নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা

মুহম্মদ নূরুল হুদা

নজরুল ইন্সটিটিউট

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা - বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা
মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রকাশক
মোঃ রবিউল ইসলাম
প্রকাশনা কর্মকর্তা
নজরুল ইন্সটিটিউট
বাড়ী নং ৩৩০-বি, রোড নং ২৮ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
মামুন কায়সার

মুদ্রাকর
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মনীষার এক মহত্তম বিকাশ, বাঙালি সৃষ্টিশীলতার এক তুঙ্গীয় নিদর্শন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। নজরুল তার বহুমাত্রিক প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে যুক্ত করেছেন আপন-মাত্রা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি রক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য-সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, রচনাবলী সংগ্রহ, প্রকাশনা ও প্রচার নজরুল ইন্সটিটিউট কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যায়ে 'নজরুলের ইন্সটিটিউট পত্রিকা - বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হল। এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ বিশেষ। এ সংকলনে নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকে বিংশ সংখ্যা পর্যন্ত যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। নজরুল প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে এ সব প্রবন্ধ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সাধ্যমত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। এ-জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

যাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের এ-গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ড. রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
নজরুল ইন্সটিটিউট ট্রাস্টি বোর্ড, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক
নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

সূচিপত্র

জীবনানুষঙ্গ

শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন ও ছাত্র কবি নজরুল
এম. আবদুর রহমান ১৫

কমল দাশগুপ্তের নজরুল স্মৃতি
আসাদুল হক ২১

নজরুল-স্মৃতি
ডঃ অশোক বাগচী ৬২

কুমিল্লায় নজরুল-নার্গিস প্রসঙ্গ
শান্তিরঞ্জন ভৌমিক ৬৮

নজরুল ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : কিছু অজ্ঞাত প্রসঙ্গ
আবুল আহসান চৌধুরী ৯৮

নজরুলের বাংলা ভ্রমণ
সিকান্দার ফয়েজ ১০৬

সাহিত্যানুষঙ্গ

সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১২১

নজরুলের জীবনদর্শন
মোহাম্মদ আজরফ ১২৮

মায়াকভস্কি ও নজরুল
আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৩৫

নজরুল-গবেষণার পথিকৃৎ আবদুল কাদির
রফিকুল ইসলাম ১৭৭

নজরুলের পাণ্ডুলিপিতে সংস্কার ও সংযোজনা
আবদুল আজীজ আল্-আমান ২১৯

নজরুলের বিদ্রোহ ঃ বিদ্রোহের স্বরূপ-অন্বেষা
আহমদ রফিক ২৩২

নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ
আবদুস্ সাত্তার ২৭০

নজরুলের শিশু-কবিতায় শব্দ অনুষঙ্গ
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ৩৪৩

নজরুল ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়
আতাউর রহমান ৩৬১

নজরুল-সাহিত্যে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ৩৭০

নজরুল কাব্যে ঐতিহ্যের স্বরূপ
শাহাবুদ্দীন আহমদ ৩৭৬

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল
মোহাম্মদ মীজানুর রহমান ৩৮৫

নজরুল ও সম্পাদক
মোবাশ্বের আলী ৩৯২

নজরুল-কাব্যের দুই ধারা
বশীর আল্‌হেলাল ৩৯৭

নজরুলের কবিতায় আত্মসম্বোধন ও আত্মঘোষণা
অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ৪০৭

নজরুল-কাব্যে ঐতিহ্য চেতনা ঃ প্রেক্ষিত 'বিদ্রোহী' কবিতা
মুহম্মদ আবু তালিব ৪১৬

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : নজরুলের প্রেরণা
এম আর আখতার মুকুল ৪২৩

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে লোকায়ত জীবন ও চেতনা
ওয়াকিল আহ্‌মদ ৪৩৩

শিশু-সাহিত্যিক নজরুল
আতোয়ার রহ্‌মান ৪৩৯

নজরুলের 'বিদ্রোহী'
আবদুল মান্নান সৈয়দ ৪৬৪

নজরুলের মনোভূমি ও বিদ্রোহী
খালেদা হানুম ৪৮৪

নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা
আবুল হাসানাত ৪৯৫

নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা
মুহম্মদ নূরুল হুদা ৫০২

নজরুলের কবিতায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ৫১০

নজরুলের পত্রোপন্যাস ঃ গঠনকৌশল ও বক্তব্য
শান্তনু কায়সার ৫২১

চলচ্চিত্রে সবাক-পর্ব ও নজরুল
অনুপম হায়াৎ ৫৩৪

নজরুলের 'আজাদ' ঃ মুক্ত মুসলমানের প্রতিকৃতি
খুরশেদুল ইসলাম ৫৪৩

অগ্নি-বীণা কাব্য পাঠের ভূমিকা
বিশ্বজিৎ ঘোষ ৫৪৮

সংবাদপত্রে নজরুল ঃ বিরোধী প্রতিক্রিয়া
তিতাশ চৌধুরী ৫৬৪

প্রেমের কবিতায় নজরুলের বর্ণবৈচিত্র্য ঃ চিত্রশিল্পের দৃষ্টিতে
কাজী মোজাম্মেল হোসেন ৫৭৪

নজরুল ইসলামের মানবিকতা ও আধুনিকতা
আবু জোবায়ের ৬২৩

নজরুলের কবিতায় রোমান্টিকতার স্বরূপ সন্ধান
রহিম আজিজ ৬৩১

নজরুল ইসলামের কাব্য-বিচার সময়ের প্রেক্ষিতে
রবীন্দ্র গুপ্ত ৬৪৫

নজরুলের উপন্যাসে মানবতাবাদ
শিরীণ আখতার ৬৬৪

নজরুলের শিক্ষাচিন্তা
হাকিম আরিফ ৬৭৮

নজরুলের ছোটগল্প ঃ আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাস
চঞ্চল কুমার বোস ৬৮৪

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নজরুল-চেতনা
মাসুমা খানম ৬৯৫

নজরুলের প্রেমের কবিতা ঃ দৃষ্টি ও সৃষ্টি
স্বপ্না রায় ৭১৯

নজরুল ও তুলনামূলক সাহিত্য
শামসুদ্দিন চৌধুরী ৭৩২

নজরুল প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম মিলন ভাবনা
হাকিম আরিফ ৭৩৯

কবি নজরুলের পরস্পর-বিরোধী সত্তা
আহমেদ আশরাফ ৭৪৬

নজরুল ও জীবনানন্দ
সৈয়দা আইরিন জামান ৭৫৩

সঙ্গীতানুষঙ্গ

নজরুল-গীতি পরিবেশনা প্রসঙ্গে
বেদারউদ্দিন আহমদ ৭৭৩

নজরুল-সঙ্গীত প্রসঙ্গে
নারায়ণ চৌধুরী ৭৭৯

নজরুল-সঙ্গীত প্রসঙ্গে
লায়লা আর্জুমান্দ বানু ৭৯৬

নজরুলের সঙ্গীত-প্রতিভা
ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ৭৯৮

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও নজরুল
শেখ লুৎফর রহমান ৮১১

শতবর্ষের বাংলা গানে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য
করুণাময় গোস্বামী ৮১৯

নজরুল-সঙ্গীত ঃ কিছু বিভ্রান্তি
আবদুস সাত্তার ৮২৭

নজরুল-গীতি নয়, সঙ্গীত
শেখ দরবার আলম ৮৩৭

নজরুল-সঙ্গীতের গায়কী : স্বাধীনতার সীমা
রওশন আরা মুস্তাফিজ ৮৪৫

মরমী গানে লালন ও নজরুল
মহম্মদ মীজানুর রহমান ৮৫৪

নজরুল-সঙ্গীতে লোক-ঐতিহ্য ও লোক-সুর
আশরাফুল আলম ৮৬৭

জীবনানুষঙ্গ

শিক্ষক কবি কুমুদ রঞ্জন ও ছাত্র কবি নজরুল

এম. আবদুর রহমান

শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক শিক্ষক-জীবন হতে অবসর গ্রহণ করবার আগ পর্যন্ত মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটের হেড মাষ্টার ছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষকতা করেন না, মল্লিক মহাশয়ও করতেন না। তবে তিনি মাঝে মাঝে সব ক্লাসই পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (Inspection) করতেন। নিম্নক্লাসের ছাত্র নজরুল প্রত্যক্ষভাবে কুমুদ বাবুর কাছে পড়েন নি। তবে তিনি নজরুলকে তাঁর স্কুলের ছাত্র হিসেবে চিনতেন এবং জানতেন। কিশোর নজরুল নানাকারণে তাঁর কবি-শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জন বহু স্থানে নানাভাবে এ কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের কাছে লেখা কবি কুমুদরঞ্জনের একাধিক পত্র আমাদের হেফাজতে আছে। তাঁর একখানি পত্র নিম্নরূপ,

শ্রীহরি শরনং

কোগ্রাম

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। নজরুল (মাথরুন স্কুলে) তখনকার 6th 5th Class পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতায় বহুবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন এবং আমার Class পরিদর্শনের কথা বলিয়াছেন ভক্তিপ্লুত বাক্যে। একান্ত ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁহার (মুখ চোখ) প্রতিভাব্যঞ্জক বলিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবিতা তখন লিখিবার কথা জানি না। অনেকগুলি চিঠি কর্মজীবনে লিখিয়াছিলেন। খোয়া গিয়াছে। একখানা বোধ হয় আছে। পাইলে পাঠাইব। নজরুল যখন কবিরূপে দেশজোড়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন সেই সময়ে কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই একান্ত বিনীত ছাত্রের মত দু'পায়ের ধূলা মাথায় নিতেন। কোন সালে পড়িতেন মনে নাই।

শুভাকাঙ্খী

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি নজরুলের মাথরুনের ছাত্রজীবন সম্পর্কে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাছ থেকে। তার উত্তরে তিনি তখন

উপরোক্ত পত্রখানি লিখেছিলেন। উক্ত পত্রের বন্ধনীর মধ্যকার কথাগুলি আমাদের। কারো কারো বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এই ধারণায় আমরা বন্ধনীর মধ্যকার কথাগুলি বসিয়ে দিলাম।

মল্লিক মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ-আলোচনা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম যে, নজরুল তাঁকে মাঝে মাঝে পত্র লিখতেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল তাঁর কাছে তাঁর কবি-ছাত্রের চিঠিগুলি রক্ষিত আছে। পরে সংগ্রহ করতে গিয়ে খবর পেলাম যে, ১৩৬৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় তাঁর অন্যান্য মূল্যবান বইপত্রের সঙ্গে নজরুলের পত্রাদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একখানা রক্ষা পেয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কোথায় আছে উল্লেখিত পত্রখানি ডাকে দেবার সময় পর্যন্ত তা মনে করতে পারছিলেন না। এজন্য তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এবং সব কাজ ফেলে খোঁজ করছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেইদিনই তিনি নজরুলের লেখা একখানা পত্র বাড়ীতে পেয়ে যান এবং কালবিলম্ব না করে ডাকযোগে তৎক্ষণাৎ চিঠিটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে দেন এই লেখককে একখানি পত্রও। পত্রের বয়ানটি নিম্নরূপ,

শ্রীহরি শরনং

কোগ্রাম

২৪-৬-৫৯

প্রিয়বরেষু

...... নজরুলের চিঠিখানি পাইলাম ও পাঠাইলাম। তুমিই রাখিয়া দিবে। ফেরত দিতে হইবে না। অনেক চিঠিই ছিল তাহা সব বন্যায় খোয়া গিয়াছে। আগেই পোস্টকার্ড লিখিয়াছি।

আশীর্বাদক

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি কুমুদরঞ্জনকে লেখা কবি নজরুলের উল্লেখিত পত্র যথাস্থানে প্রকাশ করব। (মুদ্রিত ফটোকপি এই পত্রিকার অন্যত্র দ্রষ্টব্য) ছাত্র নজরুলের প্রতি শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জনের স্নেহ, দরদ, প্রীতি এবং ভালবাসা যে কত আন্তরিক ছিল পূর্বোক্ত পত্রখানির তল্লাসীর ঘটনাটি তার সুস্পষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ বহন করছে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদরঞ্জনের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও হত।

আমরা কবি নজরুল ইসলামের জীবন-ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহ করছি এবং তাঁর লেখা চিঠিপত্র আমাদের কাজে লাগবে একথা জানতে পেরে এবং উক্ত হারানো চিঠিখানি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর উৎকণ্ঠার কথা এবং সেখানি পাওয়ার পরও আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য ডাকে দেওয়ার পর তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তিলাভের কথা আমরা বিভিন্ন সূত্রে জেনেছি, পরিচয় পেয়েছি নজরুলের প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ আকর্ষণের।

মাথরুন স্কুলে তখন তাঁর চেয়ে অধিক গুরুভক্ত ছাত্র আর ছিলেন না তা নয়। বর্তমান লেখকের অনেক আত্মীয়-স্বজন শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁদের গুরু-ছাত্রের সম্পর্ক ছিল মধুর। তবে ছাত্র নজরুলের আচার-আচরণের মধ্যে তাঁর গুরুভক্তির যে বিশেষ শরাফতী ছিল সে কথা কুমুদ বাবু আমাদের কাছে নিজেই অনেকবার বলেছেন।

নজরুলের মাথরুন স্কুল ত্যাগ করার প্রায় সাত আট বছর পরে তাঁর কবি শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কলকাতায়। যুদ্ধ ফেরত হাবিলদার কবি এতদিনে বিদ্রোহী কবি রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা সাহিত্যরসিক সমাজে ও কবিমহলে এক চমক ও আলোড়ন এনে দিয়েছে। তখন তাঁর সুর ছন্দে শোনা যাচ্ছে নদীর কুলু-কুলু ধ্বনি নয়, বাঁধ-ভাঙা বন্যার গুরু গরজন রব। কলকাতা হতে দূরে, বহু দূরে অজয় কুনুর তীরের কুঞ্জকুটীরে বসে পল্লীর মরমী কবি কুমুদ রঞ্জন শুনলেন বাংলা কাব্যে 'বারিধির মহাকল্লোল ধ্বনি।' শুনলেন এই 'শ্রাবণ প্লাবন বন্যা' আনা কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। নাম শুনে ভুলে যাওয়া অতীত দিনের একটি ছাত্রের নাম তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল, স্মরণে এসেছিল একটি নাম। তবে কি এই বিদ্রোহী কবি তাঁর সেকালের ছাত্র কাজী নজরুল ইসলাম?

খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন কবি নজরুল তাঁর স্কুলের ছাত্র — সেই কাজী নজরুলই বটে। আনন্দ-গৌরবে-বুক ভরে উঠেছিল তাঁর। পরিচয় পাওয়ার পর সাক্ষাতের ইচ্ছা জেগেছিল তাঁর মনে। একদিন সুযোগ এসে গেল। কলকাতার বুকে হল উভয়ের সাক্ষাৎ। বিদ্রোহী কবির শ্রেষ্ঠতম বন্ধু বরেণ্য নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'নজরুল প্রসঙ্গে' শীর্ষক গ্রন্থে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> আমরা ক'জন দুপুরবেলা ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীতে (দোতলায়) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে বসেছিলাম। নজরুল ইসলামও সেখানে হাজির ছিল। এমন সময় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এসে খবর দিল যে, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক নীচে

দাঁড়িয়ে আছেন। খবর পেয়ে নজরুল খালি পায়ে ছুটলো। জুতোতে পা গলাবার বিলম্ব কি সওয়া যায়? সে কি করে, দেখবার জন্য আমরাও তাঁর সঙ্গে নীচে ছুটলাম।...

দেখলাম কবি কুমুদ রঞ্জন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন, ছুটে এসে নজরুল তাঁর পায়ের ধূলো নিলো। তাঁকে সসম্মানে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি যে উপরে যাননি, তার কারণ তাঁর মন দ্বিধাবিভক্ত ছিল। নজরুল তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবে। সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কত দিন পরে ছাত্র-শিক্ষকের সাক্ষাৎ বললে ভুল হবে। কবির সঙ্গে কবিরও মিলন হল। ... কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে কত রকমের কত কথাবার্তা হচ্ছিল। কথায় কথায় নজরুল বলে ফেললো —'আমিও আপনার মত পাগল স্যার।' তখনই আমার মনের ভিতরটা কি রকম করে উঠলো। ভাবলাম ক্ষ্যাপাটা আবার একি বলে বসলো। ... কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলাম তাঁর চোখ মুখ হতে নজরুলের প্রতি স্নেহ ঝরে পড়ছে।... তিনি এক সময়ে নজরুলের শিক্ষক ছিলেন। তার জন্য নজরুল আমাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করতো। শিক্ষকও ছাত্রের কবিখ্যাতিতে মনে মনে গর্ববোধ করতেন। আমাদের কাছে এটা বুঝবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল।

এরপরেও কয়েকবার কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে কবি নজরুলের সাক্ষাৎ হয়েছিল। যখনই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, নজরুল ভক্তিভরে তাঁর এই কবি-শিক্ষকের পায়ের ধূলো নিয়েছেন এবং নানাভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সত্যিকার বিনীত ছাত্রের মতই।

উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে পত্র-বিনিময় হতো। দুঃখের বিষয় সে-সব পত্র আজ আর পাবার কোন উপায় নেই— আমরা আগেই বলেছি। ঐ সব পত্রের মধ্যে একখানি মাত্র পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখিত পত্রখানি আমাদের পশ্চিম বঙ্গ মুসলিম অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে। পত্রের অবিকল অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হল,

The Gramophone Company Ltd
(Incorporated in England)
His Master's Voice
Head office and factory in India
33 Jessore Road, Dum Dum
37/1, Sitanath Road, Calcutta

6 4 26

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

বহুদিন আপনার শ্রীচর দর্শন করিনি। কলকাতা এলে খবর দেবেন যেন। আপনার আশীর্বাদে আমি একরূপ আছি। আমি বর্ত্তমানে H M V Gramophone Co-এর Exclusive Composer তাদেরই নির্দ্দেশমত আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এই পত্র লিখছি। আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা' গানটিব Permission (রেকর্ড করার) চান উক্ত কোম্পানী। এর আগেও আপনার দু'চারখানা গান গেছে রেকর্ডে আপনি যদি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি দেন, আপনার গানের জন্য

Royalty (5% commission) পাবেন। আপনার অনুমতিপত্র পেলেই কোম্পানী আপনাকে Royalty দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে দেবে। আশা করি পত্রোত্তর পাব।

নিবেদন ইতি –

প্রণত ঃ

নজরুল ইসলাম

P.S. আপনার ঐ গানের সঙ্গে আর কোন্ গান গেলে ভাল হয়; তা যদি নির্দেশ করেন বা লিখে পাঠান সেই গানটি, তাহলে ভাল হয়।

নজরুল

উপরোক্ত পত্রটি নানাদিক দিয়ে মূল্যবান। পত্র লেখার সময় H. M. V. Gramophone Co. এর সঙ্গে কবি নজরুল কিভাবে যুক্ত ছিলেন তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল-জীবনের এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা এখনও হয়নি। কবির একাধিক বন্ধু, ভক্ত, গুণগ্রাহী ও গবেষক-সাহিত্যিক তাঁর একাধিক জীবন-কাহিনী লিখেছেন এবং লিখছেন, কিন্তু বিভিন্ন রেকর্ড-কোম্পানীর সঙ্গে নজরুলের কিরূপ সম্পর্ক ও সংস্রব ছিল, সে বিষয়ে আজও কেউ বিশদভাবে আলোকপাত করেননি। তাই তাঁর জীবনের এ দিক এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাতপ্রায় রয়ে গিয়েছে।

নজরুল-জীবনের এক মূল্যবান বৃহত্তর অংশ ঐ সব কোম্পানীর সৃজনী কক্ষে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। নজরুল-প্রতিভার বিকিকিনি করে শুধু এই শ্রেণীর কোম্পানীরাই নন— অন্য যাঁরা লাভবান হয়েছেন তাঁদের অনেকেই অসুস্থ নজরুলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি।

কবি কুমুদরঞ্জন কিছু-সংখ্যক সঙ্গীত রচনা করলেও তিনি মূলত ঃ ছিলেন কবি। সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না। অর্থের ও সম্মানের মোহ তাঁর চিরদিনই ছিল কম। তাঁর প্রিয় ছাত্র সঙ্গীতস্রষ্টা ও গায়ক নজরুলের আহ্বান এলেও তিনি সঙ্গীত রচনায় তাঁর অনুরোধে তেমন সাড়া দেন নি বা দিতে পারেন নি। আর ঐ একই কারণে আপনজনের আহ্বানে তিনি তাঁর প্রিয় পল্লীর কুঞ্জকুটীর ত্যাগ করে কলকাতা বা বর্ধমানে বাসা বাঁধতে রাজি হন নি। পল্লী এবং পল্লীবাসীদের প্রতি তাঁর প্রেম ভালবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। রচনাশৈলী তাঁর পল্লী-প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরদিন।

কবি কুমুদরঞ্জন প্রাণভরে ভালবেসেছিলেন পল্লীকে, পল্লীর গাছপালা পশুপাখী, নদী-পুকুর ও গ্রামীণ মানুষকে। বেদে, হা ঘরে, মাঝি-মাল্লা, খেয়াবী – ঝিয়ারী, প্রভৃতি সব্বাইকে। তাঁদের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে কবিতা লিখতে তিনি ভালবাসতেন। গান লেখায় তাঁর আসক্তি ছিল না। পরম বৈষ্ণব ছিলেন তিনি। ধর্ম আর কবিতা নিয়ে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন।[১]

১ পশ্চিমবঙ্গবাসী এম আবদুর রহমান একজন প্রবীণ লেখক, গবেষক ও গ্রন্থকার। নজরুল বিষয়েও তাঁর একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম অনুসন্ধান সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক এম আবদুর রহমানের এই রচনাটি সেখানকাব তরুণ লেখক ও সাংবাদিক এমদাদুল হক নূরের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। -স ন ই প

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — তৃতীয় সংকলন]

কমল দাশগুপ্তের নজরুল স্মৃতি

আসাদুল হক

[বিশিষ্ট নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, শিল্পী ও স্বরলিপিকার আসাদুল হক উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ও স্বরলিপিকার — পরলোকগত কমল দাশগুপ্ত সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ স্মৃতিচারণমূলক রচনায় বহু দুর্লভ ও মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ এবং নজরুল ও নজরুল-সঙ্গীত সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণায় আসাদুল হকের দীর্ঘদিনের যে সাধনা ও নিষ্ঠা এবং নজরুল-সঙ্গীতের এক প্রধান সুরকার কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে এই স্মৃতিচারণধর্মী তথ্যভিত্তিক রচনায়। –স.ন.ই.প.]

১৯৫৩ সাল!

হঠাৎ করেই একদিন বিখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্তের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' গ্রামোফোন কোম্পানীতে কবি নজরুলের শেষ পর্যায়ের সর্বপ্রধান সহকারী হিসাবে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁর নাম। কবি নজরুলের পর 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'কে কেন্দ্র করে বাংলা তথা ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কমল দাশগুপ্তের কর্মবহুল জীবন ও অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমার সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ— প্রৌঢ়ত্বের সীমায় অবতীর্ণ শিল্পীর জীবনে তখন ভাটার টান। ছোটখাট দু' একটা বৈষয়িক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটলেও এই উদার শিল্পীর মনের কাছাকাছি পৌঁছতে আমার বেশী সময় লাগলো না।

কমল দাশগুপ্তই আমাকে কাছে টেনে নিলেন, হয়তো কিছুটা তাঁর নিজের প্রয়োজনেই। আমি কিন্তু সাধারণ একজন শিল্পী, এবং সেই অর্থে শিল্পরসিক হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। ছোটখাটো কাজে তাঁর ফিল্মের সঙ্গীত পরিচালকের কার্যকলাপে কখনো সহকারীর ভূমিকাও পালন করেছি।

ফিল্ম-সঙ্গীতের কতকগুলো রেকর্ড বাজিয়ে শোনার প্রয়োজনে দরকার একটি গ্রামোফোন— দায়িত্ব পড়লো আমারই ওপর এবং অবলীলাক্রমে এই কাজটি সমাধা করে নিজেকে কৃতার্থবোধ করলাম। গান শোনার কাজ শেষ হলে রেকর্ডগুলি ফিল্ম-প্রযোজকের কাছে পাঠানো হলো, গ্রামোফোনটা কিন্তু আমার ঘরেই পড়ে থাকলো।

মজার কথা, এই গ্রামোফোনটাকে কেন্দ্র করেই আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটলো। আমার এক শিল্পীবন্ধু বেড়াতে এসে ঘরে গ্রামোফোন দেখে গান

শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যন্ত্র আছে, কিন্তু বাজাবার মতো রেকর্ড নেই। সে-সময়ে আমাদের ছা'পোষা জীবনে এটাতো একটা সমস্যাই বটে। সমাধানের পথ বন্ধুটিই করে দিলেন। তাঁর কাছেই জানলাম (কলকাতার) বৌবাজারে নাকি কতকগুলো দোকান আছে সেখানে সস্তা দামে পুরানো রেকর্ড বিক্রি হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সূত্র ধরেই আমি নজরুল-গীতির পুরনো রেকর্ড সংগ্রহের পথটি আবিষ্কার করে ফেলি।

১৯৫৬-এর এক সন্ধ্যায় বন্ধুর সাথে বৌবাজারে পুরনো রেকর্ডের দোকানগুলি খুঁজে বার করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। নানা ধরনের শত শত পুরানো রেকর্ডের সারি, দাম প্রতিটি আট আনা থেকে দেড় টাকা। বন্ধুবর তাঁর নিজের পছন্দমতো পাঁচখানা রেকর্ড কিনলো। আমিও দেখছিলাম, একখানা রেকর্ড হাতে নিতেই দেখলাম তাতে লেখা আছে ঃ 'কথা ঃ কাজী নজরুল ইসলাম'। এই রেকর্ডখানা কেনার মাধ্যমেই আমার নজরুল-গীতির রেকর্ড সংগ্রহের শুভ-সূচনা।

আমার কেনা এই রেকর্ডটির নং এন-২৭২২১, শিল্পী ঃ যুঁথিকা রায়। গানটির প্রথম কটি কথাঃ 'বল প্রিয়তম বল'।

যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে গ্রামোফোন এনেছিলাম দু'দিন পরে তিনি তা নিয়ে গেলেন। কিন্তু নজরুল-গীতির রেকর্ড সংগ্রহের কাজ আমার অব্যাহত থাকলো। ক্রমশঃ আগ্রহটা কেমন যেন একটা নেশায় পরিণত হলো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার সেই পুরনো বাজারে না গেলে মনে শান্তি পেতাম না। এ আগ্রহের সুযোগ নিয়ে অনেকে আমার কাছ থেকে বেশী দাম আদায় করে নিতো। এমন রেকর্ডও ডবল দামে কিনেছি— যার অর্ধেক কথাও বোঝা যায় না।

'নন্দ' নামে এক ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হয় সেই পুরানো বাজারে। তিনিও আমার মতই রেকর্ড সংগ্রহ করেন। একদিন বাজারে ঢুকে দেখি প্রথম দোকানটি তিনিই দেখাশোনা করছেন। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন যে, তিনি দোকানটা কিনেছেন, অর্থাৎ রেকর্ড কিনতে কিনতে রেকর্ডশুদ্ধ দোকানটাই কিনে বসেছেন। নেশার মধ্য দিয়ে পেশাকে অবলম্বন করেছেন। ভদ্রলোক এই পেশা অবলম্বন করায় আমার অবশ্য সুবিধাই হয়ে গেলো, পুরানো কোনো রেকর্ড পেলেই তিনি আলাদা করে আমার জন্যে রেখে দিতেন। ঐ সব রেকর্ড দেখানো তার একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। আমাকে না দেখিয়ে তিনি বিক্রি করবেন না। ঐসব রেকর্ড আমাকে দেখানোর আগে অন্য আর কাউকে দেখাতেন না, বিক্রিও করতেন না।

তার মাধ্যমেই সারা বাজারে আমার পরিচিতি ক্রমশঃ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কে পরিণত হলো। আমি কবি নজরুলের যে-কোন রেকর্ড পেলেই দরদাম না করে কিনে ফেলি।

যারা আমার কাছে ঐসব রেকর্ড বিক্রি করতেন তাদের সাথে ক্রমশঃ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক কারণেই। এই হৃদ্যতার এক চমকপ্রদ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে অবাক হলাম যখন তারা সবাই আমাকে 'নজরুল সাহেব' বলে সম্ভাষণ করতে লাগলো। তারা কেউই আমার সঠিক নাম নিয়ে প্রশ্ন করতোনা। কেউ যদি ঐ পুরানো বাজারে গিয়ে 'নজরুল সাহেবকে' খোঁজ করে তবে তারা সবাই আমার কথা বলে দিতে পারবে এক বাক্যে। তাদের সহযোগিতার কথা মনে পড়লে আজও কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠে।

পুরো একটি বছরের একটানা অন্বেষণের পুরস্কার হিসাবেই হয়তো একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে কবি নজরুলের স্বকণ্ঠে গীত একখানি রেকর্ড পেয়ে গেলাম 'মেগাফোন কোম্পানী'র রেকর্ড নং জে এন জি–৮ গান দুটোর প্রথম কয়টি কথা নিম্নরূপ,

ক–দিতে এলে ফুল হে প্রিয় কে আজি সমাধিতে মোর
খ–পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে আজি সোনার ছোঁয়ায়

এই সময় আমার অন্বেষণের ক্ষেত্র বউ বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, ধর্মতলা, মার্কেট স্ট্রীট–এমন কি আলীপুরের পুরনো বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

আমার এই সংগ্রহের কথা কমল দা (কমল দাশগুপ্ত) জানতেন। নজরুল-গীতির রেকর্ড এবং গান সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় উৎসাহে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। এ-সময়ে আমার সংগ্রহে শতাধিক রেকর্ড স্থান পেয়েছে। সব থেকে মজার কথা হলো, তখনো কিন্তু আমার নিজের কোন গ্রামোফোন নেই। 'চোঙ্‌ওয়ালা' গ্রামোফোনের পাশে বসে একটি কুকুর গান শুনছে—'হিজ মাস্টার্স ভয়েসে'র এই বিখ্যাত ছাপওয়ালা পুরনো মডেলের একটি গ্রামোফোন কেনার অর্থ-সংস্থানের কারণে দু'মাসের জন্য আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠাতে হয়েছিল। ঘরে গ্রামোফোন এলো, স্ত্রীও ফিরে এলেন। নব উদ্যমে সংগৃহীত রেকর্ড বাজিয়ে গানের পূর্ণ-বাণী উদ্ধার ও সংরক্ষণে ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম।

একদিন বৌ-বাজারে একখানা রেকর্ড খুঁজে পেলাম, বলা বাহুল্য, গান দু'খানাই কবি নজরুলের। শিল্পী মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, হিজ মাস্টার্স ভয়েসের এন, ২৭১৩৫ নম্বর রেকর্ড। গান দু'খানির প্রথম ক'টি কথা,

ক–আরো কতদিন বাকি
খ–আমি সন্ধ্যামালতী

রেকর্ডখানি হাতে করেই সোজা আমি যখন কমলদার বাসায় গিয়ে পৌছালাম, সন্ধ্যার পর তিনি তখন বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন। উদার

শিল্পীর অকৃত্রিম স্নেহস্পর্শে 'কমলদা'-এই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধনেই তখন তাঁকে ডাকতাম। হাতে রেকর্ড দেখেই আমার হাত থেকে রেকর্ডখানি দেখতে গিয়ে, তিনি অপলক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন—রেকর্ডের লেখাগুলোর দিকে। অকারণেই বার বার এপিঠ-ওপিঠ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর বিছানার পাশে রেকর্ডখানা রেখে পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে আপন মনে টানতে লাগলেন। চোখে-মুখে বিষণ্ন অভিব্যক্তি—মনে হলো তিনি যেন কোন এক স্মৃতির রাজ্যে হারিয়ে গেছেন। আমরা দু'জন ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিল না। নীরবতা ভঙ্গ করে আমিই জিজ্ঞেস করলাম, রেকর্ডের গানটি ইতিপূর্বে তিনি শুনেছেন কিনা? আমার প্রশ্নে তাঁর সম্বিত ফিরে এলো। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্লেন যে, গান দু'খানার সুরকার স্বয়ং তিনিই। আরো জানালেন যে, এই রেকর্ডটি জুড়ে রয়েছে একটি সকরুণ স্মৃতি।

বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ কমলদা সেই অতীতে আত্মমগ্ন ছিলেন। সকরুণ কাহিনীটি জানার প্রবল একটা বাসনা কিছুতেই দমন করতে পারলাম না। ব্যথা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে একটা বেদনার সুর —কমলদা বলতে লাগলেন,

'যতদুর মনে পড়ে, ১৯৪১ সালের কথা। আমি মাঝে-মাঝেই কাজীদা'কে তাগিদ দিতাম লেখার জন্য। ঠাট্টা ক'রে বলতামঃ কাজীদা, তুমি গান লিখতে শুরু করে কবিতা লেখা ভুলে গেলে নাকি? আমার কথায় বিদ্রোহী কবি হো হো করে হেসে বল্লেন, 'সময় কোথায় কবিতা লেখার'? একদিন সত্যি-সত্যি কবি একটা মস্ত বড় কবিতা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'নে দেখ, কত বড় একটা কবিতা লিখেছি। তোরা শুধু বলবি কবিতা নাকি আমি লিখি না।' কাজীদা আরো বল্লেন, কবিতাটি ছাপাতে দিতে হবে। সুতরাং পড়া শেষ হয়ে গেলেই যেন উপরের ঘরে তার কাছে পাঠিয়ে দেই। পরবর্তীকালে এই কবিতাটি কবির 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় 'চির জনমের প্রিয়া' শিরোনামে।

কমলদা বলতে লাগলেন ঃ কবিতাটি পড়ে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলাম এবং হুবহু নকল করে রেখে কবিকে মূল কপি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। দু'সপ্তাহ পরে আমি চারখানা গান নিয়ে কবির হাতে দিয়ে বললাম গানগুলো আমার এক বন্ধুর লেখা। এই লেখাগুলো সম্পর্কে মন্তব্য জানতে চাইলাম। কবি গানগুলি পড়ে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন এবং বল্লেন যে আমার বন্ধুটি যেন লেখা ছেড়ে না দেয়, কারণ প্রথমেই যখন তিনি এতো ভালো লিখেছেন, তখন আশা করা যায় চর্চা করলে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করতে পারবে। কবি যখন এ-ধরনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমি কিন্তু তখন সম্পূর্ণ নীরব। কোন সাড়া না পেয়ে কবি আমার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন—আমি ততক্ষণে মুখ টিপে হাসছি। হঠাৎ একটা কিছু ঘটে গেছে যা তিনি বুঝতে পারেননি—এই ভেবে কবি থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি তখন বল্লাম, 'আসলে গানগুলো সবই আপনার লেখা!'

কাজীদা প্রতিবাদ করে বল্লেন, 'কক্ষনো নয়।' এমন গান তিনি কখনো লেখেননি। আমি তখন শান্তভাবে জানালাম যে, দু'সপ্তাহ আগে যে কবিতাটি আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন সেই কবিতার চার-ছয় লাইন করে নিয়ে চারটি গান তৈরী করেছি। শুধু যে-সব জায়গাতে গানের প্রথম লাইনে ফিরে যেতে হবে যেখানে আমি নিজে দু'একটা শব্দ যোগ করে দিয়েছি মাত্র। আমার কথা শুনে কবি কিঞ্চিত লজ্জিত হলেন, কিন্তু সামলে নিয়ে বল্লেন, 'ঐ শব্দ ও লাইনগুলো যোগ করায় অর্থ প্রাণবন্ত ও জোরালো হয়ে উঠেছে।' কথা শেষ করেই কবি প্রাণখোলা অট্টহাসিতে পরিবেশ হালকা করে তুললেন।

কমলদার মুখে নজরুলের কবিতা সম্পর্কে যে বিবরণ শুনছিলাম সেটা তাঁর মূল বক্তব্যের ভূমিকা মাত্র। এ-প্রসঙ্গে তিনি যে সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপঃ

একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর কাজ শেষ করে কোন এক ছায়াছবির প্রযোজকের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন। দরজায় গাড়ী দাঁড়াতেই দারোয়ান জানালো কমল দাশ গুপ্ত নীচে আসছেন, সুতরাং আশেপাশের সবাই যেন রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান। নীচে ওয়েটিং রুমে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন, কমল দাশগুপ্তের নাম শুনেই তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। পাশে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি বেয়েই শ্রী দাশগুপ্ত নীচে নেমে এলেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁকে নমস্কার জানালেন, যেতে যেতে কমলদাও প্রতি-নমস্কার জানালেন এবং গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট দিল। কিছু পথ যাবার পর হঠাৎ কমলদার কি কথা মনে পড়ায় তিনি ড্রাইভারকে গাড়ী ঘুরিয়ে আবার গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে নিয়ে যাবার জন্য বললেন। গাড়ী পুনরায় আগের দরজায় ফিরে এলো। তিনি গাড়ী থেকে নেমে সোজা ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি তাকে চিনতে পেরেছেন কিনা। বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কমলদা তখন ভদ্রলোককে পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার নাম শ্রী অতুল বন্দোপাধ্যায় নয় কি? কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তো? উত্তরে বৃদ্ধ শুধু হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু কমল দাশগুপ্তকে চিনতে পারলেন না। কমলদা তখন বৃদ্ধের পদধূলি নিয়ে জানালেন যে, তিনি তাঁর কলেজের ছাত্র ছিলেন। তা'ছাড়া তাঁর বাবার নাম শ্রী তারাপ্রকাশ দাশগুপ্ত।— যিনি এক সময় বেশ ক'বছর কুমিল্লাতে তাঁদের পাশাপাশি বাস করেছেন।

কমলদার কথা শুনে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চমক ভাঙলো। বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি তারার ছেলে? তবে যে কমল, আমরা শুনতে পাই— প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্তের কথা, সেকি তুমি? কমলদা এ-কথায় সম্মতি জানাতেই বৃদ্ধ যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর আনন্দের কারণ দুটো। প্রথমতঃ বন্ধুর ছেলে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিজের ছাত্র। সুতরাং পুত্রতুল্য কমল দাশগুপ্ত হলেন গিয়ে ভারত-বিখ্যাত একজন সুরকার। তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে হাত তুলে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার

কাছে দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ করার পর কমলদা তাঁর গ্রামোফোন কোম্পানীতে আসার কারণ জানতে চাইলেন। বৃদ্ধ কিছুটা বিব্রত বোধ করছিলেন। কমলদা তখন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দোতলায় তাঁর নিজের কামরায়। এবারেও তিনি পুনরায় তাঁকে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে কমলদার মাস্টার মশাই জানালেন ঃ তার এক মাত্র কন্যা মীনাকে সুদূর কুমিল্লা থেকে কলকাতায় সাথে করে এনেছেন। কলেজ ছুটি— বেড়ানো উপলক্ষ মাত্র, আসল উদ্দেশ্য গ্রামোফোন রেকর্ডে গান করানো। অন্য রেকর্ডিং কোম্পানীতে গিয়েছিলেন, গান শোনার পর মীনাকে তারা গান রেকর্ডিংয়ের উপযুক্ত মনে করেনি। কমলদার কথায় তাঁর মাস্টার মশাই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষমান মীনাকে নিয়ে এলেন এবং কালবিলম্ব না করে মীনাকে একটি হারমোনিয়াম দিয়ে গান শোনাতে বললেন। কমলদা গান শুনতে শুনতেই নিজ হাতে একটা 'কনট্রাক্ট ফর্ম' পূরণ করতে লাগলেন। মীনা তখন খুব একটা ভালো গাইতে না পারলেও তার গলায় কিছু কিছু দরদভরা গিটকিরির কাজ কমলদার খুবই ভালো লেগেছিলো। সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে কমলদার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কণ্ঠশিল্পীদের গায়কীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের জন্য গান নির্বাচন করতেন। গান শেষ হলে মীনার হাতে একখানা খাতা দিয়ে ঐ খাতা থেকে পছন্দ মতো গান বেছে দিতে বল্লেন কমলদা। মীনার পছন্দ করা গানগুলিই কমলদা নিজে সুর করে তা দিয়ে রেকর্ড করাবেন। এই কথা শুনে মীনা অবাক হয়ে কমলদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রেকর্ড হবে তা-ও আবার সুরকার কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায়। এর মধ্যে 'কনট্রাক্ট ফর্ম' এসে গেলো, সেই ফর্মে সই করতে করতে মীনার মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো। এবারে সত্যি সত্যি গান বাছার পালা। কমলদা লক্ষ্য করলেন, মীনা বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে খাতার সব পৃষ্ঠা খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এক বিশেষ পাতায় সে তার একটা আঙ্গুল দিয়ে রেখেছে। মীনার আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে কমলদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি গান?' মীনা গানের খাতাখানা কমলদার সামনে মেলে ধরলো। মজার কথা, মীনার নির্বাচিত গানটি তখনকার একজন নামকরা শিল্পীকে দিয়ে রেকর্ড করাবার কথা ছিল। তবুও তিনি জানালেন, গানটি মীনাকে দিয়েই রেকর্ড করাবেন।

পরের দিন থেকে যথারীতি কাজ শুরু হয়ে গেল। মীনার আনন্দের সীমা নেই। গান শেখা যখন প্রায় শেষের দিকে, একদিন সে তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসে কমলদাকে আবদারের সুরে বললো, 'যে, করেই হোক, তার বান্ধবীর গানের একখানা রেকর্ড করিয়ে দিতে হবে। নইলে তার মান থাকবে না।' বলার কিছুই নেই। ছোট বোনের আবদার মানতেই হবে। আবার 'কনট্রাক্ট ফর্ম' এলো এবং যথারীতি পূরণও

হয়ে গেলো। দুই বান্ধবীর আনন্দ আর ধরে না, মন প্রাণ ঢেলে গান শিখতে শুরু করলো তারা। শেষ পর্যন্ত দু'জনেরই রেকর্ডিংয়ের তারিখ পড়লো একই দিনে। নির্দিষ্ট দিনে মীনা দমদম গ্রামোফোন কোম্পানীর অফিসে এসে হাজির হলো। কমল দাশগুপ্ত স্বয়ং মীনার গান রেকর্ডিং করার সব ব্যবস্থা করলেন। কবি নজরুল বিরচিত মোট চারটি গান অবলম্বন করে দু'টি রেকর্ডের জন্য কণ্ঠ দিলো মীনা। প্রথম রেকর্ডের গান দু'টির প্রথম দুই লাইনঃ

ক–আরো কতদিন বাকী

খ–আমি সন্ধ্যামালতী

দ্বিতীয় রেকর্ডের গান দুটির প্রথম দুই লাইন,

ক–তুমি বেণুকা বাজাও

খ–এসো নওল কিশোর

রেকর্ড করা শেষ হলে মীনা কমলদাকে তার বান্ধবীর কথা জিজ্ঞেস করলো। তার বান্ধবী যে আর ইহজগতে নেই, দু'দিন আগে হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়েছে। কথাটি শোনামাত্র মীনা চমকে উঠলো। অস্ফুট স্বরে একটি মাত্র কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো–বসন্ত!! দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু নেমে আসতে লাগলো তার। কোন সান্ত্বনার ভাষাতেই মীনাকে শান্ত করা গেলো না। তিন চার দিন চেষ্টার পর বিফল মনোরথ হয়ে মীনাকে নিয়ে তার বাবা কুমিল্লায় ফিরে গেলেন। কমলদা নিজেই তাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কমলদা নিজেও এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই স্বল্প পরিচয়েও দু'জন শিল্পীর জন্য হৃদয়ে বেদনা অনুভব করতে লাগলেন।

কমলদা গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমে বসে সুরারোপের কাজ করতেন। কিছুতেই কাজে মন বসছিল না, অথচ বাড়ী যেতেও মন চাচ্ছিল না। হঠাৎ মাস্টার মশাই এসে উপস্থিত। অশ্রু সম্বরণ করতে পারছিলেন না, দারুণ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছেন তিনি। তার ইঙ্গিতে কমলদা নীচে নেমে অপেক্ষমান একটি ঘোড়ার গাড়ীতে সারা গায়ে চাদর ঢাকা অবস্থায় মীনাকে দেখতে পেলেন। নাম ধরে ডাকতেই আয়ত চোখ দুটি মেলে তাকালো, কিন্তু মুখ থেকে কোন কথা বেরুলো না। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রু। সুডৌল মুখখানা বসন্তের ভয়াবহ আক্রমণে ছেয়ে গেছে। কমলদার চেষ্টায় তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হলো না। কিন্তু মীনা সেই যে চোখ বুঁজলো— আর খুললো না। এই পৃথিবীর কোন বন্ধনই তাকে আর ধরে রাখতে পারেনি। বলা বাহুল্য, আমার সংগ্রহ করা সেই পুরনো রেকর্ডখানি হাতে নিয়ে বেদনা-বিধূর এই কাহিনীটি মনে পড়ে গেছে কমলদার। শিল্পীর বিয়োগান্ত জীবন-নাটকের সাথে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মীনার গাওয়া গানের সেই বাণী,

॥ গান ॥

আরো কতদিন বাকী
তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায়
নিভে যায় মোর আঁখি ॥
কত আঁখিতারা নিভিয়া গিয়াছে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া মোর লাগি
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো
আকাশে রয়েছে জাগি,
যেন নীড়হারা পাখী ॥
মর্ত্যলোকে আমি তোমার বিরহে
ফেলেছি অশ্রু জল
ফুল হয়ে সেই অশ্রু ছুঁইতে চাহে
চাহে তব পদতল;
সেই সাধ মিটিবে নাকি?

॥ গান ॥

আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে
লুকাইয়া রই ঘন-পল্লব তলে ॥
বিহগীর গীতি ভ্রমরের গুঞ্জন
নীরব হয় যখন
আমি চাঁদেরে তখন পূজা করি
পূজা করি আঁখি জলে ॥
আমি লুকাইয়া কাঁদি বনের শকুন্তলা
মনের কথা এ জনমে হ'ল না বলা;
গভীর নিশীথে বন-ঝিল্লির সুরে
ডাকি দূর বন্ধুরে—
আমি ঝরে পড়ি যবে প্রভাতে
সবার হৃদয় মুকুল খোলে ॥

আমার সংগৃহীত প্রথম নজরুল-গীতির পূর্ণ বাণী,

॥ গান ॥

বলো প্রিয়তম বল!
মোর নিরাশা আঁধারে আলো দিতে
তুমি
যতো কাঁটা পড়ে মোর পথে যেতে যেতে
কেন তুমি তাহা লহ বধু বুক পেতে
যদি ব্যথা পাই বুঝি পথে তাই
তুমি ফুল বিছাইয়া চলো ॥

বলো বলো হে বিরহী
তুমি আমারে অমৃত এনে দাও
কেন নিজে উপবাসী রহি;
মোর পথের দাহন আপন বক্ষে নিয়ে
মেঘ হয়ে চলো সাথে সাথে ছায়া দিয়ে
মোর ঘুম না আসিলে কেন কাঁদ
চাঁদ ঢল ঢল ॥

গানটি শিল্পী যুঁথিকা রায় কর্তৃক গীত হয়। রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার গানটি কবি নজরুলের নয়। নজরুলের উপরোক্ত গানটি এন. ২৭২২১ নম্বর রেকর্ডে প্রকাশিত হয়।

শ্রী কমল দাশগুপ্ত অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর এই করুণ স্মৃতিকথা শুনে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ যখন আমাদের চমক ভাঙলো, ঘড়িতে দেখলাম রাত অনেক হয়ে গেছে। আমি ওঠার আয়োজন করতেই কমলদা বললেন, 'চলুন' আপনাকে সদর রাস্তা পর্যন্ত দিয়ে আসি। ফেরার পথে আমার সিগারেট কেনাও হবে; এক কাজে দু'কাজ হয়ে যাবে।'

রাস্তায় নেমে শ্রী দাশগুপ্ত আমার বললেন, 'জানেন, মীনার ঐ গানখানা–'আরো কতদিন বাকী'–কোথায় পেয়েছিলাম ? কাজীদার সেই 'চিরজনমের প্রিয়া' কবিতাখানি থেকে।'

শ্রী কমল দাশগুপ্তের সুরে ও পরিচালনায় রেকর্ডকৃত নজরুল-সঙ্গীতের সংখ্যা কত এই তথ্য জানার জন্য অনেকের মনেই যথেষ্ট কৌতুহল রয়েছে। নজরুল-সঙ্গীত গবেষক ও কবির গানের অনুরাগীদের অবগতির জন্য এখানে, আমার সন্ধানে যা আছে, তার একটি তালিকা পেশ করলাম

গানের প্রথম কলি	শিল্পী	রেকর্ড নং	প্রকাশের তারিখ
১। আগুন জ্বালতে আসিনি গো	সত্য চৌধুরী	এন. ২৭৩৯৪	
২। আজ নিশীথে অভিসার	হরিমতী	এন. ৭২৯৩	১০/১৯৩৪
৩। আধখানা চাঁদ জাগিছে আকাশে	জগন্ময় মিত্র	এন.৩১৩১২	২/১৯৫১
৪। আধো আধো বোল	কমল দাশগুপ্ত	এন. ৭৩০১	১১/১৯৩৪
৫। আমার ভুবন কান পেতে রয়	যুঁথিকা রায়	এন. ২৭৫২৩	
৬। আমার মানস বনে ফুটেছে রে	গিরীন চক্রবর্তী	এন. ১৭১৬২	৭/১৯৩৮
৭। আমার মালায় লাগুক তোমার	বীণা চৌধুরী	এন. ১৭৩৯৮	
৮। আমার সকল আকাশ ভরল	আভা সরকার	এন. ৯৭২৩	৫/১৯৩৬
৯। আমি গিরিধারী সাথে	পদ্মা রাণী	এন. ১৭৪৮৫	
১০। আমি যদি আরব হতাম	সকিনা বেগম	এন.৯৮৫৬	
১১। আমি হারিয়ে যদি যাই	পদ্মা রাণী	এন. ১৭৩০৯	

১২। আমি যার নূপুরের ছন্দ	ইলা ঘোষ	এন. ২৭৩১১	
১৩। কেন মনোবনে মালতী বল্লরী	ইলা ঘোষ	এন. ২৭৩১১	
১৪। আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে	মীনা ব্যানার্জি	এন. ২৭১৩৫	৬/১৯৪১
১৫। আয়রে অশুচি আয়রে পতিত	বাংলার ছেলে -মেয়ে	এন. ৯৯৪৬	
১৬। এ কোন মধুর শারাব দিলে	আব্বাসউদ্দিন	এফ.টি৪৯২৭	৬/১৯৩৭
১৭। এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল	আব্বাসউদ্দিন	এফ. টি ১২৭৩৭	৩/১৯৩৯
১৮। নীল আসমানের কোরান	আব্বাসউদ্দিন	এফ. টি ১২৭৩৭	৩/১৯৩৯
১৯। এস আনন্দিতা ত্রিলোক	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ৭৪১৬	
২০। এস নওল কিশোর	মীনা ব্যানার্জি	এন. ২৭১৬২	৮/১৯৪১
২১। তুমি বেণুকা বাজাও	মীনা ব্যানার্জি	এন. ২৭১৬২	৮/১৯৪১
২২। এস প্রিয় মন রাঙায়ে	পারুল সোম	এন. ২৭৩০২	৮/১৯৪২
২৩। ও কে সোনার চাঁদ	আবদুল লতিফ	এফ.টি.১২৩০৫	৩/১৯৩৮
২৪। ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো	মৃণালকান্তি ঘোষ	এন. ২৭২৪২	
২৫। ওরে আজই না হয়	মৃণালকান্তি ঘোষ	এন. ২৭১৮২	
২৬। ওরে আলয়ে আজ	কেডিজি ও অন্যান্য	এন. ৭৪১৬	
২৭। ওরে শুভ্র বসনা রজনী গন্ধা	পদ্মারাণী	এন. ১৭৩৯০	
২৮। ওরে সর্বনাশী মেখে এলি	মৃণালকান্তি ঘোষ	এন. ১৭১৮৩	৯/১৯৩৮
২৯। কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও	সন্তোষ সেনগুপ্ত	এন. ২৭০৫৭	১২/১৯৪০
৩০। কথার কুসুম গাঁথা	বেচু দত্ত	এন. ৩১২৮২	
৩১। কলংক আর জোছনায় মেশা	সুধীরা দাশগুপ্ত	এফ. টি. ৩৪৩৭	
৩২। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা	কে, মল্লিক	এন. ২৭০৪৫	১৯৪০
৩৩। কেন তুমি কাঁদাও মোরে	সকিনা বেগম	এন. ৯৮৫৬	
৩৪। ভীরু এ মনের কলি	যুঁথিকা রায়	এন.	১২/১৯৪২
৩৫। কেমনে রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়	যুঁথিকা রায়	এন. ১৭৩০৮	৬/১৯৩৯
৩৬। কেমনে হইব পার	মৃণালকান্তি ঘোষ	এন. ১৭০৬৪	৪/১৯৩৮
৩৭। কেঁদোনা কেঁদোনা মা গো	যুঁথিকা রায়	এন. ৯৯৪৭	
৩৮। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী	আব্বাসউদ্দীন	এফ.টি. ৪৯২৭	১৯৩৭
৩৯। খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে	আব্বাস উদ্দীন	এফ. টি ৩২১৭	
৪০। গগনে খেলায় সাপ	গিরীন, অসিত, চ্যাটোপাধ্যায়	এন. ১৭১৭৮	৮/১৯৩৮
৪১। গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ২৭৫২৪	
৪২। গিরিধারী গোপাল	সুধীরা এণ্ড ব্রাদার্স	এন. ১৭০৩৯	২/১৯৩৮
৪৩। গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়	জগন্ময় মিত্র	এন. ৩১৩১২	২/১৯৫১
৪৪। চম্পা পারুল যুঁথি	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ৭৩৭১	১১/১৯৩৬
৪৫। আমি চাঁদ নহি অভিশাপ	জগন্ময় মিত্র	এন.	
৪৬। চিকন কালো ভুরুর তলে	হরিমতী	এন. ৭৩১০	১২/১৯৩৪
৪৭। চুরি করে এন গিরি	কে, মল্লিক	এন. ১৭৩৫৬	১০/১৯৩৯
৪৮। জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী	যুঁথিকা ও কমল	এন. ৯৮৮৭	
৪৯। জাগ অমৃত পিয়াসী চিত মোর	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ৭৪৮৫	

৫০। তব গানের ভাষায় সুরে	অনিমা দাশ গুপ্ত	এন. ২৪৩২৫	১০/১৯৪২
৫১। তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ২৭২২৭	১৯৪২
৫২। তুই পাষাণ গিরির মেয়ে	শৈলেন গাঙ্গুলী	এন. ১৭০৪১	
৫৩। তুই অমন করে আর হাসিসনে	কে, মল্লিক	এন. ১৭২৬২	
৫৪। তুমি আর একটি দিন থাকো	পদ্মারাণী	এন. ১৭০৫০	
৫৫। তুমি কি নিশীথ চাঁদ	গ্রামোফোন ক্লাব	এন. ৯৯৫৫	
৫৬। তুমি হাতখানি যবে	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ২৭৪৭১	
৫৭। তোমার আমার এই বিরহ	ভবতোষ ভট্ট	এন, ১৭৪১৮	৩/১৯৪০
৫৮। তোমার মনে ফুটবে যবে	মৃণালকান্তি ঘোষ	এন. ১৭০৬৪	
৫৯। তোমার হাসিতে জাগে	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ৯৭০৮	৪/১৯৩৬
৬০। তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা	কে, মল্লিক	এন. ১৭১৯২	৯/১৯৩৮
৬১। মোর না মিটিতে আশা	শান্তা আপ্তে	এন. ২৭১১২	
৬২। নিরুদ্দেশের পথে আমি	পদ্মারাণী	এন. ১৭৩০৯	
৬৩। পরম পুরুষ স্নিগ্ধ যোগী	কমল ও যুঁথিকা	এন. ৯৮৮৭	
৬৪। পরি জাফরানী ঘাগরী			
৬৫। প্রজাপতি, প্রজাপতি	অসিতা বসু	এম.জে ১৩৩	১০/১৯৪২
৬৬। প্রণমামী শ্রীদুর্গে নারায়ণী	বাংলার ছেলেমেয়ে	এন. ৯৯৪৬	
৬৭। প্রভঞ্জন বীণা তব বাজে	কমলদাশ গুপ্ত	এন.৭৪৮৫	
৬৮। প্রিয় আসিল রে	কমল ও যুঁথিকা	এন.,২৭১৬৩	
৬৯। প্রিয় এমন রাত	হরিমতী	এন. ৭২৯৩	১০/১৯৩৪
৭০। প্রিয়তম এস ফিরে	কমল	এফটি. ৩৪৩৮	
৭১। বইল যখন প্রেমের হাওয়া	কমল		
৭২। বনের তাপস কুমারী আমি গো	যুঁথিকা	এন. ২৭০০৫	
৭৩। বর্ষা ঋতু এল	কোরাস	এন.১৭১৭৮	৮/১৯৩৮
৭৪। বর্ষা গেল আশ্বিন এল	কে, মল্লিক	এন. ১৭১৯২	৯/১৯২৫
৭৫। বল প্রিয়তম বলো	যুঁথিকা	এন. ২৭২২১	১২/১৯৪৭
৭৬। বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে	কমলদাশ গুপ্ত	এন. ২৭৩৩০	১০/১৯৪২
৭৭। বাঁশীতে সুর শুনিয়ে	হরিমতী	এন. ৭৩১০	১২/১৯৪০
৭৮। বেলা গেল সন্ধ্যা হোল	অনিমা	এন. ২৭০৪৫	১১/১৯৪০
৭৯। ভারতের দুই নয়ন তারা	আব্বাস/মৃণাল	এন. ১৭০৭৬	৪/১৯৩৮
৮০। ভালো লাগার স্মৃতি ভোলা নাহি	কমলদাশ গুপ্ত		
৮১। ভেসে যায় হৃদয় আমার	আব্বাস	এফ.টি. ১২১৯৪	১২/১৯৩৭
৮২। মনে পড়ে আজ সে কোন	যুঁথিকা	এন. ২৭১৯২	১০/১৯৪১
৮৩। মা তোর চরণ কমল ঘিরে	শৈলেন গাঙ্গুলী	এন. ১৭০৪১	
৮৪। মাকে আদর করে কালী বলি	মৃণাল	এন. ১৭৩৫০	৯/১৯৩৯
৮৫। মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী	যুঁথিকা	এন.	
৮৬। মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী	সুধীরা এণ্ড ব্রাদার্স	এন. ১৭০৩৯	
৮৭। মুখে কেন নাহি বলো	সত্য চৌধুরী	এন. ৩১২৮৩	১০/১৯৫০

৮৮। মোহাম্মদ মোর নয়ন মণি	আব্বাসউদ্দীন	এফ.টি. ১২৬৩৩	১২/১৯৩৮
৮৯। যদি আমি তোমায় হারাই	আভা সরকার	এন. ৯৭২৩	৫/১৯৩৬
৯০। যবে তুলসী তলায় প্রিয়	পদ্মারাণী চ্যাটার্জি	এন. ১৭০৫০	
৯১। শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে	কমল		
৯২। শ্যামা নামের লাগলো আগুন	গিরীন	এন. ১৭১৬২	৭/১৯৩৮
৯৩। হিন্দু আর মুসলিম মোরা	আব্বাসউদ্দীন ও হরিমতী	এন. ১৭০৭৬	৪/১৯৩৮
৯৪। হে প্রিয় নবী রসুল আমার	রওশন আরা বেগম	এন. ৯৭৯৩	
৯৫। হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে	রওশন আরা বেগম	এন. ৯৭৯৩	
৯৬। দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই	মোহাম্মদ কাসেম	এন. ১৭০০৮	
৯৭। আমিনা দুলাল এস	আবদুল লতিফ	এইচটি. ১২৩০৫	

শ্রী কমল দাশগুপ্ত যে বাংলা তথা উপমহাদেশ- খ্যাত সুরকারদের মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ সুরকার সেকথা একবাক্যে সবাই স্বীকার করেন। তা'ছাড়া তিনি নিজেও ছিলেন একজন প্রেমিককণ্ঠ শিল্পী। নিজের কণ্ঠে তিনি বহু বাংলা, হিন্দী, উর্দু , মারাঠী গান রেকড করেছেন।

কমল দাশগুপ্ত নিজ প্রতিভাবলে ও অধ্যবসায়ের ফলে কবি নজরুলের স্নেহস্পর্শে ধন্য হয়েছিলেন। কবি বিনা দ্বিধায় এই প্রতিভাবান সুরকারকে তাঁর লেখা নানা ধরনের গান দিয়েছেন সুর-যোজনার জন্য। নজরুলের লেখা আধুনিক, ভজন, কীর্তন, ইত্যাদি গান ছাড়াও, ইসলামী গানে সুরারোপ করে সমান সুনাম অর্জন করেন কমল দাশগুপ্ত। কবি নজরুল রচিত যে গানগুলি শ্রী কমল দাশগুপ্ত বিভিন্ন শিল্পীদের দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করেছিলেন পাঠক-বর্গ ও নজরুল-সঙ্গীতের শিল্পী এবং গবেষকদের অবগতির জন্য সেসবের অনেকগুলির পূর্ণাঙ্গ বাণী এখানে প্রকাশ করা হলো। গানগুলো কোথায় কিভাবে আমি সংগ্রহ করেছি, বা কোন কোন শিল্পীর গাওয়া, তার পূর্ণ বিবরণও প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে সন্নিবেশিত হলো। উল্লেখ্য, এ সব গান আমি সংগ্রহ করি অনেক কাল আগে- সেই পঞ্চাশ-ষাট দশকের গোড়ার দিকে, এবং তখনও গানগুলি কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

কমল দাশগুপ্ত কিছুদিন ঠুংরীর বাদশাহ বলে খ্যাত ওস্তাদ জমীর উদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে গান শেখার সুযোগ লাভ করেন ও ওস্তাদের একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। একই সাথে ওস্তাদ জমীরউদ্দীন ও কবি নজরুলের সান্নিধ্য লাভ করায় আরবী-ফারসী ও অন্যান্য শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি নানা মুসলমানী কায়দাকানুনগুলো বেশ রপ্ত করে নেন কমল দাশগুপ্ত। তাঁর এসব বিশেষ গুণাবলী ও দক্ষতা লক্ষ্য করে কবি নজরুল তাঁর কিছু ইসলামী গান বিনা দ্বিধায় সুরারোপ করার জন্য কমল দাশগুপ্তের হাতে তুলে দেন। নিম্নে উদ্ধৃত গান দু'খানির শিল্পী রওশন আরা বেগম। 'রওশন আরা বেগম' নামটি আসলে কোন হিন্দু শিল্পীর ছদ্মনাম। অমুসলিম শিল্পীরা যখন

ইসলামী গান রেকর্ড করতেন তখন প্রায় সবাই এ-ধরনের ইসলামী ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। এখানে উদ্ধৃত গান দু'খানা শিল্পী রওশন আরা কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় রেকর্ড করেন। রেকর্ড নম্বর এন. ৯৭৯৩

গান

হে প্রিয় নবী রসুল আমার
পরেছি আভরণ নামেরি তোমার ॥

নয়নের কাজল তব নাম
ললাটের টিপে জ্বলে তব নাম
গাঁথা মম কুন্তলে আহমদ
বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম
জ্বলিছে গলে মোর তব নাম মনিহার ॥

তাবিজ অঙ্গুরী তব নাম
বাজু ও পৈচি চুড়ি তব নাম
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে.
পাছে কেউ করে চুরি তব নাম
এ নাম বসন-ভূষণ আঁখিধার ॥

বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে
প্রেম-ভক্তি মাখা তব নাম
প্রিয় নাম আহম্মদ জানি আমি অনিবার ॥

গান

হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে তুমি শুনিতে কি পাও
আখেরী নবী প্রিয় আল-আরবী বারেক ফিরে চাও॥

পিঁজরার পাখী সম অন্ধকারায়
বন্ধ থাকিয়া এ জীবন কেটে যায়
কাঁদে প্রাণ ছুটে যেতে তব মদিনায়
চরণের এই জিঞ্জির কেটে দাও ॥

ফাতেমার মেয়েদের হেরি আঁখি নীর
বেহেশ্‌তে কেমনে আছ তুমি থির
তুমি কি নরের শুধু নহ কি নারীর

মুসলিম নারীদের দুখ ভোলাও ॥

যেতে নারি মসজিদে শুনিয়া আজান
বাহিরে ওয়াজ হয় ঘরে কাঁদে প্রাণ
ঝুটা এই বোরকার কর অবসান
আঁধার হেরেমে আশা-আলোক দেখাও ॥

নিম্নে প্রকাশিত গান দুটির শিল্পীও রওশন আরা বেগম। রেকর্ড নম্বর এন ৭৪৭৮। মূল রেকর্ড থেকে গানের বাণী এখানে তুলে দেওয়া হলো। গান দুটিই কবি নজরুলের পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়।১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে গান দুটি প্রকাশিত হয়।

গান

আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত
ও নাম প্রাণের মিটায় পিয়াসা
আমার তামান্না আমারি আশা
আমার গৌরব আমারি ভরসা
এ দীন গুনাহ্‌গার তাহারি উম্মৎ ॥

ও নামে রওশন জমিন আসমান
ও নামে মাখা তামাম জাহান
ও নামে দরিয়ায় বহায় উজান
ও নামে ধেয়ায় মরু ও পর্বত ॥

আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশ্‌তা অর হুর-পরী-জিন
ও নাম যদি আমার ধ্যানে রয়
পাব কেয়ামতে তাহারি শাফায়াত ॥

গান

নতুন চাঁদের তকবির শোন
কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন
আসমানে ফির ঈদজ্জোহার
চাঁদ উঠেছে মুসলেমিন ॥

এলো স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদজ্জোহার
এই সে চাঁদ
তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে
ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ।

কোরবানী দে তোরা কোরবানী দে ॥

প্রাণের মত প্রিয়তম আজকে সে সব আন
খোদারি রাহে আজ তাহাদের কররে কোরবান
কি হবে ঐ বনের পশু খোদারে দিয়ে
তোরা কাম-ক্রোধাগ্নি মনের পশু
ভবের খেলা ঘরে ॥

বিলিয়ে দেওয়ার খুশীর শিরণী তসতরীতে আন
পরিয়ে তোরা পরান ত্যাগে রঙ্গীন পিরহান
মোদের যা' কিছু প্রিয় বিলাব সবে
নবীর উম্মত পানে সকলের 'তরে ॥

শিল্পী রওশন আরা বেগমের গাওয়া আরো দুটি গান অপ্রকাশিত।[১] গান দু'খানা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়। রেকর্ড নম্বর এন. ৯৯২৬

গান

তোমারি নূরের রওশনী মাখা নিখিল ভুবন
অসীম গগন তোমার অনন্ত জ্যোতির ইশারা
গ্রহ-তারা চন্দ্র তপন ॥

তোমারি রূপের ইঙ্গিতে খোদা
ফুটিছে বনের কুসুমে সদা
তোমার নূরের ঝলক হেরি
মেঘের বিজলী চমকে যখন ॥

প্রাণের খুশি শিশুর হাসি
মধুর তোমারি রূপ দেয় প্রকাশি
তোমার জ্যোতির সমুদ্রে খোদা
আলোর ঝিনুক মোর এ দুটি নয়ন ॥

গান

নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান
জপে তোমারি নাম
তাহার গাঁথা তসবী লয়ে
নিশীথে আসমান ॥

ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া

হাতে লয়ে ফুল-কুঁড়ির তস্‌বী
ফুলের বাগান ॥

সাঁঝ-সকালে কোকিল পাপিয়া
ফেরে তব মধুর নাম গাহিয়া
ছল ছল সুরে ঝরণা ধারা
নদীর কলতান ॥

বৃষ্টির ধারার তসবী লয়ে
নাম জপে মেঘ ব্যাকুল হয়ে
সাগর-কল্লোল সমীর হিল্লোল
বাদল-ঝড় -তুফান ॥

শিল্পী সকিনা বেগমের গাওয়া একখানা রেকর্ড পাওয়া গেছে। গান দু'খানা কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। মূল রেকর্ডখানি পাওয়ার ফলে কথা ও সুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। রেকর্ড নং এন ৯৪৫৬ শিল্পীর আসল নাম 'হরিমতী'। ইসলামী গান হওয়ার দরুন তিনি রেকর্ডে ছদ্মনাম ধারণ করেছেন।

গান

আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ
এই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হজরত ॥
পয়জার তার লাগ্‌তো এসে আমার কঠিন বুকে
আমি ঝরণা হয়ে গলে যেতাম অমনি পরম সুখে
সে চিহ্ন বুকে পু'রে
পালিয়ে যেতাম কোহ্‌-ই-তুরে,
সেথা দিবানিশি করতাম তার কদম জিয়ারত ॥

মা-ফাতেমা খেলতে এসে আমার ধুলি লয়ে
আমি পড়তাম তার পায় লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে
হাসান-হোসেন হেসে নাচত আমার বক্ষে এসে
চক্ষে আমার বইতো নদী পেয়ে সে নেয়ামত ॥

আমার বুকে পা' ফেলে ফেলেরে বীর আসহাব যত
রণে যেতেন দেহে আমার আঁকি মধুর ক্ষত
কুল-মুসলিম আস্‌তে কাবায়
চলতে পায়ে দলৃত আমায়
আমি চাইতাম খোদার দীদার
শাফায়ত জিন্নত ॥

গান

কেন তুমি কাঁদাও মোরে
হে মদিনাওয়ালা
অবরোধ-বাসিনী আমি
কুলের কুলবালা-হে মদিনাওয়ালা ॥

ঈদের চাঁদের ইশারাতে
কেন ডাক নিঝুম রাতে
হাসিন য়ুসোফ-জুলেখারে কত দিব জ্বালা ॥

একি লিপি পাঠালে নাথ
কোরআনের আয়াতে
পড়তে গিয়ে অশ্রুবাদল
নামে আঁখি পাতে;

বাজিয়ে শাহাদাতের বাঁশী
কেন ডাক নিত্য আসি
হাজার বছর আগে তোমায়
দিয়েছি মালা- হে মদিনাওয়ালা ॥

শিল্পী সকিনা বেগমের গাওয়া আরো দু'খানা গান পাওয়া গেছে। রেকর্ড নম্বর এন ৭৪৮৭ রেকর্ডখানি পাওয়ার দরুন মূল কথা ও সুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। গান দু'খানি ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়।

গান

নামাজ-রোজা হজ্জ-জাকাতের পসারিণী আমি
নবীর কলমা হেঁকে ফিরি পথে দিবস-যামী ॥
আমার নবীজির পিয়ারী
আয়রে ছুটে মুসলিম নারী
দ্বীনের সওদা করিবি কে আয়রে মুক্তিকামী ॥

জন্ম আমার হাজার বছর আগে আরব দেশে
সারা ভুবন ঠাঁই দিয়েছে আমায় ভালোবেসে;
আমার আজান ধ্বনি বাজে
কুল-মুমিনের বুকের মাঝে
আমি নবীর মানস-কন্যা, আল্লাহ মোর স্বামী ॥

গান

চীন-আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম
জানে আমায় চেনে আমায়
মুসলিম আমার নাম ॥

অন্ধকারে আজান দিয়ে ভাঙলো ঘুম ঘোর
আলোর অভিযান এনেছি রাত করেছি ভোর
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ-নীচ তামাম ॥

চেনে মোরে সাহারা, গোবি, দুর্গম পর্বত
মন্থন করেছি সাগর, আমার সিন্ধু, হ্রদ
ব'য়েছি আফ্রিকা, ইউরোপে আমারি তাঞ্জাম ॥

পাক মুলুকে বসিয়েছি সোনার মসজিদ
জগৎ শান্তি পাপীদেরকে পি'য়েছি তৌহিদ
বিরান-বনে রয়েছি যে হাজার নগর গ্রাম ॥[২]

শিল্পী পদ্মারাণী চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া নজরুলের দু'খানা গান এক সময় সারা বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গান দু'খানাই কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়। গান দু'খানার প্রথম ক'টি কথা,

(১) তুমি আর একটি দিন থাকো
হে চঞ্চল যাবার আগে
মোর মিনতি রাখো ॥

(২) যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায়
তুমি করিবে প্রণাম
তব দেবতার নাম নিতে ভুলিও বারেক
প্রিয় নিও মোর নাম ॥

প্রথম গানটির সুর কমল দাশগুপ্তের। দ্বিতীয় গানটি কবি নজরুলের নিজস্ব ঢংয়ে রাগপ্রধান। কিন্তু শ্রী দাশগুপ্ত সুরটাকে জনপ্রিয় করার জন্য সহজ করে শিল্পী পদ্মারাণীকে দিয়ে রেকর্ড করান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এর আগেও গানটি একাধিক শিল্পীকে দিয়ে রেকর্ড করানো হয়। কিন্তু কেউই তেমন সুবিধা করতে পারেননি। আমি কবি নজরুলের সুরে শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া এই গানটি শুনেছি। তাঁর কাছেই জানতে পারি যে, আরও দু'য়েকজন শিল্পী নাকি এই গানটি গেয়েছিলেন। দু'টি গানই মোটামুটি সবার জানা। হিজ মাস্টার্স ভয়েসে (এইচ.এম.ভি) এ দু'টি গানই রেকর্ড হয়, এবং রেকর্ড নম্বর নং এন. ১৭০৫০

এক সময় শ্রীকমল দাশগুপ্তের কয়েকটি গানের খাতা দেখবার সৌভাগ্য

হয়েছিলো। গানগুলোর মাত্র কয়েকটি সুর করা হয়েছিল, বাকি অপ্রকাশিত।[১] দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মন থেকে আস্তে আস্তে মুছে গেছে অনেক কিছু, কিন্তু গানের রচয়িতার নামের সাথে বহু স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। বলাবাহুল্য গানগুলি নজরুল বিরচিত।

॥ ১ ॥

বুলবুলি কি এলো ফিরে
আবার গোলাপ বনে
ভুলে যাওয়া গুলবাগ কি
পড়্‌লো আজি মনে ॥
ঝরা গোলাপ পাঁপড়িগুলি
ঢেকেছে আজ মরুর ধুলি
পাতা ঢাকা সমাধিতে ঘুমায় নিরজনে ॥
দিলরুবা আর পেয়ালা হাতে
সিরাজ সাকী আসি
ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে
জল্‌সা হ'লো বাসি;
ধুলায় লুটায় ফুলের ডালি
চাঁদের চোখে পড়্‌লো কালি
শেষ গোলাপের নজরানা নাও
বন্ধু বিদায় ক্ষণে ॥

॥ ২ ॥

নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়
কে গো তুমি কে
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের
বনভূমি কে ॥
তোমার আকুল করুণ স্বরে
আজকে তারেই মনে পড়ে
এমনি রাতে হারিয়েছি যে হৃদয় মণিকে ॥
দুয়ার খুলে চেয়ে আছি
তারার পানে দূরে
আরেকটিবার ডাকো ডাকো
তেমনি করুণ সুরে;
একটি কথা শুন্‌বো বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে
দাও সাড়া দাও জাগিয়ে তোল
আঁধার পুরীকে ॥

॥ ৩ ॥

প্রেমের হাওয়া বইল যখন মুকুল গেল ঝরে
প্রদীপ নিভে রইল যখন তুমি এলে ঘরে ॥
তোমার আসার লগ্ন এলো
যেদিন আশা ফুরিয়ে গেল
মন গিয়াছে মরে যখন পেলাম মনোহরে ॥
আঘাত দিয়ে দিয়ে যেদিন করলে পাষাণ মোরে
সেদিন নিয়ে বসালে হায় তোমার ঠাকুর ঘরে;
তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি
বহু সে যুগ ছিলাম জাগি
আজিকে বেলা শেষে তুমি এলে স্বয়ম্বরে ॥

॥ ৪ ॥

ওগো সুন্দর তব পরশে
সারা অন্তর কাঁপে থর থর
একি মধুময় হরষে।
সারা দেহে মোর কাঁপন লাগে
ফাল্গুন হাওয়ায় ভীরু বনলতা
শিহরে যেমন অনুরাগে ॥
আনন্দে ফুল দোলে যেমন
ফুলে যখন মধু জাগে ॥
বঁধু কি আছে তব নয়নে
ভুলিতে পারিনা আমার শয়ন-স্বপনে
ও আঁখির প্রীতি অন্তরে নিতি
অমৃত ধারা বরষে।
ও যে যুগল চাঁদের কিরণ সম
মিলন-বিরহ জোয়ার ভাটায়
অহরহ মন দুলায় মম
কি মধু আছে তব হিয়াতে
পিয়ালা হইয়া এ দেহ যেন চায়
প্রেম মধু পিয়াতে।
আবেশে ঢলিয়া পড়ে এ অঙ্গ
প্রিয়তম তব দরশে
সাগর যেমন পড়ে ঢুলে
চাঁদকে দেখে কুলে কুলে
আপন ভুলে ॥

শ্রী কমল দাশগুপ্ত অবশ্য সবগুলো কথাতে সুরারোপ না করে কিছু কিছু কথা বাদ দিয়ে সাধারণ গানের যতগুলো পংক্তি দরকার তাই রেখেছিলেন। উপরে সবগুলো

পংক্তিই প্রকাশ করা হলো।

॥ ৫ ॥

এনেছি রূপের সুধা তনুর পেয়ালা ভরি
পিয়াসী আঁখিরে মম কেমনে বারণ করি ॥
তব মনে লজ্জা টুটে
ওঠে অঙ্গে যে ভাষা ফুটে
বসন ভূষণে তাহা ফিরিতেছে সঞ্চারী
পিয়াসী আঁখিরে মম কেমনে বারণ করি ॥
তব অন্তর মধুধারা বাহিরে উছলি যায়
বল সেকি অপরাধ মম
যদি, পরান সে মধু চায়;
জ্বালি হৃদয়ে আশার বাতি
তুমি কেন জাগো সারা রাতি
মন পতঙ্গ মম তাই চাহে পুড়ে মরি ॥

॥ ৬ ॥

আমি অলস উদাস আনমনা
আমি সাঁঝ আকাশে শান্ত নিথর
রঙিন মেঘের আল্‌পনা ॥
অলস যেমন বনের ছায়া
নীড়ের পাখী শ্রান্ত কায়া
যেমন অলস তৃণের মুখে ভোরের শিশির হিমকণা॥
নদীর তীরে অলস রাখাল
একলা বসে রয় যেমন
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণ;
যেমন অলস দীঘির জলে
থির হয়ে রয় কমল দলে
শীতল ঘুমে স্বপন সম অলস আমি কল্পনা ॥

॥ ৭ ॥ *

মুখের কথায় নাই জানালে
জানিয়ো গানের ভাষায়
এসেছিলে মোর কাছে হে পথিক
কিসের আশায় ॥
তোমার মনের কামনারে
রাখলে আড়াল অন্ধকারে

আপনি তুমি করলে হেলা আপন ভালবাসায় ॥
সাধ ছিল যে হাত দিয়ে গো
পরিয়ে দেবে হার
দ্বিধা ভরে সেই হাতে হায়
করলে নমস্কার;
নিশুত রাতে ব'লো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে
কেন এমন গোপন কর বুক ভরা পিপাসায় ॥

॥ ৮ ॥

আমার সুরের ঝর্ণাধারায় করবে তুমি স্নান
ওগো বধু, কণ্ঠে আমার তাই ঝরে এই গান ॥
কেশে তোমার পরবে বালা
তাই গাঁথি এই গানের মালা
তোমার টানে ভাব-যমুনায় বহিছে উজান ॥
আমার সুরের ইন্দ্রাণী গো উঠবে তুমি বলে
নিত্য বাণীর-সিন্ধুতে মোর মন্থন তাই চলে;
সিংহাসনের সুর-সভাতে
বসবে বাণীর মহিমাতে
সৃজন কবি সেই গরবে সুরের পবীস্থান ॥

॥ ৯ ॥

খেল না আর আমায় নিয়ে
প্রিয়, অলস খেলা
নিঠুব খেলা এবার ফুরায়
খেলার বেলা ॥
অন্ধকারের আড়াল হতে
লওহে টানি বাহির পথে
চঞ্চল তার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসাতে ভেলা॥
সবার চেয়ে ভালবাস আঘাত যারে হানো
স্মরণ যাবে করো তারে মরণ টানে টানো;
ঠাঁই যারে দাও চরণতলে
ভোলাও না তায় সুখের ছলে
মালার নামে দাও না গলে তোমাব অবহেলা ॥

॥ ১০ ॥

আশা নিবাশায় দিন কেটে যায়

হে প্রিয় কবে আসিবে
প্রতি নিঃশ্বাসে নয়ন প্রদীপ মোর
আসিছে নিভে।
ফুল ঝরে যায় হায় পুনঃ ফুল ফোটে
কৃষ্ণা তিথির শেষ চাঁদ হেসে ওঠে
আমার নিশীথের অসীম আঁধার
ওগো চাঁদ কবে নাশিবে ॥
শীত যায় মন বলে ফাগুন আসে গো
আসিল না আমার ফাগুন
চাঁদের কিরণে পৃথিবী শীতল হয়
মোর বুকে জ্বলে সে আগুন;
নিশীথে বকুল শাখে
প্রিয় প্রিয়া পাপিয়া ডাকে
আমার প্রিয়তমা 'জাগো প্রিয়া' বলে
কবে ডাকিবে ॥

এবারে যে গানটি এখানে মুদ্রিত হচ্ছে তা প্রখ্যাত শিল্পী জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে গীত। গানটির সঙ্গীত-পরিচালনা করেন কমল দাশগুপ্ত, সুরারোপও করেন কমল দাশগুপ্ত। প্রকাশ কাল ১৯৬৪ সাল। গানটির কথা নিম্নরূপ,

গান

খেলা শেষ হ'ল শেষ হয় নাই বেলা
কাঁদিও না কাঁদিওনা–তব তরে রেখে গেনু
প্রেম আনন্দ মেলা ॥
খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে
খেলা শেষ হলে এসো মোর কাছে
প্রেম-যমুনার তীরে বসে রব
লইয়া শূন্য ভেলা ॥
যাহারা আমার বিচার করেছে ভুল করিয়াছে জানি
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গান খানি;
হই কলঙ্কী হোক মোর ভুল
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে কথা...হানো যত অবহেলা ॥

এই গানটির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি শ্রীকমল দাশগুপ্তের খাতায়। কবির সহস্তে লিখিত গানটি ছিলো নিম্নরূপ,

গান

খেলা শেষ হলো শেষ হয় নাই বেলা
কাঁদিও না, কাঁদিও না –তব তরে রেখে গেনু
প্রেম আনন্দ মেলা ॥

খেলো খেলো তুমি আজও বেলা আছে
খেলা শেষ হলে যেও মোর কাছে
প্রেম-যমুনার তীরে বসে রবো
লইয়া শূন্য ভেলা ॥
যাহারা আমার বিচার করেছে
আর তাহাদের কেহ
দেখিতে পাবে না কলঙ্ক-কালি মাখা
মোর এই দেহ ;
হই কলঙ্কী হোক মোর ভুল
পৃথিবীতে আমি এনেছি গোকুল
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে কথা
হানো যতো অবহেলা ॥

॥ ১২ ॥

লুকায়ে রহিলে চিরদিন শীষমহলের শার্শিতে
তব রূপ শুধু রূপায়িত হলো হেরেমের শার্সিতে ॥
অমৃত অশ্রু মিশা–
পিনুরে চির বন্দিনী চিরযোগিনী জেবুন্নেছা
তোমার দেওয়ানে ওগো শাহজাদী কবি
আঁকিলে যে তব বিরহ বিষাদ ছবি
লাজ পায় তাজমহলও তাহার সকরুণ সঙ্গীতে ॥
কোন্ সে তরুণ কবি তোমারে
তোমার কবিতার চেয়ে সুন্দর দেখেছিল
গোলাপ ফুলের পাঁপড়িতে তব ছবি
প্রেম-চন্দন এঁকেছিল;
প্রিয়ার আদেশে আগুনের দাহ সহি
পুড়িল প্রেমিক একটি কথা না কহি
সেই মৌন প্রেমের মহিমা আজও জাগে
ঝরা গোলাপের সুরভিতে ॥

॥ ১৩ ॥

আনার কলি, আনার কলি, আনার কলি
স্বপ্নে দেখে কোন ডালিম কুমারে
এসেছিল রেবা ঝিলামের পাড়ে
দিতে তব রাঙা হৃদয়ের অঞ্জলি ॥
মরুর মনিকা বাদশাহী নওরোজে
এসেছিল কোন হারানো হিয়ার খোঁজে

তব রূপ হেরি হেরেমের দীপমালা
উঠেছিল চঞ্চলি ॥
পতঙ্গ সম পাঁপড়ির পাখা
মেলি আনার কলি গো
সেলিমের অনুরাগে মোমের প্রদীপে
পড়িলে ঢলি গো;
মিলায়েছে মাটিতে মোঘলের মসনদ
তুমি আজো জ্বলিতেছ ফুলের হাসিতে
বিরহীর বাঁশীতে
তব জীবন্ত সমাধির বিগলিত পাষাণের
আজিও প্রেম-যমুনার ঢেউ উথলি ॥

॥ ১৪ ॥

আমি গত জনমে হে প্রিয়
যত কথা বলেছিনু তব কাছে
ফুল হয়ে সেই কথা আজ পৃথিবীতে ফুটিয়াছে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যত আঁখি মম
নিভিয়া গিয়াছে ওগো প্রিয়তম
তারা হয়ে সেই আঁখিগুলি মোর তব পথ চেয়ে আছে ॥
যত দীপ জ্বেলে নিশি জেগেছিনু
একা বাতায়ন তলে
কমল কুমুদ হয়ে সেই দীপ
ফুটেছে সায়র জলে;
চকোরিণী হয়ে অপূর্ণ সাধ
আজো কেঁদে যায় ওগো মোর চাঁদ
চাতকিনী হয়ে আজো মোর প্রাণ তৃষ্ণার জল যাচে ॥

॥ ১৫ ॥

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ
বাহু-বন্ধনে আছে, মালার কি সাধ।
ফুল আনিওনা ভবনে—কেশের সুবাস তব ঘনাক মনে
হৃদয়ের লাগি' মোর হৃদয় কাঁদে চন্দন লাগে বিস্বাদ ॥
খোল গুণ্ঠন, ফেলে দাও আভরণ
হাতে রাখ হাত, তোল আনত নয়ন;
বাহিরে বহুক বাতাস
বক্ষে লাগুক মোর তব ঘন শ্বাস
চম্পার ডালে বসে মোদের দেখে
কুহু আর পাপিয়া করুক বিবাদ ॥

॥ ১৬ ॥

সাকী বুলবুলি কেন কাঁদে গুল্‌বাগিচায়

ওকি মধু যাচে
কেন আসে না কাছে
সকরুণ পিয়াসে মুখ পানে চায় ॥
ওর করুণ বিলাপ
শুনি লতার বিলাপ
আমি ঝুরিয়া মরি' ও যে সিরাজী মাগে
দিতে ভয় লাগে
তাহা সঞ্চিত থাক অন্তর-পিয়ালায় ॥
কত চামেলি হেনা
ওর আছে জানা
আমি কন্টক বিজড়িত গোলাপ হেনা
মোর ডাক নাম ধরে
কেন ডাক ঘুম-ঘোরে
তবু ক্ষণিকের তরে তৃষিত হিয়ায় ॥

কবি-বিরচিত কিছুসংখ্যক শ্যামা সঙ্গীত, ভজন ও কীর্তন গান শ্রী কমল দাশ গুপ্তের খাতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কথাগুলো অপ্রকাশিত।

॥ ১৭ ॥

ভজন

সখি, এবার রাধার আধার ভাঙিয়া
মিশিব হরির সঙ্গে
সে কেমন লীলা-মাধুরী
আমি ডুবিব রস-শেখর অঙ্গে ॥
ভালো-মন্দ দেখাবো না তার
সাঁতারিব লীলার পাথার
দেখিব সখি—
সে কেমন লীলা-মাধুরী
আমি ডুবিব রস-শেখর অঙ্গে
মিশিব হরির সঙ্গে

॥ ১৮ ॥

সখিরে, আমিতো নিয়েছি বঁধুরে কিনে॥

আমি যে সবার মাঝে

কিনেছি যে ব্রজ-রাজে
তবু, কেন মোরে কহে চোর
কেহ কহে লইয়াছি ছিনে ॥
যাহার যাহা সাধ বলুক না ওরা
কেহ বলে কালো কেহ বলে গোরা
আমিতো লয়েছি সখি আঁখি খুলে চিনে ॥
কেহ নির্গুণ কয়
কেহ কহে গুণময়
আমি জানি প্রেমময় গো—
আমি দিয়েছি তাহারে মোর অঙ্গের ভূষণ
মনি মুকুতার হার মুকুট ও কঙ্কন
পূর্ব জনমের শপথ ছিল তাই
মীরা লয়েছে তার গিরিধারী চিনে ॥

॥ ১৯ ॥

শ্যামা সঙ্গীত

আমার মা যে গোলাপ সুন্দরী
যেন একই বৃন্তে কৃষ্ণ-কলি
অপরাজিতার মঞ্জরী ॥
মা আধেক পুরুষ আধেক কৃষ্ণা নারী
অর্দ্ধ কালী আধেক বংশীধারী
মা অর্দ্ধ অঙ্গে পীতাম্বর আধেক সে দিগম্বরী ॥
সে এক পায়ে প্রেম-কুসুম ফোটায়
নূপুর-পরা সেই চরণ
মার সেই পায়ে রয় স্বর্গবলয়
সে পায়ে প্রলয় মরণ;
মা-র আধ ললাটে অগ্নিতিলক জ্বলে
চন্দ্রলেখা আধেক-ললাট তলে
মা শক্তিতে আর ভক্তিতে রে
আছেন যুগল রূপ ধরি ॥

॥ ২০ ॥

শ্যামা সঙ্গীত

কি নাম ধরে ডাকবো তোরে মা তুই দে বলে
কি নাম ধরে ডাকলে পরে ধরে তুলিস কোলে ॥
বনে খুঁজি মনে খুঁজি
পটে দেখি ঘটে পুজি
মন্দিরে যাই, কেঁদে লুটাই (মাগো)

পাষাণ প্রতিমা মা তোর একটুও না টলে ॥
কোল যদিনা দিবি মাগো আন্‌লি কেন ভবে
আমি জনম নিয়ে এসেছি যে তোর কোলেরই লোভে;
আমি রইতে নারি মা না পেয়ে
মরণ দে মা তাহার চেয়ে
এ ছাড়-জীবন কোন প্রয়োজন মাগো
আমি কোটিবার মা মরতে পারি
মা যদি পাই ম'লে ॥

॥ ২১ ॥

তোমার মদন-মোহন রূপেরই দোষ সুন্দর শ্যাম চাঁদ
মুনির যদি মন টলে নাথ, তাদের নয় সে অপরাধ॥
তোমার রূপমাধুরী দেখি যত
রূপের তৃষ্ণা বাড়ে তত
হায় দু'দিনের জীবন দিয়ে সাধলো বিধি বাদ
কোটি জনম ও-রূপ দেখে মিটবে না সে সাধ ॥
হে অপরূপ চির-মধুর
কি দোষ দেব কুলবধূর
যে দেখেছে ভুবন-মোহন তোমার রূপের ফাঁদ
সাধ করে সে ভুলেছে নাথ কুল-মানের বাঁধ ॥

॥ ২২ ॥

ভজন

আমি গিরিধারী মন্দিরে নাচিব
আমি নাচিব প্রেম যাচিব ॥
নেচে নেচে রস শেখরে মোহিব
মধুর প্রেম তার যাচিব (আমি)
প্রেম-প্রীতির বাঁধিব নূপুর
রূপের বসনে সাজিব (আমি) ॥
মানিব না লোক-লাজ কূলের ভয়
আনন্দ রাসে মাতিব।
শ্যামের বেদীতে বিরাজিব বামে
হরিরে মীরার রঙে রাঙিব (আমি) ॥

॥ ২৩ ॥

ভজন

গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব
সুন্দর সাজে মোরে সাজায়ে দে
লাখো যুগের পর শুভ দিন এলো
মেহেদী রঙে হাত রাঙায়ে দে ॥
চন্দন-টিপ, গলে মালতীর মালা
নয়নে কাজল পরায়ে দে
অধর রাঙায়ে দে তাম্বুল রাগে
চরণে আলতা মাখায়ে দে ॥
প্রেম-নীলা শাড়ী প্রীতির আঙিয়া
অনুরাগ ভূষণে বধূ সাজিয়া
হৃদয়-বাসরে মিলিব দোঁহে
কুসুমেরই সেজ সখি বিছায়ে দে ॥

॥ ২৪ ॥

ওরে তরু তমাল শাখা
আছে, পল্লবে তোর মোর বল্লভ
কৃষ্ণ-কান্তি মাখা ॥
আমি তাইতো তমাল-কুঞ্জে আসি
তাইতো তমাল ভালোবাসি
তোর, পথ-ছায়ায় আছে যে তার
চরণ-চিহ্ন আঁকা (কৃষ্ণ) ॥
তোর চূড়ায় ময়ুর নাচে
যেন, কৃষ্ণ-ময়ুর পাখা
তাই দেখে পরাণ বাঁচে
কৃষ্ণহারা পরাণ আমার বাঁচে॥
তোর শাখাতে স্বর্ণ-লতা দোলে
আমি ভাবি শ্যামের পীত-বসন বলে
মোর, অঙ্গ যেন থাকেরে তোর
কালো ছায়ায় ঢাকা
তোর ছায়া নয়রে শ্যামের ছোঁওয়া
যেন শ্যামের শীতল ছোঁওয়া ॥

॥ ২৫ ॥

ওযে রাঙা জবার বায়না ধরে
আমার কালো মেয়ে কাঁদে

ও সে তারার মালা ছড়িয়ে ফেলে
এলোকেশ নাহি বাঁধে ॥
পলাশ অশোক কৃষ্ণচূড়ায়
রাগ করে সে পায়ে পায়ে গুঁড়ায়
সে কাঁদে দু'হাত দিয়ে ঢাকি
যুগল-আঁখি সূর্য-চাঁদে ॥
অনুরাগের রাঙা জবা
ফোটে না মোর মনের বনে
মেয়ের আমার রাগ ভাঙাতে
ফিরি জবার অন্বেষণে;
মা'র রাঙা চরণ দেখ্‌তে পেয়ে
বলি এই যে জবা, কালো মেয়ে
সে, জবা ভেবে রাঙা পায়ে
উঠলো নেচে মধুর ছাঁদে ॥

॥ ২৬ ॥

মোর দুলালী নৃত্য কালী নিত্য নাচে হেলে-দুলে
তার, রূপের ছটায় নাচের ঘটায় শম্ভু লুটায় চরণ-মূলে ॥
সেই নাচেরই ছন্দধারা
চন্দ্র, রবি-গ্রহ, তারা
সেই নাচনের ঢেউ খেলে যায় স্নিগ্ধ-জলে পত্র ফুলে ॥
সে মুখ ফিরায়ে নাচে যখন
ধরায় দিবা হয়রে তখন
এ বিশ্ব হয় তিমির-বরণ মুক্তকেশীর এলোচুলে ॥
শক্তি যথায়, যথায় গতি
মা, সেথাই নাচে মূর্তিমতি
মা কবে, দেখব সে নাচ অগ্নিশিখায়
আমার শবে চিতার কূলে ॥

॥ ২৭ ॥

বর্ষা গেল আশ্বিন এলো উমা এলো কই?
শূন্য ঘরে কেমন করে পরান ধরে রই॥
ও গিরিরাজ সবার মেয়ে
মায়ের কোলে এলো ধেয়ে
আমারই ঘর রইল আঁধার আমি কি মা নই ॥
নাই শ্বাশুড়ী ননদ উমার
কেহ আদর করার নাই

মা, অনাদরে কালী সেজে
বেড়ায় নাকি তাই;
মোর গৌরী বড় অভিমানী
সে বুঝবে না মার প্রাণ-পোড়ানী
আন্‌তে তারে সাধ্‌তে হবে ওর যে স্বভাব ওই ॥

॥ ২৮ ॥

মাগো ভুল করেছি চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে
সে এবার এলে শক্ত করে উদুখলে
সেই খল্‌-কপটে বাঁধিস্‌ উদুখলে ॥
মা জানতো কে যে এমনি ভাবে
সে ছাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে
মা, ভুল্‌বো না আর সেই মায়াবীর কাজল চোখের জলে ॥
প্রেম-প্রীতি ডোর বাহুর বাঁধন করুণ চোখের জল
আনবো মাগো বাঁধতে তারে আছে যার যাহা স'ল;
তারে নীল-যমুনা বন-উপবন
সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখ্‌বো কেমন করে তখন পালায় সে কোন্‌ ছলে ॥

॥ ২৯ ॥

ব্রজে আবার আস্‌বে ফিরে আমার ননীচোরা
কাঁদিসনে গো তোরা
স্বভাব যে ওর লুকিয়ে থেকে কাঁদিয়ে পাগল করা
কাঁদিস নে গো তোরা ॥
আমি যে তার মা যশোদা
সে আমারেই কাঁদায় সদা
আমি যেই কাঁদি, সে যায় যে ভুলে বনে বনে ঘোরা ॥
মথুরাতে আমার গোপাল রাজা হলো নাকি
যেখানে যায় হয় সে রাজা ভুল দেখেনি আঁখি;
সে রাজা যদি হয়েই থাকে
তাই বলে কি ভুলবে মাকে
আমি হবো রাজ-মাতা তাই ওর রাজবেশ পরা॥

॥ ৩০ ॥

তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা বুঝতিস তোর মায়ের ব্যথা
যেমন বাবা তেমনি মেয়ে এতটুকু নাই মমতা॥
ওমা, কেউ আছে কি ত্রিসংসারে
এই চাঁদ মুখ ভুলতে পারে

মোর ঘর-বিবাগী জামাই গাহেন পঞ্চমুখে তোরই কথা ॥
ওমা দিনগুণে আর পথ চেয়ে মোর
যে অনলে পরাণ জ্বলে
তুই যদি তা জানতিস উমা তোর পাষাণ হিয়াও যেত গলে;
তোর আগমনীর বাঁশী বাজে
নিশিদিন এ বুকের মাঝে
আমি কেঁদে কেঁদে শুধাই যবে আস্‌বে কবে সেই বারতা ॥

॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্ রসনা রাধা রাধা বল্
রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ বল্ ॥
যোগে খোঁজেন শিব কৃষ্ণ গোবিন্দে
ব্রহ্মা পূজেন রাধা চরণারবিন্দে
অধরা যুগল-চাঁদে ধরিল প্রেমের ফাঁদে
গোপ গোপী দল ॥
মোর শ্রীকৃষ্ণে থাকে যে অটল মতি
সেই মতি দেন মোর শ্রীরাধা শ্রীমতী;
মন বৃন্দাবনে ফোটে কৃষ্ণ নামের ফুল
ঝরায়ে সে ফুল রাই দেন সবে প্রেমফল;
রাধা কৃষ্ণ বল ওরে নর-নারী
সংসার বনে তোরা যেন শুকসারী
তার, প্রাণে নিত্য রাস-রসের উল্লাস
যাহার হৃদয়ে দোলে মুরতি যুগল॥

॥ ৩২ ॥

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ওরে এখন খোল আঁখি
তুই সোনার খনির কাছে এসে ফিরলি ধূলা মাখি॥
এ সংসারের সার ছেড়ে তুই
সং সেজে হায় বেড়াস নিতুই
যে তোরে ধন-রত্ন দিল তারেই দিলি ফাঁকি॥
ভুলে রইলি যাদের নিয়ে তাদের পেলি কোথা হতে
তোর যাবার বেলায় কেউ কি সাথী হবেরে তোর পথে
এখনো তুই ডাক একবার
নাইরে সীমা তাহার দয়ার
সে করবে ক্ষমা ঘুম পাড়াবে শীতল বুকে রাখি॥

॥ ৩৩ ॥

তোমার লীলা-রসে হে কৃষ্ণ গোপাল
ডুবিয়ে রাখ মোরে
তোমার আনন্দ ব্রজে হে নন্দ দুলাল

রাখিও সাথী করে ॥
যে গোঠে চরাও ধেণু কিশোর-রাখাল
সেথা রাখাল বালক যেন হই চিরকাল
যে ফুলের গেঁথে মালা পরায় ব্রজের বালা
যেন লুকিয়ে থাকি সেই ফুলের ডোরে ॥
যে যমুনা জলে যে কদমতলে তুমি বিরহ প্রিয়
যেথা, রাধার সনে রহ্ নিরজনে সেথা মোরে ডাকিও;
লাখো জনম লয়ে লাখো যুগে আসিব
তব নিত্য রস-লীলা রসে ভাসিব
মোক্ষ মুক্তি চাহিনা জীবন-স্বামী হেরিব তোমারে শুধু নয়ন ভরে ॥

॥ ৩৪ ॥

তোরা দেখে যা আমার কানাই সেজেছে নবীন নাটুয়া সাজে
তালে তালে রুমুঝুমু রুমুঝুমু চরণে নূপুর বাজে॥
ত্রিভঙ্গ হয়ে নাচে হেলে-দুলে
টলে শিখি-পাখা চূড়া পরে টলে
হেসে পড়ে ঢলে গোপীদের কোলে
অপরূপ এই রসরাজে দেখে গলে যায় চাঁদ লাজে ॥
রসের অমিয়া সাগর মথিয়া
মেঘ গলাইয়া আকাশ ছানিয়া,
কে গড়িল কৃষ্ণ-চাঁদে
সে যখন নাচে চরণের কাছে ত্রিভুবন-বাসী কাঁদে
এ কোন অপরূপ রূপাধার এলো আমার আঙ্গিনা মাঝে ॥

শ্রী কমল দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমায় একদিন বলেছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের একটি ছোট্ট কবিতা ঃ 'অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা' তাঁর হাতে আসে সুর করার জন্য। কবি নাকি এটি রচনা করেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-শিয়রে বসে। কবি প্রত্যক্ষ করেন কেমন করে মৃত্যু তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে ধীরে ধীরে শান্ত পাথর করে দিল। যখন স্ত্রীর মুখ-মণ্ডল মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর স্ত্রী তার চাবির ছড়াটা স্বামীর হাতে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। কবি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই ব্যক্ত করেছেন গুটিকতক কথায় অনবদ্য একটি ছোট্ট কবিতায়। শ্রী কমল দাশগুপ্ত এই কবিতাটিকে একটি অসাধারণ গানে পরিণত করেন এক অপরূপ সুরারোপে।

গানখানা যখন রেকর্ড করার কথা ওঠে তখন তিনি এর জুড়ি গান মনের মতো না পাওয়ায় কবি নজরুলের শরণাপন্ন হয়ে সব কথা খুলে বলেন ও গানটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর একটি গানের জন্য অনুরোধ জানান। কবি নজরুল যখন জানতে পারলেন গানটি তার বাল্যশিক্ষকের রচনা তখন তিনি মল্লিক মহাশয়কে একটি পত্রে

অনুরোধ জানান এই গানটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর একটি গান রচনা করে পাঠাবার জন্য। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও তার কোন জবাব মিলল না। মল্লিক মহাশয়ের অর্থের ও যশের মোহ কোনদিনই ছিলনা, হয়তো বা তাই নজরুলের অনুরোধেও তিনি কোন সাড়া দেননি। শেষে কবি নজরুল নিজেই একটি গান রচনা করে দিলে কমল দাশগুপ্ত গানটিতে সুরারোপ করেন। গানটির প্রথম ক'টি কথা,

সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়
তুমি ফিরিলেনা ঘরে

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা' ও কবি নজরুলের 'সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়' –এই দু'টি গান প্রখ্যাত শিল্পী ইন্দুবালার কণ্ঠে রেকর্ডে বাণীবদ্ধ হয়। এইচ. এম. ভি রেকর্ড নং এন ১৭৪৪৫ প্রকাশকাল ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস। বাংলা সংস্কৃতির দুই দিকপাল কবি নজরুল ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত দু'টি গানে অনবদ্য সুরারোপের দাবীদার শ্রী কমল দাশগুপ্ত। গান দু'টি সুরে ও কথায় আজো বাংলা গানের ইতিহাসে অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

কমল দাশগুপ্ত আপন প্রতিভাবলে কবি নজরুলের বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন। কবি তার বিশেষ রচনাগুলো তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। কবির লেখা প্রায় দু'শো গানে সুরারোপ করার দুর্লভ কৃতিত্ব শ্রী কমল দাশগুপ্তের। প্রেম-সঙ্গীত, ঋতু-সঙ্গীত, ইসলামী ভজন, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী ইত্যাদি কবির নানা ধরনের গানের সার্থক সুরশিল্পী তিনি। আজো অবাক হতে হয় তিরিশ কিংবা চল্লিশ দশকের সেই গানগুলো শুনলে মন কেড়ে নেয় কথা ও সুরের সম্মোহনী-শক্তি। চিরাচরিত ইসলামী গানের সুরারোপেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। আব্বাসউদ্দীন আহমদ গী'ত

ক. মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে

খ. এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি

মোহাম্মদ কাসেম গী'ত

গ. সুদূর মক্কা মদিনার পথে
আমি রাহি মুসাফির

শ্রী কমল দাশগুপ্ত বাংলাদেশের যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ ২৮শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তারাপদ দাশগুপ্ত পেশাগতভাবে ব্যবসাজীবী হলেও, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। তারা বেশ কিছুদিন কুমিল্লা শহরে বসবাস করেন। কমল দাশগুপ্ত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি. কম পাশ করেন। পরে তারা স্থায়ীভাবে কলকাতায় ব্যবসা স্থানান্তরিত করে ওখানেই বসবাস করতে থাকেন।

তাঁরা ছিলেন তিন ভাই তিন বোন। এঁরা প্রত্যেকেই সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন। সব চাইতে আনন্দের বিষয় এই যে তারা সবাই কবি নজরুলের গান গেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বড় ভাই প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত ছিলেন নামকরা কৌতুক গায়ক ও ভারতবিখ্যাত যাদুকর। যাদুবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতার জন্য তিনি 'প্রফেসর' উপাধি লাভ করেন। এ কারণেই তিনি প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত হিসেবে পরিচিত। তিনি কবি নজরুলের বেশ কিছু গান এইচ. এম. ভি তে রেকর্ড করেন। আমি যখন এ পরিবারের সান্নিধ্য লাভ করি তখন এই খ্যাতিমান শিল্পী পরলোকে। ফলে তাঁর সম্পর্কে বেশী কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমার সংগ্রহে তাঁর গাওয়া গানের মধ্যে কবি নজরুলের রচনা ঃ

১. বিয়ের আগে / বিয়ের পরে } এন ৭২৭৫ প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত

২. পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার ১ম ও ২য় খণ্ড } এন ৭১৮০ ১২/১৯৩৩ প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত

৩. বদনা গাড়ুতে / টিকি আর টুপিতে } এন ৭৪২২ প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত

৪. আমার সাম্পান যাত্রী না লয় এন ৩৮৪৪ প্রফেসর বিমল দাসগুপ্ত

মেঝ ভাই—কমল দাশগুপ্ত নিজে। ছোটভাই শ্রী সুবল দাশগুপ্ত আধুনিক বাংলা গানের অমর সুরস্রষ্টাদের অন্যতম। তিনি কবি নজরুলের বেশ কিছু গানের সুর যোজনা করেন ও বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ড করান। 'গুপ্ত ব্রাদার্স' নামে যে রেকর্ডগুলো তখন বাজারে পাওয়া যেত সেগুলো শ্রী কমল ও শ্রী সুবল দাশগুপ্তের গাওয়া। নিচে সুবল দাশগুপ্তের সুরারোপিত কবি নজরুলের কিছু গান যা তিনি বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা রেকর্ড করিয়েছিলেন,

১. অনাদরে স্বামী আছি পরে / প্রভু তোমারে খুঁজিয়া মরি } এফটি ১২০৯৭ মোহনলাল সুকুল

২. অনাদিকাল হতে অনন্তলোক / ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান } এফটি ১২১৯৬ ১২/১৯৩৭ সাদালোক সংঘ

৩.	আজি আর কোরায়াসী যেওনা যেওনা মদিনা দুলাল	এফটি ৪৮৮৪ ৫/১৯৩৪ আব্দুল লতিফ ও তার দল
৪.	রাঙা পিরহান প'রে হে মদিনার বুলবুলি	এফটি ১২০৪৬ আব্দুল লতিফ
৫.	আমার প্রিয় হজরত ত্রাণ করো মওলা	এফটি ১২১০০ ৯/১৯৩৭ আব্বাসউদ্দিন আহমেদ
৬.	মনে রাখার দিন গিয়াছে বিরহের অশ্রু সায়রে	এফটি ৪৯২২ ভক্তি আর রায়
৭.	আজি পিয়াল ডালে আবার শ্রাবণ এল ফিরে	এফটি ১২৪৯৫ ৮/১৯৩৮ বিভা দত্ত ও ভক্তি আর রায়
৮.	মা তোমার অন্ধ ছেলে ওমা ত্রিনয়না	এফটি ১২৪৮৮ ৮/১৯৩৮
৯.	মধুর আরতি তব	এফটি ১২/১৯৩৮

চার নম্বরের প্রথম গান অর্থাৎ 'রাঙা পিরহান পরে শিশু নবী খেলেন পথে' সুবল দাশগুপ্ত বিহার প্রদেশের বিখ্যাত দেহাতী গান 'ছোটাসা বালমা মেরা আঙিনামে গুঁলিয়া খেঁলে' সুরের অনুকরণে সুরারোপ করেন।

শিল্পী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। বলাবাহুল্য এঁদের পরিবারের সাথে আমার পরিচয় তাঁর মৃত্যুর পর।

বোনদের মধ্যে বড় ইন্দিরা সেন, তিনিও কবির চারখানা গান রেকর্ড করেন এইচ. এম. ভি তে। গানগুলি যথাক্রমে.

১. মোর গানের প্রদীপ জ্বেলে
২. মোর দেহ মন দেউল তলে
৩. যে গান ফোটে আপন মনে

} FT. / 12/1938

শ্রীমতি ইন্দিরাও গত হয়েছেন। এঁরে সাথে আমার পরিচয় এবং এঁর সান্নিধ্যের সুবাদে এ পরিবারের নানা বিষয় জানবার সুযোগ হয়েছিল। আনুমানিক ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে রক্তচাপে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেঝবোন শ্রীমতি সুধীরা সেনগুপ্তা তখনকার প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের অন্যতম। তিনিও কবির কিছু গান রেকর্ড করেন। আমার সংগৃহীত কয়েকটি গান.

১. এলো ফুলের মরশুম }

২. কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা
ফুলের মত ফুল্ল মুখে } এন এফটি ৩৪৩৭

৩. মাধব গোবিন্দ
গিরিধারী গোপাল } এন ১৭০৩৭ সুধীরা এণ্ড ব্রাদার্স

৪. প্রেম নূপুর বাঁধি
সুন্দর নন্দ দুলাল } এন ২৭৪৩৯

৫. এল জীবন দেবতা

৬. মা এসেছে মা এসেছে
দশ হাতে ঐ দশ দিকে মা } এন ৭২৭৩ ৯/১৯৩৪ বাংলার ছেলেমেয়ে সুর কেডিসি

৭. আয় অশুচ আয়রে পতিত
প্রণমমী শ্রী দূর্গে } এন ৯৯৪৬ বাংলার ছেলেমেয়ে

শেষের গান চারখানা সুর করেন শ্রী কমল দাশগুপ্ত, কিন্তু কণ্ঠ দান করেন শ্রীকমল, শ্রী সুবল ও শ্রীমতি সুধীরা। শ্রীমতি সুধীরাও গত। এঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। সঙ্গীতে দক্ষতা থাকলেও তাঁর সংসারকেই বেশী ভালোবাসতেন, তাই তিনি গানের এই ভুবন থেকে কিছুটা দূরে সরে ছিলেন।

একটা ছোট্ট ঘটনার অবতারণা করা প্রয়োজন মনে করি। শ্রী কমল দাশগুপ্ত তিরিশের দশকের প্রথম দিকে যখন সুর যোজনা শুরু করেন তখন বাংলা গানের বহু

রেকর্ডে লেখা থাকতো 'নৃত্য সম্বলিত' অর্থাৎ তাল প্রধান- নাচ প্রধানও বলা যায়। যেমন খুব চালু ধরণের নূপুর সহযোগে চটুল বাজনা দিয়ে রেকর্ড শুরু হতো যাতে অঙ্গ দোলে, তারপর দু' লাইন গান, গান শেষ হতেই পুনরায় সেই বাদ্য তারপর গান ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যেত গানের সুরের সাথে বাজনার কোন মিল নেই হয়তোবা দরকারও নেই– তবু রাখতে হবে কারণ তা না হলে রেকর্ড বিক্রি হবে না। এই ছিল রেকর্ড ব্যবসায়ীদের ধারণা।

কমল দাশগুপ্ত এই ধারণাকে বদলাবার প্রয়াস নিলেন। বন্ধু প্রণব রায়কে দিয়ে গান লেখালেন নতুন ধাঁচে এবং গান দু' খানা শিল্পী যুঁথিকা রায়কে এইচ.এম. ভিতে রেকর্ড করালেন। শিল্পী নতুন, সুরকার নতুন, গীতিকার নতুন, গানের সুরও নতুন। অনেক চিন্তাভাবনার পর রেকর্ডটি যখন বাজারে ছাড়া হলো দেখা গেল গান দুটি বাজারে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। গান দু'টির প্রথম কথা,

১. আমি ভোরের যুঁথিকা

২. সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে

শ্রীমতি যুঁথিকা রায় ও শ্রী কমল দাশগুপ্তের রেকর্ড জগতে আগমন এই দুটি গান দিয়ে। তারপর থেকে প্রায় প্রতিটি রেকর্ডেই একপিঠে কবি নজরুল রচিত একটি করে গান ব্যবহার করেছেন তিনি। রেকর্ডে শ্রীমতি যুঁথিকা রায়ের গাওয়া কবি নজরুলের প্রতিটি গান আজো সঙ্গীতপিপাসুদের মনে অম্লান হয়ে আছে।

১৯৪৩ -এর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী কমল দাশগুপ্তকে Doctorate of music প্রদান করে মীরার ভজনে সুরারোপের জন্য। ১৯৪৪-এ মহাত্মা গান্ধী যে শ্রীমতি যুঁথিকা রায়কে 'মীরাবাঈ' আখ্যা দেন তাঁর মীরার ভজন গান শুনে, সেগুলো সবই কমল দাশগুপ্ত সুরারোপিত। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর গোল্ডেন জুবিলীর বিশেষ গানের সুরারোপ করার জন্য তাঁকেই দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরে এটা রেকর্ড হিসেবে নিজামের প্রাসাদে রাখা হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর 'রণ-সঙ্গীত' 'কদম কদম বারহায়ে যা' গানটির সুরকার শ্রী কমল দাশগুপ্ত। জানা যায়, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রী কমল দাশগুপ্তের সিলভার জুবিলী পালন করে এইচ.এম.ভি। কারণ তখন তাঁর সুরারোপিত গানের সংখ্যা ছিল সাত হাজারের উপর। প্রতিমাসে গড়ে ৪৫ টা গান সুর করে শিল্পীকে শিখিয়ে রেকর্ড করে দেবার অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার কমল দাশগুপ্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তিনিই একমাত্র সুরকার যিনি American Film Director, Mr. Alice Deencon যার ভারতে নির্মীয়মাণ War Propaganda Picture এর Background Music করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বেশ কিছু ভারতীয় ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন যথাঃ ১. পণ্ডিত মশাই ২. গড়মিল ৩. শেষ উত্তর ৪.

জবাব ৫. যোগাযোগ ৬. হসপিটাল ৭. চন্দ্রশেখর ৮. নববিধান ৯. ভাবীকাল ১০. শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য ১১. বিদেশিনী ১২. প্রার্থনা ১৩. মন্দির ১৪. বঞ্চিতা ১৫. রাঙ্গামাটি ১৬. গিরিবালা ১৭. মেঘদূত ১৮. মধুমালতী ১৯. গোবিন্দদাস ২০. বধূবরণ ২১. প্যাহেচান ২২. ইবান কি একরাত ২৩. এ্যারাবিয়ান নাইটস ২৪. কৃষ্ণলীলা ও বাংলাদেশে 'কেন এমন হয়' (অসমাপ্ত)। চলচ্চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে চারবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। ছবিগুলির নাম,

১. শেষ উত্তর

২. যোগাযোগ

৩. চন্দ্রশেখর

৪. শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

এক সময় 'চাঁদ ও সুরুজ কাওয়াল' কলকাতায় ও রেকর্ডে কাওয়ালী গেয়ে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তাঁরা আর কেউ নন, শ্রীকমল ও শ্রী সুবল দাশগুপ্ত দুই ভাই। নামকরণ কবি নজরুল ও ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেব করেন। ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পরিবার দুই ভাইকে তাঁদের পুত্রের মতন স্নেহ করতেন। জানা যায়, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সারা দেশে যখন চরম দুর্ভিক্ষের হাহাকার শ্রী কমল দাশগুপ্ত তখন দৈনিক নিজ খরচে এক শতাধিক লোক খাওয়াতেন এবং তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজে দেখাশুনা করতেন। এখানে বলা দরকার মনে করি এই বুভুক্ষাকে কেন্দ্র করে তিনি সঙ্গীতও রচনা করেন। সমসাময়িক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সে এক অসাধারণ সৃষ্টি। গানটি একটি হিন্দী দ্বৈত-সঙ্গীত। কমল দাশগুপ্ত ও শ্রীমতি যুঁথিকার দ্বৈতকণ্ঠে গীত। গানটির কথা হলো,

কুসু আঁসু আর কুসু হাসিছে হ্যায়

এ দুনিয়া ব্যানি হ্যামারী–

গানটি শুরু হয় চমকপ্রদ অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে কাহারবা তালে। প্রথম লাইনটা দুই বার কাহারবা তালে গাইবার পর যখন গানটা অন্তরাতে প্রবেশ করে তখন তাল বদল হয়ে শুরু হয় দ্রুত দাদরাতে। অন্তরার প্রথম লাইনটা গায় পুরুষকণ্ঠ একবার, তারপর পুরুষকণ্ঠ যখন ঐ লাইনটা পুনরায় ঐ একই সুরে ও তালে গাইতে থাকে তখন নারীকণ্ঠ অন্তরার দ্বিতীয় লাইনটা শুরু করে ঢিমা দাদরায় পৃথক সুরে। একই সাথে দুটো লাইন দুটো কণ্ঠে শুরু হচ্ছে একসাথে আবার শেষও হচ্ছে একসাথে। এমন সুন্দর ভারসাম্য করা হয়েছে যে গানের বাণী ভিন্ন হলেও কথাগুলো সবই বোঝা যাচ্ছে। তিনটি অন্তরাই এমনিভাবে শেষ করা হয়েছে। সুরকারের সুরের এমনি কৌশল ও তালের এমনই হিসাব যা ভাবলে অবাক হতে হয়। কিভাবে ও কি কৌশলে এ

কাজটা সৃজনশীল সুরকার সম্ভব করেছিলেন তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। সাধারণভাবে হিসাব করলে দেখা যায়,

৮×৩ = ২৪(কাহারবা)

৮×৪ = ২৪(দাদরা)

দাদরা ও কাহারবা তাল এক সাথে শুরু হলে কোন না কোন জায়গায় সোম পাওয়া যাবেই।

কমল দাশগুপ্তের মাতৃভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। মাকে কথা দিয়েছিলেন সব ভাইবোনদের সম্পূর্ণ ভার তিনিই বহন করবেন। বাবা ও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারের ভরণপোষণ তিনি একাই করতেন। বোনদের বিবাহ-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বও। ছোটভাই শ্রী সুবল দাশগুপ্তেরও। যখন নিজের সংসারের কথা উঠলো তখন প্রথমে মা পরে ছোটভাই হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। এই একই সময় একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজে হাত দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। নানা দিক থেকে ব্যর্থতা -বঞ্চনা তাকে বেড়াজালের মতো আঁকড়ে ধরতে লাগলো। ক্রমশঃ এই করিৎকর্মা শিল্পী বহুলাংশে তাঁর কর্মশক্তি ও সৃজনীউদ্যোগ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। কারো সাথে দেখা করতেন না, সারাদিন ঘরের কোণে বসে বইপত্র নিয়ে দিন কাটাতেন, গণসমাবেশ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতেন। এমনিভাবে তার কেটে যায় প্রায় এক যুগ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ফিরোজা বেগম তখন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাতে। কলকাতা থাকাকালীন তিনি বেশ কিছু দিন কমল দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে গান শেখার সুযোগ লাভ করেন। সেই সুবাদে গভীর হৃদ্যতার সূত্রপাত ঘটে। কমল দাশগুপ্তের জীবনের চরম দুঃসময়ে তার করণীয় কি, ভেবে কুল পাননি। শিল্পী মনে-প্রাণে শ্রী কমল দাশগুপ্তকে ভালোবাসতেন। ইতিমধ্যে তিনি কলকাতায় গিয়ে বারকয়েক শ্রী কমল দাশগুপ্তের সাথে দেখা করেন। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বিত শিল্পী তখন অনিশ্চয়তা ও অভিমানের আগুনে জ্বলছেন। শেষ পর্যন্ত ফিরোজা নিজেই ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতা যাবার পর ১৯৫৫ সালে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তাঁরা প্রথম ঘর বাঁধেন কলকাতার পার্ক সার্কাসে। দুজনে চেষ্টা করেন বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু কোন না কোন কারণে তাঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ফলে চরম দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে তাঁরা কাল কাটাতে থাকেন।

অবশেষে ১৯৬৭ সালে তাঁরা কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা চলে আসেন। এই সময়ে তাঁদের তিনটি সন্তান সম্ভবত ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন।

নানা কারণে তৎকালীন পরিবেশে এখানকার সঙ্গীতের জগতে কমল দাশগুপ্তের কোন স্থান হয়নি। তদানীন্তন পাক সরকারও তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সব দিক থেকে পর্যুদস্ত এই কীর্তিমান, দরদী শিল্পীকে দেখা গেছে ঢাকার রাস্তার ধারে দরিদ্র দোকানীর বেশে! জীবনের শেষপ্রান্তে এসে, পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে— দুই খানেই তিনি ছিলেন উপেক্ষিত।

মৃত্যুর মাত্র কিছু দিন আগে তিনি কাজ শুরু করেন রেডিও বাংলাদেশ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে। মাত্র কয়েকটি স্টুডিও রেকর্ডে কিছু গানের যন্ত্র-সঙ্গীত ও বাংলা কাওয়ালী গানের রেকর্ড করবার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও হাসপাতালে অব্যবস্থার মাঝে মৃত্যুবরণ করেন।

শিল্পী কমল দাশগুপ্তের জীবনের শেষ কয়টি বছর ঢাকায় কেটেছে। কিন্তু তৎকালীন সরকারী কিংবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান কি এই যুগান্তকারী সুরস্রষ্টাকে তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে পেরেছেন ?

এই প্রতিভাধর সঙ্গীতকার যিনি বাংলা গানের জগতে একটি ইতিহাস, তিনি আমাদের বাংলা দেশেরই সন্তান। জন্ম-মৃত্যু তাঁর এ দেশের মাটিতে। ১৯৭৫ সালের ২০শে জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন।

আমি আশা করবো, যিনি আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের সব চাইতে বেশী সংখ্যক ও সুন্দর গানের সার্থক সুর স্রষ্টা তাঁর প্রতিভার সঠিক মুল্যায়ন হোক।

১. কবি নজরুলের কীর্তির সাথে তিনিও স্মরণীয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। জনাব আসাদুল হকের বর্তমান নিবন্ধটি রচিত হয় পঞ্চাশ–ষাটের দশকে। সে- সময়ে উল্লিখিত গান অপ্রকাশিত ছিল।
২. কাজী নজরুল ইসলাম এই গানটি রেকর্ড করার আগে অনেক পরিমার্জন ও সংস্কার করেছেন। গানটির একাধিক পাণ্ডুলিপিই পাওয়া গেছে।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংকলন]

নজরুল-স্মৃতি

ডঃ অশোক বাগচী

আজকে আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে স্মৃতির অতল তল থেকে তথ্য আহরণ করে নিয়ে আসাই হবে প্রাসঙ্গিক। তিনি এমনই একটি বিস্ময়কর পুরুষ ছিলেন, যাঁর কথা মনে আসলেই সেটা সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়।

তাঁর নাম আমি প্রথম শুনেছি বোধ হয় পাঁচ বছর বয়সে, সে-সময় পাবনা টাউন হলের সামনে খুব সভা-সমিতি হত, আমাদের পরাধীন দেশটাকে স্বাধীন করবার প্রচেষ্টায়। আমার ছোটকাকা, সেজকাকা রোজ সেখানে বক্তৃতা শুনতে যেতেন, আর ঠাকুমা তাদের ভয় দেখাতেন, 'ওখানে যাসনি বাবা, পুলিশে ধরবে!'

আমি একবার বাড়ীর কারো একজনের হাত ধরে টাউন হলের কাছে গিয়েছিলাম, শুনেছিলাম সবাই জোরে জোরে গাইছে 'গাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা?' আমি জানতাম না ওই গানটা কার, কিন্তু আমার শুনতে খুব ভাল লেগেছিল, তাই বাড়ী ফিরে আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা! গাজনের বাজনা বাজা' গানটা কি চৈত্রসংক্রান্তি দিনের গাজনের গান? সেদিন ত' পাট-ঠাকুরের পূজা হয়, কিন্তু কই সেখানে ত' পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে না? তবে আজকের গানের সময় লাল পাগড়ি ওয়ালা পুলিশ কেন দাঁড়িয়ে ছিল? আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মাকে বিপর্যস্ত করে ফেললাম। মা বললেন, 'ওই গানটা কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। তোমার বাবা, 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে' যে গানটা গান সেটা তাঁরই লেখা।'

আরেক দিন বিকালে আমি বাড়ীতে খেলা করছি, দূর থেকে গোলমালের শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ দেখি ছোটকাকা মাথায় কোঁচার খুঁটি ধরে দৌড়ে আসছে, মাথা থেকে রক্ত পড়ছে, পুলিশ লাঠি মেরেছে তাঁকে।

বড় হতে হতে শেষে বুঝলাম যে, ওই গানটা 'কারার ওই লৌহ কপাট'— নামক বিখ্যাত গানের অংশ বিশেষ। ধীরে ধীরে যতই বড় হয়েছি, কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য কবিতা পড়েছি ও বাবার কাছে তাঁর লেখা গান শিখছি। আরও বড় হতে হতে 'ভারতবর্ষ'– নামক একটা কাগজে পড়লাম যে, কাজী নজরুল ইসলাম একবার সৈন্য হয়ে করাচীতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, আমার ঠাকুরদাদাও সৈন্যদের ডাক্তার হয়ে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়েছিলেন। অবিরাম পড়ার ভেতর দিয়েই কাজী

নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল এবং ব্যক্তিত্বটিকে চাক্ষুস দেখবার জন্য মনে ঔৎসুক্য ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

আমার মেসোমশায়ের বড় ভাইয়ের নাম ছিল তুলসী লাহিড়ী। তিনি ছিলেন একাধারে এক নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার এবং সুরকার। একবার আমাদের বউবাজারের বাসায় এসে তিনি বললেন, 'চল্, তোকে কলের গানের রেকর্ড তৈরীর কারখানা দেখিয়ে আনি'। উনি আমাকে সঙ্গে করে শ্যামবাজারের নলিনী সরকার স্ট্রীটে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি, একটা ঘরের ফরাসের উপরে সাদা ধুতি ও গেরুয়া পাঞ্জাবী পরা একজন ভদ্রলোক, একটা তারের বাদ্যযন্ত্র বাঁ হাতে নিয়ে টুং টাং করে বাজাচ্ছেন এবং আর এক হাতে কাগজের উপর কি সব লিখছেন। ওঁর সামনে একটি রোগা মেয়ে বসেছিলেন, উনি মেয়েটিকে বললেন, 'আয় মা, গানটা করত।' মেয়েটি ভারি সুন্দরভাবে গানটা গাইতে লাগলেন। যিনি গানটা শেখাচ্ছিলেন, তিনি আমার ইন্সিত বিশ্ববিশ্রুত কাজী নজরুল ইসলাম। শোনা যায় ঐ একখানি গানের রেকর্ড করেই সেই মেয়েটি সারা বাংলাদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

মাঝে মাঝে আমি যখন ছুটিতে কলকাতায় মামার বাড়ীতে বেড়াতে আসতাম, তখন একবার শুনেছিলাম যে, মামাদের ঐ বাসাবাড়ীটার কাছে বৈঠকখানা বাজারের ধারে-পাশে কবি থাকতেন। একবার আমাদের পাবনার সতীন্দ্রমোহন সান্যাল বা সতুদা আমাকে এক সকালে ওঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তখন বেলা দশটা। দেখি যে, একটা চৌকির উপর কবি বসে আছেন হাতে একটি হারমোনিয়াম নিয়ে। আশে পাশে আরও অনেক ভদ্রলোক উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন ওঁর গান শোনবার জন্য। তিনি গান ধরলেন, উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠ আর গানের ভাষা অনবদ্য! ঠিক কোন গানটা গেয়েছিলেন আমার মনে নেই, তবে অনেক কষ্টে শিষ্টে হঠাৎ মনে পড়ল, যেন সেই গানটা ছিল, 'বৌ কথা কও, কও কথা কও-কও কথা অভিমানি...!'

আরও বড় হতে লাগলাম। মাত্র এক বছরের জন্য কলকাতার আশুতোষ কলেজে পড়তে এসেছিলাম। তখন এক সহপাঠী বলল, 'নবযুগ কাগজের অফিসে চল, ওখানে একটা বিজ্ঞাপন দেব।'

ভবানীপুর থেকে বাসে করে যখন সেখানে পৌছলাম দেখি যে, একটা ভাঙ্গা-চোরা দোতলা বাড়ীর গায়ে লেখা আছে 'নবযুগ'। নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠছি, হঠাৎ দেখি কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঐ সিঁড়িটা দিয়ে নীচে নামছেন। অফিস ঘরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, উনিই 'নবযুগ কাগজের বর্তমান সম্পাদক। কবিতা গান ছেড়ে তিনি দৈনিক কাগজের সম্পাদনা নিয়ে মেতেছেন 'শেরে বাংলা' ফজলুল হক সাহেবের অনুরোধে। সেদিনও ওঁর পরনে ছিল ধুতি, ঢলঢলে গেরুয়া পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধী টুপি, আর পায়ে লাল তালতলার চটি, সবার উপরে গলা থেকে ঝুলছিল একটা মোটা

রুদ্রাক্ষের মালা।

নজরুল ইসলামের মত অসাম্প্রদায়িক ও ধার্মিক সংহতিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি বোধ হয় তদানীন্তন ভারতেও ছিল না অথবা আজকের ভারতেও। জন্মেছিলেন তিনি মুসলমানের ঘরে, গেয়েছেন আল্লার গান, মা কালীর গান, যিশুর গান, ভগবানের গান আরও কত কি। তাই তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালাটা দেখে আমার আদৌ বিসদৃশ মনে হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর স্বজন-পরিজনেরা লক্ষ্য করছিলেন যে, তাঁর মনে ধর্মভাবাভিব্যক্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তিনি যেন এক ধর্মের নেশায় মাতাল হচ্ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কালীঘাটের মা কালীকার মন্দিরে ও দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মা'কে দেখতে যেতেন এবং হঠাৎ হঠাৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায় গেয়ে উঠতেন, 'বলরে জবা বল, কোন সাধনায় পেলিরে তুই মায়ের চরণ তল?' অথবা 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী, বিশ্বভুবন আঁধার করে তোর রূপে মা সব ডুবালি–'

ভারতের চরম দুর্দিন চলছে। কবিগৃহে কবিপত্নী প্রমীলা দেবীর মনে প্রচণ্ড শংকা, কেন কবির মনের ভাবাবেগ এত বেড়ে যাচ্ছে? আস্তে আস্তে ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট তারিখটা এসে গেল। গান্ধীজী সারা ভারতকে আহ্বান করে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'বৃটিশ কুইট ইণ্ডিয়া... বৃটিশ ভারত ছাড়ো!' সারা দেশ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল। আমিও ঘরের ছেলে ঘরে গেলাম। প্রায় দেড় মাস পরে 'দৈনিক বসুমতী' নামক পত্রিকায় কোন এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন যে, ৯ই আগস্ট গান্ধীজী ভারত ছাড়বার আহ্বান দিলেন, আর মাত্র একদিন পরে ১০ই আগস্ট কবি মূক হয়ে গেলেন। ঐ ঘটনাটি কি ঈশ্বরাদিষ্ট? বিধাতা হয়ত বুঝেছিলেন যে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রকৃত আরম্ভের পরে আর কাজী নজরুল ইসলামের রক্ত গরম করা গানের প্রয়োজন নেই। কথাটা আমার বারবার মনে পড়ে, আমি ভুলতেই পারি না।

ডাক্তারী পাশ করবার পর আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অনেকবার নজরুল যখন যেখানে থাকতেন, সেইসব বাসাবাড়ীতে গিয়েছি। ইতিমধ্যে মাসীমাও পক্ষাঘাতগ্রস্তা হয়ে এক জড় পদার্থের মত পড়ে আছেন। কবির তখন প্রচণ্ড মনচাঞ্চল্য ও অস্থিরতা হত। তদানীন্তন কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তারেরা তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। আমার বাবার এক সহপাঠী, ডাক্তার কে. সরকারের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উপদেশমত রোগীর দেহে শিরার মধ্যে একটি জার্মান ঔষধ সূচিকাবিদ্ধ করা হবে, সেই ঔষধটি বিখ্যাত জার্মান ইহুদি নোবেল বিজ্ঞানী পল এহরলিখ্ আবিষ্কার করেছিলেন। ঔষধটা খুবই শক্তিশালী, কিন্তু মাঝে মাঝে সে-ঔষধের বিষক্রিয়ার ফলে রোগীর শরীরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। তাই রোগীর বন্ধুরা অত্যধিক স্নেহের বশবর্তী হয়ে রোগীকে ঔষধটি পুরোপুরি মাত্রায় দিতে দেননি। এটাকে হিতে বিপরীত ছাড়া আর কি বলা যায়? তাই বোধ হয় অর্ধচিকিৎসিত কবি আর ভাল হলেন না! প্রমীলা দেবীরও মনে ওই ঔষধটি দেবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না।

কেননা তিনি আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'বাবা' একটা অন্ধ বা পঙ্গু সন্তানকে কোলে করে নেড়ে চেড়েও এক মায়ের মন শান্ত হয়, কিন্তু মৃত সন্তান নিয়ে মা কী করতে পারে?'

আমার পাঠক্রমের খুঁটিনাটির জন্য ১৯৪৬ ও ৪৭-এ আমার পক্ষে কবির বাড়ীতে যাওয়া হয়ে উঠত না। সে-সময় কবির দুই পুত্র সানি ও নিনি স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে এবং নিনি খুব ভাল গীটার বাজনা ইতিমধ্যেই শিখেছিল। ১৯৫১-এ আমি প্রথমবার বিদেশে গেলাম স্নাতকোত্তর স্নায়ুশল্যশাস্ত্রের শিক্ষা নেবার জন্য। মাঝখানে ১৯৫২-তে আমি ব্যক্তিগত কারণে স্বল্পকালের জন্য দেশে ফিরে আসি। সে-সময় দেখেছিলাম যে, কাজী আবদুল ওদুদ, কমরেড মুজফফর আহমদ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় সংগঠিত "নজরুল নিরাময় সমিতি" কবিকে বিদেশে পাঠিয়ে শেষ চিকিৎসার মানসে অর্থ সংগ্রহে রত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে আমি সিন্ধিয়া কোম্পানীর জাহাজ 'জল আজাদ'-এর বোম্বাই থেকে লিভারপুলগামী জাহাজের একখানা টিকিট কেটেছিলাম। কলকাতা থেকে বোম্বাই পৌঁছে আমার মেসোমশাই-এর বাড়ীতে বিখ্যাত নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী মশায়ের সঙ্গে আমার দেখা হল। স্টেশন থেকে মেসোমশায়ের বাড়ীতে ঢুকেই দেখি যে, তুলসী লাহিড়ী মশাই সেখানে বসে আছেন। তিনি আমাকে দেখেই লাফ্ দিয়ে উঠে বললেন, 'যাক্ বাবা! বাঁচা গেল।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যাঠামশাই, কি ব্যাপার বলুন তো?' উনি একগাল হেসে বললেন, 'কাজী মানে কাজী নজরুল ইসলাম তোর ওই জাহাজে করেই কাল লিভারপুল রওনা হবে। তুই সঙ্গে যাবি বলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।' ঘরে এক অতি সুন্দরী মহিলা ও এক অতি সুদর্শন যুবক বসেছিলেন। মহিলাটি হলেন বিগত যুগের অপরূপা সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী, যার 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকে ছোট বউ-এর চরিত্রাভিনয় অবিস্মরণীয়। যুবকটি আমার পাবনার গোপালচন্দ্র ইনস্টিট্যুশনের বাল্য সহপাঠী শীতলদাস বটব্যাল, বর্তমানে বোম্বাই –এর চিত্রজগতের রাজপুত্র অথবা রাজার অভিনয়ে পটু অভিনেতা 'প্রদীপ কুমার।'

তুলসী বাবু বললেন, 'কবি মেরিন ড্রাইভের সীগ্রীন হোটেলে আছেন এবং আজ বিকেলে বোম্বাই–এর চিত্রজগতের কলাকুশলী এবং কবিরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাবেন।' আমি শীতলের গাড়ী করে বোম্বাই-এর রাস্তাঘাটে খানিক্ষণ ঘোরাঘুরি করবার পর সীগ্রীন হোটেলে গেলাম। সেখানে দেখলাম মাসীমা অর্থাৎ প্রমীলা দেবী একটি বিছানায় শুয়ে আছেন, কবি আর একটি খাটের ওপর বসে নিজের মনে কাগজ ছিঁড়ছেন। আমাকে দেখেই দু'একটা অবোধ্য আওয়াজ করেই আবার নিজের মনে কাগজ ছেঁড়বার কাজে মন দিলেন। কবির ছোট ছেলে অনিরুদ্ধ (নিনি) এবং কবির একান্ত সচিব রবীউদ্দিন আহমেদ (আমাদের প্রিয় বাঁটুদা) বসে চা খাচ্ছেন। রেখা নাম্নী একটী যুবতীও ছিল সেখানে, মেয়েটি কবির সেবিকা বা নার্স।

বিকেলে ৪টের সময় হোটেলের সভাকক্ষে এক বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। কবিকে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা ফরাসের ওপর বসানো হয়েছিল এবং তিনি নিজের মনে পুরানো পত্রিকার কাগজ ছিঁড়ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রজনীগন্ধার মালাটা ছিঁড়লেন। ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় হেমন্তকুমার অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে এলেন, তারপরে এলেন বিপিন গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী, তারপর, ঢুকলেন অশোক কুমার, প্রদীপ কুমার, কে, এস, ইউসুফ, কামাল আম্‌রোহী, কে, এ, আব্বাস, মুকেশ এবং নৌশাদ আলি। এছাড়া বহু কবি এসেছিলেন, যাঁদের মধ্যে যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমি, খৈয়্যাম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনাভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরখপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং নু নারাভি এঁরা সবাই ছিলেন।

কাইফী আজমী এবং শাহর লুধিয়ানভী স্বরচিত কবিতা পাঠ করে কবি-বন্দনা করলেন এবং তারপরেই হেমন্ত কুমার কবির নিজের লেখা গান, 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?' গাইলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে, ওই হোটেলেরই একটি অংশে বিখ্যাত বাঙ্গালী গায়ক 'কুমার'–স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে বাস করেন। কিন্তু তাঁদের টিকিটিও আমরা দেখতে পেলাম না। ওই ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীত–জীবনের প্রারম্ভে কবির কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন, তাই বোধ হয় তিনি এক অকৃতজ্ঞের মত ব্যবহার করলেন। শোনা গেল যে, তিনি বোম্বাই–এর আশে পাশে এক মনোরম স্থানে দিনটা যাপন করতে গেছেন। বিপিন গুপ্ত রেগে গিয়ে সিংহনাদের মত আওয়াজ করে বললেন, 'কৃপণটা টাকা পয়সার কথা শুনলেই বানমাছের মত সুরুৎ করে পালিয়ে যায়।'

মুকেশ একটা তোয়ালে দিয়ে থলি বানিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল। দু'ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার টাকা চাঁদা উঠে গেল। চাঁদার থলিটা কবির হাতে দিতেই তিনি কয়েকটা অবোধ্য আওয়াজ করে ফরাসের ওপর সেটা থপ্ করে ফেলে দিলেন।

পরদিন সকালে আমরা বালার্ড পিয়ার জিটিতে 'জল আজাদ' জাহাজে আরোহণ করলাম। তখন জাহাজের লাউড্ স্পীকারে হেমন্তের গলায়, 'জিন্দাগী পেয়ার কী দো চার ঘড়ি হোতী হ্যয়' গানটা শোনা যাচ্ছিল। জাহাজে বেশ কয়েকজন গান বাজনা জানা ছেলে ছিল, যাদের মধ্যে প্রদ্যোৎ সেনের নাম বেশ উল্লেখযোগ্য, কেননা সে তার পেটমোটা তানপুরাটা নিয়ে বিলেত যাচ্ছিল ভাগ্যান্বেষণের জন্য।

সে প্রায়ই কবির সামনে বসে গাইত 'আগে জান্‌লি তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।' মাঝে মাঝে কবি গানটা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠতেন, মনে হত তিনি কিছু বলতে চাইছেন, মাসীমা উল্লাসিত হয়ে বলতেন, 'হে ঈশ্বর! ওঁর মুখে দুটো একটা কথা ফিরিয়ে দাও!' জাহাজ যখন ভূমধ্যসাগরে ঢুকল, তার তিনদিন পরে অর্থাৎ ১২ই মে কবির ৫৪তম জন্মদিন। জাহাজের সবাই উঁচু-নীচু দেশী-বিদেশী মিলে বিরাট সমারোহ

করে কবির জন্মদিনের উৎসব পালন করা হল। আমি কিছু কিছু কবির গান রাতরাতি ইংরেজীতে তর্জমা করে রেখেছিলাম। সুন্দর বাদ্য সংগীতের সঙ্গে সেগুলো গাওয়া হয়েছিল। যখন কবি রচিত 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গান গাওয়া হচ্ছিল, তখন কবি ক্ষণিকের তরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন।

অবশেষে আমরা লিভারপুল বন্দরে পৌছে গেলাম এবং কবিকে নিয়ে একটি ট্রেনে করে লণ্ডনে পৌছে, 'লণ্ডন ক্লিনিক' নামক বিরাট নার্সিং হোমে তাকে ভর্তি করা হল। সেখানে বেশ কয়েকদিন ধরে স্যার রাসেলব্রেন, ডঃ ওয়াইলী ম্যাক্‌কিসক্ এবং উইলিয়ম সার্জেন্ট কবির ওপর নানা রকম পরীক্ষা করলেন এবং শেষ উত্তর হল চরম নৈরাশ্যজনক–'আমাদের কিছু করবার নেই, কবির মস্তিষ্ক শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে।' লণ্ডনের বাঙ্গালীরা কবি সংবর্ধনা করে কবির চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করলেন। অতঃপর কবিকে পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন নগরীর বিখ্যাত স্নায়ুশল্য চিকিৎসক প্রফেসর র‍্যোত্‌গেন–এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তিনিও কোনও আশা দিতে পারলেন না। তারপরে কবি এলেন আমার পাঠস্থান ভিয়েনা জেনারেল হসপিটালে। সেখানে তাঁর উপরে আমি স্বহস্তে অ্যাঞ্জিওগ্রাফী করেছিলাম। কেননা আমার অধ্যাপক ডঃ হোফ্ আমাকে অনুরূপ আদেশ করেছিলেন। অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক আশা, অনেক অর্থব্যয় সবই বিফলে গেল।

মূক কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশে ফিরে এলেন। কেবলমাত্র একটি রোগের নাম সম্বল করে যেটি পরিচিত "আলৎজহাইমের"–এর রোগ। যে রোগে কোনো এক অজানা কারণে মস্তিষ্ক শুকিয়ে আখরোটের শাঁসের মত হয়ে যায়। রোগী বেঁচে থাকে জড় পদার্থ হিসাবে। খায় দায় সবকিছু করে, শুধু তার নীরবতা ভঙ্গ হয় না! সেই নীরব কবি বাঙ্গলা দেশের স্বাধীনতার পর ঢাকা যান। ঢাকাতেই তাঁর মৃত্যু হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এবং তাঁরই লিখিত এক কবিতা 'যখন লব বিদায়'... এর মর্মার্থ মোতাবেক তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের সামনে সমাহিত করা হয়। ১৯৪২ সালের ১০ই আগষ্ট যে কবি নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, আজ তাঁর কবরের আশে পাশে শুধু শুনতে পাওয়া যায় পাখির কূজন, বাতাসের শন্‌শন্ আর কাঠ বেড়ালীর কিচির মিচির।[১]

---

১. এ-ধরনের কথা প্রচলিত থাকলেও, প্রত্যক্ষদর্শীর কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। -স. ন. ই. প.

২. নজরুলের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে সেখানে অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী সমবেত হয় এবং কবির সমাধিতে পুষ্প-স্তবক অর্পণ করে। কবির বিখ্যাত গানঃ 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই'–এর মর্মার্থই বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

৩. ডাঃ অশোক বাগচী নজরুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই স্মৃতিচারণ করেন। স. ন. ই. প.

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — সপ্তদশ সংকলন]

কুমিল্লায় নজরুল-নার্গিস প্রসঙ্গ

শান্তিরঞ্জন ভৌমিক

কুমিল্লায় নজরুল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবি ও ব্যক্তি-জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর রচনায় যেমন ভাবের, মননের, চিন্তনের, প্রকরণের বৈচিত্র্য রয়েছে, ব্যক্তিজীবনও কর্মে, ধর্মে, বিশ্বাসে, আদর্শে, অভাবে, স্বভাবে তেমনি বৈচিত্র্যময়। সুস্থ স্বাভাবিক প্রথাগত জীবনধারা বলতে আমরা যা বুঝি-নজরুল-জীবন সে অভিধায় পরিপূর্ণ নয়। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি খেয়ালী, চঞ্চল এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই তাঁর সৃষ্টিতে এবং জীবনাচরণেও এগুলো স্বাভাবিকভাবে পরিদৃশ্যমান।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) এবং মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট। তিনি প্রায় ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে মক্তবে পড়া, লেটোদলে গান গাওয়া, রুটি-দোকানে চাকুরি করা, মসজিদে ইমামতি করা, ১৯১১ সালে মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী, ১৯১৪ সালে দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণী এবং ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীতে পড়া, ১৯১৭ সালে বাঙালী পল্টনে যোগদান, ১৯২০ সালে পল্টন থেকে ফিরে আসা, ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, রাজনীতিচর্চা, সংবাদপত্র সেবা, বিবাহ ইত্যাদি, ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং মৃত্যু পর্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থায় ভারতে ও বাংলাদেশে অবস্থান—এভাবেই নজরুল ইসলামের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্কুলজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয়, সৈনিক জীবনে তা বিকশিত হয় এবং পরবর্তীতে সার্থকতার উচ্চতম শীর্ষে উন্নীত হয়।

নজরুল ইসলাম জীবনে প্রায় ৩৪ বৎসর জীবন্মৃত ছিলেন। সক্রিয় সাহিত্যচর্চা মাত্র ২৩ বৎসর অর্থাৎ ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত নজরুল পাঁচবার কুমিল্লা এসেছিলেন। তাঁর রচনায় কুমিল্লার স্মৃতি ও ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

কুমিল্লায় নজরুল ইসলামের অবস্থানকাল প্রায় ১০/১১ মাস। এ সময়ের মধ্যে তিনি দু'নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। একজনের সাথে আক্‌দ হয়েও

পরবর্তীতে বিয়ে ভেঙ্গে যায়, অপরজনের সাথে আজীবন দাম্পত্য পরিগৃহীত হয়। কুমিল্লা অবস্থানকালে তিনি গোমতীর তীরে বসে কবিতা রচনা করেছেন, গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়েছেন, গ্রেপ্তার বরণ করেছেন, অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, মাতৃস্নেহে ধন্য হয়েছিলেন ইত্যাদি। সেজন্য কুমিল্লা নজরুল-জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেছিল।

> নজরুল জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কেটেছে কুমিল্লায়। শুধু কি প্রেমের, কবির রাজনৈতিক জীবনেরও শুরু কুমিল্লায়। সে যুগে গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে, উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত গান গেয়ে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কবি জাগিয়ে তুলেছেন, সারা কুমিল্লার 'পুরবাসী'কে। নজরুল জীবনের কত ঘটনার সঙ্গেই না কুমিল্লার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একদিন।[১]

নজরুল ইসলামের কুমিল্লার সাথে নানা সম্পর্ক যেমন এ জেলাবাসীর জন্য গৌরবের, বৈচিত্র্যপূর্ণ নজরুল-জীবনের সত্য সুন্দর মানস রচনায় এ কুমিল্লা-স্মৃতিও অম্লান। আবুল ফজলের ভাষায় বলা যায়,

> নজরুল প্রেমের কবি, প্রেমিক কবি। লিখেছেনও অজস্র প্রেমের কবিতা ও গান। এসব রচনার উৎস মোটেও বায়বীয় নয়, রক্ত মাংসের মানবীই। আর এ মানবীরা কুমিল্লারই মেয়ে। কুমিল্লার মাটিতেই কবির প্রথম প্রেমের উন্মেষ আর তার পরিণতিও কুমিল্লায়। যদিও পাত্রী এক নয়। কুমিল্লাকে বাদ দিয়ে নজরুল জীবনের অধ্যয়ন কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। অপূর্ণ থাকতে বাধ্য।[২]

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে, নজরুল ইসলাম কেন কুমিল্লায় এসেছিলেন, কিভাবে এসেছিলেন, কুমিল্লায় তাঁর জীবন যাপন কেমন ছিল, এখানে কোথায় থাকতেন, কি করতেন, দৌলতপুরে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং প্রমীলার সাথে তাঁর বিয়েই বা কেমন করে হলো? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে পূর্বসূরী অনেক গবেষক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে একটা রূপরেখা প্রণয়ন করতে চেষ্টা করেছেন, অনেকে সমসাময়িক কালের নজরুল-বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণার আলোকে একটা কাঠামো দাঁড় করাতে চেয়েছেন। আবার কেহ বা যথাযোগ্যতা বিশ্লেষণে পূর্বাপর ঘটনা মূল্যায়ন করে একটি দলিল প্রস্তুত করেছেন। সেজন্য বক্তব্যের, ঘটনাবিন্যাসের, সময়ক্ষেপণের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ, নজরুল সম্বন্ধে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। তবে এ ক্ষেত্রে বক্ষমান নিবন্ধে বিভিন্ন গবেষণা-কর্মের অভিমতগুলো যাচাই করে একটা প্রামাণ্য সত্য বের করার চেষ্টা করা হলো।

প্রায় সকল গবেষক একমত যে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরের দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী আলী আকবর খানের সাথেই নজরুল ইসলাম প্রথম কুমিল্লায় আসেন। পরিচয় সূত্রটি কমরেড মুজফফর আহমদ এভাবে লিখেছেন যে ১৯১৯ সালে আলী আকবর খান তাঁর সাথে পরিচয় সূত্রে ৩২ কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে যাতায়াত শুরু করেন এবং এক সময়ে বিনা অনুমতিতে সাহিত্য সমিতির

একখানা ছোট্ট খালি ঘরে আশ্রয় নেন। আলী আকবর খান নিজ সম্পর্কে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন, ব্যাপারটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মুজফফর আহমদের পরিচিত বলে কেহ কোন কথা বলতেন না। সে সময় খান সাহেব 'একটি খারাব ব্যাধিতে' ভুগছিলেন এবং শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল*

> ঠিক এমন সময়ে নজরুল ইসলাম ওই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে থাকতে এলো। অন্য সকলের সঙ্গে তার যেমন পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ঠিক তেমনই তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো আলী আকবর খানের সঙ্গেও। ঠিক পাশের ঘরেই তো তিনি থাকতেন। নজরুল তাঁকে এটা ওটা এগিয়ে দিতে লাগল। দোকান হতে তাঁকে খাবারও এনে দিতে লাগল। অবশ্য, ক'দিনের ভিতরেই তিনি চলাফেরা করার উপযুক্ত হয়ে গেলেন। এইভাবেই হয়েছিল আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল ইসলামের পরিচয়ের সূত্রপাত।[৩]

আলী আকবর খান সে সময় প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য পুস্তক রচনা করে প্রকাশ করতেন। ঐসব পুস্তকে নিজেই কবিতা লিখতেন, কিন্তু তা 'অপূর্ব চীজ হতো'।[৪] তাঁর কবিতা রচনা দেখে নজরুলের চক্ষুস্থির। তখনই নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'লিচু চোর' কবিতা লিখে দেন। এভাবে নজরুলের সাথে ঘনিষ্ঠতা হলে পর একদিন আলী আকবর খান তাঁকে ধরে বললেন, 'চলুন কাজী সাহেব, আমার সঙ্গে আমাদের দেশে। আমাদের বাড়ীতে দিন কতক থেকে আসবেন।' এ প্রস্তাবে নজরুল রাজী হলেন এবং ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে, (চৈত্র ১৩২৭) চট্টগ্রাম মেলে তাঁরা যাত্রা করেন।

রফিকুল ইসলাম লিখেছেন,

> কুমিল্লায় পৌছে আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় যান। আলী আকবর খান কুমিল্লা জেলা স্কুলে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্র বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তের সহপাঠী ছিলেন, তখন থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে তার হৃদ্যতা। বীরেন্দ্রের মাতা বিরজাসুন্দরী দেবী স্নেহময়ী রমনী ছিলেন, আলী আকবর খান তাকে মা ডাকতেন, এবারে তিনি নজরুলেরও মা হলেন। এ পরিবারে আরো ছিলেন বীরেন্দ্রের দুটি ছোট বোন বাচ্চি (কমলা দাসগুপ্তা), জটু (অঞ্জলি সেন), বীরেনের বিধবা জেঠিমা গিরিবালা দেবী ও তার একমাত্র সন্তান আশালতা বা প্রমীলা (দুলি) এবং বীরেন বাবুর স্ত্রী ও পুত্র রাখাল। কুমিল্লা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ইন্সপেক্টর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল, এ বাড়ির মেয়েরা দুলি, বাচ্চু, জটু সঙ্গীতে মুখর ছিল, নজরুলকে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আপন করে নিয়েছিল।[৫]

মুজফফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা'য় গ্রন্থে লিখেছেন,

> শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারে নজরুল ইসলাম আপন জনের মতো অভ্যর্থিত হলো। ইতোমধ্যে কবিরূপে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাকে নিজেদের ভিতরে পেয়ে এই পরিবারের লোকেরা সত্যই বড় আনন্দিত হলেন। নজরুল ইসলাম শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় এসেছেন জানতে পেরে শহরের যুবকরা ভিড় করে সেই বাসায় আসতে লাগলেন। কবিতার আবৃত্তিতে ও গানে পরিবারটি মুখর হয়ে

উঠল। কবি নিজে এই পরিবারের আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়েছিল। বিরজাসুন্দরী দেবীর ও বীরেন্দ্রকুমার সেনের বিধবা জ্যেঠী-মা গিরিবালা দেবীর যত্নাদরে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেও বিরজাসুন্দরী দেবীকে মা ডাকতে লাগল। অবশ্য, মুরাদনগর থানার দৌলৎপুর গ্রামে আলী আকবর খানদের বাড়ীতে যাওয়ার পথেই নজরুল শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় উঠেছিল। এই সময়ে সে চার-পাঁচদিন এই বাসায় ছিল। তারপরে সে চলে গেল দৌলৎপুর গ্রামে।[৬]

এখানে মুজফফর আহমদ লিখেছেন 'এই সময়ে সে (নজরুল) চার -পাঁচদিন এই বাসায় (ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের) ছিল।' এবং দৌলতপুরে যেতে 'চৈত্র মাসের পথে তখনও কাদা হয়নি।' রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, 'কয়েকদিন কুমিল্লায় কাটিয়ে নজরুল বৈশাখের শুরুতে সদর মহকুমার আলী আকবর খানের সঙ্গে তার দৌলতপুর গ্রামের বাড়িতে যান।' এখানে 'চৈত্রমাস' ও 'বৈশাখ মাস' এবং 'চার-পাঁচদিন' ও 'কয়েকদিন'– এ কথাগুলো অনুমান সাপেক্ষ। তবে তাঁদের অবস্থান দীর্ঘ ছিল না। সে সময়ের চিঠিপত্রের তারিখ এবং চিঠিপত্রের বিষয়ানুসারে কয়েকটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,

১. নজরুল ইসলাম সে সময় ৮ই জুলাই ১৯২১ সাল পর্যন্ত কুমিল্লায় অবস্থান করেছিলেন। অর্থাৎ ১৯২১ সালের এপ্রিল (মতান্তরে মার্চ-এপ্রিল) থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেছিলেন।

২. উক্ত সময়ে আলী আকবর খানের মাধ্যমে কুমিল্লার কান্দিরপাড়স্থ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং নজরুল–নার্গিস বিবাহানুষ্ঠানে এই পরিবারের সদস্যরাই সহযাত্রী হয়েছিলেন।

৩. উক্ত সময়ে নজরুলের জীবনে এক চমকপ্রদ এবং অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। দৌলতপুরে অবস্থানকালে আলী আকবর খানের ভাগিনী সৈয়দা খাতুনের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এ ঘনিষ্ঠতার সূত্রে ও আলী আকবর খানের অসৎ উদ্দেশ্যের কূট কৌশলের ফলশ্রুতিতে অর্থাৎ দৌলতপুরে সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা এবং আলী আকবর খানের উদ্যোগে তাদের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়।[৭]

কুমিল্লায় নজরুল ইসলামের অবস্থানকাল,

১. প্রথমবার নজরুল ইসলাম কুমিল্লায় ছিলেন–দৌলতপুরে ১৩২৭ সনের চৈত্রের শেষ থেকে ৩রা আষাঢ় ১৩২৮ সন পর্যন্ত এবং কুমিল্লা শহরে ৪ঠা আষাঢ় ১৩২৮ সন থেকে ২৩শে আষাঢ় ১৩২৮ সন পর্যন্ত।

২. দ্বিতীয়বার নজরুল ইসলাম কুমিল্লায় আসেন ১৩২৮ সনের অগ্রহায়ন মাসে এবং ফিরে যান ১৩২৮ সনের পৌষমাসে।

নজরুল তখন কুমিল্লায় সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। তখনই পরশপূজা, মনের মানুষ, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতা লিখেন। বিশেষ করে 'ভাঙার গান' কাব্যের

বিখ্যাত কোরাস 'জাগরণী' লিখেছিলেন। ১৯২১ সালের ২১ শে নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে কংগ্রেসের ডাকে দেশব্যাপী হরতাল প্রতিপালিত হয়। কুমিল্লায় এ ঢেউ এসে পড়ে। নজরুল গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে মিছিলের সাথে গাইলেন,

ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।

এই মিছিল সম্পর্কে এম, এ, কুদ্দুস লিখেছেন,

সন্ধ্যার মুখে রাজগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ পূর্ব কোণে যখন মিছিল পৌছল, তখন দেখা দিল পুলিশ। তারা নজরুলকে নিয়ে গেল থানায়; সংগে ছিল আফতাবুল ইসলাম, কংগ্রেস-খেলাফতের প্রতিনিধি। সংগীয় দলবল তখন যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কি হয় নজরুলের তা জানার জন্য। ঘন্টাখানেক পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। বীরের মত ফিরে এলেন নজরুল। এতে তার জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল।[৮]

তখনই আস্তে আস্তে নজরুল ও প্রমীলার ঘনিষ্টতা বাড়তে থাকে। কুমিল্লায় বিরজা সুন্দরী দেবীর স্নেহ ছায়াতলে নজরুল-দুলী পরস্পর পরস্পরের নিকটতর হতে থাকে। একে অন্যকে বোঝে, চেনে।

দৌলতপুরের স্মৃতি নজরুলের-হৃদয়ে জাগরুক থাকলেও দুলীর সেবা যত্নে কবি নতুন জীবন যেন পেলেন। সে সময় লিখ্‌লেন,

ফিরিনু যে দিন দ্বারে দ্বারে কেউ কি এসেছিল?
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল?
আমার যত কলঙ্ক সে
হেসে বরণ করলে এসে
আহা বুক জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল?
ওগো জানত কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল?

[মনের মানুষ -ছায়ানট]

১৩২৮ সনের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ প্রায় পাঁচ মাস নজরুল কলকাতায় কাটিয়ে নিজের মনকে ধীরে ধীরে সংযত করে এবং জীবন প্রেয়সী ঠিক করে নেয়। কারণ প্রথমবার চৈত্র মাসে কুমিল্লা পদার্পণের সাথে সাথেই কবির প্রথম দর্শনে দুলীকে ভাল লেগেছিল,

মনে পড়ে বসন্তের শেষে আসা ম্লান মৌন মোর
আগমনী সেই নিশি।
হাসি হেরে কেঁদেছিনু, তুমি কার পোষা পাখী কান্তার বিধুর।
চোখে তব সে কি চাওয়া! মনে হল যেন
তুমি মোর ঐ কণ্ঠ, ঐ সুর!

[পূজারিণী/দোলনচাঁপা]

তাই দ্বিতীয়বার কুমিল্লা আসার তাগিদ অনুভব করলেন নজরুল। সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপন অন্তরতলে অনুভব করতে থাকেন নতুন অনুভূতি, নতুন স্পন্দন।

দুদিন না যেতে একি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা গন্ধ নাভি পদ্মমূলে।

[দোলন চাঁপা]

মোট কথা, এবার নজরুলের আগমন-উপলক্ষ দুলী। দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। ১৩২৮ সনের অগ্রহায়ণে কুমিল্লায় রচিত 'বিজয়িনী' কবিতায় 'হে মোর রাণী', 'ওগো জীবন দেবী' ইত্যাদি সম্বোধনে কবি নিজেকে এক নারীর কাছে সমর্পণ করেছেন — তা স্পষ্টই বোঝা যায়,

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।

অথবা

ওগো জীবন দেবী! আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল।

[বিজয়িনী/ ছায়ানট]

নজরুল ইসলাম তৃতীয়বার কুমিল্লায় আসেন ১৩২৮ সনের ফাল্গুন মাসে এবং কলকাতায় ফিরে যান ১৩২৯ সনের আষাঢ় মাসে। মোট চার মাস অবস্থান করেছিলেন এবার।

নজরুল তখন প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত জনপ্রিয় কবি। কুমিল্লায় বসে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। এবার তাঁর সাদর সংবর্ধনার অন্ত ছিল না। কান্দিরপাড়ের ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায়ই অবস্থান করছিলেন। হিন্দু-মুসলমান বন্ধু জুটেছে অনেক। তিনিও তাদের নিয়ে গান-বাজনা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে 'কুমিল্লা শহরটিকে বেশ তাতিয়ে তুলেছেন।' এ যাত্রার দীর্ঘ অবস্থানে নজরুল-দুলীর সম্পর্ক তুঙ্গে ওঠে। তাঁদের পরস্পরের প্রতি জীবন-মরণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে মনে প্রাণে। বাকী শুধু লৌকিক আনুষ্ঠানিকতার। এম, এ কুদ্দুস লিখেছেন,

> ১৩২৯য়ের আষাঢ় মাস। একটা অশুভ ঘনঘটার ঝঞ্ঝা দেখা দিল। রথের পূর্ব মুহূর্তে একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ল। দুলী নজরুল প্রসঙ্গটা তরুণ সমাজের মধ্যে একটা হিংসাত্মক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষভাব ততটা দেখা না দিলেও নজরুল হিন্দু বাসায় থাকে, হিন্দু মেয়ের সাথে দহরম মহরমের একটা বিষক্রিয়া সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচে উৎকট পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এক হিন্দু যুবকের নেতৃত্বে একদল ছাত্র রথের দিন রথ দর্শনে গেলে নজরুলের উপর অতর্কিতে আক্রমণ ও অপমান করতে বদ্ধপরিকর হয়। কুমিল্লার রক্ষণশীল হিন্দু মহলে এ ব্যাপারে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। এমন কি নজরুলকে আক্রমণ করার জন্যে

গুন্ডা লেলিয়ে দেয়া হয়। (নজরুল জীবনী পৃঃ ২২২-২৩)। অবস্থা গুরুতর জেনে অতীনবাবু, আলী নওয়াব ও তার অন্যান্য গুণমুগ্ধরা অবাঞ্ছিত সংকট থেকে নজরুলকে রক্ষা করেন। বিরাজমান বিক্ষুব্ধভাব যে কোন সময় যে কোন রূপে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে এ আশংকায় নজরুলকে গোপনে একরাতে আসাম-কলকাতা মেইল যোগে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।*

কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফিরে গিয়ে ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট (১৩২৯ সনের ২৫শে শ্রাবণ) ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট থেকে নজরুল অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন।

আবদুল কাদির লিখেছেন ১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়। রফিকুল ইসলাম অবশ্য ২৬শে সেপ্টেম্বরের কথা উল্লেখ করেছেন।*

আর কত কাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল?
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?

পুরুষগুলোর ঝুটি ধরে বুরুশ করায় দানব জুতো
মুখে ভজে আল্লা হরি পূজে কিন্তু ডাণ্ডাগুতো।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাশিমের প্রাণ বলিদান,
চণ্ডী! নিলি যোগমায়ারূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।

শাসকগোষ্ঠি এ কবিতায় বিদ্রোহের গন্ধ খুঁজে বের করলেন। 'ধূমকেতু'র এই সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হলো। নজরুলের নামে গ্রেফ্‌তারী পরওয়ানা জারি হলো। তাঁকে গ্রেফ্‌তার করার পূর্বেই তিনি বিহারে সমস্তিপুরে চলে যান। গিরিবালা দেবী তখন প্রমীলাকে নিয়ে ওখানে ভাইদের কাছে অবস্থান করছিলেন। নজরুল সমস্তিপুর থেকে তাদের নিয়ে কুমিল্লা যান। এবার ছিল তাঁর চতুর্থবার কুমিল্লায় আসা।

কুমিল্লায় ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখ নজরুলকে গ্রেফতার করে কলকাতা নিয়ে আসা হয়। ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে বিচার হলে ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪ ক এবং ১৫৩ ক ধারা অনুযায়ী ধূমকেতু রাজদ্রোহ মামলায় নজরুল এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

নজরুল ইসলামের গ্রেফতারের খবর তখন পত্রিকায়বের হয়েছিল।

আনন্দ বাজার পত্রিকা। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯। ২৪শে নভেম্বর ১৯২২

'ধূমকেতু'র সম্পাদক গ্রেপ্তার'

'ধূমকেতু' সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম গতকাল বেলা বারোটার সময় কুমিল্লাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার নামে পূর্বেই ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছিল।'

ধূমকেতু ১২ই অগ্রহায়ন ১৩২৯। ২৮শে নভেম্বর ১৯২২

'দেশের খবর। ধূমকেতুর মামলা'

ধূমকেতুর ভূতপূর্ব সারথি ২৩শে নভেম্বর দুপুর বেলা কুমিল্লায় গ্রেফতার হন। সেইদিনই চাটগাঁ মেলে চাপিয়ে ২৪শে সন্ধেবেলা কলকাতায় আনা হয়েছে। ২৫শে নভেম্বর তাঁকে কোর্টে হাজির করা হয়েছিল। মোকদ্দমার দিন পড়েছে ২৯শে নভেম্বর। মামলা চলবে।

১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর (মতান্তরে ২৫শে ডিসেম্বর) নজরুল ইসলাম কারামুক্ত হন। মুক্তি পাবার পর সোজা কুমিল্লা চলে আসেন। কুমিল্লায় পঞ্চমবার আসার পিছনে একমাত্র কারণ দুলী বা প্রমীলা। তখনই তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়ে যায়।

কুমিল্লা থেকে নজরুল কবে ফিরে আসলেন কলকাতায় তার সঠিক তারিখ উল্লেখ নেই। আবদুল কাদির এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর নজরুল কারামুক্ত হন। মুক্তির পর সোজা চলে আসেন কুমিল্লায়। ১৩৩০ সালের ১১ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার অধিবেশন উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুর যান; তথায় ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন যথাক্রমে পরিষদ ও মহিলাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দান করা হয় ১৩৩০ সালের ফাল্গুনে। 'সমস্তিপুরের ট্রেন-পথে' তিনি রচনা করেন 'রৌদ্রদগ্ধের গান।' বিহারের 'সমস্তিপুরে' তখন শ্রীযুক্তা 'গিরিবালা দেবী সকন্যা তাঁর ভাইদের বাটীতে অবস্থান করছিলেন'। [১০]

তারপরের ঘটনা হলো ১৯২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল মোতাবেক ১৩৩১ সনের ১২ই বৈশাখ শুক্রবার জুম্মার পর কলকাতা ৬নং হাজি লেইনে নজরুলের সাথে দুলী, আশালতা সেনগুপ্তা তথা প্রমীলার শুভ পরিণয় হয়ে যায় মিসেস এম, রহমানের উদ্যোগে ও সহযোগিতায়। 'আহলুল কিতাব'– এই মতানুসারে বিয়ে হয়েছিল বলে প্রমীলাকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়নি। মিসেস এম, রহমান দুটি জীবনের মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করেন। এ থেকেই কুমিল্লার সাথে চিরবন্ধনে আবদ্ধ হন নজরুল ইসলাম।

কুমিল্লায় নজরুল ইসলাম পাঁচবার এসেছিলেন এবং তাঁর অবস্থান কাল মোট দশ/এগার মাস।

> **প্রথমবার** ১৯২১ সালের এপ্রিল (মার্চ-এপ্রিল) থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত প্রায় তিনমাস।
>
> **দ্বিতীয়বার** ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে এসে ডিসেম্বরে চলে যান। এখানে এক

মাসও থাকেননি।

তৃতীয়বার ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এসে জুন মাসে চলে যান। এবার ছিলেন প্রায় চার মাস।

চতুর্থবার গ্রেপ্তারী পরওয়ানা এড়ানোর জন্য আসেন অক্টোবরে আর ধৃত হন ১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর।

পঞ্চমবার ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি চলে আসেন কুমিল্লায়। যাওয়ার তারিখ অজ্ঞাত।

কুমিল্লায় অবস্থানকালীন সময়ে নজরুল ইসলামের জীবনে আসে দুজন নারী। একজন সৈয়দা খানম (খাতুন), কবি যাঁর নাম দিয়েছেন নার্গিস আসার খানম্ এবং শ্রীমতী আশালতা সেনগুপ্তা। ডাক নাম দোলন বা দুলী এবং পরবর্তীতে নজরুল নাম দিয়েছেন প্রমীলা। এম, এ কুদ্দুস লিখেছেন,

> কুমিল্লার দুটি মেয়েকে নজরুল ভালবেসেছেন। একজন রয়েছে তার 'অন্তর তলে' আর একজন হয়েছিল প্রত্যক্ষ সংগী। দুজনেরই পারিবারিক নাম ছিল। তাদের ভালবেসে তার পছন্দসই নামকরণ করেছেন দুজনারই। সৈয়দা খাতুনের নাম রেখেছেন 'নার্গিস আসার খানম্' আর আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে দুলীর নাম রেখেছেন 'প্রমীলা'। এ দুনামেই তারা সর্বত্র পরিচিত। কাব্য, কবিতা, গানে অমরত্ব লাভ করেছে দুটি নাম।[১১]

এই দুজন নারী নার্গিস-প্রমীলা নজরুলের কবি-জীবনের সমসাময়িককালে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং দেখা যায় সে সময় কুমিল্লায় বসে কবি প্রচুর কবিতা ও গান রচনা করেছেন। এসব রচনার পটভূমিকা, উৎস এবং অনুপ্রেরণা কুমিল্লার প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং মানুষ। কুমিল্লার স্মৃতিময় কবিতা, গান ইত্যাদি 'ছায়ানট' 'দোলনচাঁপা' 'পূবের হাওয়া' (চক্রবাক) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

১৯২১ সালের এপ্রিল (মার্চ-এপ্রিলে) কুমিল্লা এসে কবি দৌলতপুর যান।

> নজরুল সেখানে দৌলতের সন্ধান পেলেন নার্গিসের মধ্যে। দু'মাসের জানাজানিতে গভীরভাবে ভালবাসলেন একে অন্যকে। সমর্পিত জীবন মিলন মোহনায় এসে বিধাতার নির্মম বিধানে দুটি হিয়া বিচ্ছেদের মর্মচ্ছেদে রুদ্ধ আবেগে বন্দী হয়ে গেল। নতুন সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার এ যে রহস্যঘন লীলা। তাই তো প্রেম-বিরহের চিরন্তনী সুর বেজেছে দুটি হৃদয়ে। দৈহিক মিলন-পরশ ক্রিয়ানুভূতির পুলক শিহরণ জাগাতে না পারলেও অন্তরের মিলন ছোঁয়া আজীবন প্রাণবন্ত রয়েছে।
>
> জীবন নাট্যের এক দৃশ্যের যবনিকাপাত হল বিজলীর চমকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে দৌলতপুরে। কুমিল্লা কান্দিরপাড়ে রচিত হল দ্বিতীয় দৃশ্য। রক্তঝরা কলজে-ছেঁড়া প্রাণে- প্রেমের নতুন প্রলেপ দিল দুলী। প্রেমের নবজন্ম হল। একটা দৃশ্য বাইরে একটা অন্তরে। দুটো ধারা। সংঘাতসংকুল পথে গতি। অনেক দুর্গম পথ পার হয়ে ১৯২৪ সালের এপ্রিলে সমাপ্তি ঘটল তার—প্রমীলা হলেন জীবনসঙ্গিনী।[১২]

তথ্য সন্ধানে দেখা যায়, কুমিল্লায় অবস্থানকালীন সময়ে নজরুল ইসলামের

রচনাসমূহকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম ঃ নার্গিস-কেন্দ্রিক রচনা সমূহ ঃ ছায়ানট, দোলনচাঁপা, পূবের হাওয়া ও চক্রবাক।

ছায়ানট গ্রন্থে-

১.	পাপড়ি খোলা	দৌলতপুর	কুমিল্লা	বৈশাখ	১৩২৮
২.	হার-মানা হার	"	"	"	"
৩.	অনাদৃতা	"	"	"	"
৪.	অবেলা	"	"	"	"
৫.	বিদায় বেলায়	"	"	"	"
৬.	মানস-বধূ	"	"	"	"
৭.	হারামনি	"	"	জ্যৈষ্ঠ	"
৮.	বেদনা অভিমান	"	"	"	"
৯.	বিধুরা পথিক প্রিয়া	"	"	"	"
১০.	পরশ-পূজা	কুমিল্লা	"	"	আষাঢ়
১১.	নিশীথ-প্রীতম্	"	"	"	অগ্রহায়ন

এম, এ কুদ্দুস ১৩৮৮ সনে 'নজরুল একাডেমী পত্রিকায়' আলী আকবর খানের বাড়ি এবং নার্গিসের ঢাকাস্থ বাসা থেকে দৌলতপুরে লেখা দশটি গান উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন, এছাড়া দৌলতপুরে ১৩২৮ সনে 'লাল সালাম', 'মুকুলের উদ্বোধন,' কবিতা লিখেন।

'ছায়ানটের' চারটি গান-

১.	অকরুণ প্রিয়া	কলকাতা	শ্রাবণ	১৩২৮
২.	শেষের গান	"	"	"
৩.	বেদনামনি	"	ভাদ্র	"
৪.	লক্ষ্মীছাড়া	"	"	"

নার্গিসকে কেন্দ্র করেই লিখিত।

'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থের অন্ততঃ সাতটি কবিতা নার্গিসকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে। ১. বেলাশেষে ২. পথহারা ৩. পূবের হাওয়া ৪. অবেলার ডাক ৫. অভিশাপ ৬. আশান্বিতা ৭. পিছুডাকা।

'পূবের হাওয়া' গ্রন্থে নার্গিস বিষয়ক কবিতা পাঁচটি, ১. স্মরণে ২. বেদনা-মানিক ৩. সোহাগ ৪. শরাবন তহুরা ৫. বিরহ বিধুরা।

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে নার্গিস বিষয়ক কবিতা ১৩টি, ১. ওগো চক্রবাকী ২. তোমারে পড়িছে মনে ৩. বাদল রাতের পাখী ৪. স্তব্ধ রাত ৫. মিলন মোহানায় ৬. তুমি মোরে ভুলিয়াছ ৭. হিংসাতুর ৮. সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে ৯. শীতের সিন্ধু ১০. আড়াল ১১. নদী পারের মেয়ে ১২. অপরাধ শুধু মনে থাক ১৩. চক্রবাক।

দ্বিতীয়ঃ দুলী (দোলন) তথা প্রমীলা বিষয়ক কবিতাঃ 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থের ১১টি কবিতা দুলীকে উপলক্ষ করে রচিত। একটা অচরিতার্থ প্রেমের কাব্য 'দোলনচাঁপা'। ৪ঠা আষাঢ় ১৩২৮ সনে নজরুল দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় চলে আসেন। কুমিল্লায় তখন তিনি মোট উনিশ দিন অতিবাহিত করেন এবং তখনই নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর জীবন। পীড়িত নজরুলের শয্যাপাশে অনুক্ষণ অবস্থান করেন দুলী। নতুন করে প্রেমরসে সিক্ত হলো কবির মন। এরই ফলে বার বার নজরুল ছুটে এলেন কুমিল্লায়। শেষ মিলনে বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত প্রেম শান্ত হলো। তাই তাঁর রচনায় দুলী সম্পর্কে উচ্ছ্বাস নেই। 'দোলনচাঁপা' কাব্য গ্রন্থের ১. দোদুল দুল ২. ব্যথাগরব ৩. উপেক্ষিত ৪. সমর্পণ ৫. চপল সাথী ৬. পূজারিণী ৭. মুখরা ৮. সাধের ভিখারিণী ৯. কবি রাণী ১০. আশা ১১. শেষ প্রার্থনা—এ এগারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে 'দুলী' বিষয়ক কবিতা সংখ্যা ছয়, ১. মনের মানুষ ২. বিজয়িনী ৩. প্রিয়ার রূপ ৪. চিরচেনা ৫. শায়ক-বেঁধা পাখী, ৬. যুদ্ধবাদল।

এছাড়া 'ছায়ানটের' 'চিরন্তনী প্রিয়া' কলিকাতা ঃ ভাদ্র ১৩২৮ এবং 'আলতা স্মৃতি' বহরমপুর জেলা ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৩১ এ দুটি কবিতা দুলীকে কেন্দ্র করেই রচিত।

'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে মোট ৫টি কবিতা দুলীকে নিয়ে রচিত। বিবাহ-পূর্ব রাগবিরাগের, প্রণয়খেলার, আশা-নিরাশার চিত্র ফুটে উঠেছে এ কবিতাগুলোতে। এগুলো হলো ১. ফুলকুঁড়ি ২. প্রণয় নিবেদন ৩. মানিনী ৪. আশা এবং ৫. গৃহ-হারা।

তৃতীয় ঃ কুমিল্লায় রচিত দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছে সাতটি ঃ ১. প্রলয়োল্লাস ২. জাগরণী ৩. বন্দী-বন্দনা ৪. বন্দনা গান ৫. মরণ-বরণ ৬. পাগল পথিক ৭. হেমপ্রভা।

চতুর্থ ঃ কুমিল্লায় নজরুল শিশু বিষয়ক কবিতা রচনা করেন পাঁচটি ঃ পরে 'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থে এগুলো স্থান পেয়েছে ১. মা ২. খোকার বুদ্ধি ৩. খোকার গপ্‌প বলা ৪. খুকী ও কাঠবিড়ালী ৫. চিঠি।

পঞ্চম ঃ কুমিল্লায় কবি নজরুল প্রকৃতিকে দেখেছেন এক মনোময় দৃষ্টিতে। গোমতীর তীরে বসে প্রকৃতিকে অবলোকন করেছেন দিনের পর দিন। তাই তিনি লিখলেন, ১. নীলপরী ২. পউষ ৩. সবুজ শোভায় ঢেউ খেলে যায়, এবং ৫. লাল ন'টের ক্ষেতে।

ষষ্ঠ ঃ নজরুল কুমিল্লায় বসে ২৩শে জুন ১৯২১ সালে বিকেলবেলা আলী আকবর খানকে একখানা চিঠি লিখেন এবং ১৯৩৭ সালে ১ লা জুলাই নার্গিসের চিঠির জবাব

হিসেবে ষোল বছর পর কলকাতা থেকে একখানা চিঠি লিখেন। এমন কি নজরুলের বিখ্যাত গানটিও শৈলজানন্দের অনুরোধে নার্গিসকে স্মরণ করে লিখিত হয়।

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তা'রে?
ভুলে যাও তা'রে ভুলে যাও একেবারে।
আমি গান গাহি আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে
আলেয়ার মত ডাকিও না আর
নিশীথ-অন্ধকারে।
দয়া কর, মোরে দয়া কর আর
আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা,
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই
শুভ লগনের বেলা।
আমি ফিরি পথে পথে, তাহে কার ক্ষতি,
তব চোখে কেন সজল মিনতি,
আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে'
দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে ॥
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে ॥

নজরুল-জীবনে নার্গিস

প্রথমেই নার্গিসের পরিচয় দে'য়া যাক। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাস্থ এক পল্লীগ্রামের নাম দৌলতপুর। কুমিল্লা শহর থেকে বর্তমানে মোটর যান বা মিনিবাসে উপজেলা সদরে পৌঁছে গ্রীষ্মকালে হেঁটে এবং বর্ষায় নৌকায় ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে নিতান্তই একটি গ্রাম দৌলতপুর। গ্রাম হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর।

দৌলতপুরের খাঁ পরিবার বর্ধিষ্ণু এবং বনিয়াদি। শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী, আর্থিক স্বচ্ছলতাও যথেষ্ট। বাড়ীতে দালান কোঠা রয়েছে, পুকুরে শান-বাঁধানো ঘাটও আছে।

> বাগবাগিচা আছে। দক্ষিণ দুয়ারী বাড়ী। পূর্বে বিরাট পুকুর। সামনে সবুজ শোভার মাঠ। এ বাড়ীর লোক আলী আকবর খান। বাড়ীর সামনে ছিল সরকারী সাহায্যকৃত একটা উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়।
>
> বাড়ীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছিল বৈঠকখানা ঘর। ঘরখানা ছিল চৌচালা, ছনের ছাউনি, আর বাঁশ বেতের নিপুণ কাজ করা চৌদিকের বেড়া। অতিথি অভ্যাগতদের থাকবার ঘরও এটা। [কুমিল্লায় নজরুলঃ এম, এ, কুদ্দুস–পৃঃ৫]

উক্ত খাঁ বাড়ীর আলী আকবর খান তৎকালে বিএ পাশ শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি কলকাতায় থাকতেন এবং পুস্তক ব্যবসা করতেন। আলী আকবর খান সম্বন্ধে মুজফফর

আহমদের মন্তব্য হচ্ছে,

আলী আকবর খান দাম্ভিক, মিথ্যাভাষী ও শঠ।[১৩]

তাঁর তিন বোন। আসমতুন নেসা, এখতারুন্নেসা এবং কমরুন্নেসা। এখতারুন্নেসা নিঃসন্তান বিধবা ছিলেন। বড় বোন আসমতুন নেসার মেয়ের নাম সৈয়দা খাতুন। সৈয়দা খাতুনের পরবর্তী নাম নার্গিস আসার খানম্।

নার্গিসের পিতার নাম মুন্সী আবদুল খালেক, মায়ের নাম আসমতুননেসা, বড় ভাইয়ের নাম মুন্সী আবদুল জব্বার, অন্য দুই ভাইয়ের নাম আবদুস সামাদ ও আবদুর রহিম। তার বড় বোনের নাম ওয়াজেদা খাতুন। নার্গিসের পারিবারিক নাম সৈয়দা খাতুন আর নজরুলের দে'য়া নাম নার্গিস আসার খানম, সংক্ষেপে নার্গিস। বাড়ী দৌলতপুর গ্রামেই। (কুমিল্লায় নজরুলঃ এম, এ, কুদ্দুস, পৃঃ ১২)।

'নার্গিস' নামটি আজ বাস্তবে ও সাহিত্যে সমধিক পরিচিত। যে সময়ের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ১৯১৯-২০, তখন নার্গিস কিশোরী বালিকা। পল্লীগ্রামের সহজ, সরল সাধারণ একটি মেয়ে।

একবার আলী আকবর খান নজরুল ইসলামকে তাঁর দেশের বাড়ী দৌলতপুর আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এ আমন্ত্রণ– কারো মতে গোপনে এবং কারো মতে প্রকাশ্যে দেওয়া হয়েছিল। যেভাবেই দেওয়া হোক নজরুল এ আমন্ত্রণে সাড়া দেন বিনা দ্বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুজফফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন যে, আলী আকবর খানের প্রস্তাবে দৌলতপুর যাওয়া যায় কিনা এ প্রসঙ্গে নজরুল তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাতে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা হলো,

দেখ ভাই আমার পরামর্শ যদি শুনতে চাও তবে তুমি কিছুতেই আলী আকবর খানের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে যেও না । তিনি অকারণে অনর্গল মিথ্যা কথা বলে যান, যেন অভিনয় করছেন এই রকম একটা ভাব তাঁর কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সর্বদা প্রকাশ পায়। কি মতলবে তিনি তোমায় তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান তা কেউ জানেন না। তিনি তোমাকে একটা বিপদেও ফেলতে পারেন।[১৪]

কারণ, আলী আকবর খানের চলাফেরা, কথাবার্তা এবং চালচলন মুজফফর অহমদ কখনো সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কাজেই তাঁর পরামর্শ প্রায় বাধা দেওয়ার মতোই হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের অজ্ঞাতে ১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের (১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিল) কোন একদিন ভোর বেলাকার চট্টগ্রাম মেইলে নজরুল আলী আকবর খানের সাথে কুমিল্লা চলে আসেন। মুজফফর আহমদের ভাষায়,

সে যে আলী আকবর খানের ফাঁদে পড়বে একথা আমি বুঝেছিলাম। নজরুল তখন

বাইশ বৎসরের যুবক। যত সব অদ্ভুত ধরনের লোকের দ্বারাই নজরুল সহজে আকর্ষিত হতো। সে জানত আলী আকবর খান দাম্ভিক, মিথ্যাভাষী ও শঠ। এসব জেনেও সে তাঁর আকর্ষণ এড়াতে পারল না। সে কিছুই গভীরভাবে বুঝতে চাইল না। কিন্তু আলী আকবর খানের সব কিছু ছিল সুপরিকল্পিত।[১৫]

কুমিল্লায় নজরুল ইসলামের খুব আদর-আপ্যায়ন হয়েছিল। আলী আকবর খান পূর্বেই তাঁদের আগমন সংবাদ গ্রামে জানিয়েছিলেন। মুন্সী আবদুল জব্বার লিখেছেন, লোক পাঠান অভ্যর্থনার্থে। ঐ যে আসতেছে দুইজন সাহেবী ধরনের পোষাক পরিধানে, যেন দুই ইংরেজের বাচ্চা।গ্রামের ভদ্রলোক হিন্দু, মুসলমান, যুবক, কিশোর ছেলেমেয়ে খাঁ বাড়ীতে ভর্তি।'—১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের ২০ (?) তারিখের অপরাহ্ন বেলা তারা পৌঁছলেন দৌলতপুরে।

প্রাথমিক আদর আপ্যায়নের পর পরিচিতি ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। একে অন্যের জানাজানি হল। চল্‌ল গান, বাজনা। গাইয়ে ও বাজিয়ে,

> হিন্দু বাবুদের ঠমক ভাঙল। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল তারা আসলে হারমোনিয়মে বাজনা টাজনা কিছুই ভাল জানে না। আসলে হৈ-চৈ মাত্র।[১৬]

মুন্সী জব্বার আরো লিখেছেন,

> দুপুরের পর হতেই খাঁ বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম ধারে বিরাট একটা গাব গাছ, তার ছায়া প্রায় আধখানা জমি জুড়ে পড়ে, সেই ছায়ায়–লোকজন শ্রোতাগণ আসতে আরম্ভ করে।..... এই স্থান লোকে লোকারণ্য হয়। কবি গান গেয়ে তাদের বিমোহিত করেন।..... যুদ্ধের তালে তালে হাত পা সঞ্চালন— এভাবে প্রতিদিন বৈকালে রং-বেরংয়ের খেলা দেখিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন।[১৭]

আলী আকবর খানের বড় ভাই নেজামত আলী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> ঝাকড়া চুল ছিল নজরুলের। সারাদিন হাসি খুশীতে মেতে থাকতেন। অন্যান্যদের মজিয়ে রাখতেন... সব কিছু এখনও চোখে ভাসে। কবি প্রাণ খুলে গান গাইতেন, হেসে খেলে বেড়াতেন। শুধু বাড়ীতেই তা সীমাবদ্ধ থাকত না। গ্রামের ছেলেমেয়েকেও কবি জোর করে ধরে গান শেখাতেন। দু'তিনটি মেয়েকে তিনি নাচ শিখিয়েছেন ঝুমুর পায় দিয়ে। তিনি নিজে গাইতেন হারমোনিয়ম বাজিয়ে আর মেয়েদের নাচতে দিতেন। অবশ্য সবই চলত ঘরের ভিতর।... কখনো কখনো আবার জোৎস্না রাতে একমনে পুকুর পাড়ে গাছের নীচে বসে বাঁশীতে সুর তুলতেন। গ্রামের ছেলে বুড়োরা এসে নীরবে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করতো। বৈঠকখানা ঘরের পাশে আছে প্রকান্ড একটা আমগাছ। তার নীচে বসেই সাধারণতঃ তিনি বাঁশী বাজাতেন।....... কবির সবচেয়ে আনন্দের ছিল পুকুরের শান্ত পানিতে সাবান দিয়ে স্নান করা। সাবান মাখতে শুরু করলে অনেকক্ষণ ধরে তা চলতো। আর নেমেই সাঁতার কাটা ছাড়াও এপাড়ে ডুব দিয়ে ওপাড়ে ভেসে ওঠা।... এভাবে দীর্ঘক্ষণ কাটাতেন তিনি পুকুরে প্রায় প্রতিদিন। ওদিক বাড়ীতে ভাত নিয়ে বসে থাকতেন কবির অপেক্ষায় খান সাহেবের বড় বোন। বিরক্ত হলেও তাগাদা দিতেন না। ভাত আগলে বসে থাকতেন মায়ের মত।[১৮]

নজরুল ইসলাম দৌলতপুরে এসে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি কবিতা লিখতেন এবং গান রচনা করে নিজে সুর দিতেন, গান গাইতেন, সেজন্য গ্রামের কয়েকজন গায়কের সাথে হৃদ্যতা জন্মেছিল। তাঁদের মধ্যে জনার্দ্দন দত্ত, সাদত আলী মাস্টার, জলধর মাস্টার, জমিরউদ্দিন (গাবুদ্দিন) অন্যতম।

স্থানীয় এক মৌলবী মকতুল হোসেন ওরফে বেঙ্গু মৌলবী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> সাঁতার কাটতে কাটতে গান গাওয়া ছিল তার (নজরুলের) সখ। মনে হত যেন দুরন্ত ছেলে।..... হারমোনিয়ম তিনি এমন করেই বাজাতেন যে তখন তাঁকে যাদুকর বলেই মনে হত।..... এমন বাজনা আর শুনি নাই।....... মাটির মানুষ বাঁশের বাঁশীকে এমন করে বাজাতে পারে তা আগে জানতাম না। তাঁর বাঁশীর সুর লহরী আজও যেন আমার কানে বাজে। আজও যেন পুকুর পাড় থেকে ভেসে আসে সেই সুর। কৃষ্ণের স্থান ছিল কদম তলায় আর নজরুলের স্থান আম্রতলে। [১৯]

সাঁতার কাটা যে নজরুলের প্রিয় ছিল, তা তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসে সুন্দরভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে।

দৌলতপুরে নজরুলের অবস্থানকাল দু'মাসের উর্ধে। এ অবস্থান অধ্যায়টি প্রেম পুলকে অভিষিক্ত। আলী আকবর খানের বাড়িতে তাঁর আন্তরিকতা এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, তা স্নেহের বাঁধন প্রীতি প্রেমের পরশে এক অভিনব রূপ নেয়। এবং তখনই আলী আকবর খানের ভাগিনী সৈয়দা খাতুনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠে। নজরুল প্রকৃত অর্থে তাঁকে ভালবেসে ফেলেন। কিন্তু বাড়ীর যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, দুনিয়াদারীতে অভিজ্ঞ, তারা উড়ে এসে জুড়ে বসা ছন্নছাড়া, হৈহুল্লোড়ে মেতে থাকা অদ্ভুত স্বভাবের যুবকটিকে, বিশেষ করে নার্গিস নজরুলের প্রণয় সম্পর্কিত বিষয়কে ভাল চোখে দেখে নাই। কিছুটা বরং রুষ্টও হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্বান গ্রাজুয়েট ভাইয়ের মতের বিরুদ্ধে জোর করে কিছু বলেন নাই। সে সম্পর্কে অধ্যাপক বদরুল হাসান লিখেছেন,

> অনেকে এই প্রেম ভাল চোখে দেখেননি। কারণ নজরুলের বাঁধনহারা ভাব তাঁর পরিবারের গুরুজনদের চোখে তাচ্ছিল্যের কারণ ছিল। সম্প্রতি নেজামত আলী খান একথা অকপটভাবেই স্বীকার করেছেন।' (সাপ্তাহিক লালমাই, কুমিল্লা, ১লা জুন ১৯৬৯।)[২০]

নার্গিসের সাথে নজরুলের পরিচয় সূত্রটি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। আলী আকবর খানের জ্যেষ্ঠ ভগ্নিকে বাড়ীর নিকটেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের অবস্থা ততটা স্বচ্ছল ছিল না। গরীব হওয়ার কারণে ভাইদের বাড়ীতে ততটা আদৃতা ছিলেন না। সে সময় নজরুলের আগমন উপলক্ষে তিনি (বোন) সকন্যা ভাইদের বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াত করতে লাগলেন। নজরুল তখন কবিতাও লিখছেন, গান রচনা করে গেয়েও

মাতিয়ে তুলেছেন। কোনো কোনো রাত্রে বাঁশীও বাজাতেন। একদিন নার্গিস নজরুলকে বললেন, 'গত রাত্রে আপনি কি বাঁশী বাজিয়েছিলেন? আমি শুনেছি।' এভাবেই পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা এবং মন দেয়া নেয়া চলছিল। যদিও বয়োজ্যেষ্ঠরা বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, আলী আকবর খান তাঁর পরিকল্পিত ঘটনার জাল বিস্তার করতে লাগলেন। তিনি নজরুলের প্রকৃতি জানতেন। স্নেহও করতেন। তাঁদের একজন হয়ে নজরুল প্রতিষ্ঠা পাক এটাও তিনি চেয়েছিলেন। সেজন্য প্রথমে আলী আকবর খানের ভাই ওয়ারেছ আলী খানের মেয়ে হেনাকে নজরুলের সাথে বিয়ের প্রস্তাব করে ব্যর্থ হন। যেহেতু নজরুলকে তাদের একজন করা চাই—তাই আলী আকবর খান নিজের ভাগিনী নার্গিসকে নিজের বাড়ী নিয়ে আসেন এবং পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের ব্যবস্থা করেন। তখনকার সময়ে নজরুলের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে মুন্সী আবদুল জব্বার বলেছেন,

> কিছুদিন পরে শুনিতে পাইলাম, কাজী নজরুল ইসলাম কাকেও পছন্দ করে না, মাত্র একটি মেয়ে তার পছন্দ হইয়াছে।... ঐ দিকে কাজী সাহেবের চিন্তার বিরাম নাই। এরূপ ফুটফুটে মেয়ে এ যাবত খাঁ ভবনে দেখি নাই।..... কাজী এই মেয়ে দেখে পাগল প্রায়।
>
> অন্যদিকে আলী আকবর খান বড় বোন নার্গিসের মাকে যেয়ে বলেছেন, 'ভাগিনীকে আমরা বিবাহ দিব।.... আমাদের বাড়ীর একটি মেয়েও এই পাত্রের পছন্দ হয় নাই। তোমার মেয়েকে পাত্র পছন্দ করেছে। বর্তমানে যে কোন উপায়ে এই কাজীকে আটকিয়ে রাখতেই হবে। এই কাজী নজরুল ইসলাম পৃথিবী বিখ্যাত এক দার্শনিক কবি হইবে।.... তাহার নমুনা আমরা পাইয়াছি। তাহাকে হাতছাড়া করা যায় না।....তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিলে ভবিষ্যতের জন্য একটা পথ আবিষ্কার হইতে পারে, তাহাতে সারা জীবনে সুখে থাকিতে পারিবে।'

মুন্সী সাহেবের এই সব কথায় খান সাহেবের মনের কথাগুলিই প্রকাশ পায়। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা ছিল নার্গিসের ছোট এবং কম সুন্দরী। আর নার্গিস ষোড়শী সুন্দরী, নজরুলের মন জয় করতে সক্ষম। মুন্সী সাহেব বলেছেন (১৩-১২-৭২) তার বয়স তখন ২৮। ছোট ভাই রহিম ১২ বৎসরের ছোট আর নার্গিস রহিমের দু'বছরের ছোট। তাতে দেখা যায় নার্গিসের জন্ম ১৯০৪/১৯০৫ সালে এবং তখন তার বয়স (১৯২১ মে-জুন) ষোলর কাছাকাছি বা ষোল। নজরুলের মত দিব্যকান্তি সুপুরুষ সুগুণ সম্পন্ন যুবকের প্রতি তন্বী তরুণী সহজেই আকৃষ্ট হবে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। প্রণয় অভিনয়ের প্রতিউত্তর দিবে তাতে সন্দেহ কি? আর যখন তা অভিভাবকদেরও অভিপ্রেত।[২১]

নার্গিসের সাথে নজরুলের বিয়ের কথাবার্তা স্থির হয়ে গেলে আলী আকবর খান মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। মেয়েটি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য পড়াশোনা করেছিল, নজরুলের উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে খান সাহেব ভাগ্নীকে

হাতে কলমে শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

বিয়ে ঠিক হওয়ার পর নজরুল ইসলাম কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লিখে জানান। নজরুলের একখানা চিঠি পেয়ে সুসাহিত্যিক পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২১ সালের ৫ই জুন তারিখে তার উত্তরে লেখেন,

> ভাই নুরু,
> এইমাত্র তোর চিঠিখানা পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। কারণ এই সুদীর্ঘ দিনগুলো কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়েই না তোর চিঠির প্রতীক্ষা ক'রে আসছিলুম।.......
> যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তা'কে বরণ ক'রে নিয়েছিস্, তখন অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর বয়েস আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ, feeling-এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশী। কাজেই ভয় হয় যে, হয়ত বা দু'টা জীবনই ব্যর্থ হয়! এ-বিষয়ে তুই যদি conscious, তা'হলে অবশ্য কোনো কথা নেই। যৌবনের চাঞ্চল্যে আপাতঃ মধুর মনে হলেও ভবিষ্যতে না পস্তাতে হয়। তুই নিজে যদি সব দিক ভেবে 'চিন্তে' বরণ করাই ঠিক ক'রে থাকিস, তা হলে আমি সর্বান্তঃকরণে তোদের মিলন কামনা করছি।....
>
> বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে? কবে? সত্বর পত্র দিস্।

এই জওয়াবের জের টেনে পবিত্র বাবু ১৩২৮ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে নজরুলকে আবার লেখেন,

> ভাই নুরু,
> যাঁকে পেয়েছিস্ তিনিই যে তোর 'চির-জনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী' একথা সত্যি যদি এতটুকু সত্য হয়, তা হলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যই ঈর্ষা হচ্ছে। অবশ্য ইংরেজী ফরাসী উপন্যাসে এরূপ নায়ক-নায়িকার সঙ্গে ঢের পরিচয় হয়েছে; কাজেই তোর এ-কথা আমি সত্যি ব'লে মেনে নিতে গররাজী নই!... তোর বিয়েটা আমাদের একটা গল্পের প্লট হবে, এতে আর আশ্চর্য কি! লিখেছিস্ঃ 'এক অচেনা পল্লী-বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোন নারীর কাছে কখনও হইনি।'...তোর বিয়েতে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে যে আমার কত প্রবল, তা জানিয়ে কোন লাভ নেই। ...তুই যে এরূপ একটা আজগুবি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবি, তা সকলে আমরা জানতুম।

স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'মোহাম্মদী অফিস' ২৯, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা' থেকে ১৩ই জুন ১৯২১ তারিখে এক পত্রে নজরুলকে লেখেন,

> অভিন্নহৃদয়েষু,
> ভাই নজরুল, আপনার ৭ই তারিখের স্নেহমাখা চিঠিখানা আজ বিকালে পেয়ে কয়েকবার পড়েছি, আর অশান্তির মধ্যেও খুব হেসেছি।.....
> নিভৃত পল্লীর যে কুটিরবাসিনীর (দৌলৎপুরের দৌলৎখানার শাহজাদী বলাই বোধ হয় ঠিক, না?) সাথে আপনার মনের মিল ও জীবনের যোগ হয়ে গেছে, তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আদাব জানাবেন।..... আমার বোধ হয় আপনার বন্ধুরা

অসন্তুষ্ট হয়েছেন একটা কারণে। আপনি 'নারায়ণে' 'দহন-মালা' লিখে নারীর কাছে ক্ষমা চাইলেন; তারপরেই এত সত্বর প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়লেন। ' যৌবনের জোয়ার' বড় সাংঘাতিক; তাকে ঠেলে রাখা বড় দায়-এ আমি স্বীকার করছি।

মুজফ্‌ফর আহমদ, ৫১নং মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে নজরুলকে এক পত্রে লেখেন,

ভাই কাজী সাহেব,
ইতিমধ্যে আপনার কোনো পত্রাদি পাইনি। ওয়াজেদ মিয়ার চিঠিতে জানলুম যে, ৩রা আষাঢ় তারিখেই আপনাদের বিয়ে হচ্ছে।... সময় খুব সংকীর্ণ..... কাজেই আমার আর যাওয়া হচ্ছে না। তবে ভালয় ভালয় সব মিটে যাক্, এ প্রার্থনা আমি জানাচ্ছি খোদার দরগাহে।...... আমার আগের লেখা দু'খানা চিঠি বোধ হয় পেয়েছেন এতদিনে।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'মোহাম্মদী অফিস' থেকে ১৬ই জুন তারিখে নজরুলকে লেখেন,

ভাই নজরুল,
আপনার আগের চিঠিটার জওয়াব আগেই দিয়েছি।......আজ, এই কতক্ষণ হ'ল, রবিবারের চিঠিটাও পেলাম।.... আপনার বিয়ের খবরটা তাড়াতাড়ি এই সপ্তাহের কাগজে বের ক'রে দিয়েছি। কিন্তু ভয় নেই, আপনার শ্রীমতির কোনো নামই কাগজে ছাপা হয়নি।......'মোহাম্মদী' একখানা আপনাকে আজ পাঠিয়েছি।....আপনি শীগ্‌গীর কলকাতায় আসছেন শুনে সত্যি বড় খুশী হয়েছি।

মুজফ্‌ফর আহমদ ২১শে জুন তারিখে নজরুলের মামা-শ্বশুরকে এক পত্রে লেখেন,

খান সাহেব,
বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি, অবশ্য বিবাহ হইয়া যাওয়ার পরে। আগে পাওয়া গেলেও বোধ হয় স্ট্রাইকের জন্য যাওয়া তেমন সুসাধ্য হইত না।.... যাহা হোক, আশা করি ভালয় ভালয় শুভ কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

মুজফ্‌ফর আহমদ ২৬শে জুন তারিখে নজরুলকে এক 'অত্যন্ত গোপনীয়' পত্রে লেখেন,

পরম প্রীতিভাজনেষু,
কাজী সাহেব, আপনার পত্রাদি যে আর মোটেই পাওয়া যাইতেছে না, তার কারণ কি?....খান সাহেবের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলাম। পত্রখানা আপনারই মুসাবিদা-করা দেখিলাম। পত্রের ভাষা দু'এক জায়গায় বড় অসংযত হইয়াছে। একটু যেন কেমন দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। আপনার হাত দিয়া অমন লেখা বাহির হওয়া কিছুতেই ঠিক হয় নাই। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, খান সাহেবের সংস্রবে থাকিয়া আপনিও না শেষে দাম্ভিক হইয়া পড়েন। অন্যে বড় বলিলে গৌরবের কথা হয়, আর নিজেকে নিজে বড় বলিলে অগৌরবের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। 'মোহাম্মদী'কে বিবাহের কথা ছাপিতে অনুরোধ করাটা ঠিক হইয়াছে কি? তাঁরা ত নিজ হইতেই ও খবর ছাপিতে পারিতেন।... বাস্তবিক আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছে বলিয়া আমি এত

কথা বলিলাম। এই নিমন্ত্রণ পত্র আবার 'অপূর্ব নিমন্ত্রণ-পত্র' শিরোনামে 'বাঙালী'তে মুদ্রিত হইয়াছে, দেখিলাম। 'বাঙালী'কে এই নিমন্ত্রণ পত্র কে পাঠাইল?.... আপনার অঙ্কলক্ষ্মীকে এই অপরিচিতের বিনয় সম্ভাষণ জানাইবেন।[২২]

নজরুল-নার্গিসের বিয়ে ঠিক হয় ৩রা আষাঢ় ১৩২৮ সন। এ বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্রটি ছিল নিম্নরূপ,

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন–

'জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে,

এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।'

–রবীন্দ্রনাথ

এ বিশ্ব নিখিলের সকল শুভ কাজে যাঁর প্রসঙ্গ কল্যাণ, আঁখি অনিমিখ হয়ে জেগে রয়েছে..... তাঁর ঐ মহাকাশের মহাসিংহাসনের নীচে আমার মাথা নত করে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমার পরম আদরের কল্যানীয়া ভাগ্নী নার্গিস আসার খানমের বিয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশ বিখ্যাত পরম পুরুষ, আভিজাত্য গৌরবে পরম গৌরবান্বিত, আয়মাদার, মরহুম মৌলবী কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দেশ বিশ্রুত পুত্র মুসলিম কুলগৌরব মুসলিম বঙ্গের 'রবি' কবি সৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। বাণীর দুলাল দামাল ছেলে, বাংলার এই তরুণ সৈনিক কবি ও প্রতিভাবান্বিত লেখকের নতুন করে নাম বা পরিচয় দেবার দরকার নেই। এই আনন্দঘন চির শিশুকে যে দেশের সকল লেখক লেখিকা, সকল কবি যুবকেরা ভালোবাসা দিয়েছিলেন সেই বাঁধন হারা যে দেশমাতার একেবারে বুকের কাছটিতে প্রাণের মাঝে নিজের আসনখানি পেতে চলেছে, এর চেয়ে বড় পরিচয় তার আর নেই।

আপনারা আমার বন্ধু, বড় আপনার জন। আমার এ গৌরব, আমার এ সম্পদের দিনে আপনারা এসে আনন্দ করে আমার এ কুটির খানিকে পূর্ণ আনন্দ দিয়ে ভরাট করে তুলুন, তাই এ আমন্ত্রণ। ..... বিয়ের দিন আগামী ৩রা আষাঢ়, শুক্রবার নিশীথ রাতে।

আরজ
দৌলতপুর, ত্রিপুরা — বিনীত
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ বাং — আলী আকবর খান[২৩]

এ বিয়েতে যোগদান করার জন্য কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের গোটা পরিবারকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এ ব্যাপারে জানা যায় যে,

কুমিল্লা থেকে সেনগুপ্তের পরিবার দৌলতপুর নিমন্ত্রিত হোক–এ ব্যাপারে একা আলী আকবর খান উদ্যোগী ছিলেন না। জ্যেষ্ঠাগ্রজ আলতাফ আলী খানের উদ্যোগ ছিল।[২৪]

বিয়ের কথা হতেই নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীকে লিখেন,

মা, তুমি না এলে আমার পক্ষে তো কেউ থাকছে না। তোমাকে আসতেই হবে।

নজরুল-নার্গিসের বিয়ের ব্যাপারটা যেহেতু ছিল একটা চক্রান্ত। সেজন্য অচিরেই একটা অশুভ দিক ফুটে ওঠে।

> বিয়ের কথা স্থির হতেই আলী আকবর খান ভাগিনেয়ীকে নিয়ে পড়লেন। তাকে তো এর মধ্যেই গড়েপিটে দিতে হবে। তা না হলে এত বড় একজন কবির যোগ্য স্ত্রী সে কি করে হবে? অল্প কটি দিনের ভিতরে বেশী লেখাপড়া তাকে শেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেটা ছেলে হয়ে শহরের মেয়েদের মতো শাড়ী পরানোও তিনি তাকে শেখাতে পারতেন না। কুমিল্লা হতে নিমন্ত্রিতারা এলে সে কাজ তাঁরাই করতে পারবেন। নার্গিসের মন যাতে পরিণত হয় সেই চেষ্টাই খান সাহেব একান্ত ভাবে করতে লাগলেন। তিনি তাকে শরৎচন্দ্রের লেখা হতে ও অন্যান্য লেখকের লেখা হতে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ অংশসমূহ পড়ে শোনাতে ও বোঝাতে লাগলেন। গড়ন পিটনটা অতিমাত্রায় হয়ে যাচ্ছিল। নজরুলের মোটেই তা মনঃপুত ছিল না। কিন্তু তার বাগ্‌দত্তা ও আলী আকবর খান সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। আমার মনে হচ্ছে এ বিষয়ে নজরুল আলী আকবর খানকে লিখেও তার মনের কথা জানিয়েছিল।... খান সাহেবের বাড়ীর কর্ত্রী তাঁর যে দিদি তাঁর এসব বাড়াবাড়ি দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গ্রেজুয়েট ভাইয়ের উপরে কথা বলবে কে? নজরুল ইসলামের মন ভেঙে গেল, সে সম্পূর্ণরূপে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল এই বিয়ের ওপরে। এই ব্যাপারটি ছিল আলী আকবর খান ও তাঁর ভাগিনেয়ীর তরফ হতে নজরুলের উপরে চরম আঘাত ও অপমান।[২৫]

নজরুল-নার্গিসের বিয়েতে বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন—তার মধ্যে কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের ১০/১১জন। (মুজফ্‌ফর আহমদ ১০ জন এবং এম, এ কুদ্দুস ১১ জন উল্লেখ করেছেন)। এছাড়া বাঙ্গোরার জমিদার রায়বাহাদুর রূপেন্দ্র লোচন মজুমদার এবং বাঙ্গোরা হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবনীমোহন মজুমদার।

বিয়ের আয়োজন ঘটা করেই চলেছিল।

> আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গান বাজনার ধুমধাম চলে বিয়ের সাতদিন আগে থেকে। নহবতখানা তৈরী হয়েছিল। রামচন্দ্রপুরের তুফানী ছিল প্রধান বাদ্যকর। আর পাঁচকিত্তার শাহাবুদ্দিন ছিল বয়াতীদের সর্দার। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের ভাই বিখ্যাত বংশীবাদক আফতাবউদ্দিন খান ছিলেন বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পি অতিথি।[২৬]

বিয়ের ব্যাপারে নজরুলকে প্রথম যেরূপ আগ্রহী দেখা গিয়েছিল, বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে কয়েকটি ঘটনায় একেবারে তাঁর মন বিগড় যায়। শোনা যায় কাবিননামায় ২০,০০০ হাজার টাকা লিখা হয়েছিল এবং ঘরজামাই হয়ে থাকার (পঞ্চম সরা) শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। ঘরজামাই প্রসঙ্গটিতে স্বভাবতই নজরুলের পৌরুষে আঘাত লাগে। এ বিষয়টি কোন অবস্থায়ই তিনি সহজে মেনে নিতে পারেননি। সেজন্য হয়তবা এ বিয়ের পরিণতি শুভ হয়নি।

নজরুলের সাথে নার্গিসের প্রথাগত বিয়ে হয়েছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। মুসলিম বিয়ে সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন,

> প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া দরকার মুসলিম বিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ নয়, এটা নিতান্তই নারী-পুরুষের মধ্যে একটা চুক্তি বা কন্‌ট্রাক্টের ব্যাপার। ইংরেজীতে যে আমরা 'সিবিল ম্যারিজ' বলি এটা ঠিক তাই। কন্‌ট্রাক্টকে আরবী ভাষায় 'আক্‌দ' বা 'নিকাহ্‌' বলে। কন্‌ট্রাক্টের একটা পরিবর্ত (আরবী কথা ইবজ বা এওজ) থাকা আবশ্যক। এই পরিবর্ত হচ্ছে নারী-পুরুষের সহবাস, আনন্দলাভ এবং সন্তানোৎপাদনও। কিন্তু সন্তান না জন্মালে বিয়ে বাতিল হয়ে যায় না। বিয়ের কন্‌ট্রাক্ট একটি মজলিসে বসে সাক্ষীদের সামনে করতে হয়। মুসলিম বিবাহে একটা 'মাহর' বা স্ত্রীধন ধার্য হওয়া অপরিহার্য। এ স্বামীর নিকট হতে স্ত্রী পেয়ে থাকেন। এর অর্ধেক স্ত্রীর পক্ষ হতে দাবী করা মাত্রই দিতে হবে। বাকী অর্ধেক বিবাহ্‌ বর্তমান থাকা অবস্থায় শোধ দিতে হবে। কিন্তু বিবাহের কন্‌ট্রাক্ট হওয়ার পরে নারী-পুরুষের সহবাসের ভিতর দিয়ে তার পরিপূর্ণতা লাভ না হলে স্ত্রীর স্ত্রীধন প্রাপ্য হয় না। বিয়েটা যখন কন্‌ট্রাক্টের মারফতে হয় তখন যখন খুশী মুখের কথায় বিয়ে বাতিল করে দিতে পারেন। কয়েকটি ব্যাপারে স্ত্রীরা বিয়ে বাতিল করতে পারলেও তার জন্যে তাঁদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। জবরদস্তীর (coercion) ভিতর দিয়ে, তা সে জবরদস্তী পুরুষ কিংবা নারী যার ওপরেই হোক না কেন, কোনো বিয়ে হলে বিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অসিদ্ধ হয়ে যায়।[২৭]

মুজফ্‌ফর আহমদের বক্তব্য হচ্ছে,

> কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যে সৈয়দা খাতুন ওর্ফে নার্গিস বেগমের বিয়ে (আক্‌দ) হয়নি এ সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিন্ত হয়েছি। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসা হ'তে যে ক'জন নিমন্ত্রিত দৌলতপুরে গিয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে সন্তোষকুমার সেন নামক পনের ষোল বছর বয়স্ক একজন কিশোর ছিল।... অবশেষে সন্তোষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।... তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আলী আকবর খানও বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর মুসাবিদা করা কাবিন নামায় একটি শর্ত ছিল এই যে কাজী নজরুল ইসলাম দৌলতপুর গ্রামে এসে নার্গিস বেগমের সঙ্গে বাস করতে পারবে, কিন্তু নার্গিস বেগমকে অন্য কোথাও সে নিয়ে যেতে পারবে না। এই শর্ত নজরুলের গৌরবে বেধেছিল। তাই সে বিয়ে না করেই বিয়ের মজলিস হতে উঠে রাত্রেই পায়ে হেঁটে সে কুমিল্লা চলে যায়।[২৮]

এ বিয়ে-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিরজাসুন্দরী দেবী 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায় 'নৌকাপথে' যে প্রবন্ধটি লিখেন, তাতে তিনি বলেছেন,

> আমরা আ' খানের (আলী আকবর খানের) বাড়ী যাব শুনে সকলেই একটু অবাক হয়ে গেল। নৌকা নিতে না পেরে 'আ খান' হেঁটেই বাড়ী গেল, বাড়ী থেকে লোক নিয়ে এসে নৌকা ঘাটে টেনে নিয়ে গেল।... বাড়ীর ছেলে, বৌ, মেয়েরা সকলে এসে প্রণাম আলিঙ্গনাদি করতে লাগল। তাদের আদব কায়দা সম্মান দেখেও মনে বড় আনন্দ হ'লো... বাড়ীর মেয়েরা কেহই তেমন শিক্ষিতা নয়, 'আ'র (আলী আকবরের) মেঝ দাদাও খেত খামার দেখা নিয়েই থাকে, লেখাপড়ার চর্চা বড়

করেনা। এ ছেলেটি ও বৌরা এবং একটি বিধবা মেয়ে আছে, ঐ মেয়েটি বাড়ীর কর্ত্রী।....

আ' (আলী আকবর) আমার পুত্র 'বীর-র' (বীরেন্দ্রের) সহপাঠী,... সে আমাকে মা বলে এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তার জন্যই তার ভাগ্নীর (অতএব আমার নাত্‌নীর) বিয়েতে তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। মুসলমানের বিয়ে এই প্রথম দেখ্‌লাম। ওদের বিয়ে একদিনে হয় না, সেদিন হ'লো আমাদের পাকাকথার বা লগ্নাপত্রের মত.... বিয়েতো ত্রিশঙ্কুর মতন ঝুলতে লাগলো মধ্য পথেই, এখন আমাদের বিদায়ের পালা...এবার গোমতী দেবীকে উল্টো ঠেলে নিয়ে আসতে হলো বলে একদিনের রাস্তায় তিনদিন কাটিয়ে আমরা নিশি ভোরে কুমিল্লায় এসে পৌঁছুলুম।[২৯]

এবং বিবাহ আসর ছেড়ে নজরুল ঐ রাত্রেই পায়ে হেঁটে কুমিল্লায় চলে আসেন। বিরজাদেবী লিখেছেন,

৩রা আষাঢ় দিবাগত রাত্রে নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীর নিকট বিদায় নিতে এলো, বলল, 'মা, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।' ওই অবস্থায় তাঁকে ফেরানোর কোনো কথাই ওঠে না, নজরুলের মেজাজ সেই রকমের নয়। তিনি বললেন, 'তুমি বাইরের লোক, পথঘাট চেন না, এই রাত্রে একলা যাবে কি করে? যাবেই যদি তবে বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। সে তবু কুমিল্লায় জন্মেছে আর কুমিল্লায় মানুষ হয়েছে, এ দেশের লোকজনকে চেনে। আমাদের সঙ্গে তো উনি থাকলেন'। তাঁর স্বামীর কথা বললেন তিনি। শুধু আষাঢ় মাসতো ছিল না, পূর্ববঙ্গের অতিবৃষ্টির আষাঢ় মাস। পথঘাট গলে গিয়ে কাদাময় হয়ে যায়। সেই কাদা বিছানো পথে দশ এগারো মাইল পায়ে হেঁটে নজরুল আর বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত কুমিল্লায় এসে পৌঁছুলেন ৪ঠা আষাঢ় সকাল বেলা।[৩০]

রফিকুল ইসলামের অভিমত হচ্ছে,

দুর্ভাগ্যবশতঃ নজরুলের বিবাহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারেনি, এমনকি আদৌ তাদের বিয়ে পড়ানো হয়েছিল কি–না তাও নিশ্চিত নয়।[৩১]

এম, এ কুদ্দুস লিখেছেন,

নার্গিসের বড় ভাই মুন্সী আবদুল জব্বার বিবাহ পড়িয়েছেন।[৩২]

বেগম শামসুননাহার আহম্মদ 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' গ্রন্থে লিখেছেন,

দৌলতপুরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যার সঙ্গে বিদ্রোহী কবি নজরুল পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলো।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর 'নজরুলের আগে ও পরে' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের 'পত্নীগ্রহণের কথা' বলতে গিয়ে লিখেছেন,

কুমিল্লার এক মুসলিম পরিবারে তাঁর প্রথম বিবাহ। কিন্তু কোনো কারণে অল্পদিন পরে এই পত্নীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। (মাহেনও, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১)।

আবদুল কাদির লিখেছেন,

অতঃপর ৩রা আষাঢ় তারিখে দৌলতপুরে আলী আকবর খানের ভাগ্নী নার্গিস আসার

খানম সাহেবার সঙ্গে নজরুলের প্রথম বিবাহ্ সম্পন্ন হয়। দেখা যায় দৌলতপুরে 'আক্‌দ' হওয়ার পর নজরুল ১৯২১ সালের ২১শে জুন তারিখে কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড় থেকে এক পত্রে আলী আকবর খানকে লেখেন, বাকী উৎসবের জন্য যত শীগ্‌গীর পারি বন্দোবস্ত করব।[৩০]

এতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, নজরুলের সাথে নার্গিসের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বাসর ঘরে যাওয়া হয়নি, জীবনে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়নি। বিয়ে হয়েছিল বলেই নজরুল কুমিল্লা থেকে আলী আকবর খানকে চিঠি লিখলেন,

কান্দির পাড়, কুমিল্লা
23,June 1921
(বিকেল বেলা)

বাবা শ্বশুর!

আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার ক'রে এসে যা কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে, অবশ্য যদি আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে। এইটুকু মনে রাখবেন, আমার অন্তর-দেবতা নেহায়েৎ অসহ্য না হয়ে পড়লে আমি কখনো কাউকে ব্যথা দিই না। যদিও ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘা'টা বুঁজে গেছে, তবু সেটার অন্তরতম প্রদেশটা এখনো শিরীষ ফুলের পরাগের মতই কোমল আছে। সেখানে খোঁচা লাগলে আর আমি থাকতে পারিনে। তা ছাড়া, আমিও আপনাদেরই পাঁচজনের মতন মানুষ, আমার গন্ডাবের চামড়া নয়, কেবল সহ্যগুণটা কিছু বেশী। আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না বা 'কেয়ার' করিনি ব'লে, আমি কখনো এতবড় অপমান সহ্য করিনি, যাতে আমার 'ম্যানলিনেসে' বা পৌরুষে গিয়ে বাজে—যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ, হীন ভাবতে পারে। আমি সাধ ক'রে পথের ভিখারী সেজেছি বলে' লোকের পদাঘাত সইবার মতন 'ক্ষুদ্রআত্মা' অমানুষ হয়ে যাই নি। আপন জনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। বাবা! আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দোওয়া করবেন, আমার এ ভুল যেন দু'দিনেই ভেঙে যায়, এ অভিমান যেন চোখের জলে ভেসে যায়!

বাকী উৎসবের জন্য যত শীগ্‌গীর পারি বন্দোবস্ত করবো। বাড়ীর সকলকে দস্তুর-মতো সালাম-দোয়া জানাবেন। অন্যান্য যাদের কথা রাখতে পারিনি, তাদের ক্ষমা করতে বলবেন। তাকেও ক্ষমা করতে বলবেন, যদি এ ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা না হয়। আরজ-ইতি।

চির-সত্য স্নেহ-সিক্ত-
নুরু

বিয়ে হয়েছিল বলেই পরবর্তীতে নার্গিস নজরুলকে চিঠি লিখেছিলেন। নজরুলও 'প্রথম' ও 'শেষ' চিঠি বলে ষোল বৎসর পর পত্রোত্তরে লিখেছিলেন—

106 Upper Chitpur Road
"Gramophone-Rehearsal Room"
Calcutta 1 7 37

কল্যাণীয়াসু!

তোমার পত্র পেয়েছি সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারায় প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে' নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। যাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দিই।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখের শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্ত্তির কল্পনা ক'রে থাকো, তা হলে আমায় ভুল বুঝবে—আর তা মিথ্যা।

তোমার উপর আমি কোন 'জিঘাংসা' পোষণ করি না—এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি 'অগ্নিবীণা' বাজাতে পারতাম না—আমি 'ধূমকেতু'র বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত—মন্দারের মত চির-অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন—বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি। তুমি ভুলে যেও না, আমি কবি— আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের কাপুরুষের আঘাতের মত নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জান বা শুনেছ, জানি না) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই।

আমি কখনো কোন 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তার 'সেতু' কোন লোক ত' নয়ই—স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমায় বিশ্বাস করো 'আমি সেই ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। করলে পত্রোত্তর দিতাম না। তোমার উপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই, কোন অধিকারও নেই—আবার বলছি। আমি যদিও গ্রামোফোনের ট্রেড মার্ক 'কুকুরের' সেবা করছি, তবুও কোন কুকুর লেলিয়ে দিই নাই। তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমায় কামড়েছিল আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি—তাদের প্রতি আঘাত করিনি।

সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমায় কত ভালবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা তাদের ক্ষমা করেছিল। নৈলে তাদের চিহ্ন-ও থাকত না এ পৃথিবীতে। তুমি আমায় জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাওনি, তাই এ কথা লিখেছ।....যাক, তুমি রূপবতী বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি

স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন্ অধিকারে তোমায় বারণ করব–বা আদেশ দিব? নিষ্ঠুর সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

তোমার আজিকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয়বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।.... জীবন ভ'রে সেখানেই চলেছে আমার পূজা-অরতি। আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ; তাই তাকে পেতে চাইনে। জানিনে হয়ত সে রূপ দেখে বঞ্চিত হব, অধিকতর বেদনা পাব,—তাই তাকে অস্বীকার ক'রেই চলেছি।

দেখা? না-ই হ'ল এ ধূলির ধরায়! প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালবাস, আমাকে চাও, ওখানে থেকেই আমাকে পাবে। লায়লী মজনু'কে পায়নি, শিরী' ফরহাদকে পায়নি, তবু তাদের মত ক'রে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও পরম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার-কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাক, তা হলে তোমার মত ভাগ্যবতী কে আছে? তারি মায়া স্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। দুঃখ নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না। মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুল-রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোন ভুল ক'রে থাক জীবনে, এই জীবনেই তার সংশোধন ক'রে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ, মুক্তি; তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা কর, স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবু চলে গেছি এই সংসারের বাধাকে অতিক্রম করে' উর্ধ্বলোকে—যেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অপূর্ণতা, সকল অপরাধ ক্ষমাসুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা দেয়।.....

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দু'টি কর তোমার শুভ্র-সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কাল্‌কার কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না। কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল। সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।

যাক-আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে ভাটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করোনা। তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই থাকি, বিশ্বাস করো, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও–এই প্রার্থনা। আমায় যত মন্দ বলে বিশ্বাস কর, আমি তত মন্দ নই—এই আমার শেষ কৈফিয়ৎ। ইতি—

নিত্য শুভার্থী—
নজরুল ইসলাম

P. S.

আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিল। ইতি–

Gentleman

নজরুলের সুবিখ্যাত 'চক্রবাক' কাব্যের 'হিংসাতুর' কবিতাটির কয়েকটি চরণ এই,

হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে? দেখ নাই আর কিছু?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে, চেয়ে দেখিলে না পিছু?
ব্যথা যে দিয়েছে, সম্মুখে ভাসে নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলে না তব পশ্চাতে তারি অশ্রু-কাতর ছায়া।
অপরাধ শুধু মনে আছে তার, মনে নাই কিছু আর?
মনে নাই, তুমি দলেছ দু'পায়ে কবে কার ফুলহার?
কাঁদায়ে কাঁদিয়া সে রচেছে তার অশ্রুর গড়খাই,
পার হতে তুমি পারিলে না তাহা, সে-ই অপরাধী তাই?
সেই ভালো, তুমি চিরসুখী হও, এক সে-ই অপরাধী।
কি হবে জানিয়া, কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি?

উক্ত মহিলার রচিত 'কোনো পুস্তকে' নজরুল সম্বন্ধে বক্রোক্তি ছিল, সেদিকে আমি একদিন কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কবি ২৯.৩.২৮ইং তারিখে 'সওগাত' অফিসে বসে 'হিংসাতুর' কবিতাটি রচনা করেন। 'হিংসাতুর' ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ পত্রটিতে যে-সকল কথা বলা হয়েছে, 'হিংসাতুর'-এ আছে তারই অনবদ্য কাব্য-রূপ।[৩৪]

বিয়ে হয়েছিল বলেই ১৯৩২ সালে কলকাতায় তালাকনামা গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষর ও নজরুলের দস্তখতসহ সম্পাদনের প্রয়োজন হয়েছিল।

নজরুল ইসলাম বিবাহের রাত্রেই বীরেন সেনের সাথে রওয়ানা হয়ে ৪ঠা আষাঢ় কুমিল্লা শহরে পৌঁছলেন। এবং এখানে ১৭দিন থাকার পর ৮ই জুলাই ১৯২১ সালে মুজফ্ফর আহমদের সাথে কলকাতায় চলে যান। মূলতঃ নজরুল-নার্গিসের পর্ব এখানেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা যেখানে শেষ, প্রকৃত ঘটনার আরম্ভ ঠিক এখান থেকেই। কথা হলো নজরুলের সাথে নার্গিসের বিয়ে হলো ঠিকই, ঘর বাঁধা হলো না, দৈহিকভাবে কেউ কাউকে পেলো না এবং একসময়ে প্রথাগত বিচ্ছেদও ঘটে গেলো। কিন্তু নজরুল কি নার্গিসকে স্বাভাবিক জীবন-প্রবাহে ভুলতে পেরেছিলেন? গ্রাম্য কবি যদি নার্গিসের

উপেক্ষিত জীবনের বেদনার করুণ কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে গেয়ে ওঠেন,

বিয়ে অইল কবির সনে
আবার-
আমায় ছাইড়া গেল কেনে
সইলো, সই।
প্রাণ আমার কান্দে তাহার তরে
স্বামী আমার সারা হৃদয় ভরে,
আমায় যদি বাঁচাইতে চাও,
সোয়ামীরে আনিয়া দাও
সই, সইগো।[৩৮]

কবি ও গীতিকার নজরুল তাঁর কবিতায় ও গানে নার্গিসকে কিভাবে ধরে রেখেছেন, স্মরণ করেছেন, অতৃপ্ত প্রেমের জাগর অনুভব করেছেন, তা মূল্যায়ন করা অবশ্যই যুক্তিসংগত। কারণ, নজরুলের গানে আছে,

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও ভুলে যাও একেবারে।
আমি গান গাহি আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সমুখে
আলেয়ার মত ডাকিও না আর
নিশীথ অন্ধকারে।
দয়া কর, মোরে দয়া কর, আর
আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা,
শত কাঁদিলেও ফিরিবেনা সেই
শুভ লগনের বেলা।
আমি ফিরি পথে পথে, তাহে কার ক্ষতি,
তব চোখে কেন সজল মিনতি,
আমি কি ভুলেও কোনদিন এসে'
দাঁড়িয়েছি তব দ্বারে।
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে

শেষ কথাঃ আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, নজরুল ইসলামের জীবনালেখ্য মূল্যায়ন করতে হলে অবশ্যই কুমিল্লা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তা করা যাবে না। কারণ, তাঁর সামগ্রিক জীবনে কুমিল্লার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিকশিত নজরুল কুমিল্লার দান। নজরুলের মধ্যে যে বিদ্রোহী ও প্রেমের সত্তা বিরাজিত, তা কুমিল্লার পূণ্যভূমি থেকে উৎসারিত।

এ ব্যাপারে কুমিল্লাবাসী কিছুটা উদাসীন। তবু নজরুলকে স্মরণ করার জন্য, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ১৯৬২ সালে কান্দির পাড়-ধর্মপুর রাস্তাটির নামকরণ করা

হয়েছে নজরুল এভিনিউ। ছোটরায় স্থাপিত হয়েছিল 'নজরুল পাঠাগার'। ১৯৬৯-৭০ সালে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'নজরুল পরিষদ'। 'নজরুল পরিষদ' থেকে মরহুম সুলতান মাহমুদ মজুমদার রচিত 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জনাব মাহমুদ নজরুল ইসলামের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কুমিল্লা ও কলকাতায় তাঁদের অনেক স্মৃতিময় দিন অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় উদ্যোগীদের সহযোগিতায় 'নজরুল স্মৃতিরক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়। এ পরিষদ কুমিল্লায় নজরুল যেখানে যেখানে অবস্থান করেছিলেন, যেখানে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, যেখানে বসে গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন—তার স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া পরিষদ মরহুম মুহম্মদ আবদুল কুদ্দুস সাহেবের সম্পাদনায় 'আমি যাযাবর কবি' নাম দিয়ে কুমিল্লা, কুমিল্লার নার্গিস ও দুলী (প্রমীলা) বিষয়ক নজরুল যে সব কবিতা, গান, চিঠি ইত্যাদি রচনা করেছিলেন, তার সংকলন প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরের দৌলতপুর গ্রামে 'নজরুল একাডেমী' স্থাপিত হয়েছে, তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টাও রয়েছে। এ সবকিছু স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের উদ্যোগেই হয়ে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, নজরুলকে জানতে হলে, বুঝতে হলে এবং তাঁর কাব্য-গানের উৎস সন্ধান করতে হলে অবশ্যই কুমিল্লায় নজরুল স্মৃতি রক্ষা করা এবং মূল্যায়নে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রত্যাশা কুমিল্লাবাসীর, নজরুল গবেষকদের, তথা সমগ্র জাতির।

তথ্যনির্দেশ

* কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের এসব বক্তব্য একালে বিনা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য নয়। -স. ন. ই.প

* উক্ত তারিখটি আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন। ডঃ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়েছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর।

ক. কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ছাড়া অন্য কেউ আলী আকবর খান সম্পর্কে ঠিক এ-ধরণের মন্তব্য করেননি। –স. ন. ই. প.

ঘ. প্রখ্যাত নজরুল-গবেষক কবি আবদুল কাদির কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের এসব বক্তব্য যুক্তির আলোকে বাতিল করে দিয়েছেন। –স.ন. ই.প

১. কুমিল্লায় নজরুলঃ এম, এ, কুদ্দুস, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, কুমিল্লা। এ গ্রন্থের 'পরিচিতি' অংশ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২. ঐ।

৩. কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, –মুজফ্ফর আহমদ, তৃতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, মুক্তধারা, পৃঃ ৯৯।

৪. ঐ।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সাহিত্য–রফিকুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৮৯, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা। পৃঃ ৫৮–৫৯।

৬. কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা।

৭. কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা।

৮. কুমিল্লায় নজরুলঃ এম, এ, কুদ্দুস। পৃঃ ৫৬।

৯. ঐ পৃঃ ৭১।

১০. নজরুল প্রতিভার স্বরূপঃ আবদুল কাদিরঃ প্রথম প্রকাশ–পৌষ ১৩৯৫ (জানু ১৯৮৯), নজরুল ইনস্টিটিউট, পৃঃ ৩৩।

১১. কুমিল্লায় নজরুল–এম, এ কুদ্দুস। পৃঃ ১৩।

১২. আমি যাযাবার কবি–এম, এ কুদ্দুস, প্রকাশকালঃ আগস্ট ১৯৮৪, কুমিল্লা। পৃঃ ১১–১২।

১৩. কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা, মুজাফ্ফর আহ্‌মদ। মুক্তধারা, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৭। পৃঃ ১০২।

১৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২।

১৬. কুমিল্লায় নজরুল, পৃঃ ৬।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।

১৮. সাংবাদিক আতিকুর রহমানের নেয়া সাক্ষাৎকার। পূর্বদেশ, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯।

১৯. কুমিল্লায় নজরুল, পৃঃ ৭–৮।

২০ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩–১৪।

২২. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, আবদুল কাদির।

২৩. নজরুল পরিক্রমাঃ আবদুল আজিজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। কলিকাতা, পৃঃ ২১৭–২১৮।

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, পৃঃ ১১০।

২৫. পূর্বোক্ত, ১১০।

২৬. কুমিল্লায় নজরুল, পৃঃ ২০–২১।

২৭. কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা, পৃঃ ১১১–১১২।

২৮. পূর্বোক্ত।

২৯. নৌকা পথে ঃ বিরজা সুন্দরীদেবী। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। শ্রাবণ, ১৩২৯।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা।

৩১. কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও সাহিত্যঃ ড. রফিকুল ইসলাম। প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৯।

৩২. কুমিল্লায় নজরুল। পৃঃ ২১।

৩৩. নজরুল প্রতিভার স্বরূপঃ আবদুল কাদির। প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩৪. পূর্বোক্ত।

৩৫. কুমিল্লায় নজরুল।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — পঞ্চদশ সংকলন]

নজরুল ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : কিছু অজ্ঞাত প্রসঙ্গ

আবুল আহসান চৌধুরী

॥ ১ ॥

কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সুবিন্যস্ত জীবনী আজো লিখিত হয়নি। তাঁর বিস্তৃত ও প্রামাণ্য জীবনী-রচনার তথ্যোপকরণও সুলভ নয়। তবুও সন্ধিৎসু গবেষকের প্রয়াসে নজরুল-জীবনের নানা লঘু-গুরু তথ্য ও ঘটনা ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত-আবিষ্কৃত হচ্ছে। এ-সব তথ্য নজরুলের ব্যক্তিজীবন, শিল্পমানস ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে নতুন আলো ফেল্‌তে পারে। এমনই কিছু তথ্য-সংবলিত নজরুল-সুহৃদ্ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯০৫-১৯৬৩) একটি খাতা আমাদের হাতে এসেছে।[১]

॥ ২ ॥

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কল্লোল-যুগের একজন বিশিষ্ট লেখক। কথাশিল্পী, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বেতার ও চলচ্চিত্রের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। 'গল্পভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সবমিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দুইশত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে— মা (অনুবাদ, ১৯২৫, মূল ঃ ম্যাক্সিম গোর্কি), শেলী (জীবনী, ১৯২৮), মজার গল্প (১৯২৮), কুলী (অনুবাদ, ১৯৪৭, মূল ঃ মুল্‌করাজ আনন্দ), জনক-জননী (উপন্যাস, ১৯৪৮), সোনার ভারত (কিশোরপাঠ্য, ১৯৪৯), এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং (জীবনী, ১৯৫২), অবিস্মরণীয় মুহূর্ত (১৯৫২), নানাকথা (প্রবন্ধ, ১৩৭১), মহিয়সী মহিলা, সান ইয়াৎ সেন (জীবনী), শতাব্দীর সূর্য, শেক্সপীয়রের কমেডি, শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি (অনুবাদ, মূল ঃ মুলক্‌রাজ আনন্দ), এইচ. জি. ওয়েল্‌সের গল্প প্রভৃতি। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-কাব্যের যে গদ্যানুবাদ করেন তা বিশেষ সমাদৃত হয়।[২] সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি একসময় তিনি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। সিটি কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) আহ্বানে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুহৃদ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) বলেছেন, 'এক চোখে গাঢ় ভাবুকতা, অন্য চোখে আদর্শবাদের আগুন। এই আমাদের নৃপেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

চট্টোপাধ্যায়। সেযুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি।'[৩] এই 'রোমান্টিক', 'বিদ্রোহী' ও 'ভাবানুরাগী'র যৌবনের দিনগুলো কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। জীবিকার প্রয়োজনে 'নৃপেন টিউশানি করেছে, বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে।'[৪]

॥ ৩ ॥

বছর ছয়েকের বয়সের ফারাক সত্ত্বেও নজরুলের সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে উভয়ে হয়ে উঠেছিলেন আক্ষরিক-অর্থেই 'অভিন্নহৃদয় বন্ধু'। এই দু'জনের প্রথম পরিচয়ের সাক্ষ্য মেলে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৯৩-১৯৭৪) স্মৃতিকথায়। তিনি বলেছেন,

> যতীনদার [কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী] বাড়ির ... এক গানের আসর শেষ করে একদিন রাত সাড়ে দশটার পরে বেরিয়েছি আমরা তিনজন, আমি, নজরুল আর আফজাল ['মোসলেম ভারত' পত্রিকার পরিচালক আফজালউল হক]।
>
> দু'পা এগোতে না এগোতেই পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, শুনছেন! আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের সুদর্শন তরুণ। বললাম, আমাদের ডাকছেন আপনি ? তরুণ বললে, এ বাড়িতে কাজী নজরুল ইসলাম প্রায়ই আসেন শুনেছি। তিনি কি ভিতরে আছেন ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলুন তো ? তরুণ বললে, তাঁকে শুধু একবার দেখব। সেই সন্ধে থেকে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে। নজরুল ও আফজল ততক্ষণে ক-কদম এগিয়ে গেছে। আমি ডাকলাম, এই নূরু দাঁড়া। তারপর তরুণটিকে বললাম, ওই আগে, ঝাঁকড়া চুল, উনিই নজরুল।
>
> ওরা দাঁড়িয়ে গেল, আমরা দুজনে এগিয়ে তাদের কাছে গেলাম। নজরুলের সামনে গিয়ে যুবক বললেন, আপনি নজরুল ইসলাম ? বলেই হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
>
> ছেলেটিও চলল আমাদের সঙ্গে। ...বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের দরজায় এসে আমরা থামতেই তরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে — ? আমি বললাম, নজরুল ও আফজল এখানেই থাকে।
>
> দরজা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। ওরা তিনজন তখনো দাঁড়িয়ে।
>
> পরদিন আফজলের কাছে শুনলাম, সেই ছেলেটির সঙ্গে নজরুল অনেক রাত পর্যন্ত পথে পায়চারি করেছে। যে-কোনো সময় এসে হাজির হবার অনুমতিও দিয়ে রেখেছে নজরুল। ছেলেটির নাম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।[৫]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ'-এও আছে এই সাক্ষাৎকারের চমকপ্রদ বর্ণনা।[৬] বোহেমিয়ান, সংসার-নির্লিপ্ত, খেয়ালি ও উড়নচণ্ডী স্বভাবের সাদৃশ্যও উভয়কে কাছাকাছি টেনে এনেছিল।

নজরুলের সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতার পরিচয় নানা সূত্রে পাওয়া যায়। একবার মোহনবাগানের বিজয়-উপলক্ষে কলকাতার ফুটবল-মাঠ থেকেই আনন্দ-উন্মাদনায় নজরুল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১)- এই তিন বন্ধু শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চেপে সরাসরি ঢাকায় চলে যান বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) বাড়িতে।[৭] কিংবা নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামাল ওরফে কৃষ্ণ মহম্মদের 'আকিকা' উপলক্ষে তাঁর হুগলীর বাসায় নিমন্ত্রিত 'কল্লোলে'র দলের সঙ্গে সেখানেও ছিলো নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সরব উপস্থিতি।[৮] নজরুল-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের পত্রালাপের কোনো হদিস মেলেনি। তবে নজরুলের কিছু পত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের উল্লেখ মেলে।

নজরুলের নানা কর্মযজ্ঞেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের আন্তরিক যোগ ছিলো। বিশেষ করে নজরুল-সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩) সূত্রে জানা যায়,

> 'ধূমকেতু'র কল্যাণে অনেক নূতন নূতন লোকের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। অনেক সব নূতন বন্ধু নজরুল পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সেই সময়েই হয়েছিল নজরুলের প্রথম পরিচয়। ... ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের জীবন নিয়ে নৃপেন 'ধূমকেতু'তে লিখত। নিজের নাম দস্তখৎ করত ত্রিশূল। 'ধূমকেতু' বার করতে গিয়ে নজরুল যাঁদের নূতন বন্ধুরূপে পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে নৃপেন ছিল নজরুলের একটি বড়-পাওয়া।[৯]

অসুস্থ নজরুল-জীবনের পর্বেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ভূমিকার কথা জানা যায়। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে (৯ জুলাই ১৯৪২) নজরুলের আকস্মিক অসুস্থতার মুহূর্তেও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ জানিয়েছেন,

> অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর স্টেশনে বলতে গিয়ে নজরুল কিছুই বলতে পারছিল না। তার জিহ্বা কেবল আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিল। সে তখনই ঘোষণা করে দিল যে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রোগ্রামটি আর একদিন হবে। ... সেই রাত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ই কবিকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।[১০]

॥ ৪ ॥

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ নজরুল সম্পর্কে দু-চারটে হালকা প্রবন্ধ লিখলেও তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে বিষয়ে কোনো স্মৃতিচারণ করেননি, তা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অজানা কথা শোনার সুযোগ হতো। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের নানা-বিষয়ক খাতাটি খুব সামান্য হলেও সেই অভাব হয়তো পূরণ করবে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২২ সালে যখন কলকাতার সিটি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট (আর্টস্) ক্লাসের ছাত্র সেই সময়ের একটি খাতায় নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কিছু বিবরণ মেলে। '১০২ আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা'

ঠিকানাচিহ্নিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এই লাইন-টানা এক্সারসাইজ খাতাটি মূলত ডায়েরী ও কিছু কবিতা-গানের উদ্ধৃতির সংগ্রহ।'Leaves of Oak'- নামে ম্যাক্সিম গোর্কির রচনার কিছু উদ্ধৃতি, আর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দু-একটি রচনার প্রাথমিক খসড়াও এখানে আছে। খাতাটির মাত্র এক-চতুর্থাংশে আছে এইসব লেখা, অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো শূন্য। 'নিশীথরাতের বাতি' শিরোনামে সাতদিনের দিনপঞ্জি এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। একদিনের অসমাপ্ত ডায়েরি ইংরেজিতে লেখা। মাত্র দুদিনের ডায়েরিতে তারিখের উল্লেখ মেলে। অন্য দিনগুলোর ডায়েরিতে কেবল বার ও সময়ের উল্লেখ আছে। ইংরেজিতে লিখিত ডায়েরিতে তারিখ পাওয়া যায় —15.11.22 এবং শেষ দিনপঞ্জির তারিখ—১০ জানুয়ারি ১৯২৩। অন্য দিনলিপিগুলো ১৯২২ সালের নভেম্বরের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরির এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় আছে নিতান্তই কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ—প্রণয়-বিরহের রোমান্টিক আবেগমিশ্রিত অনুভূতির প্রকাশ। আছে সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও কিছু সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের কথা। সেই সঙ্গে নানা বিষয়ের কিছু টুকরো মন্তব্য। এখানে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অকাল-প্রয়াত বন্ধু সুকুমার ভাদুড়ি, 'মোসলেম ভারত'-পত্রিকার পরিচালক আফজালউল হক (১৮৯১-১৯৭০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ও কাজী নজরুল ইসলামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নজরুলের সূত্রে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) পুত্র আফজালউল হকের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের। খুব জমানো একটা সাহিত্যিক আড্ডার পরিবেশ রচিত হয়েছিল আফজালউল হকের কলেজ স্কয়ারে অবস্থিত গ্রন্থ-বিপণী মোসলেম পাবলিশিং হাউস্‌কে কেন্দ্র করে। প্রায় প্রতিদিনই দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হতো। ডায়েরির এক জায়গায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখছেন,

> আ—[আফজালউল হক] সঙ্গে রায় মশায়ের হোটেলে খাওয়া গেলো। ওকে মোসলেম ভারতটা চালাবার কথা বললাম—কেননা সে যাই করুক—সেইটা তার একটা ভিত্তি হবে—একটা ঠিক আঁকড়ে ধরতে পারবে।
>
> [তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার -রাত ১১টা]

এর পরের দিনের ডায়েরিতে পাওয়া যায় আফজালউল হকের অসুখের প্রসঙ্গ। সেই বিবরণ,

> ...আফজালের অসুখ হয়েছে — সে আমাকে ডেকেছে। তখনি সেখানে গেলাম। দেখি কাহিল হয়ে গেছে— গা হাত পায় বেদনা— টিপিতে [টিপে] দিতে বললো। তাই দিলাম। তারপর আবদুল এলো— বেলা হয়ে আস্‌বে দেখে আমি চলে এলাম সু-র [সুকুমার ভাদুড়ি] কাছে।
>
> [তারিখিবিহীন, ১৯২২, রবিবার, রাত ১২ টা]

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গ্রন্থ-প্রকাশের প্রসঙ্গেও এসেছে আফজালউল হকের কথা,

> আজ মনে হচ্ছে পূজোর ছুটীর মধ্যে গল্পগুলো সব লিখে প্রকাশের একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে। আফজালকে বললাম সব খুলে —সে বললো তো— নিশ্চয়ই

প্রকাশ করবে। [তারিখবিহীন, ১৯২২, বৃহস্পতিবার, রাত ১২-৩০]

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের স্নেহ-প্রীতির একটি গভীর সম্পর্ক ছিলো। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতি তিনি বিশেষ স্নেহশীল ও মনোযোগী ছিলেন। তাঁর কথা এসেছে এইভাবে,

> প্রমথদার [প্রমথ চৌধুরী] সঙ্গে কথা বলতে আজ প্রাণটা কেঁদে উঠ্‌ছে। কতদিন হলো—তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথা বলা হয়নি। আমার-নির্বুদ্ধিতা আমার-অজ্ঞতা আমার কত পতন-স্খলন-ত্রুটি তিনি কি সুন্দরভাবে সহ্য করেছেন!
>
> [তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার, রাত-১০-৩০]

এ-ছাড়া নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরিতে বিস্মৃত কয়েকজন সাহিত্যসেবীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ, 'স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে' টমাস আল্‌ভা এডিসন-প্রসঙ্গ, সাহিত্য সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

॥ ৫ ॥

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরির বেশ কয়েক জায়গায় কাজী নজরুল ইসলামের প্রসঙ্গ এসেছে, সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে। এ-সব উল্লেখে নজরুলের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা এবং নজরুলের প্রতি তাঁর অনুরাগ, প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় আছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনে নজরুলের প্রভাব ছিলো গভীর ও অপরিসীম। তাঁর কাছে নজরুল ছিলেন 'বন্ধু, দার্শনিক ও পথ-নির্দেশক'-এর মতো। ডায়েরির এক স্থানে তিনি তার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন,

> তারপর এলো আর এক মন্দির— বিশাল— সুবিশাল —অসংখ্য আরতিদীপ সেথা নিত্য জ্বলে—অনন্ত অসংখ্য যেখানে প্রাণের দান্—দেবতা সে আমায় ডেকে নিলো—বুকের কাছে—জীবনখানা তাকে ধরে দিলাম ভয়ে বিস্ময়ে প্রেমে শ্রদ্ধায় —সে দেবতা পুরুষ মূর্ত্তি..। [তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার, রাত ১১ টা]

ঐ একইদিনের ডায়েরীতে সরাসরি নজরুলের উল্লেখ মেলে এইভাবে,

> বিজয়ের আজ জ্বর হয়েছে; তাকে আজ আর পড়াতে যাইনি। কলেজ থেকে বরাবর ধূমকেতুকেন্দ্রে এলাম। দু'একটা লেখা দেখে-দুখানা ধূমকেতু নিয়ে আ-র [আফজালউল হক] সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। কাজী একখানা বিজ্ঞাপন দেখালো। রাণীগঞ্জে সে শক্তিদার বন্দোবস্তে রুদ্রমঙ্গল করছে। রুদ্র ওর মঙ্গল করুন।
>
> [ঐ]

নজরুলের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ডায়েরির এক-অংশে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখ্‌ছেন,

> আজ সকালে বঙ্গসাহিত্যের কতকগুলো অভাব লিখে রেখেছিলাম তাঁকে দেখলাম। তার সঙ্গে আমার সঙ্গে ঠিক মিল হয়ে গেলো!

[ঐ]

আর-একদিনের দিনপঞ্জিতে টুক্‌রো নজরুল-প্রসঙ্গ,

> আজ ভেবেছিলুম তালতলায় যাব—তা আজ যাওয়া হলোনা। সু-র [সুকুমার ভাদুড়ি] একজন বন্ধুর সঙ্গে কাজীর আলাপ করিয়ে দিলাম। সেখানে শুনলাম আফজলের অসুখ হয়েছে—সে আমাকে ডেকেছে।
>
> [তারিখবিহীন, ১৯২২, রবিবার, রাত ১০টা]

॥ ৬ ॥

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মনো-প্রকৃতির দিক দিয়ে নজরুল ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন সমানধর্মা। রোমান্টিক ভাবালুতায় দুজনেই সমান আচ্ছন্ন ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যে-আন্তরিক সম্পর্ক রচিত হয়েছিল তা হয়তো এই কারণেও স্থায়ী ও গভীর হতে পেরেছিল। যে তীব্র রোমান্টিক আবেগ ব্যক্তি ও শিল্পী নজরুলের চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য ছিলো, সেই একই বিশেষত্ব নৃপেন্দ্রকৃষ্ণেরও পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ডায়েরী থেকে কিছুটা নমুনা উদ্ধার করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন,

১. ওগো আমার যাত্রাপথের প্রথম সাথী —তোমায় প্রণাম! ওগো-নিষ্ঠুর প্রাণাভিরাম— তোমায় প্রণাম! একদিন এসেছিলে পথিকের পথের সাথী হয়ে— তোমায় তাই প্রণাম; পথিকের পথের গানে তুমি বিশ্রামের সুর দিয়েছিলে — তোমায় প্রণাম; একদিন শ্রান্ত পথিকের পাশে শান্তি হয়েছিলে— তোমায় প্রণাম; একদিন নিবিড় রাতে—বেদনার বসনখানি আমার উত্তরীয় করে দিয়ে গেলে— দানের আড়ালে লুকিয়ে গেলে দাতা— তোমায় প্রণাম! আমার জীবনে প্রণাম— আমার মরণে প্রণাম! হৃদিমন্দির বাসিনী তোমায় প্রণাম!

    [তারিখবিহীন, ১৯২২, শনিবার, রাত ১১ টা]

২. পথের বাঁকে দেখি একজন চাঁপাফুল বিক্রি করছে। ... বৃষ্টির জলের ছিটে লেগে একটা চাঁপাফুলের কুঁড়ি টুক্ করে ফুটে উঠলো! সে ফুলটা কিনলাম— দেবার জন্য —ওগো বল না কাকে ?... হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া এলো — পকেটে ফুলটা ছিলো —তার গন্ধটা নাকে এসে লাগলো! যার জন্য কেনা তাকে তো দিয়ে আসতে হবে। ... তাকে দিতে এলাম। সে তখন অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে—অন্ধকারে সে ফুলটা হাসছিলো —তার হাতে দিলাম — তারপর ঘরে সেই ফুল — তার গন্ধ — সে আর অন্ধকার রইল! আর আমি?

    [ঐ]

৩. না — না — ওগো তোমার কথা তো বলা হলো না। আজ যে বড় জ্বালা প্রাণে এসে বিঁধছে। এসো — ওগো তুমি এসো —পরশপাগল আজ শুধু একটীবার পরশ চায়। একবার তোমাকে রক্তাক্ত বুকে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌তে সাধ যায়— "ওগো —চাইনা তোমার বিশ্ব— আমি শুধু তোমাকেই চাই— দিনশেষে শুধু এমনি একবার পরশ দিয়ে যেও গো!"

[তারিখবিহীন, ১৯২২, রবিবার, রাত ১০ টা]

৪. যাই —যাই —গ্রহে গ্রহে তুমি আমায় ডেকেছ —নক্ষত্রে নক্ষত্রে আমায় চেয়েছ —অন্ধকারে আঁচল দুলিয়ে সারারাত জেগেছ —যাই —যাই; কতদিন আমার পথচলা সন্ধ্যারতির ধূপধূনার গন্ধে থেমে গেছে — দেখি তুমি আমায় ডাকছো —সন্ধ্যারতি দিয়ে —উন্মুখমালতী কুসুমে —দূরে স্নিগ্ধোচ্ছ্বাসবাহিনী পবনে— গাঢ় —সুগভীর ঐ অতল নীলের উতল বুকে! যাই —যাই —ক্রন্দনে তুমি ডেকেছ— ব্যথায় তুমি চেয়েছ —কন্টকে তুমি আমার আসন পেতেছ —... বেদনায় আমায় নিবিড়ে ঢেকেছ— আঘাতে আমায় পরশ দিয়েছ —ওগো যাই —যাই; বেলা গেলো সন্ধ্যা হলো —এপারের খেয়াতরী ওপারে গিয়ে লাগে —ওগো যাই— ওগো যাই! আমায় তুমি তোমার সন্ধ্যেবেলার খেয়াপারের শেষ পথিক করো গো। সারাদিনের লাভে আমার রিক্ত খেয়া বুকে বাজবে না; যেমন করে পারো শেষ খেয়া ওগো আমায়!

[তারিখবিহীন, ১৯২২, বৃহস্পতিবার, রাত ১২-৩০]

৫. সারাদিন ধরে সে তার জীবনের পাত্রখানি ভরে তুলতে চেয়েছিলো— কর্ম্মে-হাস্যে-সুখে-দুঃখে; বেলাশেষে কর্ম্মঅন্তে নিভৃতে দেখে পাত্র যে ভরেনি; এ শূন্য পাত্র তবে কি হবে গো আর?

[১০ জানুয়ারি ১৯২৩, রাত ১০ টা]

উপরে উদ্ধৃতি-উদাহরণে স্পষ্টই বোঝা যায়, নজরুলীয় রোমান্টিক চেতনার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের রোমান্টিক অনুভূতির জগৎকে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ডায়েরিতে বিবৃত প্রণয়ভিক্ষু মনের এই যে পরিচয় তা প্রকৃতপক্ষে নজরুলের স্বভাবের অন্তর্গত ছিলো।

তথ্য-নির্দেশ ঃ

১. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও মিশ্র রচনার এই খাতাটি শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র আফজালউল হকের অনুজ অবসরপ্রাপ্ত জেলা সব্-রেজিস্ট্রার এম. আশরাফউল হক সাহেবের (১৯০৯-১৯৯৩) সৌজন্যে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আফজালউল হক-সংরক্ষিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ফাইল ও কাগজপত্রের সঙ্গে খাতাটি ছিলো।

২. নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' (কলিকাতা, মে ১৯৭৬; পৃ. ২৭১) ও হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য সংকলিত 'বঙ্গসাহিত্যাভিধান' (২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯০; পৃ. ১৭৬-৭৭) গ্রন্থ থেকে।

৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ'। প-স. কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৭২. পৃ. ৩৮।

৪. ঐ; পৃ. ২২৮।

৫. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'চলমান জীবন'। প্রতিক্ষণ সংস্করণঃ কলিকাতা, বৈশাখ ১৪০১; পৃ. ৩১২-১৩।

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৯-৪১।

৭. ঐ; পৃ. ১৯৮।
৮. ঐ; পৃ. ৫৩।
৯. মুজফ্ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'। তৃতীয় মুক্তধারা সংস্করণ : ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; পৃ. ২৪৫।
১০ ঐ; পৃ. ৩৬৮।

সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ঊনবিংশ সংকলন]

নজরুলের বাংলা ভ্রমণ

সিকান্দার ফয়েজ

নজরুল বহুবার বাংলায় এসেছেন। তখন তো আর আজকের বাংলাদেশ ছিল না। ছিল পাক-ভারত উপমহাদেশ। ভারতবর্ষ আজকে আমরা যে বাংলাদেশের নাগরিক, যে দেশে বসবাস করছি— সে সময় এটি ছিল একটি প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে 'বাংলাদেশ' কথাটিই ব্যবহার করবো।

কবির জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এই বাংলাকে তিনি প্রচণ্ড রকম ভালোবাসতেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৪০ সাল। দীর্ঘ ২৬ বৎসর। এই ২৬ বছরে কবি নজরুল জীবনানন্দের রূপসী বাংলায় এসেছেন অন্তত ৩০ বার। এসেছেন, থেকেছেন। বাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। হয়তো সেই ভালোবাসার টানেই জীবনের শেষ সময়টুকু তিনি এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে কাটাতে পেরেছিলেন। হয়তো সে কারণেই নজরুল বাংলার বুকে চির-নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

নজরুল সর্ব প্রথম বাংলাদেশে আসেন ১৯১৪ সালে। তখন বাংলা ১৩২০ সন। সে সময় তিনি আসানসোলে আব্দুল ওয়াহেদ[১] এর রুটির দোকানে ময়দা মাখার কাজ করতেন। এখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ'র সাথে। তিনি কবির আগ্রহ দেখে শেষতক তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত.কাজীর সিমলা গ্রামে নিয়ে আসেন। অতঃপর নজরুলকে ত্রিশাল বাজারের নিকটবর্তী দরিরামপুর হাই স্কুলে ক্লাশ সেভেনে ভর্তি করে দেন।

নজরুল এই দরিরামপুরে এক বছর ছিলেন। সে সময় তাঁর ইংরেজি ক্লাশের শিক্ষক ছিলেন শ্রী মহিমচন্দ্র খাসনবীশ।[২] তিনি জানিয়েছেন, নজরুল সব সময় ক্লাশে অন্যমনস্ক থাকতো। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে হক্‌চকিয়ে যেতো। তবে ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হলেই সঠিক জবাব দিয়ে দিত।

কাজীর সিমলা থেকে দরিরামপুর ছিল পাঁচ মাইল দূরে। এই পাঁচ মাইল পথ পায়ে হেঁটে নজরুল স্কুলে যেতেন-আসতেন। অনেক সময় আসা-যাওয়ার পথে নানা রকমের ফুল তাঁকে আকৃষ্ট করতো। পথের সবুজ সৌন্দর্য দেখে কবি খুবই আনন্দ পেতেন। কবি এখানে কারো সাথে তেমন মিশতেন না।

গ্রামের বখাটে ছেলেরা তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করতো স্কুলের অদূরে ছিল টুনিভাঙা বিল। এই বিলের তীরে বসে নজরুল বাঁশী বাজাতেন। নজরুল এখানকার

বখাটে ছেলেদের সাথে মিশে হুক্কায় তামুক খেতেন বলেও জানা যায়।

দরিরামপুর স্কুলে থাকা অবস্থায় দু'টো ঘটনা উল্লেখ করার মতো। একটি বিচিত্রানুষ্ঠান, অপরটি ফাইনাল পরীক্ষা।

সে বছর স্কুলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর মহড়ার দায়িত্ব পড়েছিল সহকারী শিক্ষক মহিম বাবুর উপর। নজরুল মহড়ায় অংশ নেননি। অথচ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু'টো কবিতা 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি করলেন চমৎকারভাবে। স্কুলের শিক্ষকরা তো হতবাক! আনন্দে গদগদ। ছাত্রদের আনন্দ দেখে কে? অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদেরও কি কম আনন্দ! দারুণ আবৃত্তি! কে এই নজরুল! সত্যি এ ছেলে একদিন একটা কিছু হবে।

স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েই নজরুল চম্পট। চুরুলিয়ায়। এদিকে পরীক্ষার খাতায় কি করেছেন? সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়েছেন কবিতায়। আশ্চর্য মেধা! এ পরীক্ষায় নজরুল প্রথম অথবা দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাদির লিখেছেন, 'নজরুলের মুখেই প্রথম শুনেছিলাম যে তিনি কিশোর বয়সে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলা গ্রামে এসে দরিরামপুর হাইস্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলে তাঁর জন্ম এবং বাংলাদেশে এই তাঁর প্রথম অবস্থান।'[৩]

১৯২০ সালে নজরুল সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (অবশ্য তখন পর্যন্ত তিনি শেরে বাংলা উপাধি পাননি) অর্থানুকূল্যে কোলকাতা থেকে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ছিলেন নজরুলের জীবনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। বাংলা ১৩২৭ সনের আশ্বিন মাস। দুর্গা পূজা। ফজলুল হক কয়েক দিনের জন্য নবযুগ বন্ধ রাখতে বললেন।

কাজ বন্ধ, তো, কি করা যায়?

ফজলুল হক সাহেব তখন বরিশালে ছিলেন। তাঁর ভাগ্নে ইউসুফ আলী, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদকে বরিশাল বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। চমৎকার প্রস্তাব! দু'জনেই বেশ খুশী। তাঁরা চলে এলেন বরিশালে শেরে বাংলা. এ. কে ফজলুল হকের বাড়িতে।

ফজলুল হক সাহেব, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদকে পেয়ে তো দারুণ খুশী! দুই দিন হৈ চৈ আর আনন্দে কাটলো। বেশ জমেছিল বরিশালের আড্ডা।

বরিশাল বসে ঐ সময়ে নজরুল বেশ কয়েকটি গীতি-কবিতা লেখেন। সেগুলোর মধ্যে 'দূরের বন্ধু,' 'আশা', 'মরমী', 'পথের স্মৃতি', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নজরুল সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আসেন কিশোর বয়সে, ময়মনসিংহে। দ্বিতীয়বার এলেন জীবনানন্দের রূপসী বাংলা-বরিশালে। তখন কবি আর কিশোর নন। একুশ বছরের যুবক। যৌবনের প্রারম্ভকাল। ১৯১৪ সালে নজরুল ছিলেন এক অপরিচিত বাউণ্ডেলে বালক। ১৯২০-এ তিনি কবি, হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অবশ্য বাংলাদেশের বরিশালে যখন নজরুল আসেন, সেনাপোশাক তখন আর তাঁর শরীরে নেই, বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে ।

১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস। বাংলা চৈত্র ১৩২৭। নজরুল হঠাৎ উধাও। গেলো কোথায়? খোঁজ খোঁজ। না, কোলকাতায় নেই। তখন ছিল চৈত্র মাসের শেষ দিক। কোনো একদিন সকালবেলা কবি চট্টগ্রাম মেলে চড়ে চলে এসেছেন কুমিল্লায়।

কবি কুমিল্লায় চলে এলেন। কার সঙ্গে? এক পুস্তক ব্যবসায়ীর সঙ্গে, নাম আলী আকবর খান। নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়িতে। আলী আকবর খান 'ভিশ্‌তি বাদশাহ', 'বাবর' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা। তাঁর বাড়ি কুমিল্লার দৌলতপুরে।

খানের সঙ্গে পরিচয়। খান দেখলো ভালোই তো। কিছু ব্যবসা করা যাক। নজরুলকে দিয়ে শিশুতোষ বই লেখানোর কথা ভাবলেন তিনি। ব্যবসায়িক ফন্দি আঁটলেন। নজরুলের সঙ্গে আত্মীয়তা করলে কেমন হয় ? চমৎকার আইডিয়া !

আলী আকবর খানের ছিল এক ভাগ্নী। যেমন সুন্দরী তেমন রূপবতী। নাম সৈয়দা খাতুন। থাকে গ্রামের বাড়িতে। কুমিল্লার দৌলতপুরে।

ভ্রমণে নজরুলের কোনো ক্লান্তি ছিল না। বন্ধনও নেই। নেই কোনো পিছুটানও। আলী আকবর খানের কুমিল্লা বেড়াতে যাবার প্রস্তাব নজরুলকে খুব আকর্ষণ করলো। তিনি তো আর আকবর খানের ফন্দির কথা জানতেন না ! চলে এলেন কুমিল্লায়। আলী আকবর খানের ভাগ্নী দেখতে সুশ্রী ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। নজরুলের পছন্দ হলো। কবি, ভাবী পত্নীর নাম রাখলেন নতুন করে – নার্গিস আসার খানম।

নজরুলের সঙ্গে নার্গিসের আক্‌দ হলো। কিন্তু নানা ভুল বুঝাবুঝির কারণে তাঁদের এ বিয়েটি বাসর পর্যন্ত গড়ালো না। ভেঙ্গে গেলো। হঠাৎ বজ্রপাতের মত সব কিছু লণ্ডভন্ড হয়ে গেল।

দৌলতপুরে আসার আগেই কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে একটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। সেটি ছিল ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবার। নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রী প্রমীলা বা আশালতা সেনগুপ্তা এ পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। নার্গিসের সঙ্গে কবির বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর এই সেনগুপ্ত পরিবারে নজরুলের ঠাঁই হয়েছিল। সেই বিপর্যস্ত অবস্থায় নজরুলকে এই সেনগুপ্ত পরিবারের সদস্যরা প্রচণ্ড রকমের মানসিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন। নজরুল দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় আসেন ১৩২৮ সনের ৪ আষাঢ়, ১৯২১ সালের ১৮ জুন। সেনগুপ্ত পরিবারে ১৭ দিন অবস্থানের

পর কবি ৮ জুলাই মুজফফর আহমদের সঙ্গে কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। নজরুলের প্রথম ও দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে তাঁর পারিবারিক জীবনে সবিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। সে কারণে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানে করা সমীচীন মনে করছি না। নজরুল এই কুমিল্লায় আসার পথে, কুমিল্লায় অবস্থানকালে বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। এর মধ্যে নীলপরী, পাপড়ি খোলা, অবেলায়, হার-মানা-হার, অনাদৃত, বিদায় বেলায়, হারামণি, বেদনা অভিমান, মানস বধু, বিধুরা, পথিক প্রিয়া ইত্যাদি অন্যতম।

কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্ত পরিবারে অবস্থানকালে কবির সাথে প্রমীলা তথা আশালতা সেনগুপ্তার ঘনিষ্ঠতা হয়। বাংলা ১৩২৮ সনের আষাঢ় মাসে তিনি আবার কুমিল্লায় আসেন। এবং লেখেন 'পরশ পূজা', 'মনের মানুষ', 'বিজয় গান', 'পাগল পথিক' প্রভৃতি কবিতা। একই বছর অগ্রহায়ণ মাসে পুনর্বার কুমিল্লায় বেড়াতে এসে লেখেন বহুল আলোচিত কবিতা 'বিজয়িনী'। ১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর কুমিল্লায় বসে রচনা করেন 'ভাঙার গান' কাব্যের বিখ্যাত কোরাস গান 'জাগরণী'।

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। কারণ, প্রিন্স অব ওয়েলস (পরবর্তীতে অষ্টম এডওয়ার্ড) বোম্বে এসেছেন ১৭ নভেম্বর। দেশময় তখন হরতাল ও দাঙ্গা। অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে ২১ নভেম্বর নজরুল কুমিল্লায় হরতাল ও প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। কুমিল্লায় এটি নজরুলের তৃতীয়বার আগমন। এবার নজরুল মাসখানেক কুমিল্লায় অবস্থান করেন।

নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর প্রমীলার সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বাড়তে থাকে। এবং কবিও ঘনঘন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে যাওয়া-আসা করেছেন। অন্তত প্রমীলার সাথে নজরুলের বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত।

১৯২১ সালেই নজরুল তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' লিখে ফেলেন। অবশ্য বছরের শেষের দিকে।। কবিতাটি ছাপা হয় ১৯২২ সালের শুরুতে। 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় তোলপাড়। প্রচণ্ড রকম আলোড়ন সৃষ্টি করে কবিতাটি সমাজে ঝড় বইয়ে দেয়। তখন থেকেই নজরুল ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কুনজরে পড়েন।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নজরুল চতুর্থবার কুমিল্লায় আসেন এবং প্রায় চার মাস অবস্থান করেন। তৃতীয় ও চতুর্থবারের কুমিল্লায় অবস্থানকালে নজরুলের সঙ্গে প্রমীলার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এ বছর [১৯২২] ১২ আগস্ট নজরুল প্রকাশ করেন তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা 'ধূমকেতু'। এ পত্রিকাটি প্রকাশের শুরুতেই রাজরোষে পড়ে। পূজো সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি লিখে নজরুল হলেন রাজদ্রোহী। হলেন ফেরার। কবি এ অবস্থায় পুনর্বার কুমিল্লায় চলে আসেন এবং আত্মগোপন করেন। কিন্তু যাঁর বুকের ভেতর বিদ্রোহের আগুন তাঁর পক্ষে কি পালিয়ে থাকা সম্ভব? ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর কবি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে তাঁর এক বছরের জেল হলো।

কবি জেল থেকে ছাড়া পান ১৯২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর। মুক্তি পেয়েই আবার দে ছুট কুমিল্লায়। এর চার মাস পরে ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কবি নজরুল আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলাকে বিয়ে করেন।

এ বিয়েতে সেনগুপ্তা পরিবারের সদস্যরা অবশ্য অখুশী হয়েছিলেন। ফলে প্রমীলার সাথে বিয়ের পর নজরুল আর কুমিল্লার কান্দিরপাড় যান নি। এখানে একটি কথা জানিয়ে দেয়া দরকার। বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে খুবই স্নেহ করতেন। পুত্রের মত দেখতেন। নজরুলও তাঁকে বসিয়েছিলেন মায়ের আসনে।

১৯২৫ সালের মে মাস। বৈশাখ ১৩৩২ বাংলা। কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে ফরিদপুরে। এ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাশ করম চাঁদ গান্ধী) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ উভয়ই যোগদান করেন। বঙ্গীয় কংগ্রেসের এ অধিবেশনে নজরুল যোগদান করেন। পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন কবি নজরুলের ফরিদপুর সফর সম্পর্কে লিখেছেন,

> আমাদের ফরিদপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি'র অধিবেশন বসিল। এই অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতিদিন গাড়ী ভরিয়া বহু নেতা আমাদের বাড়ীর পাশের স্টেশনে আসিয়া নামিতে লাগিলেন। আমরা স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতাম। একদিন আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম কবি নজরুল কয়েকজন শিষ্যসহ আমাদের স্টেশনে আসিয়া নামিলেন। ... কবি সঙ্গে করিয়া 'বিষের-বাঁশী' আর 'ভাঙার-গান' আনিয়াছিলেন। বই দুইখানি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। কবির শিষ্যদল আসিয়াছিলেন কনফারেন্স অধিবেশনে এই বইগুলি বিক্রয় করিবার জন্য। ... সভায় কবি যাহা বলিলেন নিতান্ত মামুলী ধরনের। কিন্তু কবি যখন গান ধরিলেন সেই গানের কথায় কথায় সমস্ত সভা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। নজরুল গান ছাড়িলে সভার লোকে আরও গান শুনিবার জন্য চিৎকার করিয়া উঠিতেছিল। ... কবি যখন তাঁহার 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া' অথবা 'শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গান গাহিতেছিলেন তখন সভায় যে অপূর্ব ভাব রসের উদয় হইতেছিল তাহা ভাষায় বলিবার নয়।[৪]

১৯২৬ সালে নজরুল আরেকবার ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে এসেছিলেন। ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর নজরুলের পরিচালনায় শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। ১৫ সংখ্যা প্রকাশের পর ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়। নজরুলের মাদারীপুর সফর এই 'লাঙল' বন্ধ হবার কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা।

১৯২৬ সালের ১১ ও ১২ মার্চ। 'ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎসজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন পরলোকগত হেমন্ত কুমার সরকার এম. এ এবং নজরুল 'জেলেদের গান' গেয়ে করেছিলেন উদ্বোধন। তৎকালে ফরিদপুর থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়

(বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) সদস্য ছিলেন স্বরাজ-দলের মনোনীত পরলোকগত চাঁদশীর ডাক্তার মোহিনী মোহন দাশ।[৫]

১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছর জুন মাসের শেষ দিকে নজরুল হেমন্ত কুমার সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা সফরে আসেন। তখন মোহিনী মোহন দাশ থাকতেন ঢাকা কাছারীর কাছে একটা বাড়িতে। নজরুল মোহিনী বাবুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

নজরুলের ঢাকা আগমনের খবর শুনে আবদুল কাদির, তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ কাসেম ও আব্দুল মজিদ সাহিত্যরত্ন কবির সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্রোহী কবির সঙ্গে 'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ' গ্রন্থের লেখক কবি আবদুল কাদিরের এটাই প্রথম সাক্ষাৎ।

এ বছর (১৯২৬) ২৭ জুন রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর চতুর্থ বৈঠক আহ্বান করা হয়। এ বৈঠকে নজরুল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'আমরা ছাত্রদল', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি গণজাগরণমূলক গান গেয়ে অনুরাগীদের আনন্দ দান করেন।

এবছর জুলাই মাসে নজরুল চট্টগ্রাম সফরে আসেন, রাজনৈতিক কারণে। কবির সঙ্গী ছিলেন হেমন্ত কুমার সরকার। তাঁরা প্রথমে ওঠেন চট্টগ্রাম ডাক বাংলোয়। হেমন্ত বাবু চলে গেলে নজরুল হবীবুল্লাহ্ বাহারের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর মাতামহ খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের তামাকুমণ্ডিস্থ বাসভবনে কিছুদিন অবস্থান করেন।

চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা নজরুলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। চট্টগ্রামের পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, সাগর আর ভক্ত যুব সম্প্রদায় নজরুলকে সেবার মুগ্ধ করেছিল প্রচণ্ড রকমে। নজরুল হয়েছিলেন বিমোহিত।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস। পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের সদস্যপদের জন্য নজরুল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সে সময় কেন্দ্রীয় আইন সভায় ঢাকা বিভাগ থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে দুইটি আসন ছিল। তখন ঢাকা বিভাগ – ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। সম্পত্তির হিসেবে ভোটারের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজারের থেকে কিছু বেশী। যাই হোক, বিদ্রোহী কবি নজরুল নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। ইতোমধ্যে ১২ অক্টোবর সাপ্তাহিক 'গণবাণী' পত্রিকায় 'নির্বাচন দ্বন্দ্বে কবি' শিরোনামে খবর বেরিয়েছে 'বাংলার বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বিভাগের মুসলমান কেন্দ্র হতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হয়েছেন।'

এর কয়েক দিন পরেই নজরুল নির্বাচন প্রচার কাজে পুনর্বার ঢাকায় আসেন। এবার তিনি আস্তানা নিলেন ৫২ নং বেচারাম দেউড়ীর মসজিদ সংলগ্ন একতলা একটি দালানে। মসজিদটি ছিল হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ ইউসুফ কাদেরী (রাঃ)'র

বাড়ি সন্নিহিত। মসজিদটি নির্মাণ করেন শাহ্ সাহেবের শ্বশুর মৌলভী এ. এম. আবদুল্লাহ। যাই হোক, এখানে নজরুলের থাকা খাওয়ায় কোনো সমস্যা হলো না। শাহ্ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ হুসেনুর রহমান কাদেরী প্রত্যহ নজরুলের খাওয়া-শোওয়ার তদারকী করতেন। এর একটা কারণও ছিল। শাহ্ সাহেবের অন্য পুত্র সৈয়দ আতাউর রহমান কাদেরী ছিলেন রাগ-সঙ্গীতের ভক্ত। ফলে কবি নজরুলের প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকাটাই সমীচীন। নজরুল এখানে থেকে যে খুব একটা নির্বাচন প্রচার কাজ চালিয়েছেন তা কিন্তু নয়। অধিকাংশ সময়ই কবি কোনো না কোনো কবিতা আবৃত্তি করে কাটাতেন। নজরুল তো ভোট চাওয়ার লোক নন। তবু প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন।

প্রচার কার্যের এক পর্যায়ে হঠাৎ একদিন কবি ফরিদপুরে পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের বাড়িতে এসে হাজির। জসীমউদ্‌দীন কবিকে নিয়ে গেলেন তমিজউদ্দীন খানের বাড়িতে। এই তমিজউদ্দীনের এক মোসাহেব কবিকে বলে ফেললো এক কঠিন কথা – 'তুমি তো কাফের ! কোনো মুসলমান তোমাকে ভোট দেবে না।' নজরুল যে কাফের নন তা প্রমাণ করার জন্য তিনি 'মোহররম' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। শুধু তাই নয়, কবি একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি করে চললেন। এদিকে দুপুর হয়ে এলো। তাও কবির হুঁশ নেই। জসীমউদ্‌দীন ফিরে আসার পথে বেশ উল্লসিত হয়ে বললেন, 'এরা নিশ্চয়ই আপনাকে সমর্থন দেবে।' কিন্তু কবি বললেন – 'না। ওরা আমাকে ভোট দেবে না। সেকথা আগেই বলে দিয়েছে।'

জসীমউদ্‌দীনের রাগ হলো খুব। 'তাহলে এতোটা সময়ের অপচয় কেন?'

কবি বললেন, 'ওরা শুনতে চাইলে, শুনিয়ে দিলুম।'

কবি নজরুল এ নির্বাচনে জিততে পারেন নি।

১৯২৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। রোববার। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। স্টীমারে ঢাকায় আসার পথে তিনি রচনা করেন 'খোশ্ আমদেদ' গানটি। এই গানটি গেয়েই তিনি সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে নজরুল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আজ আমি এই মজলিসে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয়েছে। আজ আমি দেখ্‌ছি মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াবো। ...'[৬]

সেবার নজরুল ঢাকায় ছিলেন মাত্র তিন দিন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার এ. এফ. রহমান। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন মৌঃ তসদ্দুক আহাম্মদ। নজরুল ঢাকায় বসে ১৩৩৩ সনের ১৭ ফাল্গুন লেখেন 'যুগের আলো' কবিতাটি।

যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুনছি আরাব,—
পান ক'রে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব !
ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো ! তাদের বল, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে !
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর প'রে আসছে হেসে জয়ন্তিকা !

পরের বছর (১৯২৮) ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনও উদ্বোধন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি 'চল্ চল্ চল্' গানটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গেয়েছিলেন। সম্মেলন শেষে কবিকে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয় 'বর্ধমান হাউস'-এর একটি কক্ষে। এই কক্ষে নজরুল অনেক দিন ছিলেন। 'নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতে এসে প্রায় আড়াই মাস ঢাকায় অতিবাহিত করেন।[৮]

বর্তমানে বর্ধমান হাউস বাংলা একাডেমীর অন্তর্ভুক্ত। নজরুল যে ঘরটিতে বসবাস করতেন সেটি পূর্বাবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে।

যাক সে কথা।

এবার ঢাকায় এসে নজরুলের সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছে তারা হলেন— কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, রানু সোম, উমা মৈত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের ছাত্রী মিস ফজিলতুন্নেসা। কবি এই ফজিলতুন্নেসাকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। যদিও মিস্ ফজিলতুন্নেসা নজরুলকে মোটেই পাত্তা দেননি। ১৯২৮ সালের ২৮ মার্চ এক পত্রে নজরুল তাঁর 'সঞ্চিতা' বিদূষী ফজিলতুন্নেসাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা আর করা হয়নি।

এরপর নজরুল ঢাকায় আসেন ১৯২৮ সালের জুন-জুলাই মাসে। হঠাৎ করেই একদিন কলকাতা খেলার মাঠ থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়সহ 'কল্লোল' দলের চার পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে কবি ঢাকায় চলে আসেন। ১৩৩৫ বাংলা সনের ৭ আষাঢ় তিনি বনগ্রাম বসে শ্রীমতি প্রতিভা সোমের খাতায় লিখে দেন একটি কবিতা।

শ্রীমতী রানু সোম
কল্যাণীয়াসু—
মাটির ঊর্ধ্বে গান গেয়ে ফেরে
স্বরগের যত পাখী
তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা
তাদের কণ্ঠ রাখি।
যে গন্ধর্ব-লোকের স্বপ্ন

হেরি মোরা নিশিদিন
তুমি আনিয়াছ কণ্ঠ ভরিয়া
তাদের মুরলি বীণ।
....
....
যে সুরে স্বরগে স্তব-গান গাহে
সুন্দর সুরধ্বনি
অসুন্দর এই ধরায় তোমার
কণ্ঠে সে গান শুনি ॥

নজরুলকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সম্বর্ধনা দেয়ার আয়োজন চলছে। ১৯২৮ সালের শেষের দিক। বাংলা ১৩৩৫ সনের অগ্রহায়ণ মাস। নজরুল উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন। ২৬ নভেম্বর, ১০ অগ্রহায়ণ কবি রংপুর জেলার 'হারাগাছ তরুণ সংঘে'র বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করেন। রংপুর স্টেশন পৌঁছলে বিপুল আনন্দ আর উদ্দীপনার মধ্যে কবিকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

হারাগাছা তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মৌলবী হাবিবর রহমান। 'তরুণ সংঘে'র সভাপতি মৌলবী মোবারক আলী তরুণদের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং উপঢৌকন প্রদান করেন। নজরুল যে ক'দিন হারাগাছ ছিলেন সে ক'দিন গজল গান আর আবৃত্তিতে ছিলেন মশগুল। এ বছর ১৬ ডিসেম্বর, ১ পৌষ 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাবে'র বার্ষিক অধিবেশনে নজরুল যোগদান করেন। ১৭ ডিসেম্বর ২ পৌষ, কবিকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শুধু ছাত্র-যুবক নয়, হাজার হাজার মানুষ যোগদান করেন। সভায় কবিকে রাজশাহীর মুসলমান ছাত্রদের তরফ থেকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। কবি এখানে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন এবং সব শেষে প্রাণ মাতানো সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই চমৎকার আয়োজন।

১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল ও 'মুসলিম শিক্ষা সমিতি'র ত্রিশতম বার্ষিক 'প্রতিষ্ঠা দিবস' উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে অংশ নেয়ার জন্য নজরুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কবি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের শুরুতে কবি দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও সফর করেন। এরপর আসেন চট্টগ্রামে। ১১ জানুয়ারী চট্টগ্রাম সদর মহকুমার নিকটবর্তী কাট্টলী গ্রামের ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে কবিকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সভায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগদান করেন। সভার শুরুতে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রী বরণ-সঙ্গীত গেয়ে কবিকে পুষ্পমাল্য দ্বারা বরণ করেন। সভাপতি মৌলানা আজিজুর রহমান স্বরচিত কবিতা দ্বারা কবিকে অভিনন্দিত করেন। নজরুল এ সভায় একটি গান গেয়ে শোনান। তিনি শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কে ১ ঘন্টা

বক্তৃতা করেন।

এরপর নজরুল তাঁর জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের জন্মস্থান সন্দ্বীপ সফর করেন। কবির সন্দ্বীপ সফর সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন 'জাহাজ হইতে নৌকায় এবং নৌকা হইতে সন্দ্বীপের ডাঙ্গায় পা রাখিয়াই কবি আনন্দে বলিয়া উঠেন —'চমৎকার জায়গা এ যেন একটা মায়াপুরী। আমার মত ভবঘুরে পর্যন্ত এখানে নীড় বাঁধতে চাইবে।' ছোট্ট একটি শোভাযাত্রা সহকারে কবি সন্দ্বীপ টাউনে পৌঁছেন। ডাক বাংলাতে একখানি হেলান চেয়ারে বসিয়া কবি আবার বলতে থাকেন —'নিখুঁত ছবির মতই আমাদের দেশ। সত্যিই সন্দ্বীপ দেখে আমি ধন্য হলাম। এখানে আমি আর আগন্তুক নই, আমি তোমাদেরই একজন।' ইতিমধ্যে ডাক বাংলোর সম্মুখে বহু লোক একত্রিত হয়। কবি তাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আপনাদের দেখে খুব ভাল লাগছে। কি সুন্দর স্বাস্থ্য, কি কমনীয় চেহারা! আপনারা সবাই বুঝি আরবী পড়তে ও সাঁতার কাটতে জানেন ? বিলাত কে কয়বার দেখেছেন ?"[৯]

স্থানীয় কার্গিল হাইস্কুল মাঠে কবিকে সম্বর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়। সভায় সন্দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করে শোনান মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ। কবি এ অনুষ্ঠানে সন্দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নাবিকদের সাহসিকতা, সন্দ্বীপবাসীদের আতিথ্যের প্রশংসা করেন। এ সভায় কবি 'চল্ চল্ চল্', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' 'চাষী ধর কষে লাঙল', 'ও ভাই জেলে ওঠরে এবার ঠেলে' এসব গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে কবি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান।

নজরুল সন্দ্বীপ শহরে রাত্রি যাপন করে পরের দিন মুজফ্‌ফর আহমদের বাড়ি যান। সেখানে তিনি ছিলেন দুই দিন। নজরুল সন্দ্বীপে তিন কি চার দিন ছিলেন।

এ বছর (১৯২৯) মার্চ মাসে নজরুল কুষ্টিয়া ও বগুড়া সফর করেন। মার্চের শুরুতে কবিকে কুষ্টিয়া যতীন্দ্রমোহন হলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে কবি বগুড়া আক্কেলপুর ইয়ংমেন্‌স মুসলিম এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। বিরাট শোভাযাত্রা করে কবিকে স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাণঢালা অভ্যর্থনার উত্তরে কবি তাঁর প্রাণ মাতানো গজল গান গেয়ে শোনান। সন্ধ্যার পরে বসে 'গজল-জলসা'র অধিবেশন। কবি প্রায় দু'ঘন্টা ধরে গজল গান পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মে নজরুল চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে এক সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আবুল ফজল, কামালউদ্দীন খান, হবীবুল্লাহ বাহার এবং মাহবুব-উল আলম। এ সভায় সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক নজির আহমদ চৌধুরীও যোগদান করেন।

এই সাহিত্য সম্মেলনের মূল আকর্ষণ ছিল বৈকালিক অধিবেশনে নজরুলের গান আর আবৃত্তি।

১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে'র আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে নজরুলকে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। নজরুল আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সম্মেলনে যোগদান করেন। মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর স্মৃতিধন্য সিরাজগঞ্জে এসে নজরুল খুবই অভিভূত হয়েছিলেন।

১৯৩৬ সালে নজরুল আবার ফরিদপুর আসেন। তিনি ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণদানকালে কবি তাঁর অপূর্ণ আশার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বেশী দিনের কথা নয়, সেদিনও আমার আশা ছিল, এই-ছাত্র সমাজকে অগ্রদূত ক'রে নব বিজয় অভিযানের আমি হব তূর্য বাদক, নকীব; সৃষ্টি করব সুন্দরের জগৎ-কল্যাণী পৃথ্বী, ধরণীর পঙ্কিল বক্ষ ভেদ ক'রে আনব পবিত্র আব-জম্‌জম্ ধারা। সে আশা আমার আজও ফল্‌ল না। বুঝি মুকুলেই তা পড়ল ধুলায় ঝ'রে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত।'[১০]

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। ৬২ নং নাজিমুদ্দিন রোডের 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' থেকে সেদিন প্রচারিত হয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাণী । ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু হবার প্রায় এক বছর পর ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর কবি নজরুল ইসলাম ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে লায়লা আর্জুমান্দ বানু লিখেছেন, ঢাকার সঙ্গীতের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল বেতার কেন্দ্রে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতি। ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর নজরুল ইসলামের পরিচালনায় তাঁর লেখা সঙ্গীত বিচিত্রা 'পূর্বালী' প্রচারিত হল। সঙ্গীতে অংশ নিলেন চিত্ত রায় এবং শৈলী দেবী, বর্ণনায় ঢাকার শিল্পী এবং বর্তমানে ঢাকা বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট রণেন কুশারী।'[১১] সুস্থাবস্থায় এটিই নজরুলের শেষ ঢাকায় তথা বাংলাদেশে আগমন।

নজরুল সর্বশেষ ঢাকায় আসেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে নিয়ে আসেন। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পর ২৪ মে ১৯৭২ সালে কবি পুনরায় বাংলার মাটি স্পর্শ করলেন। পরের দিন ২৫ মে, ১১ জ্যৈষ্ঠ কবির জন্মদিন। ৭৩ তম জন্মদিন। সারা দেশে বিপুল উৎসাহে বিদ্রোহী কবির জন্মদিন পালিত হলো। প্রথমে কবি ছিলেন রাষ্ট্রীয় মেহমান। এরপর তাঁকে এদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। দেয়া হয় বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা। তাঁর জন্য বাড়ি, গাড়ি,

সেবক, ডাক্তার সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। কিন্তু কি হবে আর এসব আয়োজনে ! যার জন্য এতো কিছু, তাঁর যে কোনোই উপলব্ধি নেই, জ্ঞান নেই, নির্বাক-স্মৃতিহীন !

জীবনের শেষ প্রান্তে অবশ্য কবি তাঁর আজন্ম দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। 'ম্যায় ভূখা হু' তাঁকে আর বলতে হয়নি। অবশ্য তাঁর এসব বলার কথা অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে।

নজরুল বাংলাদেশে জীবনের শেষ চার বছর অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, ঢাকার পিজি হাসপাতালে এই মহান কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তথ্য-নির্দেশিকা

১. অথবা এ. এম. বক্স-এর রুটির দোকানে।

২. পরবর্তীতে শ্রী মহিমচন্দ্র খাসনবীশ দরিরামপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

৩. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ : আব্দুল কাদির, সম্পাদনায় : শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৮৯ নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৪।

৪. নজরুল-জীবনী : রফিকুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ : ২৫ মে, ১৯৭২ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৩৩৯।

৫. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ : আব্দুল কাদির, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪।

৬. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ : আব্দুল কাদির, পৃষ্ঠা-৪৯।

৭. নজরুল-জীবনী : রফিকুল ইসলাম পৃষ্ঠা-৪১৮, ৪১৯।

৮. নজরুল-জীবনী : রফিকুল ইসলাম পৃষ্ঠা - ৪৭৫।

৯. নজরুল-জীবনী : রফিকুল ইসলাম পৃষ্ঠা-৪১৪, ৪১৫।

১০. নজরুল-জীবনী : রফিকুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৪৭, ৪৪৮।

১১. নজরুল-জীবনী : রফিকুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ৫৭৫।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা]

সাহিত্যানুষঙ্গ

সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাব

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

সাহিত্যক্ষেত্রে 'সওগাত' আর কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটে প্রায় একই সময়ে, এবং 'সওগাতে'র মাধ্যমেই নজরুলের সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা হয়। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যখন সচিত্র মাসিক 'সওগাত' প্রকাশিত হয়, সে সময়ে নজরুল ছিলেন করাচীতে-'বাঙালী পল্টনে'র একজন হাবিলদার হিসাবে কর্মরত। উল্লেখ্যযোগ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পল্টন গঠন করা হয়। পল্টনটির আক্ষরিক নাম ছিল '৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টন'। এই পল্টনের সদর দফতর ছিল করাচীর আবিসিনিয়া লাইন নামক স্থানে। 'সওগাত' বের হবার পর সেখান থেকেই নজরুল এই পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাতে শুরু করেন— প্রচুর লেখা। লেখার সঙ্গে থাকতো চিঠি। তখন নজরুলের বয়স ১৭ কি ১৮ বছর।

১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'সওগাত' প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই কেমন করে তা সুদূর করাচীর বাঙালী পল্টনে নজরুল ইসলামের হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল, সে খবর জানা নেই। তবে মনে হয় 'বাঙালী পল্টনে'র কেউ 'সওগাত' সঙ্গে করে করাচী নিয়ে গিয়েছিলেন। 'সওগাত' দেখে নজরুল যে খুবই আনন্দিত আর আকৃষ্ট হন, সে-পরিচয় পেয়েছিলাম তাঁর লেখা তখনকার চিঠিগুলি থেকে। প্রথম চিঠিতেই তিনি আমকে লিখেছিলেন-'মুসলমান সমাজের কেউ আধুনিক ধরনের সচিত্র মাসিক বের করেন নি। আপনি সে অভাব দূর করলেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

প্রথম দিকে নজরুল 'সওগাতে' প্রকাশের জন্য যেসব লেখা পাঠাতেন, তার অধিকাংশই ছিল আবেগ আর উচ্ছ্বাসপূর্ণ। সেগুলিতে গ্রন্থণা-নৈপুন্য ও শিল্পকৃতির অভাব ছিল। তরুণ লেখকের রচনায় এ-ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকা অস্বাভাবিকও ছিল না। লেখাগুলি এই কারণে তখন 'সওগাত'-এ প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু এতে নজরুল নিরুৎসাহ না হয়ে একের পর এক লেখা পাঠিয়ে যেতেন। এগুলি পাঠাতে ডাক খরচা লাগত না তাঁর। কারণ, সার্ভিস বা সরকারী ডাক টিকেটেই তাঁর লেখা এসব চিঠিপত্র তিনি পাঠাতেন।

নতুন লেখকদের অধিকাংশ লেখার ভাগ্যে যা হয়, নজরুলের প্রথমদিকের লেখাগুলিকে সেই পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছিল। অতীতের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আজ ভাবি, নজরুলের সেই লেখাগুলি যদি রেখে দিতাম, তা হ'লে আজ

সেগুলি ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে থাকতো। কিন্তু সেকালে কে জানতো যে এই নতুন লেখকটি একদিন 'যুগস্রষ্টা' কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করবেন?

বন্ধনহারা, স্কুল-পলাতক সেই কিশোরটির সুপ্ত প্রতিভা একদিন সত্যি স্ফূরণ লাভ করলো শ্যামল বাংলার মাটিতে নয়, বালুকাময় সুদূর সিন্ধু প্রদেশে—করাচীর সেনানিবাসে; সাহিত্যের দীর্ঘ সাধনায় নয়—এ যেন খোদাপ্রদত্ত এক বিশেষ শক্তি বিদ্যুতের ন্যায় অকস্মাৎ চমকিয়ে উঠলো।

নজরুলের প্রথম মুদ্রিত রচনাটির নাম ছিল 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। ছাপা হয় প্রথম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে'। এই রচনাটি ছিল করাচীর সেনানিবাস থেকে পাঠানো, হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম নামে লিখিত। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশের সাথে সাথেই ঘোষিত হয় সাহিত্যক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। এবং এই রচনাটি সেকালেই পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর এই প্রথম মুদ্রিত রচনাটির ভাষা ও রচনাভঙ্গী ছিল অভিনব ধরনের, যা আমাদের সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলকে নিয়ে শুরু হ'ল সাহিত্যিক মহলে জল্পনা। অনেকে আমার কাছে জানতে চাইলেন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয়। কিন্তু আমি তখনো পর্যন্ত জানি না কে এবং কোথাকার লোক এই কাজী নজরুল ইসলাম। ডাকযোগে তাঁর রচনা ও চিঠি পেয়েছি, এই মাত্র। উক্ত রচনাটিতে রয়েছে গল্পচ্ছলে এক বাউণ্ডেলের আত্ম-কাহিনী। বাউণ্ডেলে তার বন্ধুর কাছে কাহিনীটা বলছে,

> আমার ছোটকালের কোন কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোম্যান্স নেই। সেই রাম, শ্যামের মত পিতা-মাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়া-লেখায় নবডঙ্কা, ঝুম ঝাপ্পুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় দ্বিতীয় নাস্তি, দুষ্টামী নষ্টামীতে নন্দ দুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ! আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বিশেষ খোস ছিলেন কি না, তা আমি কারু মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না, তবে সকলেই যে আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য সকাল সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় নাওয়াকেফ ছিল না।
>
> একটা প্রবাদ আছে—উৎপাৎ করলেই চীৎপাৎ হতে হয়। সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাবাক্যটির ব্যতিক্রম হয় নি, বরং ও কথাটা ভয়ানকভাবেই আমার উপর খেটেছিল। কারণ, ঘটনাচক্রে যখন আমি আমার জননীর কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্ম্মবহুল ফুটপাথে চীৎপাত্ হয়ে পপাত হলুম, তখন কত কর্ম্মব্যস্ত সবুট ঠ্যাং যে অহম বেচারার ব্যথিত পাঁজরের উপর দিয়ে চলে গেল, তার হিসেব রাখতে শুভঙ্কর দাদাও হার মানলো।
>
> রাণীগঞ্জে এসে টেস্ট একজামিনেশন দিলুম। সমস্ত বছর হট্টগোলের মধ্যে কাটিয়েছি। পাশ করব কোত্থেকে? আগেকার সে চুরিবিদ্যায়ও প্রবৃত্তি ছিল না, —অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে টেষ্টে এলাউ হইনি, সুতরাং ওটা আর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এই শুভ সংবাদ বাবার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ

> খরচ করে আমায় বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহারে জানিয়ে দিলেন যে, আমার মত কুপুত্তুরের লেখা-পড়া ঐখানেই খতম হবে তা তিনি বহু পূর্ব্বেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন— অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলে দিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেত-বিরক্ত হয়ে উঠল। পরে যা মনে আসতে লাগল তাই করতে লাগলুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগল। দু'চার দিন যেতে যেতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শুভক্ষণে আমায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন।

গল্পে বন্ধুর কাছে জীবনের বহু কাহিনী বলে বাউণ্ডেলে তা শেষ করলো এরূপ,

> তুমি হয় ত ভাববে আমি কি করে এখনও বেঁচে আছি? ভায়া হে, আমাদের মত শয়তানের খাওয়া-পরার অভাব নেই। কারণ, তোমার মত দুই একটা ইয়ার আমাদের জুটেই জুটে। যে ব্যাটারা কিছু দিতে নারাজ, তারাও আমাদের কিছু কিছু দেয়।
>
> তারপর এই পাঁচটা বছরের মধ্যে শর্ম্মার কতবার হাত পা ভাঙল, সে সব বলতে গেলে আর একটা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়ে পড়ে। অতএব এইখানেই আমার আত্ম-কাহিনীর ইতি করি। আর এক গ্লাস পানি দিতে পার ভাই?

'সওগাতে' নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় গল্প 'স্বামী-হারা' প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের ভাদ্র মাসে—প্রথম বর্ষ ১০ম সংখ্যায়। আগেই বলেছি তার অনেকগুলি কবিতা ডাকে এসেছিল কিন্তু সেগুলি প্রকাশের জন্য মনোনীত হয় নি। হয়তো সে জন্যে তাঁর মনে আক্ষেপ জন্মেছিল। 'সওগাতে' কবিতা প্রকাশের জন্য তিনি তাই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সেই আক্ষেপের সুরটি দেখতে পেলাম তাঁর পাঠানো 'কবিতা সমাধি' নামক একটি ব্যঙ্গ কবিতায়। কবিতাটি ডাকে এলো, সঙ্গে ছোট্ট এক চিঠি। নজরুল লিখেছেন,

> আজ পর্যন্ত এতগুলি কবিতা পাঠিয়েছি তার একটিও 'সওগাতে' ছাপা হ'ল না। আমার এই 'কবিতা সমাধি' ছেপে দেবেন। আমি আর 'সওগাতে' কবিতা পাঠাব না।

কবিতাটিতে ব্যঙ্গরস ছিল। হাসির কবিতা হেডিং দিয়ে এটি প্রথম বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে' ছাপা হয়েছিল। নজরুলের প্রথম মুদ্রিত ব্যঙ্গ কবিতা বলে নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হলো,

কবিতা সমাধি

[সওগাত, ১ম বর্ষ একাদশ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৬]

পরিশ্রমে গলদঘর্ম,—সারা নিশি জেগে
ভাব শিরে মুহুর্ম্মুহু লাঠ্যাঘাতি রেগে,
সে কি লেখা লিখিলাম মহা মহা পদ্য।
অক্ষর একুন করি যোজিলাম চৌদ্দ!

মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি।
রচিলাম কি বিকট শব্দ বাছি বাছি,
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি!
কবিদের ভাব সব 'না বলিয়া নিয়া'
সাহিত্য আসরে এনু গুম্ফ আস্ফালিয়া
এ লেখা কি ব্যর্থ হয়? —তবে নামি মিছে।
"বাঃ ভাই" বন্ধুরা কয় দন্ত সংঘ খিঁচে।
চাটুবাক্যে মুগ্ধ হয়ে কবিতা রাশিকে
পাঠালাম ছোট বড় সকল মাসিকে।
সম্পাদক অভদ্র সে না দেয় উত্তর,
বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু, দুত্তোর!
টিকেট খেয়েছ মম, যেতে দাও—এবে
হে ভদ্র! কবিতাগুলি ফিরায়ে কি দেবে?
শেষে সে সহস্র পত্র লেখার দরুণ
রিপ্লাই আসিল ওহোঃ ভীষণ করুণ।
অবশ্য কিছুই তার পাই যদি খেটে–
কবিতা সমাধিপূত "পেপার বাস্কেটে"।

—হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

'সওগাতে' নজরুলের প্রথম মুদ্রিত আরো কয়টি লেখা

'কবিতা সমাধি' ছাপা হওয়ার পর নজরুল আমাকে চিঠি লিখলেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে। কিন্তু এই 'কবিতা সমাধি'র পর সত্যি সত্যি করাচী থেকে আর কোনো কবিতা পাঠালেন না 'সওগাতে'র জন্য। যা পাঠালেন, তা ছিল গল্প, প্রবন্ধ ও গান।

নজরুল ইসলামের প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রকাশিত হয় ১৩২৬ সালের কার্তিক মাসে — প্রথম বর্ষ ১২শ সংখ্যা 'সওগাতে'। আর 'সওগাতে' তাঁর প্রথম গান 'উদ্বোধন' ছাপা হয় ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। ঐ বছর পৌষ মাসের 'সওগাতে' ছাপা হয় তাঁর আর একটি গান 'কলঙ্কী প্রিয়'। তাঁর ছোটগল্প 'রাক্ষুসী' ও গান 'আবাহন' ছাপা হয় ১৩২৭ সালের মাঘ সংখ্যা 'সওগাতে'। কি কারণে জানি না, নজরুলের জীবনী লেখকদের অনেকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে করাচীতে লেখা এই কয়টি রচনার নাম উল্লেখ করেন নি।

উদ্বোধন

[গান]

বসন্ত সোহিনী-দাদরা

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব বাজাও!
অগ্নি-তূর্য্য কাঁপাক সূর্য্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব,—
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব—বাজাও!

নটমল্লার দীপক রাগে
জ্বলুক তড়িত বহ্নি আগে,
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘমন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রহ নব।
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব-বাজাও!

দাসত্বের এই ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের জঘন্য বৃত্তি
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ,
দাও তেজ, দাও মুক্তি গরব!
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব—বাজাও!

'লোহু' দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি দাও নিরস্ত্রে,
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুন: দাও গৌরব,
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব-বাজাও।

ঘুচাও ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রাণের পরশে কর হে ধন্য,
শৃঙ্খলিতের টুটিতে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড-আহব।
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব-বাজাও।

নির্বীর্য্য এ তেজ সূর্য্যে
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্য্যে
শৌর্য, ধৈর্য্য মহাপ্রাণ দাও
দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব!
দুর্জ্জয় মহা আহ্বান তব—বাজাও!

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নজরুলের প্রথম দিকের লেখা গানগুলিতে সমাজচেতনা ও দেশাত্মবোধক ভাবের প্রাধান্য ছিল।

নজরুলের সৈনিক জীবন ছিল তিন বছরেরও কম সময়ের। কিন্তু এ তিনটি

বছর ছিল তাঁর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করাচীর সেনানিবাসেই তাঁর সাহিত্যিক উত্তরণের প্রারম্ভকাল সূচিত হয় এবং এখান থেকেই তাঁর রচনাও সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় জনসমাজে।

করাচীর সেনা-নিবাস ত্যাগ করে নজরুলের দেশে আগমন

করাচীর ৪৯ নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর ১৯২০ সালে নজরুল দেশে ফিরে এলেন। শুরু করলেন দেশাত্মবোধক কবিতা ও সঙ্গীত রচনা। ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এ কয়টি বছর নজরুল তাঁর কবিতা ও গানের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণে এনে দিলেন অপরিসীম শক্তি আর সাহস, প্রেরণা জাগিয়ে তুললেন বাঙালীর প্রাণে। এ সময়ে নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট' এবং আরো কয়েকটি গান দেশসেবীদের মুখে মুখে গীত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে নজরুল উদাত্ত স্বরে গাইলেন তাঁর 'কাণ্ডারী হুশিয়ার',

তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার!

কৃষ্ণনগর সম্মেলনে ছাত্রদলের উদ্দেশ্যে গাইলেন,

আমরা শক্তি, আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্নদেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল।

বিপ্লবের বাণী ছাড়াও নজরুল এত অল্প বয়েসেই তাঁর কবিতা ও গানে মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় সোচ্চার করে তুলেছিলেন,

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ, আজি
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারো উঠিছে ডঙ্কা বাজি।

এ ছাড়া তিনি কৃষকের গান, শ্রমিকের গান, ছাত্রদলের গান প্রভৃতি লিখে তাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। দেশাত্মবোধ ও উৎপীড়িত জনগণের বেদনাই আবির্ভাবকালে নজরুলের কাব্যে ও গানে সবিশেষ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি চারণ কবি, জাগরণের কবি, যৌবনের কবি, বিদ্রোহী কবি ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত হন। এখানে সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাবকালের ব্যাপারেই বিশেষভাবে আলোকপাত করা হলো।

এর পরবর্তী কালে আসে নজরুলের রোমান্টিক সাহিত্য রচনার যুগ। নজরুল প্রতিভার শেষ অধ্যায় ছিল সঙ্গীত চর্চার যুগ। এ সময়ে নজরুল সঙ্গীত রচনার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি গানের রাজ্যে ডুবেছিলেন বলে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি লেখার প্রতি তেমন মনোযোগী হতে পারেন নি। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন সুরের হাজার হাজার গান রচনা করলেন। রেখে গেলেন সঙ্গীত জগতে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

এর পর ১৯৪২ সালে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে কবি চিরতরে বোধশক্তি এবং বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী ইতিহাস সুবিদিত।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — প্রথম সংকলন]

নজরুলের জীবনদর্শন

মোহাম্মদ আজরফ

যুক্তিবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের উপকরণ, পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যেমন মতভেদ রয়েছে—তার পটভূমিকায় তেমনি একটা স্বীকৃতিও রয়েছে। উভয় দলই বুদ্ধিকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছে। তাতে পরোক্ষে অপরাপর সকল মাধ্যমকেই অস্বীকার করে কেবলমাত্র বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানেরই একাধিপত্য গ্রহণ করা হয়েছে। পুরাকালের দার্শনিকদের মধ্যে সোফিষ্টগণ, মধ্যযুগের অব্যবহিত পূর্বে প্লটিনাস, অতি আধুনিক কালে বের্গসোঁ এ মতবাদের বিপক্ষে জ্ঞানের অপরাপর পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে দার্শনিক মহলকে সচেতন করেছেন। সোফিষ্টগণের বক্তব্য ছিল— মানব-জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির স্বকীয় প্রত্যক্ষণ, অপর দিকে প্লটিনাস বা বের্গসোঁ স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের অপর এক পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতেই দার্শনিক জগতে একাধিক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধির বিরুদ্ধে রুশো অনুভূতি বা feeling কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে এ বুদ্ধির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একদিকে সোপেনহাওয়ার অপরদিকে নীট্‌শে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সোপেনহাওয়ারের কাছে- বেঁচে থাকার ইচ্ছা (will to live) যেমন ছিল প্রবল, তেমনি নীটশের কাছে—শক্তি লাভের ইচ্ছা (will to power) ছিল প্রবল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে উইলিয়াম জেমস- বুদ্ধির বিরুদ্ধে তার প্রত্যয়ের জন্য ইচ্ছা বা (will to belive) ঘোষণা করে তেমনি বুদ্ধির বিপক্ষে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করেছেন।

সম্প্রতি অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ অস্তিত্বকে সারসত্তার পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করে বুদ্ধিপ্রসূত সারকে তত্ত্বজ্ঞানের মূল আলোচনার বিষয় বলে প্রাধান্য না দিয়ে প্রকারান্তরে বুদ্ধিকে মানব-জীবনের সর্বপ্রধান বিষয় বলে অস্বীকার করেছেন।

এসব বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় বুদ্ধি জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার পক্ষে সবচেয়ে সার্থক ও অমোঘ অস্ত্র হলেও বুদ্ধি দ্বারা যে জীবনের সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়, সেরূপ ধারণা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানবজীবনে যে এক ভয়ংকর সংগ্রাম রয়েছে তা' অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

একদিকে অপরাপর জীবনের সঙ্গে, অপরদিকে প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবজীবনকে সতত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। একমাত্র বুদ্ধিবলেই মানুষ সেসব সংগ্রামে জয়ী হয়। তবে সে বুদ্ধির দওলতে জয়ী হয় বলেই, বুদ্ধিই যে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম এরূপ ধারণা মোটেই যুক্তিসহ নয়। এরূপ ধারণাকে গোঁড়ামীরই অপর এক সংস্করণ বলা যায়।

এজন্য বুদ্ধিজাত মতবাদকে দর্শন বলা যায়, জীবন-দর্শন বলা যায় না। জীবনদর্শন এমন এক মতবাদ যাতে কেবল বুদ্ধিই সন্তোষ লাভ করে না, মানব-জীবনে ক্রিয়াশীল অন্যান্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলোও সন্তোষ লাভ করে। বুদ্ধি ব্যতীত মানব-জীবনে আবেগ এবং ইচ্ছাশক্তি তো রয়েছেই, তার উপর নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তিও রয়েছে— যেগুলোর সন্তোষ ব্যতীত কোন মতবাদই মানব-জীবনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এজন্য দেখা যায়, সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও ধর্মের মধ্যে মানব-জীবন অধিকতর সন্তোষ লাভে সমর্থ হয়। ধর্মের প্রকল্প শুধুমাত্র বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে সামগ্রিক জীবনের সন্তোষ বিধানে ধর্মের বাণী অধিকতর সফল বলে কার্যক্ষেত্রে ধর্ম দর্শন থেকে অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। এজন্য দেখা যায়, যে সব দার্শনিক মতবাদ সবচেয়ে বেশী সন্তোষ দানে সমর্থ, সেগুলো প্রায় ধর্মের পর্যায়ে চলে যায়।

নজরুল ইসলামের তত্ত্বীয় মতবাদ শুধুমাত্র বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে তাকে অভিজ্ঞতাবাদ বা যুক্তিবাদের আলোকে বিচার করা যায় না। তাঁর দার্শনিক মতবাদে বোধির রয়েছে প্রাধান্য, এজন্য এতেও তাঁর এক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। তবে তাঁর এ বোধি বের্গসোঁ প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদের মত শুধুমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের বা আদি সত্য লাভের প্রচেষ্টাতে পর্য্যবসিত নয়—তাতে অভিজ্ঞতারও ছায়া বর্তমান। এ বিশ্বের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে যে শাসন ও শোষণের রয়েছে মর্মান্তিক দৃশ্য তাও তিনি তাঁর জীবনে অনুভব করে তাকে তাঁর 'বিদ্রোহী' নামক কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের এ দেশে কার্ল মার্কস-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের বা বাকুনীন-প্রবর্তিত অরাজকতাবাদের যে মন্ত্র এসে পৌছেছিল তাও তাঁর মানসে ছিল কার্যকর। এজন্য তিনি তার জীবন-দর্শনের মধ্যে এ জগতে যে সব জুলুম ও অত্যাচার হচ্ছে— শাসন ও শোষণের যাঁতাকলে অসহায় মানুষ যেভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে তার প্রতিকারও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমের মধ্যে প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধি, বোধ, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি নানা উপাদান রয়েছে — অর্থাৎ তাঁর জীবনের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় সে বিষয়গুলো বর্তমান—এজন্য তাঁর এ জীবন-দর্শনকে কোন এক বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নয়। এতে অবশ্য তাঁর উক্তির মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে সত্যিই। তবে এ বিশ্বের সকল মহাকবির কাব্যেই সে অসঙ্গতি বর্তমান।

সেক্সপীয়র সম্বন্ধে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—Inconsistency is thy name Shakespeare—কারণ তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটকে জীবনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করেছেন। হ্যামলেটের সন্দেহপরায়ণ মনের দোলায়মান অবস্থার সঙ্গে ম্যাকব্যাথের মধ্যে প্রকৃতির প্রতিশোধের দৃশ্য মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে এতে সেক্সপীয়রের জীবনের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়নি।

ওয়াল্ট্ হুইটম্যানকে যখন তাঁর একজন অনুসারী জানালো যে তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সমালোচকগণ বলে থাকেন, তাঁর কাব্যে নাকি নানাবিধ অসঙ্গতি রয়েছে, তখন তিনি নাকি উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, তা হলে বুঝতে হবে জীবনের সঙ্গে আমার কাব্যের যোগ। কারণ জীবনেই তো রয়েছে নানা অসঙ্গতি।

শুধুমাত্র কবি নয়, কোন সাহিত্যিকের নিকটই একটা অনড় দর্শনের প্রত্যাশা না করে, তার কাব্যে জীবনের নানাবিধ দিক সম্যকভাবে রূপায়িত হয়েছে কিনা এবং সর্বশেষ পর্যায়ে তার কাব্য কোন্ পরিণতিতে এসে উপস্থিত তা-ই অনুধাবন করে দেখা উচিৎ।

নজরুল ইসলামের কাব্যের সর্বপ্রধান বিশিষ্ট সমালোচক ও প্রজ্ঞাবান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁকে যুগ-প্রবর্তক কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] তার এ মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রখর ও প্রভাদীপ্ত আলোকের ছটার মধ্যে নূতন কোন মতবাদের বা চিন্তার উদ্ভবই ছিল অসম্ভব বলে গণ্য। যে মায়াময় দৃষ্টিতে 'এ দোলক মধুময়—মধুময় পৃথিবীর ধূলি/অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি'—বলে তিনি যে মোহাস্তীর্ণ মায়াজালের সৃষ্টি করেছিলেন, তার বাইরেও যে বিশাল জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই অব্যক্ত ও অনুচ্চারিত রয়ে গেল, সে সম্বন্ধে বাঙলা ভাষাভাষী সমাজ সম্পূর্ণ অচেতন রয়ে গেলো। নজরুলের আবির্ভাব তাই একটা নূতন জীবনের সন্ধান দিয়ে একটা নব যুগের সূচনা করেছিল—এজন্য তাঁকে সত্যিই যুগ-প্রবর্তক কবি বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

নজরুলের কাব্যজীবনের ধারাকে কয়েকটা পর্যায়ে পৃথক করে কাজী আবদুল ওদুদ নজরুল সাহিত্যের উপর পরবর্তীকালে একটা অতি প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন। এতেও নজরুলের কাব্যের দার্শনিক মতবাদ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তবে আমাদের মনে হয় নজরুল-কাব্যের সার হচ্ছে তাঁর 'বিদ্রোহী' এবং তাতেই তাঁর জীবনদর্শনের সার এক অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী কবিতায় সে 'বিদ্রোহী'রই এক একটা দিক আরও দীর্ঘায়ত রূপ ধরে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলোকে 'বিদ্রোহী'রই এক একটা ভাবের সম্প্রসারিত ভাষ্য বলা যায়। এজন্য নজরুল-কাব্য পরিক্রমার অপর নামকে 'বিদ্রোহী' -পরিক্রমা বলা যায়।

'বিদ্রোহী'তে নজরুল ইসলামের যে উপলব্ধি তা হচ্ছে— মানব-জীবনের পক্ষে এক মহা ও বিস্ময়কর উপলব্ধি। কুরআন-উল-করীমে যাকে বলা হয়েছে 'লা শরীক আল্লাহ' যার নিরানব্বই নাম বা গুণাবলী এ বিশ্বভুবনে নানারূপে প্রকাশিত, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ এবং গীতায় যাকে বলা হয়েছে পুরুষোত্তম, প্যাগান ধর্মে এ বিশ্ব-প্রকৃতিকেই একমাত্র সত্তা বলে উপাসনা করার যে রীতি রয়েছে, বিদ্রোহীর প্রচণ্ডতম বিদ্রোহের অন্তরালে সে ধারাগুলোও বর্তমান। তার সঙ্গে রাজনৈতিক অসাম্য, অর্থনৈতিক শোষণলোলুপতা, অবিচার, অত্যাচার, মানবমানসে বিরাজমান সৌন্দর্য-স্পৃহা বা যৌন-লিপ্সা প্রভৃতি নানা ধারার সমাবেশে গঠিত মানসে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তা' বিশ্ব-সাহিত্যে এক অনন্য অবদান। এজন্য নজরুলের এ আদি উপলব্ধির বিকাশের ধারাকে কোনও বিশেষ সূত্রের আলোকে বিচার করা একদেশদর্শীতারই অপর এক নাম।

'বিদ্রোহী'র দীর্ঘ পরিসরের মধ্যে বর্তমান ও স্থিতিশীল পৃথিবীকে ধ্বংস করে তার স্থলে এক আদর্শিক জগৎ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা অতিশয় স্পষ্ট,

আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল

অথবা * * *

আমি শ্রাবন-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা,

প্রভৃতি বিনাশ-মূলক উক্তি নব-সৃষ্টিরই প্রস্তুতি। সে বিদ্রোহীর মধ্যেই রয়েছে,

আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,
আমি ধন্যি—

সেই ষোড়শীর হৃদি সরসিজ থেকে প্রেমাস্পদের জন্য যে আকুলতা বা ব্যাকুলতা তা প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তীকালে,

সখি পাতিস্‌নে শিলাতলে পদ্মপাতা—
সখি দিস্‌নে গোলাপ ছিটে খাস্ লো মাথা!
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি-চন্দন
কমলী মালা—
সখি দিস্‌নে লো দিসনে লো, সে বড় জ্বালা—
[ফাল্গুনী]

সর্বভূতে একমাত্র ব্রহ্মসত্তার স্থিতির যে অনুভূতি তাঁর কোন কোন গীতি-কবিতায় তার প্রকাশ ঘটেছে এমনি ভাবে,

আজ কাশবনে কে শ্বাস ফেলে যায়
মরা নদীর কূলে
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায়
অড়হরের ফুলে
ঐ বাবলা ফুলে নাক-ছবি তার
গায় শাড়ী নীল অপ্‌রাজিতার
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে

অথবা

হয়তো তোমার পাবো দেখা
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা
ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে
আলোর পথে বিজন ঘাটে
হয়ত এসে মুচকি হেসে
ধরবে আমার হাতটি একা—
ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা
তোমার চাওয়া
আনলে খবর গোপনদূতী দিকপারের
ঐ দখিন হাওয়া
[আশা]

'বিদ্রোহী'তে এ দুনিয়ার নানাবিধ অন্যায়, অত্যাচার অবিচার থাকা সত্ত্বেও পরম সত্তার যে স্বাদ কবি পেয়েছিলেন, তারই বাস্তব উপলব্ধি রয়েছে,

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়

* *

আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারই গলে দোলে হায়

[আপন-পিয়াসী, ছায়ানট]

নজরুলের বিদ্রোহ যে কেবল শাস্ত্র-শকুনীদের বিরুদ্ধেই ছিল তা' নয় যারা

এবিশ্বে আল্লার, গডের বা ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে তাঁকে তাঁর সৃষ্টি বা প্রকাশের অন্তরালে রেখে, তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে অজ্ঞ ও অচেতন মানুষের উপর নানাবিধ অত্যাচার করেছিলেন তা নয়—যারা নানা জাতীয় কলাকৌশলের আবরণে মানুষকে সতত শোষণ করে চলেছে এবং তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করার সুযোগ দিতে সম্পূর্ণভাবে অসম্মত, এজন্য তিনি 'বিদ্রোহী'তে ঘোষণা করেছিলেন,

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবে শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত!
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত।

এভাবেই পরবর্তী ভাষ্য হচ্ছে,

তোমার দত্ত হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী–
ক্ষুধা, তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ
আমিও মানুষ, আমিও মহান
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই
খাড়া গর্দান
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান
এতদিনে ভগবান—

নজরুল যে সত্য-শিব -সুন্দরের অন্বেষায় ছিলেন নিয়ত রত এবং 'বিদ্রোহী'র পর্যায়ে তার মধ্যে প্রতিভাসিত যে সব অত্যাচার লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁর এ অন্বেষার সমাপ্তিতে তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন,

আমি ভাই ক্ষ্যাপ্যা বাউল, আমার দেউল
আমারি এ আপন দেহ—
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির গেহ।
[বন-গীতি]

কেবল এখানেই তাঁর উপলব্ধির পরিসমাপ্তি হয়নি। তার পরেও আরও পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,

এ দেহেরই রঙ মহলায়—

খেলিছে লীলাবিহারী
মিথ্যা মায়া নয় এ কায়া—
কায়ায় হেরি ছায়া তারি—

নজরুল-দর্শনের বিবর্তনের ধারা আলোচনা করলে তাই স্পষ্টই দেখা যায় তাঁর কাছে ছিল এক আদর্শিক পরম সত্তার জগতে পরম সত্য। যেখানে সৎচিৎ ও আনন্দস্বরূপ এক পরম সত্তা বিরাজমান এবং যে সত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মানবাত্মার সত্তায় রয়েছে আকুল আবেগ। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তা অনুভব করা যায়। এ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা অভিন্ন। জীবাত্মার স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করলে তাকে পরমাত্মারই এক অতিশয় নিকট-অংশ বলে উপলব্ধি করা যায়। এ বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র যে সত্তা বর্তমান তার ভ্রম বা অধ্যাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারিনে।

এ জগতে যে দ্বন্দ্ব, যে অত্যাচার অবিচার চলেছে তার মূলে রয়েছে আমাদের জ্ঞানের অভাব। আমরা পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি না বলেই একে অপরের সঙ্গে উৎপত্তি সূত্রে এক হয়েও অনবরত দ্বন্দ্ব কোলাহল করেই চলেছি।

নজরুলের বিদ্রোহ তাই পরম সত্তার বিরুদ্ধে নয়,—তার বিদ্রোহ হচ্ছে প্রতিভাসিত সত্তার বিকট রূপের বিরুদ্ধে। যে সত্তা সত্য নয়,—অথচ পরম সত্য বলে দেখা দিয়ে মানব-জীবনে এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সৃষ্টি করেছে এবং তার এ বিকৃত রূপকে যারা পুঁজি করে অপর জীবকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে, সে প্রতিভাসিত সত্তার বিরুদ্ধেই প্রকাশিত হয়েছে।

'বিদ্রোহী'তে নজরুলের যে প্রচণ্ড বিদ্রোহের হুংকার প্রকাশিত, তার অন্তরালে আদি ও অবিকৃত সত্তার স্থিতির আভাস পাওয়া যায় এবং তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে এক দিকে ক্ষ্যাপা বাউলের-ভাষায় অপর দিকে বাকুনিনের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য এ দু'টো পরস্পরবিরোধী ধারা কিভাবে একত্রিত হ'তে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে ওঠে। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় নজরুল যে সত্যের সন্ধানে ছিলেন তা কেবল সৎ বা চিৎ নয়—তাতেও শুভ বা মঙ্গল রয়েছে। ঐ তিনটে গুণের সমাবেশ যে সত্যের মধ্যে বিরাজমান, তার মধ্যে কেন এত অমঙ্গল, কেন এত অন্যায় ও অবিচার? তার কারণ হচ্ছে, সে সত্যের সত্যিকার রূপ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতা। নজরুল তাই সে অধ্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং বিদ্রোহের মধ্যেই তার নিরসনের ইঙ্গিত পেয়েছেন।

১. (ক) দ্রষ্টব্য ঃ 'কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান', আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সওগাত, পৌষ ১৩৩৩।
(খ) 'অগ্নিবীণা'র সমালোচনা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ' ১৯২২..

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ২য় সংকলন]

মায়াকভস্কি ও নজরুল

আলাউদ্দিন আল আজাদ

১

আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের বহুমাত্রিক প্রেক্ষিতে কোনো ভাষার যে-কোনো একজন বা একাধিক কবি ও লেখকের মূল্যায়ন বিচিত্রমুখী রূপ লাভ করেছে, আমরা দেখতে পাই। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রেও ইউরোপীয় ধ্রুপদী চৈতন্যভাণ্ডার ও তার পরবর্তী সম্প্রসারণেরই প্রাধ্যান্য। আদি রোমিন্টিসিজমের পরে উনিশ শতকের শেষপাদে ফরাসী প্রতীকী আন্দোলন একটি সুদূরপ্রসারী সৌন্দর্যতাড়িত উদ্ভাসন ছিল; এবং বিশ শতকের প্রথম দশকের রূপকল্পবাদ ও পরবর্তী পরাবাস্তব ও অস্তিত্ববাদ নতুন নতুন অন্বেষণের দরোজা খুলে দিয়েছে। এমনকি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নিরিখে নিহিত রক্ষণশীল সমালোচনা ধারায়ও এমন রূপান্তর এসেছে যে অনেক সময় তার মূলকে চেনা মুশকিল। এইসব স্রোতের অনিবার্য প্রসারে গত তিনদশকের বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি ও ত্বরিৎ নিঃসরণ, যেগুলোর অন্যতম আমেরিকায় বিশেষভাবে বিকশিত গড়নবাদ, বিগঠন, চিহ্নতত্ত্ব ও নতুন সমালোচনা।

সাম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক বিশেষীকরণ বিস্ফোরণের পাশাপাশি এইসব নন্দনতাত্ত্বিক তৎপরতা আমাদের জ্ঞানানুশীলনের পরিধি বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সংকটকেও ঘনীভূত করে তুলেছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিশ্লেষণকে আমরা যত সূক্ষ্মমার্গেই ঠেলে নিয়ে যাই না কেন, সাহিত্য ও শিল্পকলার ধ্রুপদী প্রতীতী যে মানবতার উজ্জীবন ও রসনিবৃত্তি, তাকে অস্বীকার করতে পারি না। এই বোধের অভাবটাই সংকট।

এই সংকটকে ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে ওঠার অর্থ বিশ্ব-সভ্যতার নব উত্তরণের ক্ষেত্রের অবদান।

সৌন্দর্যতাত্ত্বিক জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে, তুলনামূলক সাহিত্য একদিকে যেমন তার ধারণ সরোবর অন্যদিকে উত্তরণের উপাদানেও ভরপুর।

আমার বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু মায়াকভস্কি ও নজরুল, যেখানে দুটি পৃথক ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ঝড়োপাখির মতো কীর্তিত এই দুই প্রখ্যাত কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনাই মুখ্য; কিন্তু সেখানেই আমার অন্বেষণ নিঃশেষিত

হবে না। উভয়ের জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, তাদের বিপ্লব ও হতাশা এবং অন্তিম করুণ পরিণতি—সাহিত্য জগতে অবশ্যই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে সমকালীন সামাজিক গতিতত্ত্বের প্রতিফলন সহজেই লক্ষণীয়; এবং তাঁদের কবিতারও সমান্তরাল বিশ্লেষণ নতুন নতুন শিল্পরহস্যের সন্ধান দেবে তাতেও আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই সমস্ত বিচিত্রধর্মী উপাদানের মাধ্যমে এই দুই মহান কবি, যুদ্ধ ও অর্ন্তদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, যার গড়নাম মানবমুক্তি,-এর দিকে রক্তাক্ত চরণে কিভাবে এগিয়ে গেছেন, তার আবিষ্কার ও পরিমাপ আমি করতে চাই। আমার গন্তব্য বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের খাদে নিমজ্জিত, বন্দী না থেকে বিশ্বমানবিক চেতনা ও কল্যাণের দিকে দুর্গম পথযাত্রায়।

আমার গবেষণার এই ভূমিকা-অংশে, একটি পরিষ্কার পটভূমি তৈরির প্রয়োজনে তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে দু'চারটি কথা বলতে আমি ইচ্ছুক। একটু দৃষ্টিপাত করলেই আমরা দেখবো, তুলনা জিনিসটা কেবল সমালোচনা নয়, ভাষারও প্রাণবস্তু। পৃথকীকরণ ও প্রতীকধর্মিতা থেকে ভাষাকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না তেমনি সাহিত্যও, তার উপাদান ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উভয় দিক থেকেই, নিরন্তর বাছাইয়ের খাত বেয়ে চলে; এবং তার রয়েছে, একই সঙ্গে বহুমাত্রিক ক্রিয়াশীলতা। যেমন একজন লেখক যদি 'শিক্ষিত' (প্রকৃত লেখককে 'শিক্ষিত' না হয়ে উপায় নেই) হন, এবং তিনি হন একজন আধুনিক কবি, তাহলে উপাদানের ক্ষেত্রে তার মনে যে তুলনামূলক প্রবাহ চলে তার গতি গতানুগতিকতা থেকে অভিনবত্বের দিকে, সারল্য থেকে জটিলতায়ঃ আপন অভিজ্ঞতাকে, কতকটা যেন অভ্যাসবশতই, কোনো বিদেশী প্রতিরূপের পটে ফেলে যাচাই করে না নেয়া পর্যন্ত তার শান্তি আসেনা। তার প্রকাশ-মাধ্যম, অর্থাৎ ভাষা এবং শ্রেণীও, একই অবিচ্ছিন্ন সংগঠনের অংশ, প্রায়শই।

এই অনুপ্রবেশ ও অন্বেষণ চলতিকালের প্রায় সব প্রাগ্রসর সাহিত্যেরই সাধারণ প্রবণতা, যার প্রধান লক্ষ্য নিশ্চয়ই শিল্পমুক্তির আকাঙ্খা। এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রধানত পাউণ্ড ও এলিঅটের কাজের মারফত এ সম্পর্কে নতুন চেতনা এলেও, তার আদি উৎস অত্যন্ত প্রাচীন, এমনকি গ্রীক ক্লাসিকের পথ ধরে ইউরোপীয় রেনেসাঁরও পূর্ববর্তী। এইখানে যে ইঙ্গিতটি আমি করতে চাই, তাহলো, সাহিত্যের স্বাভাবিক তুলনাধর্ম এবং লেখক বিশেষের দুই বা ততোধিক ভাষাচারিতা, তুলনামূলক সাহিত্যের আলাদা সত্তার যৌক্তিকতাকে মোটেই দুর্বল করে না; বরং সে যেন অস্তিত্বেরই পরোক্ষ প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ তুলনাশীলতা ও আন্তর্ভাষা বিচরণের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উৎস থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যের জন্ম; এবং একটি আলাদা বিদ্যা হিশেবে তার ক্রমান্বয়ে বিকাশ। গেটের বিশ্বসাহিত্য (weltliterature) এবং ম্যাথু আর্নল্ডের বিশ্লেষণী অনুশীলন তার নিকটবর্তী ভিত্তি।

তুলনামূলক সাহিত্যকে স্বতন্ত্রবিদ্যা হিশেবে নেয়ার দার্শনিক তাৎপর্য মূলত তিনটি— আহরণ, সমন্বয় ও সৃষ্টি।

বর্তমানকালে তরজমার মারফত বিদেশী সাহিত্যের অনেক ভালো রচনাই আমরা হাতের কাছে পাই; এর উপর নতুন নতুন ভাষা শিখলে, সেই সমস্ত ভাষার সারবস্তু সহজেই এসে যাবে আমাদের চোখের কাছে। এগুলো একান্ত ব্যবহারিক অনুবাদ, সন্দেহ নেই; তবু তা হবে যথেষ্ট মূল্যবান। এই যে অন্য ভাষার নির্বাচিত রচনাবলীর পাঠযোগ্য রূপান্তর তাকেই আমি বলছি আহরণ—বইয়ের জগতে যার সংখ্যাগত বিস্তৃতি একদিকে একটি ভাসমান তুলনাশীলতা অন্যদিকে আন্ত-উর্বরতার একটি অবস্থা। এরকম রচনা কার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে আমরা জানিনা; তবে সে যুগপৎ জ্ঞান ও প্রেরণার কারণ হতে পারে, তা ঠিক। এগুলো, দ্বিতীয় স্তর, মানে সমন্বয়ের সঙ্গেও বিজড়িত। সেখানে একটি প্রধান পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে সমালোচনা - সমন্বয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে কোনো অন্ধ আবেগ ক্রিয়াশীল থাকতে পারে অবশ্যই; কিন্তু বেশীক্ষণ অচেতন থাকতে পারে না প্রকৃত সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। সমন্বয়, একদিকে সমালোচক অন্যদিকে শিল্পীর সজ্ঞান সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে রূপময়; এবং সে হিসেবে তা তুলনামূলক সাহিত্যের শাঁস হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য; এবং সচেতন সমন্বয়ের স্রোত থেকে ফুটতে পারে, ফোটে, সৃষ্টির শাপলা, লালকমল-নীলকমল।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, মধ্যযুগ থেকেই, অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার মতোই বাংলা ভাষা বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার সংস্পর্শে এসেছে এবং উপরোক্ত প্রক্রিয়ান্তর সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী থেকে অনুবাদ এই প্রবাহের একটি প্রধান ভিত্তি। এবং আধুনিককালে, বিশেষ করে ইংরেজি মারফত ইংরেজি সাহিত্য ও বৃহত্তর ইউরোপীয় সাহিত্য বাঙলা ভাষায় তরজমা ও রূপান্তরিত হয়ে উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাভাষায় অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের এই ভাসমান ঐতিহ্য যে কি ধরনের প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে আমার বর্তমান গবেষণায় আত্মনিয়োগ তারই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সম্মান পড়ার সময় কিছু তুলনামূলক আলোচনা পড়েছিলাম, যেমন কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের উপমা ; কিংবা হোমারিক রূপকল্প ও মেঘনাদবধ কাব্য; কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তার বিশিষ্ট প্রমাণ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপরে রচিত আমার গবেষণার দু'টি পরিচ্ছেদে রয়েছে। 'তুলনামূলক সমালোচনা' যা সম্ভবত বাংলা ভাষার এতৎসম্পর্কিত একমাত্র গ্রন্থ তখনো আমার হাতে আসেনি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে শিক্ষাসচিবের কাজে যোগ দিয়ে

একদিন মায়াকভস্কি যাদুঘরে বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে দেখতে আমার মনে যে বর্তমান অধ্যয়নের কথা হঠাৎ জেগে উঠল, তার পেছনে উপরোক্ত পটভূমির যোগসূত্র থাকলেও প্রকৃত কারণ সম্ভবত ভিন্নতর। প্রথমেই মায়াকভস্কির তরুণ কালের প্রতিকৃতিতে তাঁর জলন্ত চোখ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, যার সঙ্গে নিকট সাদৃশও আমাদের সাহিত্যে তরুণ নজরুল-প্রতিকৃতির। উভয় কবির এই দৃষ্টির ব্যাখ্যা অফুরন্ত হতে পারে, কিন্তু একটি ব্যাখ্যা প্রাথমিক, তা'হল মানবযৌবন, বিপ্লব ও ভবিষ্যৎ। আপন জমিদারিতে, বিশাল বাসভবনে রক্ষিত তলস্তয়ের গ্রন্থাগার, লেখার সরঞ্জাম ও পিয়ানো দেখে আমার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়েছিল, এবং লেনিনগ্রাদে পুশকিন কোয়ার্টারে পুশকিনের স্টাডিতে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার হৃদয় একটা আবেগের আগুনে উদ্দীপ্ত ছিল। সেই সঙ্গে, তুলনামূলক সাহিত্যের সীমানার ভিতরে আমার চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হোক, তা'ও আমি চেয়েছিলাম।

তুলনামূলক সাহিত্যের উর্বরতা সঞ্চারের ক্ষমতা, তার বিশ্বমানব সংস্কৃতির ভূমিকা এবং তার আকাদেমিক ঔচিত্য সম্পর্কে এখন আর কোনো প্রশ্ন না থাকলেও সে যে এখনো উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি তা মানতে আমরা রাজী। ইংলণ্ডের কোনো ইউনিভার্সিটিতেই তার জন্য কোন আলাদা বিভাগ নেই, যদিও বিশেষ অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে পড়াশোনা ও গবেষণা করা যায়; ইউরোপেও তার প্রসার নগন্য; এবং সমাজতন্ত্রী দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী সাহিত্যের যথেষ্ট তরজমা হয়ে থাকলেও তা তুলনামূলক সাহিত্যের অঙ্গ নয়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম আমেরিকা, যেখানে তার প্রসার অন্তত চোখে পড়বার মতো। এর কারণ বোধ হয় আমেরিকান সংস্কৃতির বিশেষ অবস্থান।

এখানে স্মরণ করছি, তিরাশির শেষদিকে আমার আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল; আমি ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে যখন যুক্ত ছিলাম, তখন ওখানকার তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের দু'জন খ্যাতনামা অধ্যাপকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে, যাদের দু'জনেই ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত। তখন বিভিন্ন আলোচনার সময় মনে হোত, আমেরিকান সংস্কৃতির বিশেষ অবস্থানের অর্থ সে একদিকে নিরন্তর ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে স্নানরত, অন্যদিকে অন্তত ছয় সাতটি জাতিগত নদী প্রবাহে বিচরণ করছে, যেহেতু আমেরিকান এক বিমিশ্রিত জনসমাজ। এদিক থেকে হয়তো মিথ্যে নয় আমেরিকান হয়ে জন্মাবার সুবিধে সম্পর্কে হেনরী জেয়সের মন্তব্যঃ আমাদের নয় এমন সভ্যতার রূপ নিয়েও আমরা স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করতে পারি; আমরা পারি কুড়িয়ে নিতে, বাছাই ও সমন্বয়—এক কথায় যেখানে যা পাই আমাদের সম্পত্তিরূপে তাকে অধিকার করতে।

এজরা পাউণ্ডের বক্তব্য যেন তারই পরবর্তী ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণঃ আমাদের সুযোগ লিওনার্দোর চেয়েও বেশী—আমাদের অনেক বেশী খাদ্যগ্রাহী প্রত্যঙ্গ; একটি মাত্র ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার দায় আমাদের নেই—আমাদের রয়েছে মহাচীন ও মিশর এবং পৃথিবীর ছাদের উপর ছড়ানো অজস্র অজানা দেশ, খোটান, কারাশার ও কানসু।

স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত তুলনামূলক সাহিত্য অনুশীলনের জন্য বিশেষ উপযোগী, এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা। প্রথমত, একটি আলাদা রাষ্ট্রীয় পরিবেশে আমাদের যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার স্বাতন্ত্র্য, সৌন্দর্য ও প্রগতিশীলতা ভবিষ্যৎমুখী এবং মুক্তিযুদ্ধের মানসিকতা ও শিক্ষা তাকে আরো মৌলিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমতাবস্থায়, অত্যন্ত সহজে আমরা বাইরের পানে তাকাতে পারি। পৃথিবীর সমস্ত দেশে ভাষা ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের ধারায় অবগাহন করবার প্রেরণা রয়েছে আমাদের অস্থিমজ্জায়, রক্তধারায়। দ্বিতীয়ত, নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এবং ক্রমে ক্রমে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে উঠছে এদের সঙ্গে। অতএব সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পারস্পরিক যোগাযোগ অনিবার্য। এবং এও বোধ হয় সত্য যে, বাংলাদেশের সাহিত্য হিসেবে ওসব ভাষায় অনূদিত হবে বিগত সাঁইতিরিশ বছরেরই বাছাই করা বাংলাদেশ সাহিত্য এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত রচনাবলী। তৃতীয়ত বিপুল রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আমরা জন্মেছি, সুতরাং আন্তর্জাতিক মানবসাহিত্য আমাদের অনুশীলনের জিনিস, আয়ত্তের জিনিস। পাশ্চাত্যকে আমরা ধারণ করবো, এবং প্রাচ্যকেও; পাশ্চাত্যের জীবনতৃষ্ণার সঙ্গে প্রাচ্যের মরমীয়তাকে সমন্বিত করার সুযোগ আমাদের সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই সবচেয়ে বেশী।

একটি গুরুতর কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংস্কৃতির এই সম্ভাবনার দিকটিকে কিঞ্চিৎ উন্মোচিত করাও আমার বর্তমান গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেজন্য তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি 'তুলনামূলক' আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছি, যা সম্ভবত আমাদের দেশে তুলনামূলক সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ। মায়াকভস্কির জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে আসবে রাশিয়ার ইতিহাস, ঐতিহ্য সমাজ ও বিপ্লবের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং যুগপৎ সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন ও সাহিত্যিক রূপান্তরের নানামুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা, যা আধুনিক মানব সংস্কৃতির একটি প্রধান তরঙ্গ; অন্যদিকে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্মের মধ্যেও ভারত ও বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও ধ্যানধারণা বিজড়িত। এবং এরই মধ্যে নিহিত উভয় কবির জীবনের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি। আমার পরিকল্পনায়,

পূর্বে উল্লেখিত গন্তব্যের লক্ষ্যে, স্পষ্টতার খাতিরে প্রথম পরিচ্ছেদঃ মায়াকভস্কি ও নজরুল—সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, তুলনামূলক পর্যালোচনা।

প্রথম অধ্যায়

তুলনামূলক জীবনচরিত

আমরা সহজেই বলতে পারি যে-কোনো শিল্পীর রচনাবলী এক অপূর্ব পুষ্পসম্ভার, কিন্তু তা নিশ্চয়ই আকাশকুসুম নয় এবং যে-মাটির মধ্য থেকে ও যে-মাটিকে আশ্রয় করে সে ফুলগাছের জন্ম ও প্রস্ফুটন, তা শিল্পীর আপনজীবন। সেজন্য বলা হয়, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রচনাই লেখকের জীবনচরিত। সে হিশেবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের যে-কোনো পর্যালোচনায় সে জীবনের প্রতি সংকেত ও তার সমীক্ষা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে, মায়াকভস্কি ও নজরুলের মতো তাৎক্ষণিক সংবেদনশীল বেপরোয়া উচ্চকণ্ঠ কবিদের পক্ষে তা আরো বেশি করে সত্য। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁদের জীবনের তুলনামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে তাঁদের সৃজনধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উৎস নির্ণয় করবো।

এই দুই মহান কবির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের উপস্থাপনা ও পর্যালোচনার আগে প্রথমেই বলতে চাই যে, ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় সমসাময়িক কবি এবং তাঁদের জীবনচরিত ও সৃষ্টিকর্মে এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আর কখনো কখনো ব্যতিক্রমও রয়েছে, যার ফলে তাঁরা সহজেই তুলনামূলক আলোচনার আওতায় এসে পড়েছেন। আমি একদিকে রুশ সাহিত্য ও সমাজ এবং অন্যদিকে বাংলা সাহিত্য ও সমাজকে পটভূমি হিশেবে প্রত্যক্ষ রেখে এই দুই অনন্য সাধারণ শিল্পীর প্রতিকৃতির সঠিক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবো; কিন্তু দুইজনের কবিতা পর্যালোচনার ভাষাগত পরিমাপ যে হবে পারস্পরিক প্রতিরূপ নয় বরং সমান্তরাল অন্বেষণ, তা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রকৃত তরজমার মতোই এই ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য।

জীবনের সূত্র ধরে শুরু করলে দেখতে পাই, অক্টোবর বিপ্লবের বছরে (১৯১৭) মায়াকভস্কি চব্বিশ বছরের যুবক এবং এই একই বৎসর থেকে নজরুল বাঙালী পল্টনের সদস্য হিসেবে করাচী সেনানিবাসে অবস্থান করছেন। জন্ম তারিখের দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি থেকে বছর ছয়েকের ছোটো[১] কিন্তু মাত্র সাঁইতিরিশ বছর বয়সে মায়াকভস্কি যখন আত্মহত্যা করেন তখন ত্রিরিশ বছর বয়স্ক নজরুল সৃজনশীলতা ও খ্যাতির তুঙ্গে উঠেছেন।

মায়াকভস্কি। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে ১০টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁর মস্কোস্থ বাসকক্ষে পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এর

দু'দিন আগে (১২ই এপ্রিল, ১৯৩০) তিনি যে একটি মৃত্যুপূর্ব পত্র রচনা করেন, তার বাংলা তরজমা নিম্নরূপ ঃ

সকলের প্রতি[২]

কাউকে অভিযুক্ত করো না আমার মৃত্যুর জন্য, প্লিজ বদনাম কি দুর্নাম রটায়ো না। মৃতব্যক্তি এটা কোনদিনই সহ্য করতে পারেনি।

মা বোনেরা, বন্ধু-সাথীরা, ক্ষমা করো এভাবে চলে যাওয়াকে (অন্যকে এ পথ গ্রহণ করতে উপদেশ দিই না) কিন্তু আমার অন্য কোনো উপায় ছিলো না।

লিলিয়া — ভালোবেসো আমাকে।

বন্ধু সরকার, আমার পরিবার — লিলিয়া ব্রিক, মা-বোনেরা, এবং ভেরোনিকা বিতলদভনা পালোনস্কায়া।

যদি তুমি তাদের সচ্ছল জীবন-যাপন করতে দাও—

তখন ধন্যবাদ।

সবে শুরু করা কবিতাটি ব্রিক পরিবারকে দিও— তারা ঠিকই বুঝে নিতে পারবে।

লোকে যেমন বলে—
'ঘটনাটির যবনিকাপাত ঘটেছে'।
ভালোবাসার তরী
ভেঙে গেছে সংসারের ঘাতে
জীবনের সাথে হিশেবনিকেশ আমি দিয়েছি চুকিয়ে,
নেই আর কারো সাথে লেনদেন
পরস্পরের প্রতি ব্যথা দেওয়া
দুঃখ
আর অভিমান
সুখী হও ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি।
১২.৪.৩০

বাপ বন্ধুরা, আমাকে নিষ্ঠুর ভেবো না।
সত্যই বলছি, কিছুই করার উপায় ছিলো না।
সালাম।
এরমিলভকে বলো, দুঃখ আমার — ওর বিরুদ্ধে শ্লোগানটি
উঠিয়ে নিয়েছিলাম, দরকার ছিল আরো বকাবাদ্যের
ভি. এম.
টেবিলে আমার ২০০০ রুবল ইনকাম্ ট্যাক্স কেটে নিও
বাকীটা পাবে গির্জার কাছে।

ভি. এম.

এই পূর্বপত্রে যে ঘটনাবলী ও আত্মজৈবনিক উপাদানের প্রতি সংকেত রয়েছে, বর্তমান আলোচনায় ক্রমান্বয়ে তা উদ্‌ঘাটিত হবে, কিন্তু এখানে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, মায়াকভস্কির আকস্মিক ও নাটকীয় মৃত্যু তাঁর নিজের ফেলে যাওয়া কোনো দলিলের সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। এ মৃত্যুর সঠিক ইতিহাস নির্ণীত হয়েছে, কিন্তু এতদ্‌সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সমকালীন সাহিত্যিক মহলে তো বটেই তখনকার তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষেও বিশেষ সুখদায়ক ছিলো না। চতুর্দিকে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।[৩] সরকার ও তার সাহিত্য মুখপাত্ররা দারুণ বেকায়দায় পড়ে গেলেন এবং কবির মৃত্যুর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে অবস্থান করেছে।[৪] রোমান জ্যাকভ্‌সন মন্তব্য করেছেন, এই মৃত্যু সম্পর্কে সোভিয়েত ঘোষণাবলী মায়াকভস্কির কমিক চরিত্রেরই সাদৃশ্য সম্পন্ন।[৫] পরবর্তীকালে বিষয়টা যখন ইতিহাসের সামগ্রী, বৃত্তান্তবিদেরা আত্মহত্যার প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন এবং শুধু লিখেছেন, '১৯৩০— মায়াকভস্কির মৃত্যু'। সোভিয়েত মনস্তত্ত্বে মায়াকভস্কির মৃত্যু এক বিশ্বাসঘাতকতা, এক ক্ষমার অযোগ্য দুর্বলতা এমন একজনের মধ্যে যিনি সোভিয়েত যুগের 'সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কবিরূপে নন্দিত হয়েছেন'।[৬] বহির্বিশ্বে একে কেন্দ্র করে যে প্রতিক্রিয়া তা অনেক ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা কিংবা তার প্রতি কটাক্ষও ধারণ করেছে, সাম্প্রতিক কালেও যার জের চলেছে, দেখা যায়।[৭]

ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই, সোভিয়েত নতুন বর্ষপঞ্জী অনুসারে ১৯শে জুলাই তারিখে জর্জিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বাগদাদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] গ্রামটি কুতায়িস প্রদেশের অন্তর্গত। তাঁর পিতার নাম ভ্লাদিমির কনস্তানতোনোভিচ এবং মা'য়ের নাম আলেকজান্দ্রা আলিক্সেয়েভনা। পিতা বাগদাদী অঞ্চলের বনকর্তা (Forest Ranger) ছিলেন। তাঁর দুই বোন লুদা ও ওলিয়া এবং ফুফু আজিওতা। এই পরিবারের আর কেউ ছিলেন না।[৯]

'আমি স্বয়ং' ১০ আত্মচরিত পুস্তিকায় মায়াকভস্কি ছোটবেলার যে স্মৃতিচিত্র দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্তসার এখানে উল্লেখযোগ্য'

> প্রথম স্মৃতিচিত্র : ছবি সম্পর্কে ধারণা। স্থান অজ্ঞাত, সময় শীতকাল। পিতা রোদিনা[১১] নামের একটি রস ও ব্যঙ্গপত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাতে কৌতুককর জিনিশ আলোচিত ও দেখা হোত। তিনি ঘুরঘুর করে গাইতেন মার্সেলাইয়ের প্রথম চরণ যেখানে 'তিনবার' কথাটা রয়েছে কিন্তু তিনি উচ্চারণ করতেন রাশিয়ার শব্দের মতো যার অর্থ 'চারবার'। ব্যঙ্গপত্র আসে যথারীতি, খুললে দেখা যায় এক মহিলা ও চাচাজান চুমোচুমি করছেন। পরে দেখা গেল, ক্রোড়পত্র আসে এবং তাতে সত্যই কিছু হাসির খোরাক

আছে; কিন্তু মনে হল, অন্যরা ওসব নয়, বরং আমাকে নিয়েই হাসাহাসি করছেন। এভাবে ছবি ও রসিকতার মধ্যে পার্থক্য।

দ্বিতীয় স্মৃতি ঃ কবিতা সম্পর্কে ধারণা। গ্রীষ্মকাল, অজস্র দর্শনার্থীর ভীড়। একজন লম্বা সুদর্শন ছাত্র, নাম যার গ্লুশকভস্কি, একটা চামড়া বাঁধাই এলবাম দেখালেন, তার পাতার মধ্যে ছাপানো পায়জামাহীন, কিংবা গায়ে লেপটে থাকা পোশাকধারী একটা লোক—নাম ইউজিন অনিগিন। বোরিয়া এবং ছবির লোকটা সব পরিষ্কার বোঝা যায়। আমি ভাবলাম, এই বোরিয়াটা একটা ইউজেশিয়ান ছোকরা। এই ধারণা বছর তিন অব্যাহত ছিল।

তৃতীয় স্মৃতি ঃ বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধারণা। রাত্রি, পাশের কামরায় বাপ ও মায়ের অন্তহীন ফিস্‌ফাস্ সংলাপ। বিষয়টা, গিয়ানো। সারারাত ঘুমাই নি। একটি মাত্র কথা আমার মগজে খেলা করছিল ঃ সকালে উঠে দৌড়ে গিয়ে জিগগেস করলাম, 'বাবা, কিস্তি জিনিশটা কি ?' জবাবে খুশি হোলাম।

আত্মচরিত 'আমি স্বয়ং' পুস্তিকায় ভ্লাডিমির মায়াকভস্কি আরও লিখেছেন,

রোমান্টিসিজমের মূল ঃ প্রথম বাড়িটি পরিষ্কার মনে করতে পারি। দোতলা, দ্বিতীয় তলাটি আমাদের। প্রথম তলায় মদের দোকান। বছরে একবার আঙুর ফলের গাড়ি। আঙুরগুলো নিঙড়ানো হোত, আমি খেতাম। ওরা করত পান। বাগদাদীর কাছে চতুর্দিকে ছিল অত্যন্ত প্রাচীন জর্জিয়ান দুর্গের এলাকা। দুর্গটিকে ঘিরে একটা স্কোয়ার আকৃতি সামন্ত দেয়াল। আর দেয়ালগুলোর কোণে কামান রাখার বেদীসমূহ। দেয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুরুজ। আর দেয়ালের বাইরে গভীর গর্ত। গর্ত ছাড়িয়ে জঙ্গল আর শেয়াল। জঙ্গলকে ঝুলিয়ে রেখে পাহাড়শ্রেণী। ক্রমশ: উঁচু, যেন দৌড়ে যাবে উচ্চতম বিন্দু পর্যন্ত। উত্তর দিকে অবনত পাহাড় এবং সেখানে পাহাড়শ্রেণীতে ফাঁকা। সেখানে, আমি কল্পনা করতাম, সেখানে রাশিয়া রয়েছে। গভীর আগ্রহ ছিল আমার সেখানে যেতে।

লেখাপড়া ঃ আমার মা পড়াতেন এবং সব ধরনের মহিলা আত্মীয়েরাও। অংককে মনে হল অবিশ্বাস্য। ছেলেদের দেওয়া আপেল ও নাসপাতি গুণতে হোত, কিন্তু আমি গুণতাম না, এমনিতেই দিয়ে দিতাম। ককেশাসে প্রচুর ফল-মূল। আমি শিখি আনন্দের সঙ্গে।

প্রথম বই ঃ পাখি বিক্রেতা আগাকিয়া একই। এ সময় এমনি রকম আরও কয়েকটি পুস্তক হাতে এলো, আমি লেখাপড়া বন্ধই করে দিতাম। সৌভাগ্যক্রমে, দ্বিতীয় বইটি ছিল ডনকুইকসোট। হ্যাঁ, বই বটে। আমি কাঠের তলোয়ার ও বর্ম বানিয়ে ফেললাম এবং সবার ও সবকিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

পরীক্ষা ঃ বাগদাদী থেকে কুতাইস গমন, উচ্চবিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হোলাম। নোঙর সম্পর্কে প্রশ্নাবলী (আমার জামার আস্তিন সম্পর্কে— উত্তম জবাব দিলাম। কিন্তু বিদ্যালয়ের যাজক জিগগেস করলেন ঃ বল ও কো (O Ko) তে কি বোঝায়। আমি উত্তর দিলাম, তিন পাউণ্ড (জর্জিয়ান ভাষায় এই তার অর্থ)। সজ্জন পরীক্ষক বুঝিয়ে দিলেন 'ও কো' হচ্ছে ' চোখের' প্রাচীন চার্চ স্লাভনিকশের। আমার ফেলমারা ছাড়া উপায় রইল না। তাই আমার মনে অতিশয় বিদ্বেষ জন্মাল —যা' কিছু প্রাচীন তার বিরুদ্ধে, যা কিছু চার্চ তার বিরুদ্ধে এবং যা' কিছু স্লাভনিক তার বিরুদ্ধে; সম্ভবতঃ এ থেকে উদ্ভব হয়েছে আমার ফিউচারিজম (Futurism), আমার নিরীশ্বরবাদ এবং আমার আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)।

উচ্চবিদ্যালয় ঃ প্রস্তুতি পর্বের ক্লাশ প্রথম ও দ্বিতীয়। শ্রেণীতে সবার অগ্রবর্তী। চমৎকার (excellent) হিসেবে রোলিং। জুলেভার্ণে পাঠ করছি। এবং সাধারণভাবে, যা কিছু আজগুবি (Fantastic) তাই। কয়েকজন দাড়িওয়ালা লোক আমার মধ্যে শৈল্পিক ক্ষমতা আবিষ্কার করলেন। বিনামূল্যে শেখাতে লাগলেন।

জাপানী লড়াই ঃ বাড়িতে অধিক সংখ্যায় পত্র-পত্রিকা ও খবরের কাগজ। যেমন, রাশিয়ান ক্রনিক্‌ল্ (Russkoye Vedsmosti) রাশিয়ান ওয়ার্ড (Russkoye Slovo), রাশিয়ান ওয়েলথ্ (Russkoye Bogatsvo) এবং অন্যান্য। সবই পড়তাম। ভীষণ উত্তেজিত। ক্রুজারের পিকচার-পোষ্টকার্ড আনন্দের উৎস ছিল। সেগুলোর এনলার্জ ও কপি করতাম। ঘোষণা (Proclamation) শব্দ দেখা দিল রাশিয়ান ভাষায়। জর্জিয়ানরা ঘোষণা অমান্য করে; জর্জিয়ানদের ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলায় কসাকরা। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ছিল জর্জিয়ান। আমি কসাকদের অত্যন্ত ঘৃণা করতে লাগলাম।

বেআইন (Illegality)ঃ আমার বোন এল মস্কো থেকে। সে বেশ উৎফুল্ল। ধূর্তদের উপরে লিখিত দীর্ঘ প্রচারপত্র আমাকে দিল। আমার কাছে আবেদন সৃষ্টি করলে সেগুলো। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, এখনো স্মরণ করতে পারি। প্রথমটা,

চিন্তা কর আমার সহযোদ্ধা, চিন্তা কর
　　আমার ভাই
তোমার রাইফেল ত্বরিৎ মাটিতে
　　ছুঁড়ে মারো।[১১]
এরকম আরো কয়েকটি ছিল, যার উপসংহার,
অন্যথায়, একমাত্র পথ—
জার্মানদের কাছে, তোমার পুত্র তোমার

পত্নী এবং মা'কে নিয়ে। [১২]

(জার সম্পর্কে)

এটাই ছিল বিপ্লব। এরই নাম কবিতা। এইভাবে কবিতা ও বিপ্লব আমার মস্তিষ্কে একাকার হয়ে গেল।

১৯০৫

অধ্যয়নে মোটেই মন ছিলো না। অত্যন্ত কম নম্বর। বাইয়ন নদীর তীরে ঝগড়া করে নেহাৎ মাথাটা কেটেছিল তাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কারণ তারই জন্য অনুগ্রহ। আমার কাছে বিপ্লব এই ভাবে শুরু হল ঃ এক পাদরীর বাবুর্চী আমার ইয়ার ইসিডোর, তার নগ্নপদে চুল্লীর উপরে লাফিয়ে উঠল— তার জয়োল্লাস, জেনারেল আলি খানভকে হত্যা করা হয়েছে। জেনারেল ছিলেন জর্জিয়ার শান্তকারী (Pacifier)। অগুনতি সভা ও শোভাযাত্রা। সে সবে অংশ নিতাম। বেশ ভালোই ছিলো। অংশগ্রহণকারীদের সচিত্র ভাবে চিন্তা করতাম। নৈরাজ্যবাদীরা (Anarchist) কালো, সামাজিক-বিপ্লবীরা (Social-Revolutionaries) লাল, সামাজিক-গণতন্ত্রীরা (Social-Demo-crats) নীল, আর নিয়মতন্ত্র-প্রণালীবাদীরা (Federalists) অন্যান্য রঙে। [১৩]

সমাজতন্ত্র ঃ বক্তৃতামালা, সংবাদপত্র। ওসব থেকে কেবল অচেনা শব্দাবলী ও ভাবনারাজি পেতাম। আমার দাবী ছিল, ব্যাখ্যা। দোকানের জানালাগুলোতে, ইশতেহার। 'ঝড়ো সামুদ্রিক পাখি' ('The Stormy Pet-rel')[১৪] ও এমনি বস্তু। সব কিনে ফেলতাম। ভোর ছ'টায় উঠি, ক্ষুধার্ত পেটুকের মতো গোগ্রাসে পড়তাম। প্রথম ঃ 'সামাজিক-গণতন্ত্রীরা নিপাত যাক্' এবং দ্বিতীয়ত — 'অর্থনীতির আলোচনা'। সারাজীবন আমি তাজ্জব হয়ে ভাবছি কেমন করে সোশালিস্টরা তথ্যাবলী বিমুক্ত করবে ও বিশ্বে আনবে শৃঙ্খলা। 'কি পড়া যায়?' মনে হয়, রুবাকিনের লেখা। [১৫] তিনি যা সোপারেশ করেছেন তাই পড়ছি। কিন্তু অনেক কিছুই আছে, যেগুলো আমি বুঝতে পারি না। প্রশ্ন জিগগেস করতাম। একটি মার্ক্সীয় পাঠচক্রে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোলো (তা'রা ছিল 'এরফুট কার্যসূচী' (Erfut pro-gram)[১৬] ও 'সাকুল্য-সর্বহারার' (The Lumpen-proletariat) এর মাঝামাঝি। আমাকে সোশাল-ডেমোক্র্যাট ভাবল। বাবার করাতচেরা বন্দুকগুলো চুরি করলে তাদেরকে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক কমিটির সম্মুখে হাজির করা হয়। ল্যাসালে আবেদন করে আমার কাছে। অবশ্যই এজন্য যে তার দাড়ি ছিলো না এবং সে ছিল তরুণ। দিশেহারা ল্যাসালে, ডেমোসিনিস প্রায় যা'বে রাইওন নদীর তীরে এবং বক্তৃতা করে বেড়াবে আর আমার মুখে ইটপাটকেল। [১৭]

আঙুল কেটে রক্তে বিষক্রিয়াজনিত কারণে আকস্মিকভাবে গিতা ভ্লাডিমির কনস্তানতোনোভিচের মৃত্যু হলে (১৯০৬ খ্রীঃ) মায়াকভস্কি পরিবারের সুদিনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়ার পর মাত্র তিন রুবল অবশিষ্ট ছিল।[১৮] কিংকর্তব্যবিমূঢ়, প্রায় দিশেহারা হয়ে বাড়ির চেয়ারটেবিল সব বিক্রি করে দিলেন এবং মস্কো চলে যাওয়া মনস্থ করলেন। যাত্রাপথ, সেরা সুগন্ধি ও তেলসমৃদ্ধ বাকু, কিন্তু তারপরেই স্তেপ অঞ্চল এমনকি মরুভূমি।

প্রথম মস্কো শহরতলী গ্রাম রাজুমোভস্কিতে গিয়ে উঠলেন; সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ট্রেনযোগে মস্কোযাত্রা।

মস্কোতে ব্রোনায়া স্ট্রীটে ছোটো ফ্ল্যাট নিলেন। মাত্র দশ রুবল মাসিক পেনশন। দুই বোন ও মায়াকভস্কি পড়াশোনা করছে। মায়াকভস্কির মা লোজার নিলেন ঃ ছাত্ররা গরিব ও সমাজতন্ত্রী। এদের মধ্যে মায়াকভস্কি একজনের কথা পরেও ভোলেননিঃ নাম ছিল তার ভারভাসা কেন্দালাকি, যে তার দেখা প্রথম বলশেভিক।

এ বছরই উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম জিমনেসিয়াম শ্রেণী উত্তীর্ণ হলেন। এই সময়কার অধ্যয়ন গল্প-উপন্যাস নয়, হেগেলের দর্শন প্রকৃতি বিজ্ঞান কিন্তু প্রধানত মার্ক্সবাদ। এঙ্গেলস্ এর এন্টিডুরিং, লেজিনের টু ট্যাকটিক্স[১৯] পড়ে ফেললেন। ছাত্রদের কক্ষগুলো নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হল। তৃতীয় জিমনেসিয়াম 'তরঙ্গ'(The Surge) নামে একটি বেআইনী পত্রিকা প্রকাশ করলে মায়াকভস্কি কিছু লেখবার তাড়না অনুভব করলেন। অন্যেরা লিখছে। তিনি কি পারবেন ? আঁকাবুকি চলল।

ফলাফল সাংঘাতিক বৈপ্লবিক ও ভয়ংকর আতঙ্কজনক। সে কবিতা হারিয়ে গেল। দ্বিতীয় কবিতা লিখলেন, ফলাফল গীতিময়তা। এইসব সাহিত্যক্রিয়াকে তার 'সমাজতান্ত্রিক মর্যাদাবোধে'র সহিত সঙ্গতিহীন ভেবে লেখালেখি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন।

ভ্লাডিমির মায়াকভস্কি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ান সোশাল-ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (বলশেভিকস্)-তে যোগদান করলেন। এ সময় বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে পরীক্ষা দেন এবং পাশ করেন, কিন্তু আসল কাজ ছিল প্রচারণা, প্রথমে রুটিওয়ালা পরে মুচি ও সবশেষে ছাপাখানার মুদ্রাকরদের মধ্যে। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'কমরেড কনস্তানতিন'। এ সময় তিনি মস্কোর গ্রুজিনি অঞ্চলে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন।[২০] প্রথমে জামিনে পরে স্বাভাবিক মুক্তি লাভ করলেন, তারপর এক বছর ধরে পার্টির কাজ।

তার পরের বছর (১৯০৯) দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হলেন, এবং এক থানা থেকে অন্য থানায় ক্রমাগত বদলী করতে করতে অবশেষে মস্কোর বুতুরকি কারাগারে তাকে অন্তরীণাবদ্ধ করা হোলো। নির্জন কক্ষ নং একশো তিন।

এই বুতুরকি কারাগারেই প্রকৃতপক্ষে ভলাডিমির মায়াকভস্কির কাব্যজীবনের সূত্রপাত। আগের তিনটি বছর ছিল শিক্ষানবিশীকাল, এখন সাহিত্য সৃষ্টিতে হাত দিলেন।[২১] সর্বশেষ রচনাদি পাঠ করতেন। প্রতীকী বেলী, বালমন্ত। আঙ্গিকগত কলাকৌশল বিশ্লেষণ করতেন। কিন্তু এসবই যেন ছিল অচেনা ঃ বিষয়বস্তু ও রূপকল্প এমন জীবন থেকে আহরিত, তার নিজের সঙ্গে কোনো মিল ছিলো না। স্বাভাবিকভাবে লিখিত শুরু করলেন, কিন্তু অন্যান্য জিনিশ সম্পর্কে।

এখানে বসে খাতা ভরতি যে কবিতাবলী রচনা করেছিলেন জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় কারারক্ষী সেগুলো রেখে দিয়ে ছিল, নয়তো সেসব ছেপেই ফেলতেন। ওখানে সমকালীন লেখকদের শেষ করে ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ছিলেন— বায়রন, সেক্সপীয়র, তলস্তয়। তলস্তয়ের আনা কারেনিনা ছিল শেষ বই, কিন্তু ওটা পড়ে শেষ করতে পারেন নি, সুতরাং কারেনিনের ব্যাপারটার কি করে সমাপ্তি ঘটল, তা জানতে পারলেন না। জেলে প্রথম অপরাধের[২২] জন্য বিচার হয়েছিল, কিন্তু কম বয়স্ক হওয়ায় ছাড়া পান। মায়াকভস্কি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন পুলিশী তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণে।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নতুন সংকট, কোনো বিদ্যালয়ই তাকে গ্রহণ করতে চাইলো না, অথচ লেখাপড়া সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। পার্টিতে থাকার অর্থ আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ করা, আর আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ করার অর্থ সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা। মায়াকভস্কি 'সমাজতান্ত্রিক শিল্পকলা' রচনার জন্য মনস্থির করলেন এবং তার কলাকৌশল শিখতে মস্কো চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন।[২৩]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে চারুকলা বিদ্যালয়ের পূর্ণ নাম ছিল চিত্রকলা ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিদ্যালয়।[২৪] মায়াকভস্কি, এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে গৃহীত হওয়ার আগেও, ছবি আঁকা শিখেছিলেন পুরো এক বছর (১৯১০) প্রথমে শিল্পী জুকভস্কি ও পরে কেলিনের কাছে। কেলিন ছিলেন বাস্তববাদী, বেশ ভালো আঁকতেন; ছিলেন অত্যন্ত চমৎকার ও দৃঢ়চেতা শিক্ষক : তাঁর কাছ থেকে চিত্রকলার মৌলিক অনেক বিষয় তিনি শিখতে পারলেন।

নতুন যে বিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হোলেন, তা মোটেই পছন্দসই হোল না। প্রধান ডাকঘরের বিপরীতে তার অবস্থান। পরে মায়াকভস্কি এ সম্পর্কে বলতেন, এমন একটা জায়গায় থাকার দরুণই বিদ্যালয়টি মস্কো নগরীতে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

তখনকার দিনে সমস্ত শিল্পী পারী ও মিউনিকে পড়তে যেত এবং ওসব জায়গায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বিদেশী ছাত্রই থাকত রাশিয়ান। সমস্ত রকম উদ্ভাবনা ওখান থেকেই আসত।

মস্কোর এই চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যালয়ের একটা বিশেষত্ব ছিল এখানে উত্তম চরিত্রের সারটিফিকেট দেওয়া হোত না। তবে অনুশীলনের প্রায় সবটাই ছিল

অনুকরণ : মৌলিক প্রতিভা বিকাশের কোনো সুযোগ ছিলোনা।

এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ডেভিড বুরলুকের সঙ্গে পরিচয়।[২৫] উদ্ধত চেহারা। ঝোলামলিন কোট, হাঁটবার সময় গজরগজর করতেন। এক সময় মুখোমুখি, লেগে গিয়েছিল আর কি–প্রায় ঘুষোঘুষি হওয়ার জোগাড়। তারপর কনসার্ট কক্ষ, রাসমাক্সিনভ বাজাচ্ছেন 'মৃতদের দ্বীপ'। সুরের একঘেঁয়েমি অসহ্য লাগল, পালিয়ে এলেন, বুরলুকও ফিরে আসেন তার এক মিনিট পর। দু'জনে আবার দেখা, উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। তারপর এক সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন। একটি স্মরণীয় রাত্রি, উত্তেজিত আলোচনা। বিদ্যালয়ের একঘেঁয়েমি থেকে সমস্ত রকম ধ্রুপদী বৈচিত্র্যহীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য। ডেভিডের রক্তে এমন একটা ক্রোধ জাগ্রত ছিল যা দিয়ে তিনি তার সমসাময়িকদের ডিঙিয়ে যেতে পেরেছিলেন। পরের ভোরবেলায় উচ্চরবে একজনের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'একে চেনোনা তুমি? আমার প্রতিভাবান বন্ধু! বিখ্যাত কবি মায়াকভস্কি।'

মায়াকভস্কি তাকে বসাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বুরলুক নাছোড়বান্দা। তাকে ছেড়ে চলে যেতে যেতে বিড়বিড় করলেন, 'এখন লিখতে লেগে যাও, নইলে আমি একটা আস্ত বুর্বক বলে পরিচিত হবো।'

পরে মায়াকভস্কি বুরলুক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন এই ভাবে : 'আমি ডেভিড সম্পর্কে চিন্তা করি অপরিবর্তনীয় ভালোবাসার সঙ্গে। আশ্চর্য বন্ধু। আমার প্রকৃত শিক্ষক বুরলুক, আমাকে সে কবি বানিয়েছে। আমাকে ফরাসী ও জার্মান কবিদের কাব্য পড়ে শোনাত।[২৬] বইপত্তর জোগাড় করে দিত। চারপাশে ঘুরে অনবরত আলাপ করে যেত; এবং আমাকে কখনো দৃষ্টির আড়াল করতো না। আমাকে রোজ পঞ্চাশ কোপেক করে দিত যাতে আমি লেখবার সময় উপোস না করি।'[২৭]

সমসাময়িক কবি খেলবনিকভ ও ক্রুশেনিক যথাক্রমে শান্ত প্রতিভা ও শব্দবাজ, ডেভিডের উচ্চকণ্ঠ ক্ষমতার তলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।[২৮] সবাই মিলে কয়েকটি গীতিময় রজনী যাপন, যার মধ্য থেকে জন্ম নিল প্রথম ফিউচারিস্ট ইশতেহার 'জনরুচিকে চপেটাঘাত'।[২৯]

এর পর-পরই তরুণ শিল্পীদের সংগঠন জ্যাক অব ডায়মণ্ডস্ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রচণ্ড বিতর্ক, আলোচনা। সভায় মায়াকভস্কি ও বুরলুক অনলবর্ষী বক্তৃতা করেন। সংবাদপত্রগুলোর পাতা ফিউচারিজমের প্রসঙ্গে ছেয়ে গেল। মন্তব্য ততটা বিনয়ী ছিলো না; যেমন মায়াকভস্কিকে আখ্যা দেয় 'কুত্তার বাচ্চা'। এ সমস্ত বিতর্কের প্রত্যক্ষ ফল ফলতে দেরী হোলো না। চারুকলা বিদ্যালয়ের পরিচালক প্রিন্স লৃভব রেগে গেলেন। তিনি তর্ক-বিতর্ক ও উত্তেজনা থামাতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু

এরা অস্বীকার করেন : ফলে বিদ্যালয় থেকে তাদের বহিষ্কার।

এইভাবে বিতাড়িত হয়ে এরা রাশিয়ার আগাগোড়া ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারা বক্তৃতা করেন স্থানে স্থানে, কিন্তু সে বক্তৃতায় কর্তৃপক্ষ ও পুশকিনের উল্লেখ নিষিদ্ধ করা হোলো। অনেক সময় বক্তা মুখ খোলার আগেই পুলিশ এসে তাকে থামিয়ে দিত। প্রবীনতম ফিউচারিস্ট ভাসিয়া কামেনস্কি এদের দলে যোগ দিলেন।

মায়াকভস্কির জন্য এ সময়টা ছিল কবিতার আঙ্গিক ও শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানসঞ্চয় ও সেভাবে গুরুতর অনুশীলন।

কিন্তু কোনো প্রকাশকই তাদের লেখা ছুঁয়েও দেখত না। ওদের পুঁজিবাদী নাসিকা সবকিছুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। মায়াকভস্কির কাছ থেকে একটা চরণও তারা ক্রয় করলোনা। মস্কোতে এলে ওদের থাকবার জায়গা মিলতো না, তারা বুলেভারে রাত কাটাতেন। এসময়কার সবচে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মায়াকভস্কি রচিত ট্রাজেডি 'ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি'র সেন্ট পিটার্সবার্গের লুজাপার্কে মঞ্চায়ন।

কবিতায় ফিউচারিজমের মূলতত্ত্ব ছিল বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ভাষায় যা একটা নতুন গণতান্ত্রিক চেতনাপ্রবাহ সৃষ্টির প্রয়াস। বুর্জোয়া সমাজের হৃদয়হীন বস্তুদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ তখনকার জনতার কণ্ঠস্বরের সাথে মিলে যায়, কিন্তু জনতা তখন নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলো না।[৩০]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়ান ফিউচারিজমের সঙ্গে মায়াকভস্কির সংযোগ অবিচ্ছেদ্য হলেও, এই আন্দোলনে সর্বদা তার একটা নিজস্ব বিশিষ্ট অবস্থান ছিল। অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পীদের মতোই তার তত্ত্ব ও রচনাকর্ম সব সময় একাত্মতা লাভ করতোনা; তেমনিভাবে তার রচনাবলী তার তাত্ত্বিক বিবৃতির সীমানাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং স্থায়ী শিল্পগুণ লাভ করেছে।[৩১]

এসময় (১৯১৪) কাব্যরচনার কলাকৌশল সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হন এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাও লাভ করেন। তার বিখ্যাত কবিতা 'পাজামায় মেঘ'[৩৯] বিষয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছিলেন, ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বেঁধে গেল। কবিতা লিখলেন 'লড়াই ঘোষিত', যুদ্ধের পোস্টার আঁকলেন। অল্পদিনেই যুদ্ধের বিভীষিকা এই প্রত্যন্ত এলাকাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দিতে চাইলেন, কিন্তু আবেদন গৃহীত হলোনা।

ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হোলো ঃ

১৯১৫ মে, ফিনল্যাণ্ডের কুক্কালা গমন এবং ওখানে থাকতেই 'পাজামায় মেঘ' রচনা করেন।

মুস্তামাকিতে ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে দেখা করতে যান। 'মেঘের' কিছু অংশ পড়ে

শোনালে গোর্কি খুবই অভিভূত হন এবং মায়াকভস্কির কাঁধে অশ্রুপাত করেন। কবিতাটি তাঁকে স্পর্শ করায় মায়াকভস্কির অহঙ্কারবোধ।

জুলাই মাসে লিলিয়া ব্রিকের সঙ্গে পরিচয়, মায়াকভস্কি তার আত্মচরিতে এই ঘটনাকে 'সবচেয়ে আনন্দময় তারিখ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

সৈন্যবাহিনীতে নেওয়া হয়, কিন্তু ফ্রন্টে যেতে চাননা। রচনাবলী প্রকাশ আরও কঠিন হয়ে পড়ল, কারণ সৈনিকদের কিছু ছাপানো নিষিদ্ধ ঃ এসময় ব্রিক প্রতিচরণ পঞ্চাশ কোপেক হিসেবে তার সমস্ত কবিতা কিনে নিলে বেশ খুশী হলেন। দু'টি কবিতা প্রকাশিত হোলো ঃ আর অন্যতম 'পাজামায় মেঘ'। 'মেঘ' উড়ন্ত প্রমাণিত হোলো। সেন্সর তাকে চিরে গেলঃ পুরো দু'পৃষ্ঠা জুড়ে ডট পড়ল। তখন থেকে ডটের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা এবং কমার প্রতিও। দু'টি রচনা 'যুদ্ধ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' এবং 'একটি মানুষ' জগতে থাকে, প্রথমটি মগজে এবং দ্বিতীয়টি হৃদয়ে।

১৯১৬ 'যুদ্ধ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' লিখে শেষ করলেন এবং 'একটি মানুষে'র কিছু অংশ। অংশবিশেষ 'এনাল্স'[৩৪] পত্রিকায় ছাপা হলো।

১৯১৭, ফেব্রুয়ারী, অটোমোবাইল চড়ে গেলেন ডুমা দেখতে, রোদজিয়াঙ্কোর অফিসে হাজির হোলেন। মিলিয়কভকে[৩৫] দেখলেন একনজর। তিনি নীরব ছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে মায়াকভস্কির মনে হোলো, তোতলাচ্ছেন। ঘণ্টাখানেক কাটল। তারপর বিরক্তির সঙ্গে উঠে পড়লেন। মনে হোলো, এদের দিন শেষ, অনিবার্যভাবেই সমাজতন্ত্রীরা আসবে তাদের জায়গায়, আসবে বলশেভিকরা। বিপ্লবের প্রারম্ভ থেকে রচনা শুরু করলেন একটি কাব্যপত্র–'বিপ্লব'।[৩৬] অক্টোবর এসে গেল। এখন সর্বত্র প্রশ্ন, গ্রহণ অথবা না-গ্রহণ? মায়াকভস্কি ও অন্যান্য মস্কোবাসী ফিউচারিস্টদের মনে অবশ্য এ প্রশ্ন কখনো ওঠেনি। এটা ছিল ওদের নিজেদের বিপ্লব। মায়াকভস্কি স্মলনীতে গেলেন, বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯১৮, মস্কো গমন করেন। আলাপ-আলোচনা এবং নাস্তাসিনকি পেরেউলকে অবস্থিত কবি কাফেতে আড্ডা। ফিল্ম স্ক্রিপ্ট লিখতে থাকেন এবং কয়েকটিতে অভিনয়ও করেন।[৩৭] সিনেমার পোস্টারও আঁকেন। জুন মাসে আবার সেন্টপিটার্সবাগে'[৩৮] ফিরে আসেন। অক্টোবরে 'রহস্য-বুফে' রচনা শেষ করেন।[৩৯] তিনবার মঞ্চস্থ হয়, তারপর ম্যাকবেথ তার স্থান দখল করে।

১৯১৯, 'রহস্য' ও অন্যবিধ রচনাদি নিয়ে সহকর্মীদের সহ কলেকারখানায় যেতে থাকেন; ভিভর্গ জেলায় উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া। 'কমফুট' নামে কমিউনিস্ট ফিউচারিস্ট গ্রুপ গঠন, তারা 'কমিউন শিল্পকলা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বসন্তকালে মস্কো চলে যান। মগজে তখন ১৫০,০০০,০০০ কবিতাটি গিস্‌গিস্ করছে। 'রোস্তা'য়[৪০] প্রচারণামূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন।

১৯২০, শেষ করেন ১৫০,০০০,০০০ কবিতাটি এবং বেনামীতে প্রকাশ করেন। এটা আরও বাড়াতে ও তার উৎকর্ষবিধানের আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি দেন, কিন্তু কেউ সাড়া দিলনা। দিনরাত রোস্তায় প্রচারণাকর্মে ব্যস্ত। লিখছেন, ব্যঙ্গচিত্র আঁকছেন। প্রায় ৩০০০ পোস্টার এবং ৬০০০ শিরোনাম।

১৯২১, সর্বপ্রকার জগাখিচুড়ি; লালফিতের দৌরাত্ম্য ও নির্বুদ্ধিতার প্রতি ঘৃণা। 'রহস্যে'র দ্বিতীয় ভার্সন রচনা করেন জার্মান ভাষায়, তৃতীয় কমিনটার্ন প্রতিনিধিবর্গের সম্মানে প্রদর্শন করতে। ইজভেস্তিয়ায় লিখতে শুরু করেন।

১৯২২, প্রকাশনা ভবন এম, এ, এফ—মস্কো এসোসিয়েশন অব ফিউচারিস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনভুক্ত ফিউচারিস্টদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। আসিয়েভ [৪১] ও অন্যান্য সহকর্মীরা দূরপ্রাচ্য থেকে ফিরে এলেন। তিন বছর ধরে মনের মধ্যে ক্রমে জমছিল, সেই লেখাটি শুরু করলেন। 'পঞ্চম আন্তর্জাতিক', ইউটোপিয়া, ৫০০ বছর পরের হালচালচিত্র।

১৯২৩, শিল্পকলার বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠ করেন (LEF)[৪২] এর কার্যপদ্ধতির একটা লক্ষ্য ছিল, উৎপাদনশীল শিল্পকলার অসৌন্দর্যতাত্ত্বিকীকরণ, যার অর্থ সংগঠনবাদ। দীর্ঘ কবিতা 'লেনিন' সম্পর্কে চিন্তাভাবনা।

১৯২৪, 'কুর্স্ক শ্রমিকদের স্মৃতির প্রতি' প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা, এরা সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর। রাশিয়ার আগাগোড়া ঘুরে বেড়ান ঃ তিবলিস, ইয়াল্টা সেবাস্তপোল, তামারা। 'লেনিন' লিখে শেষ করেন এবং শ্রমিকদের সভায় পাঠ করেন। এই কবিতাটি সম্পর্কে মায়াকভস্কি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়েছিলেন, কারণ তিনি ভাবছিলেন এটাকে সহজেই ছন্দোবদ্ধ ইশতেহারের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলা। সম্ভব। শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়ায় এতোই আনন্দিত হন এবং তার মনে হয়, কবিতাটির প্রয়োজন ছিল।

১৯২৫ প্রচারধর্মী কবিতা 'উড়ন্ত সর্বহারা' ও প্রচারণামূলক পদ্যসংগ্রহ 'তুমি নিজেই আকাশে হাঁটো' প্রণয়ন। এসময় বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ভ্রমণের শুরুর দিকে 'পারী' (Paris) শিরোনামের শেষ কবিতাটি রচনা করেন। এ বছরেই প্রথম উপন্যাস শেষ করতে কৃতসংকল্প'। কিন্তু পৃথিবী ভ্রমন সম্ভব হলোনা; প্রথমেই পারীতে টাকাপয়সার পকেটমার, দ্বিতীয়ত অর্ধবছর পরেই বুলেটের মতো উড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে এলেন। একটা বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু এমনকি সানফ্রানসিকোতেও যাওয়া হলোনা। অবশ্য মেক্সিকো ও আমেরিকার সমস্তটা, এবং ফ্রান্স ও স্পেনের কিছু অংশের উপর দিয়ে ভ্রমণ করেছেন। এসবের ফল সামাজিক বক্তব্যভরা গদ্যবই—'আমার আমেরিকা আবিষ্কার' এবং কবিতা–স্পেন, আটলান্টিক মহাসাগর, হাভানা, মেক্সিকো ও আমেরিকা।[৪৩]

১৯২৬, এ সময়ে তিনি সচেতনভাবে একজন খবরের কাগজের লোক হয়ে যেতে লাগলেন। মন্তব্য, টিকাটিপ্পনী, শ্লোগান লিখছেন।[৪৪] অন্য কবিরা এই কাণ্ড দেখে বাঁকা হাসি হাসে তার দিকে, যদিও নিজেরা দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্রোড়পত্রে রচনাদি ছাপছিলেন। তাদের এইসব 'গীতিময় জঞ্জাল' মায়াকভস্কির কাছে কৌতুককর মনে হোত, যেসব লেখা নিতান্তই সহজ ছিল এবং যা কবিদের স্ত্রী ছাড়া আর কারুর কাছে আকর্ষণীয় ছিলোনা।[৪৫]

পত্রিকায় লেখা ছাড়া এসময়ে মায়াকভস্কি, পুরাতন চারণ কবিদের অনুসরণে, নিজের কবিতা আবৃত্তি করতে শহর থেকে শহরে ভ্রমণ করছিলেন। নোভোচেরকাস্ক ভিনিৎসা খারকভ। পারিস রোস্তভ তিবলিস। বার্লিন কাজান শেরদলোভ্‌ক। তুলা প্রাগ লেনিনগ্রাদ। মস্কো ভারোনেজ ইয়াল্টা। ইউপাতোরিয়া ভাইৎকা উফা।

১৯২৭, নতুন এলইএফ নামে এলইএফ পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ করেন। এবারে এর প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পকলায় কল্পনাপ্রবণতা নন্দনতত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিকতার বিরোধিতা এবং উত্তেজক রচনাদি, উচ্চমাঙ্ক প্রচারণা ও পত্রীউপকরণের উৎসাহপ্রদান। এসময় প্রধানত কমসোমোলস্‌কায়া প্রাভদায় কাজ করতেন। অতিরিক্ত খেটে 'ভালো'[৪৬] কবিতাটি লিখতে থাকেন। চলচ্চিত্র পাণ্ডুলিপি ও শিশুদের বই লেখেন। এখনও ভ্রমণ করছেন কবিয়ালের মতো। শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রায় কুড়িহাজার প্রশ্ন সংগ্রহ করেন ঃ ভাবেন 'সর্বজনীন উত্তর' নামে একটি বই লিখবেন। কারণ পাঠকদের মনোভাব তিনি জানতেন।

১৯২৮, 'মন্দ' নামের একটি কবিতা লিখেছেন বলে আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন কিন্তু আসলে কবিতাটি লিখিত হয়নি। দু'টো নাটক লেখেন 'শয্যা-ছারপোকা' এবং 'স্নানঘর'। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপরে একটি কবিতা রচনা করেন—আসলে শুধু প্রারম্ভটুকুই লিখেছিলেন, যার শিরোনাম 'আমার উচ্চতম কণ্ঠস্বরে' (At the Top of my voice), সাহিত্যিক আত্মচরিতও রচনা করেন, যে সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ 'গুরুত্বের সঙ্গে লেখা হয়নি'।[৪৭] নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের আতিশয্যের বিরুদ্ধে[৪৮] ও সুযোগ বুঝে পার্টিতে যোগদানকারী কেরিয়ারিস্টদের[৪৯] সমালোচনা করে রচিত কবিতাবলী পড়ে লেনিন খুশি হয়েছিলেন,[৫০] তাতে মায়াকভস্কি উৎসাহিত বোধ করেন।

১৯২৯, লেনিনের সঙ্গে তার আলাপ হয়, এসময় তিনি কবিতায় বহু ধরনের বিচিত্র টাইপ লোকদের (damagogist) ব্যাঙ্গচিত্র অংকন করেছিলেন।[৫১]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি সংস্কৃতির বামপন্থা সাহিত্যগোষ্ঠির (LEF) প্রধান ছিলেন এবং এই নামের পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন; কিন্তু কালক্রমে তার এই উপলব্ধি হয় যে, ছোট ছোট দলগুলো সাহিত্যের অগ্রগতি

আনে না বরং সাহিত্যের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বৃহত্তর সংগঠন সংস্কৃতির বিপ্লবী ফ্রন্টে (REF) যোগদান করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন ক্লেশদায়ক সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিয়ে ওঠা জটিল মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি তাঁকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, যদিও সে মুহূর্তেও সাম্যবাদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ছিল।[৫২]

বর্ণিত 'ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত' বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে তাঁর জীবন-বিকাশের চারটি স্তর আবিষ্কার করতে পারি : ক. জন্ম ও কৈশোরকাল (১৮৯৩-১৯০৬) খ. প্রাথমিক প্রস্তুতি কাল (১৯০৭-১৯১৩) গ. বিপ্লবপূর্বকাল (১৯১৪-১৯১৬) এবং ঘ. বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কাল (১৯১৭-১৯৩০)।

যে-কোনো সৃজনশীল শিল্পীর বিশিষ্টতা, মূলতঃ তার সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসেরই অবদান যদিও ব্যক্তিপ্রতিভার মধ্যেই তার প্রকাশ। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির সাঁইতিরিশ বছরের[৫৩] জীবৎকাল ও তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য সমকালের প্রেক্ষাপটে ফেলে তাঁর জীবন ও কাজের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং ক্রমান্বয়ে আমরা সেদিকে মনোযোগ দেবো; আপাততঃ শুধু এইটুকু বলবো যে, মায়াকভস্কির জীবৎকালটি রাশিয়ার সমাজ ও ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একদিকে রাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের আক্রমণাত্মক অভিব্যক্তি,[৫৪] অন্যদিকে শাসন-শোষণ ও শত নির্যাতনের মুখে শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ ও বিপ্লবী সংগঠনে রূপান্তর এবং পরিণতিতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই সময়েই সংঘটিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য কবির জীবন ও রচনাবলী এই পটভূমির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু এই গবেষণায় আমাদের মূল প্রতিপাদ্য যেহেতু বাংলার কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে রুশীয় কবি ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির সামগ্রিক তুলনামূলক মূল্যায়ন, সেজন্য পর্যালোচনার আগে এখন নজরুলের জীবনের প্রতি দৃকপাত করতে চাই।

নজরুল। কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘ চৌতিরিশ বছর বাকশক্তিহীন পঙ্গু অবস্থায় রোগভোগের পর ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট সকাল ১০টা ১০ মিনিটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫] কবির প্রথম আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার তারিখ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই[৫৬]। সেইদিন থেকে শুরু করে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনো সৃজনশীল রচনা তিনি উপহার দিতে পারেননি; কিন্তু আত্মপ্রকাশের সময় থেকে ওই তারিখ পর্যন্ত তাঁর যে অবদান তা অত্যন্ত বিশিষ্ট ও অসাধারণ। বাংলা সাহিত্যে নজরুল যুগস্রষ্টা, একথা সহজভাবেই সত্য। তার বিচিত্র ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন ও রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহের কাজ এখনো চলছে, এবং যতই দিন যাবে, তাঁর নতুন নতুন মূল্যায়নও চলতে থাকবে; কিন্তু মোটামুটি বাইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সৃজনশীলতার কালে সাহিত্য ও সংগীতে তিনি যা দিয়েছেন তা আমাদের

আত্মপরিচয়, জাতীয় চেতনা ও গৌরববোধের ভিত্তি স্বরূপ। তিনি আরও কি দিতে পারতেন সে বিষয়ে আমাদের আফসোস কোনদিন মিটবে না; কিন্তু যা দিয়েছেন তা আমাদের অমূল্য সম্পদ; সেজন্য বাকশক্তিহীন পঙ্গু অবস্থায় তাঁর অস্তিত্বটুকুও আমাদের কাছে পরম সন্তোষের বিষয় ছিল। মানসিকভাবে নজরুল চৌতিরিশ বছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, চৌতিরিশ বছর পর তাঁর শারীরিক তিরোধান পরিণত বয়সে ঘটলেও সমগ্রজাতি প্রচণ্ড শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল।[৫৭] শিল্প ও জীবনের মধ্যে সংযোগের এই যে গভীরতা তা অনেক সময় সৌন্দর্যতত্ত্বের অবহেলিত বিষয়, যা আমরা নজরুল-প্রতিভা ব্যাখ্যার সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখন শুধু এইটুকু বলবো যে, প্রকৃত ললিতকলা ও কবিতায় যা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা প্রকৃতির অন্তর্গত— সে ক্ষেত্রে কবি কেবল যেন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হন মাত্র।[৫৩]

১৮৯৯ ২৫শে মে মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ জন্ম। জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রাম। পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ, পূর্বপুরুষগণ পাটনার অধিবাসী ছিলেন এবং সম্রাট শাহ্ আলমের সময়ে পাটনার হাজীপুর থেকে চুরুলিয়ায় আসেন। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন। ফকির আহমদের দুই স্ত্রীর গর্ভে সাত পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সাহেবজান। তারপর চার পুত্রই অকালে মারা যায়। এরপর নজরুলের জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় দুখু মিঞা। নজরুলকে তাঁর পাড়া–প্রতিবেশীরা এই নামেই ডাকতেন। ১৯০৮ এপ্রিল, ৭ চৈত্র ১৩১৪ কবির পিতা কাজী ফকির আহমদের ইন্তেকাল। ১৯০৯ কাজী নজরুল ইসলাম নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন এ সময় কবির বয়স ১০ বছর। এই মক্তবেই এক বছর শিক্ষকতা করেন। কিছু রোজগারের জন্য আশেপাশের পল্লীতে মোল্লাগিরি, মাঝে মাঝে মাজারের খাদেমের কাজ এবং মসজিদে ইমামতিও করতেন।

নজরুলের চাচা কাজী বজলে করিম ফারসি ভাষা জানতেন এবং কবিতা লিখতেন, তাঁর কাছে কবির ফারসি শিক্ষার হাতেখড়ি। নজরুলের উর্দু–ফারসি মেশানো মুসলমানী বাংলায় পদ্য রচনার এ সময় থেকেই সূত্রপাত।

১৯১০–১১ স্থানীয় লেটোদলের 'ছোট উস্তাদজী'। দলের জন্য 'শকুনিবধ' 'মেঘনাবধ' 'রাজপুত্র' 'চাষার সঙ' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসন এবং মারফতি, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯১১ মাথরুন হাই স্কুলে ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। অর্থাভাবশত ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেই নজরুলের সে স্কুল পরিত্যাগ।

১৯১২ রাণীগঞ্জে এক রেলওয়ে গার্ডের খপ্পরে পড়ে কিছুদিন বাবুর্চিগিরি, কিন্তু এক ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে অদৃশ্য। আসানসোলে এসে আবদুল ওয়াহেদের বেকারীর দোকানে এক টাকা বেতনে রুটির ময়দা মাখার চাকুরি গ্রহণ।

১৯১৪ আসানসোলের তৎকালীন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহর সঙ্গে পরিচয়। লেটোদলের সঙ্গীত শিক্ষকরূপে নজরুল অল্পবয়সেই যন্ত্রসঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দারোগা সাহেব তার মধ্যে এক সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেয়ে নজরুলকে তার নিজগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলায় নিয়ে এলেন এবং ত্রিশাল বাজারের নিকটবর্তী দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ডিসেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু তার-পরপরই হঠাৎ একদিন কাউকে না বলে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন।

১৯১৫ জানুয়ারি রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এ বছরেই মৌলভী হাফেজ নূরুন্নবী ফারসি ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলে নজরুল সংস্কৃত ছেড়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফারসি গ্রহণ করেন। নজরুল ক্লাশের ফার্স্টবয় ছিলেন, সেজন্য তার ফ্রিস্টুডেন্টশিপ ছিল এবং বোর্ডিংয়ের খাবার ও ফ্রি পেতেন। উপরন্তু রাজবাড়ি থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন। এ টাকা থেকে কিছু বাঁচিয়ে তিনি ছোটভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচ পাঠাতেন। এ সময় রায় সাহেবের নাতী এ স্কুলের ছাত্র কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন নজরুলের বন্ধু ও একনিষ্ঠ সহচর। নজরুলের তৎকালীন রচনা 'করুণ গাথা' 'বেদন বেহাগ' ও 'চড়ুই পাখীর ছানা' এই তিনটি কবিতায় যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অল্পবয়সে বাংলার তিনটি মূলছন্দের ব্যবহার ও আয়ত্তীকরণ বিরল প্রতিভার পরিচয়। দ্বিতীয়ত, এটা যে গ্রামীণ লেটো ও কবিয়ালদের প্রভাব বিমুক্ত সাহিত্যের মূলধারারা সঙ্গে সংযোগ, সে হিসেবে ও উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ নজরুল ক্লাশ টেনের ছাত্র; ষান্মাসিক পরীক্ষার আগে শহরের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার বাঙালি যুবকদের সৈন্যদল যোগদানের আহবান দেখতে পেলেন। ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে নাম লেখালেন নজরুল ও শৈলজানন্দ। বাৎসরিক পরীক্ষার পরই তাদের কলকাতায় যাত্রা করতে হল। কিন্তু রিক্রুট কালে, শৈলজানন্দের যুদ্ধযাত্রায় বাধা পড়ল। এতে নজরুল নিরুৎসাহ হলেন না। হাওড়া থেকে ট্রেনে চড়ে লাহোর হয়ে গেলেন নৌশেরা যেখানে ট্রেনিং উপলক্ষে তিনমাস থাকলেন। অতঃপর তাদেরকে করাচী নিয়ে যাওয়া হল। করাচী বন্দরের পূর্ব উপকণ্ঠে গানজা লাইন বর্তমান আবিসিনিয়া লাইনে সৈন্যব্যারাক। নজরুল সৈনিক জীবনে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে শীঘ্রই ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সৈন্যদলের রসদ ভাণ্ডার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

করাচীর সেনানিবাস জীবনেই গুরুতর সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। বাঙালি পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের কাছে ফারসির অমর কবিতা দিওয়ানই হাফিজ ও মসনবী রুমী প্রভৃতি পাঠ করেন। করাচী থেকে কলকাতায় লেখা পাঠাতে থাকেন।

১৯১৮-১৯ নভেম্বর, অগ্রহায়ণ ১৩২৫, কলকাতা থেকে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন কর্তৃক মাসিক সওগাত প্রকাশ। মাসিক সওগাতের সপ্তম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) নজরুলের একটি লেখা ছাপা হয়। শিরোনাম 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' এবং এই গল্পটিই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত নজরুলের প্রথম রচনা (সযুন/মোনা পৃ ১৭) নজরুলের মুদ্রিত প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৬, শ্রাবণ সংখ্যায়; তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (সওগাত প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৬)। নজরুলের প্রথম মুদ্রিত গান, 'উদ্বোধন' (সওগাত, দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭)

১৯২০ জানুয়ারি কয়েকদিনের ছুটিতে এসে চুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। এ সময় কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে আসেন। অফিসটা ছিল ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের দোতালায়। আগে পত্রালাপ ছিল, এখানে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়; তিনি তখন সমিতির সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে নজরুল ঠিক করেন যে, বাঙালি পল্টন ভেঙে গেলে কলকাতায় এসে তিনি এখানেই উঠবেন।

করলেনও তাই, মার্চ এপ্রিল বাংলা ১৩২৬ সনের চৈত্র মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল করাচী থেকে সোজা কলকাতা এসে সাহিত্য সমিতির বাড়িতে উঠলেন এবং সেখানে মালসামান রেখে সৈনিকের পোশাকেই শেষবারের মত চুরুলিয়া গিয়েছিলেন। ফেরার পথে সাবরেজিস্ট্রার পদে চাকুরির জন্য দরখাস্ত দিয়ে আসেন কিন্তু ইন্টারভিউ কার্ড পেলে বন্ধুদের পরামর্শে সাহিত্য সাধনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৈশাখ ১৩২৭, মোহাম্মদ আফজাল উল হকের পিতা শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় মোসলেম ভারত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যা থেকে নজরুলের পত্রোপন্যাস বাঁধনহারা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

মোসলেম ভারতে এর পর পর প্রকাশিত অন্যান্য রচনার মধ্যে 'শাতিল আরব' 'খেয়াপারের তরণী' 'কোরবানী' 'মহররম' 'কামাল পাশা' ও 'বিদ্রোহী' অন্যতম। এসব কবিতায় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার বাংলার কবিভাষায় নতুন যুগের সূচনা করে। 'খেয়াপারের তরনী' কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লেখেন মোহিতলাল মজুমদার (মোসলেম ভারত, ভাদ্র সংখ্যা)।

মে মাসে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সান্ধ্য দৈনিক হিসেবে নবযুগ প্রকাশ

করেন। এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম। বছরের শেষ দিকে নজরুল লিখিত 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রকাশের জন্য সরকার পত্রিকাটির জামানত বাজেয়াপ্ত করেন। নবযুগের প্রধান পরিচালক হিসেবে হক সাহেবের নামই ছাপা হোত। তিনি মুজফ্‌ফর নজরুলের মতবাদ পছন্দ করতেন না। তবু শেষ পর্যন্ত, পুনরায় জামানত দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেন কিন্তু মতভেদ দেখা দেওয়ায় ডিসেম্বর মাসে নজরুল এই কাগজ ছেড়ে চলে যান। নবযুগের কাজই ছিল তাঁর সংবাদপত্রে প্রথম চাকরি। নবযুগে লিখিত প্রবন্ধাবলি নিয়ে পরবর্তীকালে যুগবানী নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

১৯২১ নবযুগের কাজ ছেড়ে দিয়ে নজরুল দেওঘর গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে সাহিত্য সমিতির অফিসে বাস করছিলেন। এখানে মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক এবং মুজফ্‌ফর আহমদও থাকতেন। এখানে হঠাৎ একদিন ভিসতি বাদশাহ বাবর প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা আলী আকবর খান এসে ওঠেন এবং একটা সিট দখল করে অবস্থান করতে থাকেন। খান সাহেব ছোটদের পাঠ্যপুস্তক ও প্রকাশ করতেন, তার জন্য নজরুল 'লিচু চোর' কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। মার্চ-এপ্রিল ২১, চৈত্র ১৩২৭ সন কাউকে না বলেক'য়ে তার সঙ্গে নজরুল তার দেশের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামে চলে যান। সেখানে আলী আকবর খানের এক ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন, নজরুলের দেওয়া নাম নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রণয় এবং ৩রা আষাঢ়, ১৩২৮ (১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি তার সঙ্গে বিবাহ (আক্‌দ) সম্পন্ন হয়।

পরবর্তীকালে নজরুলের শাশুড়ি শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও তার জা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী কুমিল্লা থেকে নৌকাযোগে গিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। আক্‌দের পরে নজরুল তাদের সঙ্গে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে চলে আসেন। আলী আকবর খান দৌলতপুর যাওয়ার সময় এখানে যাত্রাবিরতি ঘটিয়েছিলেন এবং তখন নজরুলের সঙ্গে সে পরিবারের পরিচয় ঘটেছিল। নজরুল দৌলতপুরে ফিরে যাননি আর কোনদিন।

দৌলতপুরে প্রায় আড়াই মাস অবস্থান কালে নজরুল শিশুপাঠ্য 'খোকার বুদ্ধি' 'খোকার গপ্পবলা' 'মা' 'চিঠি' প্রভৃতি কবিতা ছাড়াও নার্গিসকে নিয়ে নয়টি গান এবং 'লাল সালাম' ও 'মুকুলের উদ্বোধন' কবিতা দুটি রচনা করেছিলেন।

কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পর নজরুল ৩/৪ সি তালতলা লেনে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। এ বাড়িতে রচিত হয় তার যুগান্তকারী কবিতা 'বিদ্রোহী' (প্রথম প্রকাশ, সাপ্তাহিক বিজলী পরে মোসলেম ভারত কার্তিক ১৩২৮) এবং তারও পরে অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবাসী, বসুমতী সাধনা প্রভৃতি মাসিকপত্রেও কবিতাটি পরে সংকলিত হয়।

১৯২২ মে মাস, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রকাশিত দৈনিক সেবক পত্রিকায় যোগদান। পঁচিশে জুন তারিখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হলে নজরুল যে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন, সেটিকে পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মরত সাংবাদিকগণ মিলে 'হিন্দুয়ানীভাব' বর্জিত করে ছাপলে, প্রতিবাদে নজরুল সেবকের চাকরিতে ইস্তেফা দেন।

১১ আগস্ট তারিখে (২৫মে শ্রাবণ ১৩২৯) নজরুল নিজের সম্পাদনায় ৩নং কলেজ স্ট্রীট থেকে অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু প্রকাশ করেন। আট পৃষ্ঠার কাগজ, ফুলস্ক্যাপ সাইজ, দাম এক আনা, প্রতি সোম ও বৃহস্পতি বারে প্রকাশ করা হতো। প্রথম সংখ্যার শিরে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মুদ্রিত হয়ঃ 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, /দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/ উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন/ অলক্ষণের তিলকরেখা,/রাতের ভালে হোকনা লেখা,/ জাগিয়ে দেরে চমক মোরে/ আছে যারা অর্ধচেতন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন, 'কল্যাণীয়বরেষু, তোমাদের কাগজের দীর্ঘ জীবন কামনা করে তোমাকে একটিমাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রুমিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্যকথা বলতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের বোঝা আপনি বহন করবেন। ধূমকেতুর ১ম সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা ধূমকেতুঃ আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু।

২২ সেপ্টেম্বর (আশ্বিন ১৩২৯) তারিখের ধূমকেতুতে নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটি প্রকাশিত হলে, বিশেষত এই কবিতাটির জন্যই ধূমকেতুর সেই সংখ্যা (শারদীয় সংখ্যা) বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং কলকাতা চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। পুলিশ কবিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, নজরুল গ্রেফতার এড়াবার জন্য ছদ্মবেশে কুমিল্লা চলে যান। কিন্তু সেখানে রাস্তায় রাস্তায় অসহযোগ আন্দোলনের গান গাইতে থাকলে তাঁর পরিচয় গোপন থাকেনা। তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে এনে প্রথমে লালবাজার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিছুদিন রাখার পর প্রেসিডেন্সি জেলে আটক করা হয়। অক্টোবর (কার্তিক ১৩২৯) মাসে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণার প্রকাশ। ৭ই জানুয়ারি রাজবন্দীর জবানবন্দী রচনা।

১৯২৩, ১৬ জানুয়ারি, মামলার রায় শুনানি হয় এবং ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ১২৪- এ ধারা অনুসারে নজরুল ১ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড লাভ করেন।

মার্চ মাসে নজরুল যখন আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে কারাভোগ করছেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত নাটিকা তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। কবিবন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

হাতে নাটকটি তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি, সেখানি নিজের হাতে দিতে পারলে অবশ্য খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিতে পারছিনা, ভেবে দেখলাম তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো। আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও। তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলামনা বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিওতো চাই।'

১৬ এপ্রিল নজরুল ইসলামকে হুগলী জেলে স্থানান্তর, সাধারণ কয়েদীর পোশাক পরানো হয়। মে মাসে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

১৭ মে জনৈকা শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন, 'হুগলী জেলে' আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টায় গাড়িতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখিনা। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এতবড় কবি নাই। রবীন্দ্রনাথের উদ্বিগ্নতাও কম ছিলনা। তিনি শিলং থেকে তারবার্তা পাঠান "Give up hunger strike, Our literature claims you." চুরুলিয়া থেকে জাহেদা খাতুন এসেছিলেন পুত্রের অনশন ভাঙাতে কিন্তু নজরুল তাঁর সাথে কোন কথা না বলে সেলের ভিতরে চলে যান।

২১ মে তারিখে কলেজ স্কোয়ারে এক সভায় হুগলী জেলের অনশন ব্রতাবলম্বীদিগকে আহার গ্রহণ করতে অনুরোধ করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে নজরুল প্রমুখ আহার গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। অবশ্য এই দিনেই নজরুলের ধর্মমা বলে পরিচিতা কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী কবিকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে খাবার গ্রহণ করতে রাজি করান এবং লেবুর রসের শরবত খাইয়ে সুদীর্ঘ ৪০ দিনের অনশন ব্রতের অবসান ঘটান।

১৫ ডিসেম্বর নজরুল কারাবাস থেকে মুক্তি পান। কারাবাস এক বৎসর তিন সপ্তাহ। ১৯২৪ এপ্রিল, ১২ বৈশাখ ১৩৩১ শুক্রবার জুম্মার পর কলকাতার ৬নং হাজী লেনে আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন তখন নজরুলের বয়স ২৩ আর প্রমীলার ১৬ বছর। বিয়ের কাজী ছিলেন নূর লাইব্রেরির সত্ত্বাধিকারী মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি এ, উকিল ছিলেন আবদুল সালাম এবং সাক্ষী মোহাম্মদ

ওয়াজেদ আলী ও খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। মিসেস এ. রহমানের উদ্যোগে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় যিনি মা ও মেয়ে উপন্যাসের রচয়িত্রী। নজরুল পরবর্তীকালে তাঁর নামে বিষের বাঁশী কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। বিয়ের পর নজরুল সপরিবারে হুগলী গিয়ে বাস করতে থাকেন। হুগলীতে কবিকে সপরিপারে নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি রচনা করেন 'সুবেহ উম্মেদ' 'মুক্তিকাম' 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' 'আশুপ্রয়াণ গীতি' 'অশ্বিনীকুমার' 'সব্যসাচী' 'ঝড়' 'ফালগুনী' 'বিদায় স্মরণে' 'গোকুল নাগ'·'চরকার গান' 'কৃষকের গান' 'নকীব' 'সাম্য' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাবলী।

১৯২৫, ১৬ জুন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হলে লেখেন, 'চিত্তনামা'। এ বইয়ে দলমাদল কামানের গায়ে হেলান দিয়ে তোলা কবির ছবি সংযোজন করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক লাঙ্গল, বন্ধু শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নামে সম্পাদক, এর প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। লাঙ্গলের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের প্রখ্যাত কবিতা, 'সাম্যবাদী'।

১৯২৬, ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ ও ১২ মার্চ তারিখে, লাঙ্গল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল যাতে সভাপতিত্ব করেন হেমন্তকুমার সরকার এম. এ. এল. সি এবং নজরুল 'জেলেদের গান' গেয়ে সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন।

এপ্রিল ১৫শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে লাঙ্গল বন্ধ হয়ে যায়।

২২ ও ২৩ মে, কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তাঁর রচিত 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি গেয়ে কিন্তু এই হুশিয়ার সফল হলো না, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল হেমন্তকুমারকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং মোহিনীবাবুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

২৭ জুন রবিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে মুসলিম সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বৈঠক আহুত হয়। এই সংগঠনের আদর্শ ছিল শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নয়, হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির যুগসম্মত সমন্বয় সাধন। সাহিত্য সমাজের এই বৈঠকে নজরুল একটি সংক্ষিপ্ত ভাষন দেন এবং কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'আমরা ছাত্রদল' 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। হেমন্তকুমার

'সাহিত্যে সৃষ্টি' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

আগস্ট মাসে কথাশিল্পী মোহাম্মদ কাশেমের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় 'অভিযান'। এতে নজরুলের আশীর্বাণী ছিল নতুন যুগের যাত্রাপথিক চালাও অভিযান/উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ মানুষ মহীয়ান। (নারায়ণগঞ্জ বসে লেখা ২ জুলাই, পত্রিকাটির নামকরণ নজরুলই করেছিলেন)।

১২ আগস্ট (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৩ সন) লাঙ্গল পত্রিকার নাম পরিবর্তিত ও তার সাথে একীভূত হয়ে সাপ্তাহিক গণবাণী প্রকাশিত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ছেলে বুলবুলের জন্ম। তার নামেই নজরুলের প্রথম গজল গানের বইয়ের নামকরণ হয়েছিল বুলবুল।

বছরের শেষদিকে প্রথম গজল, মিশরীয় নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পী মিস ফরিদার উর্দুগানের অনুপ্রেরণায় রচনা করেন 'আসে বসন্ত ফুলবনে, সাজে বনভূমি সুন্দরী'।

২৭ ফেব্রুয়ারি মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনঃ ঢাকা আসার পথে পদ্মানদীতে স্টীমারে রচনা করেন গজল 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' দ্বিতীয় দিনে বক্তৃতা করেন। কৃষ্ণনগরে ভয়াবহ আর্থিক সংকটে ছিলেন। মার্চ মাসে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রমুখের চেষ্টায় এলবার্ট হলে 'নজরুল সাহায্য রজনী' অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত দু'টি আসনের একটিতে নজরুল নির্বাচনপ্রার্থী হন। ১২ অক্টোবর সংখ্যা গণবাণীতে 'নির্বাচন দ্বন্দে কবি' শিরোনামযুক্ত এক সংবাদে বলা হয়ঃ বাংলার বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বিভাগের মুসলমান কেন্দ্র থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার জন্য নজরুল আবার ঢাকায় এলেন এবং ৫২ বেচারাম দেউড়ি, হযরত সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ ইউসুফ কাদেরী (রাঃ) সাহেবের বাড়ির কাছে মসজিদ সংলগ্ন একটি দালানের কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। দুটি আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন পাঁচজন। নজরুল ছাড়া বাকী চারজন ১. বরিশালের জমিদার জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী ২. ময়মনসিংহ দেলদুয়ারের জমিদার (পরে স্যার) আবদুল হালিম গজনভী ৩. ঢাকা নবাব পরিবারের খাজা আবদুল করিম এবং ৪. জনাব মফিজউদ্দীন আহমদ। স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও , তাঁরা প্রতিশ্রুত অর্থ সরবরাহ করেন না, ফলে অর্থাভাবে সঠিক প্রচারকার্য না হওয়ায় নজরুল নির্বাচনে কেবল হারলেনইনা। তাঁর জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন নজরুল তার 'চল্ চল্ চল্' গানটি গেয়ে। সে সময় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে ঘনিষ্ঠতা ঘটে। উঠেছিলেন আবুল হোসেনের বাসায়, সম্মেলন শেষে বর্দ্ধমান হাউসের একটি কক্ষে তাঁর থাকার জায়গা করে দেওয়া হল। কাজী মোতাহার ছিলেন বর্দ্ধমান হাউস ছাত্রাবাসের হাউস টিউটর এবং মৈত্র ছিলেন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল। মৈত্রর কন্যা উমা মৈত্র ওরফে নোটন নজরুলের কাছে গান শিখত। সেবার মোতাহার মারফত ফজিলতুননেসার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। তিনি তখন তাঁর ছোটবোন শাফিকুন্নেসাসহ ৯২ নং দেওয়ানবাজার রোডে থাকতেন। নজরুল সেখানে তিনদিন গিয়েছিলেন। বিদূষী তরুণী ফজিলতুননেসার প্রতি কবির জাগ্রত প্রণয়াবেগের পরিচয় আছে কাজী মোতাহারকে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে। ফজিলতুননেসাকে সওগাত অফিস থেকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁকে সঞ্চিতা উসর্গ করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। (শনিবার, মার্চ, ঈদের দিন)। এছাড়া যে মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ হয়, তার নাম প্রতিভা সোম ওরফে রাণু সোম, পরবর্তীকালে তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিনী। কবি তখন প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় বনগ্রামে যেতেন এবং রাণু সোমকে গান শেখাতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, রাণুকে তাঁর গান শিখিয়ে সে গান রেকর্ড করাবেন। রাণুর খাতায় 'বসন্ত মুখর আজি' 'এলো বরষা শ্যাম সরসা প্রিয় দরশা' প্রভৃতি গান লিখে দিয়েছিলেন। কবি ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং চারমাস পর খেলার মাঠ থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ও কল্লোল গ্রুপের চার পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় আসেন, তখন রাণুর খাতায় কবি লিখেছিলেন, 'মাটির ঊর্ধে গান গেয়ে ফেরে স্বরগের যত পাখি/তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা তাদের কণ্ঠ রাখি'। ৩০ মে ১৫ জ্যৈষ্ঠ চুরুলিয়ায় কবির মা জাহেদা খাতুনের মৃত্যু, খবর দিয়েছিলেন পুত্রকে শেষদেখা দেখার জন্য কিন্তু নজরুল মা'কে দেখতে যাননি। অক্টোবর মাসে সুরমা ভ্যালী ছাত্র সম্মেলনের প্রধান অতিথিরূপে সিলেট গিয়েছিলেন। নভেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) রংপুর জেলার হারাগাছা তরুণ সংঘের বাৎসরিক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ গমন।

১৬ ডিসেম্বর (১ পৌষ ১৩৩৫) তারিখে নজরুল রাজশাহী মুসলিম ক্লাব এর বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে নজরুলকে বিরাট সংর্বধনা দেওয়া হয়।

২২-২৩ ডিসেম্বর (৭ ও ৮ পৌষ ১৩৩৫) কলকাতার আলবার্ট হলে নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল তাতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২৮ ডিসেম্বর (১৩ পৌষ ১৩৩৫) কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সোসিয়ালিস্ট যুব কংগ্রেসের অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত গান। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ সফর। চট্রগামে বাহার ও নাহারদের বাসায় ওঠেন।

১৯২৯, ২৪ জানুয়ারি রচনা করেন 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' এবং 'সাম্পানের গান, মার্চে কুষ্টিয়া ও বগুড়া যান। ম্যালেরিয়া ও অর্থকষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে, নজরুল কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। তিন বছর আগে থেকে (১৯২৬) নজরুল সওগাতে নিয়মিত লিখছিলেন এবং দু'বছর আগে থেকে (১৯২৭) নির্ধারিত বেতনে, কিন্তু তখন তাঁর পরিবার কৃষ্ণনগরেই থাকত। নজরুল কলকাতা ও কৃষ্ণনগরে যাওয়া আসা করতেন।

এতেও নিদারুণ অসুবিধা হচ্ছিল। কলকাতায় এসে প্রথমে স্ত্রীপুত্র ও শাশুড়িকে নিয়ে তাঁর বন্ধু সুরশিল্পী নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে উঠলেন। কিছুদিনে সেখানে অসুবিধা হওয়ায় সওগাত অফিসের (১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলকাতা নিচতলার দু'টি কামরায় বাসা বাঁধলেন। নজরুলকে কেন্দ্র করে, 'সওগাত সাহিত্যিক আড্ডা' জমজমাট হয়ে উঠল। সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৩৬) পুত্র কাজী সব্যসাচীর জন্ম এখান থেকে কিছুদিন পর উঠে যান ৮/১ পানবাগান লেনের বাড়ির দোতালায়। ১৫ ডিসেম্বর (২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) কলকাতার আলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে কবিকে সমারোহ সহকারে সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক 'চল্ চল্ চল্' নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। তারপর সভাপতি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, 'আজ এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙালীর কবি, বাঙলার কবি। অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন নজরুল সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি মি. এস. ওয়াজেদ আলি। অভিনন্দনপত্রে বলা হয়, 'তুমি বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ জিগীষু কণ্ঠের জয় ইঙ্গিত নতমস্তকে বরণ করিতেছে। তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ অভিবাদনে তুমি নয়ন পাত কর। সভাপতির অনুরোধে সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন, তিনি বক্তৃতায় মন্তব্য করেন 'কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তার নিজের স্বপ্ন নয়-সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন' [বিস্তারিত বিবরণী দ্রঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন রচিত সওগাত যুগে নজরুল]

১৯৩০ রাজদ্রোহমূলক অভিযোগে নজরুলের প্রলয়শিখা গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত, এবং নজরুলের ছয়মাস কারাদন্ডাদেশ, কিন্তু গান্ধী আরুউইন চুক্তি অনুসারে কারাদন্ড থেকে অব্যাহতি লাভ।

৭মে তারিখে বসন্ত রোগে কবিপুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১, ২০ জুন, নজরুল বর্ষবাণী সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং যান এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নজরুল জাহান আরা চৌধুরীর জন্য 'স্বপন মায়া' গানটি রচনা করেন, যার প্রথম দু'পংক্তি ছিল

এলে কি স্বপন মায়া আবার গান গাওয়াতে।

নিদাঘের দগ্ধজ্বালা করলে শীতল পুব হাওয়াতে।

এ বছরে নজরুলের চারটি বই প্রকাশ লাভ করে কুহেলিকা নজরুল স্বরলিপি শিউলিমালা এবং গীতিনাট্য আলেয়া।

১৯৩২ গ্রীষ্মকালে চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে এক সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে আবুল ফজল, কামালউদ্দীন খান, হাবীবুল্লাহ বাহার এবং মাহবুব-উল আলমও যোগদান করেছিলেন।

৫ই এবং ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে নজরুল 'যৌবনের ডাক' অভিভাষণটি পড়েন।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তরজমা রুবাইয়াৎ–ই ওমর খৈয়াম এবং কাব্যে আমপারা প্রকাশ।

১৯৩৪ গীতি শতদল (এপ্রিল) সুরলিপি (আগস্ট) গানের মালা (অক্টোবর) এবং সুর মুকুর (অক্টোবর) প্রকাশ।

১৯৩৫ সালের শুরুতে গিরিশ ঘোষের ধ্রুব ছায়াছবি মুক্তি লাভ করে যাতে নজরুল সঙ্গীত পরিচালনা ও নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই ছবির সতেরোটি গানও তিনি রচনা করেন।

১৯৩৬ ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৭, ১ জুলাই, পরিত্যক্তা প্রথম স্ত্রী নার্গিস আসার খানম এর পত্রের উত্তর প্রদান। এটাই তার কাছে লেখা প্রথম ও শেষ চিঠি। এই পত্রের এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা। কিন্তু বেদনার আগুনে আমি নিজেই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না–আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।'

নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিবাহ– বিচ্ছেদ।

১৯৩৮ ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার অন্তর্গত হাসনাবাদের আজিজুল হাকিমের সঙ্গে নার্গিসের পুনর্বিবাহ। আজিজুল হাকিম কবিতা লিখতেন এবং নার্গিসের মামা আলী আকবর খান প্রতিষ্ঠিত ভারতী লাইব্রেরিতে চাকরি করতেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৯, ১০ মার্চ, বঙ্গ প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন জানিয়ে দেন যে, নজরুলের নিষিদ্ধ বইগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে না। নজরুলপত্নী প্রমীলা গুরুতর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪০ অক্টোবর মাসে প্রকাশিত দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় প্রধান সম্পাদক। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদপ্রীতি সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নজরুল তরুণদেরকে জাগরণের ডাক দেন।

১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের (প্রতিষ্ঠা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯) একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁর পরিচালনায় নজরুল সঙ্গীত বিচিত্রা পূবালী প্রচারিত হয়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন চিত্ত রায় ও শৈলদেবী, বর্ণনায় ছিলেন রণেন কুশারী। এই অনুষ্ঠানের একটি গান ছিল 'আমি পূরব দেশের পুরনারী'।

২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪১ ৫ই এবং ৬ এপ্রিল, কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবের সভাপতিরূপে নজরুল তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে বলেন, যদি আর বাঁশী না বাজে।

১৯৪২, ১০ জুলাই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে বসে তাঁর রচিত ও নবযুগে প্রকাশিত 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধের সাপ্তাহিক কৃষকে প্রকাশিত বিকৃত সমালোচনা পাঠ করেই মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হন।

১৯ জুলাই মধুপুরে চিকিৎসার্থে নেওয়া হয় এবং ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। অক্টোবরে লুম্বিনী পার্কে চিকিৎসার জন্য ভর্তি ১৯৪৩ জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে, চিকিৎসার কোন উন্নতি না হওয়ায় লুম্বিনী পার্কের মানসিক হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। আর্থিক অনটন অবর্ণনীয় এবং নজরুল সাহায্য কমিটি গঠিত। সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সজনীকান্ত দাস ও জুলফিকার হায়দার যুগ্ম সম্পাদক। সদস্যদের মধ্যে কলকাতার হিন্দু মুসলিম গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন। এই কমিটি নজরুলকে পাঁচ মাস পর্যন্ত মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য দান করে।

১৯৪৪ অবস্থা অপরিবর্তিত, বরং আরও অবনতির দিকে।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করে।

১৯৫২ নজরুল নিরাময় সমিতি গঠন। চিকিৎসার জন্য রাঁচীতে কবি ও কবিপত্নীর অবস্থান; কিন্তু স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেলনা।

১৯৫৩ মে মাসে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে প্রেরণ, সেখান থেকে ডিসেম্বরে ভিয়েনায় চিকিৎসার চেষ্টা ব্যর্থ। ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৬০ ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধি প্রদান করেন।

১৯৬২, ৩০ জুন কবিপত্নী প্রমীলার ইন্তেকাল এবং কবির গ্রাম চুরুলিয়ায় দাফন।

১৯৭২, ২৪ মে বাংলাদেশ বিমানে করে কবিকে সপরিবারে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৬ সড়ক ৩৩০-বি সবুজ লেন ঘেরা দোতলা বাড়িতে । পরে বাড়িটি কবিভবন নামে পরিচিত হয়েছে। বর্তমানে এ বাড়িতেই নজরুল ইনস্টিটিউট।

১৯৭৩,২২ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে কনিষ্ঠপুত্র কাজী অনিরুদ্ধের মৃত্যু।

১৯৭৪, ৯ ডিসেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃত স্বরূপ এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রী প্রদান করে। সম্মাননাপত্র পাঠ করেন তদানিন্তন উপাচার্য ডক্টর আবদুর মতিন চৌধুরী।

১৯৭৫, ২৫ জানুয়ারি বঙ্গভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মাহমুদুল্লাহ্ কর্তৃক কাজী নজরুল ইসলামকে ডি. লিট ডিগ্রীপত্র উপহার প্রদান। এ সময়ে কবি ধানমন্ডির কবি ভবনে থাকতেন। তিনি বাসভবনটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ২২ জুলাই কবিকে কবিভবন থেকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় অনেকটা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। খবরে বলা হয় কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আসল কারণ এখনো রহস্যাবৃত। পিজি হাসপাতালে ১১৭ নং কেবিনে তাঁকে রাখা হয়।

১৯৭৬ জানুয়ারি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান। ২১ ফেব্রুয়ারি একুশে পদকে ভূষিত। ২৪ মে তদানিন্তন সেনাবাহিনী প্রধান ও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ক্রেস্ট উপহার।

২৭ আগস্ট দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি, ২৮ আগস্ট ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় আক্রান্ত।

২৯ আগস্ট-১২ ভাদ্র ১৩৮৩ রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হলে সমগ্র জাতি শোকে মুহ্যমান। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। দুপুর ২টার দিকে কবির মরদেহ পিজি হাসপাতাল

থেকে ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে সর্বস্তরের মানুষের পুষ্পস্তবক অর্পণ। বিকেল ৪.৩০ টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নামাজে জানাজা। জানাজার পরে কবিকে আনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে, যেখানে বাদ আছর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। এখানে আমি বিশেষভাবে বলবো যে, যেদিন (১০ জুলাই ১৯৪২) কবি কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেদিন থেকেই তার মানসিক স্বাস্থ্য ও সৃজনশীলতা লোপ পেয়েছিল। সুতরাং তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র তেতাল্লিশ বছর, মায়াকভস্কির চেয়ে ছয় বছর বেশি।

একজন প্রকৃত কবি কিংবা শিল্পীর আত্মপ্রকাশকালের যে প্রোফাইল, তার পরবর্তী বিকাশের বিস্তার ও বৈচিত্র্যের মূল্যায়নে একটি প্রধান প্রক্রিয়া অবশ্যই তুলনামূলক। জিনিশটা একটু সূক্ষ্ম বৈকি। কারণ স্বাভাবিক তুলনা ও তুলনামূলক পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য তাও আমাদের উপলব্ধি করা চাই। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে আসলে তুলনাই সমালোচনার অন্তর্মূল বিশিষ্টতা। ললিতকলা বা সাহিত্যের কোন শাখায় নতুন কোন প্রতিভার আবির্ভাবের লক্ষণ যে 'অপূর্বতা' ('Strangeness') এর জন্যই আমরা তা ঠাহর করতে পারি।

সমালোচনার আজন্ম তুলনাময়তার উৎস থেকেই কালক্রমে সাহিত্যবিচারের তুলনামূলক রীতির উৎপত্তি ও প্রসার, তা সহজেই অনুমেয়।

আমার সাহিত্য জীবনের শুরুতে কিশোরবেলার সাহিত্য ভাবনায় কেমন ক'রে জিনিশটা ধরা পড়েছিল তা দুর্বোধ্য ঠেকত। মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত (১৯৪৭) আমার প্রবন্ধ 'শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা'তে এর অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে। এখন মনে হয়, এটা পদ্ধতিরই স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, আমার কিছু ছিল না।

ঊনিশ শ' ছিয়াত্তর থেকে একাশি। পুরো সাড়ে পাঁচ বছর মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে শিক্ষাসহদূত হিসাবে পেশাগত কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের সময় (১৯৭৬-৮১) পাখির চোখে নয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়ভাবে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি। বিশেষত সাহিত্য, যে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই সচেতন ছিলাম, আমার দৃষ্টিতে এক নতুন পৃথিবীর দরোজা খুলে দিল। আলেকসান্দর সের্গেইভিচ পুশকিন, নিকোলাই গোগোল, লেভ তলস্তয়, আন্তন চেখভ। আরও কত নাম। বিশ্বসাহিত্যের একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ফিওদর দস্তয়েভস্কিকে নতুন করে চিনলাম। প্রাপ্য ছুটি ভোগ কিংবা কর্তব্যের কর্মসূচি পেলেই ট্রেনে চেপে বসেছি, ছুটে গেছি লেনিনগ্রাদ, আদি পেত্রোগ্রাদে পুশকিন হাউসে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে, একটা দেশের শাসন যখন একজন কবির বিরুদ্ধে লাগে তাকে ধ্বংস করতে, তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে তখন কবির আত্মমর্যাদাবোধ কিভাবে জ্বলে ওঠে তার কিছু চিহ্ন আহরণ করতে-রাজানুগৃহীত বিদেশী দাআন্তাসের

হাতটা তো ছিল জারেরই হাত, তার পিস্তলটা রক্ষকেরই পিস্তল। মস্কোর তিরিশ কিলোমিটার দূরে ইয়াজনায়া পলিয়ানাঃ তলস্তয়ের বাড়ি ও খামার-সেখানে গিয়ে তাঁর পালিত মৌমাছির ঘর, লেখার টেবিল, পিয়ানো, গামবুট দেখতে দেখতে যেন এক কল্পরাজ্যে চলে গিয়েছিলাম। এরা মহান জাতশিল্পী, সৃষ্টির বৈশ্বিক রূপকল্প। এমনি একধারা চলছিল। আচরণে, চেতনায়। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির জীবন ও রচনাবলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মনে হল এর সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের একজনের মিল আছে ভালোঃ কাজী নজরুল ইসলাম। যেখানে অসাদৃশ্য, সেখানেও প্রতিরূপ। মায়াকভস্কি 'সোভিয়েত কবি' এবং নজরুল বাংলার 'বিদ্রোহী কবি' দু'টিই যেন শিল্পজগতের ঝড়ের সন্তান– অস্তিমেও প্রায় একই প্রকার। অক্টোবর বিপ্লবের বছরে (১৯১৭) মায়াকভস্কি যখন চব্বিশ বছরের যুবক (জন্ম ৭ জুলাই ১৮৯৩) নজরুল তখন বাঙালি পল্টনের সদস্যরূপে করাচী সেনানিবাসে অবস্থান করছেন।

ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি থেকে কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ২৫ মে ১৮৯৯) বছর ছয়েকের ছোট এবং সাঁইতিরিশ বছর বয়সে মস্কোস্থ নিজ বাসকক্ষে মায়াকভস্কি যখন আত্মহত্যা করেন (১৪ এপ্রিল ১৯৩০) তখন নজরুল আপন কবিতার তুঙ্গে উঠেছেন ও প্রলয়শিখার (১৯৩০) মধ্য দিয়ে তখন তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রায় পূর্ণ নিঃসরণ ঘটছিল। বিপ্লবের উন্মাদনায় তারুণ্য-টগবগ, মায়াকভস্কি এ সময় (১৯১৬-১৮) যেসব কবিতা রচনা করেন, তার মধ্যে 'আমাদের কুচকাওয়াজ' 'উপরে মেঘের ভেল্কিবাজি' 'ঘোড়াদের প্রতি দয়া' উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে জোরালো বক্তব্য আছে, কিন্তু তীক্ষ্মতা কম। 'উত্তর দিতে' কবিতাটিতে (১৯১৬) বরং 'কেন আমরা যুদ্ধ করছি'র বক্রোক্তি যথেষ্ট বলিষ্ঠ। তার বিখ্যাত কবিতা 'পাজামায় মেঘ' এগুলোর পূববর্তী রচনা (১৯১৪-১৫)। এখানে স্মরণ করা যায়, মায়াকভস্কির প্রথম প্রেম ওদেসাবাসিনী সপ্তদশী মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনাঃ তার মধ্যে অসাধারণ সৌন্দর্য ও তৎকালীন নতুন বৈপ্লবিক মননশীলতার সমন্বয় লক্ষণীয় ছিল। মায়াকভস্কি বাইশ বছরের যুবক তখনঃ ওদেসায় গেলে, অপ্রত্যাশিতভবে তার প্রেমে পড়েন এবং নিদারুণ মানসিক চাঞ্চল্যে ভুগতে থাকেন। তখন তরুণ মায়াকভস্কির জীবনে ভালোবাসার আর কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। এবং এই প্রথমবারের মতো এই আবেগের স্বাদ তাকে এতটা বিচলিত করে যে, তিনি তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেননি। 'পাজামায় মেঘ' কবিতাটির উৎস তার এই প্রথম প্রেমের অনুপ্রেরণা। 'পাজামায় মেঘ' কবিতাটিকে মায়াকভস্কি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, যে চারভাগে চারটি চিৎকারঃ ১. 'তোমার প্রেম নিপাত যাক', ২. 'তোমার শিল্পকলা নিপাত যাক্', ৩. 'তোমার সমাজ নিপাত যাক্', ৪. তোমার ধর্ম নিপাত যাক্' এই সঙ্গে আছে উপসংহারে ঈশ্বরকে সম্বোধন। কবিতাটির ব্যঙ্গ ও নাস্তিক্য, নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই তো তদানীন্তন শ্রেণীচেতনা, মর্মস্পর্শী এবং অমোঘ।

'পাজামায় মেঘ' কবিতাটি মায়াকভস্কি ফিনল্যান্ডের কুক্কালায় বসে রচনা করেছিলেন (মে ১৯১৫), যখন কাব্য রচনার কলাকৌশলে তিনি অনেক বেশি শিক্ষিত এবং ফিউচারিজম আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। কৈশোরেই তিনি রাশিয়ান সোশাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক্স) তে যোগ দিয়েছিলেন (১৯০৮), পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আসল কাজ ছিল প্রচারণা, এ জন্য তিনবার জেল খাটেন। কারাগারে লিখতেও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছু শব্দাবলী জানা ছাড়া কোন অগ্রগতি হয়নি। কবিতায় ফিউচারিজমের অন্বিষ্ট ছিল বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদঃ ভাষায় যা একটি নতুন গণতান্ত্রিক চেতনাপ্রবাহ, তখনকার জনতার কণ্ঠস্বরের সাথে মিলে যায়। বিপ্লবোত্তর নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচি (NEP) যার লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রের নির্মাণ, তার সঙ্গে এই শৈল্পিক প্রস্তুতি সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, লিলিয়া ব্রিকের সঙ্গে পরিচয় (জুলাই ১৯১৫), অচিরেই যা প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাই হয়ে যায় অন্ধ নিয়তির মতো যা তাকে রেহাই দিতে পারলো না।

এখানে নজরুলকে একটু দেখা যাক। আমরা বুঝতে পারবো নজরুলের একটি প্রেমও এই চরিত্রে বিশিষ্ট হয়েছিল, যা তাঁর অনিবার্য পরিণতি ঘটিয়েছে। এটা ঠিক যে, 'বিদ্রোহী' পূর্ব কবিতা ও গানে কোনরূপ বৈপ্লবিক চেতনা ছিল না। বাঙালি পল্টনে থাকার সময়ে করাচী থেকে পাঠানো ও ফিরে আসার (মার্চ ১৯২০) পরে তার প্রকাশিত রচনায় ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলিম ইতিহাসেরই প্রাধান্য দেখা যায়-এই ধারায় কয়েকটি সাড়া জাগানো কবিতা 'মহররম' 'ফাতেহাদোয়াজদহম' 'খেয়াপারের তরণী' 'শাতিল আরব' 'কামাল পাশা'। তবে এই তথ্যের অর্থ এও নয় যে, তিনি অতীতের পুনরুক্তি করেছেন কিংবা নবজাগরণের ডঙ্কা বাজাতে অযৌক্তিক আবেগের ফুলঝুরি ছড়িয়েছেন। আসলে কবিভাষায় অন্তরালে যে সমকালীন জাতীয় সংগ্রামের ধ্বনিপ্রতিধ্বনি, তা আমরা উপলব্ধি করি উদাহরণ 'মহররম' কবিতার শেষচরণ, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা'- এই উক্তি তদানীন্তন বিলাসী দেশপ্রেমিকদের প্রতিই যেন সতর্কবাণী। 'খেয়াপারের তরণী'র একটি স্তবকঃ 'লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে/ ওগো কার তরী/যায় নির্ভীক চিত্তে/ অবহেলি, জলধির ভৈরব গর্জন/ প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন'। এটা সে সময়ের সম্মিলিত খেলাফত স্বরাজ আন্দোলনের বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রারই রূপকল্প। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুলের কাব্যচেতনার যে গুণগত উল্লম্ফন (Qualitative Leaping) তার অন্তর্মূলে সামাজিক আঘাতে পর্যুদস্ত প্রেমের বেদনার্ত আবেগই কাজ করেছিল, এ বিষয়ে অনেক বছর পরে পরিত্যক্ত প্রিয়া ও বধূ নার্গিস আসার খানমের কাছে লেখা একটি ঐতিহাসিক চিঠিতে কবির স্বীকারোক্তি আছেঃ আমার অন্তর্যামী জানেন তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি

অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি- তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না- আমি ধুমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পরতাম না। এই কবিতায় একদিকে আছে বেপরোয়া নির্ভীক, সৃষ্টির সেরাজীব মানবের প্রবল আত্মঘোষণা, অন্যদিকে সমাজবিপ্লব। যেমন উপসংহারে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত/আমি সেইদিন হব শান্ত/ যবে অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ, ভীম রণভূমে রণিবে না/ উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/বিদ্রোহী রণক্লান্ত/ আমি সেইদিন হব শান্ত।

এই নিবন্ধে আমার প্রস্তাব সোভিয়েত কবি মায়াকভস্কি ও বাংলার জাতীয় কবি নজরুলের কবিতার তুলনামূলক গতিধারাকে একটি যুগের পরিসরে (১৯১৯-১৯৩০) আমরা বিবেচনা করতে পারি। আসলে এই বারো বছরই তাঁদের কবিতার ফলনশীলতার কাল। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই স্মরণীয়, ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি ছিলেন একটি সফল বিপ্লবের মানসসন্তান আর কাজী নজরুল ইসলাম সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামে লিপ্ত একটি বিশাল দেশের সূর্যসৈনিক। একজনের ছিল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রকে প্রতিশ্রুত লক্ষ্যে গড়ে তোলার অবিচ্ছিন্ন কার্মোদ্যম, আরেকজনের স্বাধীনতা অর্জন। অবিচ্ছেদ্য জীবন ও শিল্পকলা এটা কোন প্রতিপাদ্য নয়, যেন স্বতঃসিদ্ধ-এই দুই মহান কবি দুই ভূপ্রকৃতি, সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্গত হলেও, উভয়ের ক্ষেত্রেই তা আমরা দেখতে পাই। এবং এই পরিস্থিতিও যে উভয়েই দলীয় রাজনীতির মধ্যে সর্বতোভাবে ঢুকে পড়েছেন। এই পর্যায়ে মায়াকভস্কির প্রথম ভূমিকা ছিল রাশিয়ান টেলিগ্রাফ এজেন্সি ব্যঙ্গবিভাগের কাজ আগে তার ব্যঙ্গ রচনার লক্ষ্যস্থল ছিল বিদেশী শত্রুরা আর এখন হল দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রটিবিচ্যুতি। গুটিকতক শিল্পী মিলে কাজ করতেন, ছবির ক্যাপসন লিখতেন, পদ্য বানাতেন বিষয়বস্তু ছিল গৃহযুদ্ধ ও নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের জীবনধারা। একবার মন্তব্য করেছেন, চমৎকার দায়িত্ব ছেলেবেলায়ই দলের কাজে নেমেছিলেন, কয়েকবার জেলও খেটেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা বিপ্লবের সময় স্মলনীতে লেনিনের সান্নিধ্যধন্য হয়েছিলেন, সুতরাং দলীয় কর্তব্য পালন ছিল তাঁর স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই। 'পাজামায় মেঘ' কবিতায় পুঁজিবাদের প্রতি ঘৃণা নিক্ষেপ করেছিলেন, তোমার প্রেম নিপাত যাক্, কিন্তু এই সময়ে রচিত প্রেমের কবিতা 'এটা' প্রসঙ্গে বললেন, এখন তার একমাত্র আশা 'আমাদের লাল পতাকা ব্যবস্থা'। কিন্তু এই সঙ্গে, ক্রমে এই অনুভবও তার মনে দানা বাঁধে যে, তার কথায়, 'প্রেম সবকিছুর হৃৎপিণ্ড। যদি এর সম্পন্ন বন্ধ হয় বাকি সবকিছু মরে যায়-হয়ে পড়ে অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়... প্রেমকে কখনো এটা অবশ্যই কিংবা অবশ্যই নয় এ রকম কিছু দিয়ে বলপূর্বক দমানো যায় না।' 'এটা' কবিতায় তিনি তার সৃজনশীল প্রেমের মহীয়ান আদর্শকে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্যে চিত্রিত করেছেন।

কবিতা রচনায় মায়াকভস্কির প্রিয় কৌশল অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ও বস্তুজারিত রূপকল্প; এই রীতিতেই তিনি প্রচণ্ড এক প্রকাশশক্তির প্রতিমূর্তি উদ্ভাবন করেছেন তার সমকালীন নতুন মানবের আবেগের বিশাল জোরকে বোঝাতে। এই নতুন মানবের প্রেম এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন অতুলনীয় ঐশ্বর্য। এই অনুভবকে বলা যায় চিরায়ত মানবসত্তার এক দুর্বোধ্য রহস্য যা একাধারে ব্যক্তিগত ও সাধারণ। ব্যক্তিগত অংশ তার সহজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, এটাও স্বাভাবিক। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও সাম্যবাদের আদর্শে নিবেদিত প্রাণ মায়াকভস্কি দল নির্ধারিত তার কর্তব্য কাঠামোর মধ্যে দৃঢ়ভাবে অটল থাকেন। নিয়মিত চলতে থাকে প্রচারকার্যের মধ্যেও কাব্যচর্চা।

লেনিনের মৃত্যু(২১ জানুয়ারি ১৯২৪) হলে রচনা করেন 'ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন' সুদীর্ঘ কবিতায় সমগ্র শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্বপ্নের উৎসারণ। পরে দলীয় সূত্রেই 'কাব্যদূত' হিসাবে বিদেশ ভ্রমণ করেন- লাতভিয়া পোলান্ড চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানি ফ্রান্স, এবং পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্র। তিনি তার 'লেনিন' ও অন্যান্য রচনাবলি থেকে পাঠ করেন, সোভিয়েত জীবনধারা ও তার সাংস্কৃতিক জোয়ার সম্পর্কে কথা বলেন। নিউইয়র্ক শিকাগো ফিলাডেলফিয়া ডেট্রয় ও অন্যান্য আমেরিকান শহরেও শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক তার কবিতা বিপুলভাবে নন্দিত হয়। এবং সমসাময়িক কবিতাগুলোর মধ্যে 'চমৎকার' ও 'আমার সোভিয়েত ছাড়পত্র' হৃদয়গ্রাহী। তার শেষ কবিতা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধ হিসাবে লেখা 'উচ্চঃস্বরে এবং সোজাসুজি'।

প্রায় ছোটবেলাতেই সক্রিয় রাজনীতিতে দীক্ষা মায়াকভস্কির, কিন্তু নজরুলের তার নিজস্ব 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' (অর্থাৎ 'বিদ্রোহী' রচনা), 'আনন্দময়ীর আগমনে, কবিতার জন্য কারাবরণ ও কুমিল্লার সেনপরিবারের মেয়ে দুলী তথা আশালতা সেনগুপ্তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর (২৫ এপ্রিল ১৯২৪)। তার প্রথম কাব্যের মতো তৃতীয় কাব্য বিষের বাঁশীও বাজেয়াপ্ত হয় (২২ অক্টোবর ১৯২৪), আর অভিযোগ ছিল একই রাজদ্রোহ। তার দলীয় রাজনীতিতে প্রবেশের প্রথম প্রমাণ, তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ অর্জন করেন। এর পরের বছরেই (১৯২৫) এবং একই বছরে শ্রমিক প্রজাস্বরাজ পার্টি গঠন ও দলের প্রথম ইশতেহার নিজ দস্তখতে প্রকাশ ও প্রচার করেন। ইশতেহারে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে তার আসক্তির পরিচয় ছিল। এই দলের মুখপত্ররূপেই লাঙল পত্রিকা প্রকাশ (১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫) সাম্যবাদ আন্তর্জাতিক গানটি তিনি আন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত নামে অনুবাদ করেন। একটি লক্ষণীয় ব্যাপার মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তালতলা লেনে একই কক্ষে বাস করলেও নজরুল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হর্ননি। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান ও দল গঠন তার বিদ্রোহীযুগের কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা থেকে পুবের হাওয়া

পর্যন্ত আবহে যে গুণগত উৎকর্ষ যোগ করেছে তা হল নৈরাজ্য থেকে প্রকৃত বিপ্লবী উপাদান। সাম্যবাদী (ডিসেম্বর ১৯২৫) থেকে প্রলয়শিখা পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ঢাকা বিভাগ থেকে, মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত দুটি আসনের একটিতে নির্বাচন প্রার্থী হওয়া নজরুলের প্রত্যক্ষ রাজনীতির শীর্ষবিন্দু। এই প্রচেষ্টায় জানা গেল, চেতনা ও বাস্তবতা পরস্পর কত দূরবর্তী অবস্থানে থাকতে পারেঃ বাংলার জনপ্রিয়তম কবি ভোটাভুটিতে কেবল হারলেন না, তাঁর জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। এদিকে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালোবাসার মুখোশও উন্মোচিত।

একজন কবি আর কতটুকু করতে পারেন? তিনি বিদ্রুপের গান লিখলেন, আর উদাত্তকণ্ঠে গাইলেন, দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা শিল্পসাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারবে না। এমন কোন কথা নেই; কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এইটুকু শুধু বলা যায়, এই অভিজ্ঞতা বৃহত্তর মানবজীবন ও মানব ভাগ্যের মধ্যে বহুমাত্রিক সম্ভাবনায় সংস্থিত হাওয়া চাই।

ঘনিষ্ঠ নিরীক্ষায় দেখা যায় তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ সৃজনশীলতার পর্যায়ে (১৯১৯-১৯৩০) মায়াকভস্কি ও নজরুলের কবিতার গতিরেখা একটা একরৈখিক উচ্চতায় গিয়ে অগ্রসরমান থেকেছে। রুশ ও বাংলা কবিতার নদীপ্রবাহে এটা উৎক্ষিপ্ত জলস্তম্ভের মতো, যাকে কেউ কেউ বলেন ব্যতিক্রম। কিন্তু আমি বলবো, বৈচিত্র্য। এবং তা প্রথাগত একই কাব্যতত্ত্বের অধীন। এদের কবিতাবলী বিশ্বমানের সর্বশ্রেষ্ঠ না হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহে সুদক্ষ ও অনন্য। এসব কবিতা একবারই লিখিত হয়েছে এবং আর কখনো হবে না কারণ সংশ্লিষ্ট ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সময় আর কখনো ফিরে আসবে না। আত্মহত্যার আগে তাঁর পূর্বপত্রে মায়াকভস্কি লিখে গেছেন 'ভালোবাসার তরী ভেঙে গেছে সংসারের ঘাতে' এখানে সমাজের সঙ্গে নিজেকে না মেলাতে পারার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কবি বশংবদ হলেও, অন্য কিছু হয়ে থাকে, অন্য কিছু হয়ে যায়। তার মূলে একটা নিবিড় আত্মমর্যাদাবোধ। আমাদের কবি নজরুলও তার অধিকারী ছিলেন, যে কারণে পরিনীতা প্রথম প্রিয়াকে ফেলে চলে আসেন এবং আর তার কাছে ফিরে যাননি। তার পরবর্তী পর্যায় তার নীরব আত্মহননের পালা চলেছিল। শেক্সপীঅরীয় শিল্পদৃষ্টিতে এই অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ চরিত্রগত ত্রুটি, যা তাঁদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেছে। মায়াকভস্কি ও নজরুল উভয়েই ট্র্যাজিডির নায়ক।

পাদটীকা

১। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির জন্ম ৭ জুলাই ১৮৯৩, সোভিয়েত নতুন ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৯ জুলাই ১৮৯৩ (বলশায়া সোভিয়েতস্কায়া এনসাইক্লোপিদিয়া ১৫শ খণ্ড পৃঃ ৫৪২)। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ ২৪ মে ১৮৯৯ (সুফী জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত নজরুল প্রতিভা পরিচয় ১ম সংস্করণ ১৯৮৪, পৃঃ ৬০৫)। কিন্তু প্রচলিত তারিখ ২৫মে, ১৮৯৯।

২। দ্র. সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমি প্রকাশিত লিতারেতুরনই নাচলেস্তভা (সাহিত্য ও ঐতিহ্য) ৬৫ শ খণ্ড, ১৯৫৮, পৃঃ ১৯৪, মস্কো।

৩। সিলেক্টেড রাইটিংস্ অব বোরিস পাস্তেরনাক সম্পাদনা বিয়াত্রিশ স্কট নেরকোক কন ১৯৪৯, পৃঃ ১৯১.

৪। দি সম্বোলিক সিস্টেম অব মায়াকভস্কি, লরেন্স লিও স্টাহবারজার, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি ১৯৬৪, ভূমিকা পৃঃ ১০

৫। স্মার্ড্ ভ্লাদিমিরা মায়াকভস্কাগা-রোমান য়্যাকভসন (বার্লিন ১৯৩০) পৃঃ ৩৯।

৬। ঐ, পৃঃ ৩

৭। এখানে ডক্টর ভি. গনচারভের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (১৯৮১)ঃ তিনি লিখেছেন, সারাবিশ্বে মায়াকভস্কির জীবন ও রচনাবলি বিরামহীন আগ্রহের সৃষ্টি করে চলেছে আজও। শুধুমাত্র এইটুকু স্মরণ করলেই যথেষ্ট মনে হবে কিছুদিন আগের প্রামাণ্য চিত্র 'প্যারিস, মায়াকভস্কিকে ফ্রান্সের শ্রমিকেরা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অনেককাল আগেই মায়াকভস্কির ওপর অন্য ধরনের আগ্রহ পোষণ করে তথাকথিত সোভিয়েতবিদরা, যারা সত্য মিথ্যা বাড়িয়ে বলতে চেষ্টা করেন, মায়াকভস্কির সামাজিক সত্তাকে বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর কবিতাবলির বিপ্লবী চেতনাকে ধামাচাপা দিতে। ঠিক এই ধরনের 'গবেষণাকর্মে একঘেয়েমি কল্পসর্বস্বতা নিয়ে ইদানিংকালে দু'টি আমেরিকান বই বেরিয়েছে এলেন ও সামুয়েল চারটনর্স রচিত লাভস্টোরি অব ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি এ্যাণ্ড লিলাব্রিক এবং বাগান বারুশিয়ানের ব্রিক এ্যাণ্ড মায়াকভস্কিঃ (লিতাতুরনাইয়া গাজিয়েতা নাং ৩১, ২৯ জুলাই ১৯৮১, মস্কো)।

৮। বাগদাদী গ্রামের বর্তমান নাম 'মায়াকভস্কি'। পাদটীকা ১ দ্রষ্টব্য।

৯। ভি. মায়াকভস্কি আই মাইসেলফ পৃঃ ২

১০। মায়াকভস্কি এ্যান্ড হিজ পোয়েট্রি সংগৃহীত ও সম্পাদিত হার্বাট মার্শাল, কারেন্ট
১১। বুক হাউস, বোম্বাই ১৯৫৫, পৃঃ১-২১
১২ সুপরিচিত দু'টি বিপ্লবগীতির অংশ।
১৩। মায়াকভস্কি এখানে বিপ্লবপূর্ব পেটিবুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী দলসমূহের কথা বলেছেন। ফেডারেলিস্ট-জর্জিয়ার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টি।
১৪। ম্যাক্সিম গোর্কির একটি বিখ্যাত কবিতা, যাতে আসন্ন বিপ্লবকে ঝড়ো সামুদ্রিক পাখি হিসাবে স্বাগত জানানো হয়েছে।
১৫। পড়া সংক্রান্ত জনপ্রিয় গাইড বই।
১৬। এরফুট কংগ্রেস এ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত জার্মান সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কর্মসূচি।
১৭। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি, আই মাইসেলফ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫-৬
১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।
১৯। দি টু ট্যাকটিক্স্ অব সোশাল-ডেমোক্রেসি ইন্ দি ডেমোক্রোটক রিভ্যুলিউশন।
২০। মায়াকভস্কির গ্রেফতার হওয়ার তারিখটা ছিল ২৯ মার্চ ১৯০৮, বলশেভিক পার্টির মস্কো কমিটি কর্তৃক পরিচালিত গোপন প্রিণ্টিং প্রেসটি যখন পুলিশ হঠাৎ আক্রমণ করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, মায়াকভস্কির বয়স তখন মাত্র ১৪ বছর। আসলে এটা তৃতীয় গ্রেফতার এ-বছরেরই জানুয়ারি মাসে স্বল্প সময়ের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন, মুক্তির কারণ ছিল প্রমাণের অভাব।
২১। ভলশায়া সোভিয়েতসকায়া এনসাইক্লোপিদিয়া,১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪২।
২২। গোপন ছাপাখানা মামলা।
২৩। ভলশায়া সোভিয়েতসকায়া এনসাইক্লোপিদিয়া, ঐ, পৃঃ ৫৪২
২৪। ভিক্টর শক্লোভস্কিঃ মায়াকভস্কি এ্যাণ্ড হিজ সার্কল (লিলি কেলার কর্তৃক রুশ থেকে তরজমা) উড মিড এ্যান্ড কোং নিউইয়র্ক পৃঃ ১৪।
২৫। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কিঃ আই মাইসেলফ্ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১ (খ) সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৫শ খন্ড তৃতীয় সং ১৯৭৪, পৃঃ ৫৪২।
২৬। ইশতেহারে মায়াকভস্কি ছাড়া আরও তিনজন স্বাক্ষর করেছিলেনঃ ডি বুর্লুক, এ. ক্রুশেনিক এবং ডি. খেলবক্লিকভা।
২৭। সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া ১৫ খণ্ড তৃতীয় সং ১৯৭৪, মস্কো, পৃঃ ৫৫২-৫৪৩।
২৮। ভ্লাদিমির মায়াকভস্কির দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণগ্রন্থঃ দি এমেরিকান কোয়ার্টারলি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন, জুলাই ১৯৪০, নিউইয়র্ক পৃঃ ২৩।

২৯। কবিতাটির মৌলিক শিরোনাম ছিল 'এয়োদশ ধর্মযাজক' কিন্তু সেন্সর তা নিষিদ্ধ করে।

৩০। ম্যাক্সিম গোর্কি সম্পাদিতঃ এ বছরেই সেন্সর 'বিশ্ব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

৩১। মিলিয়কভ রাশিয়ান উদারনৈতিক নেতা, তিনি সাম্রাজ্যবাদের আদর্শবাদী মুখপাত্র ছিলেন। ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ এর বিপ্লবের পরে গঠিত প্রভিশনাল গবর্নমেন্টে ইনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা জোগান এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সমর্থন করেন।

৩২। কাব্যপত্র 'বিপ্লব' মায়াকভস্কি রচনা করেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কবিতাটি ম্যাকসিম গোর্কি সম্পাদিত নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩৩। মায়াকভস্কি তিনটি চলচ্চিত্র পাণ্ডুলিপি রচনা করেন 'যুবতী মহিলা ও গুণ্ডা' 'অর্থকড়ির জন্য জন্মায়নি' (জ্যাক লণ্ডনের মার্টিন ইডেন অবলম্বনে) এবং 'চলচ্চিত্রে শৃঙ্খলিত'। এগুলোর মূলচরিত্রে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে লেনিনগ্রাদ। একটি নাট্যকর্ম, 'বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্যিক ও ব্যঙ্গাত্মক রূপে আমাদের কালের পরিচয়।'

৩৪। রোস্তা (ROSTA) রাশিয়ান টেলিগ্রাফ পরে তাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে তখন প্রপাগাণ্ডায় ব্যাপৃত ছিল।

৩৫। কবিতাটি মায়াকভস্কি অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে রচনা করেন।

৩৬। ভি. মায়াকভস্কি, আই মাইসেলফ, পৃঃ ২০।

৩৭। বলশায়া সোভিয়েতস্কায়া এনসাইক্লোপিদিয়া, পৃঃ ৫৪৩ (মৃত্যু ১৪ এপ্রিল ১৯৩০, সময় বেলা ১০টা ১৫ মিনিট)।

৩৮। এখানে, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, রুশ সাহিত্যের আরও দুই শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা, পুশকিন ও লেরমনতভ মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুবরণে স্বল্পজীবী হয়েছিলেন। আলেকসান্দর পুশকিনের (জুন, ১৭৯৯-জানুয়ারি ১৮৩৭) জীবৎকাল ছিল মায়াকভস্কির জীবৎকালের প্রায় সমান এবং লেরমনতভ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর সাতাশ বছর পুরো হয়নি। পুশকিন ও লেরমনতভ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর পিস্তলের গুলীতে নিহত হয়েছিলেন, যদিও পরিস্থিতির পিছনে তদানীন্তন জারপ্রশাসনের অদৃশ্য হস্ত সক্রিয় ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই দুটি মৃত্যু নিঃসন্দেহে দ্বন্দ্বমুখর সময়ের অবদানঃ মায়াকভস্কির যদিও আত্মহত্যা, তবু তাঁর প্রতি বিরূপ সময়ই তাঁকে চরম করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে বলতে পারি। (দ্রষ্টব্য, আলেকসান্দর পুশকিন, সিলেক্টেড ওয়ার্কস দুই খণ্ড, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো ১৯৭৪, ভূমিকা এবং মিখাইল লেরমনতভ, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ঐ, ভূমিকা)।

৩৯। দ্রষ্টব্য এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি কমিউনিষ্ট পার্টি অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন, প্রগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো ১৯৭৪, প্রথম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১১-৪২।

৪০। সুফী জুলফিকার হায়দারঃ নজরুল প্রতিভা পরিচয়, ১ম সংস্করণ ১৯৮৪, পৃঃ ৬০৭।

৪১। সুফী জুলফিকার হায়দারঃ নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, তয় সংস্করণ ১৯৮৩, পৃঃ৬৭।

৪২। দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ ও ভারতের সমস্ত পত্র-পত্রিকার সংবাদ ও প্রতিবেদন।

৪৩। এ প্রসঙ্গে আলেকসান্দর পুশকিনের কবিতা সম্পর্কে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না এবং তা হলঃ It is truly difficult to picture his most perfect lines as something 'written' made of words that existed apart and were only assembled is this particular order by the will of the artist. No, we feel that these lines must have existed like that in nature and even so, in their natural state, were committed to paper, (Alexander, Pushkin, Selected Works. Vol I, Progress Publishers, Moscow, Introduction p. 12)

নজরুলের কবিতায় এই রহস্য কার্যকরী ছিল, তা আমি দেখাবো।

৪৪ কবি রোগক্রান্ত হওয়ার এক বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে কবিকে তাঁর বাড়িতে পারিবারিক মজলিসে বলতে শুনেছেন যে বিশ্বকবির জন্মতারিখ ২৫শে বৈশাখের ৪ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১১ই বৈশাখে তাঁর জন্ম। নজরুলের উক্তিঃ কালবৈশাখীর ঝড়ের সাথে আমার আবির্ভাব। তাইতো ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের দোলা আমার জীবনে প্রতিটি ছন্দে, আমার কাব্যে আমার গানে আমার হাসি অশ্রুতে। সুফী মন্তব্য করেছেন, 'আমার মনে হয় নজরুলের সঠিক জন্মতারিখ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।' (ন.জ. শে. অ. ঐ পৃ. ১২১)

নজরুল-গবেষণার পথিকৃৎ আবদুল কাদির

রফিকুল ইসলাম

এক

নজরুল-জীবনী ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির কখন কোথায় কিভাবে প্রথম নজরুলের সংস্পর্শে আসেন? ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষের দিকে নজরুল রাজনৈতিক নেতা হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে ঢাকায় আসেন, এইটেই নজরুলের প্রথম ঢাকা সফর। ২৭শে জুন রোববার সকালে মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বৈঠকে নজরুল যোগদান করেন, অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দেন, গান শোনান। নজরুলের এই ঢাকা সফরের সময় কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাহিত্য সমাজের কর্মী আবদুল কাদিরের পরিচয় ও সৌহার্দ্যের সূত্রপাত। নজরুলের সঙ্গে আবদুল কাদিরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নির্বাচনে নজরুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়। নজরুল ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন-সভার উচ্চ পরিষদের সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ান। এই নির্বাচনে আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বরিশালের জমিদার মুহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, টাঙ্গাইলের জমিদার আবদুল হালিম গজনবী, ঢাকা নবাব পরিবারের আবদুল করিম, কুমিল্লার মফিজউদ্দিন আহমদ। এই উপলক্ষে নজরুল যখন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী প্রচারণায় যান তখন কখনো কখনো তাঁর সঙ্গী ছিলেন আবদুল কাদির। এমনি এক নির্বাচনী সফরে ঢাকা থেকে আবদুল কাদিরকে নিয়ে জয়দেবপুর যাবার পথে ট্রেনে বসে নজরুল রচনা করেছিলেন 'জয়দেবপুরের পথে' বা 'চাঁদনী রাত' কবিতাটি। ঐ নির্বাচনে নজরুল পরাজিত হলেও পূর্ব বাংলার কিছু তরুণ সাহিত্যকর্মীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুল কাদির। নজরুলের সঙ্গে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল কাদিরের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আবদুল কাদির তা আমরণ লালন করেন নজরুল-সাহিত্য গবেষণা ও নজরুল সাহিত্য সম্পাদনার মাধ্যমে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য নজরুল পুনরায় ঢাকায় আসেন। পথে পদ্মাবক্ষে স্টীমারে বসে সম্মেলনের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন 'খোশ আমদেদ' বা 'আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি' গানটি। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল ২৭শে ফেব্রুয়ারি রোববার বেলা ১২টায় মুসলিম হল মিলনায়তনে। সভায় নজরুল 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন করেন, বৈকালিক অধিবেশনে

তিনি গজল শোনান,পরদিন প্রাতঃকালীন অধিবেশনে তিনি গজল গান এবং 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নজরুলের সঙ্গে আবদুল কাদিরের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে এসে নজরুল প্রায় তিন সপ্তাহ ঢাকায় অতিবাহিত করেন। নজরুল ঢাকায় এসে প্রথম মুসলিম হলের তৎকালীন হাউস টিউটর অধ্যাপক সৈয়দ আবুল হোসেনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। নজরুল যেদিন বিকেলে ঢাকা পৌছান তার পরের দিন সকালে সৈয়দ আবুল হোসেনের বাড়িতে বসে রচনা করেন 'চল্ চল্ চল্' গানটি, যেটি তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে পরিবেশন করেছিলেন। ঐ গানটি রচনার সময় আবদুল কাদির উপস্থিত ছিলেন, গানটি 'সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিকী' 'শিখা'র ২য় বর্ষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, 'শিখা' প্রকাশনার সঙ্গে আবদুল কাদির যুক্ত ছিলেন। এভাবেই ১৯২৬ থেকে ২৮ খ্রীষ্টাব্দ তিন বছরের মধ্যে আবদুল কাদির ঢাকাতেই নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

তারপর আবদুল কাদির কলকাতায় গিয়ে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন; পত্রিকাটির নাম ছিল 'জয়তী', আবদুল কাদির সম্পাদিত পত্রিকাটির ১ম সংখ্যাতেই (বৈশাখ ১৩৩৭) নজরুলের 'চাঁদনী রাতে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, যে কবিতাটি নজরুল কয়েক বছর আগে আবদুল কাদিরকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাওয়ার পথে ট্রেনে বসে রচনা করেছিলেন। 'জয়তী'র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে নজরুলের যেসব রচনা প্রকাশিত হয় সে তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই নজরুলের সঙ্গে আবদুল কাদিরের সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। ১৩৩৭ এর জ্যৈষ্ঠে 'ভাবছ যখন করছে মানা'; 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ', আষাঢ়ে 'অভিবন্দনা' কবিতা, শ্রাবণে 'হারামণি' সমালোচনা, 'হিতেবিপরীত' ব্যঙ্গ কবিতা, ভাদ্রে 'নবীনচন্দ্র' কবিতা, 'ভরিয়া পরাণ' 'গান, আশ্বিনে 'প্রথম অশ্রু' কবিতা, কার্তিকে 'তিমির-বিদারী অলখ বিহারী' ভজন, মন্মথ রায়ের কারাগার নাটকের গান, পৌষে 'কারা পাষাণ ভাঙ্গি জাগো নারায়ণ' কারাগারের গান, ফাল্গুন-চৈত্রে 'শিশু যাদুকর' কবিতা, 'কুসুম কুমার শ্যামল তনু' গান। ১৩৩৮-এর বৈশাখে 'প্রিয় তুমি কোথায়' গান, 'গানগুলি মোর আহত পাখীর সম' গান, শ্রাবণে 'নাচিছে নটনাথ' গান, 'দোলে নিতি নব' গান, আশ্বিনে 'তুমি কোন পথে এলে' গান, কার্তিকে 'দেখে যারে দুলা সাজে' গান, 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে' গান, 'আলেয়ার গান' গান। ১৩৩৯-এর বৈশাখে 'নিরালা কানন পথে' গান, 'এল ফুলের মরসুম' গান, 'প্রিয় তব গলে দোলে' গান, 'তোমারি মহিমা গাই' সুরা ফাতেহা। ১৩৩৭-এর বৈশাখ পর্যন্ত দু'বছর মাসিক 'জয়তী' পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় আবদুল কাদির নজরুলের একাধিক রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

নজরুলের সঙ্গে আবদুল কাদিরের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার আর একটি সূত্র কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম পর্বের সাহচর্য সর্বজনবিদিত। মুজফ্‌ফর আহমদকে রাজনৈতিক কারণে কলকাতায় এবং প্রায়শঃই কারাগারে থাকতে হত, আর তাঁর পরিবার থাকত সন্দ্বীপে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে নজরুল মুজফ্‌ফর আহমদের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মুকতাদির এবং সফিউল্লাহ চৌধুরী নামক অপর এক যুবককে নিয়ে সন্দ্বীপ যান। কবি সন্দ্বীপ শহরে রাত্রি যাপন ক'রে পরদিন মুজফ্‌ফর আহমদের বাড়ি যান, সেখানে তিনি ছিলেন দু'দিন। অনুমান করা যায়, নজরুলের সন্দ্বীপ সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুজফ্‌ফর আহমদের স্ত্রী ও কন্যার খোঁজ-খবর নেওয়া। পরবর্তীকালে মুজফ্‌ফর আহমদের একমাত্র কন্যার সঙ্গে আবদুল কাদিরের যে বিবাহ হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নজরুল। আবদুল কাদির নিজেও কবি ছিলেন; মূলত রোমান্টিক গীতিকবি হলেও তিনি নজরুলের প্রভাবে কিছু উদ্দীপনামূলক কবিতাও রচনা করেছিলেন। তবে মোহিতলাল মজুমদারের আঙ্গিক সর্বস্ব কবিতার সঙ্গে আবদুল কাদিরের কবিতার সাদৃশ্য অধিক।

নজরুল অসুস্থ হন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৪৮) এবং দ্রুত সম্বিৎহারা হয়ে পড়েন। দুর্ভাগ্যবশত নজরুলের সুস্থাবস্থায় তাঁর জীবনী বা সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে কোন সামগ্রিক আলোচনা প্রকাশিত হয়নি; সৌভাগ্যক্রমে আবদুল কাদির কবির সুস্থাবস্থায় তাঁর জীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রস্তুত করেন এবং তা কবিকে দেখিয়ে নেন। বাংলা সাহিত্যে কবি কাজী নজরুলের জীবনী রচনার ঐ প্রয়াস প্রথমে 'কৃষক' ও পরে 'সওগাত' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪) প্রকাশিত হয়েছিল। কাজী আবদুল ওদুদ এর 'নজরুল-প্রতিভা' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৯, ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স, ১৩ ষ্টেশন রোড, ঢাকা) পরিশিষ্ট 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' নামে আবদুল কাদিরের ক্ষুদ্র রচনাটি মুদ্রিত হয়। ঐ সংক্ষিপ্ত রচনাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের যথার্থ জীবনীর প্রথম রূপরেখা। নজরুলের জন্ম তারিখ, পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ অর্থাৎ কবির বংশ-পরিচয়, আদিবাস, জন্মস্থানের বিবরণ রচনাটির শুরুতেই সংক্ষেপে দেওয়া রয়েছে। নজরুলের শৈশব এবং লেটোর দলে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আবদুল কাদির ঐ রচনাতে নজরুলের বাল্যকালকে জীবন্ত করে তুলেছেন,

> একদিকে ঔদাসীন্য ও অন্যদিকে চাঞ্চল্য নজরুলের প্রকৃতিতে বাল্য বয়সেই দেখা গিয়েছিল। তাঁর পদ্য-রচনার বাতিক দেখে পড়শীরা তাঁকে ডাকত 'তারা ক্ষ্যাপা', আর পরিজনেরা ডাকত 'দুখু মিঞা' বলে। কাজী ফকির আহমদের ঔরসে ৭ পুত্র ও ১ কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাহেবজানের পর ৪ পুত্র অকালে লোকান্তরিত হয়। অতঃপর নজরুলের জন্ম হ'লে তাঁর ডাকনাম রাখা হয় 'দুখু মিঞা'। অপরিসীম দুঃখের মধ্যেই নজরুলের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে; তাঁর অন্তিম জীবনেও দেখছি অবিচ্ছিন্ন দুঃখের ভ্রূকুটি, তাঁর 'দুখুমিঞা' নাম এমনভাবে সার্থক হবে, কে জানতেন ?

নজরুলের আসানসোলে রুটির দোকানে চাকুরী গ্রহণ, পুলিশ অফিসার কাজী রফিজউল্লার (আবদুল কাদির তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন কাজী রফিজউদ্দীন) স্নেহ লাভ, তাঁর স্বগ্রাম ময়মনসিংহের কাজীর সিমলা গ্রামে নজরুলকে প্রেরণ, নজরুলের দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার তথ্য আবদুল কাদির সংক্ষেপে দিয়েছেন, রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার কথাও তিনি লিখেছেন। কথাশিল্পী শৈলজানন্দকে তিনি নজরুলের সহপাঠী বলেছেন, শৈলজানন্দ নজরুলের সিয়ারসোল স্কুলজীবনের বন্ধু তবে তিনি ছিলেন রাণীগঞ্জ স্কুলের ছাত্র। যাই হোক, দুই বন্ধুর বাঙালী পল্টনে যোগদানের প্রয়াস, নজরুলের সফলতার খবরও রচনাটিতে রয়েছে।

সেনাবাহিনীতে গিয়ে নজরুলের কাব্য ও জ্ঞান-চর্চা, করাচী সেনানিবাসে পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে ফার্সী ভাষা ও কাব্য পাঠ, সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত, কলকাতার পত্রপত্রিকায় নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ও কবিতা প্রকাশ, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশক মুজফ্ফর আহমদ, 'সবুজপত্রের' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ ইত্যাদি সংবাদ আবদুল কাদিরের রচনায় রয়েছে। যুদ্ধান্তে বাহিনী ভেঙে দিলে নজরুলের কলকাতা আগমন, চুরুলিয়া ও বর্ধমান গমন, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, আফজাল উল হকের সঙ্গে পরিচয়, 'মোসলেম-ভারতে' বিভিন্ন রচনা প্রকাশ, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যে দেশময় খ্যাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আব্দুল কাদির দিয়েছেন। তিনি আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় এবং দৌলতপুর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। কুমিল্লায় শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়ীর কথা এবং নজরুলের বহু কবিতায় গোমতী-তীরের আনন্দময় স্মৃতির মধুর রূপ লাভ প্রসঙ্গ অবশ্য বাদ পড়েনি।

কুমিল্লা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নজরুলের 'অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু' (আসলে সপ্তাহে দু'বার) প্রকাশিত হয়, এবং পত্রিকাটি নির্যাতিত সন্ত্রাসবাদী-দলের অগ্নিবীণার বাহন হয়ে ওঠে, ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী নিয়ে 'যুগবাণী, 'রুদ্রমঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী' সংকলন প্রকাশিত হয়। অগ্নিক্ষরা ভাষায় দেশবাসীর মনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টির কথা আবদুল কাদির লিখেছেন। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রকাশ এবং তার প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আবদুল কাদিরের ভাষায়,

> নজরুলের 'অগ্নিবীণার' কবিতাগুলি অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের আবহাওয়ায় লেখা, সারা দেশে তখন জনগণের হাওয়া জোর বইছে। সেই ভারতব্যাপী গণ-বিক্ষোভের দিনে নজরুল হয়ে উঠলেন বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারণকবি। সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে তিনি গাইলেন মুক্ত-জীবনের গান। বীর্যের ক্ষেত্রে, সত্যের সংগ্রাম, মহামৃত্যুর অভিসার দেশবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন...।

> সেদিন তাঁর 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের বাঁশী'র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'বলাকা'র প্রভাবকেও বোধ হয় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনার অমিত তেজ, উদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ততা ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙালীর মন জয় ক'রে নিয়েছিল। তাঁর রচনায় তাঁর অশান্ত মনের ছাপ সুপরিস্ফুট; তাতে কোথাও কাব্য-সৌন্দর্যের হানি হয়ত হয়েছে। তাঁর আবেগ ও উন্মাদনা সেই প্রবল স্বাদেশিকতার দিনে প্রচুর হাত-তালি পেয়েছে। কিন্তু চিরকালের দরবারে তা না পেলেও অশ্রদ্ধেয় হবে না।

স্মরণীয় যে অসুস্থ কবির বয়স যখন পঞ্চাশ বছর তখন আবদুল কাদির নজরুলের 'অগ্নিবীণা' ও 'বিষের বাঁশী' সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছিলেন। যে সব কাব্যের প্রভাব এক বিশেষ সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'বলাকা' কাব্যের প্রভাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, চিরকালের দরবারে তা শুধু শ্রদ্ধেয় নয় স্থায়ী আসন পেয়েছে কি-না আজ কি সে বিচার প্রশ্নাতীত নয়, অন্ততঃ 'অগ্নি-বীণা' কাব্য?

আবদুল কাদির তাঁর সংক্ষিপ্ত নজরুল-জীবনীতে 'ধুমকেতু' পত্রিকা রাজরোষে পতিত হওয়ার কারণ হিসেবে 'আগমনী' কবিতাটির কথা উল্লেখ করেছেন, আসলে কবিতাটির নাম 'আনন্দময়ীর আগমনে'। তিনি নজরুলের জেল-জীবন, অনশনের কথা বলে তাঁর মাতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন,

> তাঁর অনশন ভাঙবার জন্য তাঁর মা জাহেদা খাতুন জেলে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু মাকে নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়। তাঁর মা এ-দুঃখ আমৃত্যু ভুলতে পারেন নি। ১৩২৬ সালের পর মাতা-পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয় নি,– ১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর মা লোকান্তর গমন করেছেন। আপন জন্মদাত্রীর প্রতি সন্তানের এই ঔদাসীন্য কবির খেয়াল ছাড়া আর কি হতে পারে।

লক্ষণীয় যে জন্মদাত্রীর প্রতি সন্তানের ঔদাসীন্যকে খেয়াল নামে অভিহিত করে তিনি ঐ খেয়ালের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেন নি। প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের বিবাহের দিনক্ষণ, এই বিবাহে মিসেস এম, রহমানের উদ্যোগ, বিয়ের পরে হুগলীতে সংসার স্থাপন প্রভৃতি তথ্য পরিবেশন করে কাদির প্রধান পরিচালকরূপে নজরুলের 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙ্গল' প্রকাশ, তার সর্বপ্রথম সংখ্যার সর্বপ্রথম সম্পদ 'সাম্যবাদী' কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> 'সাম্যবাদী'র প্রধান সুর মানবিকতা। অবশ্য কবি তাতে 'সাম্যবাদী-স্থান' কামনা করেছেন–... নজরুলের 'সাম্যবাদী'তে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অপেক্ষা ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের কথা বেশী ফুটে উঠেছে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে আত্মার মহিমা ও মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই মানুষে মানুষে অভেদ ভেবেছেন।

আসলে নজরুলের শ্রেণীচেতনা 'সাম্যবাদী' অপেক্ষা 'সর্বহারা' কবিতা সমষ্টিতে অধিকতর স্পষ্ট, সাম্যবাদীর মূল সুর যে মানবিকতাবোধ তা যে অর্থনৈতিক সাম্য নয় কাদির সাহেব তা যথাযথই নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু 'গণবাণী' পত্রিকার ১১ সংখ্যায় নজরুলের ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের অনুবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি খুবই সংযত,

> 'লাঙল' ও 'গণবাণীর' যুগে নজরুলের রাজনৈতিক মতবাদ কিছুটা নূতনরূপ পরিগ্রহ করে। নিরন্ন ও নিগৃহীতের দুঃখ তিনি অনেকটা নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর 'ফণিমনসা', 'সর্বহারা', 'প্রলয়-শিখা', 'ভাঙার গান', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যে এর সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, রুশ বিপ্লব, বলশেভিক মতবাদ, মার্কস-লেনিন-ল্যাঙ্গবেরির মতবাদের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সাহচর্যে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় নজরুলের যোগাযোগ এবং নজরুলের রচনায় তার কিছু প্রতিফলন আবদুল কাদিরের ভাষায়, 'নজরুলের রাজনৈতিক মতবাদ কিছুটা নূতনরূপ পরিগ্রহ করে' বা 'নিরন্ন ও নিগৃহীতের দুঃখ তিনি অনেকটা নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন'। বস্তুতঃ এটা শুধু 'কিছুটা নূতন রূপ' বা 'অনেকটা নূতন ভঙ্গী' ছিল না, এটা ছিল গভীরতর কিছু, এবং সেটা আবদুল কাদির অনুধাবন করেন নি তা নয়, কিন্তু সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু লেখেন নি। তবে কবি নজরুল সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ ঘোষণা এ রচনায় তিনি দিয়েছিলেন—"তাঁর কবিতায় নব্য-প্রতীকবাদ, প্যান-ইসলামবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি পাঁচমিশালীর সাক্ষাৎ মিললেও তিনি নিঃসন্দেহে বাঙলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি।"

নজরুলকে আবদুল কাদির 'প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি' আখ্যা দান করলেও স্বল্পপরিসরে তার ব্যাখ্যা দানের অবকাশ তাঁর ছিল না। কিন্তু 'বিদ্রোহী কবি' অপেক্ষা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি' শিরোপা যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই কারণ প্রথমটি ব্যক্তিগত আর দ্বিতীয়টি সমষ্টিগত অভিধা। আলোচ্য প্রবন্ধে ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির কবি নজরুলের ছন্দনিপুণতার পরিচয় যথার্থভাবে নির্দেশ করেন,

> বাল্য থেকেই নজরুলের ছন্দ ও সুরের কান প্রখর ছিল। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নবাবিষ্কৃত মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখেন; এই ছন্দে যে ওজস্ সৃষ্টি চলে তা 'কামাল পাশা' লিখে প্রমাণ করলেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত—বাঙলা ভাষায় তিনি এই নবছন্দের প্রবর্তক। প্রাস্বরিক ছন্দ বাঙলায় সর্বাপেক্ষা নিপুণ ও চটুল ছন্দ,—নজরুল আরবীর অনুরণনে সে ছন্দের কয়েকটি নূতন ধরন-ধারণ উদ্ভাবন করেন,... নজরুল শুধু সংস্কৃত-ভাঙা দীর্ঘহ্রস্বমাত্রিক ছন্দেই নয় প্রাস্বরিক ছন্দেও দক্ষতা দেখিয়েছেন।

নজরুলের ছন্দ-কুশলতার সঙ্গে যে তার সঙ্গীত রচনার নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা আবদুল কাদিরের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি লিখেছেন, 'ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্য শেষে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সুরের রাগ-রহস্য সন্ধানের দিকে'। নজরুল যে শুধু ঠুমরী-গজল নয়, কীর্তন, ভাটিয়ালী, বাউল, রামপ্রসাদী, এমনকি খেয়াল, ধ্রুপদ রচনায়ও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তিনি যে বহু লুপ্ত রাগ-রাগিনীর উদ্ধার ক'রে হিন্দুস্থানী ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন রাগ-রাগিনীতে আড়াই হাজারের

অধিক গান রচনা করেন সে তথ্য পরিবেশন করে আবদুল কাদির সঙ্গীতস্রষ্টা নজরুলের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে,

> এই অতি-আধুনিক ম্যানারিজমের যুগে নজরুলের কবিতায় ভাব ও ভঙ্গীর কুশলী কসরৎ না দেখে কেউ কেউ কঠিন মন্তব্য উচ্চারণ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর কিছু গান সম্বন্ধে কোনো আপত্তিই উঠতে পারে না। নজরুলের শক্তির সর্বোত্তম বিকাশ গীতি-সৃষ্টিতে। অনেকের মতে, তিনি বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা।... তাঁর গানে তিনি নিজেকে আরো নিবিড় ও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি গানে যেমন শ্যাম ও শ্যামার আরতি করেছেন, তেমনিই হজরত মোহাম্মদের প্রশস্তিতে গদ্‌গদ্ হয়েছেন।...মোদ্দা কথা, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্যকে তিনি অজস্র গানে সঞ্জীবিত করেছেন।... গানে তিনি পূর্ণনিবেদিত-চিত্ত শিল্প-সাধক; তাই তাঁর প্রেমের গান, সাধনার গান, বাঙালীর মানসকে বহুদিন সরস ক'রে রাখবে। জাতীয় দুর্দিনে বাঙালী বারবার স্মরণ করবে তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত–।

বাস্তবিকই বাঙালীর দুর্দিনেরও শেষ নেই আর বাঙালী তার প্রতিটি দুর্দিনেই, প্রতিটি সংকটে ও সংগ্রামে নজরুলের স্বদেশী তথা উদ্দীপনামূলক গানকে অবলম্বন করেছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর "বাঙালী জাতির" তরফ থেকে যখন নজরুলকে "জাতীয় সংবর্ধনা" দেওয়া হয় তখন সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, "আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।" বস্তুতঃ বাঙালীর জীবন চিরন্তন বন্দীর জীবন, অনন্ত সংগ্রামের জীবন, সেই বন্দী দশা থেকে মুক্তির জন্যে,'কারার ঐ লৌহ্ কপাট' ভেঙে ফেলার জন্যে, রণক্ষেত্রে 'টলমল, টলমল পদভরে' বীরদল চলে সমরে; নজরুলের গানকে অবলম্বন করে মাতৃমুক্তিপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বারবার। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যেমন সন্ত্রাসবাদীরা, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকেরা, তেমন মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের, রক্তাক্ত সংগ্রামে তাদের সবচেয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল নজরুলের গান।

নজরুলের বিভিন্ন রচনায় তাঁর জীবন-তত্ত্ব ও প্রকাশের স্বকীয়তা যে সুস্পষ্ট আবদুল কাদিরের তা দৃষ্টি এড়ায় নি, এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য,

> তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' এবং 'কুহেলিকা' উপন্যাসের 'জাহাঙ্গীর' তাঁরই বন্ধন-মুক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। আনসারের কামনা–
>
> 'সে মানুষের জন্য সর্বত্যাগী হ'বে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তা'রা পীড়িত ব'লে নয়, তা'রা সুন্দর ব'লে।'
>
> রহস্যময় সৌন্দর্যের প্রতি এই আবেগপ্রবণ পক্ষপাতিত্ব তাঁর সকল কথাগ্রন্থের বিশেষত্ব।....
>
> নজরুলের অনেক কবিতা, বিশেষতঃ উপন্যাস, পড়লে মনে হয় যে, আত্মস্থ হওয়ার দুরূহ সাধনা তাঁর ছিল না, অধৈর্য ও অস্থিরতা তাঁর অনেক রচনাকে অনবদ্য হ'তে

দেয়নি। উপাদান ছিল তাঁর বড় সম্বল, তাই ধ্যানের প্রসন্ন ঔদাসীন্য তাঁর রচনায় বেশি আশা করা বৃথা।

তাঁর বহু কবিতার বাঁধন যথেষ্ট আঁটসাট ও সুঠাম নয়, ভাব আশানুরূপ গভীর ও রসঘন নয়, কবি-কল্পনা তেমন ব্যাপক ও তূর্ণগতি নয়, কাব্যরুচি খুব সুক্ষ্ম ও সমুন্নত নয়— এ সব অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এ সব অভিযোগ সত্ত্বেও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলই বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা। নজরুলের কবিতায় খুঁত থাকতে পারে, কিন্তু কৃত্রিমতা নেই, প্রাণের অদম্য আনন্দ-রসে তা বেগমান ও দীপ্যমান। তাঁর সকল কবিতা যথেষ্ট মার্জিত না হ'তে পারে; কিন্তু তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, স্বাস্থ্য আছে, সচ্ছলতা আছে—সাবলীল গতি আছে। কবিতায় এতখানি পাওয়াই একালে দুষ্কর।

নজরুলের সাহিত্য যে তাঁরই বন্ধন-মুক্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে কোন ব্যবধান ছিল না তা যথার্থ, তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে বাণী প্রকাশ করতে চেয়েছেন নিজের জীবনে তা পালন করতে চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি এবং 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি লেখার জন্যে কারাবরণ ও অনশন পালনের ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আত্মস্থ হওয়ার দুরূহ সাধনা তাঁর না থাকলেও, অধৈর্য ও অস্থিরতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলেও, উন্মাদনাকে সম্বল করেও কি তিনি ধ্যানের প্রসন্ন ঔদাসীন্যকে অবলীলাক্রমে তাঁর অনেক রচনায় আনতে পারেন নি? প্রসঙ্গক্রমে 'মরুভাস্কর' কাব্য এবং অসংখ্য ইসলামী গান ও ভক্তিগীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, এ প্রসঙ্গে 'কাব্যে আমপারা'-র কথাও স্মরণীয়। নজরুলের কবিতার আঙ্গিক এবং ভাব-ভাষা নিয়ে যে অভিযোগের কথা আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন সেগুলো খণ্ডন না করলেও তিনি নজরুলের অভিজ্ঞতার অকৃত্রিমতা, প্রাণের অদম্য আনন্দ-রসের কথা বলেছেন। কিন্তু 'বাঁধন যথেষ্ট আঁটসাট ও সুঠাম, ভাব গভীর ও রসঘন, কবিকল্পনা ব্যাপক ও তূর্ণগতি, কাব্যরুচি সূক্ষ্ম সমুন্নত ও মার্জিত' হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন কবির কাব্য সাধনা যে সার্থক নয়, নজরুলের সমসাময়িক কবিদের মধ্যেই কি তার উদাহরণ নেই? প্রসঙ্গক্রমে মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার কথা বলা যায়, সে কবিতার তো ভাব, ভাষা, আঙ্গিক নিখুঁত অথচ তা পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করে না কেন? আর নজরুলের কবিতা একশ্রেণীর সমালোচক নির্দেশিত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সাত দশক ধরে সাধারণ পাঠক সমাজে এত আদৃত কেন? আবদুল কাদির যথার্থই বলেছেন যে নজরুলের কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, স্বাস্থ্য আছে, সচ্ছলতা আছে, সাবলীল গতি আছে; তবে এর সঙ্গে এ কথাও যোগ করতে হবে যে নজরুলের কবিতায় সাহস আছে। নজরুলের কবিতায় কোথাও পরাধীনতার ছোঁয়া নেই যদিও নজরুল পরাধীন দেশের কবি ছিলেন। নজরুলের চিত্ত, চেতনা ও মানস ছিল স্বাধীন মুক্ত। ঐ সাহস ও স্বাধীনতাই তাঁর কবিতাকে কালজয়ী করেছে। নজরুল অসুস্থ হওয়ার পাঁচ বছর পরে রচিত প্রবন্ধে

আবদুল কাদির লিখেছিলেন,

> তাঁর বলিষ্ঠ দেহশ্রী বিনষ্ট হয়েছে, সেই আয়তচক্ষুতে আর অতলস্পর্শী দৃষ্টি নেই, মুখে উচ্ছল হাসির ফোয়ারা স্তব্ধ হয়ে গেছে, কণ্ঠের অনর্গল বাণী মূর্চ্ছাহত, স্মৃতি শক্তি লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু নজরুলের কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার পরেও, চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও তার কণ্ঠ নিঃসৃত বাণী কি দিনের পর দিন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠেনি? কাজী নজরুলের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু কবি নজরুলের তো মৃত্যু হয়নি।

আবদুল কাদিরের নজরুল-চর্চার সূত্রপাত কলকাতায়, কিন্তু তা পরিণত রূপ লাভ করে ঢাকায়। দেশ বিভাগের পরে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় পনর বছর সরকারী সাহিত্য মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'মাহে-নও' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত নজরুলের বেশ কিছু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা কবির হস্তলিপিসহ ছাপান হয়। এছাড়া প্রধানতঃ আবদুল কাদিরের উদ্যোগেই সরকারী প্রকাশনা সংস্থা পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স্ থেকে "নজরুল পরিচিতি" নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল (প্রথম মুদ্রণ ২৬শে মে ১৯৫৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ১৯৬০, তৃতীয় মুদ্রণ ২৫শে মে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সংকলনে আবদুল কাদিরের তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে 'কবির জীবন কথা', 'বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম' এবং 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম।' "নজরুল পরিচিতি" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধটি বস্তুতঃ 'সওগাত' এ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪) প্রকাশিত এবং কাজী আবদুল ওদুদ-এর "নজরুল প্রতিভা" গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধটির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। প্রবন্ধটি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভার" গ্রন্থেও সংকলিত (প্রথম সংস্করণ ২৫শে মে ১৯৬১, দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫শে মে ১৯৬৯)। আবদুল কাদিরের 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধটির পরিচয় বিষয়ে 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্যে' সঙ্গে তুলনা প্রাসঙ্গিক। আবদুল কাদির 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে নজরুলের 'লেটো' জীবন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, "নজরুল ১২/১৩ বৎসর বয়সেই সেই নাট্যদলের জন্য 'শকুনি-বধ', 'মেঘনাদ বধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সঙ' প্রভৃতি গীতি নাট্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।" বাল্যরচনাতে নজরুলের স্বকীয়তার ছাপ আলোচনা প্রসঙ্গে আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন, তাঁর চাষার গীতে আছে 'চাষ করো দেহ জমিতে'। রামপ্রসাদ সেনের 'ও মন তুমি কৃষি কাজ জান না' গানটিতে আছে কালী মাহাত্ম্যের প্রচারণা, পক্ষান্তরে নজরুল তাঁর 'চাষার সঙ' রূপক নাট্যে করেছেন মুসলমানী ঈমান ও আহকামের ফজিলৎ বর্ণনা। নজরুলের ছাত্র জীবন সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত তথ্য 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে রয়েছে, যেমন ১৩১৮ সালে দেখা গেল নজরুল মাথরুন হাই স্কুলের ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নজরুলের নম্রপ্রকৃতি ও সম্ভ্রমবোধ সহজেই

কুমুদরঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েই অর্থাভাববশতঃ নজরুলকে সে-স্কুল ত্যাগ করতে হলো। অত:পর নজরুল রানীগঞ্জে রেলওয়ের এক গার্ড সাহেবের খপ্পরে পড়ে কিছুদিন তার বাবুর্চীগিরি করলেন। সেখানে এক ফ্যাসাদ চাগিয়ে উঠতেই তিনি হলেন অদৃশ্য। আবদুল কাদির অবশ্য ঐ ফ্যাসাদ সম্পর্কে কিছু খোলাসা করেন নি; তবে শৈলজানন্দের নজরুল স্মৃতিচর্চায় সে কাহিনী রয়েছে। আবদুল কাদির 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধে নজরুলের রুটির দোকানের চাকুরী সম্পর্কে লিখেছিলেন, '১৩১৭ সালে নজরুল আসানসোলে পালিয়ে গিয়ে এক রুটির দোকানে মাসিক ৫ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন' কিন্তু 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আসানসোলে এসে আবদুল ওয়াহেদের বেকারী দোকানে মাসিক ১ টাকা বেতনে রুটির ময়দা মাখার চাকুরী নিলেন।' নজরুল আসানসোলে যে রুটির দোকানে চাকুরী করেছিলেন তার মালিক ছিলেন হুগলী জেলার এম বখশ, মাসিক বেতন এক টাকা এবং আহার, কিন্তু থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। নজরুল রাত্রিযাপন করতেন দোকান সংলগ্ন তিনতলা বাড়ির সিঁড়ির নীচে। ঐ বাড়ীতে ছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লার আবাস। ঐ সূত্রেই রফিজউল্লা সাহেবের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়, তাঁর বাড়ীতে তিন মাসের জন্য চাকুরী এবং শেষে দারোগা সাহেবের গ্রামের বাড়ি কাজীর সিমলায় আগমন, ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি।

'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে আবদুল কাদির নজরুলের দরিরামপুর স্কুল-জীবন সম্পর্কেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছেন, যেমন ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাওয়া, শিক্ষক মহিমচন্দ্র খাসনবীশের কথা, নজরুলকে ক্লাসে কোন প্রশ্ন করা হলে প্রথমে হকচকিয়ে যাওয়া, প্রশ্নটি পুনরায় করা হলে সঠিক জওয়াব দেওয়া, স্কুলের বার্ষিক বিচিত্রানুষ্ঠানে নজরুল কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটির চমৎকার আবৃত্তি ইত্যাদি। ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসে নজরুলের ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ার সময়কার কিছু তথ্যও 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এই স্কুলের ফারসী ভাষার শিক্ষক হাফিজ নূরন্নবীর আগ্রহে নজরুলের সংস্কৃত ছেড়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফারসী গ্রহণ, রায় সাহেব এম্ চ্যাটার্জির পুষ্পোদ্যানের পাশে মাটির দেয়াল ঘেরা ছোটঘরে আর চারজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে বসবাস, ক্লাসে ফার্স্ট বয় বিধায় নজরুলের স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং এবং আহার ফ্রি, রাজবাড়ী থেকে মাসিক ৭ টাকা বৃত্তি লাভ, তার থেকে কিছু বাঁচিয়ে ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচের জন্যে সাহায্য দান ইত্যাদি। এই প্রবন্ধে শৈলজানন্দকে নজরুলের সহপাঠী বলা হয়নি, বলা হয়েছে তিনি ছিলেন রাণীগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্র এবং নজরুলের একনিষ্ঠ সহচর। নজরুলের সিয়ারসোল স্কুল জীবনের তিনটি রচনার কথা এই প্রবন্ধে আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন, 'করুণ গাথা,' 'বেদন বেহাগ' ও 'চড়ুই পাখীর ছানা' যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, ছন্দের নিদর্শন অর্থাৎ সেই সুকুমার বয়সেই নজরুলের বাংলার তিনটি মূল ছন্দ আয়ত্ত করার কৃতিত্ব অর্জনের কথা।

নজরুলের সৈনিক জীবন সম্পর্কেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে রয়েছে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে লাহোর হয়ে নৌশেরা গমন। ট্রেনিং উপলক্ষে তিনমাস নৌশেরায় অবস্থান, অতঃপর করাচী। করাচী বন্দরের পূর্ব-উপকণ্ঠে গানজা লাইনে সৈন্যদের ব্যারাকে বসবাস, সৈন্যদলে প্রভূত কর্মদক্ষতার পরিচয় দান, এবং ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার পদে উন্নতি। করাচী সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্য চর্চা, কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ এবং করাচী থেকে পাঠানো বিভিন্ন রচনা প্রকাশের তালিকা আবদুল কাদির দিয়েছেন। 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রসঙ্গ ছিল না। কিন্তু 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে তা সংযোজিত হয়, "১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে 'নবযুগ' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হয়। 'নবযুগ' ছিল রয়াল সাইজের এক সীটের কাগজ; তার সত্ত্বাধিকারী ছিলেন মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক, সম্পাদনার ভার ছিল প্রধানতঃ নজরুল ইসলামের উপর। নজরুল তখন ৮/এ টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। 'নবযুগে' নজরুল যে সকল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার কতগুলো সংকলন করে পরবর্তীকালে 'যুগবাণী' বের হয়। 'যুগবাণী' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।" 'নবযুগ' প্রসঙ্গে আবদুল কাদির মুজফ্‌ফর আহমদের নাম উল্লেখ করেন নি। 'নবযুগ' সম্পাদনার ভার মুজফ্‌ফর আহমদ এবং কাজী নজরুল ইসলাম উভয়ের ওপরেই ছিল, ৮/এ টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীতে নজরুল একা থাকতেন না, তারা দু'জনেই থাকতেন। কিন্তু কাদির সাহেব তাঁর নিজের শ্বশুর মুজফ্‌ফর আহমদের নাম উহ্য রেখেছেন এ প্রবন্ধে, যেমন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশকের কথা লিখেছেন অথচ প্রকাশক মুজফ্‌ফর আহমদের নাম দেননি। এর কারণ কি? তখন আবদুল কাদির পাকিস্তান সরকারের প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন আর তাঁর শ্বশুর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়ে কারাবন্দী অথবা আত্মগোপনকারী। সে কারণে সম্ভবতঃ ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়ীতে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে বাস করার সময় নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেছিলেন, 'বিদ্রোহী' রচনা প্রসঙ্গেও কাদির সাহেব মুজফ্‌ফর আহমদের নাম করেন নি অথচ 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম শ্রোতা ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ।

'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধে দৌলতপুরের কথা ছিল, কিন্তু নার্গিসের উল্লেখ ছিল না। 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে আবদুল কাদির লিখেছেন, "সেখানে আলী আকবর খানের এক ভাগিনেয়ীর সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি) নজরুলের প্রথম বিবাহ (আক্‌দ্) সম্পন্ন হয়। নজরুলের বর্তমান শ্বাশুড়ী শ্রীযুক্তা গিরিবালাদেবী ও তাঁর জা শ্রীযুক্তা বিরাজা সুন্দরী দেবী প্রভৃতি নৌকাযোগে কুমিল্লা থেকে গিয়ে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আক্‌দের পরই নজরুল তাঁদের সঙ্গে কুমিল্লা কান্দির পাড়ে চলে আসেন। ১৯২১

খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই তিনি কুমিল্লা থেকে আলী আকবর খানকে লিখেন, 'বাকী উৎসবের জন্য যত শীগগীর পারি বন্দোবস্ত করবো।' কিন্তু দৈবক্রমে উৎসবের ব্যবস্থার স্থানে ঘটলো চির-বিচ্ছেদ।" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মুজফ্ফর আহমদ আক্‌দের কথা স্বীকার করেন না। যাই হোক, আবদুল কাদিরের 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্যে'র পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত 'কবির জীবন-কথা' প্রবন্ধে নজরুল জীবনির বিভিন্ন তথ্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে তার প্রথম প্রবন্ধটিতে। নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে কবি আবদুল কাদিরের যে সব মূল্যবান মন্তব্য ছিল তা দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে নেই। অবশ্য প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' আর দ্বিতীয়টির 'কবির জীবন কথা'। প্রথম প্রবন্ধটির প্রায় এক যুগ পরে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচিত ও প্রকাশিত। ইতিমধ্যে নজরুল সম্পর্কে বেশ কয়েকটি স্মৃতিকথা বিশেষতঃ নজরুলের জীবন সম্পর্কে আবদুর রহমান, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহমদ, শৈলজানন্দের তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। আবদুল কাদির নজরুল জীবন সম্পর্কে প্রবন্ধটির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে ঐ সব গ্রন্থের তথ্য ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন। সেই দিক থেকে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটির গুরুত্ব ঐতিহাসিক কারণে। নজরুলের জীবন কথা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন আবদুল কাদির, ১৩৪৭ সালের ২৯শে পৌষ সোমবার দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকায় 'নজরুল জন্মবার্ষিকী' শিরোনামে এবং সেই বছরেই বিশেষ ঈদ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'কৃষক' পত্রিকায় 'নজরুল জীবনী' শিরোনামে তিনি যে দু'টি প্রবন্ধ লেখেন, তাতেই সর্বপ্রথম পরিবেশিত হয়েছিল নজরুল-জীবনীর উপকরণ। দু'টি প্রবন্ধই কবি সাগ্রহে পড়েছিলেন এবং সে-বিষয়ে আবদুল কাদিরের সঙ্গে আলোচনা কালে দু'একটি তথ্যের উপর নূতন আলোকপাত করেছিলেন। অতঃপর ১৩৫৩ সালে 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' সম্পর্কে আবদুল কাদির কলকাতা বেতার মারফৎ একটি কথিকা প্রচার করেন; তা পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত হয়ে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সালে'। সুতরাং 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধটির জন্যেই আবদুল কাদির নজরুলের প্রথম জীবনীকার।

[দুই]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ নিয়ে বেশ কয়েকটি সংকলন গত শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মীর আবুল হোসেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এবং সুফী জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত সংকলনগুলি উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানী আমলে পাকিস্তান পাবলিকেশান্স ঢাকা, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নজরুল-সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর

একটি সংকলন প্রকাশ করে 'নজরুল-পরিচিতি' নামে। যদিও এই সরকারী প্রকাশনায় সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপা হয়নি তবুও এর পেছনে যে কবি আবদুল কাদিরের উদ্যোগ ছিল তা সর্বজনবিদিত। ১৯৬২ সালের মধ্যে সংকলনটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যার সর্বশেষ সংস্করণে আবদুল কাদিরের চারটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিল, 'কবির জীবন-কথা', 'নজরুলের গল্প', 'বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম' এবং 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম'।

আবদুল কাদির নজরুলের অপ্রকাশিত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ কোন গ্রন্থে সংকলিত নয় এমন সব রচনাবলী, চিঠিপত্র ও অভিভাষণ সংকলিত করে 'নজরুল রচনা-সম্ভার' নামে একটি সংকলন সম্পাদনা করেন। ঢাকা থেকে যার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২৫ শে মে ১৯৬১, সালে। "নজরুল-পরিচিতি" গ্রন্থে সংকলিত এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়ে ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থে আবদুল কাদিরের দশটি করে প্রবন্ধ রয়েছে – তার মধ্যে নিম্নোক্ত নয়টি উভয় গ্রন্থে সংকলিত, 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য', 'নজরুল জীবনের এক অধ্যায়', 'নজরুল-কাব্যালোক', 'নজরুলের গীতি-কবিতা', 'নজরুলের গানে কথা ও সুর', 'নজরুলের ছোট গল্প', 'বাংলা-সাহিত্যে নজরুল', 'নজরুল-সাহিত্যের এক দিক', 'বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম'। ঢাকা সংস্করণ "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক' কলকাতা সংস্করণে নেই, আবার ঐ গ্রন্থের কলকাতা সংস্করণের 'নজরুলের নাটক' প্রবন্ধটি ঢাকা সংস্করণে নেই। "নজরুল-পরিচিতি" সংকলনের অন্তর্গত 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধটি 'নজরুল রচনা-সম্ভার"-এর ঢাকা বা কলকাতা কোন সংস্করণেই নেই। ইতিপূর্বে আবদুল কাদিরের 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধটির আলোচনা এবং 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পুনরাবৃত্তির জন্য ঐ প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনায় বিরত রইলাম।

"নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থের 'নজরুল-জীবনের এক অধ্যায়' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল "মাহে-নও" পত্রিকায় (আগষ্ট ১৯৫৪)। আবদুল কাদির 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধে দৌলতপুরের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু নজরুলের প্রথম বিবাহ প্রয়াস বা নার্গিস সম্পর্ক নয়। ঐ প্রবন্ধের পরিবর্তিত রূপ এক যুগ পরে প্রকাশিত 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে ঐ বিবাহ প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছিল, তবে সেখানে "আলী আকবর খানের এক ভাগিনেয়ীর" উল্লেখ থাকলেও তার নাম উচ্চারিত হয়নি। যা 'নজরুল-জীবনের এক অধ্যায়' প্রবন্ধের শুরুতে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তারপর তিনি প্রবন্ধের প্রকৃত প্রসঙ্গে এসেছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধে নজরুলের প্রথম বিবাহ প্রসঙ্গে বর্ণনায় আবদুল কাদির কোথাও সরাসরি কিছু বলেন

নি, তিনি নিজের জবানীতে কথা বলেছেন খুবই কম, তাও নার্গিস বা আলী আকবর খানের নাম উল্লেখ না করেই। নজরুলের বিবাহ প্রসঙ্গ বর্ণনায় তিনি এক অদ্ভুৎ কৌশল অবলম্বন করেছেন, এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যিককে নজরুলের লেখা পত্রের উত্তর, আলী আকবর খানকে লিখিত বলে কথিত নজরুলের পত্র এবং নার্গিসের পত্রের উত্তরে নজরুলের পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেন। আবদুল কাদির প্রসঙ্গটি শুরু করেছেন নলিনীকান্ত সরকারের বরাত দিয়ে, "এর পাঁচ-ছ মাস" পরের একটি ঘটনা তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু সুগায়ক শ্রী নলিনীকান্ত সরকার বর্ণনা করেছেন এভাবে।" তারপর উদ্ধৃতির সাহায্যে আবদুল কাদির নজরুলের কুমিল্লা ও দৌলতপুর গমনের কথা লিখেছেন, কিন্তু আশ্চর্য, নজরুল যার সঙ্গে গিয়েছিলেন সেই আলী আকবর খানের নাম তিনি উল্লেখ করেন নি।

দৌলতপুর থেকে নজরুল নার্গিসকে বিবাহ করার সিদ্ধান্তের কথা কলকাতায় সাহিত্যিক বন্ধুদের লিখে জানালে উত্তরে তাঁরা তাদের যে প্রতিক্রিয়া জানান আবদুল কাদির তা ব্যবহার করেছেন চাতুর্যের সাথে, "ত্রিপুরা জেলার সেই 'পল্লীগ্রাম' থেকে কুমিল্লা শহরে আসা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নজরুলের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর যে-সকল চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হয়, তা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক।" তারপর তিনি বিবাহের খবর জানিয়ে লেখা নজরুলের পত্রের উত্তরে পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি, এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর একটি পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুলের কোন পত্র পাননি, তিনি পেয়েছিলেন আলী আকবর খান প্রেরিত বিবাহের আমন্ত্রণ-পত্র। মুজফ্‌ফর আহমদ এ নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে নজরুল ও আলী আকবর খানকে একাধিক পত্র দেন। আবদুল কাদির ঐ সব চিঠি থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে আলী আকবর খানের নাম উল্লেখ না করে শুধু 'মামা-শ্বশুর' বলে। নজরুল তাঁর প্রথম বিবাহের নির্ধারিত দিনে বিয়ের আসর থেকে উঠে গিয়ে সে রাতেই কুমিল্লা যাত্রা করেছিলেন। আবদুল কাদির ঐ তথ্য উল্লেখ না করে কুমিল্লা থেকে আলী আকবর খানকে "বাবা শ্বশুর" সম্বোধনে নজরুলের লেখা বলে কথিত চিঠিটি ছাপেন, তবে এ চিঠিতেও কারো নাম ছিল না। আবদুল কাদির চিঠিখানা সম্পর্কে এইটুকু মাত্র লিখেছেন, "কুমিল্লা এসে তিনি প্রাগুক্ত "মামা-শ্বশুরকে' 'বাবা শ্বশুর' সম্বোধন করে এই চিঠিখানা লেখেন।"

আবদুল কাদির অবশ্য কান্দিরপাড়ে প্রমীলাদের বাড়ীতে নজরুলের অবস্থান, কলকাতা থেকে মুজফ্‌ফর আহমদের কুমিল্লা আগমন, নজরুলকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ যথারীতি বর্ণনা করেছেন, তবে নজরুলের বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে তিনি পুনরায় অপরের লেখার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আব্দুল কাদির লিখেছেন, "জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর 'নজরুলের আগে ও পরে' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের 'পত্নী গ্রহণের কথা' বলতে গিয়ে লিখেছেন "কুমিল্লায় এক মুসলিম পরিবারে

তাঁর প্রথম বিবাহ। কিন্তু কোন কারণে অল্পদিন পরে এই পত্নীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে।" আবদুল কাদির আলোচ্য 'নজরুল জীবনের এক অধ্যায়' প্রবন্ধে যে সব তথ্য দিয়েছেন তাতে তাঁর নিজস্ব তথ্য কেবলমাত্র একটি চরণে প্রদত্ত "নজরুল যখন ৩/১ সি নং তালতলা লেনে মিঃ আহমদের সঙ্গে বাস করেছেন, সে সময় এই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।" যদিও মিঃ আহমদ অর্থাৎ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ঐ ঘটনার কথা স্বীকার করেননি।

আবদুল কাদির নজরুলের প্রথম বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐরূপ কৌশল বা সতর্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন কেন? সম্ভবত এই কারণে, উক্ত প্রবন্ধে তিনি যে সব চিঠিপত্র ব্যবহার করেছিলেন তা তিনি পেয়েছিলেন নার্গিসের স্বামী কবি আজিজুল হাকিম বা নার্গিসের মামা আলী আকবর খানের কাছ থেকে। আবদুল কাদির ঐ প্রবন্ধটি যখন রচনা ও প্রকাশ করেন তখন নার্গিস, আজিজুল হাকিম এবং আলী আকবর খান তিনজনই জীবিত এবং ঢাকাবাসী, আর নজরুল তখন সম্বিতহারা, নির্বাক। স্বাভাবিকভাবেই কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্যের খাতিরে আবদুল কাদিরকে নার্গিসের জীবনের ব্যক্তিগত বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বর্ণনা করতে হয়েছে। বিয়ের রাতে বিয়ের আসর থেকে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল কুমিল্লা যাত্রা করেছিলেন। সঙ্গে নিজের কোন জিনিষপত্র বা চিঠিপত্র নিয়ে যেতে পারেননি, সেগুলো নার্গিস তথা আলী আকবর খানের হাতে পড়ে যায়। পরে আলী আকবর খানের প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কবি আজিজুল হাকিমের সঙ্গে নার্গিসের বিবাহ হয়। দৌলতপুর ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পর সম্ভবত আবদুল কাদির উল্লেখিত চিঠিপত্রগুলো পান। স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা তাঁকে ঐ মূল্যবান পত্রগুলি দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বজায় রেখেই তাঁকে লিখতে হয়েছিল, আর সে কারণেই হয়তো 'নজরুল-জীবনের এক অধ্যায়' প্রবন্ধে তিনি কোথাও নার্গিস বা আলী আকবর খানের নাম উল্লেখ করেননি। পূর্বাহ্নে রচিত 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য' প্রবন্ধে দৌলতপুরের কথা ছিল, কিন্তু নার্গিসের কথা ছিল না; পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'কবির জীবন কথা' প্রবন্ধে ছিল, "সেখানে আলী আকবর খানের এক ভাগিনেয়ীর সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি) নজরুলের প্রথম বিবাহ (আক্‌দ্) সম্পন্ন হয়। ... ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুলাই তিনি কুমিল্লা থেকে আলী আকবর খানকে লিখেন, 'বাকী উৎসবের জন্য যত শীগগীর পারি বন্দোবস্ত করব।' কিন্তু দৈবক্রমে উৎসবের ব্যবস্থার স্থানে ঘটলো চিরবিচ্ছেদ।" লক্ষণীয় যে এখানেও নার্গিসের নাম নেই, আর "নজরুল জীবনের এক অধ্যায়" প্রবন্ধে অপরের জবানীতে উদ্ধৃতির সাহায্যে নজরুলের প্রথম বিবাহ প্রসঙ্গের বর্ণনাতেও এ নাটকীয় ঘটনার দুই প্রধান চরিত্র আলী আকবর খান ও নায়িকা সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের নাম বরাবর উহ্য! এতটা সতর্কতার প্রয়োজন ছিল কি?

আবদুল কাদিরের 'নজরুল-কাব্যলোক' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল "সওগাত" পত্রিকায় ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। প্রবন্ধটির শুরুতে তিনি লিখেছেন "নজরুলের রচনাতেই আমরা প্রথম পাইলাম জীবনের পরম আস্বাদ"। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র মধ্যে নজরুলের শক্তির প্রথম স্ফুরণের কথা উল্লেখ করে, করাচীর সেনানিবাসে বসে লেখা নজরুলের কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা সম্পর্কে আবদুল কাদিরের মন্তব্য, "সহজ সৌন্দর্যসৃষ্টি ও প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী সেই গল্পগুলির বিশেষত্ব, সে-সমস্ত রচনায় বাক্-চাতুরী নাই, তত্ত্বান্বেষী মানস-কণ্ডুয়ন নাই,— আছে জীবনের সহজ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। সাহিত্য যে জীবন-বিটপীর পুষ্প, নজরুল-সাহিত্যের সুরভি আস্বাদন করিয়া বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমান তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে।" কলকাতার সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে নজরুলের মনে খেলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া এবং বহু চিন্তাশীল মুসলমানের মতন প্যান-ইসলামের স্বপ্ন দেখার কথা উল্লেখ করে আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন. "খেলাফত-যুগের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় নজরুলের আবির্ভাব হইলেও খেলাফত-পরবর্তী যুগের চিন্তাসম্পদই তাঁহার রচিত সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।" নজরুল যে প্যান-ইসলাম মন্ত্রের সাধক আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের সমর্থক কামাল পাশা এই দুই মহাবীরকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আবদুল কাদির তার হেতু নির্দেশ করেছেন এভাবে, "কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদের জন্য নয়, যৌবনের উদ্দামতা দেখিয়াই তাঁহার কণ্ঠে জাগিয়াছে আনন্দ-গীতি।" খেলাফৎ-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে কামাল-পন্থীদের সামান্য লক্ষ্যযোগ্য প্রভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে আবদুল কাদির লিখেছেন, "ধর্মসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ও ধর্মাচারের অনুশাসন অস্বীকার, বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, আধুনিক জীবন ও জগতের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি, এ সমস্তকে সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশে যে-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, নজরুল তাহার অন্যতম প্রধান অধিনায়ক। অবশ্য এ-সম্পর্কে তাঁহার বাণীতে যথেষ্ট তীক্ষ্ণতা নাই। তবে প্রশংসার বিষয় যে, নিগৃহীত মুসলমানের মুক্তির জন্য ধর্মনেতা অপেক্ষা তিনি রাষ্ট্রবীরের আবির্ভাবই অধিকতর কাম্য মনে করিয়াছেন।" আবদুল কাদির পরোক্ষভাবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথাই বলেছেন।

'নজরুল-কাব্যলোক' প্রবন্ধে আবদুল কাদির 'অতিরিক্ত উদ্দামতার ফলে নজরুলের বহু কবিতার গঠন যথেষ্ট আঁটসাট ও সুঠাম না হওয়ার কারণে তা হয়ত দূরকালের পাঠকদের রসতৃষ্ণা পুরোপুরি মেটাতে সমর্থ হবে না'— এমন আশংকা প্রকাশ করে লিখেছেন, 'নজরুল যুগ-প্রয়োজন মেটাতে কার্পণ্য করেনি।' যুগ-প্রয়োজন এবং দূর কালের পাঠকদের রসতৃষ্ণা একসাথে বাংলা সাহিত্যে কোন এবং কয়জন কবি মেটাতে পেরেছেন? এ প্রশ্নের আলোচনা আবদুল কাদির করেন নি। নজরুলের "বিদ্রোহী" সম্পর্কে আবদুল কাদির লিখেছেন, "পৃথিবীর অন্যায়-অবিচার দেখিয়া বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন।" নজরুলের

বিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি আবার লিখেছেন, "ভগবানের সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা দেখিয়া জাগ্রতশক্তি ভক্তের মনে জাগিয়াছে দুর্জয় অভিমান। তাই 'আমিত্ব' সম্বন্ধে সচেতন কবি করিতে চাহিয়াছেন বিদ্রোহ-লীলা।" প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর ভগবানের সৃষ্টির অসম্পূর্ণতার কারণে জাগ্রতশক্তি ভক্তের মনের দুর্জয় অভিমান এক কিনা বিবেচ্য। আবদুল কাদিরের বিবেচনায়, "মানুষের আত্মবোধ জাগ্রত হোক পরম সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হোক, সর্বপ্রকার ভ্রূকুটীকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সাম্যের প্রতিষ্ঠা করুক, —ইহাই কবির কাম্য।"

নজরুলের বিপ্লবী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবদুল কাদির লিখেছেন, "তিনি কবি-কল্পনায় বিপ্লব-লীলা দেখিয়াছেন; তাহাতে উন্মাদনা আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ নাই।" তবে পরক্ষণেই আবদুল কাদির লিখেছেন, "এই অসুন্দর জীবন-ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া তিনি চাহিয়াছেন নব-সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কবি কল্পনায় ধরা দিয়াছে নব-জীবনের ছবি ঃ কবির আকাঙ্ক্ষিত নব্য-সমাজ হইতেছে অক্ষয় যৌবনের দেশ, অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র।" নজরুলের "বিদ্রোহ"কে আবদুল কাদির শ্রীকৃষ্ণের লীলাচাঞ্চল্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার তাঁর "বাঁধনহারা" উপন্যাসে 'সাহসিকা'র এক পত্রে যে-বিদ্রোহিতার আভাস আছে, পরবর্তীকালে "বিদ্রোহী" কবিতায় তার পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করে আবদুল কাদির এ কথাও বলেছেন যে, "বাঁধনহারা" উপন্যাসের মূলে রয়েছে তরুণ প্রেমের ব্যর্থতা। প্রধানতঃ নারীর প্রেমের প্রেরণা থেকেই তাঁর বিদ্রোহ ভাবের জন্ম— এমন কথাও আবদুল কাদির এ প্রবন্ধে উচ্চারণ করেছেন, সম্ভবতঃ ঐ ধারণা থেকেই তিনি কৃষ্ণলীলার সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহ চেতনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পরিণামে প্রেমের কবিতা ও সঙ্গীতে নজরুলের দৈবী-প্রতিভার বিকাশের কথা বলেছেন। নজরুলের প্রেম চেতনায় বিরহবোধের উপস্থিতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন "যে-প্রেম চিত্তকে রাখে চির-সজীব, সেই সুগভীর প্রেম যেন এ নয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ যেন তাঁহার প্রেমের স্বভাব নয়। মিলন বা বিরহের রসে নিঃশেষে আত্মনিমজ্জন তাঁহার দ্বারা তেমন সম্ভব হয় না।" আবদুল কাদির নজরুলের প্রেমচেতনার যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন, তা কি রোমান্টিক প্রেম কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়? শুধু পরিপূর্ণ মিলন বা বিরহ কোন্ কবির প্রেম কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় ? যেমন কোনো কবিই শুধু বিদ্রোহ আর বিপ্লবের কবিতা লেখেন না, তেমনি কোনো কবিই শুধু প্রেমের মিলনের বা বিরহের কবিতাও লেখেন না।

'নজরুল-কাব্যলোক' প্রবন্ধের উপসংহারে আবদুল কাদির "বিদ্রোহী" কবিতার কথিত খ্যাতি এবং কবিতার ছন্দের সামঞ্জস্য সম্পর্কে কৌতুহল-উদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নজরুল ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা "বিদ্রোহী"তে একালের মানুষের বিদ্রোহের বাণী রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু

লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এ কবিতা সমিল-মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দই বিপুল ভাবের ভার বহন করিয়া চলিতে পারে; সে ছন্দের গতি মন্থর হইলেও তাহা বীররস প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী"। আবদুল কাদির বলতে চেয়েছেন যে বিদ্রোহী কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে তার মধ্যে লিরিক্ উপাদান চটুলতার সৃষ্টি করেছে! কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেই কি তা বীররস প্রকাশের জন্যে অধিকতর উপযোগী হত ? এ প্রসঙ্গে "বিদ্রোহ" এবং "বীররসের" সম্পর্ক বিচার্য। বিদ্রোহ আত্মগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার হতে পারে, নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতায় প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের জাগরণ ঘটেছে এবং প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তার প্রকাশ সাবলীল ভাবেই ঘটেছে, এমনকি বস্তুগত বিদ্রোহের প্রকাশও ঐ ছন্দে বাধাগ্রস্ত হয় নি, যেমন,

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না —
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

আবদুল কাদির লিখেছেন, "হৃদয়-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম সুরগুলি উত্তম রূপে প্রকাশ করা চলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। এই ধ্বনিমাত্রিক গীতচ্ছন্দে 'বিদ্রোহী' বিরচিত; তাই বীররসের অবসরে তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে চটুলতা; 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে দেখা গিয়াছিল যে 'লিরিক' উপাদান, তাহাই তাঁহার পরবর্তীকালের রচনায় প্রবলতর হইয়া ওঠে।" মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত "বিদ্রোহী" কবিতায় রয়েছে ব্যক্তির অন্তর বিদ্রোহ— তবে তা সমষ্টির মুক্তির জন্য, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত "দারিদ্র্য" কবিতায়ও বীররসের প্রকাশ নেই, আবার স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত "কামাল পাশা" কবিতায় বীররসের প্রাধান্য দেখি। "অগ্নি-বীণা" কাব্যের অধিকাংশ বীররসাত্মক কবিতাইতো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতায় বিভিন্ন রস বা আবেগের প্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া কঠিন, তাহলে কবিতায় আবেগকে ছন্দের দাসত্ব করতে হয়, ছান্দসিক কবিদের কবিতায় তার উদাহরণ মেলে কিন্তু ঐ সব ক্ষেত্রে ছন্দের দোলায় কবিতা হারিয়ে যায়। কবি আবদুল কাদির পরবর্তীকালে 'নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার ছন্দ' নামক একটি প্রবন্ধে (ইত্তেফাক, ঢাকা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬) লেখেন, তাঁর 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, বাঙলা ভাষায় তিনি এই নবছন্দের প্রবর্তক।" কবি আবদুল কাদিরের বহু পূর্বে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছিলেন; "বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য" (প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৩০)। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ "বিদ্রোহী" কবিতার অনুপযোগী এ কথা তবুও বলা চলে কি ?

আবদুল কাদির 'নজরুলের গীতি-কবিতা' (প্রথম প্রকাশ; দৈনিক কৃষক ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮) শিরোনামে রচিত প্রবন্ধে নজরুল যে বাংলা গীতিকবিতার প্রবহমান ধারাকে অস্বীকার করেননি সে কথা লিখেছেন। বাংলা গীতিকবিতার ঐতিহ্য বৈষ্ণব কবিতা থেকে সম্প্রসারিত। বৈষ্ণব কবিতায় যে অন্তরঙ্গ হৃদয়ের ছোঁয়া রয়েছে আবদুল কাদির "ছায়ানট" কাব্য থেকেই সে প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। সুরের বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও "ছায়ানট" এর কোন কোন কবিতায় যে পদাবলীর ললিত মাধুর্য আস্বাদন করা যায় আবদুল কাদির তাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। নজরুলকে তিনি "চির বাউল" বলেছেন; ঐতিহ্যগতভাবে বাউলরা অবশ্য "গীতি কবিতা" রচনা করেন না, তারা সৃষ্টি করেন মরমী গান বা কবিতা। আবদুল কাদির নজরুলকে বাউল বলেছেন কারণ ঘরের বন্ধন তাঁকে কোনোদিন বাঁধতে পারেনি। "বাঁধন-হারা" "চির-পথিক" বলেই নজরুল কখনও কখনও পৃথিবীর প্রেমে ধরা দিতে প্রলুব্ধ হয়েছেন, কিন্তু আবদুল কাদিরের মতে তাঁকে কোনো মর্ত্য-রমণী বেশীদিন স্নেহাঞ্চলে বেঁধে রাখতে পারেনি। এ পৃথিবীর কোনো মানব প্রিয়ার নিকট অবহেলা পেয়ে তার প্রতি কবির যে অভিশাপ, তাতে তীব্রতা নেই আছে মধুর অভিমান কিন্তু তা-ও ক্ষণস্থায়ী। সমস্ত ব্যর্থতার বেদনা থেকে কবিকে বারবার উদ্ধার করেছে তাঁর অশান্ত জীবন-বেগ, অনন্ত জীবনের জন্য উন্মাদ আগ্রহ। পৃথিবীর প্রেয়সী এবং প্রকৃতি তাঁকে বারবার উন্মানা করেছে সত্য, কিন্তু এই আনন্দের নেশার ঘোর তাঁকে গভীরভাবে আবিষ্ট করতে পারেনি, এই মধুর রসাবেশের মধ্যেও তিনি শুনেছেন কার প্রিয় আহ্বান। সেই সুদূরের বংশীধ্বনিতে তাঁর চরণে জেগেছে দুর্বার গতি-বেগ, মনে জেগেছে উন্মত্ততা। দুরন্ত প্রেমের আহ্বানে নূতন জীবনের সন্ধানে তিনি আবার অজানিতের দেশে যাত্রা করেছেন।

বলা বাহুল্য যে, নজরুলের গীতিকবিতা বা প্রেম-প্রকৃতির কবি নজরুলের যে স্বরূপ আবদুল কাদির ঐভাবে নির্দেশ করেছেন তা একজন সার্থক রোমান্টিক কবির বৈশিষ্ট্য। সুদূরের আকাংখা রোমান্টিক কবিরা লালন করেন। আবদুল কাদির বর্ণিত "অনন্ত জীবনের জন্য উন্মাদ আগ্রহ" নজরুলের যে নেই তা নয়, কিন্তু জীবনের জন্যে আগ্রহ তাঁর চেয়ে বেশী বলেই এ নশ্বর জীবন ও পৃথিবীকে তিনি সুন্দর করতে চেয়েছিলেন আর সে জন্যেই তিনি যৌবন বন্দনা করেছেন, যৌবনের বিশিষ্ট রূপ বিদ্রোহ আর প্রেম নজরুলে যা সমান্তরাল, এর মধ্যে বিরোধ কোথায় ?

'নজরুলের গানে কথা ও সুর' প্রবন্ধে (প্রথম প্রকাশ নবারুণ, ভাদ্র ১৩৪০) আবদুল কাদির নজরুলের গানকে "রক্তাক্ত আত্মার গান" আখ্যা দিয়েছেন। সেই রক্তাক্ত আত্মার গানে বাণী ও সুরের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে আবদুল কাদির লিখেছেন, "নজরুল ইসলাম সুর ঝঙ্কারে প্রথম মস্‌ত্ হইয়া ওঠেন, কী সুরে গানটি বাঁধিবেন সেইটি তাঁর আসে প্রথম; তারপর সেই সুরে ফেলিয়া শব্দ সংযোজন করিয়া দেন"।

গান রচনার ক্ষেত্রে নজরুল বরাবর ঐ রীতির অনুসরণ করেছেন কিনা বলা কঠিন। একজন সার্থক সঙ্গীতস্রষ্টার পক্ষে কখনো বাণী, কখনো সুর আবার কখনো বা প্রায় একই সঙ্গে বাণী ও সুরের সৃষ্টি সম্ভবপর, আমাদের ধারণায় নজরুলও কোন ব্যতিক্রম নন। বিভিন্ন স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, নজরুল কখনো প্রথমে গানটি লিখে তারপর সুর সংযোজন করেছেন, কখনো বা কোন সুর মনে দোলা দিয়েছে তাতে তিনি বাণী বসিয়েছেন, আবার এমনও ঘটেছে যে তিনি গানটি লিখতে লিখতে সুর করেছেন। নজরুলের অধিকাংশ গানে বাণী ও সুরের সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় এবং তা বিভিন্ন অঙ্গের গানে, যেহেতু নজরুল একাধারে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সে কারণে তাঁর অনেক গান একাধারে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও কবিতা।

আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুলের গানের ভূবন সম্পর্কে আবদুল কাদিরের একটি মন্তব্য বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, "চিরন্তন কালের যে অন্তরবাণী আনন্দ-ঘন অমৃতলোকের রসালতা নিয়া একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মর্ত্য মানবকে ভাব স্বর্গের দিকে উন্মার্গ করিয়া তোলে—ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গ আলাপে যার কিছু প্রকাশ আমরা পাই– তাহা নজরুলের গানের সাধনার বিষয় নয়। মর্ত্যলোকের মিলন-বিরহ অনুরাগ-বিধুরতার লীলাই নজরুল-সঙ্গীতে সাময়িক ভাব-স্পর্শালুতা নিয়া গভীর ও জীবন্ত হইয়া আছে; সেই গানের সৃষ্টি-উৎস ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চিরপরিচিত পটভূমি।" এ কথা ঠিক যে নজরুল-সঙ্গীতে খেয়াল, ঠুমরী, দাদ্‌রা ও গজল আঙ্গিকের প্রাধান্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নজরুলের গানে চিরন্তন কালের অন্তরবাণীর আনন্দ-ঘন অমৃতলোকের ছোঁয়া নেই। ধ্রুপদাঙ্গ ও চিরন্তন কালের অন্তরবাণী এবং আনন্দ-ঘন অমৃতলোক সর্বদা সমার্থক নয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল একই রাগে গীত হয়, তবে ধ্রুপদে খেয়ালের মতো তানের খেলা নেই, ধ্রুপদাঙ্গের গান ধীর স্থির সমাহিত আবেগ প্রকাশের উপযোগী বাণী প্রধান।

নজরুল ধ্রুপদাঙ্গের গান কম রচনা করেছেন বটে, কিন্তু নজরুলের ভক্তিমূলক গানের সংখ্যা অনেক। নজরুলের গানের শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায় যে প্রেমের গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, তারপরেই ভক্তিমূলক গান। নজরুলের ভক্তিমূলক গানের বাণী ও সুরে কি আনন্দ–ঘন অমৃতলোকের রসালতা নেই ? কবি আবদুল কাদির তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বলেছেন, "নজরুল ইসলাম হয়ত যতখানি সুর সাধক ততখানি কবি নন; তাঁর 'বুলবুল'-এর পরের রচিত অনেক গানে কাব্যের ঝলক অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, এবং সে সবও অভিনব ভাবের প্রেরণায় কোনো নবসৃষ্টি নয়। সুরের বৈচিত্র্যের জন্যেই এখন তাঁর দরদ, কথার জন্য খুব নয়। উচ্চতর ভাবতন্ত্রের মধ্যে যদি তাঁর গানের কথার জন্ম হত, তবে তা আমাদের চিত্তকেও উচ্চগ্রামের রস-পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত করে নিতে পারত। কিন্তু তাঁর গানের

আবেদন সেদিক দিয়ে সার্থক কোথায়?" কবি আবদুল কাদির তার ঐ মন্তব্যের সমর্থনে "জুলফিকার" ও "বনগীতি" সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ঐ দুটি গ্রন্থে গীতি-কবিতার যা বৈশিষ্ট্য একটি ইমোশন্ বা আইডিয়ার সম্পূর্ণতা তা নেই।

"বুলবুল" গীতি সংকলন প্রকাশের (কার্তিক ১৩৩৫, নভেম্বর ১৯২৮) পর নজরুলের যে সংকলনসমূহ প্রকাশিত হয় তা "জুলফিকার" বা "বনগীতি" নয়, "চোখের চাতক" (পৌষ ১৩৩৬, ডিসেম্বর ১৯২৯) "নজরুল-গীতিকা" (ভাদ্র ১৩৩৭, জুলাই ১৯৩০) এবং "সুরসাকী" (আষাঢ় ১৩৩৯, জুলাই ১৯৩২)। ঐ তিনটির মধ্যে "নজরুল-গীতিকা" সংকলনে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে গান সংকলিত, সে কারণে ঐ গ্রন্থটি বিবেচনা থেকে বাদ দিলেও অপর দুটি সংকলন, "চোখের চাতক" এবং "সুরসাকী"তে "বুলবুল" এর ঐতিহ্যই সম্প্রসারিত, বস্তুত ঃ এই তিনটি সংকলনের অনেক গান উৎকৃষ্ট কবিতাও বটে। আবদুল কাদির "বুলবুল" এর পর প্রকাশিত "চোখের চাতক" ও "গুলবাগিচা" সংকলন দুটির কথা উল্লেখ না করে তারপরে প্রকাশিত "জুলফিকার" ও "বন-গীতি" (আশ্বিন ১৩৩৯, অক্টোবর ১৯৩২)-র ভিন্ন ধরনের গানগুলিকে কেন "বুলবুল" এর গানের সঙ্গে তুলনা করলেন তা স্পষ্ট নয়। "জুলফিকার" ও "বন-গীতি" সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি "গুলবাগিচা"কেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। "নজরুলের 'জুলফিকার' ও গুলবাগিচা'য় 'ইসলামী গান'– এ ইসলাম ও প্যান-ইসলামবাদের জন্য যে অন্তর্দাহ, তাতে একালে প্রতিষ্ঠাহীন মুসলমানের অন্তরে কিছু অভিমান ও আশার সঞ্চার হইলেও শাশ্বত কালের কাব্যরসিক তাহাতে ক্ষুণ্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তবে এখানে ভাবিবার কথা এই যে, প্যান ইসলামত্ব বা লৌকিক হিন্দুত্বের জন্য আসলে নজরুলের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। সেই লোকপ্রিয় ভাবসমূহের আশ্রয়ে তিনি নব নব সুরের সাধনা করিয়াছেন মাত্র! পূর্বেই বলিয়াছি, গানের কথাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার কোনো গভীর স্বপ্ন বা সহৃদয়তা নাই; গানকে সহজে জনপ্রিয় করার উপচেতন আগ্রহেই তিনি প্রচলিত মতাদর্শকে আমল দিয়া থাকেন। এই দুর্বলতা স্রষ্টার পক্ষে অশোভন নিশ্চয়।" আবদুল কাদির সম্ভবত নজরুলের গান সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করার সময় গান ও কবিতার পার্থক্যের কথা মনে রাখেননি। আমরা গান শুনি, পাঠ করি না। আমরা কবিতা পাঠ করি অথবা কবিতার আবৃত্তি শুনি। কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি থেকে যেমন গানের স্বাদ পাওয়া যায় না, গান পাঠ করেও তেমনি কবিতা পাঠের রস পুরো মেলে না। গান পাঠ করে শাশ্বতকালের কাব্যরসিক যদি তার থেকে শাশ্বত কবিতার রস আস্বাদন করতে চান তাহলে কি সর্বদা তার কাব্যরস-পিপাসা নিবৃত্ত হবে? মনে হয় না। নজরুলের প্রতিটি গানকে রসোত্তীর্ণ কবিতা রূপে প্রত্যাশা করা অতিরিক্ত নয় কি ? আবদুল কাদির

নজরুলের কাছে সে দাবীই করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গীতিকবিতা যেমন গান নয়, তথাকথিত কাব্যগীতি তেমনি কবিতা নয়, গান। কবিতা গান হতে পারে যদি গানের আঙ্গিকের মধ্যে তা পড়ে। গান কবিতা হতে পারে যদি তার বাণীরূপে কাব্যগুণ থাকে। কিন্তু তা তো সর্বদা অপরিহার্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সব গান কবিতা নয়, আর কবিতাতে সুরারোপ করে গান করতে গেলে কি অবস্থা হয় মাইকেল ও জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করার প্রয়াস তার উদাহরণ। জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা সুরারোপের ফলে নিকৃষ্ট গানে পরিণত হয়েছে। গান এবং কবিতার আঙ্গিক ও চরিত্রগত মৌলিক পার্থক্য সর্বদা মুছে যাবার নয়।

প্রসঙ্গক্রমে কেউ হয়তো বৈষ্ণব পদাবলীর কথা উল্লেখ করতে পারেন। কারণ বৈষ্ণব পদাবলী একাধারে কবিতা ও গান, পদাবলী যখন সুর, তাল ছাড়া তখন কবিতা, আর যখন তা সুর, তাল, লয় যুক্ত তখন তা কীর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে অধিকাংশ রচনাই গীত হত, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী সব রচনাই গীত হবার জন্য রচিত। বৈষ্ণব পদাবলী বিশেষ পদ্ধতিতে গীত হত এবং তা প্রায়শঃ দলবদ্ধভাবে; বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীচৈতন্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, গোষ্ঠী চেতনা সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে জন্যই পালা-কীর্তনের উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল আধুনিক যুগের কবি, গীতিকার ও সুরকার। তাঁরা সঙ্গীত রচনায় মধ্যযুগের রীতি অনুসরণ করেননি। ঐ পঞ্চপ্রধান, আধুনিক বাংলা গানের স্রষ্টা। তাদের মধ্যে যাঁরা কবি ছিলেন তাঁরা একই আঙ্গিকে কবিতা ও গান লেখেননি, কবিতা ও গানের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁদের কোন কোন কবিতা কখনো কখনো গান আবার তাদের অনেক গান কবিতা, কিন্তু তাদের সব কবিতা গান নয় বা সব গান কবিতা নয়। তাদের গানের বিচারে ঐ কথা মনে রাখা উচিত, তাঁদের গানের কাছ থেকে সর্বদা কাব্যরস আশা করা সঙ্গত নয় বরং গীতরস আশা করা উচিত।

[তিন]

আলোচ্য অংশে আমরা আব্দুল কাদির রচিত 'নজরুলের ছোটগল্প', 'নজরুলের নাটক', 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', 'নজরুল সাহিত্যের একদিক', 'বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম' এবং 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধাবলী নিয়ে আলোচনা করব।

আবদুল কাদিরের 'নজরুলের ছোট গল্প' প্রবন্ধটি প্রথম 'মাহে নও' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২) প্রকাশিত এবং "নজরুল-রচনা-সম্ভার" ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত উভয় সংস্করণে সংকলিত হয়। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি নিয়ে

আলোচনা শুরু, ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত এই রচনাটি ছাপার হরফে প্রকাশিত নজরুলের প্রথম রচনা। আবদুল কাদির গল্পটি সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে মন্তব্য করেছেন, "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীতে যে আবেগ-প্রাচুর্য ও বর্ণনা-মাধুর্য রয়েছে, তাঁর তৎকালীন রচনায় তার ক্রমবিকাশই দেখা যায়। এইটি বাঙালী পল্টনের এক বওয়াটে যুবকের আত্মকাহিনী হিসেব রচিত।" আবদুল কাদির গল্পটিকে আখ্যায়িকা হিসেবে নিশ্চয়ই খুব উত্তীর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন যদিও তিনি বলেছেন যে সেই প্রথম রচনাতেই নজরুলের প্রতিশ্রুতি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীর" মূল্য ঐতিহাসিক এবং তা কেবল প্রথম প্রকাশিত রচনার কারণেই নয়, নজরুল রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, আর এটি রচিত হয়েছিল "বাঙালী পল্টনের এক বওয়াটে যুবকের আত্মকাহিনী" হিসেবে। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীর' নায়ক বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল, এক তরুণ তার সদ্য-বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারেনি, আবার বিয়ে করার পর তার মা মারা যায় তখন সে পল্টনে যায়। 'রিক্তের বেদন' গল্পটিকে আবদুল কাদির অনুরূপ আর এক খাম-খেয়ালীর রোজনামচা বলেছেন। এ গল্পও কৈশোর প্রেমকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের রোমাঞ্চের কাছে এক তরুণের আত্মসমর্পণের কাহিনী। আবদুল কাদির এ গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন, "এ গল্পটিও নজরুলের যুদ্ধ-গমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে উন্মাদনা নজরুলের দেশপ্রেমমূলক রচনাগুলোতে দেখা যায়, এ গল্পটিতে আছে তারই আনন্দময় প্রাথমিক সূচনা।" নজরুলের 'সালেক' গল্পটিকে আবদুল কাদির রূপক এবং হাফিজের একটি বিখ্যাত বাণীর রূপায়ণ আর 'রাক্ষুসী' গল্পটিকে টাইপ চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বলেছেন। 'স্বামীহারা' গল্পটিতে নজরুল বাঙালী মুসলমান সমাজে আশ্‌রাফ-আত্‌রাফ ব্যবধানের চিত্র দিয়েছেন, আবদুল কাদির গল্পটিতে মানবিকতা ও প্রেমের একাগ্রতার মর্মস্পর্শী রূপ লক্ষ্য করেছেন। 'মেহের নেগার' গল্পের পটভূমিকা ওয়াজিরিস্তান, আবদুল কাদিরের মন্তব্য এই গল্পটি সম্পর্কে ঃ "প্রেম মানুষকে করে পবিত্র, করে অমৃতের অধিকারী, এই প্রত্যয় নজরুলকে দিয়েছে প্রথম থেকেই বিকাশের প্রেরণা, আর প্রেমের মূল্য ও মর্যাদা 'ব্যথার দান' গল্পটিতে নজরুল আরও গভীর ভাবে স্বীকার করেছেন। যে গল্পের কবিত্বময় ভাষা ও বর্ণনামাধুরী পাঠকের মনে সৃষ্টি করে মাদকতা। 'হেনা' গল্পের ঘটনাস্থল বেলুচিস্তান ও আফগানিস্থান, আবদুল কাদিরের ভাষায়, এ গল্পটিতে যুদ্ধের পটভূমিতে অন্তরের অনুভূতিগুলো অনুরণিত হয়েছে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়।

আবদুল কাদির নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে রচিত গল্পগুলির মূল্যায়ন করেছেন এভাবে,

> নজরুলের প্রথম জীবনের 'রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোতে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থান বড় কথা নয়, আবেগের প্রগাঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্বর্যে এগুলো মনে আনে স্বপ্নাবেশ। তরুণ প্রেমের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন

এগুলোকে করেছে রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর 'বাদল বরিষণে', 'সাঁঝের তারা', 'দুরন্ত পথিক' প্রভৃতি যেন ভাষা ও ঝর্ণার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে তিনি সুরশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান হবেন, তার আভাষ এদু'টি গল্পগ্রন্থের অনেক ছত্র থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল।

তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'শিউলি-মালা'র গল্পগুলো আঙ্গিক এবং বর্ণনা ভঙ্গীর বিচারে অপেক্ষাকৃত অনবদ্য।

'পদ্ম-গোখরো' গল্পটি পল্লীগ্রামের একটি সুপ্রচলিত উপকথা অবলম্বনে রচিত, আবদুল কাদিরের মতে গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ ছাড়িয়ে উঠেছে মানবিকতার মাধুরী। আর 'জিনের বাদশা' আরম্ভ থেকে ব্যঙ্গরসে ঝলমল কিন্তু উপসংহারে এই ব্যঙ্গরস অকস্মাৎ এমন করুণ রসে রূপান্তরিত হয়েছে যে ভেবে বিস্ময় লাগে। 'অগ্নিগিরি' গল্পটির আরম্ভ হাসির দীপ্তিতে আর সমাপ্তি অশ্রুর কুয়াশায়, এটিকে আবদুল কাদিরের মনে হয়েছে নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। আবদুল কাদিরের নজরুলের ছোটগল্প-পর্যালোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং গল্পের সারাংশ বর্ণনামূলক।

আবদুল কাদির 'নজরুলের নাটক' প্রবন্ধের শুরুতে গ্রাম্যযাত্রাদলের কবিয়াল-রূপে নজরুলের আবির্ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নজরুলের কৈশোরের রচনা "চাষার সঙ্", "ঠগপুরের সঙ্" "মেঘনাদবধ", "শকুনি বধ", "দাতাকর্ণ", "রাজপুত্র", "কবি কালিদাস", "আকবর বাদশা" প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনে তাঁর কবি-চরিত্রের আদিম রূপ লক্ষ্য করেছেন। আসরের কোলাহলের মধ্যেও কবিতা ও গান রচনা করার দুর্লভ ক্ষমতা তিনি সেই কৈশোরের সাধনা থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। এই প্রবন্ধে আবদুল কাদির নজরুলের বিভিন্ন কৈশোর রচনা থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। নজরুলের বাল্য-রচনাতেই এ দেশের পৌরাণিক কাহিনী, পালা-গান, কবি-গান, কীর্তন; পাঁচালী প্রভৃতি বিষয়ের রচনা-রীতির সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা তিনি বলেছেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের প্রথম নাটিকা "ঝিলিমিলি" (নওরোজ, শ্রাবণ ১৩৩৪) আবদুল কাদিরকে রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে "ডাকঘরে" রয়েছে বিশ্বের আনন্দের মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত করার প্রয়াস, অপরূপের জন্য অন্তরের আকুলতা। কিন্তু নজরুল যৌবনের কবি, পৃথিবী ও প্রকৃতির স্তন্যে লালিত মানব-দুলালীর জন্যে তাঁর কামনা তৃপ্তিহীন। তাই আবদুল কাদিরের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের 'অমল' ও 'সুধা, নজরুলের হাতে হয়েছে 'হাবিব' ও 'ফিরোজা'; মাধব দত্ত হয়েছে 'মীর্জা সাহেব'। নজরুলের "সেতুবন্ধ" ও রূপক-নাট্য। আব্দুল কাদির এটিকে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার কথা বলেছেন। "সেতুবন্ধ" নাটকে যে সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে, সে হচ্ছে প্রকৃতির

জড়শক্তির সঙ্গে মানুষের তৈরী যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জড়শক্তির সংঘাত। নজরুল ধারণা করেছেন যে, প্রকৃতির শক্তিকে যন্ত্রশক্তির দ্বারা পরাভূত করতে গিয়ে মানুষের আবিষ্কারে বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটবে বার বার। আবদুল কাদির এ মত মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা"য় রূপায়িত হয়েছে দুই বিরুদ্ধ শক্তির পরস্পর সংঘাত, অভিজাত শোষকশক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত শোষিত শক্তির সংঘাত।

আবদুল কাদির নজরুলের "শিল্পী" নাটিকাটিকে রূপক বলেছেন আর "ভূতের ভয়" নাটিকা সম্পর্কে তার মন্তব্য, "ধ্বংসের পূজারী-দল নব-সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে প্রেম প্রীতি নিয়ে যখন আবির্ভূত হবে, তখনই আসবে মুক্তি, বিপ্লবের সাধনা হবে সার্থক— এ পরম তত্ত্বটির পরিবেশনা নাটিকাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। নজরুলের দেশ-প্রেমমূলক কবিতাগুলিরও অন্তর্নিহিত কথা এই—বিপ্লবের জন্য বিপ্লব নয়, নবসৃষ্টির জন্য মহৎ মানব-কল্যাণের জন্য চাই আমূল পরিবর্তন।" আবদুল কাদির নজরুলের উপরোক্ত চারটি রূপক নাটিকার পরিসর স্বল্পপরিমিত হওয়ায় ওগুলোকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী নয় বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁর মতে ঐ সব নাটিকা বেতারে ও মজলিশে অভিনীত হবার উপযোগী। আবদুল কাদির আলোচ্য প্রবন্ধে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, মনমোহন রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসেই নজরুলের নাট্যপ্রতিভার বহুধা বিকাশ ঘটে। নজরুলের "আলেয়া" সম্ভবতঃ মনমোহন থিয়েটারে অভিনীত হবার জন্যেই রচিত হয়েছিল কিন্তু তা প্রথম অভিনীত হয় নাট্যনিকেতনে। প্রতীকী-গীতিনাট্য "আলেয়া" সম্পর্কে আবদুল কাদির লিখেছেন, নর-নারীর হৃদয়ের রহস্য অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় এই নৃত্যনাট্যে রূপায়িত হয়েছে। নাটকটির প্রস্তাবনায় যে-সব গান রয়েছে তার ইঙ্গিত থেকে আবদুল কাদিরের ধারণা,

> মিলনের সার্থকতা নয়, স্বপ্ন-কুহেলিকা সৃষ্টিই নাটকখানির উদ্দেশ্য। এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে, জয়ন্তীরা যখন সর্বাংশে প্রবৃত্তিরূপিনী হয়ে মত্তদর্পে একাধিপত্য দাবী করে, তখন সেই কুৎসিৎ উগ্রাদিত্যটা রুচি-সুন্দর পুরুষের তীব্র আঘাতে অন্তর্ধান করে। উগ্রাদিত্যটাকে সম্পূর্ণ বশীভূত রাখতে পারে যে জয়ন্তীরা, তারাই হয় মীনকেতুদের হৃদয়-রাণী, —তারা যেমন নর্মবধূ, তেমনই মর্মবধূ; যেমন কামনার সহচরী, তেমনই আত্মার আত্মীয়। মুহূর্তের জন্য প্রবৃত্তির ঐশ্বর্য হতে কোনো নারী যদি রিক্তা, সেই শক্তির পুনরাবির্ভাবে নারী হয় আবার পুরুষের জীবন-লক্ষ্মী। পুরুষের পৌরুষ এবং নারীর প্রবৃত্তি, এ দুয়ের ভূমিকা নাটিকাটিতে অপূর্ব রসমূর্তি লাভ করেছে।

নজরুলের "মধুমালা" গীতিনাট্যটি কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। আবদুল কাদির লিখেছেন, "কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এর আগে অনেক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছে; কিন্তু এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিনাট্য দ্বিতীয় হয়নি। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মদনকুমার-মধুমালার পালা কাহিনী সুপরিচিত, কিন্তু নজরুল ইসলাম কাহিনীটাকে গীতাভিনয়ের প্রয়োজনে কিছুটা নূতন ছাঁচে ঢেলেছেন।" আবদুল কাদির "মধুমালা" সম্পর্কে মন্তব্য

করেছেন,

> এই গীতিনাট্যের ভাষা মধুবর্ষী, গাঁথুনিতে সুঠাম শব্দগুলি হীরক খণ্ডের মতো ঝকঝক করছে। দক্ষ শিল্পীর মতো নজরুল চরিত্রগুলো অঙ্কন করেছেন; তাতে ভাস্কর্যের দীপ্তি আছে, তারও চাইতে বেশী আছে প্রাণের স্পর্শ। তাঁর এ শিল্পসৃষ্টি মহান ও কালজয়ী।

'নজরুল সাহিত্যের একদিক' প্রবন্ধে আবদুল কাদির করাচীর সেনানিবাসে নজরুল-প্রতিভার বিকাশ ঘটার পরিচয় দান এবং পাকিস্তান যে সব অঞ্চল নিয়ে গঠিত নজরুলের রচনায় তার প্রভাব বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> বলা বাহুল্য যে, নজরুলের কবিত্বশক্তি যদি গ্রামের কবিওয়ালা বা লেটোওয়ালাদের বিচরণ-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হলে এই ক্ষ্যাপা কবির আসন বড়জোর লাভ হতো দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা, রূপচাঁদপক্ষী, ফিরিঙ্গি এন্টনি, গোবিন্দ অধিকারী, পাগলা কানাই প্রভৃতির পংক্তিতে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে নৌশেরা, কোয়েটা ও করাচী অবস্থানের ফলে নজরুলের কল্পনার সম্মুখে উদঘাটিত হয় বিশ্বের বিরাট দিগন্ত; ফলে যাত্রা-দলের গ্রাম্য গায়েনের বাউণ্ডুলে বেশ পরিহার করে তিনি রাতারাতি লাভ করলেন ভব্য কবির মর্যাদাবান আসন। তাঁর সেদিনের রচনায় পশ্চিম-পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস পাহাড়-প্রান্তর নদী-ঝর্ণা বীথিকা-বনানী বিচিত্র সুরে ও সৌন্দর্যে বাঙময় হয়ে উঠলো।

সেনাবাহিনীতে যোগদানের ফলে যে নজরুল সর্বভারতীয় তথা মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তা যে তার সাহিত্যিক জীবনের জন্য ফলপ্রসূ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা না হলে নজরুল উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের ধারায় কবিতা লিখতেন এ কথা কি বলা যায়? নজরুল একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর মানুষ এবং মৌলিক কবি-প্রতিভার অধিকারী, আর কে না জানে যে প্রতিভার আগুন কখনো ছাইচাপা থাকে না। আবদুল কাদির অবশ্য যথার্থই লিখেছেন যে নজরুলের সৈনিক জীবনের রচনাবলীতে তার নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে এবং নজরুল একটা রোমান্টিক খেয়ালের বশে যুদ্ধে যোগ দেননি; বাঙালীর ভীরুতা অপবাদ অপনোদন এবং বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষা লাভের সেই প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার, এই দুই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি যুদ্ধের জীবন-মরণ খেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আবদুল কাদিরের এ মন্তব্যও ঠিক যে, নজরুলের যুদ্ধ গমনের কল্যাণে ঝিলম, পেশোয়ার, কোয়েটা, করাচী, বালুচিস্তানের প্রকৃতি ও মানুষ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচিত। আবদুল কাদির নজরুলের সৈনিক জীবনের আরও একটি সুফলের কথা আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, নজরুলের কিশোর বয়সের রচনায় গ্রাম্য কবিয়াল ও পুঁথিয়ালদের ঢঙে আরবী-ফার্সী-উর্দু-হিন্দী-ইংরেজী শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়; সে মিশ্র ভাষায় গ্রাম্যতা-দোষ প্রচুর। কিন্তু হাফিজ-

রুমীর কাব্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার পর থেকে তিনি তাঁর মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের বহু কবিতায় যেভাবে আরবী ফার্সী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সুমার্জিত ও মধুকরী।

আবদুল কাদির আলোচ্য প্রবন্ধে একটি তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, ইকবালকে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত করাবার কল্পনাও নজরুলই প্রথম করেছিলেন। ১৯৩২ সালে নাকি নজরুল ইকবালের "শেকোয়া" ও "আসরার-ই-খুদী", হাফিজের "রুবাইয়াৎ" ও ওমর খৈয়ামের সমগ্র "রুবাই" মূল থেকে অনুবাদের সংকল্প করেছিলেন। নজরুল হাফিজের রুবাইয়াৎ এবং ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু ইকবালের কোন কবিতা তিনি অনুবাদ করেননি। ইকবালের কবিতা নজরুল কেন শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করলেন না সে সম্পর্কে আবদুল কাদির কোন আলোকপাত করেননি, তিনি শুধু লিখেছেন, বাঙালী মুসলমানের ঐহিক ও আত্মিক জীবনের দুর্গতি নজরুলের মনে সঞ্চার করেছিল তীব্র বেদনা-বোধ; তাই ইকবালের মতো তিনিও চেয়েছিলেন সকল সামাজিক কুসংস্কার ও আধ্যাত্মিক অচলায়তনের বেড়াজাল থেকে আশু অব্যাহতি।[১]

'বাঙালা সাহিত্যে নজরুল' আবদুল কাদিরের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন,

> কাজী নজরুল ইসলামের কল্যাণেই একালের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যসাধনার দিকে বৃহত্তর দেশের দৃষ্টি পড়েছে;... বিংশ শতাব্দীর আমরা যে সামাজিক বিপ্লব চাইছি, তার পূর্বাভাস ছিল নজরুলের রচনায়। তাই তরুণ বাঙালী সেদিন নজরুলকে এমন অভিনন্দন জানাল।

আবদুল কাদির তাঁর 'জয়তী' পত্রিকায় নজরুলের চিন্তায় যে অণুরণন ঘটেছিল তার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> আমার 'জয়তী' পত্রিকার আসরে নজরুল ইসলাম একেলা আসেননি; কয়েকজন চিন্তাশীল অধ্যাপক তাতে সূচনা করেছিলেন মুক্তবুদ্ধিবাদের আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে হয়েছিল নজরুলের প্রতিপত্তি। সমাজ-বিপ্লবের যে বিপুলতর পরিকল্পনার আভাস ছিল তাঁর সাহিত্যে, তার স্পষ্টতর প্রকাশ সম্ভব করতে তিনি যখন আর অগ্রসর হলেন না, তখন মুসলিম বাঙলার চিন্তাধারায় দেখা দিলেন উক্ত অধ্যাপক দল।... এঁরা বিশেষভাবে মেতেছিলেন ধর্মীয় বাদ-বিতণ্ডায়, তাঁদের শ্রোতার অভাব সেদিন বেশী হয় নাই। কিন্তু নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পর বাঙলার মুসলমান এক অদ্ভুৎ ধরনের রাষ্ট্রনীতিকতার দিকে মন ফিরিয়েছে; এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উক্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী লেখনী কিছুটা গুটিয়েছেন।

আবদুল কাদিরের উপরোক্ত মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রক্ষণশীল, গোঁড়া বাঙালী মুসলমান সমাজকে নজরুল সমালোচনার মাধ্যমে প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত করতে

চেয়েছিলেন আর সে জন্যে ধর্মব্যবসায়ীরা তাকে 'কাফের' ফতোয়া দিয়েছিল। নজরুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা থেকে শুরু হয়েছিল তরুণ মুসলমান শিক্ষাবিদদের মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, তারাও ধর্মান্ধদের আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন। বাঙালী মুসলমান সমাজে আর সমাজ সমালোচনার প্রয়াস দেখা যায়নি। আবদুল কাদির যে বলেছেন নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পর নির্বাচন, বাঙালী মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক অগ্রগতি অথচ সমাজ প্রগতির অনুপস্থিতি বাস্তবিকই তাৎপর্যপূর্ণ অবলোকন। বাঙালী মুসলমানের সমাজ সচেতনতা আর রাজনৈতিক সচেতনতা সমান্তরাল নয়। পাকিস্তান আন্দোলনে, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা, সংস্কারে বা আধুনিক সমাজ গঠনে তা পরিলক্ষিত হয় না। বাঙালী মুসলমান সমাজে বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল, সৈয়দ আবুল হোসেন বা কাজী আব্দুল ওদুদের উত্তরসুরী নেই বললেই চলে। এ সমাজের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত সামাজিক সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যান ধর্মব্যবসায়ীদের ভয়ে। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও সমাজ প্রগতি দূরাগত স্বপ্ন মাত্র। বস্তুতঃ রাষ্ট্র-বিপ্লবের চেয়ে সমাজ-বিপ্লব দুরূহ; মুসলমানপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক ছাড়া আর কোথাও রাষ্ট্রবিপ্লবের পর পর সমাজ বিপ্লব ঘটেনি কারণ আর কোন দেশে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মতো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ঘটেনি। স্মরণীয় যে মোস্তফা কামাল ছিলেন নজরুলের সবচেয়ে প্রিয় রাষ্ট্রনেতা।

'বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে আবদুল কাদির বাংলা সাহিত্যের সমসাময়িক কবি ও কবিতার সঙ্গে নজরুল ও তার কবিতার তুলনা করেছেন। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"র প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> বলাকার এই সুর তরুণ নজরুলের মানস-লোকে দুর্গম পথের স্বপ্নাঞ্জন বিস্তার করেছে; কিন্তু অবন্ধন প্রিয় ও গতিবাদী জীবনের এই মোহন রণবেশ নজরুলের অঙ্গে হয়েছে রক্তখচিত, —পথে চলার মধুর আহ্বান-মন্ত্র তাঁর কণ্ঠে হয়েছে বীরের বজ্র-হুঙ্কার।... সেদিনের বাংলা কবিতা ও গানে নজরুল সঞ্চার করলেন প্রবল প্রাণাবেগ; তাঁর যাদুকরী লেখনী গুণে মধুস্রাবী ভাষার ঝঙ্কার ব্যক্ত হলো বজ্রের ব্যঞ্জনায়। সেদিন বাংলা ভাষায় এই ওজস ও পৌরুষ সঞ্চার নজরুলের অমর দান।

নজরুলের 'শাতিল আরব' কবিতার ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' গানটির ছন্দের অনুরণনের কথা স্বীকার করে নিয়ে আবদুল কাদির লিখেছেন,

> কিন্তু নজরুল স্তবকগুলোর গঠনে যে বৈচিত্র্য সাধন করলেন, তার ফলে সৃষ্টি হলো অভিনব ছন্দস্পন্দন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ছন্দে বলিষ্ঠতা আনয়নের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন; ... বাংলা কাব্যে বীর্য-সঞ্চারের জন্য নজরুল সেরূপ

> কোনো সচেতন প্রয়াস করেননি, তাঁর সহজাত কবি-শক্তি আপন বিকাশের পথেই বিবিধ ছন্দঃভঙ্গীর সৃষ্টি করেছে, — তাঁর কবিতার স্তবক ও পদের বিচিত্র বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসাধারণ ছন্দঃদক্ষতা। ... তিনি বাংলা ছন্দে প্রাণাবেগ প্রতিষ্ঠার জন্য মধুসূদন বা দ্বিজেন্দ্রলালের পথ নিলেন না, প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ক'রে অপূর্ব ঝংকার আনয়ন করলেন।

মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় কেন আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার কারণ নির্দেশ করে আবদুল কাদির লেখেন,

> মোহিতলাল তাঁর সুবিখ্যাত ... 'নাদির শাহের জাগরণ' রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, আধুনিক বাংলা কাব্যে ভাবালুতার প্রাবল্য বা আঙ্গিকের প্রাধান্য দূরীভূত ক'রে তাকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হলে আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার এক প্রশস্ত উপায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনেক কবিতায় সাধ্যানুসারে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন; কিন্তু ছন্দের কারুকার্যে খচিত ক'রে ভাবের রূপসজ্জা রচনা ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নজরুল তাঁর ভাবের শিল্পসিদ্ধ ও সৌন্দর্যময় প্রকাশ অপেক্ষা বেশী কাম্য মনে করেছেন তার স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণময় প্রকাশ; তাই তাঁর কাব্যসৃষ্টি হয়েছে প্রাণের দীপ্তিতে ইস্পাতের মতন তীক্ষ্ণ, যৌবনের উল্লাসে ভরা জোয়ারের মতো তরঙ্গায়িত। 'পলাতকা'র (রবীন্দ্রনাথের) মুক্তক স্বরবৃত্তে তাঁর 'কামাল পাশা' বিরচিত; কিন্তু আরবী-ফারসী পদে, যথাযথ প্রয়োগে তাঁর এসব সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী। তাঁর অসামান্য অবদানে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়েছে।

[চার]

আবদুল কাদির "বাংলা ভাষা ও নজরুল ইসলাম" প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মোহিতলাল ও সত্যেন দত্তের কবিতা ও ছন্দের সঙ্গে নজরুলের কবিতা ও ছন্দের যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন তা থেকে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নজরুল তাঁর পূর্বসূরী বা সমকালীন কাব্য বা ছন্দরীতিকে অস্বীকার না করেও তা অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বচ্ছন্দ প্রতিভার বলে।

"রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক" প্রবন্ধে আবদুল কাদির দুই কবির কিছু রচনার তুলনা করেছেন, যেমন,

> হার-মানা-হার পরাব তোমার গলে।
> দূরে র'বি কত আপন বলের ছলে।
>
> রবীন্দ্রনাথ–(গীতিমাল্য-১৪)
>
> এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে।...
> আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।
>
> নজরুল–(ছায়ানট, বিজয়িনী)

আবদুল কাদির লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রিয়া বিজিতা এবং নজরুলের প্রিয়া

বিজয়িনী। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অপর দুটি রচনার তুলনা,

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হ'ল রে
আমার পথ হ'ল সুন্দর ॥

রবীন্দ্রনাথ–(গীতিমাল্য-২১)

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার, কিসের তরে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
কাল-ভয়ংকরের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।

নজরুল–(প্রলয়োল্লাস)

এই সাদৃশ্য আবদুল কাদিরের ভাষায়, "রবীন্দ্রনাথের কোমল কান্ত ললিত কথার সুর নজরুল বেঁধে দিলেন বহ্নিরাগে।" দুই কবির তুলনা আবদুল কাদিরের ভাষায়, "রবীন্দ্রনাথ নভোলোকবিহারী অমৃতকণ্ঠ অক্লান্তপক্ষ স্বর্ণবিহঙ্গ, আর নজরুল মর্তের দুঃখ-বাণ-বিদ্ধ বিদীর্ণ-কণ্ঠ আহত-পক্ষ ধূলিম্লান পাখী। উর্ধ্ব-আকাশের দিকে সুরের অঞ্জলি তুলে রবীন্দ্রনাথ নিবেদন করেন—অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে? আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের ঘোরে।... এই বিশ্ববাদকের অগ্নিবীণা বাজছে দিব্যধামে, তাতে মর্ত্যের মানুষের মনে জাগছে নূতন নূতন ভাবের স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু নজরুল যে অগ্নিবীণা বাজালেন, তার দীপক রাগে পরাধীন দেশের অধঃপতিত সমাজে জাগলো নবসৃষ্টির উল্লাস—নূতন রাষ্ট্রনীতিক চেতনা ও আর্থনীতিক অধিকার বোধ।" আবদুল কাদির আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুলের "ধুমকেতু" ও "লাঙ্গল" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "নজরুল–প্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ যে তখনই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা তাঁর এই আশীর্বাণী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।" আলোচ্য প্রবন্ধে আবদুল কাদির রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' এবং নজরুলের 'আজি হতে শতবর্ষ আগে' কবিতা দুটির উল্লেখ করে "বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা" বিতর্ক এবং তাতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটির উপসংহারে নজরুলের বিভিন্ন-রচনার উদ্ধৃতির সাহায্যে আবদুল কাদির রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। "রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগন্ত-প্লাবী কিরণে নজরুল-চিত্ত কতখানি উদ্ভাসিত হয়েছিল" তার পরিচয় দান শেষে আবদুল কাদির লিখেছেন, "আমরা দেখেছি, নজরুল তাঁর শেষের দিকের কবিতা ও কথিকায় করেছেন আধ্যাত্ম-রসের সাধনা, সুরে সুরে সঙ্গীত রসের সাধনা। সেই নিপূণ রসের সাধনায় ও অনুভবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রভাব যে কতখানি" তার পরিচয় দেবার জন্যে তিনি নজরুলের অমিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন।

যখনি কবিতা তব পড়িয়াছি আমি
তার আস্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়;
রস-পান ক'রে আমি হয়ে গেছি রস,
বলিতে পারিনা তাই সে রস কেমন।

নজরুলের কবিতা সম্পর্কে আবদুল কাদিরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা, 'বাংলা ছন্দ ও নজরুল ইসলাম,' এ প্রবন্ধ থেকে বাংলা ছন্দে নজরুলের অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দে নজরুল যে বৈচিত্র্য আনয়ন করলেন সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "স্বরবৃত্তই বাঙলার ঘরোয়া ছন্দ, তাতে চার সিলেবল মূল পর্ব গঠিত হওয়ার রেওয়াজ। কিন্তু নজরুল সৃষ্টি করলেন বৈচিত্র্য,

৪	৩	৪	৩
হাত হতে মোর	হৃদয় যায়,	দোহাই বাঁচাও	হৃদয়বান্,

এখানে প্রতি চরণের প্রথম ও তৃতীয় পর্ব চতুঃস্বর (tetrasyllabic) বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্ব ত্রিস্বর (trisyllabic), বাংলা ছন্দে নিশ্চয়ই এ ছিল এক নূতন নির্দেশ।" নজরুল যে এ ছন্দে সিলেবলগুলিকে নানা নিয়মে বিন্যস্ত করে বৈচিত্র সৃষ্টি করেন তার উদাহরণ স্বরূপ আবদুল কাদির নজরুলের 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বলো কে?' গজলটির উল্লেখ করছেন, যার প্রতি চরণের প্রথম ও তৃতীয় পর্ব তিন সিলেবল্ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বে পাঁচ সিলেবল্। নজরুলের–'কামাল পাশা' 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার ছন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "প্রাকৃত বাঙলার ছন্দে বীররসের কবিতা শক্তিমানের হাতে সংরচিত হলে রসের ন্যূনতা ঘটে না।"

বাংলা ছন্দের প্রধান তিন ধারা স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করেন প্রস্বন বা প্রস্বনের ভিত্তিতে প্রাস্বরিক বা প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ। আবদুল কাদিরের মতে "নজরুল তরুণ বয়সেই "দীওয়ান-ই হাফিজ" বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে এই দুরূহ ছন্দের ধ্বনি-রহস্য উপলব্ধি করেন।" নজরুল ইসলাম ঐ প্রাস্বরিক রীতিতেই তাঁর আরবী ছন্দের কবিতা রচনা করেন। নজরুলের সংস্কৃত ছন্দের ছাঁচে কবিতা রচনার প্রয়াস 'ছায়ানট" কাব্যের "পূবের হাওয়া ঃ পূর্ব তরঙ্গ' কবিতাটির কিয়দংশ যা শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে নির্মিত। আবদুল কাদিরের মতে,

> নজরুল সংস্কৃতের নিয়মে লঘু-গুরু-অক্ষরের তথা বাংলা প্রস্বরমাত্রিকের নিয়মে মুক্ত-বদ্ধ-স্বরের সুনির্দিষ্ট পর্যায় বিন্যাস রক্ষা করেন নাই। তিনি সংস্কৃত একটি গুরু-অক্ষরের স্থলে বাংলায় দুইটি মুক্তস্বর এবং সংস্কৃত দুইটি লঘু-অক্ষরের স্থলে বাংলায় একটি বদ্ধ স্বর ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেন নাই ; ফলে তাঁর কবিতাটিতে প্রস্বরবৃত্তের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়নি, তাতে বেজেছে মাত্রাবৃত্তের গীতধ্বনি।... মনে হয় নজরুলের সূক্ষ্মশ্রুতি সংস্কৃত 'বৃত্ত' ছন্দের ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যে সম্যক আকৃষ্ট

হয়নি; বাঙলায় নব নব ছন্দের উদ্ভাবনে তাঁর মন সমধিক সাড়া দিয়েছে সুরের প্ররোচনায়। তিনি গীতধ্বনির বিস্তার বিলম্বিত করতে গিয়েই তাঁর প্রাস্বরিক ভঙ্গীর কবিতাতেও মাঝে মাঝে মাত্রিক ভঙ্গীর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর আরবী ছন্দের গীতিগুলিতে ও ছন্দিতা গুচ্ছের কয়েকটি গানে প্রস্বরের পর্যায় বিন্যাস যথারীতি সুব্যবস্থিত রেখেছেন।

সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী', আবদুল কাদির বলেছেন, "বাংলা ভাষায় নজরুল এ ছন্দের প্রবর্তক", তাঁর মতে, 'বিদ্রোহীর' উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও উদ্দাম আবেগ বহনের জন্য এ ছন্দই উপযোগী। এ ছন্দের গুণেই নজরুলের কথা হয়েছে প্রাণময় ও অন্তরস্পর্শী। ছন্দ নিরূপিত হয় ধ্বনিগত গাণিতিক নিয়মে। ছন্দ গঠনের মূলে থাকে কবির সচেতন মনের ক্রিয়া। কিন্তু সে ক্রিয়া অগোচর। তা সুগোচর হলে কবিতা হয় ছন্দ সর্বস্ব, কাঠামো হয় অতি প্রকট, কবিতার প্রাণ পড়ে চাপা। নজরুল ছন্দচর্চা করেছেন কবিতায় প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনে।

নজরুলের জীবন, সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে আবদুল কাদিরের বারটি প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ সব প্রবন্ধে আবদুল কাদির নজরুলের জীবন ও সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পেরেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি নজরুলের রচনা সংকলন ও সম্পাদনাতেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন, কবি সম্পর্কে তার নিজস্ব প্রবন্ধগুলি সম্প্রসারিত করে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করে যেতে পারেন নি। তবুও এ কথা স্বীকার্য যে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যালোচনার পথ-নির্দেশক কবি সমালোচক আবদুল কাদির।

আবদুল কাদিরের নজরুল-চর্চার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নজরুল-রচনাবলীর সম্পাদনা। অসুস্থতার ফলে সম্বিতহারা হয়ে যাবার পরে নজরুলের কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেমন "নতুন চাঁদ" (১৩৫১/১৯৪৫),"মরুভাস্কর" (১৩৫৭/১৯৫১), "বুলবুল, ২য়" (১৩৫৯/১৯৫৩), "সঞ্চয়ন" (১৩৬২/১৯৫৫), "শেষ সওগাত" (১৩৬৫/১৯৫৯), "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (১৩৬৫/১৯৫৯), "মধুমালা" (১৩৬৫/১৯৬০), "ঝড়" (১৩৬৭/১৯৬১), "ধূমকেতু" (১৩৬৭/১৯৬১), "পিলে পটকা", "পুতুলের বিয়ে" (১৩৭০/১৯৬৪), "রাঙাজবা" (১৩৭৩/১৯৬৬), এ ছাড়াও বেশ কিছু স্বরলিপি সংকলন প্রকাশিত হয়। ঐ সব গ্রন্থের মধ্যে "মরুভাস্কর" এবং "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" ছাড়া অপর কোন গ্রন্থ সম্পর্কে নজরুলের কোন পরিকল্পনা ছিল কিনা সন্দেহ। নজরুলের অপ্রকাশিত বা পুস্তকে অসংকলিত রচনাবলী নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নজরুলের পরিবার বা বন্ধুবান্ধব কিংবা ব্যবসায়ী প্রকাশকদের উদ্যোগে ঐ সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐসব গ্রন্থের সব কটি খুব সতর্কতার সাথে প্রকাশিত না হলেও যে তাতে নজরুলের অনেক রচনা অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পায় সে কথা স্বীকার করতেই হবে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবেনা যে অপরিকল্পিতভাবেই ঐ সব গ্রন্থের প্রকাশ।

ঐ সব গ্রন্থাবলীর প্রকাশনা সত্ত্বেও নজরুলের অনেক রচনা অসংকলিত থেকে যায়, এ প্রসঙ্গে আবদুল কাদির "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে লিখেছেন,

> ১৩৬৫ সালের ২০শে বৈশাখ নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে 'শেষ সওগাত' বের হয়। এই সংকলনের 'কবিতা ও গান' অধ্যায়ের লেখাগুলিও অধিকাংশই কবির 'পরিণত' বয়সের রচনা। কবির রচিত এরূপ আরও অনেক কবিতা ও গান নানা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এখনও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কলকাতা বেতার-কার্যালয়ে এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কবির কিছু অপ্রকাশিত রচনা হয়ত পাওয়া যেতে পারে।...কবির ভক্ত ও অনুরাগীরা যত্নপর হলে তাঁর এ ধরনের বহু বিক্ষিপ্ত রচনা একত্রে গ্রন্থাকারে সংগ্রথিত হতে পারে। আমরা আশা করছি, এ সংকলনের পরবর্তী সংস্করণে কবির কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা সংযোজিত করতে পারব।

আবদুল কাদির "ইতিপূর্বে কবির কোনো বাজারে প্রকাশিত পুস্তকে স্থান পায়নি" এমন সব কবিতা ও গান, প্রবন্ধ ও আলোচনা, অভিভাষণ, চিঠিপত্র এবং কবি-পরিচিতি নিয়ে "নজরুল রচনা-সম্ভার" প্রকাশ করেন, ঢাকা থেকে ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, ২৫শে মে ১৯৬১। এই সংকলনে নজরুলের ৩৬টি কবিতা ও গান, ১টি নাটিকা, ৪টি প্রবন্ধ ও আলোচনা, ১২টি অভিভাষণ, কবি পরিচিতি পর্যায়ে আবদুল কাদিরের ৮টি প্রবন্ধ এবং কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবি-বরণ কবিতাটি স্থান পায়। এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবিতা ও গানসমূহের অনেকগুলিই পূর্বাহ্নে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন 'জয় হোক। জয় হোক!' 'চির-নির্ভয়', 'শ্রমিক মজুর' কবিতাগুলি দৈনিক নবযুগ পত্রিকায়; 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে:' কবিতাটি মাসিক মোহাম্মদীতে; 'নবীনচন্দ্র', কবিতা, 'তুমি কোন পথে এলে হে মায়বী কবি' কীর্তন গান,....'জয়তী পত্রিকায়'; 'রবি-হারা' 'কবিতা-সমাধি' কবিতা-সওগাতে 'জয়দেবপুরের পথে' কবিতা-'অভিযান' পত্রিকায়; 'দীওয়ান-ই-হাফেজ'/গজল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'তে; 'আশায়' হাফিজের অনুবাদ 'প্রবাসী'; 'বাঁশীর ব্যথা' রুমীর অনুবাদ 'বঙ্গনুর'; 'প্রেমের ছলনা' সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'এ; 'আজান' কবিতা 'সাধনা', 'মৃত তারা' সাপ্তাহিক 'ছন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত। এ সংকলনে অবশ্য কিছু অপ্রকাশিত কবিতা স্থান পায়, যেমন 'প্রথম অশ্রু' (অসমাপ্ত), 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' 'দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়' 'মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসিন', কবিতাবলী। "নজরুল রচনা-সম্ভার" ১ম সংস্করণে নজরুলের কিছু বাল্যরচনা স্থান পায়, যেমন-"চাষার সঙ"-নাটক থেকে 'চাষীর গীত' "আকবর বাদশা" নাটক থেকে 'বন্দনা গান', লেটো গান 'প্রেমের ছলনা' 'চড়ুই পাখীর ছানা' কবিতা প্রভৃতি। এছাড়া

"মক্তব সাহিত্য" থেকে সংকলিত 'চাষী' 'মৌলবী সাহেব'ও নজরুলের বাল্য রচনা। নজরুলের দৌলতপুর অবস্থানকালীন কিছু রচনাও এ সংকলনে স্থান পেয়েছে। যথা 'মুকুলের উদ্বোধন', এবং 'লাল সালাম', এই কবিতা দুটি কবি আজিজুল হাকিমের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আজিজুল হাকিম ছিলেন নার্গিস আসার খানমের স্বামী, নার্গিসের সঙ্গে বিবাহের রাত্রে নজরুল দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লা চলে গিয়েছিলেন, সঙ্গে তার কোন কাগজপত্র অর্থাৎ ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা দৌলতপুরে বসে রচিত কবিতা, গান কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। সে সব নার্গিসের মামা আলী আকবর খানের হাতে পড়ে, যেগুলো আবার পরে নার্গিস ও তার স্বামী আজিজুল হাকিমের সম্পত্তি হয়। পরবর্তীকালে আবদুল কাদিরের মাধ্যমে ঐ সব চিঠিপত্র ও রচনাবলীর কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সংকলন বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায়।

"নজরুল রচনা-সম্ভার" ১ম সংস্করণে 'ঈদ' নামে একটি ছোট্ট নাটিকা সংকলিত হয়, এটি ১৩৬৫ সালের ৭ই বৈশাখ ঈদ-সংখ্যা দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। এই নাটিকাটি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বৃটেনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনের বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কিত লিয়াজোঁ অফিসার কামাল রহিমের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ঈদ-সংখ্যায় প্রকাশের জন্য দেন। সংকলনের প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত, 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' সওগাতে, 'হারামণি' জয়তীতে, 'দিলরুবা' মাসিক মোহাম্মদীতে, 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' পত্রিকা পত্রিকাতে প্রকাশিত। ঐ প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শেষোক্ত প্রবন্ধটি। "নজরুল রচনা-সম্ভার" ১ম সংস্করণে সংকলিত নজরুলের অভিভাষণসমূহের অধিকাংশই উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে নজরুলের প্রদত্ত ভাষণগুলি থেকে সমসাময়িক দেশ কাল এবং নিজের সম্পর্কে কবির চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কবিকে কলকাতা এলবার্ট হলে যে "জাতীয় সংবর্ধনা" দেওয়া হয় তাতে প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে দেয়া কবি তাঁর প্রতিভাষণে বলেছিলেন,

> বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এর অভিযান সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে বাঁকে-বাঁকে কুটিল ফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি। এবং তাদের নখর-দংশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।......
>
> আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব স্তুতি।

নজরুলের খুব কম রচনাতেই অমন অকপট আত্মউন্মোচন পাওয়া যায়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতি-রূপে নজরুল যে অভিভাষণ দেন 'তরুণের সাধনা' নামে তা আলোচ্য-সংকলনে সংকলিত হয়। এই ভাষণে তিনি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন,

> আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা—বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশানবর্দার মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের।...আমি তখন প্রথম কাব্য কাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি..এমন ভীতির দুর্দিনে মনি-অর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা: 'তোমার লেখা পড়িয়া খুশী হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' চোখের জলে স্নেহসুধা-সিক্ত ঐ কয় পঙতি লিখা বারে বারে পড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই।...তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতিঃবিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাঙলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশ-প্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে হইতেছে। এ যেন হজ্ব করিতে আসিয়া কাবা শরীফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া।

নজরুলের ঐ সুগভীর আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কাজী নজরুল ইসলামের পিতা-পুত্ররূপ সম্পর্ক ফুটে ওঠে।

আলোচ্য সংকলনে যেসব সম্মেলনে প্রদত্ত নজরুলের ভাষণসমূহ মুদ্রিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তার উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ–'প্রতি-নমস্কার' (বুলবুল, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪১); ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানে নজরুল প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা', (বুলবুল, ফাল্গুন ১৩৪৩); ১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও'; ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় দৈনিক কৃষক পত্রিকা অফিসে জনসাহিত্য-সংসদের শুভ-উদ্বোধনে নজরুলের সভাপতির ভাষণ 'জন-সাহিত্য' (নয়া জামানা, ফাল্গুন ১৩৪৫); ১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ 'স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ'; ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে মুসলিম ছাত্র সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কবির ভাষণ, 'আল্লাহ্‌র পথে আত্মসমর্পণ' (দৈনিক কৃষক, ৮ পৌষ ১৩৪৭); ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের

১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ 'মধুরম' এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজত-জুবিলী উৎসবে সভাপতিরূপে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের শেষ ভাষণ 'যদি আর বাঁশী না বাজে।' নজরুল তাঁর শেষ ভাষণে যা বলেছিলেন তা তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ,

> যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম। হিন্দু-মুসলমানের দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব—অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তুপের মত জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না— তবু আপনারা আদর ক'রে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারিনা। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র সুন্দররূপে আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আবার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়— তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেকদিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না—আমি যদি আসি,আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্দ্ধে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁর দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলী উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাতে বর্ষা-সজল রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন—মনে করবেন—পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

বাস্তবিকই পূর্ণতার তৃষ্ণা নিয়ে নজরুল ধরায় এসেছিলেন, কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে অপূর্ণের বেদনায় সেই অশান্ত নজরুল নিশ্চুপ হয়ে রইলেন দীর্ঘকাল, তারপর বিদায় নিলেন এই সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবী থেকে। নজরুল রচনা-সম্ভার গ্রন্থে আবদুল কাদির নজরুলের যে অভিভাষণগুলি সংকলিত করেছেন তা নজরুলকে বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক যে বিভিন্ন কবিতা ও গান থেকেও নজরুলের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জনসমক্ষে প্রদত্ত ভাষণে কবি

সরাসরি নিজের কথা বলেছেন, তাঁর সমকালীন দেশ, কাল, সমাজ ও মানুষ কবির চিত্তে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সে কথা প্রকাশ করেছেন। কবির ঐ সব স্বগত-সংলাপ এক প্রকারের স্বীকারোক্তিও বটে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর সত্যভাষণ। সুতরাং ঐ সব অভিভাষণ থেকে আমরা কবিকে যতটা স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারি আর কোন রচনা থেকে তা সম্ভবপর নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ নজরুল কোন আত্মজীবনী রচনা করে যেতে পারেননি, আলোচ্য অভিভাষণগুলো কিয়ৎপরিমাণে হলেও সে অভাব পূরণ করেছে, ফলে ঐ সব ভাষণ নজরুলের জীবন ও সৃষ্টিকে যথার্থভাবে বোঝার জন্যে যে অত্যন্ত মূল্যবান তা বলা বাহুল্য।

[পাঁচ]

নজরুল অসুস্থ এবং সম্বিতহারা হয়ে পড়ার পর থেকে নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। প্রকাশকরা তাদের খেয়ালখুশী মতো নজরুলের বিভিন্ন বইয়ের যেসব সংস্করণ প্রকাশ করছিল তার অধিকাংশই ছিল অযত্নপ্রসূত এবং মুদ্রণপ্রমাদপূর্ণ। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রচ্ছদপট পরবর্তী সংস্করণসমূহে পরিবর্তিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ "অগ্নিবীণা" কাব্যের কথা ধরা যেতে পারে, যে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটশিল্পী ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরবর্তী কোন এক সংস্করণ থেকে সে প্রচ্ছদপটটি আর দেখা যায়নি। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণের পরিবর্তিত প্রচ্ছদপট প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা নিম্নমানের ছিল। নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের বিবিধ সংস্করণগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রচ্ছদপটের মতো মুদ্রণ, কাগজ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে গ্রন্থের যত সংস্করণ হয়েছে সে গ্রন্থের প্রকাশনার মান তত বেশী নিম্নগামী হয়েছে। এ ব্যাপার ঘটেছে নজরুলের আইনানুগ প্রকাশকদের ক্ষেত্রেই, আর নজরুল ও প্রমীলার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে উভয় বাংলায় নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের যে অসংখ্য বেআইনী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে নজরুল-রচনার খোল নলচে পালটে দেয়া হয়েছে। নজরুলের অসুস্থতার পর নজরুলের অপ্রকাশিত বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনাবলী সংকলিত করে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক, সুতরাং রচনা নির্বাচন বা সম্পাদনার ব্যাপারে ঐ সব গ্রন্থে কোন মাপকাঠি বা মানের বালাই ছিল না। ফলে দেখা যায় যে দুর্ভাগ্য শুধু নজরুল বা প্রমীলাকেই গ্রাস করেনি তা রাহুগ্রস্ত করেছিল নজরুল-রচনাবলীর প্রকাশনাকেও। এমন অবস্থা হয়েছিল যে নজরুল রচনার শুদ্ধপাঠ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশককে বলা যায় নজরুল-চর্চা এবং নজরুল-রচনাবলীর প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের দুই দশক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কারণে চল্লিশের দশকে অসুস্থ নজরুল ও তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার পথে ছিল, পঞ্চাশের দশকেও ঐ অবস্থার জের চলতে থাকে, ব্যতিক্রম ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল-চর্চা। দেশ বিভাগের পর থেকে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে নজরুল-গীতি প্রচারিত হতে থাকে, দেশের সর্বত্র প্রতি বছর আন্তরিকতার সাথে নজরুল-জয়ন্তী উদ্‌যাপন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকায় কবি আবদুল কাদির নিয়মিত নজরুলের অপ্রকাশিত বা অপ্রচলিত রচনাবলী প্রকাশ করতে থাকেন। আর নজরুল-রচনাবলী সম্পাদনার কাজটি শুরু করেন আবদুল কাদির "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। (প্রথম প্রকাশ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮, ২৫শে মে, ১৯৬১, প্রকাশক পাইওনিয়ার পাবলিশার্স ৩/ ৫, লিয়াকত এ্যাভিনিউ, ঢাকা-১)।

"নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থটি (১ম সংস্করণ) কাজী নজরুল ইসলামের নামেই প্রকাশিত, গ্রন্থে সম্পাদক হিসাবে আবদুল কাদিরের নাম নেই, তদুপরি গ্রন্থে লেখা আছে, "এই গ্রন্থ বিক্রয়ের লভ্যাংশ পাবেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম"। এ গ্রন্থ 'নজরুল রচনা-সম্ভার' নামে পরিচিত হলেও তাতে "কবি পরিচিতি" নামে আবদুল কাদিরের নজরুল-সম্পর্কিত আটটি রচনা সংকলিত হয়। এ অসঙ্গতির কারণেই সম্ভবতঃ কবি-পরিচিতি অংশে লেখা হয়,

> নজরুল ইসলামের সাহিত্য-সম্পদ ও সুর সৃষ্টি সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনায় আগ্রহী, তাঁদের মধ্যে জনাব আব্দুল কাদির অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে নজরুল প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি যে-সব আলোচনা করেছেন, তা থেকে বাছাই ক'রে আটটি রচনা এখানে সংকলিত হলো। নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের অসম্ভবরূপ পাঠকের চোখে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে এ রচনাগুলি কিছুটা সহায়ক হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের ধারণা এই যে "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থে শুধু নজরুলের রচনা সংকলনই শোভন হত, আবদুল কাদিরের রচনা নয়। আবদুল কাদিরের নজরুল-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী নিয়ে পৃথক গ্রন্থ হতে পারত। প্রয়োজন ছিল "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থে একটি বিস্তৃত ভূমিকার, যেখানে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে পরিচিতি থাকতে পারত। কিন্তু আবদুল কাদির ভূমিকা না লিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলীর আটটি "নজরুল রচনা সম্ভার" এর শেষে সংযোজিত করে দেন। তবে এ গ্রন্থে একটি দুই পৃষ্ঠা 'মুখবন্ধ' রয়েছে তাতে আবদুল কাদির লিখেছেন,

> কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে-সকল রচনা এ-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা ইতিপূর্বে তাঁর কোনো বাজারে প্রকাশিত পুস্তকে স্থান পায়নি।
>
> ১৩৬৫ সালের ২৫শে বৈশাখ 'নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহু সংখ্যক

> অপ্রকাশিত কবিতা' নিয়ে 'শেষ সওগাত' বের হয়। এই সংকলনের 'কবিতা ও গান' অধ্যায়ের লেখাগুলির অধিকাংশই কবির 'পরিণত' বয়সের রচনা। কবির রচিত এরূপ আরও কবিতা ও গান নানা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এখনও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কলকাতা বেতার-কার্যালয়ে এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কবির কিছু অপ্রকাশিত রচনা হয়ত পাওয়া যেতে পারে।... কবির ভক্ত ও অনুরাগীরা যত্নপর হলে তাঁর এ ধরনের বহু বিক্ষিপ্ত রচনা একত্রে গ্রন্থাকারে সংগ্রথিত হতে পারে।

আবদুল কাদির "নজরুল রচনা-সম্ভার" প্রথম সংস্করণে নজরুলের ৩৬টি কবিতা ও গান, ১টি নাটিকা, ৪টি প্রবন্ধ ও আলোচনা, ১২টি অভিভাষণ এবং ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত চুয়াল্লিশটি পত্র তারিখ পরম্পরায় সজ্জিত করে প্রকাশ করেন। এছাড়া পরিশিষ্টে ছিল 'কবি-বরণ' নামে একটি কবিতা।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত "নজরুল রচনা-সম্ভার" প্রথম সংস্করণে সম্পাদক হিসেবে আবদুল কাদিরের নাম ছিলনা কিন্তু কলিকাতা থেকে আবদুল আজীজ আল-আমান প্রকাশিত "নজরুল রচনা সম্ভার" (প্রথম মুদ্রণ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২, ২৫শে মে, ১৯৬৫, ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, ৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২) গ্রন্থটিতে "আবদুল কাদির সম্পাদিত" কথাটি লেখা ছিল। কলিকাতা সংস্করণ "সম্ভারে" ঢাকা সংস্করণের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত রচনা স্থান পায়। ঢাকা সংস্করণে গান ও কবিতা ছিল ৩৬টি, কলকাতা সংস্করণে সে সংখ্যা ৫৮টি। ঢাকা ও কলিকাতা সংস্করণে নাটিকার সংখ্যা একটিই। প্রবন্ধ ও আলোচনা ঢাকা সংস্করণে ছিল ৪টি, কলকাতা সংস্করণে তা বেড়ে হয়েছে ৭টি। ঢাকা সংস্করণে অভিভাষণ ছিল ১২টি, কলকাতা সংস্করণেও তাই। ঢাকা সংস্করণে চিঠিপত্রের সংখ্যা ৪৪টি, কলকাতা সংস্করণে সংখ্যা ৪৭টি। ঢাকা সংস্করণ "নজরুল রচনা-সম্ভারে" আবদুল কাদিরের রচনার সংখ্যা ছিল ৮, কলকাতা সংস্করণে সে সংখ্যা ১০টি। ২টি প্রবন্ধ কলকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত সংযোজনা। ঢাকা সংস্করণের পরিশিষ্টে ছিল ১টি রচনা কিন্তু কলকাতা সংস্করণে রয়েছে ২টি।

"নজরুল রচনা-সম্ভার" দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬, ২৫শে মে ১৯৬৯, এবারে আবদুল কাদিরের নাম সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছে। এ সংকলনে 'সম্পাদকের কথা'য় আবদুল কাদির লিখেছেন,

> প্রথম সংস্করণে কবির রচনা ছাপা হয়েছিল ২১৪ পৃষ্ঠা; এই সংস্করণে তা বেড়ে হয়েছে ৪১৩ পৃষ্ঠা। এতেই বোঝা যাচ্ছে নতুন সংযোজনের পরিমাণ। নজরুলের লেখাগুলির মুদ্রণ যখন প্রায় সমাপ্তির পথে, তখন তাঁর আরো কয়েকটি পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত লেখা সংগৃহীত হয়। সেগুলো 'সংযোজন' বিভাগে সন্নিবেশিত হলো।
>
> এই সংস্করণের সর্বশেষ অর্থাৎ 'চুয়াল্লিশ' সংখ্যক লেখাটি...বিশেষ কারণে সেটি পরিত্যক্ত হলো।...
>
> ছায়াচিত্রের জন্যে রচিত নজরুলের 'বিদ্যাপতি' নাটকখানি সংক্ষিপ্ত আকারে হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের সাতখানি রেকর্ডে বিধৃত হয়েছিল। তা এখানে উদ্ধৃত হলো।...

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ৯নং আন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা ৯ থেকে জোহরা খানম সাহেবা নজরুলের অনূদিত ১৯৭টি রুবাইয়াৎ গ্রন্থিত করে "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তার ভূমিকা সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা। কিন্তু কবি স্বয়ং তার জন্যে যে 'মুখবন্ধ' লিখেছিলেন তা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নজরুলের লেখা সেই মুখবন্ধ 'ওমরের কাব্য ও দর্শন' শিরোনামে এখানে পরিবেশিত হলো। এই অনুলিপি সংযোজিত হয়েছে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সহযোগিতায়।

আলোচ্য সংস্করণে সংকলিত কবিতা ও গানের সংখ্যা ৬৯টি, নাটিকা ৫টি, প্রবন্ধ ও আলোচনা ১৬টি, অভিভাষণ ১২টি, চিঠিপত্র ৫৫টি, সংযোজন অংশে ৭টি কবিতা ও গান এবং ১টি আলোচনা; কবি-পরিচিতিতে আবদুল কাদিরের ১০টি প্রবন্ধ। সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে কিছু রয়েছে কিশোর নজরুলের রচনা, যেমন- চাষীর গীত, বন্দনা-গান, প্রেমের ছলনা, চড়ুই পাখীর ছানা, করুণ গাথা, করুণ বেহাগ, ভগ্নস্তূপ, মুক্তি প্রভৃতি। ঐসব কবিতা নজরুলের লেটো বা স্কুলের ছাত্র জীবনের রচনা। সংকলনে কিছু কবিতা আছে যা নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্যায়ের অর্থাৎ অসুস্থ ও সম্বিতহারা হয়ে পড়ার পূর্ব সময়ের রচনা, যেমন, মহাসমর, জয়হোক, আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, চির নির্ভয়, দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, শ্রমিক মজুর, প্রেম ও প্রহরা, মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসিন, জামাল উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে, নবীনচন্দ্র, রবি-হারা প্রভৃতি। এ কবিতাগুলি জয়তী, বুলবুল, সওগাত, মোহাম্মদী প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় এবং দৈনিক নবযুগ (শেষ পর্যায়) এ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগুলির বেশ কয়েকটি বিভিন্ন মহাপুরুষ স্মরণে, যেমন রবীন্দ্র-প্রয়াণে তিনি লিখেছিলেন,

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে' এল দলে দলে
উদাস গগন-তলে'
বিশ্বের রবি, ভারতের কবি,
শ্যাম বাঙ্লার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে ব'লে!

'প্রবাসী' পত্রিকা থেকে 'আরবী ছন্দের কবিতা' এবং বিভিন্ন পত্রিকা থেকে "দীওয়ান-ই-হাফিজ" এর ১ থেকে ৯নং গজলও এ গ্রন্থে সংকলিত। নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে রচিত কিছু কবিতাও এ সংকলনে গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক যে কবিতাটি রচনা ও "ধূমকেতু"তে প্রকাশের জন্যে নজরুলের কারাবরণ করতে হয়েছিল সেটিও "নজরুল রচনা-সম্ভার" এর আলোচ্য সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বোঝা যায় যে এ গ্রন্থে সংকলিত বেশ কিছু কবিতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে যদিও বা কবিতা হিসেবে হয়তো সবগুলো উল্লেখযোগ্য নয়।

গ্রন্থের আলোচ্য সংস্করণে নজরুলের যেসব অভিভাষণ সংকলিত হয়েছে তা প্রথম সংস্করণের অনুরূপ "নজরুল রচনা-সম্ভারের" দুটি সংস্করণেরই মূল্যবান সংকলন হল নজরুলের চিঠিপত্র। কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবন ও মানস পুনর্গঠনে তাদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র মূল্যবান উপাদান, নজরুলের ক্ষেত্রেও তা-ই। সংকলনের প্রথম চিঠিটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদককে করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্ট-এর ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে লিখেছিলেন। করাচী থেকে 'সবুজ পত্রের' সহ সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিও গ্রন্থে রয়েছে। আরো যাদের কাছে লেখা নজরুলের চিঠি এ সংকলনে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মাসিক 'কালি কলম' পত্রিকার সহ সম্পাদক মুরলীধর বসুকে হুগলী থেকে ২৫ নভেম্বর ১৯২৫, শৈলজা নন্দকে কৃষ্ণনগর থেকে ১০ এপ্রিল ১৯২৬, চট্টগ্রামে বেগম শামসুন্নাহারকে কৃষ্ণনগর থেকে ১১ আগষ্ট ১৯২৬, ঢাকার সৈয়দ আবুল হোসেনকে কৃষ্ণনগর থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খানকে পৌষ, ১৩৩৪ সাল এবং কাজী মোতাহার হোসেনকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা পত্রগুচ্ছ। নজরুলের এসব চিঠিপত্র থেকে একদিকে যেমন তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় অপরদিকে তেমনি তার মানসের অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। যেমন নার্গিস আসার খানমকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই লেখা চিঠিটি, যদিও এ চিঠিটি সংকলনের চিঠিপত্র বিভাগে নেই, আছে আবদুল কাদিরের 'নজরুল জীবনের এক অধ্যায়' প্রবন্ধে।

> আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা।... তোমার যে কল্যাণরূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মত চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে।... হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার কথা।... বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দুটি কর... তোমার শুভ্র সুন্দর ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি।... মনে হয় যেন কালকের কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলো না, কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল।।

ঐ চিঠিটি নার্গিসের একটি চিঠির উত্তরে নার্গিসকে লেখা নজরুলের প্রথম ও শেষ চিঠি।

নজরুলের উদ্দেশে অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের লেখা "একখানি পত্র" ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা "নওরোজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেই "চিঠির উত্তরে" নজরুলের পত্র ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা "সওগাত"-এ প্রকাশিত হয়, ঐ চিঠিটি আবদুল কাদির "নজরুল রচনা-সম্ভারে" উদ্ধৃত করেছেন। যে চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন,

> বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব ক'রে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার ব'লে কোনদিন অভিযোগ করেছিলাম ব'লে ত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি! অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

আবদুল কাদির "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে লিখেছিলেন, "কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে সকল রচনা এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা ইতিপূর্বে তাঁর কোনো বাজারে প্রকাশিত পুস্তকে স্থান পায়নি।" কিন্তু ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 'সম্পাদকের নিবেদনে' তিনি তেমন কোন দাবী করেননি। দ্বিতীয় সংস্করণে নজরুলের অসুস্থ হবার পর প্রকাশিত 'শেষ সওগাত' (প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫) এবং 'ঝড়' (প্রথম প্রকাশ ১ লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৭) গ্রন্থ থেকে কিছু রচনা আহরণ করা হয়েছে। আবদুল কাদির বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে "নজরুল-রচনা-সম্ভার" গ্রন্থের উভয় সংস্করণে যে সব কবিতা, গান, নাটিকা, প্রবন্ধ, ভাষণ ও চিঠিপত্র দিয়েছেন সেগুলি নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত এবং প্রচলিত গ্রন্থসমূহে নেই। "নির্ঝর" বা "মক্তব সাহিত্য" নজরুলের সুস্থাবস্থায় ছাপা হলেও গ্রন্থ দুটির প্রচার হয়নি। ঐ সব গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করে তিনি নজরুলের অনেক সৃষ্টিকে হারিয়ে যেতে দেননি। নজরুলের কত সৃষ্টি যে হারিয়ে গেছে তার সঠিক হিসাব হয়তো কেনদিন পাওয়া যাবে না, কিন্তু আবদুল কাদিরের একক প্রয়াসে যে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রক্ষা পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নজরুলের অনেক অপ্রকাশিত রচনা এখন কারো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তারা তা যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। কেউ বা আবার নজরুলের ঐ সব সৃষ্টিকর্ম নিয়ে ব্যবসা করতে চাইছেন, এমনকি কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা-সম্ভার" নিয়েও কলকাতায় ব্যবসা হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ নিয়ে ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটেছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নজরুলের যাবতীয় অপ্রকাশিত রচনা সংগ্রহ ও সংকলিত করে প্রকাশ করা। কবি আবদুল কাদির নজরুলের অপ্রকাশিত রচনাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করার কাজের পথ-প্রদর্শক, সে জন্যে তিনি চিরদিন নজরুল-ভক্তদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংকলন

নজরুলের পাণ্ডুলিপিতে সংস্কার ও সংযোজনা

আবদুল আজীজ আল্-আমান

নজরুলের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। জীবিতকালেও যিনি একদল উন্নাসিক এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা অশোভনভাবে সমালোচনা-লাঞ্ছিত হয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পরও সেই ধারা সম্পূর্ণ স্তিমিত নয়। এঁদের বক্তব্যে যে কোন বিচার ছিল না তা নয়, কিন্তু স্বার্থগন্ধী বিচার বলেই তা অনাবিল হতে পারেনি। এই উদ্দাম ও উত্তেজিত আবিলতায় একশ্রেণীর নজরুল-সমালোচনার জন্ম, লালন এবং অধিবাস। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো আমাদের নিয়মিত শুনতে হয় ঃ নজরুল-কাব্য এবং সংগীতে, কোন সংস্কার এবং পরিমার্জনা নেই, শিল্পে যাকে বলে 'রূপ-সম্পূর্ণতা' নজরুল-সৃষ্টিতে তা অনুপস্থিত। ভাবের দিক দিয়েও এগুলির মান উন্নত নয়। 'নজরুলের-কবিতা ও গান কোনো অনন্তের দিকে আমাদের আকর্ষণ করে না —সুতরাং এগুলি একেবারেই উন্নত-পর্যায়ের সৃষ্টি নয়'। নজরুল-সাহিত্যের পূর্ণ মূল্যায়নের এই সোনালী মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরূপ দুঃখজনক মন্তব্য স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি বিশাল, রচয়িতাদের উপাধি এবং পদবী বিশালতর — সুতরাং রাংতায় মোড়া এই মুখরোচক মন্তব্যে অনেকেই বিভ্রান্ত হবেন। এবং দেখতে পাচ্ছি এই বিভ্রান্তির সংক্রমণও মারাত্মক। সুদূর অতীতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থান্বেষী উন্নাসিক বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই যে মন্তব্য করেছিলেন,

> ক. যেহেতু নজরুল-কাব্য-সংগীতে কোন পরিমার্জনা নেই, প্রধান অংশই যার আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর, সুতরাং এ সৃষ্টি সম্পূর্ণ নয়,
>
> খ. যেহেতু নজরুল সংগীত চর্চা করেননি, মার্গ সংগীতের সংগে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল না সুতরাং সুরের দিক দিয়েও এ গানগুলির কোন উজ্জ্বল আভিজাত্য নেই, 'বিশেষ নীচু শ্রেণী'র জন্য রচিত ও সুরারোপিত এ গানগুলি অচিরেই ঝরে নিশ্চিহ্ন এবং নীরব হয়ে যাবে। গাড়োয়ান, রাখাল, মাঝিমাল্লা, ভিখিরী আর নূপুর পরিহিতাদের সুর কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। আর এরাই ত নজরুলের সুরের দীক্ষা গুরু।'

এ দুটি অপবাদ যা অতি সুকৌশলে এই সব তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত-সমালোচক তাঁদের চতুর সমালোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা আজো চলছে নির্বিচারে। এসব দেখে মনে হয়, আমাদের চোখে তাঁরা যে রঙিন চশমা পরিয়ে দিয়েছিলেন, সমালোচনার ভুবনটিকে আমরা চিরকালই সে চশমা দিয়ে দেখছি, সত্যমিথ্যা বিচারের সাধারণ

বিবেকটুকু সম্ভবতঃ আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। কেবল সাধারণ সমালোচক নন, নজরুল সম্পর্কে যাঁরা দু-চার কথা বলেন এবং নিজেদের নজরুল-গবেষক বলে চিহ্নিত করেন সেইসব বুদ্ধিজীবীদের যখন নির্দ্বিধায় এবং অবলীলায় এই মহৎ আপ্তবাক্য (!) উচ্চারণ করতে শুনি — বিস্মিত হই, বুঝতে পারি তোতাপাখি কেতাদুরস্ত বুলি বলছে। এইসব অভিজাত বুলি কখনো কখনো আশোভনভাবে ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। অথচ যত ঘন আবরণে মেঘ জমা হোক, সূর্যকে চিরস্থায়ী আড়াল করা তার সাধ্যের অতীত। এসব আলোচনা-সমালোচনা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্যের পুনর্বিচার হচ্ছে, নবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা চলছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, যুক্তি-তর্কে তথ্য-তত্ত্বে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে এই সব ভ্রান্তি অপনোদনের মহৎকর্মে অনেকের বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই শাহাবুদ্দীন আহমদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, রফিকুল ইসলাম প্রধান। এই মুহূর্তে এই অসার যুক্তির কালাপাহাড় নিশ্চিহ্ন করতে বাংলাদেশে আরো অনেক বলিষ্ঠ হাত কর্মচঞ্চল। নজরুলের সব সৃষ্টিই যেমন ত্রুটিশূন্য এবং অনন্য নয় তেমনি তাঁর অনেক সৃষ্টিই আবার নিটোল এবং দ্যুতিময়। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবাদে একতরফা নিন্দাবাদ নজরুল-শিল্পের প্রাপ্য নয়, তার সৃষ্ট শিল্পের অনন্য অলংকারগুলি উদ্ধার ও আহৃত হয়ে নজরুল-সৃষ্টি যে পুনরায় স্বাভাবিক মর্যাদায় ফিরে আসছে এই আমাদের বড় সান্ত্বনা।

বিচার-বিবেচনার নানান দিক আছে, সমালোচনা যেখানে নজরুলের প্রাপ্য তা তাঁকে পেতেই হবে! কিন্তু যেখানে তিনি ত্রুটিমুক্ত, অনন্য, আমাদের প্রচেষ্টা হোক সেখানে তাঁকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।

'নজরুলের সুরজ্ঞান' এবং 'সংগীতজ্ঞ নজরুল' যদিও আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, তবুও প্রাসঙ্গিকভাবে শুধু এইটুকু বলে রাখা যায়; 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে এ সম্পর্কে নজরুলের উপর যত অপবাদ চাপান হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে নিশ্চিহ্ন হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সুরজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞ নজরুলের এক সম্রাটোচিত পরিচয়। 'সুর ও শ্রুতি' শীর্ষক যে বিপুলায়তন গ্রন্থটি 'অপ্রকাশিত নজরুলের'[১] শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, কবির সুরসাধনার তা এক যুগান্তকারী দলিল। কি গভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং শ্রমে ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডারটি তিনি নিজের দখলে এনেছিলেন, সেই বিস্ময়কর ইতিহাস তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে। সুর এবং সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও স্বীকরণে এই নিষ্ঠা, এই শ্রম, এই তপস্যা বাংলার অন্য কোন কবি-গীতিকার করেছিলেন কিনা সন্দেহ জাগে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সংগীতজ্ঞ নজরুলের স্বরূপ আলোচনার এক নতুনতর দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলেই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

বর্তমান আলোচনায় আমরা একটি বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের জবাব দিতে চাই। নজরুল-সৃষ্টিতে — অর্থাৎ তাঁর রচনাবলীতে কোন সংস্কার নেই,— পরিমার্জনা এবং গ্রহণ-বর্জন নেই, কবির প্রতি এই হল একশ্রেণীর সমালোচকের মারাত্মক অভিযোগ। এবং এই অভিযোগের সূত্র ধরে তাঁরা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে পঙ্গু এবং অপুষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন। বলাবাহুল্য, এই হাস্যকর প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ, সৃষ্টি পঙ্গু বা অপরিণত হলে তা কখনো পঞ্চাশ-ষাট বছর সগৌরবে বেঁচে থাকত না এবং আপামর বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ফিরত না। এই বাস্তবতার নিরিখেও কিন্তু এই অপপ্রচার একেবারে স্তিমিত হয়ে যায় নি। এই অভিযোগে এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা একের পর এক তথ্য পরিবেশন করে যাব। আমার কাছে নজরুলের প্রায় দেড় হাজার পাণ্ডুলিপি আছে, এসব পাণ্ডুলিপিতে আমি এমন একটি সৃষ্টিও লক্ষ্য করিনি যেটিতে কোন গ্রহণ-বর্জন নেই, সংস্কার ও পরিমার্জনা নেই— প্রতিটি গানই যথেষ্ট গ্রহণ-বর্জনের ভিতর দিয়ে এক নিটোল স্থাপত্যের রূপ পেয়েছে। যাঁরা বলে থাকেন যে নজরুল কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই তিন চার মিনিটে একটি 'অক্ষত' আস্ত গান লিখে দিতেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই আংশিক সত্য তুলে ধরেন। এ কথা ঠিক, ভাবের আবেগে নজরুল গান 'সৃষ্টি' করতেন, শব্দের পর কষ্টকর শব্দ বসিয়ে 'নির্মাণ' করতেন না। যেহেতু সৃষ্টি, তা অবশ্যই ভাবাবেগ তাড়িত এবং এ জন্যে দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্বল্প সময়সীমায় যে গান রচিত হত তার মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের লীলাখেলাগুলি অত্যুৎসাহী নজরুলানুরাগীর চোখে ধরা পড়ত না। আমার কাছে যে পাণ্ডুলিপি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি গান 'একটানে' লেখা এবং নির্ভুল। এ থেকে যেন কেউ না ভাবেন এগুলি এভাবেই রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি পূর্বলিখিত গানের পরিমার্জিত পুনর্লিখন।

পরিমার্জনা সংক্রান্ত তথ্যগুলি এতদিন আমরা কেউ কোন বিজ্ঞান-ভিত্তিকভাবে উপস্থিত করতে পারিনি। এই সংযোজন-বর্জনে সৃষ্টি কতটা শিল্পসুষম এবং রূপ-সম্পূর্ণ হয়েছে সে বিচার অন্যেরা করবেন। আমরা আজ শুধু এইটুকু দেখাতে চাই যে নজরুল-সৃষ্টিতে গ্রহণ-বর্জন আছে, সংস্কার আছে, পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন আছে — কখনো কখনো তা মাত্রাতিরিক্ত। আর এই সংস্কার-ক্রিয়া চলেছে দ্বিতীয় পাঠের সময়, পুনর্লিখনের সময়, সংগীত শিক্ষা দেবার মুহূর্তে, প্রুফে, কখনো কখনো মুদ্রণের পরও। আলোচনার যথাস্থানে এসবের পরিচয় পাওয়া যাবে। সুতরাং এই বিভ্রান্তিকর রটনা এবং অপপ্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া দরকার যে, কবির সৃষ্টিতে কোন সংস্কার নেই, পরিমার্জনা নেই।

পরস্পর 'পাণ্ডুলিপির পাঠ' এবং ' শেষ পাঠ' (গ্রন্থে মুদ্রিত বা রেকর্ডে গৃহীত পাঠ) লক্ষ্য করলেই পরিমার্জনার ক্ষেত্রে নজরুল-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সহজ হবে।

পাণ্ডুলিপিতে আমি যে গানটি যেভাবে পেয়েছি, হুবহু সেভাবেই 'পাণ্ডুলিপি পাঠ' -এ নকল করে দিয়েছি, যে পংক্তিটি যেমন ছিল তাই আছে। 'পাণ্ডুলিপি পাঠে' অনেকগুলি পংক্তি বা পংক্তির অংশ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আছে, পরবর্তীকালে কবি ঐ অংশগুলি বর্জন করেছেন। কিছু পংক্তি কবি কেটে দিয়েছেন কিন্তু পরে 'stet' কথাটি লিখে তা সংরক্ষণ করেছেন, এ-ধরনের পংক্তিগুলি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আছে ঠিকই কিন্তু শুরুতে বসেছে 'stet' শব্দটি।

এখন ভিন্নতর পাঠ এবং তাদের পর্যালোচনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারেঃ

একটি রাগ প্রধান গান ঃ পাণ্ডুলিপির পাঠ

১. (নিশীথ-চন্দ্র তন্দ্রাতুর আঁখি)
২. নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে।
৩. (ঘুমায় রাতের তারা চাঁদের পাশে ৷৷)
৪. (কেন .... পরাণ উদাসে ৷৷)
৫. হে প্রিয় কোথা তুমি দূর প্রবাসে ৷৷
৬. (মালার) বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
৭. ঘুমায়েছে ফুল-মালা শ্রান্ত আঁচলে
৮. (ঢলিল) ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে ৷৷
৯. ফুরাল দিনের কাজ ফুরায় না রাতি,
১০. (জেগে জেগে অভিমানে নিভে যায় বাতি।)
১১. শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
১২. (নিভে না অসহায় নয়নের বাতি।)
১৩. নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।
১৪. (রাতের তিমির-কুন্তলে মুখ লুকায়ে)
১৫. (কাঁদিব কত আর)
১৬. (বল আর কতদিন এমন নিদ্রাহীন)
১৭. (শূন্য আকাশে ৷৷)
১৮-১৯. (তোমার দেশে কি গো/বিরহী)
২০. (ও দেশে বাজে নাকি বিরহী বেণুকা)
২১. (জাগিয়া কাঁদে নাকি ... বিরহ)
২২. (কেন বল বনফুল ... তুলি)
২৩. (অনাদরে যদি শুকাতে ...)
২৪.২৬. (গুণ্ঠনে কত আর/ লুকায়ে রব/ বিষাদ-মাঝে)
২৭. ২। কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি

২৮. ১। বিষাদ-মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি
২৯. (জীবনের ... গেল বিরহে)
৩০. দিন যায় দিন গুনে রাত যায় নিরাশে ॥

বেহাগ-ত্রিতালে নিবন্ধ মাত্র এগার পংক্তির এই রাগপ্রধান গানটি রচনার জন্য কবি ছোট বড় ত্রিশটি চরণ রচনা করেছেন। অর্থাৎ একটি গানের জন্য তিনটি সংগীত রচনার শ্রম অকাতরে ব্যয় করেছেন। অসম্ভব শিল্প-সুষম কয়েকটি পংক্তির উপর নির্মমভাবে কবিকে যখন অস্ত্রোপচার করতে দেখি, আমরা হতবাক হয়ে যাই। প্রথম পাঠের ১, ৩, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ এই বাতিল পংক্তিগুলি সম্ভবতঃ অনেক গীতি-রচিয়তার জন্য মহাসঞ্চয়, অথচ কবি এগুলিকে অনায়াসে বাসি ফুলমালার মতো ধূলোয় নিক্ষেপ করলেন। অবশ্যই সংযোজিত চরণগুলিতে সংগীতের কাব্যমহিমা নবতর গরিমা পেয়েছে। প্রথম পাঠের তৃতীয় (ঘুমায় রাতের তারা চাঁদের পাশে) এবং পঞ্চম (হে প্রিয় কোথা তুমি দূর প্রবাসে) পংক্তি দুটি যদি বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় আনি, দেখব, তৃতীয় পংক্তিটি 'নির্মিত' আর পঞ্চম পংক্তিটি 'সৃষ্টি'। 'দূর প্রবাসে' এই একটি শব্দে ভাবের ব্যাপ্তির সঙ্গে বিরহী আত্মার সকরুণ যন্ত্রণাটুকু আমাদের মন-মানসেও ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এই বর্জন এবং নবতর সংযোজনে নজরুল গীতিতে যে 'নজরুলী ঐতিহ্যের' সৃষ্টি হয়েছে, আমরা কি চিরকাল সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকব?

বেহাগ-ত্রিতাল

নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে ॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে,
ঘুমায়েছে ফুল-মালা শ্রান্ত আঁচলে,
ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে ॥

ফুরায় দিনের কাজ ফুরায় না রাতি,
শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়,
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।

কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি,
বিষাদ-মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি,
দিন যায় দিন গুণে নিশি যায় নিরাশে ॥

একটি কাব্যগীতি ঃ পাণ্ডুলিপির পাঠ

১. মোমতাজ! মোমতাজ !
২. (পাষাণে শুভ্র শতদল অমল শুভ্র কমল)
৩. (ফুটালে বিশ্বমাঝ ॥)
৪. (তোমার তাজমহল (র প্রাণ)
৫. (নব) (মহাস্বর্গের) বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম আজো করে ঝলমল ॥
৬. (কত সম্রাট ধুলায় হইল ধূলি)
৭. (তব প্রেমে মোরা শাহ্‌জাহানে নাহি ভুলি')
৮. কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে
৯. পৃথিবী ভুলিতে নারে, প্রেমিক শাহ্‌জাহানে,
১০. শ্বেত মর্মরে (রাজ) সেই বিরহীর (প্রাণের) ক্রন্দন মর্ম্মর
১১. (ধ্বনিতেছে কাঁদায় গগন) গুঞ্জরে অবিরল ॥
১২. (কোন নওরোজ উৎসবে তুমি শাহ্‌জাহানে দিলে দেখা)
১৩. (আজো) সেই উৎসব-স্মৃতি আজো শ্বেত যে শুভ্র পাষাণে রয়েছে লেখা।)
১৪. কেমনে জানিল শাহ্‌জাহান? প্রেম পৃথিবীতে মরে যায়
১৫. তাই পাষাণ-প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায়!
১৬. (নন্দন হতে ঝরে পড়ে প্রেম)
১৭. (নন্দন হতে) (পাষাণের ক্রন্দন)
১৮. (নন্দন-লোক হতে ঝ'রে পড়া এক ফোঁটা চন্দন।)
১৯. (যেন প্রেমিকের অভিযোগ)
২০. যেন (গো) তাজের পাষাণ- প্রেমের অঞ্জলি লয়ে (প্রেমের) নিষ্ঠুর বিধাতা পানে
২১. (এ তাজ নয় যেন)
২২. অতৃপ্ত প্রেম বিরহী আত্মা আজো অভিযোগ হানে
২৩. (বুঝি সেই লজ্জায় বালুকায় মুখ লুকায়েছে বালুকায়)
২৪. (সেই লাজে যমুনা-জল ॥)
২৫. (শীর্ণা যমুনা-জল ॥)
২৬. বুঝি সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চাহে
২৭, শীর্ণা যমুনা-জল ॥

শেষ পাঠ ঃ

মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল
(যেন) বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম আজো করে ঝলমল ॥
কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাহ্‌জাহানে,
শ্বেত-মর্ম্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্ম্মর
গুঞ্জরে অবিরল ॥
কেমনে জানিল শাহ্‌জাহান ? প্রেম পৃথিবীতে ম'রে যায়!
(তাই) পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায়।
(যেন) তাজের পাষাণ-অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতা পানে
অতৃপ্ত প্রেম, বিরহী-আত্মা আজো অভিযোগ হানে,
(বুঝি) সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায়
শীর্ণা যমুনা-জল ॥

বার পংক্তির এই অবিস্মরণীয় আধুনিক সংগীতটির জন্যে কবিকে রচনা করতে হয়েছে সাতাশটি চরণ, তারপর চলেছে গ্রহণ এবং বর্জন, সংস্কার এবং পরিমার্জনা। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের এই সংস্কার-মানসিকতার প্রতি আমি সবার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আলোচ্য সংগীতটির কথাই ধরা যাক, সাতাশ পংক্তি রচনার পর কবি নির্দয়ভাবে বর্জন করলেন পনের পংক্তি, গ্রহণ করলেন মাত্র বারো। আজ কাল যাঁরা কবিতা লেখেন, সংগীত রচনা করেন —ক'জনের মধ্যে এই ধৈর্য ও নিষ্ঠা আছে? পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠটি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই এক একটি পংক্তি কবি হৃদয়ের গভীরতম অঞ্চল থেকে উঠে আসছে, ডুবুরীর মুক্তা সংগ্রহের মত হৃদয়ের তলদেশ থেকে তিনি সেগুলি সংগ্রহ করছেন, যেটিতে সঠিক সুর বাজেনি সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হচ্ছে সেটি। সম্পূর্ণ সংগীতটি রচিত হয়ে যাবার পরও চলেছে গ্রহণ-বর্জন, এমন কি মুদ্রণের পরও এমনতর ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়নি। গৃহীত পাঠের দ্বিতীয় পংক্তিতে এই ধরনের একটি সংযোজন লক্ষ্য করি। আছে ঃ 'যেন বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম আজো করে ঝলমল', মুদ্রিত গ্রন্থে পরিবর্তিত রূপ এই ঃ 'যেন বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম ফিরদৌসের এক মুঠো প্রেম আজো করে ঝলমল।' বিতর্কিত এই পরিবর্তনটি কবিই করেছিলেন। এই গ্রহণ-বর্জন, সংস্কার পরিমার্জনায় বাণী অধিকতর নিটোল, গতিশীল ও দ্যুতিময় হয়েছে। কবিতো সারা জীবন অপবাদ ও অপপ্রচারের শিকার হয়েছিলেন[২], তাঁর মৃত্যুর পরও কি সে ধারা অব্যাহত থাকবে?

একটি শ্যামা সংগীত ঃ পাণ্ডুলিপির পাঠ ঃ

১. (তুই কি গো মা জেলের মেয়ে)
২. (মহামায়ার জাল ফেলেছিস জগৎ জু'ড়ে)
৩. জগৎ জু'ড়ে জাল ফেলেছিস্
৪. (তুই কি গো মা জেলে)
৫. (শ্যামা মা তুই)
৬. (মহামায়া)
৭. শ্যামা মা তুই জেলের মেয়ে।
৮. তোর মায়ার জালে মহামায়া (আছে মা ত্রিভুবন)
৯. বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে
১০. (প'ড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে)
১১. নিখিল
১২. (কোটি নর-নারী কাঁদে)
১৩. তোর মায়া-জাল তত বাঁধে
১৪. (যত) পলাতে চায় যত ধেয়ে ॥
১৫. (তোর মায়া-জাল ছিন্ন করার সাধনা কই সাধ কোথায়)
১৬. (তুই নিজে না মুক্তি দিলে এ জাল থেকে মুক্তি কে পায়।)
১৭. (চতু) চতুর যে মীন সে জানে মা জাল থেকে কি মুক্তি আছে,
১৮. তাই জেলে যখন জাল ফেলে, সে (লুকিয়ে) লুকায় জেলের পায়ের কাছে।
১৯. ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে
২০. (তাই)
২১. (আমিও মা তাই নিলাম শরণ)
২২. (তোর দুটী ঐ তোর দুটী)
২৩. (মা তোর ঐ অভয় চরণ)
২৪. (মা তোর মায়াকে জয় করেছি)
২৫. (মোরে ধরতে)
২৬. (পরাণ নিলাম আ)
২৭. তাই মা আমি নিলাম শরণ
২৮. তোরই দুটী রাঙা চরণ
২৯. আমি (কাটল বেড়) এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
৩০. (তোরই)
৩১. মা তোর অভয় চরণ পেয়ে।

শেষ পাঠ ঃ

জগৎ জু'ড়ে জাল ফেলেছিস
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।
তোর মায়ার জালে, মহামায়া,
বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে ॥

প'ড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে,
তোর মায়া-জাল ততই বাঁধে
পালাতে যায় যতই ধেয়ে ॥

চতুর যে মীন সেই জানে মা,
জাল থেকে কি মুক্তি আছে ?
তাই জেলে যখন জাল ফেলে,
সে লুকায় জেলের পায়ের কাছে।
ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে।
তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দু'টি রাঙা চরণ,
আমি এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোর অভয় চরণ পেয়ে ॥

দুটি পাঠ মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছি সতের পংক্তির এই শ্যামা-সংগীতটির জন্য কবি রচনা করেছেন একত্রিশটি চরণ, সুতরাং বর্জ্জিত চরণের সংখ্যা চৌদ্দ। যে সতেরটি চরণ শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে, পাণ্ডুলিপির মূল পাঠের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কম নয়। লক্ষ্য করুন, সপ্তম পংক্তির 'মা' জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে 'কি' চৌদ্দ পংক্তিটি 'পলাতে চায় যত ধেয়ে' হয়েছে 'পালাতে যায় যতই ধেয়ে', সতের পংক্তির 'সে' হয়েছে 'সেই', আটাশ চরণের 'তোরই দু'টী'র পরিবর্তিত রূপ 'তোর ও দু'টি। বলাবাহুল্য, এসব পরিবর্তনে দ্যোতনা ও কাব্য-সৌন্দর্য বেড়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি নির্ভুল, কিন্তু কবির মনে যে ইমেজ বা ভাবমূর্তি ছিল তা এ চরণ দুটিতে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে প্রকাশিত হয়নি, সুতরাং সংগত কারণেই পরিত্যক্ত হয়েছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ চরণদ্বয়ের বর্জনের মধ্যে যেকোন সতর্ক পাঠক যথেষ্ট চিন্তাভাবনার রসদ পাবেন। চরণ দুটি এখানে উদ্ধৃত করছি'

তোর মায়া-জাল ছিন্ন করার সাধনা কই সাধ্য কোথায়
তুই নিজে না মুক্তি দিলে এ জাল থেকে মুক্তি কে পায়।

আমার ত মনে হয় এ দুটি পংক্তি অসাধারণ সৃষ্টি, ছন্দের বিচারে নিটোল, কাব্য-সৌন্দর্যে অনন্য, ভক্তিগীতির সমর্পিত আকুতিতেও অনবদ্য—অথচ কবি নজরুল দ্বিধাহীন চিত্তে এগুলি বর্জন করে লিখলেন'

চতুর যে মীন সেই জানে মা জাল থেকে কি মুক্তি আছে?
তাই জেলে যখন জাল ফেলে সে লুকায় জেলের পায়ের কাছে।

সংগীতটির পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে ধীরব-জীবনের পটভূমিতে, এর ভাব উপমা উৎপ্রেক্ষা সব কিছুই গৃহীত হয়েছে এ-জীবন থেকে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ চরণে এ-জীবন যথাযথ উপমিত না হওয়ায় কবি অস্বস্তি বোধ করেছেন, ছন্দ-কাব্যগুণ আকৃতিতে বৈশিষ্ট্যোজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের কবি-সত্তা অতৃপ্ত থেকেছে, পুনর্লিখিত পংক্তি দুটিতে যখন মীন-জাল জেলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবে ফিরে এসেছে নীরব পাণ্ডুলিপির বুকে, কবির তৃপ্ত হৃদয়ের মধুর গুঞ্জরণটি আমরা অনায়াসে শুনতে পেয়েছি। সুতরাং হীরকোজ্জ্বল পংক্তি দুটিকে কবি অবহেলায় খোলস বদলের মত পরিত্যাগ করেছেন। বর্জন ও পুনর্লিখনের মাধ্যমে এভাবে গীতিকার নজরুল প্রায় তাঁর সকল গানে দুর্নিবার গতি ও প্রাণ সঞ্চার করেছেন। পাণ্ডুলিপির এসব খবর না জেনে, এই সংশোধন ও সংযোজনার সংবাদ না রেখে যে সব সমালোচক (?) এই যুগান্তকারী সংগীত-প্রতিভার উপর অহেতুক অশালীন দোষারোপ করেন, তারা আর যাই হোক সুস্থ মনোভাবের পরিচয় দেন না। আমরা আশা করব এ সব অসত্য একমুখী প্রচার বন্ধ হবে।

একটি অপ্রকাশিত ইসলামী সংগীতের মূল পাঠ ঃ ১ম পাঠ

বক্‌রীদ্‌

১. (কোর্‌বাণী দে তোরা কোরবাণী দে)
২. (শোন্‌ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে। ওরে—)
৩. (ভোগের এ ঈদ নহে, ত্যাগের এ ঈদ ত্যাগের)
৪. শেয়র্‌ ॥ নতুন চাঁদের তকবীর শোন্‌, কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন
৫. (আবার নভে) আস্‌মানে ফের ঈদজ্জোহার চাঁদ উঠেছে মুসলেমিন।
৬. (ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে)
৭. এল স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদজ্জোহার এই সে চাঁদ
৮. তোরা ভোগের পাত্র ফেল্‌রে ছুঁড়ে ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ ॥
৯. কোরাস্‌ ঃ — কোর্‌বাণী দে তোরা কোরবাণী দে
১০. (শোন্‌ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে ॥)
১১. (শুনেছিলেন খোদার আদেশ স্বপনে)
১২. (এমনি) এই সে চাঁদে ইবরাহিম স্বপনে
শুনেছিলেন খোদার আদেশ গোপনে
১৩. (প্রিয়তম পুত্রে তাহার কোর্‌বাণী দিতে)

১৪. (ভক্তি ও ত্যাগের তাঁর নিতে আজ্‌মায়েশ্‌)
১৫. (পুত্রে দিতে কোর্‌বাণী)
১৬. ভক্তি ও ত্যাগের তার পরীক্ষা নিতে
১৭. প্রিয়তম পুত্রে কহেন কোর্‌বাণী দিতে
১৮. কোরাস ঃ—কোর্‌বাণী দে ওরে কোরবাণী দে
১৯. শোন্‌ খোদার তাকিদ শুভ্র এ বক্‌রীদে।।
২০. (কি হবে রে বনের পশু কোর্‌বাণী দিয়ে)
২১. (যা)
২২. (তোর যা) প্রাণের যা তোর প্রিয়তম আজকে সে সব আন্‌
২৩. খোদার রাহে আজ তাহাদের কর্‌রে কোর্‌বান।
২৪. কি হবে ঐ বনের পশু খোদারে দিয়ে
২৫. (কর খোদার)
২৬. কাম ক্রোধাদি মনের পশু জবেহ্‌ কর্‌ নিয়ে
২৭. কোরাস ঃ—কোর্‌বাণী দে তোরা কোর্‌বাণী দে
২৮. (শোন্‌ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে।)
২৯. (তশ্‌তরী ভর্‌ বিলিয়ে দেওয়ার খুশীর শির্ণীতে,)
৩০. বিলিয়ে দেওয়ার খুশীর শির্‌ণী তশ্‌তরীতে আজ,
৩১. পর্‌রে তোরা পরম ত্যাগের রঙীন পিরাহান
৩২. (হব ইসমাইলের প্রায় জবীহুল্লাহ্‌ সবে)
৩৩. মোদের যা কিছু প্রিয় বিলাব সবে
৩৪. নবীর উম্মত তবে সকলে কবে।
৩৫. কোরাস ঃ—কোরবাণী দে তোরা কোরবানী দে
৩৬. (শোন্‌ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে।)

রেকর্ডের পাঠ ঃ ২য় পাঠ

নতুন চাঁদের তকবীর শোন্‌, কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন।
আসমানে ফের ঈদজ্জোহার চাঁদ উঠেছে মুসলেমিন।।
এল স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদজ্জোহার এই সে চাঁদ,
(তোরা) ভোগের পাত্র ফেল্‌রে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ ॥
কোরাস ঃ কোরবানী দে তোরা কোরবানী দে ॥
প্রাণের যা তোর প্রিয়তম আজকে সে সব আন
খোদার রাহে আজ তাহাদের কররে কোরবান।

কি হবে ঐ বনের পশু খোদারে দিয়ে
(তোর) কাম ক্রোধাদি মনের পশু জবেহ্ কর্ নিয়ে ॥
কোরাস ঃ কোরবানী দে তোরা কোরবানী দে ॥
বিলিয়ে দেওয়ার খুশীর শির্‌ণী তশতরীতে আন্
পররে তোরা পরম ত্যাগের রঙীন পিরাহান,
মোদের যা কিছু প্রিয়, বিলাব সবে,
নবীর উম্মত তবে সকলে ক'বে।
কোরাস ঃ কোরবানী দে তোরা, কোরবানী দে ॥

যে পাঠ গৃহীত হওয়া উচিত ঃ ৩য় পাঠ

নতুন চাঁদের তক্‌বীর শোন্, কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন।
আসমানে ফের ঈদজ্জোহার চাঁদ উঠেছে মুসলেমিন ॥
এল স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদজ্জোহার এই সে চাঁদ,
(তোরা) ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ ॥
কোরাস ঃ কোরবানী দে তোরা কোরবানী দে,
শোন্ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে ॥
এই সে চাঁদে ইবরাহিম স্বপনে
শুনেছিলেন খোদার আদেশ গোপনে ঃ
ভক্তি ও ত্যাগের তার পরীক্ষা নিতে
প্রিয়তম পুত্রে কহেন কোরবানী দিতে ॥
কোরাস ঃ কোরবানী দে তোরা কোরবানী দে,
শোন্ খোদার তাকিদ শুভ এ বক্‌রীদে ॥
প্রাণের যা তোর প্রিয়তম আজকে সে সব আন,
খোদার রাহে আজ তাহাদের কররে কোরবান্।
কি হবে ঐ বনের পশু খোদারে দিয়ে
(তোর) কাম ক্রোধাদি মনের পশু জবেহ্ কর নিয়ে ॥
কোরাস ঃ কোরবানী দে তোরা কোরবানী দে,
শোন্ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে ॥
বিলিয়ে দেওয়ার খুশীর শির্‌নী তশ্‌তরীতে আন
পররে তোরা পরম ত্যাগের রঙীন পিরহান,
মোদের যা কিছু প্রিয়, বিলাব সবে,
নবীর উম্মত তবে সকলে ক'বে।

কোরাস ঃ কোরবানী দে, তোরা কোরবানী দে,
শোন্ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে।।

এ অপ্রকাশিত ইসলামী সংগীতটির তিনটি পাঠ আমরা পর পর উদ্ধৃত করলাম। একে অপ্রকাশিত বলেছি এ কারণে যে রেকর্ডে গৃহীত পাঠটি কোথাও কোথাও প্রকাশিত হলেও, সম্পূর্ণ পাঠটি (যে পাঠ গৃহীত হওয়া উচিত) আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তিন পাঠ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাচ্ছি ১ম পাঠ ৩৬ পংক্তির, ২য় পাঠ ১৫ পংক্তির এবং ৩য় পাঠ ২৪ পংক্তির। রেকর্ডের সময়সীমা রক্ষার খাতিরে কোরাস অংশ থেকে 'শোন্ খোদার তাকিদ তোরা এ বক্‌রীদে' এই সুন্দর পংক্তিটিকে কবি একেবারে নিষ্ঠুরতায় দ্বিখণ্ডিত করেছেন এবং একই কর্তব্যের খাতিরে প্রথম পাঠের দশ থেকে একুশ চরণ দ্বিতীয় পাঠে বর্জিত হয়েছে। আমার মতে এই নির্ভুল পংক্তিগুলি রক্ষিত হওয়া উচিত এবং যা আমরা তৃতীয় পাঠের 'কোরাস' অংশে এবং দ্বিতীয় স্তবকে সংরক্ষিত করেছি। এই সংরক্ষণের পরও তৃতীয় পাঠ ২৪ পংক্তির, সুতরাং মূল রচনা থেকে বারটি চরণ অপসারিত ।

১. আবদুল আজীজ আল্-আমান সংগৃহীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থ।
২. দুঃখ হয় এদেশে কেন জন্মালাম—এই নিন্দুকের দেশে—। মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে ' ... তবুও এই মানুষ — এই পশুর জন্য আমি গান গাই।' — নজরুল

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — তৃতীয় সংকলন]

নজরুলের বিদ্রোহ ঃ বিদ্রোহের স্বরূপ-অন্বেষা

আহমদ রফিক

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা কবিতায় বিদ্রোহ-চেতনার পদচারণা-ঐতিহ্য সৃষ্টিতে অনন্য। কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিভার হাত ধরে এই ধারা উনিশ শতক পেরিয়ে একটি বলিষ্ঠ স্রোতের সুনির্দিষ্ট প্রবহমানতায় নিজকে চিহ্নিত করেছে।

বাংলা কবিতায় বিষয়ে ও প্রকরণে সুস্পষ্ট অর্থময়তায় বিদ্রোহের প্রথম প্রকাশ ঘটিয়েছেন যশোরের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের বিদ্রোহ চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবং অবতারবাদের মহিমার বিরুদ্ধে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিহিত। মহাকাব্যের নায়ক দেবতার ভূমিকা থেকে মর্ত্যের ভালোমন্দে-মেশা রক্ত-মাংস-স্বেদ মিশ্রিত বাস্তবে অবতরণ করেই প্রচলিত বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শেষ করেনি, তার ভূমিকায় ফুটে উঠেছে ব্যক্তিক-চেতনার শৌর্যবীর্য পেরিয়ে স্বাদেশিক চেতনার প্রতীকী জ্বালা-যন্ত্রণা। সনাতন ঐতিহ্যাবৃত ও মহাকাব্যে নিন্দিত চরিত্রগুচ্ছের সংগ্রামে ও যন্ত্রণায় পরাধীন স্বদেশের মুক্তি স্পৃহা প্রতিফলিত। এই শৈল্পিক অভিনবত্বের প্রভাব সমকালীন বাংলাকাব্যে নতুন এক পথ রচনার মর্যাদা অর্জন করেছিলো। একটি বিশাল সম্প্রদায়ের প্রথাসিদ্ধ রক্ষণশীলতায় লালিত বিশ্বাসে আঘাত করে শৈল্পিক অভিনবত্ব অর্জন মিত্রাক্ষরের প্রচলিত বেড়া ভেঙ্গে সদর্প-বিচরণের চেয়ে অনেক অনেক কঠিন। কিন্তু বিষয়গত ও প্রকরণগত এই উভয় দিকেই মধুসূদন তার বিদ্রোহী-ভূমিকাটির সমাপন ঘটিয়েছেন এমন এক আবেগে, যার পেছনে ছিল প্রচলিত মূল্যবোধ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের সৎসাহস। এই বলিষ্ঠ মননশীলতাই মধুসূদনের কাব্যচেতনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যা প্রতীকী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য নতুন এক দিকদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই বিদ্রোহের স্বরূপ একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণ অর্থে অনেকেই হয়তো রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিদ্রোহের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চাইবেন। কিন্তু রাবীন্দ্রিক সৃষ্টির বিশদ বিচারে এর পর্ব-পর্বান্তরে বিদ্রোহের অন্তঃশীলা উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রথম থেকে প্রচলিত কাব্যস্বভাব ও কাব্যরূপে ভাঙ্গচুরের সূচনা, তাতো এক ধরনের শৈল্পিক বিদ্রোহের পরিণতি বটেই। আবার এর সাথে যুক্ত হয়েছিলো, তারুণ্যের বলদৃপ্ত ও জয়োদ্ধত প্রকাশ, এক-ব্যক্তিক ও সামাজিক চৈতন্যে গতিবেগ সঞ্চারী সৃষ্টির উদ্দীপনা। চেতনা-মথিত এই চারিত্রিক প্রকাশের পর্ব-পর্বান্তর

চলেছে নানারূপে, নানা রঙে। কখনো বেদুইন-জীবনের তীব্র প্রাণোচ্ছলতার আকাঙ্খা, কখনো নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বানে, আবার স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আফ্রো-এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী পদচারণার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট উচ্চারণে। তার সৃষ্টিপর্বের শেষদশক তো সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় মানুষের সপক্ষে এক মূল্যবান কাল-পরিসর। শুধু বিষয়গত মহিমার পূর্ণগত উত্তরণে এবং পর্যায়ক্রমিক আরোহনেই নয়, প্রকরণিক বিবর্তনের বাঁধভাঙ্গা মুক্তিতেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। শব্দ, ছন্দ ও ভাষার এবং আলংকারিতার বিভিন্ন উদ্যানে তার প্রতিটি সৃষ্টিপর্বেই নতুন সৃষ্টির দুঃসাহস ধরা পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র বিদ্রোহের স্বরূপ একান্তভাবেই অন্তঃশীলা ও প্রতীকী এবং সবসময় সশব্দ উচ্চারণে পরিস্ফুট নয় বলে এবং প্রধানতঃ শৈল্পিক পথে হার্দ্য উচ্চারণের গুণগ্রামে প্রতিফলিত বলে এর প্রকাশ সহজে দৃশ্যগোচর হয় না। এটা রবীন্দ্র-চেতনার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু নজরুলের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পরিক্রমার কালেই বিশের দশক থেকে বলদৃপ্ত আবেগের ঝড়ো গর্জন তুলে বাংলা কবিতার অঙ্গন সচকিত করে নজরুলের অভ্যুদয় বিদ্রোহের মশাল-চিহ্নিত পথে শুধু ধূমকেতুর পুচ্ছ তাড়নার ছটা, উল্কার আগ্নেয় আভা, আর ঝড়জলের অশনি-সংকেত। বিষয়ে ও প্রকরণে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে নজরুলের বিদ্রোহী প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে তাই এতই পরিস্ফুট, এবং এমন ধ্বনি-গম্ভীর যে অসতর্ক পাঠকেরও চিত্ত স্পর্শ করে, প্রাণে ঝংকার তোলে। বিদ্রোহের এই দৃশ্যময়, ধ্বনিময় ও আবেগময় প্রকাশের কারণেই বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুলই 'বিদ্রোহী কবি' রূপে চিহ্নিত; এবং বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ পেরিয়েই বিদ্রোহের মর্যাদায় অভিষিক্ত। এদিক থেকে নজরুল সর্বতোমুখী বিচারেও অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। এখানে একাধিক শব্দে বিশেষিত হবার যুক্তিসঙ্গত অধিকার তাঁর রয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বাস্তবিক পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রাবীন্দ্রিক-বিদ্রোহের সুচারু সুক্ষ্মতায় এবং সার্বিক বিচারে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে বিরাজমান পরিমিত ও গীতধর্মী হার্দ্য উচ্চারণের পটভূমিতে নজরুলই প্রথম সংযোজন ঘটালেন দামামার ক্রুদ্ধ ধ্বনির, তেজোদৃপ্ত আগ্নেয় উচ্চারণের। শব্দ যে কী ভয়ানক শক্তিমান, ভয়ংকর ধ্বনিময় ও কী ভীষণ চিত্রময় হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল নজরুলের রচনায়, কবিতায়, গানে, প্রবন্ধাবলীতে। 'নির্জীব অর্ধচেতনদের জাগিয়ে' তোলার ব্রতে উদ্দীপ্ত নজরুলের বলিষ্ঠ পদচারণা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে, হাতে-ধরা জ্বলন্ত মশালের আলো ধূমকেতুর পুচ্ছ-ছটার মতোই সেই অঙ্গনের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ ঝলসানির চমক নিয়ে।

কেউ কেউ মনে করেন, নজরুলের বিদ্রোহী পরিচয়ের পেছনে রয়েছে তাঁর বহুখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জনপ্রিয়তা। কিন্তু না, 'বিদ্রোহী'-খ্যাত নজরুলের বিদ্রোহ শুধুমাত্র অই কবিতার নিয়মভাঙ্গার বয়ানে ও সাগ্নিক উত্তাপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ চেতনার পরিচয় নিয়ে তাঁর বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে, এবং ঘটেছে আরো বিভিন্ন পথে। মনে হয় বিদ্রোহ ছিল তাঁর স্বভাবে, তার স্বভাববৈশিষ্ট্যে। তাই তাঁর বিদ্রোহ-চেতনা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিটি শাখা নানাভাবে স্পর্শ করেছে। আর যেখানেই এই স্পর্শ, সেখানেই জন্ম নিয়েছে উত্তাপ আর শক্তি। এইসব কারণে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমকাল অবধি দ্বিতীয় কাউকে পাই না, যাকে 'বিদ্রোহী' পরিচয়ে চিহ্নিত করতে পারি। বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী' বলতে তাই নজরুল ইসলামকেই বুঝায়, অন্য কাউকে নয়। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'ঝড়োযুগের মাঝে দিন বদলের পালায় দামামা বাজানোর' দায়টি নজরুলই নিয়েছিলেন এবং সার্থকভাবে নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ আরেকটি বিষয় অনুধাবন করার মতো। বিদ্রোহীর অভিনব উদ্ভাস নিয়ে নজরুলের দেশজোড়া খ্যাতির অধিকার একমাত্র রাজরোষের জন্যই নয়, যদিও 'অগ্নিবীণা' ছাড়াও কবির পাঁচ পাঁচটি বই, 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'চন্দ্রবিন্দু', 'প্রলয়শিখা', 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ হয়েছিলো, এবং একজন কবির এতগুলো বই নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় ছিল না; আসলে এই খ্যাতির প্রধান আকর্ষণ ছিল অন্য এক বিন্দুতে। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক রচনার অন্তর্নিহিত শাক্ত চেতনার উত্তাপ একদা এ দেশের হৃদয়মন জয় করে নিয়েছিলো; বিশেষ করে গোটা তারুণ্য ও যৌবশক্তিকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করেছিলো। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কবির আত্যন্তিক যোগসূত্রটিও এই পথে বাঁধা। তাই 'বিদ্রোহী কবি' রূপে তাঁর পরিচয় এ দেশের প্রতিটি শিক্ষিতজনার কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে।

বিদ্রোহের লক্ষ্য ও পথ,

যে বিদ্রোহের জন্ম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, পরবর্তী সময়ে তাকে দেখা গেছে নানা পথের যাত্রিকরূপে, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও মৌল বৈশিষ্ট্য ছিলো অই বিদ্রোহ। উপাদান তথা বিষয়গত এবং গুণগত চরিত্র বিচারে নজরুলের এই বিদ্রোহে বরাবরই দেখা গেছে বিভিন্ন প্রকৃতির এক কেলাসিত রূপ। বস্তুতঃ এইরূপ 'বিদ্রোহ' কবিতার অহমবোধের মুক্তিতেই তার দায় শেষ করেনি, পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং অই গণ্ডি ভেঙ্গে তার যাত্রা একাধিক মাত্রায়। তাই দেখতে পাই, নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা এর একাধিক অনুসত্তার বৈচিত্র্য নিয়ে এক সমন্বিত রূপে পরিস্ফুট। এর প্রতিফলন শুধু তার কবিতায় বা গানেই নয়, অন্যান্য রচনায়ও বিষয়গত ও প্রকরণগত এই উভয় দিকেই দৃশ্যমান রূপ নিয়ে উপস্থিত। এই বিদ্রোহ চেতনার বৈশিষ্ট্য নানা উপখাতে বেগবান হয়ে যেন এক সংক্ষুব্ধ মোহনার চরিত্র অর্জন করেছে।

নজরুল-মানসে বিদ্রোহের রূপ নানামুখী পথে বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রধান বিস্ফোরক লক্ষ্য ছিলো স্বদেশে বিদেশী শাসন ও আধিপত্যবাদের অবসান, তা সেই লক্ষ্য যে-পথেই অর্জিত হোক না কেন। সেই সঙ্গে ছিল অহম্-বোধের প্রাচীর-ভাঙ্গা মুক্তি, সামাজিক বৈষম্য ও সম্প্রদায়গত বিভেদের অবসান এবং নারী-স্বাধীনতা ও নারী জাগরণ ইত্যাদি বিষয়। এক কথায় তাঁর বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য নিঃসন্দেহে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান এবং ব্যক্তিক বৃত্তে চৈতন্যের মুক্তি, বাকী সব প্রথমোক্তেরই পার্শ্বমুখ।

উনিশ শতকের সাহিত্যের প্রধান ধারা যেখানে বিদেশী শাসনের সহযোগিতা, মধুসূদনে ও রবীন্দ্রনাথে যেখানে সাহিত্যে প্রতীকী বিদ্রোহ, যা স্বাদেশিকতার প্রাঙ্গনে জনমনে সহজবোধ্য নয়, সেখানে প্রচলিত ধারা ও ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে নজরুলের আবির্ভাব বিদ্রোহের দামামা বাজিয়ে, আবির্ভাব বিদেশী শাসন ছিন্ন করার অভিপ্রায় নিয়ে জাতীয় চারণ কবি রূপে। জাতীয় রাজনীতি যখন জনমনের আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে বিদেশী শাসনাধীনে ক্ষমতা ভোগের লিপ্সায় আকুল কিংবা আপোষবাদিতায় মগ্ন, তখন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ জাতির আত্মোপলব্ধির ডাক দিলেন নজরুল, যেমন কবিতায় তেমনি গদ্য রচনায় 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু'র অনলবর্ষী নিবন্ধাবলীতে। আহ্বান জানালেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার,

> জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনো সচেতন জাগ্রত জনসংঘকে চুপ করানো যায়?[১]
>
> ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজটরাজ বুঝি না, ... । ভারতবর্ষের এক পরমাণূ অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।...
>
> পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে।[২]

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আগুন-ঝরানো বলিষ্ঠ কণ্ঠে ডাক পাঠালেন দেশের তরুণ যুবশক্তির উদ্দেশে,

> ওঠ আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকাবাহী বীর সৈনিক দল। ওঠো তোমাদের ডাক পড়েছে—রণদুন্দুভি রণভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয় নিশান তুলে ধর।... পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে। ভেঙ্গে ফেল ঐ প্রাসাদ শৃঙ্গ... বল আমরা স্বাধীন।
>
> আমাদের বিজয় পতাকা তুলে ধরবার জন্য এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে।[৩]

স্বদেশের মুক্তি-আন্দোলনের সপক্ষে নজরুলের বিদ্রোহ এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন সম্পন্ন করেছে। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এবং প্রয়োজনে যুক্ত হয়েছে সংকীর্ণ সম্প্রদায় চেতনার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। এখানে কবি যেন তাঁর সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

স্বদেশ-মুক্তির অভিপ্রায় নিয়ে দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুস্থ ও সঠিক

সেকুলার পথে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় আচার-আচরণের গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহী বিস্ফোরণ যেমন তিক্ত তেমনি তীব্র, কখনো ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিষাক্ত। অসাম্প্রদায়িক মানবচৈতন্যের প্রতিভূরূপে, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির এক সংকর চৈতন্য রূপে নজরুল চাইলেন বিভক্ত, বিবদমান ও বৈষম্যপীড়িত এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের হাত থেকে বিষভাণ্ড কেড়ে নিয়ে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তাদের মিলিত পথযাত্রার বোধে উদ্দীপ্ত করে তুলতে। 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবি তাই লিখলেন,

> 'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত, সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার দুশমনীর ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।[৪]

আবার স্বাদেশিকতার পটভূমিতে নবযুগের আবাহনে কবির বলিষ্ঠ উদার-কণ্ঠে উচ্চারিত হলো,

> মানবতার এই মহান যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শুদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ, তুমি সত্য।[৫]

অনুরূপ বক্তব্য আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও, যদিও তা বিদ্রোহের চেতনায় সম্পৃক্ত নয়। তবে পরিণত বয়সে রবীন্দ্র-চেতনায় সম্প্রদায়গত বৈষম্য অবসানের তীব্র আকুলতা ও বাস্তব সমাধানের দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

সম্প্রদায়-চেতনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উত্তাপ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গার রক্তারক্তিতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ কবি'র মানবিক আহ্বান,

> হিন্দু, না, ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
> কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র। (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)

সম্প্রদায়গত বিভেদের মধ্যে সেকুলার জাতীয়তাবোধের সেতু-বন্ধনের আদর্শ ও কার্যক্রম চেতনায় ধারণ করতে পেরেছেন বলেই কবি অনায়াসে লিখতে পেরেছেন একদিকে অসাম্প্রদায়িক, সুস্থ ও বলিষ্ঠবোধের কবিতা (যেমন কাণ্ডারী হুঁশিয়ার)। আবার সেই সঙ্গে রচনা করেছেন উভয় সম্প্রদায়ের জন্য উদ্দীপক কবিতা। উদ্দেশ্য বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ ঘটানো। এরই এক দিকে রয়েছে কামাল পাশা, আনোয়ার, মহররম, কোরবাণী, শাত্-ইল-আরব ইত্যাদি কবিতা অন্যদিকে রয়েছে আগমনী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আনন্দময়ীর আগমনে ইত্যাদি কবিতা।

দেশপ্রেমিক জননায়ক কামাল পাশার সংগ্রাম ও বীরত্ব যেমন স্বদেশে বিদেশী

শত্রু বিনাশের পদ্ধতিগত প্রতীক, তেমনি কোরবানী বা মহররমের আত্মত্যাগ ও আদর্শগত প্রতীকে কবি আহ্বান জানান মুক্তির রক্তঝরা সশস্ত্র পথে শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে নেমে আসার। আহ্বান জানান দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের কাছে, বিশেষ করে দেশের তরুণ যুব সমাজের উদ্দেশ্যে,

(ক) ওরে সত্যমুক্তি স্বাধীনতা দেবে এইসে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!...
জোর চাই, আর যাচ্না নয়
কোরবানী-দিন আজ না ওই?...
কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ?
বল্‌-জুঝ্‌বো জান্ ভি পণ! (কোরবানী)[৬]

(খ) "ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা-
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহিনা।...
সকীনার শ্বেতবাস দেবো মাতা-কন্যায়,
কাসিমের মত দেবো জান রুধি অন্যায়! (মহররম)[৬]

'ধূমকেতু' পত্রিকার 'মহররম সংখ্যায়'ও কবি বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছেন রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহররমের আত্মত্যাগের আদর্শ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে। 'কামাল পাশা'তেও স্বদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামের পরোক্ষ ও প্রতীকী ইংগিত দৃষ্টি এড়ায়না,

দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে।
বেশ করেছে !!
শহীদ ওরা শহীদ! ইত্যাদি[৭]

অন্যদিকে অত্যাচারী শক্তির বিনাশের উদ্দেশে ঐতিহ্যবাহী দেবীর সংগ্রামীরূপের চিত্রও অনুরূপ স্বদেশ-মুক্তির সংকল্পে ধৃত,

মহামাতা ঐ সিংহ-বাঘিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে-
শাশ্বত নহে দানব শক্তি পায়ে মিশে যায় শির পশুর!
নাই দানব
নাই অসুর
চাইনে সুর
চাই মানব!-(আগমনী)[৮]

উদ্দেশ্যটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় (১ম, বা, ১২ শ সংখ্যা 'ধূমকেতু')। এখানেও কোরবানীর প্রতীকাদর্শে আত্মদানের ইঙ্গিত, যে আদর্শ তিরিশের দশকেও আধুনিক কবির লেখনীতে স্বীকৃত

আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা

বিদেশী শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তীব্র তীক্ষ্ণ কবিতাটি অবশ্য

শিল্পগুণে চিহ্নিত নয়,

'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
'ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,-আসবি কখন সর্বনাশী'?
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা![৯]

এই প্রসঙ্গেই আমরা দেখতে পাই তার বিদ্রোহ-চেতনায় মানবিকবোধের প্রতিফলন। এবং অই সূত্রেই দেখা যায়, তাঁর বিদ্রোহ সাধারণভাবে সামাজিক বৈষম্য, শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ, যা আবার সবিশেষ হয়ে উঠেছে নারীমুক্তি ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে, এক কথায় যেকোন ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য, শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উচ্চারণে। স্বভাবতঃই এমন একটা বিদ্রোহী-চেতনা যে বিত্তহীন কৃষক-শ্রমিক-পতিত মানুষের পক্ষে বাঙ্ময় হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে; বিশেষ করে যখন বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ তাকে স্পর্শ করে, এবং বন্ধু-সাহচর্য যখন এই মানসিকতায় উদ্দীপনা যোগায়! স্বভাবতঃই আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, বিশেষ করে কমরেড মুজফফর আহমদের সাক্ষ্য-অনুযায়ী, কেন একটি নিঃসঙ্গ সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্দেশে অভিনন্দন জানাতে তাঁর পক্ষে প্রলয়োল্লাসের প্রয়োজন হয়েছিল,

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ('প্রলয়োল্লাস', অগ্নিবীণা)

সামাাজিক বৈষম্য, নারীপুরুষ-বৈষম্য, এবং সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহী-বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'সাম্যবাদী'র কবিতাবলীতে, 'লাঙ্গল' 'গণবাণী' ইত্যাদি পত্রিকায় বিত্তহীন মানুষের পক্ষে আবেগ-দীপ্ত উচ্চারণে, এমন কি ফণীমনসার বনে কখনো কখনো রক্তিম ঝড়ের উদ্দামতায়। দুই একটি ছোট্ট উদাহরণরই যথেষ্ট হবে,

'জাগো জনশক্তি ! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা। তোমার হাতের এ-লাঙ্গল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক-উলটে ফেলুক। আর তোমার হাতুড়ি, ভাঙ্গো ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধুলায় লুটাও অর্থপিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙ্গল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তমাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা![১০]

ধর্মঘট উপলক্ষে 'নবযুগ'এ কবি লিখলেন,

শ্রমজীবী দলেও তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্র্যাসির জাগরণ এদেশে দাবানলের

> মত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রুখিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং করিবে।[১১]

ইউরোপে শ্রমজীবীদের অসন্তোষ, সংঘবদ্ধ হওয়া ও দাবী আদায়ে শক্তির প্রকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও দেখতে পাই তুলনীয়,

> য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকেরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে।[১২]

> তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল। আজ নির্ধনকেই বল লাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে।[১৩]

সর্বোপরি-ব্যক্তিক বিদ্রোহের বৃত্তে অহম্-বোধের স্ফূর্তি ও তার বাঁধ-ভাঙ্গা মুক্তির রূপ চরিত্র সেকাল থেকে একাল অবধি রীতিমত এক বিতর্কিত বিষয়। তবু আমাদের মনে হয়, 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে এই অহম্-বোধেরই অভিব্যক্তি, যা গণ্ডীবদ্ধ বেস্টনীর বাধা ছিন্ন করে আত্ম-উপলব্ধিতে সচেতন ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এমন এক অব্যাহত লড়াই চালিয়ে যেতে চায়, যার মাধ্যমে বিশ্বে জাতিগত ও সমাজগত অন্যায়-উৎপীড়নের অবসান ঘটতে পারে। অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতের হাহাকারে বাতাস আর ভারী হয়ে উঠবেনা। একমাত্র তখনি বিদ্রোহী-যাত্রার অবসান ঘটতে পারে,

> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা।
> অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রনিবেনা-
> বিদ্রোহী রণক্লান্ত
> আমি সেইদিন হব শান্ত। ('বিদ্রোহী', অগ্নিবীণা)

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ব্যক্তি-চৈতন্যের বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে এমন এক সর্বজনীন ও সর্বকালীন বিষয়, যা আদপেই স্তব্ধ হবার নয়, শেষ হবারও না এমন কি সমষ্টিগত বিদ্রোহের চেয়েও এর গুরুত্ব একদিক থেকে বরং কিছুটা বেশী। তত্ত্বগতসূত্রে কিংবা অভিজ্ঞতা আমাদের জানায় যে, বৈষম্য-পীড়িত সাধারণ সমাজে তো বটেই, এমন কি শ্রেণীবৈষম্য-অবসিত সমাজ কাঠামোতেও বৈষম্যের বীজ পুরোপুরি নির্মূল হতে চায় না; যেকোনো ধরনের শক্তির প্রশ্রয়ে বা ছায়ায় এর অংকুর দেখা দিতে পারে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সমষ্টিগত পর্যায়ে বিস্তার পেতে পারে। আর তখনি প্রয়োজন পড়ে এক ধরনের বিদ্রোহের, বলা যায় আত্মচৈতন্যের বিদ্রোহের, যা একদা নির্দ্দিষ্ট দেশ-কালে সাংস্কৃতি বিপ্লবের নাম নিয়ে জ্বলে উঠেছিল; নিঃশেষ করতে চেয়েছিল নব্যবৈষম্যজনিত আমলাতান্ত্রিক চেতনার আবির্ভাব। ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ নীতিগতভাবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সমষ্টিসত্তায় প্রসারিত বা রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা তাই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

বস্তুতঃ তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ বা ব্যক্তিক বিদ্রোহ নানা পথে কোনো-না-কোন নিগূঢ় সামাজিক কারণের মধ্য দিয়ে চিরায়ত অস্তিত্বে পৌছে যেতে পারে। চিরায়ত যদি

একে নাও বলি, অন্ততঃপক্ষে অবিচ্ছিন্ন এক সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়ার চলমানতায় যুক্ত হয়ে পড়ার মতো স্থায়িত্ব সে অর্জন করতে পারে। হয়তো এ জন্যই নজরুলের বিদ্রোহ-চেতনা তত্ত্বগত বা গুণগত কারণে বার বার আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক প্রয়োজনের আঙ্গিনা অতিক্রম করেছে। এমন কি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও নির্দিষ্ট বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে নজরুলের বিদ্রোহী-আহ্বান নব্যভুবন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় প্রভূত উত্তেজনা ও উদ্দীপনার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে।

নজরুলের বিদ্রোহী-চেতনার স্বরূপ-সন্ধানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে কোনো মহৎ শিল্পীর মধ্যেই কোনো-না-কোনো ধরনের বিদ্রোহের বীজ নিহিত থাকে, এবং এর অঙ্কুরিত প্রকাশও ঘটতে পারে; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর রূপ, এর চরিত্র ভিন্ন হতে পারে, এই যা। পূর্বসুরীদের অনুসৃত পথ থেকে সরে এসে ব্যতিক্রমী বিচরণ; পুরনো বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের অস্তিত্ব গুঁড়িয়ে দিয়ে ঐতিহ্যের নব রূপায়ন নিশ্চিতই এক ধরনের বিদ্রোহ, এবং তা হতে পারে শৈল্পিক বিদ্রোহ। শিল্প-সাহিত্যকে দেশ-সমাজ-সংস্কৃতির গুণগত রূপান্তরের কাজে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জড়তা, অন্ধতা, রক্ষণশীলতা এবং অনুরূপ অস্তিত্বের অবসান ঘটিয়ে নতুন সৃষ্টির উত্তেজনায় এক ধরনের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এক কথায়, শিল্প-সাহিত্যের বিষয়গত ও প্রকরণগত এই উভয় দিকেই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। বলাবাহুল্য, নজরুলের বিদ্রোহ শিল্পরূপের এই উভয় দিকেই প্রসারিত, তবে প্রথমোক্ত দিকেই যেন এর ব্যাপ্তি অধিক। শুধু 'বিদ্রোহী' বা 'ধুমকেতু' কবিতায়ই নয়, যথেষ্টসংখ্যক কবিতা ও গানে (যে গুলোকে আমরা বলতে পারি 'বিদ্রোহাত্মক' কবিতা-গান) এই বিদ্রোহের গুণ সঞ্চারিত; এবং তা আরো দেখতে পাই তাঁর গদ্য রচনায়, বিশেষ করে সামাজিক রাজনৈতিক লক্ষ্যের রচনায় কখনো সাংবাদিকতার জ্বালাময়ী লেখনীমুখে, এমনকি কখনো কথা-সাহিত্যে অর্থাৎ কয়েকটি অসফল উপন্যাসিকায়। নজরুলের বিদ্রোহ সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে এবং তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীতে এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নিবন্ধ ও প্রতিবেদনে, যেমন তীক্ষ্ণ এর শরাঘাত, তেমনি তীব্র এর জ্বালা।

বিদ্রোহের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্যে উত্তরণের মত ও পথের দ্বন্দ্ব নজরুলকে দ্বিধা সংশয় জনিত ভয়ানক অনির্দিষ্টতায় (বিজ্ঞানের পরিভাষায় non specificity) ফেলে দিয়েছিলো। বিদ্রোহের স্বভাবধর্মের সাথেও এই নির্দিষ্টতার ছিল নিগূঢ় সম্পর্ক। মত ও পথের অবিরাম দ্বন্দ্বে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি, তারই ডানায় ভর করে তাঁর বিদ্রোহ-চেতনা কখনো সমান্তরাল পথের নিশানায়, কখনো বা বিপরীত চরিত্রের পথ ধরে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেনি। কারণ তার লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট । যে-কোনে পথের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছে যাওয়াই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মত ও পথের নির্বাচনে ভেদাভেদ ঘুচে গিয়েছিল বলেই তাঁর বিদ্রোহ কখনো

দেখা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনুসারী। তাঁর মতো 'চির তিক্ত প্রাণে'র পক্ষেও সম্ভব হয়েছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে নির্বিচার সমর্থন জোগানো, চরকার প্রশস্তি গেয়ে দেশময় আলোড়ন তৈরি করতে; গান্ধীবাদকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রতিবেদন ও গান রচনা,

ঘোররে ঘোর ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।[১৪]

কিংবা অন্যত্র ছন্দ-ভাষা ও ভাবের অদ্ভুত সমন্বয়ে চরকা ও স্বরাজের কী গভীর মেলবন্ধন। সত্যই কবিতাটির শব্দ নির্বাচন ও ছন্দময়তা অপরূপ,

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণকায়
যায় অতীত
রক্তপায়
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায় ইত্যাদি ('প্রবর্তকের ঘুর চাকায়')

এমনি করে কবি এক সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ দলের পক্ষেও সমর্থনের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আবার গান্ধীবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতায় ও দুর্বলতায় ক্ষুব্ধ হয়ে চরকা-খদ্দরী রাজনীতির পঙ্গুত্বের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে লিখলেন,

সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি! ('সব্যসাচী')

যখন যেদিকে খুশী পা বাড়ালেও নজরুলের সর্বাধিক আকর্ষণ ছিলো সন্ত্রাসবাদের কণ্টকিত পথের রক্তিম ইশারায়। সন্ত্রাসবাদের রক্তঝরা পথের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ঘিরে তাঁর বিদ্রোহচেতনা ভয়ানকভাবে আকর্ষিত হয়েছে। এই পথেই তার চেতনা নিজেকে প্রসারিত করে দেবার গভীরতা অর্জন করেছে। রক্তমদের বিষপানে আর্ত চৈতন্যের কাছে ধরা পড়েছে 'মন্দির আজি বন্দীর ঘানি।' নিঃশঙ্ক চিত্তে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন,

মৃত্যু আহত মৃত্যুঞ্জয়
কে শোনাবে তারে চেতন মন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়।
('তূর্য নিনাদ', বিষের বাঁশী)

এসো বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ বিজলী-ঝলক ন্যায় অসির।
('আত্মশক্তি', বিষের বাঁশী)

কবি শিকল পরার ছলে শিকল ছিন্ন করার গান গেয়ে যুবশক্তিকে নির্ভয়ে কারাবরণ

ও প্রয়োজনে মৃত্যুবরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যবহারগত চাতুর্যে 'শিকল' শব্দটিকে যেমন সবিশেষ করে তুলেছেন, তেমনি একে করেছেন শক্তিমান, এর দেহে আরোপ করেছেন বিদ্রোহের গরিমা; শিকল হয়ে উঠেছে মুক্তি-সংগ্রামের পরোক্ষ প্রতীক, কর্মের উদ্দীপনা,

শিকলে যাদের উঠিছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনাগীতি তারি।

('বন্দনা গান'—ঐ)

আজি রক্তনিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহলবন্দী শৃঙ্খলে ......
ওরা দু'পায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে' গেল শিকল-ঝঙ্কারে, ('বন্দী-বন্দনা'—ঐ)

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের কর্‌ বরে বিকল ॥...
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,
এযে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা।
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ শরণ ॥

('শিকল পরার গান'—ঐ)

আবার 'ভাঙ্গার গান'—এ এই শিকলই অত্যাচারী শাসন-দণ্ডের প্রতীক, যা সন্ত্রাসী বিদ্রোহের শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলে একাকার করে দিতে হয়। সেখানে এই বিদ্রোহাত্মক শক্তিই প্রলয়-রূপে মৃত্যুকে আহ্বান জানাচ্ছে জীবনের আঙ্গিনায়, চাইছে সেই ভয়াল শক্তির সাহায্যে কারার লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেলার ডাকে প্রলয় বিষাণ বাজাতে,

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙ্গে ফেল্‌, কর্‌ রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকলপূজোর পাষাণ-বেদী! ('ভাঙ্গার গান')

প্রসঙ্গতঃ শব্দ ব্যবহারের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বিদ্রোহাত্মক প্রিয় শব্দাবলীর কোন কোনটিকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয়েছে একাধিক অর্থে বা প্রতীকে, বিশেষ করে বীর্যব্যঞ্জক শাক্ত কবিতাবলীতে। এই বিশিষ্ট ব্যবহারের ছোট্ট একটি উদাহরণ উপরে দেখতে পেয়েছি।

সন্ত্রাসবাদী চেতনার সাথে আত্যন্তিক মিল সত্ত্বেও নজরুলের বিদ্রোহধর্ম মাঝেমধ্যে এবং পর্যায় বিশেষে সাম্যবাদের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছে। এবং শ্রমিক কৃষক এবং বিত্তহীন ও পতিত মানুষের সপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, যা তার সাম্যবাদী

কবিতাবলীতে বিধৃত। 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরের গান', কিংবা 'শ্রমিক মজুর ' 'রক্ত পতাকার গান' ইত্যাদি বিভিন্ন কবিতায় এই বিশেষ চৈতন্যের প্রকাশ ঘটেছে,

> **গাহি সাম্যের গান—**
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান। (সাম্যবাদীঃ সর্বহারা)
> মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর্,
> গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙ্গার হাতুড়ি ধর্ ॥ ('শ্রমিক মজুর')

বিদ্রোহের উৎস

নজরুলের বিদ্রোহী-চেতনার পরিচয় প্রসঙ্গে ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত বলতে চেয়েছেন যে, মানবপ্রেমই নজরুলীয় বিদ্রোহের মূলে কার্যকরী, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক পথের বৈচিত্র্যময় পদচালনায় ধন্য,

> নজরুলের বিদ্রোহের উৎস তার সুগভীর ও প্রত্যয়োজ্জল মানবপ্রেম। তাই মানুষের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও অসংগতি তাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি এইসব বৈষম্য ও অসংগতির স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।[১৫]

অন্যত্র একই সুরে তিনি বলেছেন,

> তার বিদ্রোহের মূলে স্বভাবগত অকৃত্রিম মানবপ্রেম এবং সে প্রেমের প্রকাশ তার অন্তরের নির্দেশানুসারে।[১৫]

সন্দেহ নেই, মানবপ্রেম নজরুলের শিল্প-চেতনার একটি অবিসংবাদী উপাদান; কিন্তু আমাদের মনে হয়, মানবপ্রেম নজরুল-মানসের, বিশেষ করে তার বিদ্রোহী চেতনার প্রধান উপকরণ নয়; বরং তীব্র স্বদেশপ্রেমই সেখানে প্রধান, এবং নিয়ামক উপকরণ, যদিও এর প্রকাশ বিভিন্ন চেহারায়। এদেশে বিদেশী শাসনের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ তার স্বদেশপ্রেমেরই নামান্তর, যা আবার সাধারণ সূত্র হিসাবে সর্বপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ দেশের দারিদ্র্য, সর্বপ্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি সবকিছুই তো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরিণাম। এমন কি সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৈষম্যও। এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেমন স্বাদেশিকতার পটভূমিতে ধৃত, তেমনি আবার স্বাদেশিকতার প্রয়োজনেই আহ্বান জানাতে হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এবং যৌথ সংগ্রামের।

সাধারণ বিচারে মানবতাবাদীর (হিউম্যানিস্টের) চরিত্রধর্ম বিদ্রোহীর চরিত্রধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। মানবপ্রেমের প্রায়োগিক অভিব্যক্তিতেও তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, তিক্ততা,

প্রমত্ততা ইত্যাদি গুণের আবেগাধিক্য সাধারণ সূত্র হিসাবে প্রধান হয়ে ওঠেনা; বরং সহিষ্ণু ঔদার্য, ধীর স্থির প্রশান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ সেখানে মূল সুর হিসাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। আবেগের প্রমত্ত উৎসার, প্রখর ঝলসানি সেখানে অনুপস্থিত। শিল্পচেতনা, এমনকি সংস্কৃতিচেতনার ক্ষেত্রে এইসব সূত্রপথেই রবীন্দ্র-চেতনার সাথে নজরুল-চেতনার প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ঠিক যেমনটি দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস গান্ধীবাদের সাথে তার প্রিয় সহিংস সন্ত্রাসবাদের বিপুল পার্থক্যে। এখানে এদের অবস্থান প্রকৃতই একেবারে বিপরীত মেরুতে।

নজরুল তাই কোনো বিচারেই 'হিউম্যানিস্ট' নন, তার প্রধান পরিচয় 'বিদ্রোহী' রূপে, এবং সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহী রূপে। মানবপ্রেমের তথা মানবিকতাবাদের শান্ত স্নিগ্ধ দীপালোকের নম্র উদার আভার পরিবর্তে নজরুলের বিদ্রোহ-ধর্মী রচনায় ফুটে উঠেছে উগ্র তেজ, যন্ত্রণার অসহিষ্ণু উত্তাপ, অন্তর্দহনের তীব্র আঁচ, সর্বোপরি সন্ত্রাস আবেগের রক্তমদির গর্জমান কল্লোল। প্রচণ্ড গতিময় আবেগের উল্লাস বিদ্রোহীর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রাণস্পন্দনের আকুলতায় কম্পমান। কী কবিতায় কী গানে কী গদ্য নিবন্ধে এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য কোনোদিক থেকেই মানবিকতাবাদের চরিত্রগুণের সমান্তরাল নয়।

আসলে, তার বিদ্রোহ-চেতনার উৎস সন্ধানে মানবপ্রেমের প্রশ্নটি এসেছে সম্ভবত স্বদেশমুক্তির ব্যাপক ক্যানভাসে তার বহুপথ বিচরণের কারণে। মানবপ্রেমের সাধারণ পথের অনুসারী না হলে পরস্পর-বিরোধী পথচলা ও পথের অনির্দিষ্টতার মতো বহুবিধ এবং বহুবিচিত্র পথ-অনুসরণের ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন।

এই একটি পথেই তাঁর বিদ্রোহী-পদচারণার আপাত-বৈপরীত্য এবং স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা চলে। আসলে তাঁর মুখ্য বিদ্রোহাত্মক রচনার চরিত্রধর্ম ও সারাৎসার বিচার করতে হলে নিসংশয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসে বলতে হয়, নজরুল নীতিগতভাবে আপাদমস্তক একজন সন্ত্রাসবাদী, সন্ত্রাসবাদের চেতনা ও প্রেরণা তার প্রাণবায়ু। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙ্গার গান, প্রলয়শিখা এবং ধূমকেতু পত্রিকার নিবন্ধাদি, এমন কি উপন্যাসিকাগুলোও এই চেতনা ও দৃষ্টান্তই বহন করে।

রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রের বৈষম্য ও অসংগতির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ আসলে তার চেতনার তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালা যন্ত্রণারই অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ, উষ্ণ তরল আবেগের তেজোদীপ্ত অভিব্যক্তি। তার প্রতিটি বিদ্রোহাত্মক রচনায় এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকট। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর চিঠির জবাবে লিখিত বক্তব্যেও বিষয়টি স্পষ্ট। এমন কি পরোক্ষে হলেও লক্ষ্য করা যায় যৌবশক্তির প্রতীক সন্ত্রাসবাদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব,

> আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। ..... 'বিদ্রোহী'র জয়তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্কতিলক ব'লে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি।..... আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান

> গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে —যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা—সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।[১৬]

এতো গেল সামাজিক দিকের কথা, 'সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক' দিকের কথা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বদেশমুক্তির ক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তি অনেক বেশী দহনক্ষমতা সম্পন্ন; তাই একের পর এক তার কবিতার বই, তার নিবন্ধ গ্রন্থ, তার পত্রিকা সম্পাদনা সরকারী প্রশাসনের কাছে অসহনীয় হতে থাকে এবং সেগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যায়,

> এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক দেশ-সৈনিক হতে পারবে।....
>
> হে আমার অপ্রকাশ মহাবিদ্রোহী, তুমিই আবার বল দিয়ো। যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকাতলে তরবারি করে রক্ত-সৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি।...
>
> আমি প্রলয়ের, আমি প্রেমের নই। আমি রুদ্রের, আমি করুণার নই। আমি সেবার নই, আমি যুদ্ধের। আমি সেবক নই, আমি সৈনিক। আমি মঙ্গলের নই, আমি মৃত্যুর।[১৭]

এই 'তিক্ত শক্তি রুদ্র জ্বালা বিষদাহনের' প্রতীক তারুণ্যের অমিত শক্তি ও নির্ভীক আত্মত্যাগের প্রতি ছিল তার প্রবল নির্ভরতা। কবিতায়, গানে, প্রতিটি নিবন্ধে এই অনুভবের প্রকাশ,

> আমাদের কাছে প্রেম ভণ্ডামী, করুণা বিদ্রূপ, প্রণয় কশাঘাত, প্রীতি ভীরুতা।.......
>
> আমাদের বিবাহের লাল চেলি দেশ-শত্রুর রক্তরাঙা উত্তরীয়, ভীম তরবারি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের শয়ন সাথী, ফাঁসির রশি আমাদের প্রিয়ার ভুজবন্ধন। (বিষবাণী-ধূমকেতু, পৃঃ ২৪)

বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীতে এই সুর এমনি তীব্র, কখনো নৃত্য পাগল ছন্দোময় তার টানে তীব্রতর। তাই সঙ্গত কারণেই মনে হয়, নজরুল যখন যে পথের এ্যাডভেঞ্চারে মেতে উঠুন না কেন, তার প্রাণের টান সন্ত্রাসবাদের প্রতি, দেশের সন্ত্রাসবাদী যুবশক্তির প্রতি। তাই মানবপ্রেমের চেয়েও বিদেশী প্রভুত্ব উৎখাতের তীব্র আকাঙ্খা, সামাজিক অন্যায় ও রক্ষণশীলতা অবসানের তীব্র স্পৃহা নিয়ে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার অব্যাহত যাত্রা।

বিদেশী শাসনের অবসান-আশঙ্কায় উদ্ভুত তীব্র স্বদেশপ্রেমের উৎসে স্নাত নজরুলের বিদ্রোহী-চেতনা। এর উল্লিখিত বিচিত্র পথ-পরিক্রমার কারণ বুঝতে গিয়ে আমাদের পৌঁছাতে হয় কবির স্বভাবধর্ম বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে, যা বাস্তবিকই এক প্রচণ্ড আবেগতাড়না। এবং নজরুল সত্যই আত্যন্তিকভাবে এক আবেগ প্রধান চৈতন্যের শিল্পী। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নজরুল যেমন আবেগ-তাড়িত ব্যক্তিত্ব, তেমনি তার শিল্পীচৈতন্যের বিদ্রোহ সেই আবেগ-তাড়িত সত্তার প্রচণ্ড চাপময় উত্তেজনার

বহুমুখী বিস্ফোরণ, বলা যায় এক ধরনের শৈল্পিক 'ক্যাথার্সিস'। আর এই বিস্ফোরণ, আমরা আগেই বলেছি, নানামুখী হয়েও সূত্র হিসাবে দুই প্রধান ধারায়— ব্যক্তিসত্তার ও সমষ্টিসত্তার বিদ্রোহে লক্ষণীয়।

আমাদের বিশ্বাস, এই আবেগ তাড়নার কারণেই নজরুলের বিদ্রোহ সুনির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের আশ্রয়ে স্থিত হয়নি, স্থির হয়নি। দুরন্ত উল্কার মতো প্রচণ্ডবেগে ও আবেগে ছুটে চলতে চেয়েছে। সম্ভবতঃ এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিস্তর সাম্যবাদী কবিতা লিখেও, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও নজরুলের বিদ্রোহ রোমান্টিকতার আঙ্গিনা পেরিয়ে সাম্যবাদী বাস্তবতার মতাদর্শগত বৃত্তে আশ্রয় নেয়নি, সংযুক্ত হয়নি সাম্যবাদী আন্দোলনের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় স্থির-সহিষ্ণুতার সাথে। এখানে এসে ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তের বক্তব্যের সাথে আমরা একমত যে,

> নজরুলের বিদ্রোহ বিশেষ কোন মতবাদের খাতে প্রবাহিত নয়।... তার রোমান্টিক কবিচিত্ত মানুষের নির্যাতন লাঞ্ছনা শোষণ প্রভৃতি উচ্ছেদ করতে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। (নজরুল চরিত মানস)

বিদ্রোহের চরিত্রধর্ম

নজরুলের বিদ্রোহে মতাদর্শগত বৈচিত্র স্বভাবতঃই সংশয়বাদীর মনে প্রশ্ন তুলতে পারে যে, তার বিদ্রোহের স্বরূপ তার নিজের চোখেই যথেষ্ট স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল কিনা? তা না হলে সমষ্টিগত বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও কেন তিনি কখনো গান্ধীবাদীরূপে অহিংস চরকার সমর্থক, কখনো চিত্তরঞ্জনের স্বরাজদলের সঙ্গী, কখনো বা সাম্যবাদের রোমান্টিক সমর্থনে বাঙ্ময়, যদিও সন্ত্রাসবাদের প্রতি তার মানসিক টান ছিল পূর্বাপর। তার এই বহুধা বিচরণের মূলে যে তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, সে-সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তবে উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে আমাদের মনে হয়, সন্ত্রাসবাদের সাথেই ছিল তার বিদ্রোহীচেতনার আত্মিক সম্পর্ক, এবং একমাত্র সন্ত্রাসবাদের সাথেই তার বিদ্রোহীচেতনার সমীকরণ সম্ভব ছিলো।

নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার সাথে তার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে আরো একটি দিক বিচার্য, বিশেষ করে মতাদর্শগত স্থিতির প্রশ্নে। যে ধীর স্থির নিয়মতান্ত্রিক নিষ্ঠা ও আত্মিক নিশ্চিতি নিয়ে সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ যাত্রায় পথ কেটে কেটে এগিয়ে যাবার মনোধর্ম মতাদর্শগত বৃত্তে স্থিতির জন্য প্রয়োজন, সেই সহিষ্ণু ধৈর্য্য ও স্থৈর্য নজরুলের ছিল না। তার বিদ্রোহ তাই বড় চলমান, দ্রুত গতিশীল। এইসব মানদণ্ডের বিচারে নজরুল যেন স্বভাব-বিদ্রোহী— বিদ্রোহ তার স্বভাবে, এবং সেই স্বভাবেই তার শৈল্পিক চৈতন্যের মুক্তি, উত্তেজনার নিঃসরণ বা 'ক্যাথার্সিস'। এদিক থেকে বিদ্রোহী নজরুল, তার বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীর প্রতীকে বা তার অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা

'ধূমকেতু'র সারথীর প্রতীকে সত্যই যেন এক ধূমকেতু; যেমন আকস্মিক এর উদয়, প্রদীপ্ত বিচ্ছুরণ, তেমনি এর বিলয়। 'ধূমকেতু' 'অগ্নিবীণা'র অন্তর্ভুক্ত কবিতা হিসাবে কিংবা পত্রিকার নিবন্ধাদি রূপেও 'বিদ্রোহী' কবিতারই সহোদর, বলা যায় যমজ সহোদর, তবু বক্তব্যে শব্দচয়নে ধ্বনির দ্রুত ধাবমানতায় বিদ্রোহ-চেতনার ঘনিষ্টতার প্রতিভূ বলে মনে হয়।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক সৃষ্টিকর্মের চরিত্রে রয়েছে যৌবনের আবেগ-উচ্ছলতার চরম প্রকাশ, ভাবোচ্ছ্বাসের শীর্ষোন্নতি, যা তার বিদ্রোহের শাক্ত চেতনাকে বহন করেছে; নিরস বুদ্ধিচর্চার জ্যামিতিক হিসাব-নিকাশের চেয়ে স্বভাবধর্মে উৎসারিত আবেগময়তাই নজরুল-মানসের একটি অভঙ্গুর চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য। এই আবেগধৃত শক্তি-চেতনাই তাকে অশ্বারোহী সৈনিকের মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, যৌবনের প্রবল দাপটে সবকিছু অস্বীকার করার, সবকিছু ভেঙ্গে ফেলার স্পর্ধা জুগিয়েছে।

বিদ্রোহী-চেতনার শিল্পরূপ অনুধাবনের চেষ্টায়, এর অন্তর্গত গুণগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টায় দেখতে পাই, শুধু বিষয়গত ক্ষেত্রেই নয়, প্রকরণিক পথেও অর্থাৎ শব্দ, শব্দচিত্র, ছন্দ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রচলিত ধারার বাইরে পরিবর্তন ও অভিনবত্বের চমক, যা আমাদের চকিত করে তোলে। তোলে প্রকরণিক বিদ্রোহের কারণেও বটে।

এই প্রকরণিক বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে শব্দ ব্যবহারের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ প্রচলিত মিহি, স্নিগ্ধ, শান্ত ও কোমল শব্দের পরিবর্তে তপ্ত, তীক্ষ্ণ, বর্ণাঢ্য, শাক্ত ও খর উজ্জ্বল শব্দাবলী এবং শব্দচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে। বাংলা কবিতায় এই অভিজ্ঞতা অভিনব তো বটেই। অভিনব আরো এই কারণে যে এই প্রক্রিয়া, কবিতাকে শুধুমাত্র রোমান্টিক বর্ণময়তা, শক্তির ওজস্বিতা বা দহনকারী উত্তাপ বিচ্ছুরণেই শেষ হয়ে যায়নি, আরো একটি গুণগ্রাম সংযোজন করেছে, যা এর আগে কেউ করেনি। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার সাংস্কৃতিক তথা শৈল্পিক সাংকর্যের প্রতিফলন ঘটানো।

আর এই উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির শৌর্যবীর্য বা সংগ্রামের ইতিকথা এবং 'মিথ' প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করেছেন, ব্যবহার করেছেন সংশ্লিষ্ট শব্দাবলী। তাই ইসলামী ইতিকথা ও হিন্দু পুরাণ কিংবা এদের অনুষঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিদ্রোহাত্মক রচনাবলীর একটি অংশের শব্দ ও শব্দচিত্র-ভাণ্ডার। কখনো এককভাবে, প্রধানতঃ যৌথভাবে সাংস্কৃতিক সাংকর্য প্রকাশ পেয়েছে এইসব শব্দাবলী ব্যবহারের মাধ্যমে। তাই ' কোরবানী', 'মোহররম' ও অন্যান্য বিদ্রোহাত্মক বিদ্রোহের প্রতীকে ধৃত অন্যান্য ইসলামী ঐতিহ্যের কবিতায় যেমন হিন্দুদেবদেবী ও পুরাণ প্রসঙ্গ স্বাদেশিকতার প্রতীকে স্থান করে নিয়েছে, তেমনি একই উদ্দেশ্যে লেখা 'রক্তাম্বরধারিণী মা' বা 'আনন্দময়ীর আগমনে' ইত্যাদি কবিতায়ও স্বদেশমুক্তির প্রতীকের সাথে ইসলামী

শব্দাবলী স্বচ্ছন্দ আবেগে মিশে গেছে। এ বিষয়ে নজরুলীয় বিদ্রোহ সমস্ত সংস্কার ও রক্ষণশীলতার (তা যে কোনো সম্প্রদায়েরই হোক না কেন) উর্ধ্বে। ধরা যাক 'কোরবাণী' কবিতাটি। এখানে 'বোধন, ভৈরব, রুদ্র, প্রলয়বীণা, ডম্বরু, প্রহ্লাদ ইত্যাদি পুরাণ-অনুষঙ্গ-সমৃদ্ধ শব্দের উপস্থিতি বৈপরীত্য সৃষ্টির বদলে বরং জালিমের খুন, লোহু ইত্যাদির সাথে মিলে মিশে সত্য-গ্রহ-শক্তির উদ্বোধনই ঘটিয়েছে। বিষাণ ও বোধনের সাথে কিয়ামতের কোন খুন খারাবির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি,

'প্রলয়-বিষাণ' 'কিয়ামতে' তবে বাজাবে কোন বোধন?
সেকি সৃষ্টি-সংশোধন
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন্!
ওরে হত্যা নয় আজ সত্য-গ্রহ শক্তির উদবোধন। (অগ্নিবীণা পৃঃ ৫৩)

এই সাংকর্যের একটি চমৎকার এক-পংক্তির উদাহরণ,

তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন!...
আজ আল্লার নামে জান কোরবান ঈদের পূত বোধন।
(ঐ পৃঃ ৫২)

এখানে 'বলির পূত বসনে' বা 'পূত বোধনে' ঐতিহ্যের বিচ্যুতি ঘটেনি। আর নজরুলের বিদ্রোহে এটা ঘটে না বলেই একই কবিতায় কবির প্রশ্ন ঝলসে ওঠে, রহমান কি রুদ্র নন? (ঐ পৃঃ ৫১)। তাই 'মোহররম' কবিতায় 'হায়দরী হাঁক -এর পাশাপাশি শুনতে পাই 'দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা' (ঐ পৃঃ ৫১)। এমন কি 'খেয়া-পারের তরণী'র মতো নিখাদ ধর্মচেতনা-সমৃদ্ধ কবিতাও এই সাংকর্য থেকে রক্ষা পায়নি। এখানে দেখা যায় 'ওঙ্কার, ভৈরব, প্রলয়, রুদ্র' ইত্যাদি বহুব্যবহৃত শব্দাবলীর সংকর উপস্থিতি; অনুপ্রাসে বেজে ওঠে প্রলয় নাচন,

অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন!...
...নাচে পাপ সিন্ধুতে তুঙ্গ-তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ! (ঐ, পৃঃ ৪৯)

অন্যদিকে 'রক্তাম্বরধারিণী মা'র অত্যাচারী-বিনাশের অনুষঙ্গে আরবী-ফার্সী শব্দের জলতরঙ্গ বেজে উঠেছে,

মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝ'রে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিত।...
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা। (ঐ, পৃঃ ১৩)

শ্বেত হরিতকে লালে লাল করে তোলার তীব্র বাসনা নিয়েই নজরুলের বিদ্রোহ-

চেতনা প্রাণ পেতে চেয়েছে বলে 'আনন্দময়ীর আগমনে' ও স্বদেশমুক্তির দুরন্ত আবেগে শব্দ সাংকর্যের চেহারা দেখতে পাই, যা অস্বাভাবিকতায় দুষ্ট নয়,

লানত গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,
ধর্মধ্বজা উড়ায় দাড়ি 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে।
তাজ-হারা যার নাঙ্গাশিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি,
ধর্ম-কথা বলছে তারাই পড়ছে তারাই কেতাব-পুঁথি।...
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু মীর কাসিমের প্রাণ-বলিদান
চণ্ড! নিলি যোগমায়া রূপ বলল সবাই বিধির বিধান।
(নজরুল-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩২)

এমন কি একই কবিতায় কোরবানীর প্রতীকে সমান্তরাল বক্তব্যের চমৎকার প্রতিভাস ঘটান একটি মাত্র পংক্তির স্বাদেশিকতায় 'দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তিপূজা' এবং সক্ষোভে আঘাত করেন উভয় সম্প্রদায়ের দীন হীন গোলামী মানসিকতায়।

প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় অনুষঙ্গে ধৃত নয় এমন কবিতাদিতেও একই ব্যবহারে উল্লিখিত শব্দধর্মের প্রয়োগ পর্যাপ্ত,

(ক) আমি বজ্র, আমি ঈশানে-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার (অগ্নিবীণা, পৃঃ৭)
(খ) তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃস্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে! (ঐ, পৃঃ ৯)
(গ) ধরি বাসুকির ফণা জাপটি
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি! (ঐ,)
(ঘ) আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী' আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
(ঐ,পৃঃ ১০)
(ঙ) ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।
(চ) থৈ তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সব খাণ্ডব-দাহ চাই!
ওরে আয়!
কর কোরবান আজ তোর জান দিল আল্লার নামে ভাই,
ঐ দীন দীন-রব আহব বিপুল বসুমতী বোম ছায়!
(ছ) ওরে আয়!
বল্ 'জয় সত্যম পুরষোত্তম' ভীরু যারা মার খায়!
(জ) ঝুটা দৈত্যেরে নাশি, সত্যেরে
দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!

শুধু কবিতায় নয়, তার রাজনৈতিক রচনাবলীতেও, বিশেষতঃ 'ধূমকেতু'র রচনাবলীতে এই বৈশিষ্ট্যময় শব্দাবলীর মাধ্যমে স্বাদেশিকতার সাংকর্য সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহের

লক্ষ্যে প্রাণ পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে।

সাংস্কৃতিক সাংকর্যের প্রসঙ্গেই ভাবগত ও শব্দগত সাংকর্যের প্রশ্নে নজরুলীয় শব্দবৈশিষ্ট্যের একটি বহু-কথিত দিক অর্থাৎ তাঁর কবিতায়, তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারগত দক্ষতা ও শক্তিমত্তার উল্লেখ এসে পড়ে। এবং সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, নজরুলের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে হিন্দুপুরাণ ও অনুষঙ্গে ধৃত বিষয় ও শব্দাবলীই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে (অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারকে ব্যতিক্রম হিসাবে মেনে নিয়ে), ইসলামী সাংস্কৃতিক রূপক, প্রতীক, শব্দানুষঙ্গ বড় একটা আসেনি। যেটুকু এসেছে তাতে শক্তি, ওজস্বিতা, বিস্ফোরক রূপ ছিল না। নজরুলই প্রথম শক্তির বিস্ফোরক ব্যঞ্জনায় কবিতার চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই অভিনবত্ব সৃষ্টির দক্ষতায় রয়েছে এক ধরনের শৈল্পিক বিদ্রোহ, প্রকরণিক বিদ্রোহের রূপ, যার পেছনে রয়েছে কবির 'নিপীড়িতা দেশমাতার উদ্ধার', পরিকল্পনায় বিদ্রোহ-চেতনা। মধুসূদনের বেলায় এই বিদ্রোহ ছিল পয়ারের প্রাচীন বেড়া ভেঙ্গে অমিত্রাক্ষরের শক্তিমান পদচারণায় রৌদ্ররসের পরিবেশন, বিশেষ করে সঙ্গতিময় শব্দাবলীর তেজোদৃপ্ত, গম্ভীর ব্যবহারে কবিতার চরিত্রে শৌর্যবীর্যের গুণারোপ, চরণে চরণে গুরুগম্ভীর গর্জনধ্বনির সৃষ্টি। এদিক থেকে মধুসূদনের সাথে নজরুলের বেশ কিছুটা মিল লক্ষণীয়; যেমন উভয়ের চারিত্র-বৈশিষ্ট্য (স্বেচ্ছাধর্মে)[১] তেমনি ছন্দের অভিনব প্রবর্তনায়, পৌরুষদীপ্ত শব্দ ব্যবহারের স্বভাব সুলভ আকর্ষণে অনুপ্রাসের ধ্বনি-গম্ভীর রণনের প্রতি উভয়েরই আকর্ষণ লক্ষণীয়।

তবু সময়-সমাজ-পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে উভয়ের মধ্যে কিছুটা প্রভেদও চোখে পড়ে। মধুসূদনের যেখানে রৌদ্ররসের ওজস্বিতা, নজরুল সেখানে রুদ্ররোষের দহনজ্বালা, আগ্নেয়দীপ্তি। 'রুদ্র' শব্দটির উপর্যুপরি ব্যবহার এর কারণ নয়, বরং তার বিদ্রোহে-ধৃত শব্দাবলীর দহন ও বৈনাশিক শক্তির প্রকাশই এর কারণ। রুদ্র অর্থাৎ শিবের তৃতীয় নয়নে বহ্নিশিখার বৈনাশিক ও দাহিকা শক্তির কারণেই সম্ভবতঃ এই বিশেষ প্রতীকের প্রতি নজরুলের এত আকর্ষণ, এবং এই অনুষঙ্গে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে রুদ্রের জয়গান করেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন তাকে, তার আগ্নেয় শক্তির প্রকাশ ও পরিবেশনা সম্পন্ন করেছেন। বিদ্রোহচেতনা সমৃদ্ধ তার কবিতাগ্রন্থ (যেমন অগ্নিবীণা, চন্দ্রবিন্দু, প্রলয় শিখা) ও কবিতাবলীর, এমন কি গদ্য রচনার নাম থেকেও (রুদ্রমঙ্গল, ধূমকেতু ইত্যাদি) নজরুলের এই প্রবণতা, তার মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে শিবের রুদ্র নয়ন যেখানে জাতীয় গরিমার প্রতীক, নজরুল-কাব্যে রুদ্রনয়ন সেখানে আগ্নেয়শক্তি ও ধ্বংসের প্রতীক, যে শক্তির বিস্ফোরণ ধ্বংসের আয়োজনে পরাধীনতার আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে স্বাধীন স্বদেশ সৃষ্টির কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মধুসূদনে যা প্রতীকীরূপে সীমাবদ্ধ, নজরুলে তা পরিস্ফুট শক্তির

প্রমত্ততায় বেগবান, ভাঙনের নেশায় গর্জমান। রুদ্র ও অগ্নি শব্দ দুটোর এবং এদের বিভিন্ন প্রতিরূপী প্রয়োগ নজরুলের কাছে তাই এত প্রিয়, তার কবিতায় তাই এত বহুলদৃষ্ট। নজরুল-কাব্যের আগ্রহী পাঠকের কাছে পরিসংখ্যানটি কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে যে শুধুমাত্র 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতেই বিভিন্নরূপী 'অগ্নি'র উল্লেখ নয় বার, তেমনি রুদ্র-শিব এসেছে সাত বার, 'ধূমকেতু'তে প্রথমটি সাতবার, শিব রুদ্রও তাই। আর পুরাণ-অনুষঙ্গে ধৃত কবিতায় কিংবা ধূমকেতু পত্রিকার সারথী বয়ানে এই উল্লেখ অনেক, অনেক।

বিদ্রোহী নজরুলের এই দুটো প্রিয় কাব্য-শব্দ (অগ্নি ও রুদ্র) নিষ্প্রাণ উল্লেখে নয়, বরং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহারে মূল্যবান। এদের সাথে আরো কয়েকটি নজরুলীয় শব্দের উপস্থিতিতে বিদ্রোহের উন্মাদনার চিত্রন কাব্যরূপ পেয়েছে। এদের সার্থক ব্যবহার কবিতার শরীরে ফুটিয়ে তুলেছে তেজসঞ্চারী দহনজ্বালা, আবেগশিখার তীব্র উত্তাপ; উচ্চারণে ধ্বনিগম্ভীর বিচিত্র গর্জন—পাঠকের রক্তস্রোত নিঃসন্দেহে চঞ্চল করে তোলে, পাঠকমন উদ্দীপনার তীব্র জোয়ারে ভেসে যেতে দ্বিধা করে না,

(ক) মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ,... আমি ধ্বংস...
আমি ধূর্জ্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহীসুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!...
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

(খ) আমি হোমশিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!....
আমি কৃষ্ণকণ্ঠ, মন্থনবিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।

(গ) আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!

(ঘ) কৃতঘ্নী আমি কৃতঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি !
পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর
শোনরে মর শোন অমর!

'অগ্নি' বা 'রুদ্র'ই নয় শুধু; শক্তি চেতনা সম্বলিত যে সব বিস্ফোরক শব্দাবলীর ক্রিয়া ও প্রভাব নজরুলের বিদ্রোহকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত, উত্তপ্ত তেজোদীপ্ত ও তাৎপর্যময়, সেগুলোর একটি সুচয়িত তালিকা নজরুলের 'বিদ্রোহী শব্দাবলী' রূপে চিহ্নিত হতে পারে। হতে পারে এই জন্য যে, এইসব শব্দ বা শব্দচিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে ও প্রয়োগধর্মের মাধ্যমে বিদ্রোহের ব্যঞ্জনা ও গভীরতা, এমন কি ব্যাপকতা ও গুণগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এক একটি শব্দ তার বিভিন্ন প্রতিশব্দের ধ্বনি ও আবহে কবিতার শরীরে শক্তি ও গতির সঞ্চার করেছে ; কবিতার প্রতিটি উচ্চারণ জারিত করেছে বিদ্রোহের তীব্র রসে। বিভিন্ন প্রতিরূপে ব্যবহৃত কয়েকটি

বিদ্রোহ-জারিত শব্দ ব্যবহৃত প্রতিরূপসহ তুলে ধরা হলো,

অগ্নি/দাবানল/বৈশ্বানর/বহ্নি/আগুন/ অনল/
রুদ্র/ঈশান/ধুর্জ্জটি/পিনাকী/নটরাজ/ব্যোমকেশ/মহেশ/শিব/ভৈরব/মৃত্যুঞ্জয়
রক্ত/খুন/লোহু/রুধির
প্রলয়/ধ্বংস/বিনাশ
ভীম/ভয়াল/ভয়ংকর/ভীষণ
তলোয়ার/তরবার/তরবারি/শমসের/কৃপান/খাড়া/অসি
দামামা/দুন্দুভি/ডমরু/ভেরী (রণভেরী)/
হলাহল/গরল/বিষ/জহর
অসুর/দৈত্য/দানব
নাঙ্গা/উলঙ্গ
শিকল/শৃঙ্খল/
ধূমকেতু
শনি

আমার মনে হয় নজরুলের 'বিদ্রোহী শব্দাবলী' উৎসাহী গবেষকের জন্য আকর্ষণীয় বিষয়রূপে বিবেচিত হতে পারে। এদের ব্যবহারিক ঔচিত্য, কবিতার শরীরে গুণগত প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা-অক্ষমতা, অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি, সর্বোপরি একই শব্দের অন্যত্র ব্যবহারের তুলনামূলক বিচার নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এখানে আমরা প্রধান বিদ্রোহধর্মী শব্দগুলোকেই চিহ্নিত করেছি মাত্র।

বিশিষ্ট কিছু শব্দ, তীব্রতীক্ষ্ণ শাণিত শব্দের ঝকমকে দীপ্তি ও ব্যঞ্জনা, কিংবা অনুরূপ শব্দের ধ্বনিগম্ভীর পদচারণা বিদ্রোহের গুণগত অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে শক্তিসঞ্চারী সজীব, বলিষ্ঠ ও বেগবান শব্দাবলীর সংগ্রামী বৈশিষ্ট্য বিদ্রোহের শক্তিরূপ সৃষ্টি করেছে, সমাসবদ্ধতায় দৃপ্ত গাম্ভীর্যে ওজস্বিতার আবহ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি অন্যান্য প্রকরণিক গুণও বিদ্রোহের অভিব্যক্তিকে করেছে বিশেষত্বমণ্ডিত, সব মিলিয়ে নজরুলীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত কাব্যপ্রকরণ, শৈল্পিক গুণগ্রাম, যা একান্তভাবেই নজরুলের এবং নজরুলেরই।

একটু লক্ষ্য করলেই শব্দ-সাংকর্য ও শব্দের শাক্তরূপ ছাড়াও নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতায় চোখে পড়ে শব্দের অতিবিশেষিত রূপ, বিশিষ্ট চরিত্রের বিশেষণের বহুল প্রয়োগ, শব্দদ্বিত্ব বা খণ্ডবাক্যের পুনরুক্তিজনিত অভিব্যক্তির তীব্রতা। আবার এরই পাশাপাশি বর্ণময়তা বা শব্দবৈপরীত্য, কোমলে কঠিনে সেতু বন্ধনের চেষ্টা যা কখনো সরলতা কখনো দুর্বলতার পরিচায়ক।

নজরুল-সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি এড়াবেনা যে 'মহা' শব্দটির গুণগরিমামণ্ডিত শাব্দিক ব্যবহারের প্রতি নজরুলের সবিশেষ পক্ষপাতিত্ব। যেমন করে 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে 'চির' শব্দের প্রয়োগ। পূর্বোল্লিখিত শব্দটির বিশেষিত

রূপের সাহায্যে শব্দের শক্তিমত্তা ও বীর্যই নয়, অন্তর্নিহিত সন্ত্রাসী রূপটিও ফুটে উঠেছে। মহাপ্রলয়, মহাবিপ্লব, মহাবিদ্রোহী, মহাহুংকার, মহাকল্লোল, মহাবিশ্ব, মহাসিন্ধু, মহাকাল, মহাশঙ্খ, মহাভয়, ইত্যাদি শব্দের মহা'ঘাত শুধু আভিধানিক অর্থের প্রচণ্ডতা, প্রবলতা, বিশালতা বা আতিশয্যই প্রকাশ করে না, সেই সঙ্গে বাক্য-বাক্যান্তরে বিস্ফোরক ওজস্বিতা সৃষ্টি করে, যেন মুক্তি-সংগ্রামের দামামা বাজিয়ে পাঠকের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিদ্রোহের ডাক পাঠায়, রক্তপ্রবাহ দ্রুততর করে তোলে। শব্দের এই শক্তিমত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই নজরুল এদের ব্যবহারে প্রচণ্ড স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, বিশেষ করে তার বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীতে।

এই আকর্ষণীয় 'মহা'-ঘাতশুধু 'বিদ্রোহী' বা 'ধূমকেতু' কিংবা অনুরূপ কবিতায়ই নয়, 'ধূমকেতু' পত্রিকার সারথী-রচনায় এবং বিদ্রোহীধর্মী অন্যান্য গদ্য রচনায়ও বহুলদৃষ্ট। মার্চের ছন্দে যুদ্ধের জয়োল্লাসী পদচারণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে মুখর বহুখ্যাত 'কামাল পাশা' কবিতাটির গদ্য প্রারম্ভিকায় মাত্র দুটো বাক্যের স্বল্পপরিসরে মহাআহবে, মহাবাহু, মহাহর্ষে, বিশ্বত্রাস প্রভৃতি এতগুলো বিশেষিত শব্দের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার যে ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা পাঠকের চেতনায় আঘাত না করে পারে না। 'ধূমকেতু'র নিবন্ধ থেকে এমন উদাহারণ অজস্র তুলে ধরা যায়, যায় তার বহুখ্যাত কবিতার কোন কোনটি থেকেও। এগুলোতে মূর্ত হয়েছে নজরুল-রচনার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষণ ও বিশেষিত গুণগ্রামের প্রাচুর্য লক্ষণীয়,

> সেদিনকার মহা-আহবে গ্রীক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত...। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশা মহাহর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। (অগ্নিবীণা, পৃঃ ২৫)

কামাল পাশার উল্লেখে তিন তিনটি বিশেষণের প্রয়োগ এবং বাক্যগঠনে অতীব বর্ণপ্রিয়তা বা আতিশয্য-প্রীতি লক্ষণীয়, যা মূলতঃ রোমান্টিক চেতনারই প্রকাশ। একই চারিত্রধর্মের প্রকাশ পেয়েছে 'আনোয়ার' কবিতাটির গদ্য প্রারম্ভিকা, এবং এর গদ্য পরিশিষ্টে স্বাদেশিকতার প্রতীকী বর্ণনা আরো তাৎপর্যময়; রুদ্ধ আবেগ ছাড়া পেয়ে যেন উদ্বেল হয়ে উঠছে। আবার একই বর্ণনায় 'কাপুরুষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ' 'প্রলয় ডম্বরু-ধ্বনির মত হুঙ্কার' 'সিংহশাবকের মতো গর্জন' প্রভৃতি শব্দাবলীর পাশাপাশি 'হারা-মা-আমার' তারার পানে চেয়ে চেয়ে ডাকিবেন 'আসিবে সেদিন আসিবে' ইত্যাদি বাক্যাংশ বৈপরীত্যময় বোধের মধ্য দিয়ে নিছক রোমান্টিকতার চরম প্রকাশই প্রকট করে তুলেছে (অগ্নিবীণা, পৃঃ ৩৮-৪২,)

এই রোমান্টিক আবেগ নজরুলের রচনাতেই নয়, নজরুলের চিন্তাভাবনার সাক্ষ্য হিসাবে তার আপন জবানীতেও পরিস্ফুট। 'আমার সুন্দর' নিবন্ধে নজরুল বলছেন,

> নবযুগে তার শক্তিসুন্দর প্রকাশ এসেছিল, তা এল রুদ্রতেজে, বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন

সর্বপ্রথম হক সাহেবের 'নবযুগেই' কি লেখাই লিখলাম, পনের দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।' (ধূমকেতু পৃঃ ৫৫)

নজরুল-বর্ণিত সেই 'নবযুগ' এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করবে,

> আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহা উদ্বোধন।...ঐ শোনো শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ঐ শোনো মুক্তিপাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তিবিষাণ! ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙার নব -সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! (যুগবাণী, পৃঃ ১-২)

অন্যত্র 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয় নিবন্ধেও অই একই চরিত্রের প্রকাশ,

> ওরে আমার ভারতের সেরা, আগুন-খেলার সোনার বাংলা। কোথায় কোন্ অগ্নিগিরির তলে তোর অগ্নিসিন্ধু নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে পড়ল? কোন অলস-করা করুণার দেবতার বাঁশীর সুরে সুরে তোর উত্তাল অগ্নি-তরঙ্গমালা স্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ল।...ফুঁ দাও ফুঁ দাও এই নিরস্ত অগ্নিসিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ হিন্দোল উলসিয়া উঠুক। (ধূমকেতু পৃঃ ৩৬)

শুধু বাক্যধৃত তীব্র রোমান্টিক আবেগই নয়, পাঠক উদ্ধৃত মাত্র চারটি বাক্যে লক্ষ্য করতে পারেন নজরুলের অতি প্রিয় শব্দ 'অগ্নি'র উত্তাপ আর শিখা, একই শব্দের উপর্যুপরি প্রয়োগের মাধ্যমে অভিঘাত সৃষ্টির আকাঙ্খা। এমনি আরো দু'একটি নমুনা,

> হে আমার অজানা প্রলয়ংকর মহা সেনানী তোমায় আমি দেখি নাই, কিন্তু তোমার আদেশ আমি শুনেছি, আমি শুনেছি।...
>
> হে আমার অনাগত অব্যক্ত মহাশক্তি! বাজাও, বাজাও, আমার কণ্ঠে তোমার প্রলয়শিঙা বাজাও।...
>
> হে আমার অপ্রকাশ মহা বিদ্রোহী, তুমিই আবার বল দিয়ো। (ঐ পৃঃ ৩৭)

নজরুলের বিদ্রোহী উদ্দীপনায় সৃষ্ট কাব্যভুবনের সাথে তার গদ্যের ভুবনও যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, এবং এই দুই ভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি যে মূলতঃ একই উৎসের অবদান, সে কথার প্রমাণ মিলবে তার বিদ্রোহী চেতনার কবিতাবলীর সাথে সমান্তরাল গদ্য রচনা মিলিয়ে পড়ে দেখলে, এবং এই দুইয়ের তুলনামূলক বিচারে; ঠিক যেমনটি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-পর্বের ছোটগল্প, ছিন্নপত্রের বয়ান ও সমকালীন কবিতাবলীর মূল ভাব, অভিব্যক্তি ও উৎসবিন্দুর তুলনামূলক বিচারে পরিস্ফুট আশ্চর্য সমান্তরালতায়।

'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত সারথীর প্রতিবেদনের বিশেষ একটি অংশে প্রতিফলিত বিদ্রোহের উচ্চারণ, তার ভাবগত ও শাব্দিক চরিত্র নিম্নরূপ,

এস আমার রুদ্র তাপস তরুণের দল! অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বলা রুদ্র চুল্লীর মধ্যে তোমাদের নব সৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তোমাদের এই রুদ্র তপস্যার প্রভাবে সকল নরকাগ্নি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে যেমন ইব্রাহীমের পরশে নমরুদের জাহান্নাম, ফুল হয়ে হেসে উঠেছিল।...শনি হবে আমাদের কপালে জয়টীকা, ধূমকেতু হবে আমাদের রথ, মরুভূমি হবে আমাদের মাতৃক্রোড়, মৃত্যু হবে আমাদের বধু।...গরল আমাদের তৃষ্ণার জল, দাবানল শিখা আমাদের মলয় বাতাস, জাহান্নাম আমাদের শান্তি-নিকেতন।...মহামারী, মারীভয়, ধ্বংস আমাদের উল্লাস। ইত্যাদি (ঐ পৃ-২)

উল্লিখিত অংশে অসাবধানী নজরুল-পাঠকেরও চোখ এড়াবেনা বহুপরিচিত নজরুলীয় শব্দাবলীর প্রাচুর্য, বহুচেনা শব্দবিন্যাস ও বাগভঙ্গি, আর ভাবগত দিক থেকে নজরুলীয় বিদ্রোহের উল্লাস, তপ্ত পরিবেশ। 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' এমন কি অনুরূপ কবিতাবলীর বক্তব্য ও শাব্দিক চরিত্রের সাথে সামান্য অবধানেই প্রচণ্ড একাত্মতা চোখে পড়ে। বিদ্রোহী নজরুলের অতি প্রিয় শব্দাবলী 'অগ্নি' 'রুদ্র' 'শনি', 'ধূমকেতু' 'দাবানল' ইত্যাদির এই ছোট্ট পরিসরে বার বার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

আরো দু-একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। 'নবযুগ'-এ কবি লিখলেন মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে, বিশেষ করে স্বদেশে বিদেশী শাসনের অন্যায় ও নীতি বিগর্হিত অবস্থানের প্রসঙ্গ তুলে,

এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন! মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? (যুগবাণী, পৃঃ৩)

অন্যদিকে 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের 'বন্দনা গান' কবিতাটিতে একই সুরে একই চিন্তার শাব্দিক প্রতিফলন ঘটালেন এই বলে, 'মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।'

তেমনি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকে প্রকাশিত বহুখ্যাত বিদ্রোহী কবিতার একটি চরণ,

'আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী'! মাত্র নয় মাস পরে 'ধূমকেতু'র মোহররম সংখ্যার নিবেদনে (১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) অনুরূপ উত্তাপ নিয়ে মহররমের ক্ষোভ মেটাতে 'কে আছ অরুণ খুনের তরুণ শহীদ' ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে তরুণদের উদ্দেশে আহবান জানালেন স্বদেশের মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে। কবিতা ও গদ্যের এমনি ভাবগত ও শাব্দিক পরামর্শ নজরুলের রুদ্রচেতনার রচনাবলীতে এন্তার দেখা যাবে। নজরুল-সাহিত্যের উৎসাহী গবেষক এদিকে চিন্তাভাবনার শ্রম নিয়োগে এগিয়ে আসতে পারেন, দেখাতে পারেন নজরুলের

বিদ্রোহী রচনার গদ্যে-পদ্যে তুল্যমূল্য চরিত্রের প্রকাশ।

বিদ্রোহের প্রতীকে শৌর্য-বীর্য তথা রুদ্ররসের কবিতায়, ক্ষোভ, ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশের উত্তপ্ত কবিতায় ছন্দ, শব্দ ও ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একই শব্দ বা বাক্যাংশ বা খণ্ড-পংক্তির উপর্যুপরি বা একাধিক ব্যবহার অই বিশেষ শ্রেণীর কবিতার এক ধরণের প্রকরণিক বৈশিষ্ট্য রূপে ফুটে উঠেছে। এতে অবগত দিক থেকে যেমন গুরুত্ব বা গভীর ছাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আবার পুনরুক্তিজনিত ধ্বনি-ব্যঞ্জনা প্রত্যয়-সিদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়ে উঠেছে। ছন্দবৈশিষ্ট্যের সাথে শব্দধ্বনির অভিনবত্ব নতুন, তির্যক ও আলাদা স্বাদ এনে দেয়। ধুন বা প্রতিধ্বনির মত শব্দ বা শব্দমালার একাধিক উচ্চারণ, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করেই শেষ হয় না, মশাল-মিছিলে স্লোগানের জমাট আবহ সৃষ্টি করে এগিয়ে যেতে থাকে। একাধিক অন্ত্যমিলের সাথে একই শব্দের বা শব্দমালার মিল শুধু ধ্বনি-সাম্যই আনেনা, তবলার বোলের মতো উপর্যুপরি আঘাত চৈতন্যে যেমন আঘাত হানে, তেমনি আবার চৈতন্য উদ্দীপ্তও করে,

> ঐ সে মহাকাল সারথী রক্ততড়িত চাবুক হানে,
> রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে!
> ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছটায় নীল খিলানে!
> গগন তলের নীল খিলানে। (অগ্নিবীণা, পৃঃ ৩)

আবার অন্যত্র ছোট ছোট পংক্তিতে এবং অসম পংক্তিতে অন্ত্যমিলে ধ্বনি-রণন অধিকতর শ্রবণ শোভন মনে হয়,

> খোল্ তোরণ,
> চল্ বরণ
> কর্ বো মা'য়
> ডর্ বো কায়?
> ধর্‌বো পা'য় কার্ সে আর
> বিশ্বমা'ই পার্শ্বে যার? (ঐ পৃঃ ১৮)

'আগমনী' কবিতাটির চতুর্থ স্তবকেও এমনি অসম পংক্তির ছন্দচাতুর্যে ধৃত ধ্বনির প্রসাদ পাঠকের তৃপ্তির কারণ হয়ে ওঠে। উপরিদ্ধৃত অংশের শেষ পংক্তি দুটো ধ্বনি মিলের খাতিরে মাঝখানে ভেঙ্গে নিলেও ক্ষতি ছিল না– কিন্তু তারচেয়ে বরং পংক্তির অসমতাই বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছে। বলা বাহুল্য, সমধ্বনির মিলে এসব ক্ষেত্রে একঘেঁয়েমি তৈরী হয়নি, বরং ধ্বনির চঞ্চলতা আরো প্রাণ পায় যখন এই সঙ্গে একাধিক অন্ত্যমিলের পারম্পর্য তাল সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অন্ত্যমিলের এইসব গন্ডীরা মিছিলের ধ্বনি সৌন্দর্যের সাথে পর্বান্তরে ধ্বনি-মিল যেন অতিরিক্ত পাওনা। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটির প্রতিটি স্তবক বিশ্লেষণে বিষয়গত সংহতির সাথে শব্দ ও

ধ্বনির এই সব কারুকার্যে প্রতিফলিত সুষমার যে পরিচয় ফুটে ওঠে, তাতে কবিতাটিকে নজরুল-কাব্যের অন্যতম একটি হীরকখণ্ড রূপে চিহ্নিত করা চলে।

পুনরুক্তিঘটিত ধ্বনি ব্যঞ্জনা ও অন্ত্যমিল যেমন মিছিলের দ্রুত পায়ে ছুটতে থাকে, তেমনি কখনো সেখানে ফুটে ওঠে ধীর-গতি-ছন্দে শ্লথ পায়ে চলার ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মাধুর্য। অনেকটা ঘরোয়া বৈঠকে ধীরতালের সঙ্গতের মতো, মৃদু হলেও দুর্বল নয়,

ভুলে যাও শোক—চোখে জল ব'ক
শান্তির আজি শান্তি-নিলয় এ-আলয় হোক!
ঘরে ঘরে আজ দীপ জ্বলুক!
মার আবাহন-গীত চলুক!
দীপ জ্বলুক!
গীত চলুক!! (ঐ, পৃঃ ১৯)

ছোট বড় পংক্তিতে ছয় ছয়টি অন্ত্যমিলের ধ্বনি—সুষমার সাথে দ্বিতীয় পংক্তিতে একাধিক পর্ব-গত-মিল-জনিত ধ্বনির চলমানতা আমাদের চমৎকৃত করে তোলে।

শুধু পংক্তি-শেষের তথা অন্ত্যমিলের গৌরবেই নজরুলের বীরত্বব্যঞ্জক কবিতাবলীর ভাব ও সুর বাঁধা নয়। বরং বলবো, নজরুলীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক পর্ব-পর্বান্তরের মিল, ধ্বনির অনুরণন যদিও সেই সঙ্গে প্রায়শঃ ছোট বড় পংক্তির অন্ত্যমিল ঐ সব অনুপ্রাসের ঝনঝনার সাথে একাধারে বৈচিত্র্য ও সঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। আমার মনে হয় স্বদেশপ্রেমের তীব্র আবেগের সাথে শক্তিচেতনার সঙ্গতি বিধান এইসব কারুকার্যের জুড়ি নেই। 'কামাল পাশা'য় প্রায় সর্বত্র এ ধরনের দ্বিঘাত বা ত্রিঘাত শব্দধ্বনি আমাদের চকিত চমকিত করে তোলে; সেই সঙ্গে উদ্দীপ্ত এবং উজ্জীবিতও করে তোলে। 'আনোয়ার' কবিতাটিতেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়,

ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা
ওদের হল্লা শুধু হল্লা (ঐ পৃঃ ২৮)
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর-বাড়ী সব সামাল!
ঘর-বাড়ী সব সামাল!! (ঐ, পৃঃ ৩৬)

আনোয়ার! আর না!
দিল কাঁপে কার না?
তলওয়ারে তেজ নাই! তুচ্ছ স্বার্ণা
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না?
আনোয়ার! আর না! (ঐ, পৃঃ ৩৯)

'খেয়াপারের তরণী'তেও অনুরূপ অন্ত্যমিলের তর্জন চমকপ্রদ। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ছত্রে এর প্রমাণ মেলে,

১. বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জিছে কে আবার?...
২. নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহা বিশ্বে,...
৩. প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!...
৪. দাড়ি-মুখে সারি গান—লা শরীক আল্লাহু ! ইত্যাদি

(ঐ, পৃঃ ৪৯-৫৯)

কিন্তু পর্ব-মিল বা অনুপ্রাসের ধ্বনি-গরিমা একমাত্র বিবেচ্য নয়, এমন কি প্রধান বিবেচ্য বিষয়ও নয়। কারণ, পর্বমিল তথা পংক্তির অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস ঝনঝনা নজরুল-পূর্ব বাংলা কবিতায়, এমন কি রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্র নাথে বহুলদৃষ্ট। পরিসর সংক্ষিপ্ত করণের অভিপ্রায়ে সমান্তরাল পংক্তিমালা উদ্ধার করা হয়নি। এখানে আমাদের বিবেচনায় নজরুলের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বের পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন এবং সেইসব শব্দ ও শব্দমালার ধ্বনিগত মিলের পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনা গভীর ব্যবহার, যা বিদ্রোহী চেতনার ভাবকে গভীরতা দিয়েছে, প্রসারিত করেছে, এবং আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির কাজে সহায়ক হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার নির্বাচিত শব্দমালা ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা, কান্না, মমতা, স্বদেশপ্রেম, ব্যক্তিপ্রেমের প্রতীকে দেশপ্রেম ইত্যাদি ভাবধর্মের সংশ্লিষ্ট আবেগ উচ্ছ্বাসের বাহন হয়ে উঠেছে। আর এই অভিপ্রায় পূরণের জন্যই নজরুলীয় জবরদস্ত শব্দ, তাৎপর্যময় শব্দ ও তেজোদীপ্ত বাক্যাংশের বার বার আসা, পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমন কি কখনো চতুর্থ বা পঞ্চম-ষষ্ঠ পংক্তিতে ফিরে ফিরে আসা, ফিরে এসে যেমন অন্ত্যমিলের ধ্বনি রনন ঘটানো, তেমনি আবার পংক্তির অন্ত্যমিল তথা পর্বান্তরে বিভিন্ন মাত্রার মিল অনুপ্রাসের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ঘনঘটা সৃষ্টি। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটি উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্ট, এবং হৃদয়ে বিদ্রোহীভাবের তরঙ্গধ্বনির কল্লোলিত আবেগের সৃষ্টি, এবং হৃদয়ে বিদ্রোহীধ্বনির দামামা বাজিয়ে সেই আবেগের তীব্র গতিময় মুক্তি ঘটানো। ঠিক এমনটি অন্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

এ জাতীয় শাব্দিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার, উল্লিখিত মিল-বৈচিত্র্যের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিঘটিত সুষমার আরো কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ, কখনো পর্ব শুরুতে কখনো পর্বমধ্যে বা পর্বান্তে সমধ্বনির ডম্বরু বাজানোর দৃষ্টান্ত পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। সেই সঙ্গে আনন্দদায়কও হয়ে উঠতে পারে।

আমরা তাই পরিতৃপ্তির সাথেই লক্ষ্য করি, প্রলয়-নেশার আকুল, ধ্বংসের প্রতীক অনাগত কাল কেমন 'ভয়ংকর হাসি' নিয়ে 'সিন্ধু-পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে' আগল ভেঙেই নিশ্চল হয়না, বরং চারদিকে সর্বনাশী ধ্বংসের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়, যেখানে,

অট্ট রোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর! (ঐ, পৃঃ ২)

পাঠক লক্ষ্য করবেন, শুধু পর্ব-মিলের গম্ভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিই এখানে একমাত্র কারুকার্য নয়, বরং সেই সঙ্গে শাব্দিক বৈশিষ্ট্য যেন ভয়ংকরের আবহ তৈরি করে দিয়েছে।

রণ-ভেরীর ভয়াবহ ধ্বনির নৃত্যচঞ্চলতাও এই একই শাব্দিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও সেখানে অনুপ্রাসের অব্যাহত বোলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে,

নাচ্ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ-থৈ।
থৈ তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই!—
কর্ কোরবান আজ তোর জান দিল্ আল্লার নামে ভাই।

শেল গর্জ্জন
করি' তর্জ্জন
হাঁকে বর্জ্জন নয় অর্জ্জন আজ, শির তোর চায় মা'য়।
সব গৌরব যায় যায়,
ওরে আয়।
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!

পাণ্ডবের খাণ্ডব দাহনের তাণ্ডব শুধু নৃত্যের তালে ধ্বনির অনুনাদ অর্জন করেই শেষ হয় না, এদের শাব্দিক বলিষ্ঠতা আকাঙ্খিত অনুষঙ্গও সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন করে কোরবানীর অনুষঙ্গে আত্মদানের পরিবেশ রচিত হয়, আবার পরবর্তী পংক্তিগুলোতে শেল ফাটানোর তর্জন-গর্জনের মধ্য দিয়ে স্বদেশের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণ দানের নির্দেশ রূপে কাড়া-নাকাড়া বাজাতে থাকে। ছন্দের সুকৌশলী এক ঠাস বুনোনিতে তর্জ্জন-গর্জ্জন বর্জ্জন অর্জ্জন ইত্যাদি শব্দগুলো নিজেরাই যেন এক একটি বারুদ-শেল, আর এদের তীব্রধ্বনির সাথে সঙ্গতের জন্যই যেন পরিবেশিত হয় কাড়া-নাকাড়ার ঘন ঘন দ্রিম দ্রিম বোল। পরবর্তী কয়েকটি পংক্তিও একই কারণে উদ্ধারণযোগ্য যেখানে বলিষ্ঠ শব্দধ্বনির পেশী সচ্ছলতা বীরত্বব্যঞ্জক রৌদ্র ঝলসানি এনে দেয়।

লক্ষ্য করার মতো যে, শব্দধ্বনির সমিল কম্পনে প্রায় প্রতিটি পংক্তির শরীর যেন স্বতঃস্ফূর্ত তেজ-বিস্ফোরণে স্পন্দিত, হিল্লোলিত! অন্তর্ধৃত শক্তির তাড়নায় আবেগের যে আলোক-বিচ্ছুরণ, এর দীপ্তি কবিতার ভাবচেতনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য তথা অনুভবগ্রাহ্য করে তুলেছে। শব্দের ঐশ্বর্য যে দীপ্তিমান হয়েও কী শক্তিমান হতে পারে তার প্রমাণ মেলে যখন নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা, কবিতার বিশেষ বিশেষ স্তবক ও পংক্তিমালা পাঠকের চেতনা সত্যই আলোড়িত করে তোলে। এই আলোড়ক ও উদ্দীপক শক্তির কারণ নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট শব্দের সঠিক ব্যবহার, আকাঙ্খিত ছন্দ-

কাঠামোয় যথাযথ স্থানে এদের ব্যবহার, শব্দের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার মিলনে পরিতৃপ্তির উদ্ভাসন।

ঝুটা দৈত্যেরে নাশি, সত্যেরে
দিবি জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোসী বীর, কঞ্জুসী লেখা আমাদের খুনে নাই।.......
মোরা অসি বুকে ধরি হাসি মুখে মরি' জয় স্বাধীনতা গাই।
(ঐ, পৃঃ ৪৬)

একটু ভিন্ন স্বাদের ধ্বনি মিল,

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্ত্য! (ঐ, পৃঃ১০)
আমি চপলাচপল হিন্দোল! (ঐ, পৃঃ ৬)
দামামা বাজানোর শক্তিধ্বনিময় আরেকটি তীব্র অনুভূতির আবেগধৃত পংক্তি,
ওরে শক্তিহস্তে মুক্তি, শক্তি, রক্তে সুপ্ত শোন। (ঐ পৃঃ ৫২)
এবং অনুরূপ পংক্তির সংখ্যা নজরুলের সন্ত্রাসী কবিতায় মোটেই অল্প নয়।

রোমান্টিক বিদ্রোহ

কিন্তু এই সব প্রকরণিক সার্থকতার পথে বিদ্রোহের যে গুণগত রূপ ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে শক্তির বিস্ফোরণ ও শাণিত বিদ্যুত ঝলসানি সত্ত্বেও রোমান্টিকতার বর্ণবিভা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মাত্র, অতি স্পষ্ট। আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক রচনাবলীতে (কবিতা ও গদ্য উভয়ই) শক্তি ওজস্বিতা ও বিস্ফোরক চরিত্রের পাশাপাশি আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য বর্ণাঢ্য শব্দ ও শব্দচিত্রের আধিক্য, বিশেষণ ও বিশেষিত শব্দের বহুলতা, সর্বোপরি আবেগের বহমান তারল্য, গর্জমান স্রোত— বলাবাহুল্য শৈল্পিক গুণগ্রাম বিচারে এসব রোমান্টিক চরিত্রেরই লক্ষণ; অবশ্যই রোমান্টিকতা নয়, সুস্থ বলিষ্ঠ শক্তি রোমান্টিকতার প্রকাশই মূল কথা। তার শব্দ ও ধ্বনির বহমান ঘনঘটায় চপল জলতরঙ্গের গরিমা সত্ত্বেও রোমান্টিকতা কিন্তু চরিত্রধর্মে রোমান্টিকতাই, অন্য কিছু নয়।

তাই যেমন কবিতায় তেমনি গদ্য পংক্তিতে প্রচণ্ডতা ও আতিশয্যসূচক বিশেষণের ব্যবহার কেমন স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, উল্লেখ ও উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি, 'কামাল পাশা' 'আনোয়ার' ইত্যাদি কবিতা ও অনুরূপ অন্যান্য রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে। উল্লেখিত হয়েছে 'মহা' শব্দটির বিশেষিতকরণের ও শব্দ গঠনের

তাৎপর্য, এবং যথেষ্ট উদাহরণ সহযোগে। এমন কি তুলে ধরেছি তার রোমান্টিক আবেগজারিত বাঞ্ছিত প্রিয় শব্দাবলী।

এ ছাড়াও রোমান্টিক চেতনার আরো কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। তার শাক্তচরিত্রের কবিতা তথা বিদ্রোহ-ধর্মী কবিতার মধ্যে তীব্রতীক্ষ্ণ প্রমত্ত শব্দের পাশাপাশি কোমল, নম্র অবৈপরিত্যময় চরিত্রের শব্দ বা পদ নির্দ্বিধায় স্থান করে নেয়। রক্তঝরার পাশাপাশি, আগুনের আবহে পুষ্পের কোমল বিনম্র হাসি দ্বন্দ্ব-জনিত নয়া সিনথেসিসের পরিচয় বহন করেনা, বরং তার বিদ্রোহের শক্তিচেতনার সাথে এবং আবেগ-সমৃদ্ধ রোমান্টিকতারই মিশ্রণ ঘটায়। এই বিশেষ সূত্রটি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যেখানে রোমান্টিক চেতনার সাথে নৈরাজ্যিক আবেগের প্রতিফলন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

তবে নজরুলের বিদ্রোহে রোমান্টিকতার উদ্ভাস সম্পর্কে একটি কথা বলে নিতে হয় যে, হয়তো এই রোমান্টিক গুণগ্রামের জন্যই নজরুলের বিদ্রোহধর্মী রচনাবলী সমকালে এমন প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জনের সৌভাগ্যে চিহ্নিত হয়েছিল, যা সমকালীন অন্য কোন কবির রচনার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এই বক্তব্যের জের টেনেই বলতে হয়, রোমান্টিকতার এই বৈশিষ্ট্য যদি কোনো নন্দনতাত্ত্বিকের চোখে কবিতার বিশেষ ধরনের নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুণ রূপে বিবেচিত না-ও হয়, তবু স্বীকার করতেই হবে, জাতীয় জীবনের বিশেষ পর্বে শিল্পকলায় জাতিসত্তার হৃদয়াবেগের উৎসারণ সাধারণ সূত্র হিসাবে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং নজরুলের বিদ্রোহাত্মক রচনাবলীতে এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটি সার্থকভাবে পালন করেছে অর্থাৎ এক কথায়, জাতীয় সত্তার আত্মনির্ভর চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি ও গতিবেগ সঞ্চারে গভীরভাবে সাহায্য করেছে। কেউ কেউ শিল্পসৃষ্টির এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার গন্ধ পেতে পারেন, কিন্তু সার্থক রচনা তাৎক্ষণিকতার প্রসারণ ঘটিয়ে চিরায়তের দ্বারপ্রান্তে পৌছাতে পারে, তেমন উদাহরণ মোটেই বিরল নয়।

অবশ্য কবিতা বা গানে অনেক সময় যা অভিপ্রেত নয়, তাই-ই আবার গদ্য রচনায় বিশেষ করে জনমন উদ্বোধনের ক্ষেত্রে ও আত্মসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনে কখনো কখনো অপরিহার্য হয়ে উঠে। বিষয়গত মহিমার পাশাপাশি তখন আরো প্রয়োজন হয় শব্দের উদ্দাম আবেগে, ধ্বনির চঞ্চল্য অভিঘাতে, বিশেষ বিশেষ বাক্যবন্ধের ব্যঞ্জনায় চেতনায় ঝড়ের সঞ্চরণ ঘটানোর। তপ্ত, সুঠাম, বলিষ্ঠ শব্দাবলী কখনো তাৎক্ষণিক আবেগে কখনো ঐতিহ্যের বা পুরাকথার প্রতীকে বজ্রবিদ্যুতের ঝলসানিতে শক্তি ও গতিবেগের সূচনা ঘটায়। শব্দরূপী শক্তিকণা যেন এক রাসায়নিক আকর্ষণে সন্নিবদ্ধ হতে থাকে, হতে থাকে এমন সব বাক্যবিন্যাসে যে ওরা কখনো কখনো চৌম্বক-বিন্দুতে পৌছে যেতে পারে, আর তখনি ঘটতে পারে শক্তির উত্তপ্ত বিস্ফোরণ, যা জনচেতনা অধিকার করে নেয়। সমাজচেতনা। তখন তার রূপান্তরের

জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সেখান থেকে আহরণ করতে পারে। এবং লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যাত্রা শুরু করতে পারে।

নজরুলের রাজনৈতিক কবিতা এবং রাজনৈতিক নিবন্ধাবলীতে, বিশেষ করে 'ধূমকেতু'র রাজনৈতিক আহ্বানে বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভবাণী আবেগদীপ্ত বর্ণবহুল ও সঞ্চারী শব্দাবলীর মাধ্যমে এমনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো যে সেই তাৎক্ষণিক সাফল্য বিচারে নজরুল যেন সম্রাট; তার তুলনা তিনি নিজেই। লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, তার শব্দ নির্বাচন ও বাক্যবিন্যাসের অগ্নিঝরা বৈশিষ্ট্য তখন আর ক্ষ্যাপা বাউলের উদাসী একতারায় ঝংকার তুলে পথ চলেনা, তার উচ্চারণে তখন ধ্বংসের বিষাণ বাজানো ইসরাফিলের হুংকার। নির্বাচিত শব্দ, ধ্বনি ও বাক্যবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য যেন হ্যামিলনের সেই বাঁশীওয়ালার মতো পথ চলে; এর আকর্ষণ সব সংকীর্ণতা, জড়তা স্বার্থপরতার অবসান ঘটাতে ঐতিহ্যের মিশ্র প্রতীকে সচেতন প্রাণে ঝড় তুলে এগিয়ে যায়, লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা জোরালো হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ বিদ্রোহ-চেতনা কেন্দ্র করে নজরুলীয় শব্দাবলীর তৎকালীন জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের একটি চমকপ্রদ দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে না করে পারে না। নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকা কেন্দ্র করেই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং নজরুলের জন্য একটি শ্লাঘার স্তরে উন্নীত হতে দেখি। অবাক হয়ে আমরা লক্ষ্য করি 'ধূমকেতু'র প্রকাশ উপলক্ষে রচিত ও প্রেরিত রাবীন্দ্রিক আশীর্বাণীতেও শব্দ ও ভাষায় যেন নজরুলীয়ানার চমক,

> আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
> আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
> দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
> উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
> অলক্ষণের তিলক রেখা
> রাতের ভালে হোক না লেখা
> জাগিয়ে দেরে চমক্ মেরে
> আছে যারা অর্ধচেতন!

অমন যে প্রশান্তির ও স্থৈর্যের প্রতীক রবীন্দ্রনাথ, তার এই কবিতাটিতেও 'অগ্নিসেতু' 'অলক্ষণ' 'অর্দ্ধচেতন' ইত্যাদি শব্দ-সমন্বয়ে যেন চাবুক হাঁকড়ানোর আওয়াজ শুনতে পাই।

বিপ্লবী বারীন ঘোষ তো কবিকে সম্বোধন করেছেন তাঁরই ভাষায় 'ভাই পাগল' বলে। লিখছেন,

...আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যারা মেকী, তাদের গোঁফ ও দাড়িতে

আগুন লাগিয়ে দিক; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যারা সাচ্চা সোনা তাদের খাদ পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলুক; আশীর্বাদ করি... ইত্যাদি

(ধূমকেতু, পৃঃ ৬)

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

কাজী ভায়া,

...রুদ্ররূপ ধরে ধূমকেতুতে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছ—ভালই হয়েছে। আমি প্রাণ ভরে বলছি— স্বাগত!...

...তুমি মহাকালের প্রলয় বিষাণ এবার বাজাও। অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙ্গ, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক। (ঐ, ঐ)

আশ্চর্য! এ যেন নজরুলের রচনা, তারই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি! 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র (৩০শে আগষ্ট, ১৯২২) মন্তব্যও ছিল প্রায় একই ধরনের। 'ধূমকেতু'কে চিহ্নিত করা হয়েছে ধ্বংসের প্রতীক রূপে, যে আবার পরিণামে সৃষ্টি করবে সুন্দরের।

আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা তার বিশিষ্ট শব্দাবলী ও কাব্যসম্ভারের সাহায্যেই সমকালীন বঙ্গদেশকে উন্মথিত করেছিলো, বাঁধ ভাঙ্গার ব্রতে প্রবল আবেগ সৃষ্টি করেছিলো। সত্যই সব রকম ক্ষুদ্রতা ও দীনতার ঊর্ধে উঠে সংগ্রামী উল্লাসের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নজরুলীয় বিদ্রোহী নয়া ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলো। 'ধূমকেতু'র বিশেষ সংখ্যার নামকরণ (যেমন মহররম সংখ্যা, দীপালী সংখ্যা, পূজা সংখ্যা ইত্যাদি) ও সমধর্মী চেতনার আগ্নেয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে সঠিক শরসন্ধানের পথে বেরিয়ে এসেছিল বিদ্রোহী আবেগের লাভা-প্রবাহ। এইসব শব্দময় উত্তাপ, ধ্বনির গর্জন, বাক্যবিন্যাসের তরঙ্গভঙ্গ রাতারাতি নজরুলকে তুলে দিয়েছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

নজরুলের বিদ্রোহ যখন যে-পথের এডভেঞ্চারে মেতে উঠুক না কেন, আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এর প্রাণের টান ছিলো সন্ত্রাসবাদের প্রতি, দেশের সন্ত্রাসবাদী যুবশক্তির প্রতি। নজরুলের বিদ্রোহী রচনাবলীর পাঠে এর প্রমাণ মেলে। আবার একই সঙ্গে ধূমকেতুর পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হয় না, সেখানে সন্ত্রাসী চেতনার শরীরে রোমান্টিক আবেগের কী গভীর উদ্ভাস, যেন গঙ্গা-যমুনার মিলিত প্রবাহ। কিন্তু এই সঙ্গে আরো দেখতে পাওয়া যায়, প্রচলিত ধারা লংঘনের আকাঙ্খা, আইন অমান্য করার দুর্বার স্পৃহা ; তার ভাষায়, 'আমি মানি নাকো কোন আইন' কিংবা 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ' অথবা 'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল, আমি...দারুণ স্বেচ্ছাচারী' ঘোষণা নানারূপে নানাভাবে নজরুল চেতনায় যেন অব্যাহত সঞ্জীবনী রস, যা বিদ্রোহী চেতনার উদ্দীপক উপকরণরূপে বরাবর বয়ে চলেছে।

নৈরাজ্যিক বিদ্রোহ

কিন্তু এই প্রত্যয় যে আসলে নৈরাজ্যিক বোধেরই অপর পিঠ, সে কথা রাজনীতি সচেতন শিল্পমনস্ক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারেন। এই নৈরাজ্যিক বোধের প্রকাশ শুধু তার রাজনৈতিক মত ও পথের দ্বন্দ্বজাত অনিশ্চয়তা বা অনির্দিষ্টতায়ই চিহ্নিত নয়, তার 'বিদ্রোহী' বা অনুরূপ কবিতার বৈপরীত্য-বোধেই প্রকট নয়, তার রাজনৈতিক রচনাবলী—বিশেষ করে ধূমকেতুর উদ্দীপক, তপ্ত নিবন্ধাবলীও আত্মবিরোধিতা ও বৈপরীত্যের মধ্যে প্রতিফলিত। 'ধূমকেতুর পথ' রচনায় নজরুল বলেছেন (২৬শে আশ্বিন, ১৩২৯),

> ...পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।
>
> আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!" (ধূমকেতু পৃঃ ৪)

আবার এই একই নিবন্ধে বলেছেন,

> বিদ্রোহ মানে কাউকে না-মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝিনা সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা।... ধূমকেতুর মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায় তাই কর।
>
> ধর্ম, সমাজ, রাজা দেবতা কাউকে মেনো না। নিজের মনের শাসন মেনে চল। (ঐ পৃঃ ৬-৭)

এই যে বক্তব্য, সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে এর প্রতিটি কথায় পরস্পর-বিরোধিতায় নৈরাজ্যিক বোধের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই চেতনা আবেগে বহমান বলেই এমন চিন্তাও তার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে,

> আমাদের বিদ্রোহ যারা দেশ জয় করেছে তাদের উপর নয়, আমাদের বিদ্রোহ দেশদ্রোহীদের উপর। (ঐ পৃঃ ২৫)

এই বক্তব্যে ভুল বোঝাবুঝির কিছুটা অবকাশ থাকলেও আসলে এই ক্ষোভ এমন এক সময় প্রকাশ পেয়েছিল যখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন-বিরোধী ও বিদেশী শাসক-সমর্থক দেশদ্রোহীর সংখ্যা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

বিশদ অনুধাবনে দেখা যায়, বিদ্রোহ-চেতনার অন্তর্গত উল্লিখিত নৈরাজ্যিকবোধ একাধারে বিষয়গত ও শিল্প-প্রকরণগত। 'আমার সুন্দর' নিবন্ধে বৈপরীত্য-চিন্তা-প্রসূত নৈরাজ্যবোধের একটি পরিপূর্ণ চেহারা ফুটে উঠেছে। তেমনি দেখা যায়, 'ধূমকেতু' 'রুদ্রমঙ্গল' 'দুর্দিনের যাত্রী' কিংবা 'নবযুগ'-এর কোনো কোনো নিবন্ধে। 'আজ চাই কি' নিবন্ধের সূচনা বাক্যটিতেই তো এই চেতনার প্রকাশ ঘটেছে,

> আজ চাই সারা ভারতজোড়া একটা বিরাট ওলোট পালট। (ধূমকেতু, পৃঃ ৬৭)

তেমনি 'আমার পথ' আমাদের একই পথের নিশানা দেখায়, বুঝাতে চেষ্টা করে

যে, 'আত্মাকে চেনা, নিজের সত্যকে নিজের ভগবান মনে করার দম্ভ...মনে একটা 'ডোন্টকেয়ার' ভাব আনে।' (রচনাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯৫)

'দুর্দিনের যাত্রী'র 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা' নিবন্ধে এই বিশেষ ভাবটিই প্রধান ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

> একবার শির উঁচু করে বল দেখি বীর, 'মোরা সবাই স্বাধীন, সবাই রাজা।'...স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা। আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই।...
>
> 'আমার রাজা আমি'–বাণী বলবার সাহস আছে কোন বিদ্রোহীর? তার সোজা উত্তর—যে বীর কারুর অধীন নয়, বাইরে ভেতরে যে কারুর দাস নয়, সম্পূর্ণ উদার মুক্ত। যার এমন কোন গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে সে নিজের সত্যকে ফাঁকি দেয়, শুধু সেই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। (রচনাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭৮)

এই বক্তব্য এত স্পষ্ট, এত স্বচ্ছ যে এর চরিত্র চিনিয়ে দিতে হয় না। একই নিবন্ধে বিষয়গত নৈরাজ্যের ও শাব্দিক নৈরাজ্যের শক্তিরূপ হাত ধরাধরি করে উল্কাবেগে ধাবমান। নীচের উদ্ধৃতটিতে আবার নৈরাজ্যের কাঁধে হাত রেখেছে রোমান্টিকতার চকমকি; এই জুটির ঘনিষ্টতায় বেশ উষ্ণ সৌহার্দ্য দৃশ্যমান; অনেক অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান,

> কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী! ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা-দুন্দুভি!...বল কারোর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। (ঐ, পৃঃ ৬৭৯)

'নবযুগ' নিবন্ধটিতেও এই একই বক্তব্যের প্রকাশ চোখে পড়ে। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই।

প্রকরনিক দিক থেকে শব্দ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই বিশেষ চেতনার পরিচয় পূর্বোক্ত আলোচনাতেই স্পষ্ট, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। তবে বিপরীত চেতনার কিছু কিছু শব্দাবলীর উপস্থিতি যে তার বহুখ্যাত বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীও আক্রমণ করতে দ্বিধা করেনি, সে সম্পর্কে আমার মনে হয় দু'একটি উদাহরণ যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় আলোচনার দাবী রাখে যে, বিদ্রোহের রূপচিত্রে বৈপরীত্যময় শাব্দিক উপাদান (শব্দ ও শব্দচিত্রের বিন্যাসে) দুষণীয় নয়, যখন এতে দ্বন্দ্বের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে নবসৃষ্টি তথা 'সিনথেসিসের' অবকাশ থাকে, সম্ভাবনা থাকে, তা না হলে নানা বিরোধীভাবের সমাবেশে মূলভাব বা প্রত্যয় আহত হতে পারে, রসাবেশে সার্থকতার সম্ভাবনা ব্যাহত হতে পারে। নজরুলের বিদ্রোহধর্মী কবিতার কোথাও কোথাও এই লক্ষণ দেখা যায়, এবং তার সর্বাধিক খ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটির

আলোচনা প্রসঙ্গে রসভোক্তাদের অনেকের চোখেই এই বিশেষ দিকটি ধরা পড়েছে, যা প্রকারান্তরে শৈল্পিক দুর্বলতার পরিচয়-বহ। এই বহু-আলোচিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এবং অকারণ উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে শুধুমাত্র ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্তের যুক্তিনির্ভর একটি মন্তব্যের উল্লেখেই এর ইতি টানা যায়, 'যদিও নজরুলের বিদ্রোহীর রোমান্টিক স্বরূপে জীবনের রুদ্রভীষণের সঙ্গে কোমল মধুরের ভাবপরিণয় স্বীকৃত, তবুও এই মিলনের সীমা আলোচ্য কবিতাটির অনেক স্থলে অতিক্রান্ত হওয়াতে মূল রস নিবেদন পুরোপুরি সার্থক হয়নি।'

'এই কবিতার রোমান্টিক বিদ্রোহ অনেক ক্ষেত্রে ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে।' (নজরুল চরিত মানস, পৃঃ ১০৬)

কাজী আবদুল ওদুদও বিদ্রোহীর আলোচনায় প্রায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ভাবগত দিক থেকে নয়, রূপগত বা প্রকরণিক দিক থেকে আমরা লক্ষ্য করি শাব্দিক ঔচিত্য বা শক্তি ঔচিত্য অতিক্রমণের কিছু কিছু উদাহরণ, বিশেষ করে বিদ্রোহধর্মী কবিতায় রয়েছে, যা অনভিপ্রেত।

'প্রলয়োল্লাস' -এর মতো একটি চমৎকার কবিতার তেজোদৃপ্ত শব্দাবলীর ভরাট ধ্বনির পাশাপাশি হঠাৎ করে কোমল মধুর শব্দের লালিত্য পরিবেশে অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। 'প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল অনাগতের বজ্রশিখার মশাল জ্বালা' পটভূমিতে রক্ত, কৃপাণ ইত্যাদি ভয়াল শব্দরূপের সামনে "দোদুল দোলা" প্রলয়োল্লাসের চরিত্রধর্মের সমান্তরাল নয়। তেমনি জগৎ-জুড়ি ঘনিয়ে-আসা প্রলয়ের আবহে মহানিশার শেষে উষার তরুণ হাসিটা যেখানে স্বাভাবিক ও প্রত্যয়গ্রাহ্য সেখানে তার 'করুণ বেশ' রক্তিম উষার চরিত্রানুগ নয়। স্তবকটির দিকে নজর ফেরালেও তাই মনে হয়,

> মাভৈঃ মাভৈঃ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে!
> জরায়-মরা মুমূর্ষুদের-প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে।
> এবার মহানিশার শেষে
> আসবে উষা অরুণ হেসে
> করুণ বেশে! (অগ্নিবীণা, পৃঃ ২)

তবু 'করুণ বেশে' কথাগুলোর পর ব্যবহৃত বিস্ময়বোধক (!) আমাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির অবকাশ নিয়ে আসে। এবং 'প্রলয়োল্লাসে' ধ্বংসের শেষে নবীন সৃষ্টির সম্ভাবনায় ভর দিয়ে আমরা এই ছায়াটুকু অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারি, যা কোনো কোনো কবিতায় সম্ভব হয়ে উঠে না।

অমন যে 'আগুনের শিখার মতো প্রোজ্জ্বল, উজ্জল লেলিহান' (প্রবাসী) কবিতাবলীর সংকলন 'অগ্নিবীণা' এর উৎসর্গ কবিতাটিতেও (যা "সাগ্নিক বীর"

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বারীন ঘোষের উদ্দেশে নিবেদিত) এই ছায়ার পদচারণা সুস্পষ্ট। কবিতাটিতে বজ্রেবাঁশী বাজানোর মধ্যে নজরুলীয় কান্ত গজলের উদাসী পদাবলীর প্রাধান্য 'দুর্বাসার রুদ্র তড়িৎ হানার' পরিবেশ একেবারেই অন্য মেরুর হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিদ্রোহ ও বিপ্লব আর মূল সুর হয়ে উঠে না, বিশেষ করে বেণু ও কদম্বের শাব্দিক লীলা-মাধুরীর প্রতীকে,

> দুর্বাসা হে। রুদ্রতড়িৎ হানছিলে বৈশাখে
> হঠাৎ সে কার শুনলে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।
> বজ্রে তোমার বাজল বাঁশী
> বহ্নি হ'ল কান্না-হাসি,
> সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী
>
> মন সরে না কাজে–

অগ্নি-সুরে রক্তের শিখা তখন আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, উদাসী ছায়ার আচ্ছন্নতায় সে শিখা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সজল সুরের বিরহী ব্যথা-ই প্রধান হয়ে ওঠে।

এজাতীয় দুর্বলতার ছায়া বৈপরীত্যের বোধ নিয়ে কোথাও কোথাও দেখা দিলেও এই বৈশিষ্ট্য প্রধান নয়। এবং এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রকরণিক পথে এ ধরনের নৈরাজ্যের উপাদান প্রধান নয়। এসব দিক থেকে 'ভাঙ্গার গান' বলা যায়, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত একটি প্রতিবাদী কবিতা যা নিটোল শক্তি-উচ্চারণে গরিমাময়। এমন দাবী সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবে না যে, নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাবলীর মধ্যে সর্বতোমুখী বিচারে 'ভাঙ্গার গান' অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এবং এ ধরনের সার্থক বিদ্রোহী কবিতা নজরুল-রচনায় কমই চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে হয়, অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনে 'বড়' কবিতা লেখার দক্ষতা সম্ভবতঃ নজরুল-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, যে সংহতি , যে প্রসাদ দীর্ঘ কবিতায় অনেক সময় ব্যাহত হতে দেখা যায়। বড় ক্যানভাসে যেখানে শৈথিল্য বা বৈপরীত্যের আভাস জাগার আশংকা থাকে, ছোট ক্যানভাসে সেই দুর্বলতার পরিচয় চোখে পড়ে না।

বস্তুতঃ রোমান্টিকতা-ধৃত শব্দ, পদ ও বাক্যবন্ধেই নৈরাজ্যিক চেতনার আশ্রয় একমাত্র কথা নয়, বরং নজরুলের বিদ্রোহীসত্তার পরিস্ফুট চিত্র-চরিত্র বিশ্লেষণে এই বিশ্বাসই নিশ্চয়তা পায় যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে যে এত পরস্পর বিরোধী পদচারণা, সন্ত্রাসবাদী শক্তিচেতনার সাথে রোমান্টিক আবেগের অবাধ মিশ্রণ ও তার সংকর প্রকাশ, দুই প্রধান ধর্মীয় চেতনার সাংস্কৃতিক সাংকর্যের এই যে নির্ভয় প্রকাশ শৈল্পিক উদ্ভাস, এ সবই তো এক অর্থে নৈরাজ্যিক ধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ (তা সে রাজনৈতিক হোক বা শৈল্পিক হোক)। তাছাড়া এই সূত্রটিও তো অনস্বীকার্য যে

সন্ত্রাসবাদ রাজনৈতিক বিচারে এক ধরনের নৈরাজ্যিক চিন্তার ফসল এবং নৈরাজ্যিক প্রক্রিয়াও বটে; আর নজরুলের বিদ্রোহ-ই বলি বা স্বদেশপ্রেমই বলি, তা যে, সর্বাধিক পরিস্ফুট দেশমুক্তির পটভূমিতে সন্ত্রাসবাদী চেতনা ঘিরে, সে কথা অস্বীকার করা কঠিন। 'প্রলয়োল্লাস' থেকে 'আনন্দময়ীর আগমনে' পর্যন্ত এই চেতনাচিত্রনই নজরুলের বিদ্রোহধর্মী কবিতায় সর্বাধিক লক্ষণীয়।

এতসব সত্ত্বেও দুর্বলতার জটিলতা থেকে অন্ততঃ একটি বিন্দুতে আমাদের স্বস্তি সুস্পষ্ট যে সমকালীন রাজনীতির ভুলভ্রান্তি, জটিলতা-দুর্বলতা এবং লক্ষ-সম্পর্কিত দ্বিধাসংশয় ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও নজরুল-চেতনায় বিদ্রোহের লক্ষ্য সম্পর্কে এতটুকু অস্পষ্টতা ছিলনা। যে-কোনো ধরনের প্রভুত্ববাদ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধার অবকাশ ছিল না। এমন কি এ সম্পর্কে ছিল না তার মধ্যে আপোষবাদিতার সামান্যতম প্রশ্রয়। অথচ বিশের দশকে দেশের স্বাধীনতার দাবী সম্পর্কে ধোঁয়াটে রাজনীতির দ্বিধা সংশয় ও আপোষপন্থার কথা আমরা সবাই জানি, যে-কারণে জাতীয় কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে হসরত মোহানী-উত্থাপিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। তা-সত্ত্বেও এক বছর পরেই 'ধুমকেতু'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে সারথী নজরুলের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছিল যেমন বলিষ্ঠ ও নির্ভয়, তেমনি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।

বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, নজরুলের বিদ্রোহ-চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে প্রধানতঃ তার স্বভাবধর্মজাত রোমান্টিক-নৈরাজ্যিক আবেগ এবং সেই আবেগ ধৃত তীব্র তীক্ষ্ণ শাক্ত শব্দাবলী, যেগুলো-'নজরুলীয় শব্দাবলী'রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য, এবং যেসবের সাহায্যে ও অভিনব ছন্দকুশলতায় সমৃদ্ধধ্বনি ও শব্দ চিত্রের এক বিস্ফোরক বিদ্রোহী ভুবনের সৃষ্টি— যা বাস্তবিকই নজরুলের 'বিদ্রোহী ভুবন।' এর অন্তর্গত শব্দাবলী, শব্দতো নয়, যেন এক একটি দুঃসাহসী শক্তিকণা, আর এইসব শক্তিকণার তেজোদীপ্তির সাথে রোমান্টিক আবেগ ও নৈরাজ্যিক স্বতঃস্ফূর্ততা মিলে মিশে এক ত্রিকোণ চারিত্রের বাহুবন্ধনে গড়ে উঠেছে নজরুলের বিদ্রোহচেতনার শৈল্পিক ত্রিভুজ—আর এই ত্রিকোণ স্থাপত্যের সূত্রপথে তার বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ অন্বেষার কাজটি সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূচী

১. কাজী নজরুল ইসলাম, যুগবাণী, পৃঃ ৪১

২. ঐ ধূমকেতু (সংকলন) পৃঃ ৩-৪

৩. ঐ, ঐ পৃঃ ২৭
৪. নজরুল রচনাবলী (বাংলা একাডেমী), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৬
৫. যুগবাণী পৃঃ ৩৩
৬. কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা (দশম-সংখ্যা ৩৫২) পৃঃ ৫৩,৫৪,৫৮
৭. ঐ ঐ পৃঃ ৩৬
৮. ঐ, ঐ, " পৃঃ ১৮
৯. রচনাবলী, (১ম), পৃঃ ৩৩০–৩৩২
১০. ঐ " পৃঃ ৬৯৩-৬৯৪
১১. যুগবাণী, পৃঃ ১৮
১২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৪, পৃঃ ২৭৮–৬৯
১৩. ঐ, ২৭, পৃঃ ৪৭৬
১৭. কাজী নজরুল ইসলাম, বিষের বাঁশী, পৃঃ ৩৭
১৫. ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চরিত মানস, পৃঃ ১৪৪, ১৪৩
১৬. ধূমকেতু (সংকলন), পৃঃ ৮৭
১৭. রচনাবলী, ১ম [দুর্দিনের যাত্রী], পৃঃ ৬৮৬–৬৮৮

নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ

আবদুস্ সাত্তার

[যুগস্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যে শুধু নতুন ভাবধারা এবং বিষয়বস্তুই আমদানী করেননি, তিনি নিজস্ব ভাষা, আঙ্গিক এবং রূপরীতিও নির্মাণ করে নিয়েছেন। বক্তব্য-প্রকাশ ও উপজীব্য-বিষয় যথার্থরূপে ফুটিয়ে তোলার এবং কাব্য-শিল্প নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি আরবী-ফারসী-উর্দু প্রভৃতি ভাষার ভাণ্ডারেও নির্দ্বিধায় হাত পেতেছেন, শরন নিয়েছেন সে-সব ভাষার কাব্য-ঐতিহ্যের। বস্তুতঃ, নজরুল-সাহিত্যে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী-ফারসী-উর্দু তুর্কী-এমনকি গ্রীক শব্দাবলীও সহাবস্থান করেছে, এবং বিচিত্র ও সুদক্ষ ব্যবহারে অর্থপূর্ণ এবং কাব্য-ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে আছে।

নজরুল-কাব্যে ভাষা-ব্যবহার-বিশেষ করে আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহার সম্পর্কে কাব্যবেত্তা, ভাষা-বিশেষজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা অনেককাল ধরেই নানাভাবে আলোচনা করে আসছেন। এ দিক থেকে বিষয়টি একেবারে নতুন না হলেও কবি, গবেষক ও আরবী ফারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী জনাব আব্দুস সাত্তারের 'নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ' শীর্ষক এই তথ্যপূর্ণ রচনাটি পত্রস্থ করা হলো এই কারণে যে, এতে আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহারে নজরুলের নৈপুণ্যই শুধু তুলে ধরা হয়নি, তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং কবির শব্দ ব্যবহার রীতির স্বাতন্ত্র্যও উপস্থাপিত হয়েছে। - স. ন, ই, প,]

[এক]

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন ভাষাশিল্পী। তাঁর কবিতায় তিনি অজস্র আরবী-ফারসী-উর্দু বা বিদেশী শব্দ বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এই শব্দের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা এবং কাব্যের নন্দন-তাত্ত্বিক আলোচনার আগে, বাংলা অক্ষরক্রম অনুযায়ী আভিধানিক সূত্রে সাজিয়ে কিছু শব্দের উল্লেখ এখানে করা হলো। তাঁর ব্যবহৃত সবগুলো শব্দের উল্লেখ এখানে অবশ্যই সম্ভব নয়। কারণ তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা এতই বেশী যে, সেগুলো পুরোপুরি সংগ্রহ করলে 'ফরহঙ্গে রব্বানী' বা বাংলায় 'আরবী-ফারসী-উর্দু অভিধান' হয়ে যাবে এবং তার কলেবরও নেহাৎ কম হবে না।

নজরুলের কবিতা পাঠ করে যা কিছু সামান্য শব্দ আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা-ই এ আলোচনায় পেশ করা হলো। শব্দগুলোর পাশে বন্ধনিতে আরবী-

এর জন্য 'আ', ফারসীর 'ফা', উর্দুর জন্য 'উ' তুর্কীর জন্য 'তু' উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু শব্দ আছে যেগুলোতে আরবী-ফারসীর সমন্বয় ঘটেছে এবং সেখানে বন্ধনিতে 'আ, ফা' দুটোই উল্লেখিত হলো। কি জন্য আরবী ফারসীর সমন্বয় ঘটেছে তার ব্যাখ্যা শব্দগুলোর অর্থ জ্ঞাপন করতে গিয়ে অর্থের পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে। বাংলা অক্ষরক্রম অনুযায়ী শব্দ, শব্দের বাংলা অর্থ এবং কবির কবিতা থেকে একটি করে উদাহরণও উপস্থাপন করা হলো, যদিও একই শব্দের ব্যবহার কবির বহু কবিতার বহু পংক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এমনকি একই পংক্তিতে কয়েকটি করে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ আছে।

সমগ্র প্রকাশিত নজরুল-সাহিত্যের উপর জরিপ চালিয়ে মোটামুটিভাবে যা উদ্ধার করা গেছে তা 'অগ্নিবীণা'র স্বরবর্ন 'অ' থেকে শুরু করে 'মরু-ভাস্কর', 'সর্বহারা' বা অন্যান্য গ্রন্থের ব্যঞ্জনবর্ন 'হ' পর্যন্ত (অক্ষরক্রম অনুযায়ী 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্তই বাংলা অভিধান তৈরী করা হয়) অথবা আরবী-ফারসী-উর্দু-খ্যাত 'আমপারা'র 'আলিফ' থেকে শুরু করে 'ইয়ে' পর্যন্ত যেমন 'য়্যা আল্লাহ্ আমি আন্ধা', 'য়্যা নবী সালাম আলায়কা' ইত্যাদি (এখানে বলে রাখা ভালো 'আমপারা' (কাব্য অনুবাদ)-এর 'আম' আরবী শব্দ এবং-এর অর্থ সাধারণ এবং 'পারা' ফারসী শব্দ এবং এর অর্থ অংশ, খণ্ড, ভাগ ইত্যাদি। যেমন পবিত্র কোরান তিরিশ পারা বা খণ্ডে বিভক্ত এবং এর মধ্যে 'আমপারা' সাধারণ খণ্ড। 'আম'-এর বানান 'আইন ও মিম'। 'আইনের উপর আছে খারা জবর এবং 'মিম'-এর উপর 'সাকেন' চিহ্ন। এই খাড়া জবর 'আলিফ' হিসাবে ধরা হয় এবং এখানে এই খাড়া জবরকে 'আলিফ' ধরে ইয়া পর্যন্ত আরবী-ফারসী-উর্দু অভিধানের সূত্র বজায় রাখা হয়েছে। যেসব শব্দের সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে আরবী-ফারসী-উর্দু বা অন্যান্য শব্দের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই তিন হাজার শব্দের মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ আরবী শব্দ, শতকরা ৩০% ভাগ ফারসী শব্দ এবং শতকরা ১০% ভাগ উর্দু বা অন্যান্য শব্দ। এই শব্দসমূহ আমাদের দেশে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে প্রচলিত ঠিক সেই ভাবেই কবি নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন।

হ্যাঁ, শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে নজরুল, বলা চলে, রাজমিস্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। রাজমিস্ত্রী বলছি এই কারণ যে, রাজমিস্ত্রীরা ইমারত বা প্রাসাদ তৈরীর সময় হাতুড়ি দিয়ে ইট পরীক্ষা করে তবে ইমারত গাঁথা শুরু করেন। ইট খারাপ মনে হলে প্রথম টোকাতেই বুঝতে পেরে সেটা বাতিল ঘোষণা করে ফেলে দেন। আবার কোন ছোট জায়গায় যেখানে পুরো ইঁটের প্রয়োজন নেই, সেটা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে বা ছেঁটে-ছেঁটে ছোট করে ঠিক মানানসই মতো বসিয়ে দেন।

কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর কাব্য তথা সাহিত্য প্রাসাদ তৈরীতে বাছাই করা

শব্দের ইঁট তো ব্যবহার করেছেনই, তদুপরি ছন্দ, মাত্রা, তাল, লয় ইত্যাদিজনিত কারণে কোনো কোনো শব্দ-ইট ভেঙে একটু ছোট করেছেন। অথচ সেই শব্দ বুঝতে আমাদের কোনোই কষ্ট হয় না। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে আশা করি। যেমন 'অদূরে 'দলিজে' মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন রোল'। এই বাক্যে ব্যবহৃত 'দলিজ' শব্দটি ফারসী এবং এর মূল হচ্ছে 'দহলিজ'। চার মাত্রার এই 'দহলিজ'-কে মাত্রা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি তিন মাত্রায় 'দলিজ' করেছেন এবং উক্ত পংক্তিতে ছন্দেরও কোনো পতন ঘটেনি। অথচ শব্দটির চেহারা দেখে ও অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি ওটা দহলিজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে দরিয়া থেকে 'দরী' যেমন 'গিরিদরী' (পর্বত-সমুদ্র), দাওয়াত থেকে 'দাওত' যেমন, 'দাওত' এসেছে নয়া জামানার', 'তাওফিক' থেকে 'তৌফিক' যেমন 'তৌফিক দাও খোদা ইসলামে', 'রওশন' থেকে 'রোশন' বা 'রোশ্‌নী' যেমন 'ঘুচাল কি অমা 'রোশনী'তে', 'নওজোয়ান' থেকে 'নৌজোয়ান' যেমন 'শুনরে পাতিয়া কান' 'নৌজোয়ান', ইত্যাদি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়নি এমন কথা আমরা বলবো না। কারণ মধ্যযুগের কাব্য তথা পুঁথি-সাহিত্যে প্রচুর আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এসবের নায়ক ছিলেন শাহ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মুনসী শেখ মোহাম্মদ, মুনসী ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ দানেশ, মুনসী এরাদত আলী এবং আরও অনেকে। তাঁদের শব্দ প্রয়োগ-কৌশল এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে সুঘ্রাণ থাকলেও 'বসরার গোলাপে'র সুঘ্রাণ ছিল না। কাজী নজরুল এই সব শব্দ ব্যবহারে শুধু রাজমিস্ত্রীর ভূমিকাই পালন করেন নি, তৈরী করেছেন সুদৃশ্য এবং শৌখিন ইমারত; আধুনিক কালের নতুন প্যাটার্নে। আর সেই শৌখিন ইমারতের সম্মুখে বিস্তৃত করেছেন বসরার গোলাপে'র মনোমুগ্ধকর বাগান। এখন নজরুল-কাব্যে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দাবলীর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক,

অ

অক্ত (আ)- সময়, কাল

জেদ্দার পূবে মক্কা মদিনা চৌদিক পর্বত
তারি মাঝে কাবা আল্লার ঘর দুলে আজ হর 'অক্ত'।

[ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

অজুহাত (আ)- কারণ, ওজর, আপত্তি

উমর যেদিন বিনা 'অজুহাতে' পাঠাইল ফরমান। [খালেদ]

আ

আইন (আ)- বিধি, নিয়ম, কানুন
'আইন' খাতায় পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলি নিজেরে করেছি একা। [চিরঞ্জীব জগলুল]

আউয়াল (আ)- প্রথম, আদি
এ কি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই
সেই রবিউল-আউয়াল?
[নতুন চাঁদ]

আওরত (আ)- মহিলা, রমণী
ঝুটা তেরি তলোয়ার ছিন লিয়া যব দেশ,
'আওরত' সম ছি ছি ক্রন্দন রব পেশ।
[আনোয়ার]

আওলিয়া (আ)- সাধু, দরবেশ
লাখো 'আওলিয়া' দেউলিয়া হলো যাহার কাবা দেউলে
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি কালি দিল কুলে।

আওয়াজ (ফা)- শব্দ, ধ্বনি
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর-আওয়াজ
শোন্ কোন মুঝদা সে উচ্চারে হেরা আজ
ধরা মাঝ। [ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

আকিকা (আ)- শিশুর নব জন্ম উপলক্ষে পশু জবাই, উৎসব
সাত দিন যবে বয়স শিশুর, আরবের প্রথা মতো
আসিল 'আকিকা' উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যতো। [মরু-ভাস্কর ঃ দাদা]

আখের (আ)- শেষ
নামাজ পড়, রোজা রাখ/কলমা পড় ভাই,
তোর 'আখেরে'র কাজ করে নে/সময় যে আর নাই। [গানের মালা ঃ সংযোজন]

আখেরী (আ. ফা.)- শেষ। আরবী 'আখের'-এর সঙ্গে ফারসী 'ই' মানে 'ইয়ে' যোগ হয়েছে।
উমর ফারুক! 'আখেরী' নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু। [চিরঞ্জীব ঃ উমর ফারুক]

আঁখি (উ)- চোখ
মুছাতে এলে যে উৎপীড়িতে এ নিখিলের 'আঁখি'-জল,
সে এলো গো মাখি' শুভ্রতনুতে বিষাদের পরিমল। [মরু-ভাস্কর ঃ

— ১৮

আলো আঁধারি]

আগ/আগুন (উ)- অগ্নি

যে 'আগুন' ছড়ায়েছে এ বিশ্বে, তারি দাহ্ ফিরে এসে,
ভীম দাবানল রূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরি দেশে দেশে।

আজব (আ)- আশ্চর্যজনক

খাইবে পোলাও কোর্মা কাবাব!
আয় কে শুনিবি কথা 'আজব'! [জীবনে যাহারা বাঁচিল না]

আজম (আ)- শ্রেষ্ঠ, মহৎ বড়

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক 'আজমে' করেছ ধন্যা।

আজল (আ)- মৃত্যু

কোথা সে আজল? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ। [আজাদ]

আজাদ (ফা) <আজাদী-স্বাধীন, মুক্ত

পশু কোরবানী দিস্, তখন/'আজাদ' মুক্ত হবি যখন
জুলুমমুক্ত হবে রে দ্বীন।

আজান (আ)- ডাক, আহ্বান

শুনি তখন 'আজানে'র কি বজ্র-গম্ভীর স্বর
আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। [আজান]

আতর (আ)- সুঘ্রান, সুগন্ধি

'আতর' সুবাসে কাতর হলো গো পাথর দিল।

আদব (আ)- শিষ্টতা, ভদ্রতা

'শিখে নিক' কভু সভ্যতা কোনো
'আদব' কায়দা কোনো দেশের। [জীবনে যাহারা বাঁচিল না]

আদম (আ)- মানব, মানুষ, নর

ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা ধরে সেই
বাবা 'আদমে'র আদিম পথ। [জীবনে যাহারা বাঁচিল না]

আফতাব(ফা) –সূর্য, সুরজ

মককার হাতে চাঁদ এলো যবে তকদিরে 'আফতাব'
কুল মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামী খাব। [খালেদ]

আফসোস (ফা)– দুঃখ, কষ্ট

ওরে সব যায়

তবু কবজায় তোর শমশের নাহি

কাঁপে 'আফসোসে' হায়।

আব (ফা)– পানি, জল

আজো উথলায় 'আব' জমজম কাবা শরীফের কাছে

সেই সে নামাজ রোজা আছে আজও আজও সে কলেমা আছে। [আজাদ]

আবাদ (আ) চাষ, কর্ষণ , ফলান

তওফীক দাও খোদা ইসলামে

মুসলিম জাঁহা পুনঃ হোক 'আবাদ'। [জুলফিকার]

আবে কাওসার (আ. ফা)– বেহেশতের কাওসার নামক প্রস্রবণের পানি। ফারসী 'আব' আরবী 'কাওসারে'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

প্রস্তুত হও আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে

আল্লাহ্ থেকে আবে কাওসার নবীন বার্তা বয়ে।

আবে হায়াত (আ.ফা) –জীবন রস, জীবন পানি। এই শব্দেও আরবী ও ফারসীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। 'আব' ফারসী এবং 'হায়াত' আরবী।

তুমি এলে, সাথে এলে না দস্ত/করিল শক্র বাজু শহীদ

তব হাত হতে 'আবে হায়াত'/লুটে নিল যুরূপ-এজিদ। [রীফ সর্দার]

আঞ্জাম (ফা) আয়োজন

চলে 'আঞ্জাম'

দোলে তাঞ্জাম। [ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

আতশ<আতশী (ফা)– অগ্নি, আগ্নেয়

জিবরাইলের 'আতশী' পাখা সে ভেঙে যেন খান খান,

দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আনচান। [ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

আনার দানা (ফা) ডালিম জাতীয় ফলের দানা

এলো কি চোর কাঁটা? না 'আনার দানা' পাথরকুচি। [আগুনের ফুলকি ছুটে]

আমদানী (ফা)– আয়, লাভ

মেঘ চাইতেই পায় পানি

এ কোন মায়ার 'আমদানী' [মরু ভাস্কর]

আমল নামা (আ. ফা)- কর্ম তালিকা। 'নামা' ফারসী শব্দ। আরবী-ফারসী যুক্ত শব্দ।

মিলিবে 'আমল নামা' ডান হাতে যার
সহজে দিবে সে তার হিসাব-নিকাশ। [কাব্য আমপারা : সুরা ইনকিলাব]

আমামা (আ)- পাগড়ী, শিরস্ত্রাণ
মেঘের ছিন্ন কাঁথায় শুয়ে যে আজিকে ঈদের চাঁদ
স্বপ্ন হেরিছে লক্ষ টাকার 'আমামা'-পাগড়ী বাঁধ। [ঈদের চাঁদ]

আমির (আ)- নেতা, রাজা
পামীর ছাড়িয়া 'আমির' আজিকে
পথের ধূলায় খোঁজে মণি। [সুবেহ্ উম্মীদ]

আমিরুল মুমেনিন (আ)- বিশ্বাসী নেতা
হায়রে আধেক ধরার মালিক 'আমিরুল মুমেনিন'
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন। [উমর ফারুক]

আমীন (আ)- বিশ্বাসী
ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল : মোহাম্মদ 'আমীন',
করে নাকো পূজা কাবার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন। [সাম্যবাদী]

আম্বিয়া (আ)- নবীগণ, পয়গম্বরগণ
মুনি ঋষি আউলিয়া 'আম্বিয়া' দরবেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যাঁর আসার খবর। [নও কাবা]

আয়াত (আ)- নিদর্শন, চিহ্ন
তোমায় পাওয়ার পথ খুঁজি গো
কোরানের 'আয়াতে'। [গীতি শতদল]

আয়েব (আ)- দোষ
শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল 'আয়েব'। [মৌলবী সাহেব]

আরজি (আ)- নিবেদন
ফুল মালা দিয়া না করিব বরণ
করিতে মামুলি 'আরজ' পেশ। [আমানুল্লাহ]

আরব (আ)- দেশের নাম
সহসা বাজিল রণদুন্দুভি 'আরব' দেশে।
ফেজার যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।

আরাবীর (আ)- আরব দেশীয়

উষ্ণীষ কোরানের হাতে তেগ 'আরাবীর',
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।

আরশ (আ)- আল্লাহ্‌র সিংহাসন
জমিন-আসমান জোড়া শির পাও তুলি তাজি বোররাক
চিখ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে মারে জোর হাঁক।
[ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

আরাম (ফা)- বিশ্রাম
জুতো গুতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
'আরাম'সে যার কাটিল দিন। [জীবনে যাহারা বাঁচিল না]

আল্ আমীন (আ)- বিশ্বাসী, রাসূলে করীমের খেতাব
এই জানিয়াছি এই দেখিয়াছি, এই শুনিতেছি রাত্রিদিন,
আসিছেন তিনি, তৌহিদের মহাজ্যোতি লয়ে 'আল-আমীন'। [মহাসমর]

আল-আহাদ (আ)- এক, অদ্বিতীয়
তেমনি পরম আদি কবি তিনি-নিরাসক্ত ও 'আহাদ',
মনসুখ করি দেন অসুরের, আনেন জগতে সাম্যবাদ। [মহাসমর]

আলবৎ (আ. আলবাত্তা থেকে)- নিশ্চয়ই, অবশ্যি
শহীদ হয়েছে? ওফাত হয়েছে? ঝুটবাত 'আলবাৎ',
খালেদের জান কবজ করিবে ঐ মালেকুল মৌৎ? [খালেদ]

আল্লাহ (আ)- সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা
আল্লাহ রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম সুন্দর এক 'আল্লাহ' আমাদের প্রভু।

আল্লাহু আকবর (আ)- আল্লাহ সবচেয়ে বড়, মহান
উমর আনিল ঈমান? গরজি গরজি উঠিল স্বর,
গগন পবন মন্থন করি 'আল্লাহু আকবর'। [উমর ফারুক]

আশিক (আ)- প্রেমিক
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে 'আশিক'
কসম করিছে হবে শহীদ। [সুবেহ্ উম্মিদ]

আহমদ (আ)- প্রশংসিত
নাম শুনে কহে আমিনা, স্বপ্নে হেরিয়াছি কালরাতে
'আহমদ' নাম রাখিও যেন ওর। [মরু ভাস্কর ঃ দাদা]

আহাদ (আ)- এক, অদ্বিতীয়

জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদে জ্ঞান,
অভেদ, 'আহাদ' মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান। [মহাসমর]

আঁসু (উ)- চোখের জল, অশ্রু

সেনাদের চোখে 'আঁসু' ধরে না কো হেসে কেঁদে তারা বলে,
খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে। [খালেদ]

আহাজারি (ফা)- আর্তনাদ

খালেদ, খালেদ, শুনিতেছ নাকি সাহারার 'আহাজারি'?
কত ওয়েসিস রচিল তাহার মরু নয়নের বারি। [খালেদ]

ই

ইজ্জত (আ)- সম্মান, মান

রাখিতে 'ইজ্জত' ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের
দেবে কি? কে আছ মুসলমান? [শহিদী ঈদ]

ইনসান (আ)- মানব, মানুষ

ধরার জিন্দানে বন্দী 'ইনসান'
আজাদী দিতে এলে, হে প্রিয় আল-আরাবী। [সঙ্গীতাঞ্জলী]

ইনসাফ (আ)- ন্যায় বিচার

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখতে বসিয়া করিছে শয়তান 'ইনসাফ'। [উমর ফারুক]

ইফতার (আ)- রোজা শেষে আহার-পানীয়

এই উপবাসী আত্মা, এই যে উপবাসী জনগণ
চিরকাল রোজা রাখিবে না-আসে শুভ 'ইফতার' ক্ষণ।

ইবলিস (আ)- শয়তান

রোয়ে ওজ্জা হুবল 'ইবলিস' খারেজীন
কাঁপে জীন্।

ইমান (আ)- বিশ্বাস

ইমান! ইমান! বল রাত দিন ইমান কি এত সোজা?
ইমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানী বোঝা?

ইমাম (আ)- ধর্মীয় নেতা

কোথা সে আরিফ কোথা সে 'ইমাম' কোথা সে শক্তিধর?

মুক্ত যাহার বাণী শুনে কাঁদে ত্রিভুবন থর থর।

ইয়া (আ)- হে, ওহে

'ইয়া' এলাহী বলো সে কবে
আমার স্বপন সফল হবে। [গীতি শতদল]

ইরান (ফা)- দেশ, এশিয়া মহাদেশের অংশ

বিরান মুলুক 'ইরান' ও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যাজিয়া নিঁদ।

ইলাহী (আ)- প্রভু, স্রষ্টা

আমি, ঐ নামে মুসাফির রাহি তাই, চাহিনা তখত শাহানশাহী
নিত্য ও নাম য়্যা এলাহি/যেন হৃদে জাগে। [বন গীতি]

ইশ্‌ক (আ)- প্রেম

ওরা খোদার রহম মাগে
আমি খোদার 'ইশ্‌ক' চাই। [জুলফিকার]

ইশারা (আ)- ইঙ্গিত

হাসিয়া বলিলে, 'তোর তরে নর আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ
ভাবিবে, খলিফা করেছে 'ইশারা' হেথায় নামাজ পড়ি
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি। [উমর ফারুক]

ইসলাম (আ)- ধর্ম, শান্তির ধর্ম

মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
'ইসলাম' এসেছিল দুনিয়ায় যারা কোরবান তার।

ঈ

ঈদ (আ)- খুশী, উৎসব, আনন্দ

সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ,
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ। [ঈদের চাঁদ]

ঈদগাহ (আ. ফা)- ঈদের মাঠ

আজিও তেমনি জমায়েত হয় 'ঈদগাহে' মসজিদে
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিঁদে। [আজাদ]

ঈদুল আজহা (আ)- বড় ঈদ, কোরবানীর ঈদ

'ঈদুজ্জোহার' চাঁদ হাসে ওই
এলো আবার দোসরা ঈদ। [গুলবাগিচা]

ঈদুল ফিতর (আ)- ফিতরা আদায়ের ঈদ, রোজার ঈদ
'ঈদুল ফিতর' আনিয়াছে তাই নব বিধান। [ঈদের চাঁদ]

উ

উম্মেদ, উম্মিদ (ফা)- আশা, আকাঙ্ক্ষা
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোন ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণের কেহ হবে না না-উম্মেদ। [সুবেহ উম্মেদ]

উম্মত (আ)- সম্প্রদায়, অনুসারী
আল্লা! এরাও মুসলিম, এরা রসুলের 'উম্মত',
কেন পায় নিক প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহমত।

উম্মী (আ)- নিরক্ষর
সেই সে পূর্ণ মুসলমান, সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মী' হয়েও জয় করিতে পারে সে বিশ্বচরাচর। [আজাদ]

এ

একদম (ফা)- একেবারে, এক নিঃশ্বাসে
সাব্বাস ভাই, সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে
পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব যম-ঘর 'একদম' সেরে।

এছমে আজম (আ)- শ্রেষ্ঠ নাম (একমাত্র আল্লার)
'এছমে আজম' এনে মৃত
মুসলিমে তুই কর সঞ্জীব [জুলফিকার]

এতীম (আ)- অনাথ
আশ্রয় দান ধূলি-লুণ্ঠিত
কাঙালে 'এতীম' আত্মীয়েরে। [কাব্য আমপারা ঃ সুরা বালাদ]

এলহান (আ)- স্বর, সুমিষ্ট স্বর
পাহাড়ী তরুর শুকনো শাখায়
গাহে বুলবুল খোশ্‌ 'এলহান'। [সুবেহ উম্মেদ]

এশা (আ)- রাত্রির প্রথম ভাগের নামাজ
তিমির রাত্রি, 'এশার' আজান শুনি দূর মসজিদে,
প্রিয় হারা কার কান্নার মতো এ বুকে আসিয়া বিঁধে। [উমর ফারুক]

ওজন (আ)- মাপ, পরিমাণ

সর্বনাশ তাহাদের হ্রাসকারী যারা
যখন লোকের কাছে মেপে নেয় তারা
তখন পূর্ণ করে চায় মেপে নিতে
তাদেরে 'ওজন' করে হয় যবে দিতে,
তখন কম সে করে মাপে ও 'ওজনে'। [কাব্য আমপারা ঃ সূরা তাৎফিক]

ওজু (আ)- ধৌত, প্রক্ষালন
আব জমজম উথলি উঠিছে তোমার 'ওজুর' তরে
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে। [খালেদ]
ওকাজ (আ)- মেলা, অধিবেশন
এ মহারণের জন্য প্রথম 'ওকাজ' মেলায়
মাতিত যেখানে সকল আরব পাপের খেলায়।
ওফাত (আ)- মৃত্যু, মরণ
শহীদ হয়েছ? 'ওফাত' হয়েছ? ঝুটবাত আলবৎ,
খালেদের জান কবজ করিবে ঐ মালেকুল মৌৎ? [খালেদ]
ওয়াজ (আ)- বক্তৃতা, ভাষণ
'ওয়াজ' নসিহত করে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে। [মৌলভী সাহেব]
ওয়ালেদ (আ)- জন্মদাতা, বাবা
ওয়ালেদেরই মত বুজর্গ
মক্তবের ঐ মৌলবী সাহেব। [মৌলভী সাহেব]
ওহী (আ)- ঐশীবাণী, (আ, ওয়াহি থেকে)
পাও নিকো 'ওহী' হও নিকো নবী তাই তো পরাণ ভরি
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি বক্ষে জড়ায়ে ধরি। [উমর ফারুক]
ওমরাহ্ (আ)- নেতা, প্রধান, রাজা
ফকীর বাদশা আমির 'ওমরাহে'
কাঁদে তেমনি আজো, তারি মর্সিয়া গাহে। [গুল বাগিচা]

ক

কওসর (আ)- বেহেশতের স্রোতধারা
আল্লাহ্ আকবর! আল্লাহু আকবর!
আল্লার কাছ থেকে এলো, আজ রহমত 'কওসর'।

কওম, কৌম (আ) জাতি, গোষ্ঠী

সব আছে তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?
ভেবেছ কি কেউ 'কৌমের' পীর নেতা কেন হয় হেন?

কতল (আ)- হত্যা, বধ

দানব দৈত্য 'কতল' করিতে আসে তলোয়ার লয়ে
ফেরদৌস হতে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হয়ে।

কতলগাহ (আ. ফা)- বধ্যভূমি, হত্যার মাঠ

রাজ্য ও দেশ গেছে ছারে খারে! দুর্বল নরনারী
কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য 'কতলগাহে'তে তারি। [খালেদ]

কদম (আ)- পা

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর
দিন দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার 'কদমে' শির। [খালেদ]

কঞ্জু, (ফা)-কৃপণ

আনোয়ার মুশকিল
জাগা 'কঞ্জু' দিল। [আনোয়ার]

কবর (আ)- সমাধি

ইসলামে তুমি দিয়ে 'কবর'
মুসলিম বলে করে ফখর।

কবরস্তান (আ. ফা)- সমাধিস্থান

আল্লার সাথে নিত্য যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম 'কবরস্তানে' পেয়েছে তার খবর।

কবুল (আ)- গ্রহণ, স্বীকার

তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও,
'কবুল' কর এ প্রার্থনা, প্রভু কৃপা কর, ফিরে চাও।

কমি (ফা. উ.) + উ. 'ই'- স্বল্পতা, অল্প

দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ
সব ভরপুর 'কমি' নাই। [নতুন চাঁদ]

কমজাত (ফা)- পাজী, বদমাশ, নিম্নমানের

ধুঁকে মলো, আহা, তবু পানি এক কাৎরা
দেয় নিরে বাছাদের মুখে 'কমজাত'রা। [মোহর্‌রম]

কমজোর (ফা)- অল্পশক্তি

শমশের হাতে 'কমজোর' নয় শিরীন জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছে জয় অসির অজেয় রণভূমি।

কমবক্ত (ফা)- অভাগা, দুর্ভাগা
তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি 'কমবক্তে'র মেলা
শক্তিমাতাল দৈত্যরা সেথা করে মাতলামী খেলা।
করজ (আ)- ঋণ, ধার
ফরজ তরক করে করলি/'করজ' ভবের দেনা
আল্লাহ ও রসুলের সাথে/হলো না তোর চেনা। [গীতি শতদল]
কলেমা(আ) মুসলিম বিশ্বাসের অকাট্য বাণী
মুখে যেন জপি আমি
'কলেমা' তোমার দিবস-যামী। [বন-গীতি]
কসম (আ) –শপথ
খদিজারে কন –আল্লাহতালার 'কসম' কাবার ঐ
লাৎ ওজ্জার করিব না পূজা জানি না আল্লা বই।
[সাম্যবাদী]
কহর (আ)–দুর্যোগ, বিপদ
হাসানের মতো পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরি 'কহরে'র। [মোহর্‌রম]
কাগজ (ফা)–লেখার কাগজ
'কাগজে' লিখিয়া সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে,
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত সাগর তীরে? [আজাদ]
কাফন (আ) শবাচ্ছাদন
আসমান জোড়া কাল 'কাফনের' আবরণ যেন টুটে,
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশু অধর পুটে।
কাফের (আ) –অবিশ্বাসী
ওই অসুরের দল দেখ যত, ছন্দপতন সংসারের,
সুন্দর এই সৃষ্টিতে তাঁর এরাই দৈত্য, এরা 'কাফের'। [মহাসমর]
কাফেলা (আ)- মিছিল, দল
কাঁদিছে 'কাফেলা' কারবালায়
কে গাহিছে গান বন্দনার। [রীফ সর্দার]
কাবা (আ) –পবিত্র ঘর
মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির 'কাবা' নাই। [সাম্যবাদ]
কাবাব (ফা)–ভাজা মাংস
কলিজা 'কাবাব'–সম ভুনে মরু–রোদ্দুর,

খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জুর।
কাঙাল (ফা)– দুঃখী, দুর্ভাগা
তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ মালা,
করে নাকো কেন 'কাঙালে'র ঘর আলো?
কামান (ফা)–গোলা বন্দুক
'কামানে'র চাকা যথা অচল/রৌপ্যের চাকী ঢালে সেথায়,
এরাই য়ুরোপী বীরের জাত/শুনে লজ্জাও লজ্জা পায়। [রীফ সর্দার]
কামাল (আ)–কর্ম, পূর্ণতা
কামাল তু নে 'কামাল' কিয়া ভাই। [কামাল পাশা]
কিতাব (আ) –বই
তাই উহাদের 'কিতাবে' কয়
হজরত রসুলের নায়েব। [মৌলবী সাহেব]
কিয়ামত (আ) –প্রলয়ের দিন, ধ্বংস-দিবস
যে ইসরাফিল প্রলয় শিঙ্গা বাজাবেন 'কিয়ামতে'–
তারি লালাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে।
কিম্মত (আ)– মূল্য, দাম
চক্ষে সুর্মা বক্ষে খোর্মা বেদুঈন কিশোরীরা
বিনি 'কিম্মতে' বিলালে সেদিন অধর চিনির সিরা। [মরু ভাস্কর]
কিশ্‌তী (ফা) নৌকা, জাহাজ
ছিল নবীর নূর পেশানিতে,
তাই ডুবলো না 'কিশতী' নূহের। [জুলফিকার]
কুরবান (আ)–উৎসর্গ
আসগর সম বাচ্চারে দেব 'কুরবান',
জালিমের দাদ নেব, দেব আজ গোর জান।

কুরবানী (আ)–উৎসর্গ করা। আরবী 'কুরবান'-এর সঙ্গে ফারসী 'ই' যোগ করা হয়েছে।
আন মহিমা হজরতের /শক্তি আন শেরে খোদার
'কুরবানী' আন কারবালার/আন রহমত মা ফাতেমার। [জুলফিকার]
কুল (আ.ফা)–সম্পূর্ণ, পূর্ণ
আজাদ মানুষ বন্দী করে অধীন করে স্বাধীন দেশ,
'কুল' মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে ক'দিন বেশ। [কামাল পাশা]
কুর্‌নিশ, কুর্ণিশ (ফা) –অভিবাদন, সালাম

ক'রে তসলিম হর 'কুর্ণিশে' শোর আওয়াজ... [ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

কুরসি (আ)–সিংহাসন

খোদার হাবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে,
ঝুঁকে পড়ে আরশ 'কুরসি' চাঁদ সুরুজ তাঁয় দেখাতে আসে।
[গুলবাগিচা]

কোরান (আ) –মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, আল্লার বাণী

আছে সে 'কোরান' মজিদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এক কণা তার পেয়েছিস কেউ তোরা? [আজাদ]

কোহিনুর (ফা. আ)–উজ্জ্বল মণি (ফা,'কোহ' মানে পাহাড় এবং আ.'নূর' মানে আলো– দুটো মিলে 'উজ্জ্বলমনি' বোঝানো হয়েছে)।

রতন মাণিক হয় না ত মাটি, হীরা সে হীরাই থাকে,
মোদের মাথার 'কোহিনুর'–মণি কি করিব বল তাকে? [চিরঞ্জীব জগলুল]

খ

খঞ্জর (ফা–)–ছুরি, চাকু

অঞ্জলি হ'তে পানি পড়ে গেল ঝরঝর
লুটে ভূমে মহাবাহু 'খঞ্জর' জর্জর।

খরিদ (আ)– ক্রয়, কেনা

হায় গণনেতা ভোটের ভিখারী নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছে 'খরিদম্ব করে। [আজাদ]

খাক (ফা) মাটি

'খাক' বলিল, না, জানি না ত আমি আব বুঝি তা জানে
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বধুঁ কোনখানে? [আর কত দিন)

খাল (আ)–চামড়া

খালেদ! খালেদ! সর্দার আর শির পায় যদি মূঢ়
খাসা জুতা তারা করবে তৈরী 'খাল' দিয়ে শত্রুর। [খালেদ]

খাজা খিজির (ফা)–পানির পয়গম্বর। ('খাজা' সম্রাট অর্থে এবং 'খিজির' মহান ব্যক্তি অর্থে অর্থাৎ যিনি মুসলিম মতে পানিতে অমর হয়ে অধিষ্ঠিত আছেন খাজাখিজির আঃ)

উর্ধে জাগিয়া রহিলেন ঈসা অমর মর্ত্যে 'খাজা খিজির',
দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর। [মরু ভাস্করঃ অনাগত]

খাদেম (আ) সেবক

এরাই মানব জাতির 'খাদেম' ইহারাই খাকসার
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যেরে করে দেয় মিসমার।

খান্নাস (আ) শয়তান, কুমন্ত্রণাদাতা

কুমন্ত্রণাদানকারী 'খান্নাস' শয়তান
মানব-দানব হতে চাহি পরিত্রাণ। [কাব্য আমপারা : সুরা নাস]

খাপ (ফা)- ঢাকনা

শামবাসী ওরা, সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ
তলোয়ার নাই, বহিছে কটিতে কেবল শূন্য খাপ।

খাব (ফা)-স্বপ্ন

'খাবে' দেখেছিলেন ইবরাহিম
দাও কুরবানী মহামহিম। [কোরবানী]

খামোশ (ফা) -চুপ, সাবধান, নীরব

ব্যাস! চুপ 'খামোশ' রোদন।

খাঞ্চা (ফা)- ট্রে

চোখের পানির ঝালর ঝুলানো হাসির 'খাঞ্চা' পোশ,
যেন অশ্রুর গড়খাই ঘেরা দিল খোশ ফেরদৌস।

খাস (ফা)- আসল

জগতের 'খাস' দরবারে চাই
শ্রেষ্ঠ আসন শ্রেষ্ঠ মান।

খিমা (আ)- তাঁবু

জয়নাল সম মোরা সবাই। শুই বিমারী 'খিমা'র মাঝ
আফশোস করি কাঁদি শুধু/দুশমন করে লুটতরাজ। [রীফ সর্দার]

খিঞ্জির (আ)-শূকর

আনোয়ার! জিঞ্জির
পরা মোরা 'খিঞ্জির', খিঞ্জির? [আনোয়ার]

খুব্‌জ (আ) রুটি

ঝুলিতে দু'খানা শুকনো 'খুব্‌জ'-রুটি
একটি মশকে একটুকু পানি, খোর্মা দু'তিন মুঠি! (উমর ফারুক)

খেয়ালী (আ. ফা)- আনমনা। (আরবী 'খেয়াল' এর সঙ্গে ফারসী 'ই' মানে 'ইয়ে' যোগ করা হয়েছে)

আমি 'খেয়ালী' বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন। [বিদ্রোহী]

খোশ্ আমদেদ (ফা)–স্বাগতম , শুভ আগমন

'খোশ আমদেদ' আফগান শের! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আজ
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ শরমে নোয়ায়ে শির বেতাজ। [আমানুল্লাহ্]

খোশ্ -খবর (আ. ফা)–শুভ সংবাদ

ঘোষিতে যেন গো ওপারে ওপারে
তাঁহারি আসার 'খোশ্ খবর'। [মরু ভাস্কর ঃ অনাগত]

খোশ-নসীব (ফা.আ.) সৌভাগ্য

দশ দিক ছাপি ওঠে আহ্বান, ধন্য ধন্য মুত্তালিব
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য, আবদুল্লাহ্ 'খোশ্-নসীব'। [মরু ভাস্কর ঃ অনাগত]

খুন (ফা.) রক্ত

শুধু মোহ চোখের কালোয় মায়ারই জাল বুনে,
কাঁচা বুকের 'খুন' পিয়ে নেয় বিষাক্ত কাম ঘুণে।

খ

খোৎবা (আ)– ভাষণ

'খোৎবা' পড়বি মসজিদে
তুই খতিব নতুন ভাষায়। [জুলফিকার]

খোশরোজ (ফা)–শুভ দিন

খুশীর ঐ 'খোশরোজে' রোজ খুনসুড়ি কি করে এড়াই? [আগুনের ফুলকি ছোটে]

খোশবু (ফা)–সুঘ্রাণ

সাহারাতে ফুটলো রে রঙিন গুলে লালা
সেই ফুলেরই 'খোশবুতে' আজ দুনিয়া মাতোয়ালা। [জুলফিকার]

খোদ (ফা)–নিজ

'খোদ' খোদা সে নির্বিকার
আজ টুটেছে আসনও তাঁর।

খোদা (ফা)–স্রষ্টা

'খোদা'র সৃষ্ট মানুষের ভালোবাসিতে পারে না যারা
জানি না কেমন জনগণ নেতা হতে চায় হায় তারা!

খেলাফত (আ)– প্রতিনিধিত্ব

'খেলাফত' তুমি চাওনিক কভু, চাহিলে আমরা জানি,
তোমার হাতের বেদেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি। [খালেদ]

গ

গজল (আ)–গীতিকবিতা, গান

হে মদিনার বুলবুলি গো
গাইলে তুমি কোন 'গজল'? [বন গীতি]

গম্বুজ (ফা)– মসজিদের উপরি ভাগের গোল অংশ, টাওয়ার

'গম্বুজে' কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মসজিদে?

গরীব (আ)– দুস্থ, নিঃস্ব

ধন সম্পদ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান?
আশ্রয় দেয় 'গরীবে' কি কভু এদের দর দালান? [গোঁড়ামি ধর্ম নয়]

গর্দান (ফা)–ঘাড়

পণ্য তখতে বসিয়া যে করে তখতের অপমান
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার 'গর্দান'।

গাজী (ফা)–যোদ্ধা

জ্বালাবে আবার খেদিব ... প্রদীপ
'গাজী' আবদুল করিম বীর। [সুবেহ উম্মিদ]

গ্লাস<গেলাস (ইং)– পাত্র, পানপাত্র

রজনী গন্ধার 'গেলাসে' রজনী দেয় সুরা আনি। [গীতি শতদল]

গিদ্‌ধর (ফা)– শৃগাল, শকুন

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুর্বল এ 'গিদ্‌ধরে' কেন তড়পানো আর? [আনোয়ার]

গুনাহ্‌গার (ফা)–পাপ ধারণকারী, পাপী

আয় 'গুনাহ্‌গার' ক্ষতির হিশাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা। [মরু ভাস্করঃ কৈশোর]

গুলজার (ফা)–ফুলময়, সৌন্দর্যময়।

বাজে, কাহারবা বাজা, 'গুলজার' গুলশান
গুলফাম।

গুলবাগ (ফা) –ফুলের বাগান।

আজও, গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি জানাস রে 'গুলবাগে'! [বনগীতি ঃ সংযোজন]

গুলবাগিচা (ফা)– ফুলের বাগান

'গুলবাগিচা'র বুলবুলি আমি
রঙীন প্রেমের গাই গজল [গুলবাগিচা]

গুলবাহার (ফা)– ফুলের বসন্ত ('বাহার' বসন্ত)

উহারা চাহুন অশান্তি, মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,

ভূতেরা চাহুন গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব 'গুলবাহার'। [এক আল্লাহ জিন্দাবাদ]

গুলাব (ফা)–গোলাপ ফুল

ওরে 'গুলাব'! নিরিবিলি/বুঝি নবীর কদম ছুঁয়েছিলি/তাই,
তাঁর কদমের খোশবু আজও তোর আতরে জাগে। [বন গীতি]

গুলশান (ফা)– বাগান

অসম্ভবেরে সম্ভব করো জাগো নব যৌবন,
ভিক্ষা দাও গো ; এ ধরা হউক আল্লাহ 'গুলশান'। [আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও]

গুল বদন (ফা. আ)–ফুল–শরীর। ('বদন' আরবী, অর্থ শরীর)

নৈশাপুরের 'গুলবদনী'র চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা হাসি শিরীন শিরীন বোল।

গুলিস্তান (ফা)– বাগান, ফুলময় বাগান

চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এলো ভোরের দরদালানে
পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে 'গুলিস্তানে'।

গেরেফতার (ফা)– বন্দী

দেহ ও মনের রোজা আমার
এফতার করে 'গেরেফতার'
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর ঐ চাঁদে। [নতুন চাঁদ]

গোর (ফা)–কবর

হবে জুদা তার তন্ শির
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত–
যে নেবেরে তাঁরে 'গোরে'।

গোরস্তান (ফা)–কবর খানা

জিন্নাত হতে দেখিব মোদের 'গোরস্তানের' পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নতুন ঘর।

গোলাম (আ)– চাকর

তাহাদের ধরে 'গোলাম' করিয়া ভরিতে ছে কার ঝুলি?
চা বাগানের আড় কাঠি যেন চালান করিছ কুলি।

গোলাম খানা (আ, ফা)–চাকরের ঘর (ফারসী 'খানা' যুক্ত হয়েছে)

শহিদী দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি 'গোলাম খানায়' বসি।

গোস্বা (উ)– ক্রোধ

মুণ্ডুটা তার খসাই
'গোস্বা'তে আর পাই না ভেবে কি যে করি দশাই । [কামাল পাশা]

চ

চরকা (ফা)- সুতো তৈরীর চাকা
শনের চরকা ঘোর
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে
চড়ে দেড়শত চোর। [রাজা প্রজা]

চাপকান (ফা)- ঢিলা কোর্তা
দরিদ্রে ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেঁপে হল ধামা-ঝুড়ি,
শীতের দিনেও চর্বি গলিয়া পড়ে 'চাপকান' কুঁড়ি।

চাপরাশি (ফা)-পিয়ন
গোলামীর চেয়ে শহিদী-দর্জা অনেক উর্ধে জেনো,
'চাপরাশির' ঐ তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো।

চেরাগ (ফা)- বাতি
দিনে আর রাতে 'চেরাগ' যাহার চন্দ্র সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম প্রেমের অশ্রু ধারা?

চেহারা (ফা)- অবয়ব
মর্দের মতো 'চেহারা' ওদের স্বাধীনের মতো বুলি,
অলস, দু'বাজু দু'চোখে সিয়াহ অবিশ্বাসের ঠুলি। [খালেদ]

চোগা (তুর্কি)- পশমী জামা
অন্তরে ভোগী বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,
'চোগা' চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয়।

জ

জওহর (আ. ফা -'গওহর') মুক্তো, মণি
পানি কওসর
মনি 'জওহর'। [ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম]

জওয়ান (আ)-যুবক, শক্তিধর।
এমন সময় আসিল 'জওয়ান' হাথেলিতে হাতিয়ার
খর্জুর শীষে ঠেকিয়াছে গিয়া উচাঁ উষ্ণীষ তার! [খালেদ]

জওয়াব (আ)- উত্তর।
যদিরে তুই গরুর সখি
পার হয়ে যাস পুলসেরাত

কি দিবি মোহাম্মদে 'জওয়াব'? [শহিদী ঈদ]

জখম (ফা)– আঘাত।

নিজের হাজার ঘায়েল 'জখম' ভুলে তখন ডুকরে কেন
কেঁদেও ফেলে শেষে
কে যেন ভাই কলজে খানা পেষে। [কামাল পাশা]

জঙ্গ (ফা)– যুদ্ধ

জং ধরে নি কো কখনো তাহাতে 'জঙ্গের' খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুঈন মেয়ে। [খালেদ]

জমজম (আ)– মক্কার বিখ্যাত কূপ।

টলে কাঁখের কলসে কাওসর ভর,
হাতে আব 'জমজম' জাম।

জমিন (ফা)– মাটি

জমায় না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন
আসমান যার ছত্র ধরেছে পাদুকা যার 'জমিন'।

জমিদার (ফা)– ভুস্বামী ভূমির মালিক

রবে না বাদশাহ্ রাজা 'জমিদার' মহাজন
কারো বাড়ী উৎসব কারো বাড়ী অনশন। [জয় হোক জয় হোক]

জলসা (আ)– সভা, সম্মেলন

ফুলের দরবারে পাখীর 'জলসা'তে
বুকের অঞ্চল সিংহাসন মম
বসো আমার চাঁদ-চাদিনী রাতে। [গীতি শতদল]

জবেহ (আ)– হত্যা, বধ

নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে,
কেন হতেছিস দলে দলে তোরা কতল গাহেতে 'জবে'? [আজাদ]

জল্লাদ (ফা)– খুনী

এদের ভুলের মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
ইহাদের প্রেমে কাঁদি আমি, কেন হলো এরা জল্লাদ?

জহর (ফা)– বিষ

'জহর' নিয়ে জহরত দেয়া নও বণিকের নও খেলা। [মরু ভাস্কর
কৈশোর]

জমায়েত (আ)– সমাগম

শুধু প্রজাদের 'জমায়েত' হবে আজিকার ঈদগাহে,

কাহার সাধ্য কোন ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে।

জাকাত (আ)– পবিত্রতা, (ইসলামী মতে গরীব দুঃখীদের দান করা।)
বুক খালি করে আপনারে আজ দাও 'জাকাত'।
জানাজা (আ)– মৃত ব্যক্তির জন্য নামাজ
মৃত্তিকা মাতা কেঁদে মাটি হলো বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার 'জানাজা' কাঁধে যেন–তাই বহে ঘন নাভিশ্বাস।
জান্নাত (আ)– স্বর্গ, বেহেশত্।
ইহারাই জিন, এরাই অসুর এরাই শত্রু 'জান্নাতে'র
যুগে যুগে আসি' পয়গম্বর সংহার করে এই কাফের। [মহা সমর]
জামাত (আ)– দল
শয়তান আজ ভেশ্‌তে বিলায় শারাব জাম
দুশমন দোস্ত এক 'জামাত।'
জামানা (আ)– সময় কাল
না ফরমানীর 'জামানা'য়
আনিল ফরমান খোদার [জুলফিকার]
জালিম (আ)– অত্যাচারী
আগুন যে বুকে আছে তাতে আরও দুঃখ ঘৃতাহুতি দাও,
বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোক 'জালিম' পানে উধাও। [আজাদ]
জাহাজ (আ)– পোত
কোরানের ওই 'জাহাজ' বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে। [জুলফিকার]
জাহান্নাম (আ)– নরক।
আজ 'জাহান্নামের' বহ্নি সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফিরদৌসের নার্গিস লালা ফেলে আঁসু পরিমল।
জাহান (ফা)– পৃথিবী
আজি ইসলামের ডঙ্কা গরজে ভরি 'জাহান'
নাহি বড় ছোট –সকল মানুষ এক সমান।
জানোয়ার (ফা)–পশু
আনোয়ার ভাই! 'জানোয়ার' সব সাফ। [কামাল পাশা]

জিঞ্জির (ফা)– শিকল
আজাদ আত্মা! আজাদ আত্মা! সাড়া দাও, দাও সাড়া,
এই গোলামীর 'জিঞ্জির' ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া। [আজাদ]

জিন (আ)– আগুনের তৈরী মনুষ্য সদৃশ্য জীব

ওরা নির্জীব, জিব নাড়ে শুধু তবু স্বার্থ ও লোভ বশে,

ওরা 'জিন' প্রেত, যক্ষ উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে। [এক আল্লাহ জিন্দাবাদ]

জিন্দাবাদ (ফা)– দীর্ঘজীবি হোক।

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ, ।

আমরা বলিব, সাম্যশান্তি, এক আল্লাহ 'জিন্দাবাদ'। [এক আল্লাহ জিন্দাবাদ]

জিন্দান (ফা)– জেলখানা।

নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম ভাই,

জুলুমের 'জিন্দানে' জনগণে আজাদ করিতে চাই।

জিন্দেগী (ফা)– জীবন

'জিন্দেগী' ভর তারি মালা প'রবো আমার গলে। [ইসলামী গান]

জিয়ারত (আ)– পরিদর্শন

কাবার 'জিয়ারতে' তুমি কে যাও মদিনায়?

আমার সালাম পৌছে দিও নবীজীর রওজায়। [গীতি শতদল]

জুদা (ফা)– পৃথক

হাঁকে ঘন ঘন বীর

হবে 'জুদা' তার তন শির

আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত।

জুলফিকার (আ)– তরবারি

আজ ভোঁতা সে দু'ধারী ধার

ঐ আলীর 'জুলফিকার'।

জুলুম (আ)– অত্যাচার

আমার পিছনে পীড়িত আত্মা অগণন জনগণ

অসহ 'জুলম' যন্ত্রণা পেয়ে করিতেছে ক্রন্দন। [আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও]

জেওর (আ)– অলঙ্কার

খালেদ! খালেদ! তাজিমের সাথে ফরমান পড়ে ভূমি

সিপা' সালারের সকল 'জেওর' খুলিয়া ফেলিলে তুমি। [খালেদ]

জেহাদ (আ)– যুদ্ধ

আশা ভরা মুখ, তাজা তাজা বুক, নৌজোয়ানীর গান,

দুঃসাহসীর মরণ সাধনা, 'জেহাদে'র অভিযান।

জোশ (ফা. উ.)– শক্তি সাহস, উৎসাহ

গম্বুজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মসজিদে?

মুয়াজ্জিনের হুঁশ নাই, নাই 'জোশ' চিতে শেষ হৃদে।

জোহর (আ)– মধ্যাহ্ন সময়ের নামাজ

ঘুমিয়ে কাজা করেছি ফজর

তখনো জাগিনি যখন 'জোহর'। [গীতি শতদল]

তওবা (আ)– অনুশোচনা

তাতে 'তৌবা তৌবা' করি যদি

যাবে কামানের গোলা আটকে ঠিক। [তৌবা]

তকদীর (আ)– ভাগ্য

বদলাবে 'তকদীর' আমার

ঘুচিবে সর্ব অন্ধকার। [নতুন চাঁদ]

তকবীর (আ) আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণা

বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা পেয়েছ কি কওসর?

বেহেশতে হতে 'তকবীর' ধ্বনি আল্লাহু আকবর।

তখ্‌ত (ফা)– সিংহাসন

'তখ্‌তে' তাহার কালি পড়িয়াছে, অবিচারে আর পাপে,

তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে।

তখ্‌ত তাউস (ফা.আ.) ময়ুর সিংহাসন। আরবী 'তাউস' বা 'তাবুস' অর্থ ময়ূর।

কেহ চাহিয়াছে 'তখ্‌ত-ই-তাউস' কোহিনূর কেহ, এসেছে কেউ

খেলিতে সেরেফ খুশরোজ হেথা, বন্যার সম এসেছে ঢেউ। [আমানুল্লাহ্‌]

তয়ম্মুম (আ)–পানির অভাবে মাটি ও পাথর দিয়ে অজু

যত সে জালিম রাজা বাদশারে মাটিতে করেছে গুম,

তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া 'তয়ম্মুম' [খালেদ]

তসবীর (আ)–ছবি

মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ 'তসবীর'

তসবীতে জপি যত তাঁর নাম, তত ঝরে আঁখি নীর।

তসলিম (আ)–সালাম

সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ 'তসলিম' করি তারে

ঈদ গাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।

তলোয়ার (ফা)–তরবারি

যুগে যুগে তুমি অকল্যাণের করিয়াছ সংহার,

তুমি বৈরাগী, বক্ষের প্রিয়া, ত্যাজি ঘর 'তলোয়ার'। [আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও]

তসবীহ্‌ (আ) –জপমালা।

ইহারাই ফেরদৌস আল্লার প্রেম ঘন অধিবাসী
'তসবী' ও তলোয়ার লয়ে আসি অসুরে যায় বিনাশি'।

তহরিমা (আ)– নামাজের নিয়ত করে বুকে হাত বাঁধা
খালেদ! খালেদ! ফজরে এলে না, জোহর কাটলো কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা 'তহরিমা' বেঁধে। [খালেদ]

তাজ (আ)– মুকুট, টুপী।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যার কাজ,
তাঁরি তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তাঁরি শির 'তাজ'।

তাজমহল (আ)– সম্রাট শাহ্জাহান নির্মিত স্মৃতি-সৌধ।
দাও সে আকবর সেই শাহ্জাহান
সেই 'তাজমহলে'র স্বপ্নসাধ। [গুলবাগিচা]

তাজী (ফা)- ঘোড়া।
এক মুর্গীর জোর গায়ে নেই
ধরতে আসে তুর্কী 'তাজী'। [কামাল পাশা]

তালাক (আ)– বিবাহ-বিচ্ছেদ।
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে
বিবি 'তালাকে'র ফতোয়া খুঁজেছি ফেকাহ্ ও হাদিস চষে।

তাম্বু (আ)–সামিয়ানা।
আসমানী তার 'তাম্বু' টানানো মাথার পরে
গ্রহ রবি শশী দুলিতেছে আলো স্তরে স্তরে।

তামাম (আ)– সম্পূর্ণ, শেষ।
শোন দামাম কামান 'তামাম' সামান
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়াহি সাল্লাম।

তুফান (আ)–ঝড়।
'তুফান' আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
জেহাদ জেহাদ বিপ্লব বিদ্রোহ মোর গান গাওয়া। [চিরনির্ভয়]

তুনে (উ)–তুমিই।
কামাল 'তুনে' কামাল কিয়া ভাই। [কামাল পাশা]

তেজ (ফা)–শক্তি।
পরম প্রবল আল্লার 'তেজ' কোথা হতে যেন এলো
বহিতে লাগিল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন এলোমেলো।

তেগ (ফা)- তলোয়ার।

হুলকুমে হানে 'তেগ' ওকে বসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।

তৌফিক (আ)-শক্তি।

'তৌফিক' দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম জাঁহা পুনঃ হোক আবাদ। [জুলফিকার]

তৌহিদ (আ)-একত্ব।

'তৌহিদ' আর বহুত্ববাদে বেধেছে আজিকে মহাসমর
লা শরীক এক হবে জয়ী- কহিছে আল্লাহু আকবর। [মহাসমর]

দ

দম (ফা)- নিঃশ্বাস।

কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির 'দম' টুটে।

দরগাহ (ফা)- মাজার।

নৈরাশ হইয়ো না রে 'দরগাহে' আল্লার। [গীতি শতদল]

দরবার (ফা)-সভাস্থল, কোর্ট।

খসে পড়ে হাত হতে শত্রুর তরবার
ভাসে শোকে কিয়ামতে আল্লার 'দরবার'।

দরবেশ (ফা)-ভিক্ষুক, গরীব, আল্লার পথে দরিদ্র জীবন যাপন।

হায় ঋষি 'দরবেশ'
বুকের মাণিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তাঁরে দেশ দেশ। [ঈশ্বর]

দরাজ দিল (ফা)- প্রশস্ত হৃদয়।

শুকনো খুবজ খোর্মা চিবায়ে উমর 'দরাজ দিল',
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দীন দুনিয়ার খিল। [খালেদ]

দরিয়া (ফা) -সমুদ্র।

মিকাইল অবিরল
লোনা 'দরিয়া'র সবি জল ঢালে
কুল মুল্লুকে।

দরুদ (ফা)- নবীর প্রশংসা।

আরব আবার হলো আরাস্তা
বান্দারা যতো পড়ে 'দরুদ'।

দহলিজ <দলিজ (ফা)-দরজার পাশের স্থান, বারান্দা

নতুন করিয়া আমিনা জননী কাঁদিলেন হেরি শূন্য কোল,
অদূরে 'দলিজে' মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন রোল। [মরু ভাস্কর ঃ পরভৃত]

দলিল (আ)–প্রমাণ।

দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা নাই 'দলিল'
কবুলিয়তের না বালাই।

দস্ত (ফা)–হাত

বাজুতে তাহার বাঁধা কোরান, বুকে দুর্মদ বেগ
আলবোরুজের চূড়া গুঁড়ো করা 'দস্তে' দারুণ তেগ। [খালেদ]

দাওয়াত (আ)–আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ।

'দাওয়াত' এসেছে নয়া জামানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান। [গুল বাগিচা]

দানা পানি (ফা)–খাদ্য পানীয়।

মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি
ইহারা দানব কেড়ে খায় সব মানবের 'দানা পানি'। [গোঁড়ামী ধর্ম নয়]

দামামা (ফা)– ঢোল, নাকাড়া।

তবে শোন, ঐ শোন বাজে কোথা 'দামামা'
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।

দিল (ফা) -অন্তর।

এ কি বিস্ময়, আজরাইলেরও জলে ভর ভর চোখ,
বেদরদ 'দিল', কাঁপে থর থর যেন জ্বর জ্বর শোক।

দুনিয়া (আ)– পৃথিবী।

তারা বলে মোরা যদি প্রার্থনা করি তাঁর কাছে এক সাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির 'দুনিয়া'তে।

দুলদুল (আ)– হজরত আলীর ঘোড়া।

বিশ্বাস করো এক আল্লাতে প্রতি নিঃশ্বাসে দিনেরাতে
হবে 'দুলদুল' -আসোয়ার পাবে আল্লার তালোয়ার হাতে। [এক আল্লাহ জিন্দাবাদ]

দুশমন (ফা)– শত্রু।

বালু ফেঁড়ে ওঠে রক্তসূর্য ফজরের শেষে দেখি,
'দুশমন' খুনে লাল হয়ে ওঠে খালেদী আমামা এ কি? [খালেদ]

দিশারী (ফা)- পথ প্রদর্শক।

এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি না ভয়,
মোদের পথের 'দিশারী' সে এক সর্বশক্তিময়।

দোজখ (ফা) -নরক।

নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে
পরকালে 'দোজখে'র আগুনে জ্বলিবে [জয় হোক জয় হোক]

দোয়া (ফা)-আশীর্বাদ!

হে শহীদ বীর, এই 'দোয়া' করো আরশের পায়া ধরি,
তোমারই মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি। [উমর ফারুক]

দোস্ত (ফা)- বন্ধু।

ঈদ উৎসব আসিলরে যেন দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত দুশমনী ছিল যথা নিল 'দোস্ত'ই আসিয়া জিনে। [মরুভাস্কর]

দৌলত (আ)- সম্পদ।

ধন 'দৌলত' চান না উনি
রন মশগুল খোদার নামে। [মৌলবী সাহেব]

ন

নওজোয়ান (ফা)- নব যুবক।

নিত্য সজীব যৌবন যার এস এস সেই 'নওজোয়ান'
সর্বক্লৈব্য করিয়াছে দুর তোমাদেরই চির আত্মদান। [এক আল্লাহ জিন্দাবাদ]

নওরোজ (ফা)- নতুন দিন, নববর্ষ।

এরাই শহীদ প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীরুর বাজারে এরা আনে নিতি নব 'নওরোজ' মেলা।

নওয়াব (ফা)- রাজা, জমিদার।

ত্যাগ করে না ক ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,
'নওয়াব' বাদশা জমিদার হয়ে চায় প্রতিষ্ঠা মদ।

নওশা (ফা)- নতুন বর।

রণে যায় কাসেম ঐ দু' ঘড়ির 'নওশা'
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা।

নকীব (আ)- আহ্বায়ক, ঘোষক।

নকীবের তুরি ফুৎকারে আজ
বারোয়ার সুরে কাঁদে।

নজর (আ)- দৃষ্টি।

ফজর বেলার 'নজর' ওগো উঠলে মিনার পর

ঘুম টুটানো আজান দিলে, আল্লাহু আকবর। [বাংলার আজীজ]

নজরানা (আ)– উপহার।

সুর শা'জাদার প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,

মোর বনগীতি 'নজরানা' দিয়া দস্ত চুমি। [জহীর উদ্দিন খান]

নফসি নফসি (আ)– আত্ম–বিলাপ

ঝরা জলপাই পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সাদ

দিল ফরমান, 'নফসি নফসি' জপে, গণে পরমাদ। [খালেদ]

নয়া জামানা (আ. ফা)– নতুন কাল, আধুনিক কাল।

ওরে যৌবন রাজার সেনানী

'নয়াজামানার' নওজোয়ান। [জীবনে যারা বাঁচিল না]

নবী (আ)– পয়গম্বর, আল্লার সংবাদ বাহক।

আঁধার ধরণী চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি,

মক্কায় পুন: ফিরিয়া আসিল কিশোর নবী।

নবুয়ত (আ)– পয়গম্বরত্ব।

দেখেছি এর পিঠের পর 'নবুয়তে'র মোহর সীল

চক্ষে ইহার পলকবিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল। [মরুভাস্কর ঃ কৈশোর]

নহবত (আ)– সুর স্বর।

খাদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালী 'নহবতে' বাজে সুর মধুর। [খাদিজা]

নহর (আ)– নদী।

'নহরের' পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রু জলে,

তসবীর তার জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে।

নামাজ (ফা)– উপাসনা।

'নামাজ' রোজার শুধু ভড়ং

ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং।

নিয়ামত (আ)– আশীর্বাদ, লাভ।

এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে

নিজেদের করিল বঞ্চনা। [জীবনে যারা বাঁচিল না]

নিশান (ফা)– পতাকা।

বাজাই বিষান উড়াই 'নিশান' ঈশান কোণের মেঘে,

প্রেম বৃষ্টি ও বজ্র প্রহারে আত্মা উঠিবে জেগে।

নূর (আ)–আলো।

আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ,

এই পথে মোর চলে যেতেন 'নূর' নবী হজরত। [গীতি শতদল]

নীল (ফা)-রং

বিষে 'নীল' হয়ে আসে মনি–সে কি অধিক মূল্য তরে?
[মরু ভাস্কর ঃ আলো আঁধারি]

নেকাব (আ)– পর্দা, ঘোমটা।

গুলরুখ নাজুক 'নেকাবে' ঢাকা।

নেস্ত–নাবুদ (ফা)– ধ্বংস কাণ্ড।

তাই তারা আজ 'নেস্ত নাবুদ'
আমরা মোটেই হই নি জের। –[কামাল পাশা]

প

পয়জার (ফা)– জুতা।

খালেদ! খালেদ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশমন মারা দুটো 'পয়জার'ও হবে? [খালেদ]

পয়গম্বর (ফা)– মহাপুরুষ, নবী।

কোনো ওলী কোনো দরবেশ যোগী কোনো 'পয়গম্বর',
অন্য ধর্মে দেয় নিক গালি, কে রাখে খবর? [গোঁড়ামী ধর্ম নয়]

পয়গাম (ফা)– সুখবর।

শুভ বিবাহের 'পয়গাম' তারে পাঠাল দেশের রেওয়াজ তাই,
দিনও তারিখ হল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বিয়াই। [খাদিজা]

পয়মাল (ফা)– বিনষ্ট, ক্ষতি।

তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
দাদা, তেরি ঘর কিয়া বরবাদ 'পয়মাল'

পরওয়ার দেগার (ফা)– প্রভু, আল্লাহতা'লা।

বাদশা তুমি দিন ও দুনিয়ার
হে 'পরওয়ার দেগার'। [জুলফিকার]

পরদা, পর্দা (ফা) ঢাকনা , ঘোমটা।

অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা 'পর্দা' পানে
গ্রহ তারা মোর সেহেলিয়া নিশি জাগে তার সন্ধানে।

পরোয়া (ফা)–ভয়, সংকোচ।

'পরোয়া' করিনা বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে। [আমার কৈফিয়ত]

পাক (ফা)– পবিত্র।

খালেদ! খালেদ! মিসমার হলো তোমার ইরাক শাম,

জর্ডন নদে ডুবিয়াছে 'পাক' জেরুজালেমের নাম। [খালেদ]

পলিদ (ফ)- অপবিত্র
খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি,
'পলিদ' হইলো, খুলেছে এখানে য়ুরূপ পাপের ভাঁটি।

পাও তক (উ)- পা পর্যন্ত।
শির হতে এই 'পাও তক' ভাই
লাল লালে লাল খুন মেখে। [কামাল পাশা]

পানাহ (ফা)- সাহায্য।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে
শরণ যাচি, 'পানাহ' মাগি তাহার তরে। [আমপারাঃ সুরা ফলক]

পিঞ্জর (ফা)- খাঁচা।
ফিরদৌসের রণ দুন্দুভি
শুনে 'পিঞ্জরে' জেগেছে শের।

পিরহান (ফা)- জামা।
পিরানের' সব দামন ছিন্ন কিন্তু সে সম্মুখে
পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুঃখে। [খালেদ]

পিয়ালা (ফা)-পাত্র।
চাঁদের পিয়ালা'তে আজি
জ্যোছনা-শিরাজী ঝরে। [গীতি শতদল]

পীর (ফা)-জ্ঞানবৃদ্ধ।
মোর জ্ঞানী 'পীর' আজ খারাবির পথে,এসো মোর সাথী পথবালা'
[নির্ঝর গজল]

পেরেশান (ফা)- হয়রান।
এই ধূর্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
আলীর সেনারে করেছে সদাই বিব্রত 'পেরেশান'।

ফ

ফকির (আ)- গরীব।
তুমি, চাহ নাই কেহ হইবে আমীর,পথের 'ফকির' কেহ [বনগীতি ঃ সংযোজন]

ফখর (আ)- অহঙ্কার।
মার খাই আর তাহারি 'ফখর'
করি হর্দম জগৎময়। [জীবনে যাহারা বাঁচিল না]

ফরমান (ফা)- আদেশ।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার 'ফরমান'। [এ কি আল্লার কৃপা নয়?]
ফরিয়াদ (ফা)- অভিযোগ।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ 'ফরিয়াদ'
আমরা তাদের রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ।
ফানা (আ) -ধ্বংস, বিলয়।
শুন, মোমিন মুসলমান/করি আমি নিবেদন
এ দুনিয়া 'ফানা' হবে জেনে জানো না। [জুলফিকার]
ফেরেশতা (আ)-দেবদূত, স্বর্গীয় দেবতা।
অসম্ভবের অভিযান -পথ তারাই দেখায় নরে
সর্ব সৃষ্টি 'ফেরেশতারেও' তারা বশীভূত করে।
ব
বজ্জাত (ফা)-দুষ্ট, খারাপ<বজ্জাতি।
জাতের নামে 'বজ্জাতি' সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া। [জাতের বজ্জাতি]

বদ (ফা)-খারাপ।
অজ্ঞান তিমিরান্ধকারের ইহারা বদ্ধজীব,
উৎপীড়কের পীড়িত দলিত 'বদ' নসীব। [আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও]
বদনসীব (ফা. আ.)-খারাপ ভাগ্য, দুর্ভাগা (নসীব আরবী, অর্থ ভাগ্য)
যেদিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পংগু, খঞ্জ, আতুর বদ নসীব।

বদনাম (ফা)-দূর্নাম।
তামাম মোর কাম শুধুই 'বদনাম' নিজের দোষ ভাই
নিজের দোষ সে। [নির্ঝর]
বদমাশ (ফা)- পাজী।
চারদিকে এই গুণ্ডা এবং 'বদমায়েসীর' আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে? [পথের দিশা]

বন্দী (ফা)- আবদ্ধ।

তারাই 'বন্দী' হয়ে আছে গ্লানি অধীনতা কারাগারে,
তারাই নিত্য জ্বালায় পিত্ত অসহায় অবিচারে।

বদল<বদলানো (আ)–পরিবর্তন।
এদের মুক্তি অদৃষ্টবাদ,বসে বসে ভাবে একা,
'এ মোর নিয়তি' 'বদলানো' নাহি যায় কপালের লেখা।
বরবাদ (ফা)– বিনষ্ট, নষ্ট।
কারো অট্টালিকা কারো খড়হীন ছাদ,
রবে না ভেদ, সব ভেদ হবে 'বরবাদ'। [জয় হোক জয় হোক]

বরাত (ফা)– ভাগ্য।
বদ নসীবের 'বরাত' খারাপ বরাদ্দ তাই করলে কি না আল্লায়। [কামাল পাশা]
বাগিচা (ফা)– বাগান
খোদার 'বাগিচা' এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল'
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচার বুলবুল।
বাদশাহ (ফা)–সম্রাট, রাজা।
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
'বাদশাহ' হতে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমিদারী।
বারেষ (উ)–বৃষ্টি।
শূন্য পিঠে কাঁদে দুল দুল
হজরত হোসেন শহীদ
আসমানে শোকের 'বারেষ'
ঝরে আজ খুন হয়ে। [গুল বাগিচা]
বান্দা (ফা)– দাস, গোলাম।
সে দিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
ঘুচে যাবে মোর চির জনমের সকল দুঃখ ব্যথা। [একি আল্লার কৃপা নয়?]
বিমান (ফা)– আকাশ যান।
কাঁপুক বিশ্ব দূর 'বিমান' [গুল বাগিচা]
বিলকুল (আ)– সম্পূর্ণ
জান মারা তার পাষাণ পাঞ্জা 'বিলকুল' ঢিলা আজ.
কবজা নিসাড় কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।
বুলন্দ (ফা) –উচ্চ, ভাল।

দু'জনার হবে 'বুলন্দ' নসীব, লাখে লাখে হবে বদ নসীব,
এ নহে বিধান ইসলামের।

বুলবুল (ফা)- কোকিল।
শুষ্ক মনের সাহারায় যেন দজলা ফোরাত বহে,
পিঁজরার 'বুলবুল, বসরার গোলাবের কথা কহে।

বুসা (ফা)- চুমা
খালেদ! খালেদ! ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল প্রায়,
বলে, 'সত্যিই মহাবীর তুই 'বুসা' দিই তোকে আয়!

বিয়াবান (ফা)- মরুভূমি
আনোয়ার! আনোয়ার!
জনহীন এ 'বিয়াবানে' মিছে পস্তানো আর!

বেইমান (ফা. আ) বিশ্বাসঘাতক।
জানো না কি তুমি, রে 'বেইমান'
আল্লাহ সর্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সব কিছু?

বে আদব (ফা.আ)- অভদ্র।
যত হুর পরী অপসরী দল
'বে আদবী' দেখে চটিয়া লাল। [জীবনে যারা বাঁচিল না]

বেনসীব (ফা.আ.)- ভাগ্যহীন ('নসীব' আরবী, অর্থ ভাগ্য)
কাঁদিয়া কহিনু ওরে 'বে নসীব' হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল? [আজাদ]

ম

মঞ্জিল (আ)—গন্তব্যস্থান।
নজ্জুম সব বলছে সবাই, আসবে সেজন এ মঞ্জিল,
এই সে মানে, আমার ধ্যানে তাদের গোণায় আছে মিল। [মরু ভাস্করঃকৈশোর]

মওত (আ)—মৃত্যু।
'মওতের' দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম? [খালেদ]

মজলুম (আ) —অত্যাচারিত।
সাত আসমান বিদারী আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিম মারিয়া করিবেন 'মজলুমের' প্রাপ্য শোধ।

ময়দান (ফা)—মাঠ।

আমি তকবীর ধ্বনি করি শুধু কর্ম বধির কানে
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে 'ময়দানে'।

মর্‌দ (মর্দ) (ফা)–পুরুষ।
ওরা মরক্কো 'মর্দের' জাত মৃত্যু মুঠার পরে,
শত্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে। [খালেদ]

মস্তান (ফা)– মাতাল।
'মস্তান'!
ব্যস থাম।

মহফিল (আ)– সভা, সংস্থা।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশত এলো দুনিয়ার 'মহফিলে'।

মহম্মদ (আ)–প্রশংসিত।
ত্রিভুবনের প্রিয় 'মুহম্মদ' এলোরে দুনিয়ায়। [জুলফিকার]

মহরম (আ)– হিজরী সালের প্রথম মাস।
কত 'মহরম' এলো, গেলো চলে বহুকাল
ভুলিনি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল।

মসজিদ (আ)– উপাসনা স্থান, উপাসনা ঘর।
এরাই আত্ম প্রতিষ্ঠালোভে 'মসজিদে মসজিদে'
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষা হায় স্বজাতির হৃদে।

মাজহাব (আ)– সম্প্রদায়।
হানাফী ওহাবী লা-মাজহাবীর তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল, তলপী তোল। [খালেদ]

মাল্লা (আ)– নাবিক।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি 'মাল্লা'
দাড়ী মুখে সারি গান লা-শরীক আল্লা।

মাফ(আ)– ক্ষমা।
আজকে যত পাপী তাপী সব গুনাহ্ পাইল 'মাফ'ই। [জুলফিকার]

মারফত (আ)– মাধ্যম।
তাই সে পরম ভিক্ষু ভিক্ষা চায়
ভিখারীর 'মারফতে' তব দরজায়। [আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও]

মারহাবা (আ)– স্বাগতম।
ওয়ে 'মারহাবা' ওয়ে মারহাবা এয় সরওয়ারে কায়েনাত।

মাতম (ফা)– দুঃখ শোক।

হায় হায় হায়, কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনি ও কে,
দজলা ফোরাত নতুন করিয়া 'মাতম' করিছে শোকে। [খালেদ]

মাজার (ফা)– কবর।
খালেদ ! খালেদ! ভাঙিবে নাকি হাজার বছুরী ঘুম?
'মাজার' ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম। [খালেদ]

মিনার (ফা)– মসজিদের উচ্চ টাওয়ার যেখান থেকে মুয়াজ্জিন আজান দেন।
ফোরাতের পানি রক্তিম হলো, মাগো বিদ্বেষ বিষে
কারা তীর হানে কাবার শান্তি 'মিনারের' কার্ণিশে।

মিসকিন (আ)–ভিক্ষুক।
আমরা কাঙাল, আমরা গরীব, ভিক্ষুক 'মিসকিন'
ভোগীদের দিন অন্ত হউক, আসুক মোদের দিন।

মুনাজাত (আ)– প্রার্থনা।
যে হাতে কেবলি কর 'মুনাজাত'
সে হাতে এবার অস্ত্র ধরো। [সাধনা]

মিছিল (ফা)– কাফেলা।
কারবালা যেন নাহি আসে আর মহররমের চাঁদে
তাজিয়া 'মিছিলে' একি কাজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে।

মুনাফা (আ)– লাভ, আয়।
কিয়ামতের বাজারে ভাই 'মুনাফা' চাও বহুত। [জুলফিকার]

মুনাফিক (আ)–প্রতারক, বেইমান।
ইসলাম তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে করো ফখর
'মুনাফিক' তুমি সেরা বেদ্বীন।

মুবারক (আ)–পবিত্র।
আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে 'মুবারক' মোহাম্মদ, পুঁজি আল্লাহু আকবার। [জুলফিকার]

মুয়াজ্জিন (আ)– আহ্বায়ক।
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতী আজান
দিতেছে নবীন 'মুয়াজ্জিন'।

মুরশিদ (আ)– ধর্মীয় পরিচালক।
খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে,
ছেড়ে মসজিদ আমার 'মুর্শিদ' এলো যে এই পথ ধরে। [জুলফিকার]

মুর্দা (ফা)–লাশ, শবদেহ।

কোথায় ইমাম কোন সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?
চারদিকে তব 'মুর্দার' লাশ।

মুলক<মুলুক (আ)– রাজ্য, দেশ।

পরের 'মুলুক' লুট করে খায়,ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই, তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত। [কামাল পাশা]

মুসলিম (ফা)– আল্লার একত্বে বিশ্বাসী জাতি।

ধৈর্য্য ও বিশ্বাস হারায় সে 'মুসলিম' নয় কভু
বিশ্বে কারেও করে না কো ভয় আল্লাহ্ যার প্রভু।

মুসলমান (ফা)– আল্লার একত্বে বিশ্বাসী শান্তিবাদী মানব। (ফারসী শব্দ 'মুসলিম' –এর বহু বচন মুসলমান)।

হউক হিন্দু, হোক ক্রীশ্চান, হোক সে 'মুসলমান'
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাঁহার ধরায় অকল্যাণ। [এ কি আল্লাহর কৃপা নয়?]

মুসাফির (আ) পথিক, ভ্রমণকারী।

আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই
বেদুইনদের সাথে 'মুসাফির' বেশে ফিরিত গো সর্বদাই। [মরু-ভাস্কর ঃ পরভূত

মুসাফিরখানা (আ. ফা)– অতিথি শালা।

আমি ছিনু পথ ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
'মুসাফির' খানা ভুলায়ে আনিবে কোন্ এই মঞ্জিলে?

মোল্লা (আ)– শিক্ষক, জ্ঞানী, পণ্ডিত।

আজ জল্লাদ নয় প্রহলাদ সম 'মোল্লা, খুন-বদন,
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।

মৌলবী (আ)–পণ্ডিত।

'মৌলবী' সাহেব দুনিয়া ভুলে
জালিয়ে রাখেন দ্বীনের বাতি। [মৌলবী সাহেব]

মৌলানা (আ)–পণ্ডিত, জ্ঞানী (আসল অর্থ 'আমাদের প্রভু'। 'মওলা' থেকে মৌলানা)।

কোন শাস্ত্রী বা 'মৌলানা' বলো জেনেছে তাহার ভেদ?
গাধার মতন বয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরাণ বেদ। [সুবেহ্ উম্মীদ]

মৌলুদ (আ)–জন্ম উৎসব (রাসুলে করীমের জন্ম উপলক্ষে আয়োজিত)

'মৌলুদ' শরীফে উনিই

ওঁরেই ডাকি ফাতেহাতে। [মৌলবী সাহেব]

মোস্তফা (আ)–পছন্দনীয়।

আয় মরুপারের হাওয়া, নিয়ে যারে মদিনায়,
জাত পাক 'মোস্তফার' রওজা মোবারক যেথায়। [জুলফিকার]

র

রওশন (ফা)– উজ্জ্বল, সুন্দর।

সূর্য যেন গো দেখিয়াছে তার পিছনের অমা রাতি,
রৌশন রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি। [উমর ফারুক]

রওশনী (ফা)– ঔজ্জ্বল্য, আলোকময়তা।

বদর বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি অমা রৌশনীতে?

রমজান (ফা)–উপবাস

মাহে 'রমজান' এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর
নামিবে তাহার রহমত এই ধূলির পর।

রসুল (আ) –প্রেরিত পুরুষ।

আল্লা 'রসুল' মুখে বলে তাঁর ক্ষমা পায় নিক এরা
দেখেছে শুষ্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কাবা ও হেরা।

রসিদ (ফা)– স্বীকৃতি পত্র

পুলসিরাতের পুল হতে পার
নিয়ে রাখবে আগাম 'রসিদ'। [গুলবাগিচা]

রহমত (আ)– দয়া।

বিশ্বাস করো অবিশ্বাসীরা, 'রহমত' তাঁর আসিছে ঐ
ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আল্লা বৈ। [মহাসমর]

রাহা (ফা)– রাস্তা, পথ।

অস্তপারের দেশ পারায়ে বহুত সে দূর
তোদের ঘরের 'রাহা'। [কামাল পাশা]

রোজ (ফা)– দিন, দিবস

যেন 'রোজ'– হাসরের ময়দান,
সব উন্মদ সম ছুটে।

রোজ কিয়ামত (ফা আ.)– ধ্বংস, বিলয়ের দিন।

জানি না কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহা প্রলয়,
মিশরের তরে 'রোজ কিয়ামত' ইহার অধিক নয়। [চিরঞ্জীব জগলুল]

রোজা (ফা)– উপবাস।

গরীবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা 'রোজা' রাখে,
পরম আত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাকে।

রুহ (আ)– আত্মা।
মালেকুল মৌত করিবে কবজ 'রুহ' সেই খালেদের?
হাজার রাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের। [খালেদ]

ল

লাজ (ফা)–লজ্জা।
আল্লার আশ্রয় চেয়ে আল্লার শক্তিতে আজ,
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে 'লাজ'।

লানত (আ)– অভিশাপ।
'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,
ধর্ম ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, গলিজ মুখে কোরান ভাজে। [আনন্দময়ীর আগমনে]

লাশরীক (আ) –অংশীদারহীন, অদ্বিতীয়।
অখণ্ড এক চাঁদ আজ বুঝি দু'খণ্ড হয়ে যায়
শরিকী আনিল হায় যারা মানে 'লাশরীক' আল্লায়।

লেবাস (আ)– পোশাক।
নাই হলো মা জেওর 'লেবাস'
এই ঈদে আমার
আল্লাহ্ আমার মাথার মুকুট
রসুল গলার হার । [গীতিশতদল]

শ

শবে কদর (ফা. আ.)– পবিত্র রাত্রি, সম্মানীয় রাত্রি।
করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান 'শবে কদরে'
জানবে কিসে 'শবে কদর' কয় কারে? [কাব্য আমপারা ঃ সুরা কদর]

শমশের (ফা)– তরবারি।
হায়দরী হাঁক হাঁকি দুল দুল আসওয়ার
'শমশের' চমকায় দুশমনে ত্রাসবার।

শয়তান (আ)– অভিশপ্ত, দুরাচার, পাজি।
'শয়তান' ছিল বাদশাহ সেথা. অগণিত পাপ সেনা।
বিনি সুদে সেথা চলিত হেথা ব্যভিচার লেনা দেনা। [মরু–ভাস্কর ঃ অভ্যুদয়]

শরবত (আ)– সুস্বাদু পানীয়।
ঘন উথলে অদূরে জম জম 'শরবত'।

শরম (ফা)– লজ্জা।

পুণ্য পিশাচ! স্বার্থপর।
দেখাস নে মুখ লাগে 'শরম'।

শরাব (আ)- পানীয়।
রঙ্গীন রাখী, শিরীন 'শরাব' মুরলী রোবাব বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখী, সোনালী রূপালী দিন।

শরীক (আ)- অংশীদার।
এক যে পরম বিচারক, তাঁর 'শরীক' কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দুদিন পরে তা ভাই। [গোঁড়ামী ধর্ম নয়]

শরীফ (আ)- ভদ্র ,অমায়িক।
রিফ 'শরীফ' সে কতটুকু ঠাঁই,
আজ তাঁরি কথা ভুবনময়। [সুবেহ্ উম্মীদ]

শহদ (আ)- মধু, মিষ্টি।
দোজখ আমার হারাম হলো
পিয়ে কোরানের শিরিন 'শহদ' [জুলফিকার]

শহীদ (আ.)-ধর্মযোদ্ধা।
তোমরা 'শহীদ' তোমরা অমর, নিতি আনন্দ ধামে,
তোমরা খেলিবে, তোমাদের তরে তাঁর কৃপা নিতি নামে। [আল্লাহ্ রাহে ভিক্ষা দাও]

শহীদী (আ. ফা.) ধর্মযোদ্ধা সদৃশ।
উহারা চাহুক দাসের জীবন , আমরা 'শহীদী' দর্জা চাই,
নিত্য মৃত্যু ভীত ওরা মোরা মৃত্যু কোথা খুঁজে বেড়াই। [এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ]

শাফায়াত (আ)-পক্ষে অনুরোধ, নিবেদন।
ইবরাহীমের মতো পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নইলে কখনো মুসলিম নও, মিছে 'শাফায়াত' চাও।

শামাদান (আ)–ধূপাধার, বাতিধার।
আমার হৃদয় 'শামাদানে' জ্বালাও মোমের বাতি।

শাহানশা (ফা)–সম্রাট।
ইহারা সর্ব ত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে
ভয় করে না ক কোনো দুনিয়ার কোন্ সে 'শাহানশা' কে।

শির (ফা) মস্তক, মাথা।
আল্লার নামে নিবেদিত 'শির' নোয়ায় সাধ্য কার?
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার।

শিরীন (ফা)- সুমিষ্ট, ভালো চমৎকার।

শাফাতের 'শিরীন' শিরনী
পাবি না আর পাবি না যে। [শাদী মুবারক]

শিরনী (ফা)- মিষ্টি খাদ্য।
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনী ফুল কালাম।

শিরাজী (ফা)-পানীয়।
'শিরাজী' পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা।

শের (আ)- সিংহ, ব্যাঘ্র।
মেষ সম যারা ছিল এতদিন
'শের' হলো আজ সেই মেশের । [সুবেহ্ উম্মীদ]

শেরওয়ানী (ফা)-ঢিলা কোট, ঢিলা জামা।
রীশই-বুলন্দ 'শেরওয়ানী' চোগা তসবী ও টুপী ছাড়া,
পরে নাকো কিছু মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া [খালেদ]

শোহরত (আ)-প্রচারণা।
সামনে থেকে পালাও
'শোহরত' দাও, নওরাতি আজ হর ঘরে দীপ জ্বালো [কামাল পাশা]

সওগাত (তু)-উপহার, উপঢৌকন।
ভুখারীর দ্বারে 'সওগাত' বয়ে রিজওয়ানের।

সওদা (ফা)-সামগ্রী।
ওরে আছে বেলা, ভাঙে নিকো খেলা, ইহারি মাঝে
প্রাণের 'সওদা' করে নে, বরে নে হৃদয় রাজে। [মরু ভাস্কর- খদিজা]

সওয়াব (আ)-পূণ্য।
ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেববাজ/আপনারে আর দিসনে লাজ
গরু ঘুষ দিয়ে চাস্ 'সওয়াব'?

সওদাগর (ফা)-ব্যবসায়ী।
দেখবি কে আয় আজ আমাদের নওল কিশোর 'সওদাগর'
শুক্লা দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝ'লে মুখের পর। [মরু ভাস্কর ঃ
কৈশোর]

সওয়ার (ফা)- আরোহী ।
বোররাকে তারা হইলো 'সওয়ার'
ছুটাইবে ঘোড়া ততঃকিম। [জীবনে যাহারা বাঁচিল না]

সফেদ (ফা)–সাদা।

নৌ রুস্তম উঠেছে রুখিয়া

'সফেদ' দানবে দিয়েছে লাজ। [সুবেহ্ উম্মীদ]

সয়লাব (আ)–প্লাবন,বন্যা।

বেদনার বানে 'সয়লাব' সব, পাইনে সাথীর হাত,

আন গো বন্ধু নূহের কিশ্‌তী বার্ষিকী সওগাত।

সাকী (আ)– পানপাত্র ধারক।

'সাকীর' পিয়ালা পরে

সকরুণ অশ্রুর বেল ফুল ঝরে।

সাফ (উ)–পরিস্কার।

বুজদিল ঐ দুশমন সব বিলকুল 'সাফ' হো গিয়া। [কামাল পাশা]

সহি সালামত (আ) নিশ্চিত ভালো।

মজলুম যতো মুনাজাত করে কেঁদে কয় এয় খোদা,

খালেদের বাজুতে শমশের রেখো 'সহিসালামতে' সদা।

সালাত (আ)– নামাজ।

ঐ শোন শোন 'সালাতে'র ধ্বনি

খায়রুম মিনান্ নৌম।[মরু-ভাস্কর ঃ অবতরনিকা]

সালাম (আ)–শান্তি।

পাক কদমে 'সালাম' জানাই

নবীর নায়েব মৌলবী সাহেব [মৌলবী সাহেব]

সাহারা (আ)– মরুভুমি, বালুভুমি।

যে গৃহ যুদ্ধে আরব হইলো মরু 'সাহারা'

আত্মবিনাশী সে রণে নামিল পুনঃ তাহারা

সিজদা (আ)– নত হওয়া।

থাকি কি না থাকি এই দুনিয়ায় তোমরা থাকিয়া দেখো,

যেদিন 'সিজদা'; করো আল্লারে, কাঁদিয়া তাহারে ডেকো[এ কি আল্লার কৃপা নয়?]

সিতারা (ফা)– তারকা।

জোহরা 'সিতারা' উঠেছে কি পুবে? জেগে উঠেছে কি পাখী?

সুরার সুরাহি ভেঙে ফেল সাকী, আর নিশি নাই বাকী।

সিন্দাবাদ (ফা)–নাবিক।

হে চির অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো?

ইঙ্গিত তুমি বৃদ্ধ 'সিন্দাবাদের, বাহন সাজো। [আজাদ]

সিয়া (আ) –নীল বর্ণ।
আসমানে ঐ ভাসমান যে মস্ত দুটো রক্তের তাল,
একটি নিবিড় নীল 'সিয়া' আর একটা খুবই গভীর লাল। [কামাল পাশা]

সিপাহ্ সালার (ফা) –সেনাপতি।
ঐ শোন্ শোন্ 'সিপাহ্সালার' কামাল ভাই-এর কালাম। [কামাল পাশা]
সুরাহি (আ)–মদের পাত্র। (আরবী 'সারাহিয়্যা' থেকে সোরাহি।
সুরার 'সুরাহি' ভেঙে ফেল সাকী আর নিশি নাই বাকী।
হজ (আ)– তীর্থ যাত্রা।
এরাই কাবার 'হজের' যাত্রী, এদেরই দস্ত চুমি
কওসর আনে নিঙাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি।
হজরত (আ)– সর্বোত্তম, সম্মানীয়।
হিজরত করে 'হজরত' কিরে
এলো এ মেদিনী মদিনা ফের?
হরদম (ফা)– সবসময়, প্রতি নিঃশ্বাসে।
তৈয়ার হেয় হর্দম ভাই ফাড়তে জিগর শত্রুদের। [কামাল পাশা]
হররোজ (ফা)– প্রতিদিন।
জীবনে যাদের 'হররোজ' রোজা ক্ষুধায় আসে না নিঁদ,
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
হাজার (ফা)–সহস্র।
আমার মনের মসজিদে দেয়
আজান 'হাজার' মুয়াজ্জিন । [জুলফিকার]

হাবীব (আ)-বন্ধু।
খোদার 'হাবীব' এসেছে আজিকে হইবে মানব মিতা,
পুণ্য সভায় ঝলমল করে ধরা পাপ শঙ্কিতা। [উমর ফারুক]
হাম্মাম (ফা)–গোসলখানা।
খোলে হুরপরী মরি
ফিরদৌসের 'হাম্মাম'।

হারাম (আ)–নিষিদ্ধ।
চাই না ধর্ম চাই না কাম/চাইনা মোক্ষ সব 'হারাম'
আমাদের কাছে শুধু হালাল/দুশমন খুন লালসে লাল। [দুঃশাসনের রক্তপান]

হারামী (আ.ফা)–পাজী, বদমাস।
এক হাতে বাঁধা হেমজিঞ্জীর আর এক হাত খোলা
কী যেন 'হারামী' নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা। [খালেদ]

হারাম খোর (আ.ফা)– নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণকারী।
দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের
রাজা আংরেজ 'হারামখোর'। [তৌবা]

হাশর (আ)–পুনরুত্থান দিবস।
রোজ 'হাশরে' আল্লা আমায় করো না বিচার। [জুলফিকারঃ২য় খণ্ড]

হাশমত (আ) –সৌখীন, জাঁকজমক।
দাও সেই খলিফা সে 'হাশমত'
দাও সেই মদিনা সে বোগদাদ। [গুলবাগিচা]

হাওয়া (আ)– বাতাস, আবহাওয়া, বায়ু।
'হাওয়ায়' ঝরা পাতার নুপুর বাজে ঝুনঝুনিয়ে। [গীতি শতদল]

হিম্মত (আ)– সাহস।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার 'হিম্মত'? [কাণ্ডারী হুঁশিয়ার]

হিসাব (আ) গণণা।
মরলো যে সে মরেই গেছে
বাঁচলো যারা রইলো বেঁচে
এই তো জানি সোজা 'হিসাব'! দুঃখ কি আর। [কামাল পাশা]

হুকুম (আ)–আদেশ
আমরা 'হুকুম' বর্দার তাঁর, পাইয়াছি ফরমান,
ভীত নরনারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ।

হুঁশিয়ার (ফা) সাবধান।
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা 'হুঁশিয়ার'। [কাণ্ডারী হুঁশিয়ার]

হুরপরী (আ. ফা)–স্বর্গীয় নারী।
'হুরপরী' শোকে হায়
জল ছল ছল চোখে চায়।

হুররো হো (আ. উ)–বেশ হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে।

'হুররো' হো!

হুররো হো! [কামাল পাশা]

হেনা (উর্দু)–মেহেদী, রঙ।

লাল ফুল সম দাগ খাওয়া দিল, নার্গিস ফুলী আঁখ,

ইস্পাহানির 'হেনা' মাখা হাত, পাতলি পাতলি কাঁখ।

হেরেম (ফা)–অন্দর মহল।

আঁধার 'হেরেমে' বন্দিনী হলো সহসা আলোর মেয়ে,

সেইদিন হতে ইসলাম গেলো গ্লানির কালিতে ছেয়ে। [আমাদের নারী]

আধুনিক আরবী সাহিত্যে বিদেশী শব্দ বিশেষ করে ফরাসী শব্দ ব্যবহর শুরু করলেন এভাবে। ফরাসী শব্দের ব্যবহারে ঘোর আপত্তি তুললেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রথম সারির অন্যতম রূপকার ডক্টর তাহা হোসাইন। যদিও তিনি ফরাসী মহিলা বিয়ে করেছিলেন তথাপি তিনি আরবী সাহিত্যে ফরাসী শব্দের ব্যবহার পদ্ধতিকে তুলনা করলেন সুন্দরী নারী দেহে ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ। তখন মিশরের 'আল হেলাল' পত্রিকার জাঁদরেল সম্পাদক জুরজী জায়দান ডক্টর তাহা হোসাইনের এই যুক্তি খণ্ডন করলেন এই বলে যে, মিশরীয় সামাজিক তথা দৈনন্দিন জীবনে যে সব ফরাসী শব্দ পরিচিত এবং ব্যবহৃত হয়ে আসছে সে সব সাহিত্যে ব্যবহার করলে দোষের কিছু নেই। অনেকেই জুরজী জায়দানকে সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে 'আল্ হেলাল' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হলো। তাদের যুক্তির সঙ্গে আরও যুক্ত ছিল, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা যদি সাহিত্যে দেখা দিতে পারে তবে বিদেশী বহুল প্রচলিত এবং জানা শব্দ ব্যবহারে আপত্তি থাকার কথা নয়। বলা যায়, এই সময়ে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন মাহমুদ তাইমুর আহমুদ তাইমুর প্রমুখ খ্যাতিমান আরবী কথা শিল্পীগণ। বাংলা সাহিত্যের বেলায়ও জুরজী জায়দানকে সমর্থন করে, বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামও কেবল সেইসব শব্দই ব্যবহার করেছেন যে গুলো আমাদের কাছে খুবই পরিচিত এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

এখানে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরব শাসক সুলতান মাহমুদ ইরান দখল করেন তখন ইরানীরা ইসলাম গ্রহণ করেন বটে তবে তাদের সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত রয়ে যায়। আস্তে আস্তে ইরানীদের প্রাচীন ভাষা পাহলবী 'দারী' বা আধুনিক ফারসী ভাষায় রূপ লাভ করে। এমনকী পাহলবী ভাষার হরফ আরবী হরফে পরিবর্তন করা হয় এবং ইরানীদের আলাদা সম্মান প্রদর্শনের জন্য আরবীর চেয়ে বাড়তি আরও চারটি হরফ ফারসী ভাষায় সংযোজন করা হয় যেমন টে, পে, ঢ়ে, ইয়ে ইত্যাদি। কিছু সংখ্যক ইরানী এসব মনে প্রাণে গ্রহণ করলেও অনেকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদে মুখর হয়। কিন্তু রাজশক্তির

কাছে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হয়নি। আরও প্রতিবাদের শিকার হতে হয় যখন ফেরদৌসীর মতো কবিরা আধুনিক ফারসী সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রচলন ঘটাতে শুরু করেন। ফেরদৌসীর মতো অন্যান্যরাও যখন একই পথ অবলম্বন করেন তখন এই পদ্ধতি সহনীয় হয়ে ওঠে। অবশ্যি সাহিত্যের এই নব দিগন্তের সূচনায় রাজশক্তির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জানা গেছে, সুলতান মাহমুদ সাহিত্য ও শিল্পের খুবই সমঝদার ছিলেন এবং তাঁর রাজদরবারে পণ্ডিত, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়াও কেবল কবিদের সংখ্যাই ছিল চারশত।

ফারসী সাহিত্যের সূচনা পর্বের ফেরদৌসী থেকে শুরু করে রুমী, জামী, খৈয়াম, আনওয়ারী নিজামী, সাদী, হাফিজ, আত্তার, আমির খসরু, জেবুন্নেসা পর্যন্ত এবং তাঁদের পরবর্তী কবিদের থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সময়ের কবি সাহিত্যিকরাও তাঁদের কাব্য কর্ম এবং সাহিত্য কর্মে অবলীলা ক্রমে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং এ জন্য ফারসী সাহিত্যে যত আরবী শব্দের প্রয়োগী রীতি লক্ষ্য করা যায় অন্য কোনো ভাষায় এতটা লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করেছেন। ফারসী কবিদের মতো আরবী শব্দের প্রয়োগ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের বাগানে 'বসরার গোলাপ' ফুটিয়েছেন, সু-ঘ্রাণে 'মাতোয়ারা' করেছেন এবং সাহিত্যের গলায় পরিয়েছেন জহরতের মালা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রখ্যাত ফারসী কবি এবং সঙ্গীত জগতের সম্রাট আমির খসরু দেহলবী ফারসী সাহিত্যে প্রথম সারির কবিদের অন্যতম কবি। ফারসী ভাষা ছাড়া তিনি উর্দু ও হিন্দী ভাষায়ও প্রচুর কবিতা লিখেছেন। হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দী কবিতার শরীরে আরবী-ফারসীর জরির ঝলমলে শব্দে পোশাক পরিয়ে সুদৃশ্য ও আকর্ষনীয় করে তোলেন। তাঁর কবিতার কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

হিন্দু বাচ্চেরা বনিগর আজব হুসন ধরতা হ্যায়,
দর অক্তে সুমন গুফতন মুহফুল ঝরতা হ্যায়,
গুফতম বিয়াকে বর লবে তু বুসে বগীরম'
গুফতে আরে রাম ধরম নষ্ট করতা হ্যায়।

[আশ্চর্য সুন্দর রূপ ধরেছে ও হিন্দু শিশুগণ
প্রতিটি মুহূর্তে যেন কথায় সে ফুল ঝরে শুধু
মন বলে, 'চুমো দিই আশ্চর্য ফুলের সমারোহে।
ওরা বলে, 'আরে রাম! ধর্ম নষ্ট হয়েছে এবার]'

উপরের হিন্দী কবিতার চার লাইনের স্তবকে 'আজব' (আশ্চর্য), 'হুসন' (সুন্দর), 'অক্ত' (সময়) ইত্যাদি আরবী শব্দ এবং 'গুফতন' 'গুফতম' 'গুফতে' (মূল 'গুফত' থেকে যার অর্থ কথা, বলা ইত্যাদি), 'দর' (প্রতি) ইত্যাদি ফারসী শব্দ। বলা আবশ্যক

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং কিছু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা এর সমর্থনে উচ্চকণ্ঠ হন এবং কিছু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে বলেন, 'আরে রাম! রাম! আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়েছে।'

সত্য কথা চিরদিনই সত্য। সত্য কথা কোন ধর্মকে কোনোদিন নষ্ট করতে পারে না। আমির খসরু রচিত বহু হিন্দী গজল আছে, যে সব গজলের প্রাণ শক্তিকে সঞ্জীবিত রেখেছে প্রচুর আরবী-ফারসী উর্দু শব্দ। বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামও বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে আমির খসরু দেহলভীর মতো সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু বৃহৎ জনগোষ্ঠীর রায়ে তিনি বিজয়ী- বাংলা সাহিত্যের ধর্ম নষ্ট করেননি। বরং আমরা এই নব পর্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে 'বুসা' বা চুমো দিতেই আগ্রহী।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল সাহিত্যে যেসব ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ আরবী শব্দ। আরবী শব্দের 'মাদ্দাহ' বা মূল অন্বেষণ না করে, অবশ্যি এসবের কোনো প্রয়োজনও পড়েনি, শব্দটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেভাবে প্রচলিত ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করেছেন। ব্যাকরণবিদরা শব্দের 'তালিল' করে নিতে পারেন। অর্থাৎ কোনটা 'এলেম' 'বিশেষ্য' কোনটা 'ফায়েল' (কর্তা) কোনটা 'ম'ফোল (কর্ম) কোনটা 'আমর' (আদেশ), কোনটা 'তাসনীর (ক্ষুদ্রায়তন) ইত্যাদি নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধা হয় না।'

কিছু আরবী শব্দের সঙ্গে ফারসী শব্দের সমন্বয় ঘটে এক নবরূপ লাভ করেছে যেমন 'আব-ই-হায়াত' 'আব-ই-কাওসার', 'আব-ই-জমজম', 'আমল নামা', 'কবর-স্তান', 'কোহিনূর' 'খোশ্ খবর', 'খোশ নসীব', খেয়ালী' (খেয়াল+ই), 'গোলাম খানা', 'তখত তাউস', 'বদ নসীব' ইত্যাদি। শব্দগুলোর অর্থ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বলে এখানে আর পুনরাবৃত্তি ঘটালাম না।

আরবী শব্দ এবং আরবী-ফারসীর সমন্বয়জনিত কারণেই নজরুল সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় অর্থাৎ শতকরা ৬০% ভাগ। আরও মজার কথা এই, যেসব আরবী শব্দ ফারসী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে উর্দু কবি সাহিত্যিকরাও সে সব উর্দু সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। এ কারণে নজরুল সাহিত্যে ফারসী শব্দের গড়পড়তা শতকরা ৩০% ভাগ এবং উর্দু শব্দের সংখ্যা শতকরা ১০% ভাগেরও কম।

ফারসী শব্দের ব্যাপারে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। কিছু সংখ্যক ফারসী শব্দ আছে যেগুলো বাংলায় এসে ছোটখাট হয়েছে অর্থাৎ নিজস্ব শরীর থেকে কিছু অংশ প্রত্যাহার করে বাংলার সঙ্গে বাংলাজাত হয়েছে। অথচ ফারসী ভাষায় সেগুলো পুরোপুরিই ব্যবহৃত হয়। এ ধরণের শব্দ সংখ্যা অনেক। এখানে কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি যেগুলো নজরুল ইসলাম বাংলাজাত করে তাঁর সাহিত্য-কর্মে ব্যবহার করেছেন। যেমন,

১. আন্দাজ–মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'আনদাখ্ তান।' এর অর্থ নিক্ষেপ করা, মারা, খোলা, গুলি করা ইত্যাদি। বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটির ভিন্নরূপ লক্ষ্য করবার বিষয়, যেমন 'তীরন্দাজ', 'গোলন্দাজ', 'বরকন্দাজ' 'খোনান্দজ' ইত্যাদি। 'আন্দাজ'-এর আভিধানিক অর্থ নিরূপণ, পরিমাপ, অনুমান ইত্যাদি।
'নাইকো পাইক 'বরকন্দাজ'. নাই পুলিশের ডর। [সাম্য]

২. আলু—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'আলুদান'। এর অর্থ ধারণ করা, বহন করা, আয়ত্তে রাখা ইত্যাদি। যেমন দয়ালু, দুধালো, জোরালো, নিঁদালু প্রভৃতিতে 'আলু' যুক্ত হয়ে বিশেষ্যপদ যেমন দয়া, দুধ, জোর, নিঁদ ইত্যাদি এক নবরূপ ধারণ করেছে এবং 'আলুদান' শব্দটিও লেজ বিহীন হয়ে কেবল 'আলু' হয়েছে। 'আলু' এর সাধারণ অর্থ মিষ্টি আলু, লাল আলু, গোল আলু ইত্যাদি।

৩. কার—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'কারদান'। এর অর্থ 'কারক' (যে করে অর্থে), ধারক ইত্যাদি। নেক, বদ, জেনা, রোজ ইত্যাদি বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রূপ লাভ করেছে নেককার, বদকার, জেনাকার, রোজকার, ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় শব্দটির আদি রূপ নেই।

৪. খানা—মূল 'খানা'। এর অর্থ স্থান, বাড়ী জায়গা, ইত্যাদি বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে এরূপ দাঁড়ায়। যেমন চিড়িয়াখানা, ডাক্তারখানা, পায়খানা, জেলখানা, কসবীখানা, দপ্তরখানা, দস্তরখানা, তাড়িখানা, জিন্দানখানা, ইত্যাদি। 'বন্দী শামের 'জিন্দানখানা', হিন্দের বদ্‌বখত।

৫. খোর—মূল ফারসীর পুরোশব্দ 'খোরদান'। এর অর্থ খাওয়া, পান করা। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে অর্থ দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যে খায় কিংবা পান করে। যেমন মদখোর, ঘুষখোর, হারামখোর, আদমখোর, গাঁজাখোর ইত্যাদি এবং মূলশব্দের লেজুড়ও খসে পড়ে।
'খামখা তুমি মরছ কাজী ব্যস্ত তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে 'মদখোরের' এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে!

৬. গার—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'গার-ই'। এর অর্থ বৃত্তি-ব্যবসায় ইত্যাদি। বিশেষ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে শেষের 'ই' বা 'ইয়ে' ওঠে যায় এবং শব্দ গুলো এরূপ দাঁড়ায়, যেমন যাদুগর, কারিগর ইত্যাদি। আবার এই মূল ফারসী 'গার-ই' বা 'গারি' শব্দের অপভ্রংশ 'গিরি' যার অর্থও বৃত্তি, ব্যবসায় বা

ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'প্রফেশন'। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরূপ দাঁড়ায়, যেমন মুনশীগিরি, বাবুগিরি, কেরানীগিরি, মৌলবীগিরি ইত্যাদি।

৭. গো—ফারসীর পুরো শব্দ 'গুফ্তান'। এর অর্থ বলা, কওয়া ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল 'গো' অংশটুকু থাকে বাকী অংশ হাওয়া হয়ে যায়। যেমন 'কানুনগো।' সিলেটে 'গো' অর্থটি, টা, খানা, খানি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন দুই বন্ধুতে সিগারেট বিনিময়ের সময় বলেন, 'আপনার গো রাখুইন আমার গো খাইন।'

৮. গির—মূল ফারসীর পুরোশব্দ 'গিরিফ্তান'। এর অর্থ লওয়া, দখল করা, আয়ত্তে আনা ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল 'গির' টুকু থাকে বাকী অংশ অন্তর্হিত হয়ে যায়। যেমন 'আলমগীর', জাহাঙ্গীর, রাহ্গীর।

৯. দান্—মূল ফারসী 'দান'। এর অর্থ শস্য কণা, খাদ্য কণা। 'দান্' শব্দটি মূল ফারসী 'দানিস্তান'-এরও অন্তর্গত। যখন শব্দটি কোনো বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কেবল 'দান' টুকুই অবশিষ্ট থাকে আর কিছু থাকে না। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় জানা, বোঝা কিংবা কোনো কিছু রাখার পাত্র বা আধার। যেমন আতরদান, ছাইদান, কদরদান, পানদান ইত্যাদি।

১০. দার—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'দাশ্তান'। এর অর্থ ধারণ করা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'দার' টুকুই থাকে আর সব কিছু উহ্য হয়ে যায়। অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন থানাদার, হানাদার, অংশীদার, চটকদার ইত্যাদি।

১১. পছন্দ—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'পছন্দ্দিদান।' এর অর্থ পছন্দ করা, মনোনীত করা। এই শব্দ কোনো বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল 'পছন্দ' টুকুই থাকে 'দিদান' উহ্য হয়ে যায়। অর্থ ঠিকই থাকে যেমন 'দিল পছন্দ', বিবি পছন্দ ইত্যাদি।

১২. পরস্ত—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'পরস্তিদান'। এর অর্থ উপাসনা করা, পূজা করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'পরস্তিদান' কেবল 'পরস্ত' হয় এবং এর অর্থ দাঁড়ায় 'পূজারী', 'উপাসক' ইত্যাদি। যেমন পীরপরস্ত, বোতপরস্ত, গোরপরস্ত, বিবিপরস্ত ইত্যাদি।

১৩. পাশ্—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'পাশিদান'। এর অর্থ ছড়ান, বিলি করণ, ছিটানো ইত্যাদি। বিশেষ্যপদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'পাশিদান' অন্যরূপ ধারণ করে কেবল 'পাশ' হয় এবং এর অর্থ দাঁড়ায় যে বস্তু দ্বারা ছিটানো হয়। যেমন 'গোলাপ পাশ'। 'সাদা মেঘের 'গোলাব পাশে' ঝরিছে গোলাব পানি।' [গীতি শত দল]

১৪. পোশ্—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'পোশিদান'। এর অর্থ পরিধান করা, আবৃত করা, ঢাকা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'পোশিদানে'র কেবল 'পোশ' থাকে। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে পরিধান করে কিংবা যে বস্তু দ্বারা আবৃত করা হয়। যেমন 'বালাপোশ', তক্তপোশ, খাঞ্চাপোশ, পাপোশ ইত্যাদি।

'চোখের পানির ঝালর ঝুলানো হামির 'খাঞ্চাপোশ'।

১৫. বর—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'বরদান'। এর অর্থ বহন করা। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'দান' অন্তর্হিত হয় এবং তখন অর্থ দাঁড়ায় 'বহনকারী', যেমন 'রাহবর'।

১৬. বরদার—মূল ফারসীর পুরোশব্দ 'বরদাস্তান'। এর অর্থ ধারণ করা, বহন করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে 'বারদার'ই থাকে। বাকী অংশ উহ্য হয়ে যায় এবং অর্থ দাঁড়ায় ধারণকারী, বহনকারী ইত্যাদি। যেমন 'নিশানবরদার', হুকুমবরদার, তল্পিবরদার। 'আমরা 'হুকুমবর্দার' তার পাইয়াছি ফরমান।' [নিত্য প্রবল হও]

১৭. বাজ—মূল ফারসীর পুরো শব্দ 'বাখতান'। এর অর্থ খোলা, ভান করা ইত্যাদি। শব্দটি বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে 'বাখতান' সম্পূর্ণ আড়ালে হয়ে নতুন শব্দ 'বাজ'-এ পরিণত হয়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় খেলার নায়ক কিম্বা ভানকারী। যেমন 'চালবাজ', 'ধড়িবাজ', 'ফাঁকিবাজ' ইত্যাদি। 'যে যত ভণ্ড 'ধড়িবাজ' আজ সেই তত বলবান' [ফরিয়াদ]

১৮. নবীশ—মূল ফারসীর পুরোশব্দ 'নবীশ্তান'। এর অর্থ লেখা, নকল করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হলে কেবল 'নবীশ' থাকে বাকী অংশ লোপ পায়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় লেখক বা নকলকারী। যেমন খাসনবীশ, নকলনবীশ মহালনবীশ ইত্যাদি।

এমনি ধরণের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। আমার এইসব শব্দের উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, অনেক আরবী-ফারসী শব্দ বাংলার সাথে মিশ্রিত

হয়ে সে সব শব্দের মূল বা 'খাদ্দাহ্' হারিয়ে আলাদাভাবে নতুনরূপ ধারণ করেছে উপরের শব্দসমূহ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। কাজী নজরুর ইসলাম এইসব শব্দ সম্পর্কে ছিলেন অত্যধিক সচেতন এবং ব্যাকরণরীতি অবলম্বন করেই তিনি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রমাণ, তাঁর কাব্যের উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নজরুল কাব্যে উর্দুশব্দের সংখ্যা শত করা ১০% ভাগেরও কম। এর কারণ প্রধানত এইটাই যে, উর্দু সাহিত্যে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার মতো। ফলে উর্দু শব্দের শতকরা হার কম।

আরও বলে রাখা ভালো যে, কিছু কিছু ফারসী শব্দ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদারূপ নিয়ে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাজাত হয়ে আছে। দু'চারটে উদাহরণ এইরূপ,

জোতদার—সংস্কৃতঃ জোএ>জোও>জোততা>জোত
+ফারসী 'দার'= জোতদার।
ফাঁকিবাজ— সংস্কৃত ফক্কিকা>ফাকিয়া>ফাঁকি
+ফারসী 'বাজ'=ফাঁকিবাজ।
গাঁজাখোর—সংস্কৃত গঞ্জিকা>গাঞ্জা>গাঁজা
+ফারসী 'খোর'= গাঁজাখোর।
শিক্ষানবিশ—সংস্কৃত শিক্ষা+ ফারসী নবিশ=শিক্ষা নবিশ।
গোলন্দাজ—সংস্কৃত গোলকা>গোলআ>গোল
+ফারসী আন্দাজ=গোলন্দাজ।

এ ধরণের শব্দও নজরুল সাহিত্যে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেববাজ
আপনারে আর দিসনে লাজ
গরু ঘুষ দিয়ে চাস সওয়াব? [শহিদী ঈদ]

তিন

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমগ্র সাহিত্যে যে সব আরবী-ফারসী-উর্দু বা অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করেছেন সেইসব শব্দের আবর্তন-বিবর্তন এবং বাংলায়ন আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। শব্দ শব্দই এবং শব্দকে আমরা মুক্তাখণ্ড, উপলখণ্ড অথবা পাথরের চকচকে নুড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। হাজার হাজার বছরের আবর্তন-বিবর্তনের স্রোতোধারার ঘর্ষণে হয়তো শব্দগুলোর গা থেকে অসমান বস্তু অন্তর্হিত হয়ে আরও চকচকে আকার ধারণ করেছে- অর্থের কোনো অসঙ্গতি ঘটে নি। ব্যাকরণবিদ বা ভাষার রূপকারদের হাতে পড়ে শব্দের সঙ্কোচন হয়তো ঘটেছে কোথাও কোথাও কিন্তু সেই শব্দের গা থেকে আসল নির্যাস বের করতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় নি।

আমরা এবারে নজরুল ইসলাম যেসব আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন

সেই শব্দগুলো আরবী-ফারসী-উর্দু ভাষার কবি সাহিত্যিকদের হাতে কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা ছোটখাট ফিরিস্তি পেশ করছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, কোনো কোনো নজরুল গবেষকের মতে (ইচ্ছাকৃতভাবে নাম উল্লেখে বিরত রইলাম) 'নজরুল ইসলাম আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন আরবী-ফারসী-উর্দু কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এবং নজরুল সাহিত্যেও তাঁদের প্রভাব বর্তমান।' কথাটি যে কত অযৌক্তিক এবং ঢালাও মন্তব্যের পরিচয়বাহী তা নিম্নের উদ্ধৃতিসমূহই প্রমাণ করবে।

১. দিল (ফা')- অন্তর, হৃদয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি। এই 'দিল' কবি নজরুল ইসলাম বহু কবিতায় ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহরণ, 'হায় সাহারার প্রখর তাপে/ পরান কাঁপে, 'দিল'-কাবাব। [বুলবুল]

মওলানা রুমীর কবিতায় 'দিল' আছে এই ভাবে,

'দিল' বদস্ত আর কে হজ্জে আকবরাস্ত
আজ হাজারা কাবা এক 'দিল' খোশ্‌তরাস্ত।
কাবা বুনো গাহে খলিলে আজরাস্ত
'দিল' গুজারোঁ গাহে জলিলে আকবরাস্ত।

[মানুষের হৃদয় জয় করা হজ্জে আকবরী, হাজার কাবার চেয়ে একটি হৃদয় অনেক বড়। কাবা তৈরী করেছেন আজরের পুত্র ইবরাহীম খলিলুল্লাহ এবং মানুষ তৈরী করেছেন স্বয়ং আল্লাহত়ায়ালা, আর মানুষের হৃদয়ই আল্লাহর বিহারভূমি।]

মওলানা রুমীর আর একটি কবিতায় 'দিল' আছে এইভাবে,

দস্ত দর তসবীহ ওয়া 'দিল' দর গাউওয়া খার
ইঁ চানিন তাসবীহ্ কে দারাদ আসার?

[হাতে তাসবীহ এবং হৃদয়ে গাভী ও গাধার চিন্তা, এ ধরনের তাসবীহ্‌তে কান আসর করতে পারে?]

কবি ইকবালের 'দিল' এইরূপ,

আঁ ফকর কে বে তেগে সদ্ কিশ্‌ওয়ার 'দিল' গীরদ,
আজ শওকতে দারা বেহ্ আজ ফররে ফরীদুঁ বেহ।

[যে হৃদয় বিনা তরবারিতে শত শত দেশ জয় করে, সে হৃদয় দারার ঐশ্বর্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ফরীদ বাদশাহর জাঁক জমকের চেয়েও অনেক বড়।]

আর একজন উর্দু কবি তাঁর 'দিল' উৎসর্গ করেছেন এই ভাবে,

ম্যায় 'দিল' মুরশিদ কো দিয়া নজরানা সমঝ্‌কার,
ঔর ইশ্‌ক জ্বালায়া মুঝে পরওয়ানা সমজকার।

[আমার হৃদয় আমি উপহার স্বরূপ আমার প্রভুকে দিলাম। এবং নিজে প্রেমের আগুন জ্বালালাম নিজেকে পতঙ্গ সাব্যস্ত করে।]

২. খোশবু (ফা) সুঘ্রান, সুগন্ধি। কাজী নজরুল ইসলাম এই 'খোশবু' ছড়িয়েছেন তাঁর কাব্য-কর্মের সর্বত্র। একটি মাত্র উদাহরণ,

যে দেশের বাতাসে আছে নবীজির দেহের 'খোশবু', [জুলফিকার]

পারশ্যের বুলবুল কবি হাফিজের 'খোশ্‌বু' এইরূপ,

ইয়ারে আগার ইয়ারে নাদারাদ ইয়ারে হরগেজ ইয়ার নিস্ত্‌
গুলে আগার 'খোশবু' নাদারাদ দিদারে কাবেল নিস্ত্‌।

[বন্ধু যদি বন্ধুসুলভ ব্যবহার না করে তবে সে বন্ধুর অনুপযুক্ত। আর ফুলে যদি সুঘ্রাণ না থাকে তবে সে ফুল দেখারও অনুপযুক্ত।]

মহাকবি ইকবালের মাত্র এক জায়গায় 'খোশ্‌বু' এরকম,

সাদকাত সাফ নেহী হো সাক্‌তা বানাতিউ কি অসুলো সে,
'খোশ্‌বু' নেহী আ সাকতি কাগজোঁ কে ফুলো সে।

[সত্য কোনোদিন ভাওতাবাজি দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, কাগজের ফুল থেকে কোনোদিন সুঘ্রাণ আসে না।]

৩. ইশ্‌ক (আ)- প্রেম, প্রণয়। নজরুল-সাহিত্য 'ইশ্‌কে' ভরা। 'গুলবাগিচা, থেকে মাত্র একটি লাইন, 'হৃদয়ে লইয়া 'ইশ্‌ক' আল্লার/চল্‌ আগে চল্‌ বাজে বিষাণ।'

কবি হাফিজের আল্লার 'ইশ্‌ক' ছাড়া মানবতাবাদী 'ইশ্‌ক' এইরূপ,

চুনা কাহাত শোদ্‌ আন্দর দামেস্ক,
কেহ্‌ ইয়ারাহ্‌ ফরামুশ্‌ জারদান্দ 'ইশ্‌ক'।

[দামেস্ক শহরের ভিতরে এতো যে দুর্ভিক্ষ অথচ মানুষের অন্তরে প্রেম আছে, মানবতাবোধ আছে।]

কোনো কোনো ফারসী কবিতার পেছনে সুন্দর-সুন্দর কাহিনী আছে। কবি হাফিজের এই দুই লাইন কবিতার অন্তরালেও একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। কবি হাফিজের 'দীওয়ানের' দুটি লাইনে যেমন 'আগার আ তুর্কে সিরাজী বদস্ত আরাদ দিলে মারা/বখালে হিন্দুয়াশ বখশাম সমরখন্দ ওয়া বোখারা' ['প্রাণ যদি মোর ফিরে দেয় সেই তুর্কী চাওয়ার মনচোরা/একটি কালো তিলের লাগি বিলিয়ে দেব সমরখন্দ ও বোখারা'- কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত]। খ্যাতি যখন তুঙ্গে তখন একদল লোক তখনকার দুর্ধর্ষ সম্রাট চেংগিজ খানের কাছে গিয়ে বললো, 'হে সম্রাট, আপনি এত কষ্ট করে রাজ্য জয় করেন আর কবি হাফিজ রূপসী নারীর গালের তিলের বিনিময়ে সমরখন্দ ও বোখারার মতো সম্পদশালী রাজ্য বিলিয়ে দিচ্ছেন।'

চেংগিজ খান তো শুনে অবাক সঙ্গে সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ পাঠালেন কবিকে

ধরে আনার জন্য। কবি মেসওয়াক করতে করতে হাম্মামখানায় যাচ্ছিলেন গোসল করতে, ঠিক সেই অবস্থায়ই তাঁকে রাজ দরবারে হাজির করা হলো।

চেংগিজ খানের ছিল এক চীনা বেগম। তিনি ছিলেন খুব বিদূষী এবং কবি হাফিজের খুব ভক্ত। হাফিজকে এই অবস্থায় দেখে তিনি বাদশাহ্কে বললেন, 'জাঁহাপনা এ কি করেছেন? এত বড় একজন খ্যাতিমান কবি, তাঁকে এ অবস্থায় হাজির করিয়েছেন? আগে তাঁকে পরিধানের কাপড় দিন অতঃপর কোনো অভিযোগ থাকলে বলুন।'

বাদশাহ ভাবলেন তাই তো! সম্রাজ্ঞীর কথাই ঠিক। সম্মানীয় ব্যক্তিকে অসম্মান করা অন্যায়। তাঁকে উত্তম পোশাক প্রদান করে অতঃপর বললেন, 'কি কবি সাহেব, আমি এত কষ্ট করে রাজ্য জয় করি আর আপনি নাকি সমরখন্দ ও বোখারার মতো আমার প্রিয় রাজ্য নারীদেহের সৌন্দর্যময় তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছেন?'

হাফিজের জবাব, 'জাঁহাপনা, ব্যাকরণে ভুল করেছেন। আমি বিলিয়ে দিয়েছি এমন তো কোনো কথা নেই। কবিতার প্রথমেই আছে 'আগার' অর্থাৎ 'দিতে পারি' কিংবা 'দিব', দিয়েছি বলে তো বলা হয়নি।'

চেংগিজ খান নিজের ভুলের জন্য হেসে ফেললেন এবং বললেন, 'সময় উপযোগী দু'চারটে মিসরা লিখুন না?'

সঙ্গে সঙ্গে কবি হাফিজ উপরে উল্লেখিত দুটো লাইন লিখে দিলেন। বাদশাহ্ এতে খুশী হলেন এবং কবিকে পুরস্কৃত করলেন। চীনা বেগমও এতে আনন্দিত হলেন।

উল্লেখ্য, চেংগিজ খান যখন চীন দখল করেন তখন চীন রাজপরিবার থেকে উপঢৌকন হিসেবে এই মহিলাকে দেওয়া হয়েছিল।

আওরঙ্গজেব কন্যা প্রখ্যাত ফারসী মহিলা কবি জেবুন্নেসা মখফীর একটি ছত্রে 'ইশক' ব্যবহার করা হয়েছে এইভাবে,

দুর্‌রে আব্‌লাগ কাসিমে দিদ মজুদ,
মগর 'ইশকে' বুতানে সো মলুদ।

[চোখের পানি কি চমৎকারভাবে জমা হয়ে আছে; এসব তো চোখের পানি নয় বরং প্রেমই জমা হয়ে আছে]

উপরের দুটো লাইনের অন্তরালেও সুন্দর কাহিনী আছে। একবার এক রাজকুমার আবেগপ্রবণ অবস্থায় আয়নায় মুখ দেখছিলেন। হঠাৎ তার চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি আয়নায় পড়ে এবং বিস্মিত হয়ে রাজকুমারের চোখে সুদৃশ্য হয়ে ধরা পড়ে। রাজকুমার মুহূর্তের মধ্যে কবি বনে যান এবং আবেগের বশে লিখে ফেলেন : 'দুররে আবলাগ কাসিমে দিদ মজুদ'। ওই পর্যন্তই। হাজার চেষ্টা করেও মিল সহকারে দ্বিতীয় লাইন আর তিনি লিখতে পারেন নি।

কি আর করবেন? আর এক লাইন না হলে যে মিসরা হয় না-অন্ততঃ দুই লাইনের কবিতা। তিনি ওই একটি লাইন জানিয়ে দিয়ে সারা শহরময় ঢোল পিটিয়ে বলার ব্যবস্থা করলেন এই বলে যে, যিনি মিল সহকারে পরবর্তী লাইন লিখে দিতে পারবেন তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।

জেবুন্নেসা প্রাসাদের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। এমন সময় ঢোলকের দল ওখান দিয়ে যাচ্ছিল ওই লাইন নিয়ে শোরগোল করতে করতে। জেবুন্নেসা তাদের ডাকলেন এবং ব্যাপারটি জানতে পেরে ওই লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে লিখে দিলেন ঃ 'মগর ইশ্‌কে বুতানে সো মলুদ।'

তখনকার বিচারক কবিদের রায়ে জেবুন্নেসা পুরস্কৃত হলেন এবং পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁকে ডাকা হলো। জেবুন্নেসা পুরস্কার আনতে আর যান নি। বরং চার লাইন কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন,

দর সুখন মখফী আম সো
বুয়ে দর বরগ-এ গুল,
হরকে দিদান মায়েল দারাদ
দর সুখন বিনাদ মারা।

[আমি তো লুকিয়ে আছি আমার এ কাব্যের ভিতরে , যেমন লুকিয়ে থাকে সুঘ্রাণ সে গুলাবের মাঝে, গুলাব নির্যাস যদি পাবার কামনা কেউ করে সে যেন আমার কাব্য আত্মার আকুতি দিয়ে পড়ে।]

কবি ইকবাল 'ইশক' নিয়ে 'শিকওয়াহ' করেছেন এইভাবেঃ

ইশ্‌ক কো , ইশ্‌ক কী আশিফ্‌তা -সরী কো ছোড়া?
রসমে সলমান ও উবায়সে করনী কো ছোড়া?

[প্রেম, প্রেম-আচরণ এবং প্রেমের মত্ততা কি ছেড়ে দিয়েছি? ছেড়ে দিয়েছি কি সোলেমান ও ওয়ায়েসকরনীর সেই প্রেমের রীতিনীতি?]

উপমহাদেশ খ্যাত ফারসী ও উর্দু কবি গালিব এর 'ইশ্‌ক' একটু ভিন্ন স্বাদের ঃ

ইশ্‌ক মুঝকো নেহী , ওহ্‌শাত-ই সহী,
মেরী ওহ্‌শাত, তেরী শোহরত ই সহী।
মগর কাতায়া না কি জিয়ে তাল্লুক হম সে
কুছ নেহী তো ওহ্‌শাত-ই সহী।

[আমার প্রেম না থাক, যন্ত্রণাই যথেষ্ট ; আমার যন্ত্রণা, তোমার খ্যাতিই যথেষ্ট; তথাপি আমাকে বিচ্ছিন্ন করো না তুমি। কিছুই না থাক, আমার যন্ত্রণাই যথেষ্ট।]

৪. বুলবুল (কা) কোকিল। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমগ্র সাহিত্যের বাগানে

'বুলবুলের' মিষ্টি গান ছড়িয়েছেন। একটি মাত্র উদাহরণ ঃ 'হৃদয়ে মোর খুশীর বাগান /বুলবুলি তায় গায় সদাই'

কবি শেখ সাদীর 'বুলবুল' কি রকম দেখা যাকঃ

বুলবুল মুশদায়ে বাহার ব ইয়ার,
খবরে বদ ব বোফে শোমে গুজার।

[কোকিলের ধর্ম মিষ্টি গান গেয়ে বন্ধুদের পরিতৃপ্ত করা। পেচকের ধর্ম অন্ধকারে খারাপ সংবাদ ছড়ানো।]

পারশ্যের বুলবুল কবি হাফিজ 'বুলবুল' এর সঙ্গে কাঁদতে চেয়েছেন বন্ধুত্ব করার জন্য। ব্যতিক্রমধর্মী কণ্ঠ এইরূপঃ

ব নালে বুলবুল আগার ব আমানত সর ইয়ারিস্ত,
কেহ্ মা দুম্ব আশেক জারায়েম ও কর মা জারিস্ত।

[বুলবুল তুমি কাঁদো, কাঁদো আমার বন্ধুত্ব যদি চাও, আমরা দু'জনেই কাতর প্রেমিক, কান্নাই আমাদের একমাত্র সম্বল।]

মহাকবি ইকবালের 'বুলবুল' পাখাহীন অবস্থায়ও আকাশে উড়তে আগ্রহী, সম্মুখে তার গতি ঃ

কওমে আওয়ারা ইনাঁ–সাব হ্যায় ফির সুয়ে হিজাজ,
লে উড়া বুলবুল বে পর্‌কো মজাকে পরওয়াজ।

[দিশে হারা জাতি হিজাজের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, পক্ষবিহীন বুলবুল ,সেও আকাশে উড়ে যেতে চায়।]

৫. মঞ্জিল (আ) গন্তব্যস্থান, বসতিস্থান আবাসভূমি ইত্যাদি। কাজী নজরুল ইসলামের বহু কবিতায় 'মঞ্জিল' তাঁর আর্তির মধ্যে। একটি উদাহরণ ঃ 'আসবে সেজন এ মঞ্জিল/এই সে মাসে। [মরু ভাস্কর]

ইসলাম পুর্ব-যুগের 'সাবআ মু'আল্লাকা' খ্যাত কবি ইমরাউল কায়েস–এর, মঞ্জিল তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল তাঁর প্রিয়ার জন্য এই সেই মঞ্জিল ঃ

কিফান্‌বেক্‌ মিন্‌ জিকরী হাবিবিন ওয়া 'মানজিলি'
বি সিক্‌তেল আলওয়া বায়নাদ্‌ দুখুল ফা হাওমালী।

[বন্ধু দাঁড়াও, আমার প্রেয়সী ও তার বসতিস্থান স্মরণ করে কেঁদে নিই। হাওমল ও দুখুল এর মাঝখানে বালির ভিটি এখনো পড়ে আছে।]

কবি হাফিজ তাঁর 'মঞ্জিল' খুঁজেছেন প্রিয়ার রাস্তার উপর। যেমন,

ইয়াদ বাদ আঁকেহ্‌ সো গোয়ে তোয়াম মঞ্জিল বোদ্‌,
দিক্‌হ রা রোশনী আজ খাক্‌ দরতে বোদ্‌।

[মনে পড়ে তোমার পথের মাথায় ছিল আমার বসত, আমার চোখে এখন সেই মাটি চমক খেলে।]

দার্শনিক কবি ইকবাল বহুস্থানে 'মঞ্জিল' –এর কথা বলেছেন। একটি 'মঞ্জিল' এই রকম,

মঞ্জিলে দহ্‌রমে উটোঁ কে হুদী খাঁ গয়ে,
আপনি বগলোঁ মেঁ দবায়ে হুয়ে কুরআঁ গয়ে।

[বসতিস্থান থেকে হুদী মানে যারা উটের গান গাইত তারা চলে গেলো। তারা চলে গেলো বগলের নীচে কোরান দাবিয়ে রেখে।]

৬. জোশ (ফা. উ.)–উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা।
নজরুল–কাব্যে 'জোশ'–এর কথা অনেক স্থানেই আছে। তাঁর ইসলামী 'জোশ' এইভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ 'নাহি সে উমর খাত্তাব ,
নাহি সে ইসলামী 'জোশ/করিল জয় যে দুনিয়া, আজ নাহি সে সিপাহী।'

মওলানা রুমী তাঁর 'জোশ–এর কথা বলেছেন এইভাবে,
মান চে গুইয়াম দর দিলে মান 'জোশে' নিস্ত,
বা কে গুইয়াম দরজাহাঁ এল গোশে নিস্ত।

[আমি আমার আশার কথা, উত্তেজনার কথা কার কাছে বলবো যদি পৃথিবীতে শোনার মত একটি কানও না থাকে।]

৭. জওহর (আ, ফা-গওহর) মূল্যবান পাথর, মনি, মুক্তো ইত্যাদি। নজরুল ইসলাম 'জওহর' বা 'গওহর' দিয়ে তৈরী করেছেন তাঁর কাব্যের প্রাসাদ । একটি মাত্র উদাহরণ,

'পানি কওসর /মণি 'জওহর' /আনি জিবরাইল আজ হরদম দানে 'গওহর'/
টানি' মালিক উল–মৌত জিঞ্জির বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।'

মহাকবির শেখ সাদী 'গওহর'–এর চিরত্বগুণ রক্ষা করেছেন এইভাবে,
সংগে বদ 'গওহর' আগার কাসায়ে জরি শেকান্দ, .
কিমতে সংগে নাইয়াফ জাইয়াদ ও জর কম্‌ না শওয়াদ।

[যদি শক্ত পাথর দিয়ে মুক্তোখণ্ড অথবা সোনার পিয়ালা ভেঙ্গে ফেলা হয় তবু মুক্তো বা স্বর্ণের দাম কমে না। এবং স্বর্ণ স্বর্ণই থাকে। পাথরও কোনোদিন সোনা হয় না।]

মহাকবি ইকবালও 'জওহর' ছড়িয়েছেন তাঁর কাব্যের সর্বত্র। 'পচ-চি-বায়দ

কর্দ' (অতঃপর কিংকর্তব্য) কাব্যগ্রন্থের দুটি লাইনে ব্যবহৃত 'জওহর' কি ঔজ্জ্বল্যই না দিচ্ছে,

মুমিন আজ আযম ও তওফকুল কাহির আস্ত,
গর না দারাদ ইঁ দু' 'জওহর' কাফির আস্ত।

[মুসলমান বিজয়ী হয় তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও নির্ভরশীলতার জন্যে । এই দুই গুণ সম্পন্ন 'মুক্তো' যদি না থাকে তবে সে কাফের মানে অবিশ্বাসী।]

৮. আব জম জম (ফা. আ) মন্দাকিনী ধারা, মক্কার পবিত্র কূপ (নহরে জম জম)। কাজী নজরুল ইসলামের 'আব জম জম' খুব কষ্টে অর্জিত। যেমন,

'আব জম জম' আনলে এরা,
আপনি পিয়ে কলসী বিষের।'

মহাকবি ফেরদৌসীর 'আব জম জম' এইরূপ,

আবে জম জম করদা বুদাম আবে সুরা কায়কোরাম,
পাদশাহী করদা বুদাম পাসবানী কায় কোরাম।

[যে একবার 'আবে জম জম'-এর পানি পান করেছে সে কোনোদিন নর্দমার পানি খাবে না। যে একবার বাদশাহী করেছে সে কখনো চৌকিদারী করতে যাবে না।]

৯. জহর (ফা)-বিষ। নজরুল ইসলাম 'জহর' কিনেছেন জহরতের বিনিময়ে। যেমন, 'জহর' নিয়ে জহরত দেয়া নও বণিকের নও খেলা। ফারসী কবি ও সঙ্গীত সম্রাট আমির খসরু দেহলভী 'জহর'-এর ক্রিয়া অনুভব করেছেন এইভাবে,

তন্ দুরস্তি গার না বাশাদ শহদ শকর 'জহর' আস্ত,
মাশুক আগার খোশ্ না বাশাদ বস্তার গুলখারে আস্ত।

[স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে তখন মধুও মিষ্টি বিষের মতো মনে হয়।
প্রেমিকা যদি খুশী না থাকে তবে ফুলের বিছানা কাঁটার মতো মনে হয়।]

একটি জনপ্রিয় উর্দু গজলে 'জহর' আছে এইভাবে,

দুনিয়া মে হম আয়ে তো জিনাহী পারে গা,
দুনিয়া আগার 'জহর' কা পিয়ালা হায়
তো পিনাহী পারে গা।

[দুনিয়াতে যখন এসেছি তখন জীবিত থাকার চেষ্টা করতেই হবে।

দুনিয়া যদি বিষের পাত্রও হয় তবু তা পান করতেই হবে।]

১০. খাহেশ<খায়েশ (ফা)-ইচ্ছা, অভিলাষ, আশা, আকাঙ্খা ইত্যাদি। নজরুল ইসলামের 'খায়েশ' নিঃস্বার্থ, তিনি কেবল স্বদেশে 'নওরোজে'র মেলা দেখতে চান। যেমন,

তখত তাউস কোহিনূর কারো নাই 'খায়েশ',
নওরোজের এই সে দেশ।

কবি গালিব তাঁর 'খাহেশ' বিবৃত করেছেন চিরন্তন সূত্রেঃ

দুনিয়া কি 'খাহেশ' ইত্নি
কেহ্ হর 'খাহেশ' পে দম নিকলে,
বহুত আরমাঁ নিকলে মেরে
ফির ভি কম নিকলে।

[দুনিয়ার আশা-আকাঙ্খা এত যে, একটি আশা পূর্ণ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। অজস্র আশা পূর্ণ হয় অথচ মনে হয় কিছুই হয় নি মানে খুব কম হয়েছে।]

১১. মসজিদ (আ)-উপাসনালয় (মুসলিমদের), নামাজ-ঘর। নজরুল ইসলাম বহু 'মসজিদ' তৈরী করেছেন তাঁর কাব্যকর্মের মোড়ে মোড়ে। কিন্তু আল্লার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের একটি হৃদয়ের চেয়েও 'মসজিদ' অনেক ছোট। যেমন, কবি বলেছেন,

নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার 'মসজিদ'।

উমর খৈয়ামের বরাত দিয়ে জনৈক উর্দু কবি 'মসজিদের' স্থান উল্লেখ করেছেন এইভাবে,

সাকী শারাব পিলে দে হম মসজিদ মে বৈঠ কর্,
ইয়া ওহ্ জাগা বাতা দে জাহাঁ পর খুদা না হুঁ।
[হে সাকী, আমাকে মসজিদে বসে পান করতে দাও,
না হলে এমন স্থানের কথা বলে দাও, যেখানে খোদা নেই।]

আর একজন উর্দু কবি বলেছেন,

মসজিদ তুরো মানদের তুরো
ইয়ে তু মুজাক্কার হায়,

মগর কেসি কা দিল না তুরো
ইয়ে খাস খুদা কা ঘর হায়।

[মসজিদ ধ্বংস করো, মন্দির ধ্বংস করো, এটাতো পৌরুষ দীপ্ত কাজ। কিন্তু কারো মন ভঙ্গ করো না, কারণ মানুষের মন আল্লাহতায়ালার খাস ঘর।]

১২. আবহায়াত (ফা. আ.)-জীবন সার, জীবন রস, জীবন পানি। নজরুল ইসলাম রাসুলে করীমের মারফত 'আব হায়াত' বিলিয়েছেন সারা দুনিয়ার মানবতা-পাত্রে। যেমন,

হায় সিকান্দার খুঁজলে বৃথাই 'আবহায়াত' এই দুনিয়ায়,
বিলিয়ে দিল আমার নবী, সে সুধা মানব সবায়।

পারশ্যের কবি হাফিজের 'আবহায়াত' এইরূপ,

সাকীম খিজিরাস্ত ও মি 'আবহায়াত',
তৌবা আজ মি চুঁ কুনাম হায়হাতা হাত্।

[আমার সাকী হচ্ছে খিজির এবং আমার পানীয় হচ্ছে 'আব হায়াত'। তৌবা করি শারাব ছেড়ে দেব, কিন্তু আফসোস তা হয় না বরং উল্টোটা হয়ে যায়।]

১৩. মাল্লা (আ) নাবিক, মাঝি।

নজরুলের তরী কখনো ডুববার নয়। কারণ এ তরীর কাণ্ডারী মানে চালক হচ্ছেন সরওয়ারে কায়েনাত আহমদ (সঃ) এবং মাঝি মাল্লারাও পাকা। যেমন,

এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ
পাকা সব মাঝি ও মাল্লা
মাঝিদের মুখে সারিগান
শোন ঐ লা শরীক আল্লাহ্।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত কবি গালিব 'মাল্লা'দের সতর্ক করে দিয়েছেন এইভাবে,

বে ফিকর না হো মাল্লা সাহেল কি
কিনারে আ কর,
হাজারো কিশতিয়া ডুব গয়ী ইস
সাহেল সে টাক্‌রা কর।

[হে মাঝি, কিনারে এসেও নিশ্চিন্ত হয়ো না, কারণ কিনারের ধাক্কা খেয়েও বহু নৌকা ডুবে গেছে।]

১৪. মুল্লা, মোল্লা (আ) জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিজ্ঞজন।

কাঠমোল্লাদের উপর ক্ষিপ্ত নজরুলের সাবধান বাণী,

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে,

দেবদেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!

দার্শনিক কবি ইকবালের 'মুল্লা' এই রকম,

ব-বন্দ্-ই-সুফী ও মুল্লা আসীরী,

হায়াত আয্ হিকমত-ই-কুর আঁনা-গারী

[তুমি সুফী ও মুল্লার ফাঁদে বন্দী আছ—পবিত্র কুরআনের জীবন থেকে তুমি সরে পড়েছ।]

১৫. সিজদা (আ)–নত হওয়া নামাজে ব্যবহৃত 'সিজদা'। 'মরু-ভাস্কর' গ্রন্থে নজরুল ইসলামের 'সিজদা' এই রকম,

পড়ছে ঝুঁকে অধোমুখে 'সিজদা' করার লাগি সব,

সেদিন হতে শুনছি কেবল নতুনতর 'সালাত'-রব।

কবি হাফিজ-এর 'সিজদা' এইরূপ,

ব ম্যায় 'সুজ্জাদা' রাঙি কোন গারাত পীরে মগা গোয়েছ,

কে সালেক বেখবর নাবুদ জরাও রসমে মঞ্জিল হা।

[কামিল পীর যদি জায়নামাজে শারাব ঢালতে বলেন, তাই ঢালো। কারণ, তিনি সিজদার আসল মানে জানেন এবং আসল মঞ্জিলে যেতে যা দরকার সে সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে।]

একটি জনপ্রিয় উর্দু গজলে 'সিজদা' আছে এইভাবে,

জেয়সী 'সিজদো' সে আল্লাহ্ কো নেহি মিলতা,

হর জাগা মে ঝুঁকানে সে কিয়া ফায়দা।

[যে সিজদায় আল্লাকে পাওয়া যাবে না,

দুনিয়া জোড়া মাথা নত করেও কোনো লাভ নেই।]

১৬. আসমান (ফা)–আকাশ।

নজরুল-কাব্যের বহু 'আসমানের' একটি এইরূপ,

আরাস্তা আজ জমীন 'আসমান'

হুরপরী সব গাহে গান।

কবি ইকবালের 'আসমান' এ রকম,

দু'আ ইহ্ কর্ কি খুদাওন্দে আসমা'নো যমী

করে ফির উস্ কি যিয়ারতসে শাদমাঁ মুঝকো।

[এই প্রার্থনা করো, যেন স্বর্গমর্ত্যের প্রভু খুদাতায়া'লা তাঁর দর্শন দ্বারা আমাকে আবার আনন্দময় করে তোলেন।]

১৭. ফেরেশতা (আ)–স্বর্গীয় দূত।

নজরুল-কাব্যে 'ফেরেশতা' বহুবার আবির্ভূত হয়েছেন। এক স্থানে এই ভাবে,

'ফেরেশতা' সব সওদা খুশীর

বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে।

কবি গালিব 'ফেরেশতা'কে দেখিয়েছেন এই ভাবে,

মুহব্বত আগ হ্যায় যো পথর কে সিনে সে জ্বলতে,

বাশার কিয়া? ফেরেশতো ইনহি সোলে সে জ্বলতে।

[প্রেম হচ্ছে এমন আগুন যা পাথরের ভিতর থেকেও বের হয়ে আসে। মানুষ কি ? ফেরেশতারাও মানুষের স্ফুলিঙ্গে জ্বলে যায়।]

১৮. ফুল (উর্দু)– পুষ্প।

বিভিন্ন ফুলের সমারোহে নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যের বাগান সাজিয়েছেন। তাঁর অনন্য একটি ফুল,

'সাহারাতে ফুট্‌লো রে 'ফুল'

রঙ্গিন গুলে লালা।

সেই ফুলেরই রৌশ্‌নীতে

ত্রিভুবন উজালা।

কবি ইকবাল ফুলের দল দিয়ে হীরক খণ্ডও কাটতে চান,

'ফুল' কি পাত্তি সে কাট সাকতা হ্যায় হীরে কা জিগর।

[ফুলের দল দিয়ে হীরকের অন্তরও কাটা যায়]

১৯. ফরমান (ফা)–আদেশ।

নজরুল কাব্যে বহু সৎকর্মের 'ফরমান' আছে। একটি ফরমান এই,

মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরই অপমান,

তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে 'ফরমান'।

প্রখ্যাত ফারসী অন্ধ কবি রোদকীর 'ফরমান' খুবই চমৎকার,

খিরমন্দ গুইয়াদ খিরদ পাদ্‌শাহ আস্ত,
কি বরহাস্‌ আম 'ফরমান' বরাস্ত।

[মানব দেহের শাসক হচ্ছে জ্ঞান, এই জ্ঞানই আদেশ দান করে দেহ শাসন করতে।]

২০. তৌহিদ (আ)–একত্ববাদ।

বহু জায়গায় নজরুল ইসলাম তৌহিদের বাণী ঘোষণা করেছেন। একটি নমুনা

এই তৌহিদ-একত্ববাদ বারে বারে ভুলে এই মানব,
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল তলের ঘোর দানব।

মহাকবি ইকবালও তৌহিদের ঘোষণা করেছেন বারবার। একটি উদাহরণ,

মক্‌শ তৌহিদ কা হর দিল বঠায়া হম্‌নে,
যেরে খঞ্জর ভি ইহ্‌ পয়গাম সুনায়া হম্‌নে।

[প্রতিটি হৃদয়েই তৌহিদের ছবি এঁকেছি, খঞ্জরের নীচে থেকেও এই পবিত্র বাণী শুনেয়েছি]

২১. গুল (ফা)–ফুল, পুষ্প।

নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য-মাঠ গুলে গুলজার অর্থাৎ ফুলে ফুলময় করেছেন।
'বুলবুল' থেকে একটি নিদর্শন,

গোপনে চৈতী হাওয়ায় 'গুল' বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাকছে ডালে কু কু বলে কোয়েল ননদী।

কবি হাফিজ তাঁর 'দীওয়ান' সাজিয়েছেন 'গুল'-এর বাহার দিয়ে,

গুল বে রোখ ইয়ারে খোশ্‌ না বাশাদ,
বি বাদাহ্‌ বাহারে খোশ্‌ না বাশাদ।
[গোলাপ ছাড়া প্রিয়ার মুখ ভালো লাগে না।
গোলাপ ছাড়া বসন্ত কাল নিরর্থক।]

উর্দু কবি জোশ মলিহাবাদী 'গুল' প্রস্ফুটিত করেছেন নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে। যেমন,

মেটা দো আপনি হাস্তি কো আগার কুছ মর্তবা চাহে,
যেয়মে দানা খাক্‌ মে মেলকার গুলে গুলজার হো যায়ে।
[যদি কোনো ফললাভ চাও তবে সাধনার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন

করো। যেমন বীজ মাটিতে মিশে গিয়ে ফুলে ফুলময় করে তোলে।]

উর্দু কবি মীর তকী মীরও 'গুল'-এর আসলরূপ প্রদর্শন করেছেন,

নিকাল যাতি হ্যায় খোশবু তো 'গুল' বেকার হোতা হ্যায়।

[সুঘ্রাণ বেরিয়ে গেলে ফুল নিরর্থক হয়ে পড়ে।]

২২. খঞ্জর (ফা)–ছুরি, বল্লম, তরবারী, ছোরা।

নজরুল ইসলাম অশুভ খঞ্জরের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। যেমন,

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,

বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের 'খঞ্জর।'

কবি ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার মারাত্মক 'খঞ্জরের' কথা বলেছেন এভাবে,

তুম্হারী তাহ্যীব আপনে খঞ্জরমে আ'পহী খুদক্শী করেগী,

জো শাখে নাযুক পে আশ্ইয়ালা বনে গা নাপায়দার হোগা।

[তোমাদের সভ্যতা তোমাদেরই ছোরায় আত্মহত্যা করবে।

দুর্বল শাখায় যে বাসা তৈরী করা হয় তা খুবই ক্ষণস্থায়ী।

২৩. শমশের (ফা)–তরবারী।

নজরুল ইসলাম বহুবার 'শমশের'-এর ঝিলিক দেখিয়েছেন। বীর খালেদের 'শমশের' এইরূপ,

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন অসিবেন ঈশা ফের,

চাই না মেহদী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে 'শমশের'।

মহাকবি ইকবাল আত্মবিস্মৃত মানুষকে ডাক দিয়েছেন এভাবে,

তু শামশীরে যে নিয়ামে খুদ বিরূ আ',

বিরূ আ' আয নিয়ামে খুদ বিরূ আ'।

[হে তরবারী, তুমি নিজের খাপ থেকে বাইরে আসো,

তুমি বাইরে আসো, নিজের খাপ থেকে বাইরে আসো]

২৪. বান্দা (ফা)–চাকর, গোলাম, দাস।

নজরুল ইসলামের 'বান্দা' বন্ধন ছিঁড়ে বাইরে আসতে চায়,

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির,

'বান্দা' আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।

কবি ইকবাল বান্দা ও বাদশাহ্‌কে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছেন ঃ

এক হী সফমে খড়ে হো গয়ে মাহমুদ ও আয়াজ,
না কোই 'বান্দা' রাহা আওর না কোই বান্দা নওয়াজ।

[একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মাহমুদ ও আয়াজ, এখন আর কোনো তফাৎ নেই, কে চাকর, কে বাদশাহ।]

২৫. জিঞ্জির (ফা)–শিকল।

নজরুল ইসলামের 'জিঞ্জির' বড় শক্ত। যেমন,

টানি' মালিক উল মৌত 'জিঞ্জির' বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।

শেখ সাদীর 'জিঞ্জির'ও লক্ষ্য করবার মতো,

পায়ে দর 'জিঞ্জিরে' পে দোস্ত্ আ,
বেহ্ কেহ্ ব বেগানে দর দোস্তাঁ।

[বন্ধুর কাছে আবদ্ধ থাকা শত্রুর বাগানে ভ্রমণ করার চেয়ে উত্তম।]

২৬. আতশ<আতশী (ফা)–আগুন, অগ্নি

নজরুল 'আতশ' জ্বেলেছেন বহু কবিতায়। একটি নমুনা,

জিবরাইলের 'আতশী' পাখা সে ভেঙে যেন খান খান,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আনচান।

কবি গালিব– এর 'আতশ' এইরূপ'

ইশ্‌ক পর জোর নেহী, হ্যায় য়েহ্‌ ওহ্ 'আতশ',
জো লাগায়ে নহ্ লাগে ঔর বুজায়ে নহ্ বুজে।

[প্রেমের উপর কোন জোর জবরদস্তি নেই, এটা সেই আগুন যে আগুন জ্বালালে জ্বলে না এবং নিভাতে চাইলেও নেভে না।]

২৭. সাকী (আ) –শরাব পরিবেশক।

নজরুল বহুবার 'সাকীর' পেয়ালায় আমাদেরকে কাব্যরস পান করিয়েছেন। যেমন,

বন্ধু গো 'সাকী' আনিয়াছ নাকী বরষের সওগাত।

কবি হাফিজের 'সাকী' এভাবে হাজির,

সাকী, ব নূরে বাদাহ্ বর আফরোজ জামে মা,
মুতরেব বেও কেহ্ কার জাহাঁ শব্দ ব কামে মা।

[হে সাকী, সুরার ঝলক দিয়ে পাত্র উজ্জ্বল করো,
হে জ্ঞানী, বলো, দুনিয়ার সব আকাঙ্খা কি আমাদের পূর্ণ হয়েছে?]

কবি গালিব 'সাকী'কে দেখেছেন এভাবে,

নাহ্ হায়রত চশ্মে 'সাকী' কী,
নাহ্ সুহবত দওরে সাগর কী।
[সাকীর চোখ আর ঘুরে ঘুরে কারও চোখে বিস্ময় জাগায় না;
সুরাপাত্র ঘুরে ঘুরে কারও তৃষ্ণা মেটায় না।]

২৮. তন (ফা)–শরীর, দেহ।
নজরুল ইসলামের কাব্যের 'তন' শৌর্যবীর্যে ভরা। যেমন.
হাঁকে ঘন ঘন বীর–
হবে জুদা তার 'তন' শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত –যে নেবেরে তাঁরে গোরে
আমির খসরু দেহলভীর 'তন'এর আকাঙ্ক্ষা এইরূপ,
মান তু শুদাম তু, মন শুদী, মান 'তন' শুদাম
তু জান শুদী,
তা কস্ নাহ গোয়দ বাদ আজ ঈঁ মান দীগরম
তু দীগরী।
[আমি যদি তুমি হই, তুমি আমি হই
তাহলে আর কেউ বলতে পারবে না যে,
তুমি আর আমি ভিন্ন।]

২৯. আরজু (ফা) ইচ্ছা, অভিলাষ, আশা।
নজরুলের 'আরজু' এইরূপ,
যে নাম নিয়ে এসেছি দুনিয়ায়
সেই নাম নিতে নিতে মরি এই 'আরজু'। [সঙ্গীতাঞ্জলী]
উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী 'আরজু' পেশ করেছেন এভাবে ঃ
যো হ্যায় গরজ উস্কে নয়ে জিস্তাজু
লাখো আগার দিল হাঁয় তো লাখো আরজু।
[প্রত্যেকেই কমবেশী ভিন্ন মত পোষণ করে,
যদি সহস্র প্রাণ থাকে তবে সেখানে সহস্র আশা।]

৩০. দুশমন (ফা) –শত্রু।
নজরুল ঈদের আনন্দে দোস্ত দুশমন এক করে ফেলেছেন,
শয়তান আজ ভেশ্তে বিলায় শরাব -জাম,
দুশমন–দোস্ত এক জামাত।
উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী 'দুশমন' কে ছাড়তে চান না :

জান যব তক নাহ্ হো বদন সে জুদা,
কোই দুশ্‌মন নাহ্ হো ওতন সে জুদা।
[যে পর্যন্ত প্রাণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়,
সে পর্যন্ত কোনো শত্রু যেন মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।]

আলতাফ হোসেন হালীর সমসাময়িক এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রখ্যাত কবি আসাদুল্লাহ্ গালিবের 'দুশমন'ও কম প্রিয় নয়। যেমন,

রফিকোসে রকীব আচ্ছে' যো দুশমনি সে নাম লেতা হায়,
ফুলো সে খার বেহতর যো দামান্দ থাম্ লেতা হায়।
[বন্ধুর চেয়ে সেই শত্রু ভালো যে শত্রুতার জন্যও অন্ততঃ স্মরণ করে।
ফুলের চেয়ে কাঁটা ভালো, যে কাঁটা আঁচল টেনে ধরে।]

৩১. মরদ, মর্দ (ফা) পুরুষ, নর মানব।

নজরুল ইসলামের 'মর্দ' কেমন শক্তিশালী,

ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধরতে আসেন তুর্কী তাজী 'মর্দ' গাজী মোল্লা। [কামাল পাশা]

উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব নিরুপণ করেছেন এভাবে,

এয়সা না হো 'মর্দ' ঔর আওরত মে রাহে বাকী নাহ ফারাক,
তা'লিম পা কার আদমী বানানা তুমহিঁ জিয়ানা নারী।
[এমনও যদি হয় যে, নারী– পুরুষে কোনো তফাৎ না থাকে,
তবে তা হবে শিক্ষার মাধ্যমে সভ্যতার দিকে ধাবিত হওয়া।]

দার্শনিক কবি ইকবালের 'মর্দ' এর নমুনাও লক্ষ্য করবার মতো,

নিশানে মর্দে মুমিন বাতু গোয়ম,
চু মর্গ আয়াদ্ তবস্‌সুম বর লবে উস্ত।
[বিশ্বাসী পুরুষদের লক্ষণ বলবো,
যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখনও তার মুখে মৃদু হাসি থাকে]

৩২. হেনা (আ. হিন্না থেকে)-মেহেদী।

নজরুল 'হেনা'র শিল্পকর্মে তার কাব্য সাজিয়েছেন এভাবে,

সেই মুহূর্তে 'হেনার' সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।

উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী, হেনার আসলরূপ দেখিয়েছেন এ ভাবে,

সুর্খে রূহ্ হোতা হায় ইনসাঁ ঠোকর খানে কে বাদ,
রংগ লাতি হায় হেনা পথ্থর পর পিস জানে কে বাদ।

[মানুষ উজ্জ্বল প্রাণের অধিকারী হয় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর,
মেহেদী রং প্রাপ্ত হয় পাথরের সঙ্গে পিষ্ট হওয়ার পর।]

৩৩. সিয়া (ফা) কালো রং এর কালি। (উর্দুতে সিয়াহী ব্যবহৃত হয়)।
নজরুল এর 'সিয়া' এ ভাবে চিহ্নিত,
বুঝলে ভাই ঐ নীল 'সিয়াটা' শত্রুদের,
দেখতে নারে কারু ভালো,
তাইতো কালো রক্তধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের।
উর্দু কবি দাগ সিয়া<সিয়াহী ব্যবহার করেছেন এ ভাবে,
ইশ্‌কে বাজী মেঁ কারামত নাহ্‌ হো কিয়া মা'নী,
যিসকো দিল চাহে মুলাকাত নাহ হো কিয়া মা'নী,
লিখতা হোঁ জিগর খুন সে 'সিয়াহী' নাহ্‌ সমঝানা,
মরতা হোঁ তেরী হিজর মেঁ জিন্দা নাহ্‌ সমঝানা।
[প্রেমের খেলায় আশ্চর্য লাভ না থাক,তাতে কি?
যাকে প্রাণ চায় তার সঙ্গে দেখা না হোক তাতে কি?
বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছি কালি কিনা জানি না,
তোমার বিচ্ছিন্নতায় মৃত-প্রায়, জীবিত কিনা জানি না।]

৩৪. শামা (ফা)– বাতি, মোমবাতি।
নজরুল ইসলাম 'শামা'র আলোকে বহুবার আমাদের চোখ ঝলসে দিয়েছেন যেমন,
'আমার হৃদয় 'শামা'দানে জ্বালি মোমের বাতি।' (জুলফিকার)
উর্দু কবি দাগ এর 'শামা' আমাদের চিন্তামগ্ন করে,
যো জ্বালাতা হ্যায় কেসী কো ওহ্‌ভী জলতা হায় জরুর,
শামা ভী জ্বল্‌ যাতী হায় পরোয়ানা জ্বল জানে কে বাদ।
[যে জালায় সেও নিশ্চিতভাবে দগ্ধ হয়,
পতঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাওয়ার পর মোমবাতিও জ্বলে নিভে যায়।]

৩৫, খাক (ফা)–মাটি।
নজরুলের কাব্য–বৃক্ষ সরস খাক কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠেছে,
'যদিই পাই তায় তোমার বোঁত্তার খুশবুদার 'খাক্‌' ধুল থোড়া।'
কবি ইকবাল দেশের মাটির প্রতিটি কণাকেই দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন অবশ্যি এটা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে বলা,
পাথর কি মুরতোঁ মেঁ সমঝা হ্যায় তু খুদা হায়,

খাক্ওয়াতান কা মুঝকো হর যররা দেওতা হ্যায়।
[তোমাদের ধারণা, পাথরের মূর্তিতে খোদা আছেন,
আমার কাছে স্বদেশের প্রতিটি ধূলিকণাই দেবতাস্বরূপ।]

৩৬. জুদা (ফা)–পৃথক, বিচ্ছিন্ন।
নজরুল–কাব্যে 'জুদা'র খবর বহু আছে।
মওলানা রুমী 'জুদা'র করুণ পরিণতি উপলব্ধি করেছেন এ ভাবে,
বেশ্‌নু আয্‌' ন'য় চুঁ হেকায়েত মী কুনাদ,
ওয়ায্‌ জুদাইহা শেকায়েত মী কুনাদ।
[শোনো, বাঁশী কি কাহিনী বর্ণনা করছে,
আসলে সে বিচ্ছিন্নতার করুণ অভিযোগের কথা শোনাচ্ছে।)

৩৭. মউত (আ)–মৃত্যু।
নজরুল বহুবার, 'মউত'কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।
হজরত আলী (রঃ) মৃত্যুকে মধুর মতো মনে করেছেন,
আল 'মাউতু' আহ্‌লী ইন্‌দানা মিনাল আসাল,
নাহ্‌নু বানু দাববাত আসহামেল্‌ জামাল।
নাহ্‌নু বানুল 'মাউতু' ইজাল মাউতা নাজাল
তান্‌হী ইবনে উফ্‌ফান বিল মারফেল্‌ আছাল
ওয়াদ –যু আলাই না শায়েখনা ছুম্মা বেহাল।

[মধুর চেয়ে মিষ্টি মৃত্যু আজ আমাদের কাছে,
আমরা দাববার গোত্র, উটের চালনা জানা আছে।
যখনি সে মৃত্যু আসে আমরা মৃত্যুর পুত্র হই,
উফ্‌ফান গিয়েছে মারা এ খবর দ্রুতবেগে বই–
নেতাকে ফিরিয়ে দাও, এই দাবী আর কিছু নয়।
কবি গালিব 'মউত' টেনে নিয়েছেন তাঁর জীবন কাব্যে এ ভাবে,
কয়েদে হায়াতও বন্দে গম্‌ আসল মে দোনা এক হায়
মউত সে পহলে আদমী গম, সে নাজাত পায়ে কিয়ুঁ?
[আয়ুর মেয়াদ আর দুঃখের বন্ধন আসলে তো একই,
মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে কি করে?]

৩৮. বদল (আ) পরিবর্তন, প্রতিদান।
নজরুল–কাব্যে বহুবার 'বদল'–এর আবির্ভাব ঘটেছে। একটি মাত্র উদাহরণ,

'বদলাবে তকদীর আমার/ঘুচিবে সকল অন্ধকার।' [নতুন চাঁদ] 'বদল' থেকে 'বদলাবে'।

হজরত আলী (রঃ)–এর 'বদল'এ কি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ,

ফাকুম বি ইলমিন ওয়ালা তাবগি লাহু 'বাদলা'ন,

ফান্ নাসু মাওতা ওয়া আহলেল ইলমু আহ্য়িয়া।

[জ্ঞানের সে অন্বেষণে কখনো চেয়ো না প্রতিদান,

জ্ঞানীরা জীবিত আর বাকী সব মৃতের সমান।]

৩৯. খোদ (ফা)– জিন , আপন। (খোদ থেকে খুদী, উর্দু)

নজরুলের আত্মজ্ঞান বড় স্পষ্ট,

খোদকে যদি চিনতে পারিস চিনবি খোদাকে।

ইকবালের খুদীতত্ত্বও কম উপদেশ পূর্ণ নয়।

খুদীকো কর বুলন্দ ইতনা কি হর তকদীর সে পহলে,

খুদা বান্দেসে খোদ্ পুছে বতা তেরী রিযা কিয়া হায়।

[নিজেকে এত উন্নত করো যে প্রত্যেক ভাগ্যনির্দ্ধারণের আগে খোদা

যেন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার মনের ব্যাসনা কি?]

৪০. মুহব্বত (আ)– প্রেম, ভালোবাসা, প্রণয়।

নজরুল ইসলাম প্রেমের জয় গান গেয়েছেন সর্বত্র।একটি নমুনা,

'মুহব্বত মেরা ফস্ গয়ি'। [বনগীতি]

একজন উর্দু কবি তাজমহল দেখে গরীবদের 'মুহব্বত' এর কথা এভাবে বলেছেন,

এক শাহান্‌শাহ্ নে দৌলত কা সহারা লেকর

হম গারীবোঁ কী 'মুহব্বত' কা উড়ায়া হায় মজাক।'

[এক শাহানশাহ্ অঢেল ধনভাণ্ডারের সুযোগ নিয়ে

আমাদের মতো সামান্য লোকের প্রেমকে উপহাস করেছেন।]

কবি ইকবালের প্রার্থনায় 'মুহব্বত' এ ভাবে,

ইস দওরকী জুলমত মে হর কলবে পরেশাঁ কো,

ওহ্ দাগে মুহব্বত দে জো চাঁদকো শরমা দে।

[বর্তমান কালের অন্ধকারে প্রত্যেকটি হৃদয়ে এমন ব্যাকুলতা

জাগিয়ে দাও, চাঁদকেও লজ্জা দেয় এমন প্রেমের কলঙ্ক দাও।]

উপরে মাত্র প্রায় অর্ধশত আরবী– ফারসী উর্দু শব্দের ব্যবহার এবং প্রতিটি শব্দের মাত্র একটি করে উদাহরণ নজরুল কাব্য থেকে পেশ করেছি। সেই সঙ্গে বিশ্বের তাবৎ আরবী উর্দু ফারসী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবিরা শব্দসমূহ কিভাবে

ব্যবহার করেছেন সে সব থেকেও মাত্র একটি করে উদাহরণ আহরণ করেছি। নজরুল ইসলাম শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন মাত্র। তিনি শব্দের অন্তর্ভুক্ত কোন পংক্তির ভাবধারা অনুসরণ করেছেন কিংবা কাব্যের মূল ভাব অনুকরণ করে নিজের নামে আত্মসাৎ করেছেন এমন কথা আশা করি কেউ বলতে পারবে না। তবে যদি কেউ বলেন যে , নজরুল ইসলাম আরবী ফারসী উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে সেসব ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তবে তাঁদের ধারণা যে কত অযৌক্তিক এবং অপ্রতুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্পর্কে পরে বলছি।

আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষাও সাহিত্যের উদ্ভবজনিত প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলবোও না । শুধু এইটুকুই যোগ করতে চাই যে আরবী ভাষার শব্দগুলো আমরা পেয়েছি ফারসীর মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে ফরাসী শব্দও। অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরবগণ ইরান দখল করেন তখন ইরানীরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের মূল ভাষা পাহলবী থেকে আর একটি নতুন ভাষার নবরূপ পরিগ্রহ করে। সেই ভাষাই 'দারী' বা আধুনিক ফারসী ভাষা। শুধু নতুন ভাষাই জন্ম লাভ করলো না পাহলবী ভাষার হরফ পাল্টিয়ে আরবী হরফ প্রর্বতন করা হলো এবঙ আরবী হরফের চেয়ে আরও চারটি হরফ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এ সম্পর্কে আগে সামান্য ইংগিত দেওয়া হয়েছে। ফেরদৌসীর মতো বিশ্বখ্যাত কবিরা তখন এগিয়ে আসলেন ফারসী ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য-তাঁদের অমর অবদান সন্নিবেশিত করে।

পাহলবী ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। এই ভাষার প্রাচীন কবি মহামানব জরোথুস্ত্র এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মহাগ্রন্থ 'জেন্দ' ও 'আবেস্তা' এবং দুটো মিলিয়ে 'জেন্দাবেস্তা'। এই পাহলবী ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে সংস্কৃত ভাষার প্রথম গ্রন্থ বেদ। উর্দু ভাষার উদ্ভব অনেক পরে।

ইরানীরা যখন সিন্ধু অববাহিকা বেয়ে এই উপমহাদেশে আসা শুরু করেন তখন তাঁদের সাহিত্য ভাণ্ডারতো আনেনই সেই সাহিত্যভাণ্ডারের সঙ্গে আনেন প্রচুর আরবী শব্দ। মুলত ঃ আমাদের আরবী শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ফারসীর মাধ্যমেই।

এই উপমহাদেশে যখন মুসলিম শাসন কায়েম হয় তখন ফারসী ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং দীর্ঘদিন তা অব্যাহত থাকে। ফলে ফারসীর প্রচলন এ দেশে একটা আভিজাত্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী ফারসী ও উর্দু শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। মধ্যযুগের কবি সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট পরিমানে। বিশেষ করে পুঁথি সাহিত্যে। শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকরাই তাঁদের সাহিত্যকর্মে আরবী ফারসী উর্দু শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বস্তি পান তাই নয় অনেক হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় । এমন কি কোনো কোনো হিন্দু পণ্ডিত সাহিত্যিক আরবী ও

ফারসী ভাষা রপ্ত করে গ্রন্থও রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। অনেক হিন্দু পরিবারেরও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। এই ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরই 'দীওয়ান ই-হাফিজে'র প্রথম সার্থক অনুবাদক। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলা হতো 'হাফিজ-ই-হাফিজ।' অর্থাৎ কবি হাফিজকে তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

আরব ইরান, তুরান প্রভৃতি পশ্চিমী দেশ থেকে যেসব সুফী দরবেশ এবং মুসলিম প্রবক্তা এদেশে আগমন করেছিলেন তাঁরা কেবল ইসলামের অমিয়বাণী, শুভ শিক্ষা বিস্তার করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা এদেশেই রয়ে গেলেন এ দেশকে ভালোবেসে এবং এদেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। এখানেই শেষ নয়। বহু হিন্দু তখন ইসলামের শান্তির বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তাঁদের মধ্যে তখন দেখা দেয় নব উদ্দীপনা এবং নতুন প্রেরণা। ইসলাম গ্রহণ করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, ইসলামী ঐতিহ্যপ্রীতি এবং সেই সঙ্গে আরবী ফারসী উর্দু চর্চার প্রচলনও তাদের মধ্যে ব্যাপক আকারে দেখা যায়।

পশ্চিমী দেশসমূহ থেকে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী শাসন কায়েম করার জন্য যাঁরা এদেশ আগমন করেছিলেন তাঁদের রক্তধারায় ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ এবং শেখ সাদী যার বর্ণনা দিয়েছেন, 'বার গুজিদা হাস্তে গুইয়া জবু তাজা নামে নাদ' বলে। অর্থাৎ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন বংশাবলীর রক্ত ধারার মধ্যে একটা সজীব উন্নতমনা স্বভাব থাকে। সেই উন্নতমনা স্বভাবত কিছুসংখ্যক মানুষ এদেশে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। বংশ পরম্পরায় তারা বাইরে বাঙ্গালীত্বপনা বজায় রাখলেও পারিবারিক জীবনে আরবী উর্দু-ফারসীর চর্চা পরিহার করতে পারেন নি। এমনকি অনেক পরিবারে ছিল দ্বিভাষিতার লক্ষণ। কারণ তারা বাইরে বাংলায় কথা বলতেন কিন্তু ঘরে অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে ব্যবহার করতেন ফারসী কিংবা উর্দু। আর এই ফারসী উর্দুর সঙ্গে ছিল প্রচুর আরবী শব্দ।

কাজী নজরুল ইসলামের পারিবারিক জীবনে বংশপরম্পরায় ছিল আরবী ফারসী উর্দুর চর্চা। তাঁদের রক্তধারায় যে 'নামে নাদ' প্রবহমান ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন নজরুল। পবিত্র হাদিসে আছে, 'কুল্লু শাইয়েন ইয়ারজুয়ু ইলা আসলেহী'। অর্থাৎ সবকিছু তার মূলের দিকে ধাবিত হয়। নজরুল ইসলামও তার মূলের দিকে ধাবিত হয়েছেন। ফলে নিজস্ব ধর্ম,ঐতিহ্যপ্রীতি স্বাজাত্যবোধ ইত্যাদি রক্ষা করতে গিয়েই তাঁর রচনায় প্রচুর আরবী ফারসী উর্দু শব্দের মুক্তো দিয়ে সাহিত্যের মালা তৈরী করেছেন। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নজরুল আরবী ফারসী উর্দু শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে এসব ভাষার কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি এবং তাঁদেরকে অনুসরণও করেননি। তিনি অনুসরণ করেছেন নিজেকে ,তাঁর বিবেককে এবং এদিকে ধাবিত করেছে তাঁর আসলবস্তু মানে রক্তধারা। তিনি নিজেই নিজের অনুসারী।

নজরুলের শিশু-কবিতায় শব্দ অনুষঙ্গ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

১.০ ভূমিকা

কবিতার দৈহিক কাঠামো নির্মাণ ও প্রসাধন-কলা রূপায়নে শব্দ-ব্যবহারের গুরুত্ব সর্বাধিক। কবিতার রূপকল্প বিশ্লেষণে অধিকাংশ সময়ে রূপক, অনুপ্রাস, চিত্রকল্প বা ছন্দের গুরুত্ব নির্দেশিত হলেও শব্দ প্রয়োগের আনুষঙ্গিক দিক বা অন্য অর্থে স্টাইলিসটিক দিক আলোচিত হয় না বলে শব্দনির্মাণের অন্তর্নিহিত কৌশল নেপথ্যে থেকে যায়। শব্দ-ব্যবহারে ধ্বনির পারস্পরিক বিন্যাস, অনুরণন এবং স্বরতরঙ্গের দিক অনুসৃত হয়ে থাকে। একজন কবি কবিতার অবয়ব নির্মাণে শব্দ-গঠনের এই দিকগুলি সচেতনভাবে চিন্তা করেন বলে তাঁর কবিতা বিশ্লেষণে কবিতার রূপগত এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে ভাষা সম্পর্কে কবি-মানসের বিশেষ প্রযুক্তি বা কৌতূহল ধরা পড়ে। বর্তমান আলোচনায় কাজী নজরুল ইসলামের ঝিঙেফুল, পুতুলের বিয়ে ও কিশোর ও শিশুকাব্যে শব্দ-অনুষঙ্গের বিভিন্ন রীতি যেভাবে অনুসৃত হয়েছে তার বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে বিশ্লেষিত।

১.১ শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

বাংলা শব্দ ব্যবহারে চারটি রীতি লক্ষণীয়। এগুলি যথাক্রমে তৎসম, তৎভব, দেশী ও বিদেশী। বর্তমান আলোচনায় শব্দ-বিভাগের এই রীতি দুটি পর্যায়ে বিশ্লেষিত। প্রথম পর্যায়ে বিদেশী শব্দ ও দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশী-রীতির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। দেশী-রীতিতে তৎসম, চলিত ও আঞ্চলিক শব্দ-প্রয়োগ নির্দেশিত। তৎসমে সাধুরীতিতে ব্যবহৃত শব্দ একদিকে এবং অন্যান্য শব্দ দ্বিতীয় পর্যায়রূপে গণ্য করা হয়েছে। নজরুলের শিশু বিষয়ক বিভিন্ন কবিতায় এই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত হওয়ার কারণ কবিতায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহারে কবিতার দেহ-নির্মাণ, অর্থগত প্রকাশ ও ছন্দ-গঠনে কবির সচেতন মানসিকতা প্রতিফলিত। নজরুল তাঁর অসংখ্য কবিতায় আরবি, ফারসী, হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছেন। শিশুদের জন্য লিখিত কবিতায় এই শ্রেণীর শব্দ যে উদ্দেশ্য সাধন করেছে সেই দিকটি প্রধানভাবে বিবেচ্য। রোদসী ও ক্রন্দসী অভিধানশুদ্ধ শব্দ কিনা—কবিতার শব্দ ব্যবহারে তা একান্ত প্রয়োজনীয় দিক নয়। তার কারণ, কবিতায় শব্দ ব্যবহারে অনেক সময় কবি নতুন শব্দ গঠন করে থাকেন সমশ্রেণীর প্রয়োজনীয় শব্দের অনুপস্থিতি ধ্বনিমাধুর্য অর্থব্যঞ্জনার

দিক চিন্তা করে। শিল্পকর্ম-সচেতন কবি তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক সময় ব্যাকরণ ও আভিধানিক শুদ্ধাশুদ্ধির দিক বিচার না করে বাস্তব প্রয়োজনের দিক চিন্তা করেন। অবশ্য, সাধারণভাবে ব্যাকরণ-অশুদ্ধ শব্দ গ্রহণের পশ্চাতে শক্তিশালী যুক্তি থাকা প্রয়োজন।

ক. আঞ্চলিক শব্দ

নেবু (খুকি ও কাঠবেড়ালী)
কও (খোকার খুশী)
টাঙতে (খাঁদু দাদু)
ক্যান (বোক্-চন্দন)
লিখতেছি (চিঠি)
ল'স (চিঠি)
ড্যাবিয়ে (হোঁদল কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন)
ওঠেছে (ঈদের চাঁদ)
ডিঙনু (লিচু -চোর)
দুকুরে (ঝিঙে ফুল)

খ. বিদেশী শব্দ

তোফা (খোকার গপ্প বলা)
এন্তার (প্রভাতী)
মশ্গুল (ঝিঙে ফুল)
আসমানে (ঝিঙে ফুল)
আলমানাক (খাঁদু দাদু)
উররে (ঠ্যাং-ফুলা)
এরোপ্লেন (চলব আমি হালকা চালে)

গ. সাধুরীতি

যাহা (মা)
কেহ, পাইবে (মা)
হেরিলে (মা)
ভাঙিয়া (মা)
চাপিতেন (মা)
বুঝিয়া (মা)
ধরিয়া (মা)
কাহার (মা)
দিগম্বর (খোকার বুদ্ধি)
চক্ষুস্থির (খোকার বুদ্ধি)
বাহির (খোকার গপ্প বলা)
ফুটিয়াছিল (খোকার গপ্প বলা)

ত্যাজি (প্রভাতি)
পুত্রে (চলব আমি হালকা চালে)
ত্রিভুবনের (চলব আমি হালকা চালে)
লতিকা (ঝিঙেফুল)
কর্ণে (ঝিঙেফুল)
গুল্মে (ঝিঙেফুল)
সুধাংশু (খাঁদুদাদু)

ঘ. গঠিত অগঠিত শব্দের বিশেষ প্রয়োগ রীতি
ফিরোজিয়া (ঝিঙেফুল)
ঘুম্ যাও (ঝিঙেফুল)
যেটুক (খুকী ও কাঠবেড়ালী)
সকলগুলো (খুকী ও কাঠবেড়ালী)
ছোড়্ দি (খুকী ও কাঠবেড়ালী)
বোক্-চন্দর (খোকার বুদ্ধি)
য়্যাববড় (চিঠি)
তুষ্টু (চিঠি)
দোস্তি (চিঠি)
গ্যে (লিচু-চোর)
য়্যাক -গোদা (ঠ্যাং-ফুলা)
য়্যাদেখেছিস (ঠ্যাং-ফুলা)

১.২ উপসর্গের প্রয়োগ

বাংলা বাক্য ব্যবহারে, শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটি মুক্ত রূপমূলের (যেমন, ছাদ, ছাত্র, মেয়ে, খোকা) স্বাধীন ব্যবহার ক্ষমতা ও অর্থবাচকতা গুণ বিদ্যমান । মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূলের (যেমন, রা, গুলো,পুঞ্জ) সংযুক্তি সাধনে শব্দের অর্থগত দিক সম্প্রসারিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 'কাল' মুক্ত রূপমূল এবং অ বদ্ধ রূপমূল। 'কাল' রূপমূলের প্রথমে অ-যুক্ত হওয়ার পর 'অকাল' স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে। বদ্ধ রূপমূল মুক্ত রূপমূলের প্রথমে মধ্যে বা শেষে যুক্ত হয়ে মূল রূপমূলের অর্থ সম্প্রসারণে সহায়তা করে। কবিতায় উপসর্গের ব্যবহার সীমিত হওয়ার কারণ উপসর্গ অন্তর্ভুক্তির ফলে অনেকক্ষেত্রে ধ্বনির ব্যঞ্জনা হ্রাস পায়। নজরুলের শিশু বিষয়ক কবিতায় উপসর্গের ব্যবহার একেবারে অনুপস্থিত নয়। নীচে উপসর্গের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল,

ক. সারাদিন (খোকার খুশী)

খ. হরিমটর (খোকার খুশী)

গ. অলক্ষে (লক্ষ্মী ছেলে তাই তোলে)

নজরুলের শিশু কবিতায় উপসর্গ কম ব্যবহারের কারণ ছোটদের কবিতায় উপসর্গের ব্যবহারে অর্থগত দূরান্বয়তা দেখা দেয় বলে কবিতার চিত্রকল্প অনুধাবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

১.৩ বহুবচন

মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বহুবচন নির্দেশক সমঅর্থদ্যোতক একাধিক বদ্ধ রূপমূল যুক্ত হতে পারে। বদ্ধ রূপমূলের স্বতন্ত্ররূপ থাকা সত্ত্বেও সেগুলো স্বতন্ত্রশ্রেণীর রূপমূল রূপে গ্রহণ করা হয়না। তার কারণ, এগুলো সমশ্রেণীর অর্থ প্রকাশ করে । যেমন, 'ছেলে' এই মুক্তরূপমূলের সঙ্গে রা,-গুলো বা-গুলি বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করে (মেয়েরা, মেয়েগুলো, মেয়েগুলি)। নজরুলের কবিতায় বহুবচন ব্যবহারে স্বতন্ত্র কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণতভাবে প্রচলিত রূপই তাঁর কবিতায় গৃহিত। যেমন,

শালিকগুলো (ফ্যাসাদ)

একটি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র লক্ষণীয় 'খুকী ও কাঠবেরালী' কবিতায়, 'সকলগুলো' শব্দ ব্যবহৃত। ব্যাকরণগত দিক থেকে এই ব্যবহার অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে যদিও কেউ কেউ এই শ্রেণীর বহুবচন ব্যবহার করে থাকেন।

১.৪ শব্দে অক্ষর ভাগ

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের কাঠামো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এগুলো এক বা একাধিক অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত। অধিকাংশ কবিই একাধিক অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। এর অন্যতম কারণ হল, একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের অর্থে একটা সীমাবদ্ধতা আছে বলে অর্থ সম্প্রসারিত হয়না। একটা মুক্ত রূপমূলের সমন্বয়ে একাধিক অক্ষর সমন্বয়ে একটা বৃহত্তর রূপমূল গঠিত হয়ে থাকে। নজরুলের শিশু বিষয়ক কবিতার অধিকাংশ শব্দই সাধারণত এক থেকে চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। নীচে অক্ষর গ্রন্থনার কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপিত।

এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ
বর (খোকার খুশী)
শোন (খোকার খুশী)
আয় (মা)
মা (মা)
চুণ (খোকার বুদ্ধি)
বীর (খোকার বুদ্ধি)

লক্ষণীয় যে একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বদ্ধাক্ষর বা শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত। ব্যতিক্রম স্বরূপ 'মা' শব্দ উল্লেখযোগ্য। এখানে ধ্বনিগুণ বৃদ্ধির জন্য শব্দশেষে আ স্বরধ্বনি অন্তর্ভূক্ত।

দু' অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ

নদী ঃ নো-দী (শিশু যাদুকর)
এলিঃ এ-লি (শিশু যাদুকর)
মন্মথঃ মন্-মথ (শিশু যাদুকর)
থাকবোঃ থাক-বো (সংকল্প)
চল্‌বঃ চোল-বো (চলব আমি হালকা চালে)
শিশুঃ শি-শু (শিশু-সওগাত)
ঝুম্‌কো ঃ ঝুম-কো (ঝুম্‌কো লতার জোনাকি)

দু' অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষর স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে গঠিত। অধিকাংশ শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর স্বরধ্বনি দিয়ে শেষ হওয়ায় শব্দের ধ্বনি-ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ

কাঠবেরালিঃ কাঠ্ -বে-রালি (খুকী ও কাঠ্ বেরালী)
রাজপুত্তরঃ রাজ্-পুত্-তোর (দিদির বেতে খোকা)
হুঙ্কারেঃ হুং-কা- রে (খোকার বুদ্ধি)
ঝৃল্ ঝাপ্পরঃ ঝৃল-ঝাপ্-পুর্(হোঁদল-কুঁৎকুতের বিজ্ঞাপন)

তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দচয়নে নজরুলের কবিতায় একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তিনটে অক্ষর ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ হয়েছে।

যেমন, ঝুপ-ঝাপ্-পর্। এই শ্রেণীর অক্ষর বিভাগের জন্য শব্দটি ছোটদের জন্য উচ্চারণে সুবিধা দেখা দিয়েছে।

চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ

আপনারে ঃ আ-পো-না-রে (মায়া -মুকুর)
ফুলকুঁড়িকেঃ ফুল-কুঁ-ড়ি-কে (আগুনের ফুলকি ছোটে)
চবুতরারঃ চো-বু তো-রার (আগুনের ফুলকি ছোটে)
মশারীতেঃ ম-শা-রী-তে(ঘুম-পাড়ানীগান)
কেরোসিনের ঃ কে-রো-সি-নের(নতুন খাবার)
সূর্যিঠাকুর ঃ সূর-যি-ঠা-কুর (মাঙ্গলিক)
ফুটিয়াছিলঃ ফু-টিয়া-ছি-লো (খোকার গপ্প বলা)

নজরুলের কবিতায় চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । প্রথমত এক শ্রেণীর শব্দের শেষ ধ্বনি-এ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দের শেষ ধ্বনি-র । প্রথমটি স্বরধ্বনি ও দ্বিতীয়টি ব্যাঞ্জনাত্মক ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে শেষ হয়েছে।

১.৫ মুক্ত, বদ্ধ ও জটিল রূপমূল

নজরুলের-শিশু বিষয়ক কবিতায় মুক্ত, বদ্ধ ও জটিল রূপমূলের ব্যবহার লক্ষণীয়।

শব্দ ও রূপমূলের মধ্যে পার্থক্য থাকায় রূপমূল সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে সহায়ক হবে। 'টেবিলগুলো'বা 'সমাজতান্ত্রিক' একটা শব্দরূপে গৃহীত হলেও গঠন ও অর্থগত দিক থেকে একক রূপমূল নয়। 'টেবিলগুলো' দুটো রূপমূল, প্রথমটি 'টেবিল', দ্বিতীয়টি 'গুলো' 'সমাজতান্ত্রিক' তিনটে রূপমূল দ্বারা গঠিত, 'সমাজ' 'তন্ত্র' ও 'ইক'(ষ্ণিক)। 'টেবিল' একটা রূপমূল ও একটা শব্দ। রূপমূল অর্থে ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান নির্দেশ করা হয়। গঠন বৈশিষ্ট্য, অর্থদ্যোতনা ও ব্যবহারগত দিকের সাহায্যে রূপমূল দুটি পর্যায়ে বিচার্য, মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূল। মুক্ত রূপমূল অন্য কোন রূপমূলের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, গঠনের তুলনায় ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নয় এবং অর্থদ্যোতক গুণ বিদ্যমান। যেমন, মেয়ে, আকাশ, উপহার।

ভাষায় মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে মুক্ত রূপমূল অথবা বদ্ধ রূপমূল সংযুক্ত হয়ে রূপমূল - সম্ভার বৃদ্ধি করে যোগাযোগের পথ সুগম করে । মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে অপর একটি মুক্ত রূপমূল সংযুক্তির পর উভয় রূপমূলের পূর্ব অর্থ পরিবর্তিত হয়ে স্বতন্ত্র একটা অর্থ নির্দেশ করে থাকে। মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূল যেভাবে সংযুক্ত হয়, তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখা যেতে পারে,

ক. দুটো মুক্ত রূপমূল সহযোগে গঠিত নতুন রূপমূল
ডাক, টিকিট =ডাকটিকিট
গাং (নদী), চিল (বিশেষ একধরনের পাখি)=গাংচিল (যে পাখি পানির ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়)

খ. মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল সহযোগে গঠিত নতুন রূপমূল
ছেলে, -গুলো =ছেলেগুলো
লাল,-চে =লালচে

যখন দুটো মুক্ত রূপমূল সমন্বয়ে একটা স্বতন্ত্র রূপমূল গঠিত হয়, তখন এই শ্রেণীর রূপমূলকে জটিল রূপমূল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই শ্রেণীর রূপমূল উভয় রূপমূলের একটা স্বতন্ত্র অর্থ নির্দেশ করে। যেমন, নজরুল, সঙ্গীত, শিল্পী =নজরুল সঙ্গীতশিল্পী।

গঠনগত দিক থেকে মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূলের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । বদ্ধ রূপমূলের অর্থপ্রকাশক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর রূপমূলগুলো মুক্ত রূপমূল ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না । যেমন,

ক. বদ্ধ রূপমূল -
—গুলো,রা, -তর

খ. মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূলের সংযুক্তি
—বইগুলো , ছেলেরা, ক্ষুদ্রতর

বদ্ধ রূপমূল বহুবচন, উপসর্গ , অনুসর্গ , কারক, প্রত্যয়- বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে।

মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির পর সম্প্রসারিত ও সাধিত রূপমূল গঠিত হয়ে থাকে। মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির পর সম্প্রসারিত রূপমূল গঠিত হয়ে ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, তুলনার মানের মত ব্যাকরণগত সম্পর্ক নির্দেশ করে। মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে বদ্ধ রূপমূল যুক্ত হয়ে সাধিত আকারের মধ্যে দিয়ে ব্যাকরণগত বিভিন্ন পদবিন্যাস প্রকৃতি নির্দেশ করে থাকে। যেমন,

প্রকৃতি (বিশেষ্য)–প্রকৃতিবাদী (বিশেষণ)
প্রাকৃতিক (বিশেষণ)

নজরুলের শিশু-বিষয়ক কবিতায় মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূলের বহুল প্রয়োগের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সাধিত রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি বিশেষ লক্ষণীয়। সম্প্রসারিত রূপমূলের তুলনায় সাধিত রূপমূলের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য থাকার কারণ, এই শ্রেণীর রূপমূলের মাধ্যমে কবি গঠিত রূপমূলের সাহায্যে অর্থগত বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে, সম্প্রসারিত রূপমূল প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিতায় বৈচিত্র্য আনা সম্ভব নয় বলে সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নজরুল-ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলের উদাহরণ নীচে বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে নির্দেশিত হয়েছে,

ক. মুক্ত রূপমূল
পেয়ারা (খুকী ও কাঠবেরালী)
কাঠবেরালী (খুকী ও কাঠবেরালী)
বর (খোকার খুশী)
খ্যাঁদা (খাঁদু দাদু)
আড়ি (ঠ্যাং-ফুলা)
ন্যাকা (পিলে-পটকা)

খ. বদ্ধ রূপমূল
সন্ধানীরা (সংকল্প)
শালিকগুলোর (ফ্যাসাদ)

গ. সম্প্রসারিত রূপমূল
পেটে—এ (খুকী ও কাঠবেরালী)
নাকটাকে—টা,-কে (খাঁদু দাদু)
করেছেন—ছেন (খাঁদু দাদু)
মুর্গীর—র (খোকার বুদ্ধি)
কেদারাতে—তে (খোকার গপ্প বলা)

ঘ. সাধিত রূপমূল
আকুলতা (মা)

ঢাকড়ুবাড়ু (পিলে-পট্‌কা)
রং-মশাল (জিজ্ঞাসা)
থল-ভোমোর (সারস-পাখী)
সত্‌র-চোখী (হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন)
জল-দেউড়ি (চলব আমি হালকা চালে)

১.৬ শব্দ-প্রকৃতি

নজরুলের কবিতায় মাঝে মাঝে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৎভব ও তৎসম শব্দ ব্যবহৃত। তৎভবের তুলনায় তৎসম শব্দের সংখ্যা কম। শিশু-বিষয়ক কবিতায় ছন্দ ও ভাবগত সহজতার জন্যই তৎসমের তুলনায় অধিকতর তৎভব শব্দ ব্যবহৃত। তৎসম শব্দ ব্যবহারে অনেকক্ষেত্রে ভাবের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি হয়েছে। অনেক সময় এই শ্রেণীর শব্দ ধ্বনি-মাধুর্যের জন্যও ব্যবহৃত। তৎভব শব্দের সাহায্যে বাণীভঙ্গীর সহজাত দিক লক্ষণীয়। চরণ নির্মাণে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের সাহায্যে যে প্রয়োজন সাধিত হয়েছে নীচে কতকগুলো দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা দেখান হয়েছে,

ক. কাঠ্‌বেরালি। কাঠবেরালি। পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেরাল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?
(খুকী ও কাঠবেরালী)

চরণঃ শব্দ শেষ হয়েছে স্বরধ্বনি দিয়ে। ও, উ স্বরধ্বনির ব্যবহারে শব্দের তরঙ্গ উপরে উঠেছে।
শব্দ প্রকৃতিঃ অধিকাংশ তৎভব
আঞ্চলিক শব্দঃ নেবু
তৎভব শব্দ ব্যবহারে ভাবের মধ্যে সহজতা সৃষ্টি।

খ. "সাত ভাই চম্পা জাগো"-
পারুল দি' ডাক্‌ল, না গো?
একি ভাই কাঁদন ঃ -মা গো
কি যে কয়-আরে দুত্তুর! (দিদির বেতে খোকা)

তৎভব শব্দের ব্যবহার। রূপকথার ভাবে সহজতা আনার প্রচেষ্টায় শব্দগঠন পরিবর্তন। 'দিদি' শব্দ 'দি' পরিবর্তনে বাহ্যিকতা বর্জন। শেষ চরণের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়া অন্য তিন চরণের শেষে স্বরধ্বনি ব্যবহৃত।

গ. চুণ ক'রে মুখ প্রাচীর 'পরে ব'সে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন সে এক নিরেট বোকা। (খোকার বুদ্ধি)

তৎসম ও তদভব শব্দের মিলনে ভাবের দ্বিমুখী চিত্রের সমন্বয় সাধন। 'প্রাচীর' শব্দ প্রয়োগে ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি করে পরবর্তী মুহূর্তে উপরের পরিবর্তে 'পরে ব্যবহারে

চিত্রের পারম্পর্য রক্ষা। 'শ্রীযুক্ত' ভেঙে 'শ্রীযুত' এর মাধ্যমে তৎভব শব্দের সাহায্যে সহজতা সৃষ্টি।

ঘ. নবনীতে সুকোমল লাবণি লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগ্ বিজয়ে। (শিশু যাদুকর)

তৎসম শব্দ ভেঙে ভাবের চারুতা বৃদ্ধি। 'দিগ্বিজয়'এর পরিবর্তে 'দিগ্‌বিজয়' উচ্চারণ সুবিধার্থে ব্যবহার। 'নবনী', 'লাবণি' 'অবনী'র মাধ্যমে অনুপ্রাস সৃষ্টি 'ন' ধ্বনির সাহায্যে ধ্বনিব্যঞ্জনা আনা। লাবণির আগে সুকোমল ব্যবহারে লাবণ্য মাধুর্য নির্দেশ। লাবণি শব্দ শিশুর পূর্ণ রূপ প্রকাশ করতে সমর্থ।

ঙ. মস্ত জাহাজ ব্যস্ত ভারি
সিন্ধু-ডাকাত জাল-পসারী,
মীনের ভীতি ধ্বংস-চারী
চাইনে ভাই ঐ জল-শকুন।
(চলব আমি হালকা চালে)

প্রত্যেক চরণে চারটে শব্দ ব্যবহৃত এবং প্রথম ও তৃতীয় শব্দের মধ্যে স্ত, ন্ধ থাকলেও দুটো করে অক্ষর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর শব্দশেষে স্বরধ্বনি থাকায় অনুরণন গুণ রক্ষিত। যেমন,

মস্ত	জাহাজ	ব্যস্ত	ভারি
স্ব	ব্য	স্ব	স্ব
সিন্ধু-ডাকাত		জাল-পসারী	
স্ব	ব্য	ব্য	স্ব
মীনের	ভীতি	ধ্বংস-চারী	
ব্য	স্ব	স্ব	স্ব

সিন্ধু-ডাকাত, জাল-পসারী, ধ্বংস-চারী ও জল-শকুন বিভিন্ন চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে।

স্ব ঃ স্বরধ্বনি ব্য ঃ ব্যঞ্জনধ্বনি

১.৭ রূপমূলের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে ধ্বনি ব্যবহারের রীতি

বাংলা রূপমূলের গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সাধারণভাবে রূপমূলের প্রথম ধ্বনি স্বরধ্বনি দিয়ে শুরু হলে তার পরবর্তী ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা প্রথম ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তার পরবর্তী ধ্বনি স্বরধ্বনি দিয়ে গঠিত হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী রূপমূলের অক্ষরবিভাগ স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা ব্যঞ্জনধ্বনি-স্বরধ্বনি এই শ্রেণীর ধ্বনিগত মিলবিন্যাস রক্ষিত হয়ে থাকে। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির এই রীতি রূপমূল গঠনে লক্ষণীয় বলে অক্ষরবিভাগে ধ্বনি ও উচ্চারণগত বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। ব্যতিক্রম হিসাবে লক্ষণীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, দ্বিস্বরধ্বনি, সংযোগস্থল অথবা

অক্ষরের পর বিরামচিহ্নের ক্ষেত্রে। এখানে পর পর দুটো অসমশ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনি (যেমন, ম্লান=ম, ল), সমশ্রেণীর দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি (যেমন, কাব্য= ব, ব), দুটো সম বা অসমশ্রেণীর স্বরধ্বনি (যেমন, দিয়ে=ই, এ, নিই=ই, ই) ও পর পর যতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটো অসমশ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনি (যেমন, অম্লান=ম, ল) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রূপমূল গঠনের এই বৈচিত্র্য অনুযায়ী নজরুলের এই কবিতায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলের ধ্বনিসংযুক্তিগত দিক নীচে উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে,

ক. একাক্ষর বিশিষ্ট রূপমূল

কিল	(খুকী ও কাঠ্‌বেরালী)	ব্য স্ব ব্য
লাফ	(খাঁদু দাদু)	ব্য স্ব ব্য
গা	(খাঁদু দাদু)	ব্য স্ব

খ. দু'অক্ষর বিশিষ্ট রূপমূল

ধানাই	(খোকার খুশী)	ব্য স্ব ব্য স্ব স্ব
দাদু	(খাঁদু দাদু)	ব্য স্ব ব্য স্ব
টাঙ্‌তে	(খাঁদু দাদু)	ব্য স্ব ব্য ব্য স্ব
চম্পা	(দিদির বেতে খোকা)	ব্য স্ব ব্য ব্য স্ব

'ধানাই' রূপমূলের শেষে দুটো স্বরধ্বনির মাধ্যমে দ্বিস্বরধ্বনি গঠিত। 'টাঙ্‌তে' ও 'চম্পা' রূপমূলে প্রথম বদ্ধাক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন ও দ্বিতীয় অক্ষরের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হলেও একসঙ্গে উচ্চারিত না হওয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত হয়নি।

গ. তিন অক্ষর বিশিষ্ট রূপমূল

আমাদের	(মা)	স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য
চাহনি	(মা)	ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব
কেননা	(খোকার বুদ্ধি)	ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব
পালোয়ান	(খোকার বুদ্ধি)	ব্য স্ব ব্য স্ব স্ব ব্য

'পালোয়ান' রূপমূলে ও-আ পাশাপাশি অবস্থান কালেও একসঙ্গে উচ্চারিত না হওয়ায় দ্বিস্বরধ্বনি গঠন করেনি।

ঘ. চার অক্ষর বিশিষ্ট রূপমূল

দিগম্বরের	(খোকার বুদ্ধি)	ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য
আঁধমহলে	(খোকার বুদ্ধি)	স্ব ব্য ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব
জুজুবুড়ীর	(খোকার গপ্‌প বলা)	ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য
শুনেছিলুম	(খোকার গপ্‌প বলা)	ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য স্ব ব্য

প্রথম দুটো রূপমূলে দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি অবস্থিত কিন্তু অক্ষর বিভাগের জন্য শ্বাসপর্বের বিরতি থাকায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠন করেনি।

নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত রূপমূলের ধ্বনিসংগঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একমাত্র দ্বিস্বরধ্বনি ও যুগ্মীভবন গঠন ছাড়া সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত

হয়নি। যেখানে দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি ব্যবহৃত সেখানে দুটো স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হওয়ায় ব্যঞ্জনধ্বনি বিযুক্ত হয়ে পড়ায় উচ্চারণগত সুবিধা হয়েছে। অধিকাংশ রূপমূলেই স্ব ব্য বা ব্য স্ব এই রীতি-বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

১.৭.১ সংযুক্ত ব্যঞ্জন, যুগ্মীভবন ও দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার

রূপমূল গঠনে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পর্যায়ক্রম অনুসারে দ্বিস্বরধ্বনি, যুগ্মীভবন ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত হয়ে থাকে। এই ত্রয়ী প্রক্রিয়া অক্ষর গঠন, পর্বনির্মাণ ও যতিপতন রূপরেখা নির্দেশে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'অন্তিম' , 'শুক্তি' শ্রেণীর রূপমূলে স্ত ও ক্ত একত্রে লিখিত হলেও সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দুটো দ্বিবিধ প্রয়াসে উচ্চারিত। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনে দুটো অসমশ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করে ও নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। 'ক্লান্তি' 'তৃণ' রূপমূল সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি হিসাবে গ্রহণ করা যায় (ক্লান্তির ক্ল, স্ত নয়।)। যুগ্মীভবনে দুটো সমশ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও শ্বাসপর্বের যতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে পদ্য (দদ) সত্যি (ত ত) রূপমূলের উল্লেখ করা যায়। ইটালীয় ভাষাতেও একই রীতি লক্ষণীয়। যেমন, পিরানদেল্লো। অন্য দিকে, দ্বিস্বরধ্বনির ক্ষেত্রে দুটো সম বা অসমশ্রেণীর স্বরধ্বনি রূপমূলে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। চাই (আই), নিই (ই ই) রূপমূল দ্বিস্বরধ্বনির উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

নজরুলের কবিতায় নির্বাচিত রূপমূলের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা সীমিত (ছোটদের উচ্চারণে ক্লেশসাধ্য), এবং যুগ্মীভবন ও দ্বিস্বরধ্বনির (অনুপ্রাস ও ধ্বনিব্যঞ্জনা) বহুল ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। যুগ্মীভবনের তুলনায় দ্বিস্বরধ্বনির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, নজরুল গৃহীত রূপমূলের সংখ্যানুপাত নিম্নরূপ ঃ দ্বিস্বরধ্বনি, সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুগ্মীভবন। এখানে স্মর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটো স্বরধ্বনির পাশাপাশি ব্যবহারে রূপমূলে ধ্বনির অনুরণন ও দ্যোতক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

স্মৃতিটুকু	সম	(শিশু যাদুকর)
যন্ত্রণাকে	তর	(সংকল্প)
গ্রীসের	গর	(সংকল্প)
চন্দ্র	দর	(সংকল্প)
বেত্র	তর	(লক্ষ্মী ছেলে তাই বলে)
প্রেত	পর	(লক্ষ্মী ছেলে তাই বলে)

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহারে নজরুলের কবিতায় দ্বিতীয় ধ্বনি হিসাবে ধ্বনি প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গঠনগত দিক থেকে র তরলধ্বনি বলে উচ্চারণে প্রলম্ব

ভাব বিদ্যমান। অনেকক্ষেত্রে র-এর আগে ঘোষধ্বনি (যেমন গ, দ) ব্যবহৃত হওয়ায় ধ্বনির অনুরণন গুণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। নজরুল রূপমূলের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে–এই তিন স্থানেই সংযুক্ত ধ্বনি ব্যবহার করেছেন।

যুগ্মীভবন

উজ্জ্বল	জ্জ	(শিশু যাদুকর)
কিন্নরী	ন ন	(শিশু যাদুকর)
বিশ্ব	শ শ	(সংকল্প)
অধ্যবসায়	ধ ধ	(মাঙ্গলিক)
তপস্যায়	স স	(মাঙ্গলিক)

যুগ্মীভবন প্রয়োগে নজরুল অনেক সময় মহাপ্রাণ ও ঘোষধ্বনি পাশাপাশি ব্যবহার করায় উচ্চারণ-তরঙ্গে একটা সবল প্রবাহগত দিক ধরা পড়ে। যুগ্মীভবন রূপমূলের মধ্যে ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতাও নজরুলের কবিতার বৈশিষ্ট্য।

দ্বিস্বরধ্বনি

যৌবনেরই	ও উ	(কিশোরের স্বপ্ন)
আওয়াজেই	আ ও, ই ই	(ছোট হিটলার)
মহিমায়	আ এ	(নতুন পথিক)
শারদীয়া	ই আ	(এই মধু মেলাতে)
খাও	আ ও	(নতুন খাবার)
পাকিয়ে	ই এ	(নতুন খাবার)
ভাই	আ ই	(প্রজাপাতি)
দু'পেয়ে	এ এ	(গদাই-এর পদবৃদ্ধি)

নজরুলের কবিতায় দ্বিস্বরধ্বনি ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যবহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে, তিনি দ্বিতীয় স্বরধ্বনি উ-ই-এ-ও নির্বাচন করেছেন। এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলো উচ্চারণের সময় জিভ উত্থানশীল অবস্থায় থাকে এবং ও, উ গোলাকার ধ্বনিগুণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় ছন্দে প্রলম্বিত টান আনতে সক্ষম। এই ধ্বনির ব্যবহারে রূপমূল নির্বাচনে নজরুলের সতর্ক প্রয়াস চিহ্নিত করে। নজরুল রূপমূলের প্রথমে ও শেষেই অধিকাংশ দ্বিস্বরধ্বনি ব্যবহার করেছেন।

১.৭. ২ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

রূপমূল গঠনে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি রূপমূলের বিভিন্ন অংশে সম ও অসম প্রকৃতিতে বিস্তৃত হয়ে ধ্বনিগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। স্বরধ্বনিগুলি ঘোষ হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষ, মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলে কবিতার ছন্দস্পন্দ, অক্ষর বিভাগে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফুসফুস থেকে বাতাস স্বরযন্ত্রে প্রবেশের পর বাতাসের চাপ ও কম্পনের প্রকৃতি অনুসারে স্বরতন্ত্রীর অনুরণনের ওপর স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। স্বরতন্ত্রের কম্পনের জন্য ধ্বনির ঘোষতা

এবং বাতাসের প্রবাহের জন্য ধ্বনির মহাপ্রাণতা সৃষ্টি হয়। কবিতায় ঘোষ, মহাপ্রাণ এবং কতকগুলো নমনীয় ধ্বনি (যেমন শ,ল, ম, ন, র) ব্যবহারে ছন্দে অনুরণন-বৈচিত্র্য দেখা যায়। মহাপ্রাণ বা ঘোষধ্বনি রূপমূলের প্রথমে, মধ্যে বা শেষে অন্তর্ভুক্তির জন্য ধ্বনিগত অনুপ্রাণতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ ধ্বনির গুরুত্ব বেশী। ঘোষধ্বনির অন্তর্ভুক্তিতে কবিতার অক্ষরের ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়।

কবিতার রূপমূল অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ঘোষ, অঘোষ, মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ ধ্বনির ভূমিকা অনেকাংশে পৌনঃপুনিকতার পর্যায়ে বলা যায়। একজন সচেতন শিল্পী এমন বিশেষ এক শ্রেণীর রূপমূল কবিতায় গ্রহণ করেন, যার সাহায্যে কবিতার চরণে ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব। রূপমূল নির্বাচনে নজরুলের ইন্দ্রিয়গত দিক কতখানি সচেতন ছিল তা সহজেই নির্দেশ করা সম্ভব। বিশেষত, তিনি সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন বলে ধ্বনির অনুরণনময়তা সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। নীচে তাঁর কবিতা থেকে অল্পসংখ্যক দৃষ্টান্তের সাহায্যে ধ্বনি ব্যবহারের রীতি বৈচিত্র্য নির্দেশ করা হয়েছে,

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি

ঘুম-পাড়ানী (ঘুম-পাড়ানী গান)
ঘঃ মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রথমে ব্যবহৃত
তুফান (ঈদের চাঁদ)
ফঃ মহাপ্রাণ ধ্বনি মাঝে ব্যবহৃত
ঝাঁপিয়ে (কোথায় ছিলাম আমি)
ঝ, প ঃ প্রথমে মহাপ্রাণ, পরে অল্পপ্রাণ
ভালোবাসি (কোথায় ছিলাম আমি)
ভ, ব ঃ প্রথমে মহাপ্রাণ, পরে অল্পপ্রাণ
পাগলি (মা এসেছে)
প ঃ অল্পপ্রাণ প্রথমে ব্যবহৃত
পদ্মফুল=(মা এসেছে)
প'দ, ফ ঃ প্রথমে অল্পপ্রাণ পরে মহাপ্রাণ, মধ্যে ঘোষ ধ্বনি।
ঠাকুর (বগ দেখেছ) ?
ঠ, ক ঃ প্রথমে মহাপ্রাণ, পরে অল্পপ্রাণ

রীতি-বৈচিত্র্য

ক. রূপমূলের মধ্যে মহাপ্রাণ ধ্বনির অন্তর্ভুক্তিতে মাঝের ধ্বনি জোরে উচ্চারিত।

খ. প্রথমে মহাপ্রাণ ও পরে অল্পপ্রাণ ধ্বনি ব্যবহারে প্রথম ধ্বনির ওপর জোর দিয়ে দ্বিতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় প্রবাহ কমিয়ে আনা।

গ. অল্পপ্রাণ, ঘোষ, মহাপ্রাণ ধ্বনির এই পর্যায়ে রূপমূল আস্তে উচ্চারণ করে অনুরণন এনে শেষে বেশী প্রস্বন দেওয়া।

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম
ঘুম আয় রে; দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা',
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা।
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম। (ঘুম-পাড়ানী গান)

ধ্বনি-সংযুক্তির বৈশিষ্ট্য

ঘুম-পাড়ানী	ঘো+ম+অ+ড়+ন
	ঘো+স্ব+ম+অ+স্ব+ড়+স্ব+ন+স্ব
মাসি	ম+স্ব+ম+ই
পিসি	অ+স্ব+স+স্ব
ঘুম	ঘো+উ+ম
দিয়ে	ঘো+স্ব+য়+এ
যেয়ো	য+এ+য়+স্ব
বাটা	ঘো+আ+অ+আ
ভরে	ঘো+স্ব+র+এ
পান	অ+স্ব–ন
দেবো	ঘো+স্ব+ঘো+স্ব
গাল	ঘো+স্ব+ল
ভরে	ঘো+স্ব+র
খেয়ো	অ+স্ব+য়+ও
আয়	স্ব+য়
রে	র+স্ব

সংকেতঃ অ=অঘোষ, ঘো=ঘোষ, স্ব=স্বরধ্বনি (ঘোষ)

কোমল ধ্বনি ম এর আগে বা পরে ঘোষ ধ্বনি ব্যবহারে অথবা স্বরধ্বনির পরে য় ও র ধ্বনি সংযুক্তি করণে রূপমূল গঠনে অনুরণন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বরধ্বনির ব্যবহার

রূপমূলের প্রথমে		রূপমূলের মাঝে		রূপমূলের	শেষে
এ	হইতে		ই	বালিকা	আ
উ	উৎসুক	মুকুরের	উ	মায়া	আ
অ	অনিমিখ	চাহিয়া	আ	জ্ঞানী	ই
আ	আদি	কাহারে	আ	যোগী	ই
আ	আমরা	তারা	আ	লেখে	এ
অ	অমৃতের	বালক	আ	দর্পণে	এ
অ	অবতার	ছোট	ও	তোমরাই	ই
এ	এই	সে	এ	দেহে	এ

অ	অমৃতের	দেহখানি	এ	আছে	এ
অ	অনন্ত	বিরাট	ই	ছায়া	আ
অ	অনাগত	তোমাতে	ও	তুমি	ই
আ	আনিতে	নিতে	ই	নও	ই
আ	আবার				(মায়ামুকুর)

নজরুলের কবিতায় স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি রূপমূলের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে বিভিন্ন রীতিতে অন্তর্ভুক্ত। রূপমূলের প্রথমের তুলনায় মধ্যে ও শেষে স্বরধ্বনির ব্যবহার রূপমূলের গঠন অনুযায়ী নিয়মিত। রূপমূলের প্রথমে ব্যবহৃত অধিকাংশ স্বরধ্বনিই একাক্ষর রূপে ব্যবহৃত।

রূপমূলের প্রথমে যে স্বরধ্বনিগুলি ব্যবহৃত সেগুলো হচ্ছে

অ	ছয়
এ	দুই
আ	পাঁচ
উ	এক

কবিতায় অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনির সংখ্যা লক্ষ্য করলে যায় যে অ, আ, এ, উ সংখ্যানুপাতে ব্যবহৃত। নিম্ন-মধ্য অ ও মধ্য আ স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা থেকে বোঝা যায় স্বরভঙ্গি নীচে নেমে এসে মধ্যবর্তী পর্যায় থেকে উচ্চতর অভিমুখী হয়েছে।

রূপমূলের মধ্যে ব্যবহৃত স্বরধ্বনি

ও	দুই
এ	দুই
ই	তিন
উ	এক
আ	চার

নজরুলের কবিতায় প্রথমে ব্যবহৃত আ স্বরধ্বনির মতই রূপমূলের মধ্যেও আ স্বরধ্বনির ব্যবহারের প্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যবর্তী এই স্বরধ্বনির পাশাপাশি ই, এ, ও ব্যবহারে ধ্বনির উর্ধ্বগামী ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়।

রূপমূলের শেষে ব্যবহৃত স্বরধ্বনি

এ	চার
আ	তিন
ই	তিন
ও	এক

কবিতায় রূপমূলের শেষে ব্যবহৃত স্বরধ্বনির মধ্যে এ-র সংখ্যাধিক্য, এবং তার

পরেই ই, আ-র স্থান। এক্ষেত্রেও নজরুলের কবিতায় একটা সাধারণ রীতিবৈচিত্র্য বিদ্যমান। তা হল মধ্য, স্বরধ্বনি আ-র ব্যবহার এবং ওপর থেকে ক্রমশ নিম্নগামী স্বরের প্রতি প্রবণতা।

রূপমূলে প্রথমে, মধ্যে বা শেষে স্বরধ্বনি অন্তর্ভুক্তির জন্য মীড়ের তারতম্য ঘটে থাকে। রূপমূলের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি মীড়ের ওপরে ওঠায়, রূপমূলের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনি মীড়ের মধ্যবর্তী পর্যায় এবং রূপমূলস্থিত শেষ স্বরধ্বনি মীড়ের ওপরে উত্থান-দিক চিহ্নিত করে।

নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে স্বরধ্বনি ব্যবহারে মীড়ের এই তিনটি পর্যায় নির্দেশ করা হয়েছে।

ক. রূপমূলের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনি
→
খ. রূপমূলের মাঝে অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনি
↑
গ. রূপমূলের শেষে অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনি
↑

রূপমূলের বিভিন্ন অংশে অন্তর্ভুক্ত স্বরধ্বনির মত ব্যঞ্জনধ্বনি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও ধ্বনি-ব্যঞ্জনা বিভিন্ন প্রান্তিকে নির্দেশিত হয়ে থাকে। নজরুলের 'সংকল্প' কবিতা থেকে ছ'টা চরণ আলোচনার জন্যে গ্রহণ করে রূপমূলের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনধ্বনির রূপগত একটি প্রবণতা নির্দেশ করা হয়েছে।

থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তা'রা কেমন ক'রে,
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তা'রা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে ॥

রূপমূলের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

ক ৭	ম ৩	থ ১
দ ৪	য ৩	ন ১
ব ৩	ত ২	ছ ১
ঘ ৩	ল ২	
	হ ২	

রূপমূলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

র ৯	
ন ৫	স ২
শ ৩	ক ১
ম ৩	দ ১
গ ২	খ ১
ট ২	ব ১
ত ২	

রূপমূলের শেষে অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

র ১২	খ ২
ছ ৪	ণ ২
ক ৩	ধ ১
ন ৩	ষ ১
ব ২	ত ১
শ ২	
য় ২	

রূপমূলের তিনটি অংশে যে ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত, সংখ্যানুপাতে সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল ব, ক, ন, দ, ছ। রূপমূলের প্রথমে স্পৃষ্ট ধ্বনির সংখ্যা বেশী। এগুলো ব্যবহারে মুখের ভেতর থেকে সজোরে বাতাস বের করার প্রবণতা স্পষ্ট। অন্যদিকে, রূপমূলের মধ্যে ও শেষে তরল (র) ও নাসিক্য (ন) ধ্বনি ব্যবহারে রূপমূলের অক্ষর বিভাগের মাধ্যমে ব্যঞ্জনা প্রকাশের দিক অত্যন্ত স্পষ্ট।

১.৮ স্বরতরঙ্গ

কবিতায় চরণ নির্মাণে রূপমূলের ব্যবহারে উচ্চারণ বা স্বরতরঙ্গের বিভিন্ন রীতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবিতা আবৃত্তির সময় ধ্বনির মীড়ের এই ওঠা-নামার প্রকৃতি সব সময়েই বিশেষ ক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মীড়ের পরিবর্তনগত এই দিক স্বরতরঙ্গ রূপে চিহ্নিত। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, রূপমূলস্থিত ঘোষ ধ্বনি উচ্চারণ এবং উচ্চাবস্থিত স্বরধ্বনির জন্য স্বরতরঙ্গের বিভিন্ন রীতি লক্ষিত হয়ে থাকে। সেজন্যে ধ্বনির পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিচার করা হয়। স্বরতরঙ্গ বিচারে কণ্ঠের উচ্চ ও নিম্নগ্রাম তিন দিক থেকে বিচার্য; উচ্চ, নিম্ন ও সাধারণ পর্যায়। কবিতার চরণের স্বরতরঙ্গ রীতি রূপমূলের নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে নির্দেশ সম্ভব। রূপমূলের ওপরের রেখার সাহায্যে উচ্চগ্রাম, নীচে নির্দেশিত রেখা দিয়ে মধ্যগ্রাম ও সর্বনিম্নস্থিত রেখা সঙ্কেতে নিম্নগ্রাম নির্দেশিত হয়ে থাকে।

কবিতায় চরণ সামগ্রিকভাবে উচ্চারণের সঙ্গে রূপমূল উচ্চারণের বিশেষ প্রবণতা

কবিতা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। রূপমূলস্থিত কোন ধ্বনির ওপর এই শ্রেণীর গুরুত্ব মীড় (pitch) নামে পরিচিত। এগুলো /১ ২ ৩ ৪/ এই চারটি পর্যায়ে দেখান হয়। মীড়ের সর্বোচ্চ পর্যায় /১/ চিহ্নের সাহায্যে ও সর্বনিম্ন দিক /৪/ সংখ্যা এবং মধ্যবর্তী দুটো পর্যায়ের জন্য /২ ৩/ সংখ্যা ব্যবহৃত। নজরুলের কবিতার চারটি চরণের সাহায্যে এই দুটো দিকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে,

↑ ২ কোন্ সে দুষ্টু ছেলে[২] →
→২ তারকার পিদিম জ্বেলে[২] →
→ ২ সারা রাত আগুন খেলে[২] →
২উল্কার গুলতি ছুঁড়ে[২] →
↑(জিজ্ঞাসা)

১.৯ উপসংহার

নজরুল ইসলামের তিনটি শিশু-কাব্যের কতকগুলো কবিতা অবলম্বনে শব্দের অনুষঙ্গগত রীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলেও এখানে স্মর্তব্য যে এ আলোচনা সীমিত পরিসরে ব্যাখ্যাত। সার্বিকভাবে বা বিস্তৃত পরিসরে এই দিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। নজরুলের অন্যান্য কবিতার শব্দ অনুষঙ্গত দিক ব্যাখ্যা করলে বিস্তৃত বৃত্তে কবি-মানসের একটা চিত্ররীতি নির্দেশ করা সম্ভব।

নজরুল ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আতাউর রহমান

পলাশীর প্রান্তর। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ, ২৩শে জুন, রোজ বৃহস্পতিবার। ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধে পরাজিত হলেন। ৩রা জুলাই রাত্রির অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে,

নিবিল গৃহের দীপ—নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।[১]

এরপর বণিকের 'মানদণ্ড' 'রাজদণ্ড' হয়ে দেখা দিল। সেই দিন পরাধীনতার শৃংখল অক্টোপাসের মতো চেপে ধরেছে বাংলাদেশকে। এই শৃংখল ছিন্ন করতে কেটে গেছে দুই শতাব্দী। এই শৃংখল ছেঁড়ার-সংগ্রামে কর্মীর সাধনা—সৈনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির স্বপ্ন— কবির কল্পনা, কবির ছন্দ, কবির সুর। পরাধীনতার বেদনায় পীড়িত হয়ে কবি গেয়েছেন,

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব-শৃংখল বল, কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।[২]

রঙ্গলালের (১৮২৭–১৮৮৭) এই উচ্চারণ জাতির স্বতোৎসারিত বেদনার প্রকাশ। ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার মানসে মধুসূদন (১৮২৪–১৮৭৩) লিখেছেন,

জন্মভূমি রক্ষা-হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়—শত ধিক্ তারে।[৩]

শৃংখলিত বাংলাদেশের বরেণ্য সন্তান রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১) দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন

শিকল দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।

কবি-সম্রাটের আহ্বান ব্যর্থ হলো না। শিকল-দেবীর পূজা বেদীকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে এক উদ্ধত তরুণ 'নিষেধ-জগতে' প্রবেশ ক'রে ঘোষণা করলেন,

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ।[৫]

এই বলিষ্ঠকণ্ঠ বিদ্রোহী কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

বৃটিশ শাসনকাল থেকে এ পর্যন্ত অনেক কবিই আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে। কারণ, জাতীয় জীবনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখকে তাঁরা ভাষা দিয়েছেন। সংকটকালে তাঁদের সাহিত্য আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে—পথ দেখিয়েছে। তাঁরা উভয়ে ছিলেন বৃটিশ-যুগের কবি। কিন্তু তাঁরা কালোত্তীর্ণ। তাঁদের বাণী দেশ ও কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সব দেশের সব কালের মানুষের প্রাণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক প্রয়াসে—রবীন্দ্র-নজরুলের চেতনা রক্তধারার মত প্রবহমান। বৃটিশ-যুগের কবি হলেও তাঁদের উপলব্ধিতে, উচ্চারণে আমরা আজও খুঁজে পাই আমাদের আশার কথা—আমাদের প্রত্যয় ও আদর্শের কথা।

আমাদের আলোচ্য-বিষয় নজরুল ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর—নয় মাসের রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই অভ্যুদয়ের ইতিহাসের দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় বৃটিশ-যুগের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, দ্বিতীয় অধ্যায় পাকিস্তানী শাসন-কালের সঙ্গে। নজরুলের সাহিত্য-সাধনার কাল ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। সেটা ছিল বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের শাসন শোষণের যুগ। সেই শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল নজরুল ছিলেন তার নিবেদিতকর্মী—একনিষ্ঠ সৈনিক। বিদ্রোহী তিনি অবশ্যই। তাঁর বিদ্রোহ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে, তাঁর বিদ্রোহ ছিল সামাজিক অসাম্য-বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তাঁর বিদ্রোহ ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে।

সে-যুগের রাজনৈতিক আন্দোলন অহিংস-অসহযোগিতার পথে, নিয়মতান্ত্রিকতার পথে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে। নজরুল কিন্তু সেই নীতি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয় ও আদর্শ অহিংসা এবং নিয়মতান্ত্রিকতাকে লংঘন ক'রেছে বার বার। আমরা জানি, এই জন্য বৃটিশ সরকার তাঁর পত্রিকা ও বই নিষিদ্ধ করেছে। সে যুগের রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯–১৯৪৮) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০–১৯২৫) প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তিনি অহিংসাকে বিদ্রূপ করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না—এটা ছিল নজরুলের রাজনৈতিক বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ জন্য তাঁকে কারা-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

'ধূমকেতু'র সারথি (১৯২২) নজরুল তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় উচ্চকণ্ঠে পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছেন,

> সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃংখল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।[৭]
>
> 'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম।

সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় উপমহাদেশের এক দুরারোগ্য ব্যাধি। স্বাধীনতা-শান্তি-প্রগতির পথে এটা একটা বিরাট বাধা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক আছেন যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সেই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশে নজরুল আস্থা রেখেছিলেন মানবতায়, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে, সামাজিক সাম্যে।

সে যুগের অবিশ্বাস ঈর্ষা বিদ্বেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী' [৮]

'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়।'

'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের।.... যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্ম গ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি।'[১০]

মানব সমাজের অসাম্য-বৈষম্য—বিরোধ-বিসংবাদ দূর করার জন্য তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন। তাঁর সাম্যের গানকে কবির খেয়াল মনে করা ভুল। ১৯২৫ এর ডিসেম্বরে তিনি 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশ করলেন কৃষক শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গঠন করলেন কৃষক শ্রমিক দল। কবির প্রয়াসে তৈরী হলো সে দলের কর্মসূচী। তাতে ঘোষণা করা হলো,

> আধুনিক কল-কারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিষ লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মীগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।[১১]

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি দেশের কথা ভেবেছেন,

> চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
> জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
> আপন প্রাঙ্গন-তলে দিবস-শর্বরী
> বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি... ।[১২]

নজরুলের কাব্যে একটি সাম্য-রাজ্যের ছবি পাই,

গাহি সাম্যের গান

বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী.
হেথা পায় নাক কেহ ক্ষুদ ঘাঁটা কেহ দুধ সর ননী।
অশ্ব-চরণে, মটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ
ঘৃণা জাগে নাক সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা দেহ।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গীর্জা-ঘর
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ, নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্‌ত, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাতে রেখে মিলিয়াছি ভাই ভাই।
নাইকো এখানে ধর্মের ভেদ, শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদ্‌রী-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।[১৩]

বৃটিশ-যুগে দেশে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে উঠেছিল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' ও 'নিখিল মুসলিম লীগ'। কখনো ঐক্য কখনো অনৈক্য, কখনো সংঘাত কখনো সন্ধির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা এক জায়গায় এসে সমাধানের পথ হারিয়ে ফেললো। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের স্থায়ী সমাধানের জন্য মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য দাবী করলো (১৯৪০) স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—যার নাম পাকিস্তান।

এই সময় নজরুল ইসলাম খানিকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবু তাঁকে মুসলিম লীগ বিরোধী 'নবযুগ' পত্রিকার পরিচালক নিযুক্ত করা হলো। (অক্টোবর ১৯৪০)।

মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসার তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল। উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে শুধু মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে নজরুলের সমর্থন থাকার কথা নয়।

'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার এক বছর পর তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত-জুবিলী উৎসবে তাঁর অনুরাগীদের জানালেন,

> হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য ঋণ-অভাব—অন্য দিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তুপের মত জমা হয়ে আছে—। এই অসাম্য, এই ভেদ-জ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম।[১৪]

তিনি নিজেকে "হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির উর্ধ্বে"[১৫] ব'লে পরিচয় দিলেন।

নজরুল পাকিস্তান-আন্দোলন সমর্থন করেন নি, কিন্তু মুসলিম জাগরণে তাঁর

অবদান অসামান্য। মুসলিম লীগের সভায়-সম্মেলনে গীত হয়েছে নজরুলের জাগরণী গান। ইসলামী গান ছাড়াও– চল্ চল্ চল্, দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু প্রভৃতি গানও পাকিস্তান আন্দোলন-যুগে গীত হয়েছে। তাঁর বিদ্রোহী, মানুষ, নারী, কুলি-মজুর, ফরিয়াদ, অগ্রপথিক, আমার কৈফিয়ৎ প্রভৃতি কবিতা মুসলিম জাতীয়তাবাদীর কাছে মোটেই অবাঞ্ছিত ছিল না।

নজরুলের কবিতায় গানে যে-স্বাধীনতা-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-মানবতার সুর উচ্চারিত হয়েছে তা জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে প্রভাবিত করেছে। তিরিশ- চল্লিশ-দশকের রাজনৈতিক চেতনায়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, সাহিত্যিক প্রয়াসে নজরুলের বিদ্রোহ ও সাম্যের প্রভাব সক্রিয় ছিল।

'কল্লোল' (১৩৩০) 'কালি কলম' (১৩৩৩) 'শিখা' (১৩৩৩) 'প্রগতি' (১৩৩৪) প্রভৃতি নতুন-যুগের বার্তাবাহী পত্র-পত্রিকার পশ্চাতে নজরুলের অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনুভবে এ স্বীকৃতি আছে। তিনি বলেছেন, "নজরুলের সাহচর্য ছাড়া সেদিন মুক্ত-যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায়নি।"[১৬]

জাতীয় সঙ্গীত জাতীয় কবিতার ভিত্তি, জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য, জাতির শৌর্য-বীর্য। বাংলা জাতীয় সঙ্গীত স্বদেশী গান বলতে বুঝায় স্বদেশভূমির বন্দনা গান–স্বদেশের প্রতি ভক্তি নিবেদন –দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশস্তি। নজরুলের জাতীয় সঙ্গীতে এইরূপ ভাবের প্রকাশ কম। তাঁর জাতীয় সঙ্গীত মানে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙক্ষা–অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান। তাঁর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও স্বদেশ স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়–বরং তা নিখিল মানবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যুব-শক্তির প্রশস্তি নজরুলের জাতীয় সঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১। স্বদেশ আমার! জানিনা তোমায় শুধিব মা কবে ঋণ,
২। স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী,
৩। জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা
৪। এ কি অপরূপ রূপে বা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী

প্রভৃতি গানে স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশের প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে পল্লী-জননীর প্রশস্তি গানটি সর্বোৎকৃষ্ট।

১৯৪০ এর দিকে তিনি বাঙালী জাতির কথা বলতে শুরু করেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১৩৪৯ এর ৩রা বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন,

> বাঙালীর মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি (ব্রেন-সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি, পৃথিবীতে কোন জাতির নেই।[১৭]...

> বাঙালী শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজো বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত।[১৮]
>
> বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনীশক্তি, আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।[১৯]

বাঙালী -চরিত্রের একটি দোষের কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি তিনি,

> আজ আমাদের (আলস্যের) কর্মবিমুখতার, পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন।[২০]
>
> আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বেশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশী লুটে নিয়ে যায়, আমরা তো তার প্রতিবাদ করি না, উলটো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।[২১]

এই একই সময় 'ঈদের চাঁদ' কবিতায় নজরুল লিখেছেন,

> মৃত্যু মোদের অগ্রনায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
> ফিরদৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ।
> আমাদের ঘিরে চলে বাঙলার সেনারা নৌ-জোয়ান
> জানি না, তাহারা হিন্দু কি খ্রীশ্চান কি মুসলমান।[২২]

১৯৪২ সালে নজরুল স্মৃতিহারা ও বাকশক্তিহীন হয়ে গেলেন।

হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ শেষ পর্যন্ত বিরাট গৃহ-যুদ্ধে পরিণত হলো। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দাঙ্গা-দ্বন্দ্বের মধ্যে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করলো বিভক্ত ভারতের দুটি সরকারের কাছে।

পূর্ববঙ্গ—যা আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত, সেটা পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হলো। কবি নজরুল হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করার যে প্রয়াস করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে গেলো।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে নজরুলের ভূমিকার বিচার করতে হলে এই পটভূমিকা অপরিহার্য।

১৯৪৭ এর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-চেতনায় একটা পরিবর্তন দেখা গেল। বাংলা–ভাষার আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে এখানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ভাবধারা গড়ে উঠতে লাগলো। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের ছাত্ররা তরুণেরা। এঁদের সবার মধ্যেই নজরুল অনুরাগ বর্তমান ছিল। নজরুলের সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সংকল্প, সম-অধিকারের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করার আদর্শে যুব সমাজের আকর্ষণ সন্দেহাতীত।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল—তরুণেরা তারও বিরোধিতা করলো।

পাকিস্তান সরকারের সংকীর্ণ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আশ্রয় হয়ে উঠলেন নজরুল ইসলাম। যুব-আন্দোলন ছাত্র-আন্দোলনে নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও গানের প্রেরণা ও প্রভাব ছিল অনিবার্য। সেই প্রভাবের ফলে বিদ্রোহের পথে চললো বাংলাদেশের মানুষ। সেই বিদ্রোহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলো ১৯৭১ সালে। বিদ্রোহী বাঙালী জয়ী হলো।

নজরুল প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে পরাজয়ের বেদনার সঙ্গে বিজয়ের প্রত্যাশা নিয়ে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলেছিলেন,

> কাণ্ডারী তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
> বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর
> ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
> উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্বার।[২৩]

হাঁ বাঙালীর খুনে রঞ্জিত হয়ে স্বাধীনতা সূর্য উঠলো—বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

নজরুলই কারার লৌহ কপাট ভাঙ্গার সাহস জুগিয়েছেন বহু দিন ধরে। তারি প্রেরণায় ধূলায় তাজমহল গড়ার স্বপ্ন দেখেছে বাংলাদেশের মানুষ। নজরুলের কবিতা-গান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানের প্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছে।

বহু দিনের তিক্ত বিরোধ ভুলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে—তাতেও রয়েছে নজরুলের শিক্ষা। সেই যুদ্ধে—কে হিন্দু কে মুসলমান সে জিজ্ঞাসা করার কথা বাংলাদেশের মানুষ ভুলে গিয়েছিল।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলো—ঘোষিত হলো সব মানুষের সমান অধিকার।

বাংলাদেশ ভাগ হলেও নজরুল ইসলাম ভাগ হননি—প্রবীণ কবি অন্নদাশংকর রায়ের কবিতায় এ কথা আমরা শুনেছি।

নজরুলের জন্ম ভারতে। তিনি সেই দেশের নাগরিক। তবু তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর জন্য এই গৌরবের আসন নির্দিষ্ট হয়েই ছিল।

৬৪ বৎসর আগে এ দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক প্রয়াত আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেছিলেন,

> নজরুল ইসলাম বাংলার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙ্গালী জাতি। সুতরাং

এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশভঙ্গীরই ছাপ দিতে হইবে।[২৪]

এ ছাপ নজরুলের কাব্যে আছে আমরা জানি। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাই আমরা বিখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদারের লেখায়।

বঙ্কিম-সাহিত্যকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরোধী ব'লে রায় দিয়ে বলেছেন, বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টির একটি ফল এই—শতকরা ৫৪ জন বাঙালী—মুসলমান বাঙালী তাতে ক্ষুব্ধ। বঙ্কিম তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদের সর্বস্বীকৃত স্রষ্টা নন, যেমন স্রষ্টা নজরুল।[২৫]

উপসংহারে কবি নজরুলের বাংলাদেশ-বন্দনা উদ্ধৃত করে বক্তব্য শেষ করছি।

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ-অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে।
ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সেই পুরবাণী
জাগায় সুপ্ত-প্রাণ জাগায়—নব চেতনা দানি,
সেই সঞ্জীবনী-বাণী শক্তি তার ছড়ায়
পশ্চিম সুদূর অনন্তে।
উর্মিছন্দা শত-নদী স্রোত-ধারার নিত্য পবিত্র
সিনান-শুদ্ধ-পূরববঙ্গ
ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য
শক্তি-প্রবুদ্ধ পূরববঙ্গ।
আজি শুভ লগ্নে তারি বাণীর বলাকা
অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা
ঝঙ্কার হানি যায় তারি পুরবাণী
জীবন্ত হউক হিম-জর্জর ভারত
নবীন বসন্তে।

তথ্য নির্দেশ

১. নবীন চন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)
২. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনী কাব্য (১৮৫৮)
৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৯১৪)
৫. নজরুল ইসলাম—অগ্নিবীণা (১৯২২)
৬-৭. নজরুল ইসলাম—ধূমকেতুর পথ (১৯২২)
৮. নজরুল ইসলাম—ইব্রাহিম খাঁর কাছে লিখিত পত্র
৯.-১০. জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনার উত্তরে (১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৯)
১১. কৃষক-শ্রমিক স্বরাজ সম্প্রদায়ের কর্মসূচী (১৯২৬)

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-(নৈবেদ্য)
১৩. নজরুল ইসলাম-সর্বহারা (১৯২৬)
১৪-১৫. অভিভাষণ, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জয়ন্তী উপলক্ষে, কলকাতা (১৯৪১)
১৬. সঞ্জয় ভট্টাচার্য ঃ আধুনিক কবিতার ভূমিকা
১৭-২১. নজরুল ইসলাম-বাঙালীর বাংলা
২২. দৈনিক নবযুগ, ঈদসংখ্যা (১৯৪২)
২৩. নজরুল ইসলাম-সর্বহারা (১৯২৬)
২৪. আবুল কালাম শামসুদ্দীন-কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান, মাসিক সওগাত পৌষ (১৩৩৩)
২৫. গোপাল হালদার-বাংলা কাব্যে মানব-স্বীকৃতি

নজরুল-সাহিত্যে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি আলাওল তাঁর 'সতীময়না' কাব্যে লিখেছিলেন,

কদাচিৎ কবি নহে সামান্য মনুষ্য।

শাস্ত্রে কহে কবিগণ ঈশ্বরের শিষ্য ॥

আলাওল ঈশ্বরের শিষ্য বলে সম্মানিত করেছেন সেসব কবিকে, যাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিবেদন করেন। নজরুল ইসলাম এমনি এক কবি, যিনি মানুষের কবি, মানব-কল্যাণের কবি, মানবতার কবি।

নজরুল বাংলার কবি, বাংলাদেশের গণমানসের কবি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম যেমন জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক তেমনি তা জাতির চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা এবং সংগ্রামেরও প্রতিচ্ছবি।

'বাংলার কাব্য' গ্রন্থে হুমায়ুন কবির বাংলা কবিতা সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা বলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, পশ্চিম বাংলার প্রকৃতি 'মানুষকে ভাবুক করে' আর পূর্ব বাংলার প্রকৃতিতে চলে 'অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা'। আর 'পদ্মা-যমুনা-মেঘনার স্রোতোধারায়' তিনি দেখেছেন 'সৃষ্টি ও ধ্বংসের' লীলা-খেলা। আমরা দেখেছি, পূর্ব বাংলার প্রকৃতি, মাঠ-প্রান্তর, নদী-নালা, ফুল-ফল, নজরুল ইসলামের রোমান্টিক চেতনাকে সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত করেছে। এ দেশের কঠিন মাটির বুক চিরে সোনালী ফসল তুলে আনে যে কৃষক, পদ্মা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গে শক্ত হাতে হাল ধরে যে মাঝি— সে সব মানুষই নজরুল ইসলামকে দিয়েছে সংগ্রামী চেতনা।

নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিম বঙ্গে, বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর মরদেহ আজ পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের মাটিতে চির-শয়ান। যদিও কবি ছিলেন নির্বাক ও নিস্তব্ধ, তবুও তাঁর জীবনের শেষ ক'টি বছর কেটেছে এই বাংলাদেশের মাটিতে। নজরুল বাংলাদেশে প্রথম এসেছিলেন ১৯১৪ সালে পনেরো বৎসর বয়সে। কাজী রফিজউল্লাহ দারোগার প্রচেষ্টায় নজরুল আশ্রয় নেন কাজীর সিমলা গ্রামে। তারপর তিনি দরিরামপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৪ থেকে শুরু করে ১৯৪২ পর্যন্ত এই ২৮ বৎসর তাঁর কর্মমুখর কবি-জীবনে তিনি বাংলাদেশে দীর্ঘকাল কোথাও অবস্থান না

করলেও এই বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিরন্তর। কর্ম-ব্যপদেশে, কখনো নিছক ভ্রমণের জন্যে, কখনো বা কোন সভা-সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্যে, কবি বারম্বার এসেছেন এই বাংলাদেশে।

নজরুল ইসলাম ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি হন এবং সে বছরই ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় ৫ মাইল পথ পায়ে হেঁটে দরিরামপুর স্কুলে আসতেন। ময়মনসিংহে কবির অবস্থান স্বল্পকালীন হলেও প্রতিদিন 'পলাশ' শিমুলশোভিত পথের যে সবুজ সৌন্দর্য কিশোর নজরুলের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছিল, তা অবশ্যই ছিল দীর্ঘকালীন। দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬-এর দিকে ময়মনসিংহে এক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ-রক্ষায় অপারগ হয়ে তিনি লিখেছিলেন,

> এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালে অনেকগুলি দিন ইহারই বুকে কাটিয়া গিয়াছে। এখানে থাকিয়া আমি কিছু দিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজও আমার মনে সেই সব প্রিয়-স্মৃতি উজ্জল ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। বড় আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই শৈশবচেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহপ্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব। কিন্তু তাহা হইল না, –দূরদৃষ্ট আমার।

১৯২০ সালে নজরুল ইসলাম তাঁর বন্ধু মুজফ্ফর আহমদসহ বরিশালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বাড়ীতে বেড়াতে যান। ১৯২১ সালে তিনি আলী আকবর খানের সঙ্গে আকস্মিকভাবে কুমিল্লার দৌলতপুরে গিয়েছিলেন। সেখানেই ঘটে তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা— প্রণয় এবং প্রথম বিবাহ। নার্গিসের সঙ্গে আক্দের পর তিনি কুমিল্লা কান্দিরপাড়ে কিছুদিন থেকে কলকাতায় ফিরে যান। সে বছরেরই শেষদিকে তিনি আবার কুমিল্লা কান্দিরপাড়ে যান এবং সেখানে কিছুদিন বাস করেন। ১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের পর তিনি নিরুদ্দেশ হন এবং ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় গ্রেফ্তার হন। এক বৎসর কারাভোগের পর নজরুল কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সোজা কুমিল্লা চলে যান। ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

নজরুল ১৯২৬ সালের জুন মাসে প্রথম ঢাকায় আসেন। ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বর্ষের ৪র্থ অধিবেশনে যোগদান করেন। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র ১ম ও ২য় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি যথাক্রমে ১৯২৭ ও ১৯২৮এ আবার ঢাকায় আসেন। ১৯৪০ সালে ঢাকার বেতার-কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষেও তিনি সুস্থ অবস্থায় শেষবারের মত ঢাকায় আসেন। ১৯৭২ সালে অসুস্থ ও নির্বাক কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং এখানেই তিনি আমৃত্যু বাস করেন।

১৯২৬-এর জুলাই মাসের শেষদিকে নজরুল চাটগাঁয় বেড়াতে যান। সেখানে ১৯২৯ সালেও আবার তাঁর যাবার সুযোগ ঘটে। এ সময়ে তিনি সমুদ্রপথে সন্দ্বীপ ভ্রমণে যান।

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত কয়েকটি সভা-সম্মেলনেও যোগ দেন। যেমন–মাদারীপুর সম্মেলন (১৯২৬), সিলেটে সুর্মা ভ্যালী ছাত্র সম্মেলন (১৯২৮), বগুড়া আক্কেলপুরে ইয়ংমেন'স এ্যাসোসিয়েশন সভা (১৯২৯), রাজশাহী মুসলিম ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সভা (১৯২৯), সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন (১৯৩২), ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলন (১৯৩৬), যশোহর বনগাঁ সাহিত্য সম্মেলন (১৯৪১)। এ সব সভা-সমিতিতে যোগদান ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নজরুল সফর করেন, কোথাও কোথাও একাধিকবার। বাংলাদেশে সফরকালে ট্রেনে বা স্টীমারে এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে কবি অনেক কবিতা ও গান লেখেন, সেগুলো নজরুল সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। বিশেষ করে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় লেখা তাঁর কবিতা ও গানগুলি উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ।

কুমিল্লায় দৌলতপুরে কবি লেখেন–'পাপড়ি-খোলা', 'অবেলায়', 'হার-মানা-হার', 'অনাদৃত', 'বিদায় বেলায়', 'হারামণি;, 'বেদনা-অভিমান', 'মানস-বধূ', 'বিধুরা', ও 'পথিক-প্রিয়া'। কুমিল্লা কান্দিরপাড়ে বসে লেখা হয় 'বিজয়িনী', 'জাগরণী', 'শায়ক-বেঁধা পাখী', 'চির-চেনা' ও 'স্তব্ধ বাদল'। প্রথম অনুরাগ বা প্রণয়-কেন্দ্রিক হলেও কবিতাগুলি সুন্দর প্রেমের কবিতা হিসাবে সমাদৃত। তাঁর বহুল আলোচিত 'বিজয়িনী' কবিতাটি প্রমীলার উদ্দেশ্যে লেখা। 'জাগরণী' কবিতাটি ব্যতিক্রমধর্মী। ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমনের প্রতিবাদে যে হরতাল হয় সে হরতালে কবি যোগ দেন এবং জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন,

ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা দাও,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।

কুমিল্লার পথে ট্রেনে লেখা 'নীলপরী' কবিতাটি প্রকৃতিমূলক,

ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার
হলুদ রাঙা উত্তরী।
উত্তরী বায় গো–
ঐ আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায়
নীল সে পরীর দূর-তরী।...
তার বেতস-লতায় লুটায় তনু,
দিগ্বলয়ে ভুরুর ধনু,
সে পাকা ধানের হীরক, রেণু
নীল নলিনীর নীলিম-অনু
মেখেছে মুখ বুক ভরি।

কবিতাটি চিত্রধর্মী হলেও প্রকৃতির মধ্যে কবি প্রিয়ার অস্তিত্ব স্থাপন করেছেন।

কবি চট্টগ্রামে লিখেছিলেন সিন্ধু-হিন্দোল (৩ তরঙ্গ), অনামিকা, গোপনপ্রিয়া, বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি এবং 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের আরও কয়েকটি কবিতা। 'সিন্ধু-হিন্দোল' তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কবিতা, যেখানে কবির আত্মানুভূতি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। চির-বিরহী কবি ও সিন্ধু একই বেদনায় একাকার,

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' হাবিবুল্লাহ্ বাহারের চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে লেখা। এখানেও কবির প্রেম-চেতনা ও প্রকৃতি-চেতনা এক সূত্রে গাঁথা।

তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ীর আঁচলখানি
–তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি পরশের মত নিবিড় আদর ছাওয়া।

হাবিবুল্লাহ্ বাহারের বাড়ীতে 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' নজরুলের এই কবিতায় অমর হয়ে আছে। অন্যদিকে কবির হৃদয়েও এই বৃক্ষ সারির চিত্র দীর্ঘকাল পর্যন্ত অম্লান হয়ে ছিল। শামসুন নাহারকে কলকাতা থেকে এক পত্রে কবি তাই লিখেছিলেন,

আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলীর খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে 'গুবাক তরুর সারি'র নিশ্চয় দিতে পারবে। ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে, ওদের আঁখি পল্লবে হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশী করে শ্বাস ফেলে। মনের চক্ষে ওদের আমি দেখি আর কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। *তোমাদের পাড়ার ফাল্গুনী কোকিলারা হয়তো ভোরে তেমনি কোলাহল করে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এতদিনে হয়তো আমের শাখাগুলি মুকুলে মুকুলে নুয়ে পড়েছে, গন্ধে তোমাদের আঙিনা ভারাতুর হয়ে উঠেছে।*

হাবিবুল্লাহ্ বাহারও 'কাজি সাহেব' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন– 'চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আমাদের বাড়ীর সুপারিগাছগুলো আজও অমর হয়ে আছে নজরুলের সাহিত্যে'। শুধু চট্টগ্রামের নয়, বাংলাদেশের অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্যই নজরুলের সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। কর্ণফুলীকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,

তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী?

সমুদ্র-পথে চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ যাত্রার স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছেন তিনি 'শীতের সিন্ধু' কবিতায়। সন্দ্বীপকে ঘটনাস্থল করে রচিত হয়েছে গীতিনাট্য 'মধুমালা'।

'পদ্মা' নদী নিয়ে লেখা তাঁর বহুল পরিচিত গান–'পদ্মার ঢেউ রে/ মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা যারে'। পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙনকে লক্ষ্য করে তিনি লিখেছেন,

এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে,
এই ত নদীর খেলা (রে ভাই)
এই ত বিধির খেলা।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নৌকা 'সাম্পান' নিয়ে নজরুল গান লিখেছেন–'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়'। কুমিল্লার উচ্ছল পাহাড়ী নদী 'গোমতী' নিয়েও লেখা হয়েছে গান। 'সেতুবন্ধ' রূপক নাটক হলেও 'সাড়া-ব্রীজ'কে অবলম্বন করেই নাটকটি রচিত। লক্ষণীয় বিষয়, সাময়িকপত্রে এ-নাটক প্রথমে 'সাড়া-ব্রীজ' নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। বরিশালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবি-কে যে কি মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের একটি বর্ণনায়,

বরিশাল। বাঙলার ভিনিস!

আঁকাবাঁকা লাল রাস্তা! শহরটিকে জড়িয়ে ধরে আছে ভুজবন্ধের মত ক'রে।

রাস্তার দু–ধারে ঝাউগাচের সারি! তারির পাশে নদী। টলমল করছে—

বোম্বাই-শাড়ী পরা ভরা-যৌবন বধূর পথচলার মত। যত না চলে, অঙ্গ দোলে তার চেয়ে অনেক বেশী।

বাংলাদেশের ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য কবিকে উল্লসিত ও পুলকিত করেছিল। তার পরিচয় আমরা বিভিন্ন কবিতা ও গানে লক্ষ্য করি।

নিছক প্রকৃতি-বর্ণনায় কবির মন আবদ্ধ ছিল না। কবির সৌন্দর্যবিহারী মন বিচরণ করেছে রূপকল্পের আনন্দলোকে। কয়েকটি কবিতা বা গানের উল্লেখ করলেই কথাটি স্পষ্ট হবে।

ক) ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥
এই রোদ সোহাগী পউষপ্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ খেতে।
আজ কাশবনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে।

খ) হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত
কিরণ ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য-আলো-সরিৎ ॥

গ) ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়

নামলো কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া।

ঘ) হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে।
টইটম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক ঝলে
চন্দ্র ঘুমায় গগন তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে।

শুধু প্রকৃতি নয়, বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতিও কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্যে যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়–তাঁর রচিত অজস্র 'ভাটিয়ালী' ও 'ভাওয়াইয়া' গানে।

লোকজ পরিবেশ নিয়ে লেখা নজরুলের 'অগ্নিগিরি' গল্পটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 'দরিরামপুর'ই অগ্নিগিরি গল্পের হিসেবে হয়েছে 'বীররামপুর'। এ-গল্পে নজরুল ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার সুচারু প্রয়োগ করেছেন।

বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি কত বিচিত্র রূপে যে নজরুলের সাহিত্যে ধরা পড়েছে তার একটি পরিচয় আমরা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরলাম। সবশেষে, নজরুল 'পূরব-বঙ্গ' নামে যে কবিতায় পূর্ব বাংলার জাগরণীর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করবো–

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে
ব্রাহ্ম মুহূর্তে-সেই পুরবাণী
জাগায় সুপ্ত-প্রাণ জাগায়–নবচেতনা-দানি
সেই সঞ্জীবনী-বাণী শক্তি তার ছড়ায়
পশ্চিমে সুদূর অনন্তে॥
উর্মিছন্দা শত নদীস্রোতধারায় নিত্য পবিত্র—
সিনান-শুদ্ধ-পূরববঙ্গ
ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য
শক্তি প্রবুদ্ধ পূরববঙ্গ।
আজি শুভলগ্নে তারি বাণীর বলাকা,
অলস ব্যোমে মেলিল পাখা
ঝঙ্কার হানি যায় তারি পুরবাণী
জীবন্ত হউক হিম-জর্জর ভারত
নবীন বসন্তে।

নজরুল কাব্যে ঐতিহ্যের স্বরূপ

শাহাবুদ্দীন আহমদ

॥ ১ ॥

শ্রী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নজরুল-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে তাঁর 'প্রাণ-সুন্দর বিপ্লবী কবি নজরুল' প্রবন্ধে লিখেছেন,

> সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে সে ডুব দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানে আর রবীন্দ্রনাথের সুরের গভীরে; তেমন করে রবীন্দ্রনাথের আলোয় সমস্ত চেতনাকে রাঙিয়ে তুলতে আজকের যুগের তরুণদের দেখি না। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হলো, যখন সে কবিতা লিখলো, যখন নিজে গান রচনা করলো, সুর সৃষ্টি করলো, তখন তার কবিতার একটি অক্ষরের মধ্যে, তার প্রকাশের ক্ষীণতম ভঙ্গিমার মধ্যে, এমন কি তার ভাষার রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেলো না রবীন্দ্র-প্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ।

এর থেকে বোঝা গেলো যে, রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার সর্বগ্রাসী ক্ষমতার প্রভাব এড়িয়ে যখন বাংলা ভাষার কোন কবিই কবিতা লিখতে সমর্থ হননি, তখন নজরুল ইসলাম সেই প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র কাব্যরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। এই স্বতন্ত্র, অন্যের দ্বারা অপ্রভাবিত কাব্য, তিনি কি করে সৃষ্টি করলেন? এর জবাবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

> মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষণ চেষ্টার বাইরে, যে রহস্যময় শক্তি দৈবধনের মত শুধু দু' একটি চিহ্নিত ভাগ্যবানকে দেয় তার নিগূঢ় রহস্য মন্ত্রের দুর্লভ দীক্ষা, নজরুল এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে সেই রহস্যময় দুর্লভ শক্তির প্রসাদ, যার কৃপায় সে হয়ে ওঠে অনন্যসাধারণ, স্বতন্ত্র, একক।

নজরুলকে যাঁরা গভীরভাবে পড়েছেন তাঁরা উপর্যুক্ত উক্তিকে কি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারবেন? নজরুল যতই অনন্যসাধারণ বা ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা হোন বাংলা সাহিত্যের বা পৃথিবীর অন্য সাহিত্যের কোন প্রভাব কি তাঁর কাব্যে পড়েনি? তাদের রূপের ক্ষেত্র আদলই কি তাঁর কাব্যমুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না? সব সময় সৃষ্টিধর্মী, আবিষ্কারধর্মী এবং অতি নতুনের প্রতি অনুগত এই কবি প্রতিভা হুইটম্যানের অনুরণনে যে 'অগ্রপথিক' কবিতা লেখেন তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত'। নব সৃষ্টির উল্লাসে মেতে এই কথা লিখলেও অতীতের সম্বন্ধসূত্রকে কি তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? এই কথার জবাব দিতে গেলেই নজরুল

কাব্যে ঐতিহ্য ও তার স্বরূপের প্রশ্ন উঠবে এবং দেখা যাবে যে, নজরুল কাব্যের শিকড় ঐতিহ্যগ্রথিত, ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন নয়। কোন শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য কখনও ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হয় না—হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোন সাহিত্য নেই যার পিতৃপুরুষ নেই, যা সম্পূর্ণ একক বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ জন্যই টি. এস. এলিয়ট তাঁর Tradition and the Individual Talent প্রবন্ধে বলেছেন, No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets.

এবং টি, এস, এলিয়টের Selected Prose-এর সম্পাদক জন হেওয়ার্ড ঐ প্রবন্ধটির একটি টীকায় বলেছেন, In poetry there is no such thing as complete originality owing nothing to the past.

কোন কাব্যই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারে না এবং অতীতের কাছে তার ঋণ থাকেই এবং কোন কবিকে প্রশংসা করার অর্থ তার মৃত পূর্বসূরীর প্রশংসা করা। উল্লেখযোগ্য কবির আবেগ নিজস্ব হতে পারে। তাঁর সৃষ্টি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু যে আঙ্গিকের মাধ্যমে তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন কিংবা যে চিন্তাদর্শের মধ্যে এমনকি উপলব্ধির মধ্যে তিনি বিকশিত হচ্ছেন তাঁর পূর্বপুরুষের সৃষ্টির সঙ্গে তার কোন না কোনভাবে সম্বন্ধ রয়ে গেছে। নজরুল ইসলাম এর ব্যতিক্রম নন এবং তাঁর মধ্যে শুধু তাঁর নিজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন দত্তই শুধু নন এবং তাঁর ভাষায় মধ্যযুগের পুঁথি রচয়িতা, কীর্তন রচয়িতা ও শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতাই নন, অন্য ভাষার– আরবী, ফারসী, ইংরেজী, উর্দু ভাষার কবিরাও তাঁর কাব্যের অন্তঃশরীরে মিশে আছে।

নজরুলের কবিতায় ঐতিহ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ঐতিহ্য কি এবং নজরুল তাঁর কাব্যে শুধুমাত্র প্রাচীন বা নিকটতম অতীতের কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন না সাহিত্যাতিরিক্ত অন্য বিষয়ও তাঁর কাব্যশরীর ও প্রাণকে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করেছে। ঐতিহ্য মানব-সভ্যতার বা কর্মকাণ্ডের বা মানব ইতিহাসের ইতিহাস-পুরষদের কর্মকাণ্ডের প্রবহমান ধারা। যে ধারা কেবল অতীত অন্তর্লীন হয়ে যায় না, যা বর্ধনশীল ইতিহাসের দীপ্তিমান গৌরব। এটা যখন সার্বিক মানব ইতিহাসের কর্মকাণ্ড হয় তখন নয়, যখন কোন জাতীয় ইতিহাসের কর্মকাণ্ড হয় তখনই হয় ঐতিহ্য। এই জাতীয় ইতিহাসের আছে জাতির জীবনাদর্শ বা জীবন-দর্শন। এবং যেহেতু জাতীয় জীবন ধর্মের অনুশাসন বা আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই ধর্মাদর্শও এই ঐতিহ্যের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। নজরুল-কাব্যে তাই যেমন অতীতের সাহিত্যের ভূমিকা আছে তেমনি আছে অতীত ইতিহাস ও ধর্মের ভূমিকা। নজরুল ইসলামের আলোচনায় তাই তাঁর জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর জাতীয় ধর্মের আলোচনা এসে পড়ে। কে না জানে নজরুল ইসলামের এই জাতীয় ইতিহাস ও ধর্ম তাঁর কাব্যের গভীর প্রাণশক্তি। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি

নজরুল লিখেছেন–'আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত'। এখন উল্লেখ করছি তিনি লিখেছিলেন,

কবে সে খেয়ালী বাদশাহী
সেই সে অতীতে আজও চাহি
যাস মুসাফির গান গাহি
ফেলিস অশ্রুজল।

কিংবা

কবে আমাদের কোন্ সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ।

এবং একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন,

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্ ॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

উদ্ধৃতাংশ সমূহ দেখলে মনে হয় তিনি অতীতকে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন এবং নতুন সৃষ্টির জন্যে তিনি যৌবনশক্তিকে শুধু সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা দিচ্ছেন। কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখব, তিনি মানুষের অতীত কর্মকীর্তিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা তো করছেনই না, বরং অতীত থেকে মানুষকে প্রেরণা গ্রহণ করার উৎসাহ যোগাচ্ছেন। তিনি অতীতসর্বস্ব জীবন চাননি–যে জীবন অতীতের মোহে অতীতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অলস ও নিশ্চল হয়ে যায়; তিনি চেয়েছিলেন অতীতের মধ্যে যে নিহিত জীবনী ও প্রাণশক্তি আছে তার বিদ্যুতে শক্তিমান হয়ে সঞ্চালিত হতে, বর্ধিষ্ণু হতে, সমুজ্জ্বল হতে। সে জন্যই 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটির শেষ স্তবকটিতে তিনি বললেন,

যাক রে তখ্‌ত্ তাউস
জাগ্ রে জাগ বেহুঁশ!
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুশ
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ হীনবল!
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল!!

এই যে তিনি তাজমহলের উদাহরণ দিলেন, এতেই বোঝা গেল অতীতের সমুজ্জ্বল কীর্তির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান। অতীতের কীর্তিশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে যে নতুন জীবন ও প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর একটি গানে তা প্রাণময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখানে সেই গানটির উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে আর একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো। 'ভোরের সানাই' শীর্ষক এই গানটিতে নজরুল বলছেন,

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই নিঁদ-মহলার আঁধার পুরে।
শুন্‌ছি আজান গগন-তলে অতীত রাতের মিনার-চুড়ে ॥

সরাইখানার যাত্রীরা কি 'বন্ধু জাগো' উঠ্‌লো হাঁকি?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখী গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে' ॥

আজ কি আবার কা'বার পথে ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে।
নাম্‌ল কি ফের হাজার স্রোতে 'হেরার জ্যোতি জগৎ জুড়ে' ॥

আবার খালেদ তারেক মুসা আন্‌ল কি খুন-রঙিন ভুষা,
আসল ছুটে হাসিন্‌ উষা নও-বেলালের শিরীন সুরে ॥

তীর্থ-পথিক দেশ-বিদেশের আরফাতে আজ জুট্‌ল কি ফের.
'লা-শারীক আল্লাহু' মন্ত্রের নাম্‌ল কি বান পাহাড় 'তুরে'।

আঁজলা ভরে আন্‌ল কি প্রাণ কারবালাতে বীর শহীদান,
আজকে রওশান জমীন-আস্‌মান নওজোয়ানীর সুরখ্‌-নূরে ॥

উদ্ধৃত এই রূপধর্মী গীতি-কবিতায় নজরুলের চিন্তাদর্শ বা চিন্তা-দর্শনটি পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অতীতের উপমা দিয়ে বর্তমানের জাগরণকে প্রমাণ করেছেন বা বর্তমানের জাগরণকে অতীতের উপমায় চিহ্নিত করেছেন। তিনি অতীত রূপকালঙ্কারে বর্তমানকে ভূষিত করে সমুজ্জ্বল করেছেন। যৌবন-দীপ্ত এই নতুন জীবন কীর্তি-দীপ্ত অতীত জীবনের যে প্রবহমান ধারা বা অতীত শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত শক্তি সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। প্রচ্ছন্নভাবে এখানে একটি মহান ধর্মীয় আদর্শের বোধকেও সঞ্চারিত করা হয়েছে– যে ধর্মবোধ জীবনকে স্থবির করে না, সঞ্চালিত করে, উজ্জ্বল জীবনে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। এইখানে এসে নজরুলের কবিতার রেনেসাঁসের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নজরুল ইসলাম যে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন বা পৃথিবীর যে সময়টিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পৃথিবীতে একদিকে যেমন নিপীড়ন ছিল তেমনি অন্যদিকে ছিল দর্শন, বিজ্ঞানের দুর্নিবার জয়। তখন নিপীড়ন ছিল কিন্তু সে নিপীড়নের রূপ ভিন্ন, নিপড়ীনের স্থূল রূপ ঝরে গিয়ে শুরু হয়েছিল সূক্ষ্মরূপ, শাসন ও শোষণের রূপেরও বদল ঘটেছিল। রেনেসাঁস, ফরাসী বিপ্লব, রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে মানবসমাজের উত্তরণ গোটা

পৃথিবীর চেহারা বদলে দিচ্ছিল। সর্ববন্ধনমুক্ত আলোকিত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ উর্ধ্বচারী ভোরের পাখীর মত কলরোলমুখর হয়ে উঠছিল। এই নতুন যুগের করস্পর্শ উপমহাদেশকেও স্পন্দিত করছিল। সে স্পন্দন নজরুলের চিন্তাকেও উৎফুল্ল করে তোলে। নজরুল শুধু উপমহাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন না, তিনি স্বপ্ন দেখেন সকল মানুষের স্বাধীনতার, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতার। ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে তিনি দেশের সকল মানুষকে তাঁর এই স্বপ্নের সঙ্গী করতে চান। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করতে চান এই মন্ত্র দিয়ে যে, মানুষ সব কিছুর উপরে। মানুষের শক্তি সীমাহীন এবং মানুষ আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলে পৃথিবীর কোন শক্তিই মানুষকে শোষণ, সংস্কার, নিগ্রহ, জড়তা, মূর্খতা, অলসতা ও অমানবতার কারাগারে বন্দী রাখতে পারবে না। এই মুক্তচিন্তায়, মানবতার ও মানবিকতার মুক্তিচিন্তায় অতীতের ও সমমনের যে-সব মনীষীর মানবমুক্তিদর্শন ইন্ধন জুগিয়েছে তার সব কিছুকে ব্যবহার করে নজরুল নতুন জীবন্ত মানুষ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। মানবসৃষ্ট এই সব দর্শনের ব্যবহারে তিনি ছিলেন পক্ষপাতহীন। এই জন্যে দেখা যায় আধুনিক মানস প্রাচীনতার গন্ধমাখা সে দর্শনকে পরিত্যাগ করতে প্রয়াসী নজরুল তাকে নিষ্কুণ্ঠভাবে আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রুশো-ভল্টেয়ার-মার্কস-এঞ্জেলসের জীবন-দর্শনকে তিনি জানতেন কিন্তু তিনি এও জানতেন সে দর্শন আর একটি দর্শনের আলোককিরণ পান করেই মানবমুক্তির দর্শনকে আবিষ্কার করেছে। পার্থক্য পোশাকের মাত্র, পার্থক্য শরীরের নয়। সে জন্যে তিনি এই নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করতে দ্বিধা করেননি,

> আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বোঝা যায় যে সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।

নজরুল নবযুগের বাঁশী বাজিয়েছেন গণতন্ত্রধর্মী সমাজতান্ত্রিক রূপের, স্বাধীন সমাজ তৈরীর স্বপ্ন দেখেছেন, সে সমাজ তৈরী করতে হলে তা বির্বতনবাদের নিয়মে নয় বিপ্লববাদের নিয়মে যে তা করতে হবে তাও বলেছেন; কিন্তু এসব বলতে গিয়ে তিনি ঐতিহ্যের শিকড়কাটা বিপ্লবী সাজতে পারেননি। তিনি ইসলামী দর্শনত বটেই, তিনি গীতা এমনকি শাক্তদর্শন পর্যন্ত তাঁর কাব্যগাথায় গেঁথে দিয়েছেন।

রেনেসাঁসের মুক্তিমন্ত্রের স্রষ্টা বলেই তিনি শ্যাম ও শ্যামার গান লিখতে দ্বিধা করেননি। এটা ধর্মবোধ থেকে নয় কাব্যবোধ থেকে যে লেখা হয়েছিল, প্রতীকার্থে যে এর ব্যবহার হয়েছিল সে কথা তিনি বলেছেন আবদুল কাদিরের বক্তব্যের জবাবে। সমালোচক আবদুল কাদির লিখেছিলেন,

> নজরুল ইসলাম বাঙলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুঙ্কারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neo-paganism-এর সাহায্য গ্রহণেও অগ্রণী।

জবাবে নজরুল বলেছিলেন ওটা neo-paganism বা নব্য প্যাসানবাদ নয়, ওটা pseudo paganism বা নকল বা ছদ্ম বা মিথ্যা বা প্যাগান বা প্রতীকবাদ।

বলাবাহুল্য নজরুল ইসলামের এই মুক্ত চিন্তায় যেমন ধর্ম-প্রবক্তা এবং রাজনৈতিক ও দার্শনিক মনীষীদের চিন্তাদর্শ শোষিত হয়েছে তেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি-বৃন্দ হাফেজ-রুমী-খৈয়াম, শেলী-বায়রন-হুইটম্যান প্রমুখও শোষিত হয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথ।

॥ ২ ॥

নজরুল ইসলামকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। এই বিদ্রোহাত্মক চারিত্র তিনি কি ঐতিহ্য থেকে অর্জন করেছিলেন? আমরা যদি মনে করি তাঁর কবিতায় একটি বিপুল অংশ ইসলামী ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট তাহলে প্রশ্ন হবে ইসলাম কি বিদ্রোহের ধর্ম? শাব্দিক অর্থে ইসলাম শান্তি ও আত্মসমর্পণের ধর্ম। কিন্তু সামাজিক অর্থে ইসলাম বৈপ্লবিক ধর্ম। আরব বিশ্বে তো বটেই সমগ্র বিশ্বের চিন্তাধারায় রাষ্ট্র ও সামাজিক বিধানের নীতিমালার পরিকল্পনায় পর্যন্ত ইসলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই পরিবর্তনের পিছনে একটি বিশাল বিদ্রোহ কাজ করেছিল। অবশ্যই এ বিদ্রোহ ছিল শুভ অর্থের। সাম্যবাদ, শ্রেণী ও বর্ণবৈষম্যবিরোধী কুসংস্কার বর্জিত বিশ্বাসী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কল্যাণকর এক সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল এই বিদ্রোহের কারণ। সার্বিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই আদর্শ যে নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেনি তা কে বলবে! নজরুল যখন বলেন,

> মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
> আমি সেই দিব হব শান্ত
> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
> অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।

তখন মনে না হয়ে পারে না রসুল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের মত এক উৎপীড়নহীন সমাজ সৃষ্টির জন্যে নজরুল বিদ্রোহীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর বিদ্রোহ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, উৎপীড়ক, অন্যায়কারী, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মানবতাবাদী সমাজ সৃষ্টির বিদ্রোহ।

নজরুল ইসলাম বিশ্বাসী; বিশ্বাসী মুসলিম! "আমার লীগ আমার কংগ্রেস" প্রবন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—"আল্লাহ্ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত, আল-কোরআন আমার পথপ্রদর্শক।" সুতরাং তাঁর বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়—কিন্তু দেখা যায় তিনি তথাকথিত মোল্লা-মৌলবী এবং পীরদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ।

তিনি যে উদার, সংস্কারমুক্ত, গণতন্ত্রধর্মী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সমাজ সৃষ্টির পথে তাঁর ভাষায় অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মোল্লা-মৌলবীদের কুসংস্কার সর্বস্ব

গোঁড়ামী বাধা। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ও সংস্কৃতির যে নবজাগরণধর্মী নতুন মুসলিম সমাজের তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি তার বাধা বলে মনে করেছিলেন শিল্প-সঙ্গীত-সংস্কৃতিবিমুখ মোল্লা সমাজকে। তাঁর কতিপয় কবিতায় এঁদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আঘাত আছে। তিনি লিখছেন,

যুবা যুবতীর যে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ়া পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর,
যেতে নারে সেই হুর-পরীর
শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয়
আয় বেহেশতে কে যাবি আয়।

পূর্ণ জীবনময় প্রাণধর্মী মুক্তবুদ্ধির গোঁড়ামীমুক্ত সমাজ সৃষ্টিতে 'জ্ঞান-মজুর' 'শাস্ত্র পণ্ডিত' 'বুঢ়া পীরে'রা বাধা বলে নজরুলের এই বিদ্রূপবাণী। রসোজ্জল জীবনের পথে বাধা হয়ে এরা সমাজের অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে নজরুল এদের বিরুদ্ধে রূঢ়-জিহ্বা হয়ে উঠেছিলেন।

বলাবাহুল্য এইসব পংক্তি রচনাতেও তিনি সাহিত্য-ঐতিহ্যরিক্ত নন। ফারসী সাহিত্যের তিনজন কবি হাফিজ, রুমী ও খৈয়াম যে নজরুলের বিদ্রোহী কবি-সত্তা সৃষ্টিতে পরোক্ষ রসদ জুগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ইবরাহীম খাঁর কাছে লেখা চিঠিতে নজরুল লিখছেন—"আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফিজ রুমীকে শ্রদ্ধা করেন এ-ও আমার মনে হয় না। আমি তো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদের।" আমরা দেখেছি নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনে হাফিজ, রুমী ও খৈয়ামকে শুধু শ্রদ্ধা জানাননি তাঁদের কবিতার ও কাব্যের অনুবাদ করেছেন। বিশেষ করে হাফিজ ও খৈয়ামের। এই দুই মহাকবির কাব্যধর্ম থেকে তিনি যে মুক্তবুদ্ধি মানুষ হওয়ার ও মানবতার দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই বিদ্রোহী সত্তার সারাৎসার তাঁর কবিতার এক অভিনব তেজস্বিতার জন্ম দিয়েছিল। তাঁর নির্ভীক প্রতিবাদী অভিযোগকারী সাহসী কণ্ঠের মর্মস্থলে ঐ ত্রয়ী কবির কাব্যসুর যে প্রেরণা জুগিয়েছে কাব্যরসিকের চোখে তা আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না।

একটা প্রশ্ন হতে পারে যে নজরুল তাঁর কাব্য চিন্তাদর্শে কেবল ইসলামকে মান্য করেছেন কি-না অথবা যেহেতু তিনি সাম্যবাদী কবিতা লিখেছেন বা গীতা ও শাক্তবাদী -দর্শন অনুসারী কবিতা ও গান লিখেছেন তাতে তিনি ইসলামী আদর্শ বিরুদ্ধ চিন্তার শিকার হয়েছেন কি-না! বাস্তবতা এই যে নজরুল ইসলাম যেমন ইসলামী আদর্শ-সমন্বিত কবিতা ও গান লিখেছেন তেমনি গীতা ও শাক্তদর্শনভিত্তিক গান ও কবিতা লিখেছেন। এসব তিনি কেন লিখেছেন তা দীর্ঘ ও বিশদ পর্যালোচনার বিষয়। তবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পরিশ্রমী নজরুল পাঠক ও সমালোচক সমগ্র নজরুল ইসলামকে খুঁটিয়ে

দেখলে দেখতে পাবেন নজরুল পৃথিবীতে শান্তি ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন! বিপুল ইতিহাস পাঠে নজরুল দেখেছেন যে পৃথিবীতে পশুশক্তি যখন অন্যায় ও অত্যাচারের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে তখন তা প্রেমের অমেয় বাণীতে প্রতিহত হয়নি। শক্তিবলে তাকে উৎখাত করতে হয়েছে। সত্য ও দ্বাপর যুগে হোক কিংবা ত্রেতা ও আধুনিক যুগে হোক, মহাভারত বা রামায়ণের যুগে হোক, অথবা এই অতি আধুনিক যুগে হোক যুদ্ধ করেই দেবতাদের দানবদের ধ্বংস করতে হয়েছে। ইসলামেও যে জেহাদ আছে সে-ও এই মানব সমাজকে অনাচার, অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করার দর্শন। এই যে অত্যাচার থেকে, নিপীড়ন ও জুলুম থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নজরুল যে-দর্শনের মধ্যেই তার উপাদান পেয়েছেন তাকেই তিনি তাঁর কাব্যে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

যুদ্ধ করতে গেলে মানুষের প্রয়োজন হয় কিসের? সাহসের, শক্তির, জ্ঞানের, পৌরুষের, ভালোবাসার, প্রেমের। প্রয়োজন হয় অন্ধকারের প্রতি ঘৃণার এবং আলোর প্রতি ভালোবাসার। যে-দর্শন ও যে ধর্মীয় আদর্শ এই শিক্ষার প্রতি আনুকুল্য দেখিয়েছে নজরুলের কবিস্বভাব তাকেই বরেণ্য দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। মানব সমাজের এই মানবিক ঐতিহ্য তাই শেষ পর্যন্ত নজরুলের কাব্য ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নজরুল-কাব্যের অন্তর্প্রকৃতির ঐতিহ্যের এটা ব্যাখ্যা, কিন্তু নজরুলের কাব্যের বহির্প্রকৃতির ঐতিহ্যের একটা ব্যাখ্যা আছে যেটা নজরুল লুকাতে চাইলেও লুকোতে পারেননি এবং যে জন্যে নজরুল প্রকৃতি ও চারিত্র্যে হিন্দু বাঙালী বা আধুনিক বাঙালী কবিদের থেকে পৃথক। এ পার্থক্য তাঁর অন্তর্প্রকৃতিতেও আছে, কিন্তু বেশী করে আছে তাঁর বহির্প্রকৃতিতে। "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ" নামে তাঁর একটি বিখ্যাত প্রতিবাদী প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে করি, বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীর একটি মুসলমানী ঢং আছে।" নজরুল ইসলাম কবিতা লিখতে শুরু করলে তাঁর কাব্যে এই ঢংটি সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। আধুনিক বাঙালী শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে যখন ইউরোপীয় ঢং বিকশিত হয়ে উঠছিল, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ থেকে মোহিতলাল এবং তার পরে ত্রিশের আধুনিক কবি পর্যন্ত, তখন আমরা ইউরোপীয় কবিদের চেয়ে বেশী করে নজরুল ইসলামে পেলাম আরবী ও ফারসী কবিদের, পেলাম হাফিজ ,রুমী, খৈয়ামকে এবং তাঁদের কাব্য মেজাজ ও আমেজকে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ মারফত ইউরোপীয় আদল যে নজরুলে একেবারে এলোনা তা নয়, কিন্তু সিংহভাগই এলো পারসী কবিদের থেকে। এই কারণেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নজরুলের ভাষায়, অক্ষরে ও সুরে রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে খুঁজে পাননি। এবং সে জন্যেই তিনি আবেগমণ্ডিত উচ্চারণে বললেন–"নজরুল-প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হলো, যখন সে কবিতা লিখলো, যখন সে নিজে গান রচনা করলো, সুর সৃষ্টি করলো তখন তার একটি অক্ষরের মধ্যে, তার প্রকাশের ক্ষীণতম ভঙ্গির মধ্যে,

এমনকি তাঁর ভাষার রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেলনা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ।"

ঐতিহ্য পরিচয়ের ভিন্নতার জন্যেই নজরুল ভিন্ন প্রতিভা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। এটা বুদ্ধদেব বসুরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি বলেছিলেন,

> কবিতার যে আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নজরুলও তাই, কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমির ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, ভিন্ন একটা ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মেছিলেন।

বলাবাহুল্য, নজরুল ইসলামের মানবিক চৈতন্য এই ঐতিহ্যেরই অবদান। এটি তাঁর কাব্য-কুসুমে বিচিত্র রূপে ও বর্ণে বিভাসিত এবং সৌরভে ও সৌগন্ধে স্ফুরিত।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল

মোহাম্মদ মীজানুর রহমান

রক্ষণশীলতা একরকম স্রোতবিহীন নিস্তরঙ্গ নিথর প্রান্তের জলাবদ্ধ দ্বীপ। সেখানে সঙ্কীর্ণতা নামের শেওলা জন্মানোই সম্ভব। প্রগতির গান সেখানে গীত হয় না কখনো। সমুদ্রের ছোঁয়া না পেলে যেমন নদীর প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে না, তেমনি দুর্বার জলধারা ছাড়া জলাবদ্ধতার দুঃখময়তা নিবারণ অসম্ভব।

দুনিয়াজুড়ে সম্প্রদায়বদ্ধ অসংখ্য সমাজ নিয়ে মানবগোষ্ঠী। নানা ধারণায় নানা বিশ্বাসে অন্তরীণাবদ্ধ মানুষ। জ্ঞানের আলো ছাড়া অজ্ঞতার অন্ধকার যেমন দূর করা সম্ভব নয় তেমনি দুর্বল মানুষের সঙ্কীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যে চাই উদার মানসিকতার অবাধ বাক্-স্বাধিকার। কেবলমাত্র এ কারণেই সাহিত্যের মূল্য অপরিমেয়। প্রতিটি শব্দ যেখানে মানুষের মনকে অনুভূতির একাত্মতায় আলোড়িত করে আদি হতে অন্তহীনতায় সেখানে প্রসারমান সাহিত্যই হচ্ছে মানবিক ও চিরায়ত।

বাংলা সাহিত্যের রক্ষণশীলতার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত ও ধর্মবিষয়ক দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে নানাভাবে সমাজ জীবনকে আন্দোলিত করেছে, দংশিত করেছ, ক্ষত-বিক্ষত ও নিগৃহীত করেছে। এবং এর জের হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় মানুষে মানুষে কম হানাহানি কম রক্তারক্তি হয়নি। এর অন্যতম কারণ ধর্মভেদসহ আর্থ সামাজিক অসামঞ্জস্যতাও বটে। ইসলাম ধর্মের মানবিক ও উদারনৈতিক ভাবধারার সংগে, সংস্কারবদ্ধ অমানবিক—জাত বিচার বিদ্বিষ্ট শ্রেণীকৌলিন্যে বিশ্লিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ লোকের লক্ষণীয় সংঘাত নানাভাবে বাংলা সাহিত্যকে এ সময় সংক্রমিত করে তোলে। ইংরেজদের দুর্দ্দমনীয় শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা-লাভের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়কে শাসকের পর্যায় থেকে যখন শাসিতের পর্যায়ে পদানত হতে হল ঠিক সেই সময়ে অদূর অতীতের মুসলিম শাসিত অন্য একটি সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রসাদপুষ্ট হয়েছিল ধর্মের দিক থেকে না হলেও, আর্থ-সামাজিক পুষ্টির দিক থেকে। সে সম্প্রদায় ছিল এক শ্রেণীর তথাকথিত কুলীন হিন্দু। পিস্ট পদদলিত সম্প্রদায় হিসেবে বিজিত মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজদের যতটা আক্রোশ পড়েছিল তারচেয়ে অধিকতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আক্রোশে নানাভাবে বিদ্বিষ্ট ও নির্যাতিত হয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়।

বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রখ্যাত ও শক্তিমান লেখকের রচনায়ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় দীপ্যমান। বঙ্কিম চন্দ্রের সুবিখ্যাত 'আনন্দ মঠ' এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'আনন্দ মঠে' সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার এবং ইংরেজদের তুষ্ট করার পিছনে একদিকে যেমন তৎকালীন আমলাচরিত্র বিশিষ্ট (ম্যাজিস্ট্রেট) বঙ্কিমের ব্যক্তিগত স্বার্থস্পৃহা কাজ করছিল, অন্যদিকে তেমন চরিতার্থ হয়েছিল তাঁর চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাব। এ ধরনের সাহিত্য বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন করেছিল তা বলাই বাহুল্য। মানবিক মিলন-সম্মিলন এবং জীবন-চর্চা সকল সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে। প্রতিটি সম্প্রদায়, যত সকীর্ণ অর্থেই ভাবা যাক না কেন, তার সংস্কার, আচার-আচরণ, সামাজিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ধর্ম ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এমন কি যত উদারই হোক না কেন মানুষ জন্মগতভাবেই যেন ধর্মচেতনা বোধের বাইরে থাকতে অভ্যস্ত নয়। যদি কেউ থাকে তা হবে বাহ্যিক, আন্তরিক নয়। অতএব সে সাম্প্রদায়িক। কেবলমাত্র বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধই মানুষকে মানুষের আত্মিক ধর্মে প্রাণিত করে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সে মানুষের মধ্যে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

এ সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর এক অভিভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদিস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে।"

কিন্তু সাহিত্যের শেষ কথা এটাও হতে পারে না। সমাজ জীবনে সংস্কৃতির রূপান্তর বিবর্তনবাদের অন্তর্গত। হিন্দু-মুসলমান বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে দেখা যায় যে, সাংস্কৃতিক ভাবধারায় একে অন্যের ঐতিহ্যের ধারক। সামগ্রিক না হলেও প্রতিফলন লক্ষণীয়। ফলে একে অন্যের হৃদয়ে আত্মীয়ের মতোনই আশ্রয় লাভ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। সাহিত্যাঙ্গনে হিন্দু-মুসলিম চরিত্র তাই কোথাও কোথাও একাকার হয়ে গেছে। জ্ঞানের বিস্তৃতির সংগে সংগে তার আলো অন্ধকার-হৃদয়গুলোকে আলোকিত করছে বৈকি। সঙ্কীর্ণতা ক্রমান্বয়েই হটে যাচ্ছে প্রগতির ধাবমান আলোকচক্রের বিকীরিত বিভায়।

খণ্ডিত হলেও ইংরেজ আমল থেকে যে জাতিক চেতনা তৎকালীন ভারতীয়দের মনকে বিদেশী শাসন থেকে যুথবদ্ধ মুক্তি-সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার অনুপ্রেরণা বাংলা সাহিত্যে বলিষ্ঠভাবে এনে দিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আর তা ছিল সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধটি ছিল নজরুলের অন্যতম অন্তরতম। যার জন্য তিনি কবিতায়, প্রবন্ধে, গল্পে ও উপন্যাসে

এবং রাজনৈতিক বক্তৃতা-ভাষ্যে শুধু সম্প্রদায় নয়, মানুষের জয়গানে থেকেছেন অধিকতর সোচ্চার। প্রসংগত নজরুলের 'কুহেলিকা' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে,

> প্রমথ ঃ সত্যিই কি আমাদের আন্দোলন থেকে (ইংরেজ-খেদা আন্দোলন) মুসলমানদের বাদ দেবো?...অনিমেষ বলিয়া উঠিল, প্রমথ দা জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান ভেবে দেখিনি। তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসেবে। সে হিসেবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যেই একটা মনান্তর না বাঁধে। আমরা বিপ্লববাদী কিন্তু গোঁড়ামীকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি.. ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।

এখানে নজরুল মনুষ্যত্ববোধের অভিধায় ছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে। তিনি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, তদানীন্তন হিন্দু বাঙালী এনার্কিস্টরা মুসলমান বাঙালীদের হয় বিশ্বাস করতো না, নয় ধর্মবিদ্বেষবশতঃ মুসলমানদের ঘৃণাভরে এড়িয়ে চলতেন। এর পেছনে এঁদের যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল তা চরিতার্থ করতে সাম্রাজ্যবাদী উৎখাতের পরিকল্পনাই ছিল মুখ্য। সে ক্ষেত্রে ইংরেজদের মতো ভারতীয় মুসলমানদেরও বিদেশী জ্ঞান করার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া তখন ছিল সক্রিয়। মনে হয় সেখানে বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠ' এর 'বন্দে মাতরম'ই ছিল প্রেরণা। কিন্তু নজরুল তাকে গ্রাহ্যে না এনেই গাইলেন ভিন্নতর আবেদনময়ী সাম্য গীতি,

> গাহি সাম্যের গান–
> ... ...
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।

মানুষ, মানুষে ধর্মগত ভেদবুদ্ধি ও দুস্তর ব্যবধান ঘুচানোর ভেতর মানুষকে বড় করে দেখানোই ছিল নজরুলের ধর্ম। আর সেটাই ইসলাম ধর্ম! যে ধর্ম মানুষের জন্য সৃষ্ট, মানুষের কল্যাণে সৃষ্ট, মানুষ সেই ধর্মকে গ্রহণ করুক অর্থাৎ মানব-প্রেমই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠুক—আর সেখানেই নজরুলের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উপস্থিত,

> গাহি সাম্যের গান—
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!
> নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ্, অভেদ্ ধর্ম জাতি
> সব দেশে, সবকালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি–

এই "তিনি" প্রতীকী,

> সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
> আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি। [ঈশ্বর]

অর্থাৎ খোদ্ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নজরুলের গভীর বিশ্বাস। নজরুল প্রত্যক্ষ করেন প্রতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভাস। অজ্ঞতাকে পরাজিত করে নজরুল জ্ঞানে

জয়ী হয়েছিলেন। তাই তাঁর মাঝে প্রতিফলিত হয়েছিল কোরানের অমর বাণী, 'রাব্বি জেদ্‌নি এল্‌মা'– হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও,— অন্ততঃ আমি যেন কোন সুন্দরকে ঘৃণা না করে ফেলি, অন্ততঃ মানুষের প্রতি আমার যেন কোন বিদ্বেষ না জন্মায়।

নজরুলের কবিতায় রয়েছে একটা বিপুল বীরত্বব্যঞ্জক আবেগের আলোড়ন সৃষ্টিকারী শক্তিমত্তা। প্রচলিত সংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত মানসিকতার বিরুদ্ধে রয়েছে সেখানে তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ যা তিনি তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যক্ত করেছেন,

> কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
> কন্‌ফুসিয়াস্‌? চার্বাক্‌-চেলা? বলে' যাও, বল আরো!
> বন্ধু, যা-খুশী হও,
> পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশী পুঁথি ও কেতাব বও,
> কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
> জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে' যাও যত সখ,—
> কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
> দোকানে কেন এ দর কষাকষি?—পথে ফোটে তাজা ফুল!
> তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
> সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে' দেখ নিজ প্রাণ!' [সাম্যবাদী]
> ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া
> দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া। [ঈশ্বর]

নজরুল ছিলেন সাত্ত্বিক। তাঁর এই আত্মিক দর্শন মানুষের ভেতর থেকে ভেদবুদ্ধি বিনাশ করতে সক্ষম, মানুষ যদি তাঁর আত্মদর্শনকে সম্যক উপলব্ধি করে। নজরুল জাত্‌-ধর্মের মিথ্যে মোড়ক খসিয়ে মানুষকে জ্ঞান করার শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। আর সেই কারণেই কুরান বা পুরাণ থেকে শব্দ চয়ন করতে তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। 'বিদ্রোহী' কবিতাকে সমৃদ্ধ করতে যথার্থ শব্দ প্রয়োগ করার সময় কখনো মনে স্থান দেননি যে এ শব্দটি হিন্দু ধর্মের অথবা এটি মুসলমান বা অন্য কোন ধর্মের। শব্দের ব্যঞ্জনায় যে অমৃতের সন্ধান তিনি দিয়েছেন তা স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়গ্রাহী ও অবিনশ্বর। শব্দগুলির দ্যোতনা, ওজন ও স্টাইল মনকে স্পর্শ করে—এমন কি ভেঙ্গে ভেঙ্গে যদি পৃথকভাবে এমন করে রাখা যায় যেমন– ধূর্জটি, ইন্দ্রানী, ব্রহ্মা, পিনাকপাণি, ত্রিশূল, চক্র, মহাশঙ্খ, ক্ষ্যাপা দুর্বাশা, বিশ্বামিত্র, বেদুইন, চেঙ্গিস, বোররাক, বসুধা, আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল, বাসুকি, জিব্রাইল, অর্ফিয়াস, হাবিয়া, বিষ্ণু, চণ্ডি, রণদা, পরশুরাম, বলরাম ও ভৃগু। নানা ধর্মাবলম্বীর প্রতীকধর্মী শব্দাবলীকে একই সূত্রে গ্রথিত করে 'বিদ্রোহী'র ব্যঞ্জনায় নজরুল যে অনবদ্য ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন তা শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়—এত বড় সমন্বিত, অন্বিত ও ইতিহাস অনুষঙ্গে বিধৃত কবিতা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই দুর্লভ বলে প্রতীয়মান হয়। নজরুলের অদম্য এই শক্তি

তাঁর স্বদেশের মানুষের অজ্ঞতাপ্রসূত সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিদ্বিষ্ট অপশক্তির বিরুদ্ধেই অধিকতর সোচ্চার হয়েছে। সাহিত্যে শব্দের এমন চমৎকার ব্যবহার নজরুলের পূর্বে আর কোন বাঙালী কবির মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

হিন্দু না ওরা মুসলিম ?' ওই জিজ্ঞাসা কোন্ জন?

কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র। [কাণ্ডারী হুঁশিয়ার]

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নজরুল যে সব ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছেন তাও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করেছে বলে মানতে হবে। নজরুলের এই অভাবনীয় কাব্যধারণ ক্ষমতা এবং তৎকালীন সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল মন্দভাবের মধ্যে তার প্রকাশ নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। এর একটা সবচে' বড় দিক হচ্ছে তা হল কবি যে সত্যের প্রকাশে নির্ভীক ও অদম্য তার প্রমাণ এতে মিলেছে। তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একদিকে ছিল গান্ধীবাদে সিক্ত অহিংস স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার, অন্যদিকে সক্রিয় ছিল বৃটিশের শ্বেত-সন্ত্রাসের মুখোমুখি স্বদেশী এ্যানার্কিস্টদের সহিংস নাশকতামূলক তৎপরতা এবং আত্মবলিদানে উন্মুখ টগবগে রক্তের এক ঝাঁক সুদীপ্ত ভারতীয় তরুণ। স্বাধীনতার লড়াইয়ে মানুষের তরল রক্তের এমন স্রাব অহরহ তখন পায়ে চলা পথে এক রাঙা অরুণের উন্মেষের লক্ষ্যে স্বদেশীদের উদ্বেলিত করে তুলছিল। সামাজিক পরিবেশে সম্প্রদায়গত জাতবিরোধসহ স্ববিরোধী বৈরিতা বৃটিশরাজের পুলিশী জুলুমের ভয়, আতঙ্ক এবং স্বদেশী-দালালদের লজ্জাকর লেজুড়বৃত্তির বহিঃপ্রকাশে সমূহ-উপদ্রব একত্রে নজরুলের কবিতায় শ্লেষের আকারে প্রকাশ পায়,

চর্মকার আর মেথর-চাঁড়াল ধর্মঘটের কর্মগুরু।
পুলিশ শুধু করছে পরখ কার কতটা চর্ম পুরু।
চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত বাড়ী!
বোঁট্‌কা-গন্ধী ভোজপুরী কয় বাঙালীকে 'মৎছুইয়ে।'
দে গরুর গা ধুইয়ে...
...মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন রান্না করে কার না বাড়ী,
গা ছুঁলে তার লোম ফেলে না, ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি।
...ভয়ে মিঞা ছাড়ল টুপি, আঁটল কষে গোপাল-কাছা,
হিন্দু সাজে গান্ধী-ক্যাপে, লুঙ্গী পরে ফুঙ্গী চাচা।
দেখলে পুলিশ গুতোয় ষাঁড়ে,
পুরুষ লুকোয় বাঁশের ঝাড়ে।
খ্যাঁদা বাদুড় রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর কান খুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে...

এমন কি এর সংশ্লেষে নজরুলের বড় সংশয় ছিল বৃটিশদের দেশছাড়া করে যে স্বরাজ আসছে তা হবে,

সস্তাদরে দস্তামোড়া আসছে স্বরাজ বস্তাপচা

কিন্তু তবু কবির সংশয় ঘোচেনা,
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ী,
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়,
কাঁদে ছেলে মেয়ে।
মাতা কয়, 'ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে,
দেখ চেয়ে'।

এবং ক্রমাগত আত্মবলিদানেও যখন হতাশা সমাজকে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধছে তখন নজরুলের মনে তার ভাবান্তর ও প্রতিক্রিয়া,

আমরা ত জানি স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস।
এলো কোটি টাকা, এলো না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ। [আমার কৈফিয়ৎ]

এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও তদানীন্তন বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতব্যাপী চরম সম্প্রদায়গত বিরোধের মুখে সাধারণ গণমানুষের ভিতর এখানে ওখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই ছিল। মানবতাবাদী নজরুল এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মধ্যেও খুঁজেছিলেন 'পথের দিশা',

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েসির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি আর পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?...
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরী-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্টমেলায়
বাঙলাদেশও মাত্‌ল কি রে ?...
ব্যাগ্র-পরাণ অগ্রপথিক, কোন্ বাণী তোর শুনতে সাধ ?
মন্ত্র কি তোর শুনতে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ ?...
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব ঘোড় সওয়ারী
আসছে কেহ? টুট্‌ল তিমির, খুললো দুয়ার পূব-দুয়ারী ?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে।

(এটাই সম্ভবতঃ বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নজরুলের সঠিক জবাব ছিল বঙ্কিমের 'আনন্দ-মঠ' এর জন্যে।)

বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধূলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড় ?

জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম–ধ্বজা টিকির গিঁটে, দাড়ির ঝোপে!'

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্পের মরণঘাতি কুয়াশায় তবু নজরুল নিজেকে জলাঞ্জলি দেননি। সত্যের দিশারী এই কবির গানের মধ্যেও মনুষ্যত্বের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আর সে গানে ইসলামের সার ও শাশ্বত ধারণা ব্যক্ত হতে দেখি আমরা। সেখানে মানুষের জাতি কি হবে তার ধারণা ব্যক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি নজরুল,

...সাম্য-মৈত্রী আনিয়া মোরাই বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি ॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা ॥
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি ধারা,
উচ্চ-নীচের ভেদ-ভাঙি, দিল সবারে বক্ষ পাতি ॥
...
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম,
সত্যে যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তারি নাম।
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর-সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতের বোরকা উতারি এনেছি আশার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি

মানুষের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মুক্তি দিশারী ইসলামের প্রবক্তা মহানবীকে সামনে রেখে নজরুল তাঁর মরমী কণ্ঠে আবারো গাইলেন,

...ক্ষমা কর হজরত
মোরা ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ ॥
......
প্রভু আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাতো পরমত ॥
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী ॥
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত্‌ হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥

মিশরের জগলুল পাশার তিরোধানে 'চিরঞ্জীব জগলুল'-এ নজরুল লিখেছেন,

মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান!

এখানে ধর্মের নাম বা আবরণ বা অনুষ্ঠান নয়। ধর্মের মূল শক্তি হচ্ছে মনুষ্যত্ব। মানুষের প্রতি মানুষের স্বজনভাব পোষণই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবর্জিত মানবতা।

নজরুল ও সম্পাদক

মোবাশ্বের আলী

এক

লেখকের সাথে সম্পাদকের বা সম্পাদকগোষ্ঠীর অথবা সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পর্ক বিচিত্র, অভিনব, এমন কি বৈপরীত্যে ভরপুর। কোন কোন লেখক সম্পাদকের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে থাকেন, আশীর্বাদপুষ্টও হন; আবার কোন কোন লেখকের প্রতি সম্পাদকের কলম কৃপণ এবং রসনা ক্ষুরধার হয়ে ওঠে।

কখনও কখনও একই লেখক এক সম্পাদকের বরাভয় লাভ করেন, অথচ অন্য সম্পাদকের রোষদৃষ্টি তাঁর প্রতি আপতিত হয়। কীট্‌স দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। সকল নিরিখে কীট্‌স ইংরেজি সাহিত্যে ত বটেই, বিশ্বসাহিত্যে, একজন শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেতে পারেন। একজন প্রতিষ্ঠিত ও প্রথম শ্রেণীর সমালোচক মিডলটন মারী যাঁকে সেক্সপীয়ারের চাইতে উঁচুতে স্থান দিয়েছেন।

অথচ তাঁর Endyminion যখন প্রথম প্রকাশিত হল সে-সময় তাঁর ওপর নেমে আসে সম্পাদকের রোষদৃষ্টি, উদ্যত হয় খড়গ-কৃপাণ। 'কোয়ার্টারলি রিভিউ'র সম্পাদক গিফোর্ড তাঁর সর্বনাশ করে ছাড়েন। তাঁর যে প্রত্যাশা, কাব্যটি প্রকাশিত হলে তাঁর আত্মনির্ভরশীল হবার আশা, খ্যাতিলাভের বাসনা এবং দয়িতাকে লাভের স্বপ্ন সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

প্রায় সমসাময়িক কবি বায়রন উল্লেখ করেছেন,

> Who kill'd John keats?
> "I" says the Quarterly
> So savage and tartly
> "It was one of my feats."

অর্থাৎ কোয়ার্টারলি কীটসকে হত্যা করেছে অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে। 'কোয়ার্টারলি রিভিউ'র সম্পাদক গিফোর্ড তাঁকে অনিবার্য মৃত্যুর পথে ধাবিত করেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ঘটে এই মহতী প্রতিভার অকাল মৃত্যু।

অথচ বিপরীতভাবে দেখা যায়, ইংরেজি সাহিত্যে এজরা পাউণ্ড নবাগত এলিয়ট এবং জেমস জয়েসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সংবাদটা এখন আর কারো অজানা নয়, যে-কাব্য লিখে এলিয়ট নোবেল পুরস্কার পেলেন সেই Waste Land পাউণ্ড

সম্পাদিত। পাউণ্ড সম্পাদনা করতে গিয়ে মূল কাব্যের অর্ধেকটা কেটে দেন— এক রকম কাঁচি কাটাই বলতে হয়। ফলে কাব্যটি নোবেল পুরস্কারের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

আবার এই পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথকে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজে পরিচিত করেন সেই ১৯১২ সালে—একটি মার্কিনী পত্রিকার লণ্ডন প্রতিনিধি হয়ে। আর সেই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির দ্বারটি প্রশস্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে পর পাউণ্ডের মনোভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। আসলে পরশ্রীকাতরতা একটি মানবীয় গুণ। এবং পাউণ্ড এর উর্ধ্বে হবেন, এমন কোন কথা নয়। পরবর্তীকালে পাউণ্ডের বিপরীত আচরণে রবীন্দ্রনাথের অবাক হবার কোন কারণ নেই। কেননা দেশের মাটিতেই তাঁর ঘটেছে একাধিকবার বিরূপ অভিজ্ঞতা— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ সম্পাদকের কাছে। তিনি ব্যথিত বিমর্ষ হয়েছেন।

রুশ সাহিত্যে দেখা যায়, 'নভো মীর' পত্রিকা বরিস পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসটি ছাপতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ঔপন্যাসিককে ভীষণ বেকাদায় ফেলে। দেশের বাইরে ইতালিতে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাচার করা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর থাকে না। ফলে তিনি পড়েন কর্তৃপক্ষের রোষানলে এবং দেশদ্রোহী বলে আখ্যাত হলেন।

সুতরাং সম্পাদকের মহিমা অপরিসীম! সৃষ্টিশীলতা ও ধ্বংসসাধন-উভয় ক্ষেত্রেই-তাঁর কর্মপটুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

দুই

বাংলা সাহিত্যে উনিশ ও বিশ শতকের মাঝামাঝি যে-সকল যুগন্ধর সাহিত্য সম্পাদক এসেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, সজনীকান্ত দাশ, দীনেশ রঞ্জন দাশ ও গোকুল চন্দ্র নাগ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রমুখ।

অক্ষয় কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য', রামানন্দের 'প্রবাসী', প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র', সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি', দীনেশ রঞ্জন ও গোকুল নাগের 'কল্লোল', বুদ্ধদেবের 'কবিতা', নাসিরউদ্দীনের 'সওগাত' বাংলা সাহিত্যের দিগনির্দেশক বলা চলে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃষ্ঠপোষিত ও অক্ষয় কুমার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' ধর্মভিত্তিক

হলেও বাংলা গদ্য সৃজনে এর উদ্যোগ গৌরবময়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা দ্যোতনায় বঙ্কিমের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা কে না জানে!

প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' বাংলা গদ্যে নতুন একটি রীতি—চলিত রীতি—সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর এ ত জানা কথা যে, 'সবুজপত্র' মন ও মেজাজে, রচনাশৈলী ও আঙ্গিকে সমকালীন লেখকদের, এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্যায়ের গল্পগুলোর চারিত্র্য যে সবুজপত্রীয়, এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য।

দীনেশ রঞ্জন ও গোকুল নাগের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কল্লোল' নতুন একটি যুগের সৃষ্টি করে এবং বাংলা সাহিত্যে তা 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই রবীন্দ্রবলয় হতে মুক্ত হয়ে যে-সকল সাহিত্যিক আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের কারো কারো জীবনে 'কল্লোলের অবদান অনেকখানি।[১]

বাংলা সাহিত্যের জলো আবহাওয়ার মধ্যে মননশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে সুধীন দত্তের 'পরিচয়' বিশেষ সহায়তা করেছে। বাংলা গদ্যের দৃঢ়তা তাঁর বিশেষ অবদান, এ-কথা বলতেই হয়।

বুদ্ধ দেবের 'কবিতা' বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি স্বাস্থ্যকর পত্রিকা। ইংরেজের আমলে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের পদচারণা বিলম্বিত লয়ের। বিশের দশকে বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারে এবং সাহিত্যিক সৃষ্টিতে মোহম্মদ নাসিরউদ্দীনের 'সওগাতে'র অবদান ঐতিহাসিক মর্যাদাবহ। এই সময় 'সওগাত' কলকাতা থেকে বাঙালী মুসলমানের তমসাচ্ছন্ন জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছে।

'সওগাতে'র সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', ' মোসলেম ভারত'। নজরুল-প্রতিভা বিকাশে এই সব পত্রিকার ভূমিকা অসাধারণ।

তিন

'সওগাতে'র পৃষ্ঠাতেই নজরুলের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। তবে তাঁর আবির্ভাব কবিরূপে নয়, গদ্যকাররূপে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অখ্যাত লেখকের লেখা ছাপান সম্পাদক। সে-সময় লেখক সুদূর করাচীতে—শুধু লেখার গুণে লেখাটি ছাপিয়ে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন একটি মূল্যবান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তেমনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' নজরুলের প্রথম কবিতা ছেপে তাঁর কবি শক্তিকে স্ফুরিত করতে সহায়তা করেছেন। আর যুদ্ধ-ফেরতা সৈনিক-কবি এসে আস্তানা গাড়েন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' অফিসে। এখানে মুজফ্‌ফর আহমদের সাথে তাঁর সখ্যতা তাঁর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব একজন বিদ্রোহীরূপে। তিনি প্রচলিত প্রথা ভেঙে দিয়ে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বিশের দশকে তাঁর মধ্যে এই যে বিদ্রোহী সত্তা এযে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ প্রভাব-সঞ্জাত নয়, কে বলতে পারে?

মুজফ্‌ফর আহমদ বা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের স্নেহস্পর্শ তিনি যেমন পেয়েছেন তেমনি মৌলবাদীদের শিকার হয়েছেন। মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ'র 'মোহাম্মদীতে' তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। তাঁকে কাফের, আজাজীল ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়। প্রত্যুত্তরে তিনিও মৌলানাকে 'আক্রমণ খাঁ' বলে অভিহিত করেন।

একদিকে তিনি যেমন হলেন মৌলবাদীদের নিন্দার শিকার, অপরদিকে তেমনি হলেন কট্টরপন্থী 'শনিবারের চিঠির' বিদ্রূপের পাত্র। তিনিও সজনীকান্তকে তামাশা করে ডাকেন সজনে ঘণ্ট খান।[২]

চার

বিশের দশকে দেখা যায়, মুজফ্‌ফর আহমদ আর মোহম্মদ নাসিরউদ্দীনের স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর সৃষ্টি বিচিত্রধারায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। কিন্তু তিরিশের দশকে এসে তিনি ক্রমাগত সংগীতের জগতে অন্তর্লীন হয়ে গেলেন–অন্যান্য রচনায় তাঁর দেখা দেয় অনীহা।

অবশ্য বাংলা কাব্যের উন্মেষ-পর্ব থেকে, সেই চর্যাপদের কাল থেকে কবিরা মূলত গীতিকার। চর্যাপদ চর্যাগীতি বলেই সমধিক পরিচিত। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রধানত গীতিকার। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতা রচিত হত আবৃত্তির জন্য নয় গাইবার জন্য।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল। বিহারীলাল থেকে গীতিকবিতা আবৃত্তির জন্য রচিত হলেও এর মধ্যে গীতিসুরটি সুস্পষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথ নজরুলেও তা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল উভয়ে অজস্র ধারায় সংগীত রচনা করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সাথে সাথে সাহিত্যের অপরাপর শাখার প্রতি সমমাত্রায় দৃষ্টিপাত করেছেন। সংগীতের জগতে তিনি একান্তভাবে বিভোর হয়ে থাকেন নি। সংগীত সৃষ্টির সাথে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি তিনি রচনা করে গেছেন।

তিনি তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ কতভাবে না তাঁর প্রতিভাকে বিচ্ছুরিত করেছেন।

অথচ এই বয়সে নজরুল–বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা হয়েও– মূলত গান রচনা করেছেন।

এ কি কোন সম্পাদক শক্ত হাতে হাল ধরেননি বলে? 'সওগাত' এ থাকতে তাঁকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয় 'মৃত্যুক্ষুধা' ধারাবাহিকভাবে, লেখেন গল্প কবিতা। 'সওগাতের' পর আর কোন গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়নি কেন?

'সওগাতে' তাঁর অবস্থানের শেষ পর্যায়ে বিজ্ঞাপিত হয় যে, নতুন একটি উপন্যাস তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখবেন–'মায়ামৃগ' শিরোনামে।[৩] 'সওগাতে'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল বলেই কি তা আর লেখা হয়নি ?

সম্পাদক ও সম্পাদনা তাঁকে–তাঁর জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরেও–কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এ একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং উপভোগ্য আলোচনা।

১. *দ্রষ্টব্য–কল্লোলযুগ, অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত*

২. নজরুল সজনীকান্তের না হলেও তাঁর দোসর মোহিতলালের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হন।+ এ সূত্রে নীরদ চৌধুরী উল্লেখ্য,

But with all his dislikes for certain aspects of Nazrul's Poetry, Mohit Babu admired his virtuesity as a versifier and often recited his poems in our house, and put as much gusto into the reading as he did in his own poems.

–Thy Hand, Great Anarch; Nirad C. Chaudhuri.

পরবর্তীকালে, আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'মোহাম্মদী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পর, তাতে নজরুলের অনেক বিখ্যাত গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের আত্মজীবনী 'অতীত দিনের স্মৃতি' দ্রষ্টব্য।

৩. দ্রষ্টব্য— বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।

মোহিতলাল মজুমদারই বিশের দশকে নজরুল-প্রতিভার ও তাঁর কবিতায় মৌলিকতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম নন্দনতাত্ত্বিক. বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে তাঁকে বাংলার সারস্বত সমাজে স্বাগত জানান।

নজরুল-কাব্যের দুই ধারা

বশীর আল্‌হেলাল

নজরুলের কাব্য-জীবনকে কালগতভাবে গোটা চার-পাঁচ স্তরে ভাগ করা যায়। আবার তাঁর কাব্যের বেশ কয়েকটি ধারা রয়েছে। যেমন একটি প্রধান ধারা তাঁর রোমান্টিক প্রেমের কবিতা ও গান। যদি কেউ বলেন এটাই তাঁর সর্বপ্রধান ধারা তাতে তর্ক করার বিশেষ কিছুই নেই। কাজী নজরুল ইসলাম চির-রোমান্টিক কবি। তাঁর প্রেমের কবিতা হৃদয়-নিংড়ানো আনন্দ-বেদনা, অপরিমেয় ভাবোচ্ছ্বাস আর স্বপ্নালু কল্পনায় ভরপুর। অবশ্য উপযুক্ত বাণীর বৈভব তাঁর প্রেমের কবিতার ষোলকলা পূর্ণ করেছে। প্রেমের কবিতার এই রূপ ও অরূপের ঐতিহ্য বাংলা কবিতাতেই ছিল। কিন্তু ফারসির ক্লাসিক ও খণ্ড প্রেম-কাব্যের পূর্বাপর পরিচয় যাঁর কিছুমাত্র জানা আছে তিনি বুঝবেন তাঁর প্রেমের কবিতার এবং অন্য কোনো কোনো ধারার কবিতার রোমান্টিকতা সেখান থেকেও এসেছিল এবং এই দুয়ের পরস্পরগ্রাসী মাখামাখি হয়েছিল। নজরুলের কবিতায় ফারসির (এবং উর্দুর) প্রভাব বলতে সচরাচর মনে করা হয় তাঁর আরবি-ফারসি শব্দব্যবহারের নিছক রূপতাত্ত্বিক দিকটিকে। কিন্তু ফারসির কাব্যসুধা তিনি বেশ পান করেছিলেন বলেই মনে হয়, এবং তাঁর কাব্যের প্রাণের মধ্যেই তার প্রভাবও পড়েছিল নিবিড়। নজরুল-কাব্যের এই দিকটি একটি ভালো অনুসন্ধানের বিষয়। যাই হোক, নজরুল-কাব্যের প্রেমের রোমান্টিকতা তাঁর অন্যান্য ধারার কবিতা এবং গানেও যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়েছিল, আপাতত এই কথাটাই আসল প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে বলে রাখতে চাই।

নজরুল-কাব্যের অন্য যে দু'টি প্রধান ধারাকে নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে দু-এক কথা বলতে বসেছি সে-দু'টি তাঁর কাব্যের খুবই পরিচিত ধারা। বাংলাদেশে আজ এ-দুটিকে নিয়েই যা-কিছু আলোচনা, দাবি, পাল্টা দাবি, দ্বন্দ্ব-তর্ক, মান-অভিমান। তার একটি তাঁর জাগরণ উদ্দীপন বিদ্রোহ গণচেতনার ধারা, অন্যটি তাঁর ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ধারা। ১৯২০ সালের দিকে নজরুল প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আর কাব্যশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েই বাংলা কাব্যের জগৎকে মাতিয়ে তোলেন। দু-তিন বছরের মধ্যেই তিনি প্রলয়োল্লাসের কবি, বিদ্রোহী কবি-রূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। ওই বছরই তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'যুগবাণী' প্রকাশিত হলে রাজদ্রোহের অভিযোগে তা বেআইনি ঘোষিত হয়। ওই বছরই নজরুল সম্পাদিত

'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ওতে প্রকাশিত কবিতার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর জেল হয় ১৯২৩ সালে। জেলে অনশন করে তিনি বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী-স্বদেশী ও স্বাধীনতা-পিয়াসী জাগরণ পরে আরো সংগঠিত ও সংহত রূপ লাভ করে। কবিতায় সর্বহারার গান গান, নিপীড়িত মানবের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্‌গাতা হয়ে ওঠেন তিনি। জাতীয়তাবাদী এবং গণদরদী প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গেও তিনি কিছু কিছু জড়িয়ে পড়েন। তাই প্রধান পরিচয় তাঁর যেটা দাঁড়িয়ে যায় সে পরিচয় বিদ্রোহের, তারুণ্যের জাগরণের, জীবনোল্লাসের, সাম্যের, গণমুক্তির, প্রতিস্পন্দের। নজরুল-কাব্যের অনেকগুলো ধারার মধ্যে স্বভাবতই এই ধারাটাকেই তাঁর প্রধানতম ও স্থায়ী ধারা বলে বিচেনা করা হয়।

কিন্তু এই বিবেচনা অনেকে সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, নজরুলের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নয়, বরং ইসলামি ধারাই প্রধান ও স্থায়ী ধারা। বরং তাঁরা দাবি করেন, বাংলায় তথাকথিত মুসলিম রেনেসাঁর প্রথম সার্থক উদ্‌গাতা নজরুল। আজকের বাংলাদেশে ইসলামি উজ্জীবনের নতুন জোয়ারে এ-দাবি তো খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন হলো এ দুই দাবির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি ন্যায্য? এই নিয়ে চলেছে তর্কাতর্কি, মন-কষাকষি। একদল নজরুলের হাতে লাল ঝাণ্ডা ধরিয়ে দিতে চান, অন্য দল তাঁকে মোল্লা বানাতে চান।

সমস্যা হচ্ছে আমরা বড় আবেগে ভাসি। আমাদের নিরপেক্ষ বিশ্বদৃষ্টি, ইতিহাসের বোধ নেই, সাহিত্যের বোধ তো নেইই। গোষ্ঠী-স্বার্থ বড় প্রবল। উভয় পক্ষেরই একজন বড় কবির দরকার। তাই তাঁকে নিয়ে টানাটানি। বাংলাদেশে এসে মৃত্যু হওয়াতে নজরুলের আরো সর্বনাশ হয়ে গেছে। অবশ্য আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না চুরুলিয়ায় চিরদুঃখের মর্মসাথী প্রমীলার পাশে কবর হলে তাঁর অন্য সর্বনাশ হতো কিনা। সমগ্রটাকে সমগ্র করে দেখতে হবে, এই হচ্ছে মূল্যবিচারের ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক দাবি। না হলে নজরুলের আর প্রমীলার লাশ-দুটিকেই কেবল ভাগ করে নেয়া হবে। যাঁরা ভাগ করবেন তাঁদেরও শেষ পর্যন্ত বিশেষ লাভ হবে না। অন্নদাশঙ্কর রায় যে বড় মুখ করে ছড়া কাটলেন, সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে কেবল ভাগ হয়নি নজরুল, কই, তা সত্য রইল কই।

ওই দুই ধারার কবিতা, জাগরণের আর ইসলামি ভাবধারার কবিতা, নজরুল মোটামুটি একসঙ্গে রচনা করতে শুরু করেছিলেন, এবং এই উভয় ধারা তাঁর সারা কাব্য-জীবন জুড়েই কম-বেশি পাশাপাশি চলে। তাই এর কোনোটাকেই অস্বীকার করা চলে না। এর কোন্‌টার প্রাধান্য বেশি হয়তো তাই নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে। নজরুল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ধারার কাব্য বলতে কেবল যে ইসলামি কবিতা আর গান লিখেছিলেন তা নয়, তিনি হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতিমূলক প্রচুর গান লিখেছিলেন, কেবল তাই নয়, এইসব গানে তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। 'রাঙা জবা', 'দেবীস্তুতি',

'হরপ্রিয়া', 'দশমহাবিদ্যা' এইসব সঙ্কলনে নাটিকায় এগুলি সংগৃহীত রয়েছে। বলা হয়, আধুনিক কালীসাধনার গান অর্থাৎ শ্যামা-সঙ্গীত নজরুলের মতো হিন্দু কবিরাও লিখতে পারেন নি। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে যেমন, হিন্দু পুরাণে তেমনি নজরুলের ভালো জ্ঞান ছিল। কবিতায়ও তিনি উপমা রূপক-রূপে হিন্দু দেবদেবীর প্রচুর ব্যবহার করেছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন সম্ভবত শিব, তারপর ব্রজের রাখাল, এটা লক্ষণীয়। অর্থাৎ বিদ্রোহের তাণ্ডবের পর হৃদয়ের কারবার, প্রেম-বিরহের লীলা।

আমি নজরুলের কাব্যে তাঁর ইসলামি আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মচেতনার স্থানটাকে মোটেই খাটো করতে চাইছি না। নজরুল-কাব্যের এটি একটি অতি বৃহৎ দিক। আল্লাহতালার উপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। রসুলুল্লাহ তাঁর আদর্শ পুরুষ। ইসলামের মর্মবাণী তিনি প্রগাঢ়রূপে অনুধাবন করেছিলেন। বিশ্বাস করতেন, ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই মুসলমানের আজকের অধঃপতন। ইসলামের করুণা, ইনসাফ ও বিশ্বমানবতার আদর্শকে তিনি আন্তরিকভাবে উচ্চে তুলে ধরার প্রয়াস করেছিলেন। এবং ইসলামি কবিতায় ও গানে তাঁর অপূর্ব কাব্য-রস ও কৌশল স্ফূর্তিলাভ করেছে। তিনি সত্যিই যেন বেহেশ্‌তের ফুল ফুটিয়েছেন এই ধারার কাব্যে।

কিন্তু নজরুলের ইসলামি কবিতা ও গানের এই কি কেবল পরিচয়? নাকি তাঁর ইসলামি ধারার কাব্যের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল? বাঙালি মুসলমান, সঙ্গীতচর্চাকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ জ্ঞান করতেন। কিন্তু ইসলামের মর্মবাণীকেই এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ্‌ ও রসুলের না'তকে নজরুল তাঁর অপরূপ বাণী ও সুরলহরির মাধ্যমে পরিবেশন করে এমন উন্মাদনা সষ্টি করেন যে মুসলমানের সেই জড়ত্ব কেটে যায়। এও বাঙালি মুসলমানের এক নতুন জাগরণ। নজরুলের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকে পর্যালোচকরা আজ খুব বড় চোখে দেখেন। কাব্যে সঙ্গীতে বাঙালি মুসলমানের চিত্তের উদ্‌বোধন নজরুলের বড় কীর্তি। যে-কোনো সাহিত্যের বিকাশে একটা সময় থাকে যখন ধর্মচর্চা বড় ভূমিকা পালন করে। মুসলমানরা বাংলায় ধর্মচর্চা করে নি বলে বাংলা সাহিত্যে একদিকে মুসলমানের প্রভাব উপযুক্তভাবে পড়েনি, অন্যদিকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তাদের সহজ দখল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নজরুল এই শূন্যপূরণ অনেকখানি করতে পেরেছিলেন ঠিক ধর্মচর্চা করে নয়, ধর্মের মহৎ প্রেরণা জাগিয়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, নজরুল-কাব্যের যে সমগ্র জাগরণ ও উদ্দীপন তারি অংশ বলে বিবেচনা করা উচিত তাঁর ইসলামি গানের উদাত্ত আহ্বানগুলিকে। বৈজ্ঞানিক বিচারে যে-কোনো ধর্মীয় জাগরণই সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তার কথা যদি বাদ দিই, নজরুলকে সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না। বাঙালির জাগরণ-প্রয়াসে ইসলামকেও নজরুল কাজে লাগিয়েছিলেন, এটিই হচ্ছে বলার কথা। না হলে তাঁর 'রাঙা জবা'র হিন্দু ভক্তিমূলক গানের কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

অবশ্য নজরুলের ইসলামি কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনার চরিত্রবিচার করতে হলে তার বিস্তৃত সমীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দরকার। সে-কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বর্তমান নিবন্ধে করা সম্ভব নয়। নজরুলের ইসলামি ধ্যানধারণা কীভাবে গড়ে উঠেছিল কী ছিল তার পরিচয় ইসলামের কোন স্কুল বা ধী-গোষ্ঠী তাঁকে প্রধানত প্রভাবিত করেছিল দু-এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। ওহাবি, ফরায়েজি, ইত্যাদি আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে বার-বার ইসলামের মূল স্বরূপ বা মৌলবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা কখনো স্থায়ীভাবে সফল হতে পারে নি। অলি-আউলিয়া পীর মুরশেদদের মাধ্যমে এখানে প্রধানত ইসলামের মরমী ভাবধারাই প্রতিষ্ঠিত হয় যা একটা সমন্বয়ধর্মী ভাবধারা, তাতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ শেরেক, বেদাৎ, গুরুবাদ প্রশ্রয় পায়, যার একটা প্রধান স্বভাব তার পৌত্তলিক গন্ধ, অবধারিতভাবে হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রভাবও এতে পড়ে। এই মরমী-পৌত্তলিক স্বভাবের কারণেই ইসলাম বাংলায় অশিক্ষিত কিন্তু ভাবুক জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে। নজরুল ছোট থেকে পারিবারিক পরিবেশে এবং পিতার কাছ থেকে যে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার ভাবধারা ছিল মোটামুটি এই ধরনেরই, যার ফলে তিনি কবিতায় গানে ইসলামকে এমন মনোমুগ্ধকর করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। নজরুলের ইসলামি কবিতায় গানে আরো প্রভাব পড়েছে এই ধরনের ফারসি, বিশেষত উর্দু সাহিত্য থেকে, উন্মাদনাময় উর্দু কাওয়ালির প্রভাব পড়েছে। লক্ষণীয়, তিনি হাম্‌দের চেয়ে না'ত লিখেছেন অনেক বেশি। এর কারণ আর কিছুই নয়, নিরাকার আল্লাহর মহিমা-কীর্তনে কাব্যের স্ফূর্তি খুব বেশি ঘটানো যায় না, কিন্তু রসুল নামক পরম সুন্দর ব্যক্তিটির রূপ আর গুণের কীর্তন করতে গিয়ে কাব্যকৌশলের চূড়ান্ত করা যায়। তাঁর না'তে হিন্দু বন্দনা-গানেরও প্রভাব পড়েছে, কখনো কখনো যা হয়তো প্রকৃত ইসলামসম্মত নয়। কেবল ইসলামি গানে কবিতায় নয়, তাঁর অন্যান্য কবিতায়ও বাউলদের প্রভাব পড়েছে। তবে তিনি ইসলামি শরিয়ত অর্থাৎ কোরান ও হাদিসের অনুশাসন অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী সম্পর্কে ভালো-রকম অবহিত ছিলেন এবং ইসলামী গানে, কবিতায় তারও ব্যাপক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

নজরুলের ইসলামি কবিতা ও গানের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার বিষয়। যদিও এই নিবন্ধে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

পুনশ্চ ঃ

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে। ওপরের আলোচনাটুকু লিখেছিলাম এ-বছরের নজরুল-জন্মদিবসের ক'দিন আগে ১৮ মে (১৯৯০)। তারপর নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকী এল। ২৮শে আগষ্ট বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে আহমদ ছফা 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ' নামে প্রবন্ধ পড়লেন। এই প্রবন্ধের যে বিষয় সেটা আমার ওপরের আলোচনাটুকুর সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কিত নয়, আবার বিশেষভাবে সম্পর্কিতও

বটে। পাঠক দেখেছেন, আমি আসল বক্তব্যে প্রবেশ করার আগে প্রথম অনুচ্ছেদে একটু ভণিতা করেছি। আমার ভাবতে এখন একটু অবাকই লাগছে, ওই ভণিতায় আমি সব বাদ দিয়ে নজরুলের কবিতায় ফারসি-উর্দুর প্রভাবের কথা কেন বললাম। আবার দেখুন, শেষ অনুচ্ছেদে বলেছি, নজরুলের ইসলামি কবিতা ও গানের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার বিষয়। এখন পরবর্তী কথাগুলো বলতে গিয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারছি, আসলে যে-কোনো বড় লেখকেরই লেখার বিষয়, বক্তব্য, ভাবের সঙ্গে, লেখকের চেতনালোকের সঙ্গে তাঁর লেখার ভাষা বা রূপকল্পের সম্পর্কটি খুব নিবিড়। এবং এই সাযুজ্য মোটেই কোনো আকস্মিক বা বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারটি যদি মনে রাখি তাহলে কোনো লেখককে বুঝতে এবং তাঁর মূল্যায়নের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে তা বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

যাই হোক, আহমদ ছফার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য ছিল নজরুল তাঁর কবিতার ভাষার গভীর প্রভাব ও প্রেরণা শোষণ করেছিলেন মুসলমানি পুঁথি-সাহিত্য থেকে যাকে দোভাষি সাহিত্যও বলা হয় এবং যার কবিদের বলা হয় শায়ের। কী রকম এক জেদের ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেন। বলেন, শায়েরদের সেই পুঁথিতে ছিল যথেষ্ট পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, কিন্তু তা ছিল পল্লীর অগণিত অশিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত কাব্যপিয়াসি মুসলমানের প্রাণের ভাষা, পরিমার্জিত হিন্দু-রুচির পক্ষে এই ভাষা ছিল অচ্ছুৎ। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধযুক্ত ও সেই অচ্ছুৎ ভাষাকে নজরুল জাতে তোলেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আধুনিক ও নাগরিক লেখকদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন, অন্তত ওই ভাষার প্রতি তাঁদের নাক-সিঁটকানি বন্ধ হয়। তিনি বলতে চান নজরুলের কবিতার ঋণ ও প্রভাব পুঁথি সাহিত্যের কাছে, পুঁথি-সাহিত্যের ঐতিহ্যই নজরুলের কবিতার ঐতিহ্য। এবং নজরুলের মাধ্যমে সেই ঋণ এবং ঐতিহ্য আমরা বহন করে চলেছি। ইত্যাদি।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যে বা কবিতায় আঠারো-উনিশ শতকের পুঁথি-সাহিত্য বা শায়েরদের রচনা দোভাষি সাহিত্যের প্রভাব-অপ্রভাবের বিষয়টি একটি বৃহৎ প্রশ্ন তাতে সন্দেহ নেই। মনে পড়ল আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে পুঁথি-সাহিত্যের স্থান সম্পর্কে অনেক বিতর্ক হয়েছে, এমনকি নজরুল যে ওই উত্তরাধিকার বহন করছেন এ-কথাও কেউ কেউ বলেছেন মনে পড়ল। এই বিতর্কের সামান্য একটু পরিচয় দেয়া বোধ হয় এখানে দরকার। ১৯৩৯ সালের ১১ এপ্রিলের 'দৈনিক আজাদে' 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ লিখিত 'মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত),

> বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন নামে কুমিল্লায় একটি সাহিত্যিক সম্মেলন হইয়া গেল। ... সম্মেলনের মূল সভাপতি মিঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অতি দীর্ঘ অভিভাষণ ধৈর্য ধরিয়া পাঠ করা কঠিন। মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর মন্তব্য শুধু একদেশদর্শী নহে, অজ্ঞতার পরিচায়কও। পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা মোটেই কৃত্রিম নয়- তাহা হইলে গ্রামের অক্ষরপরিচয়সম্বল মুসলমানরাও কখনো এসব পড়িয়া আনন্দ পাইত না। পুঁথি-সাহিত্যের ন্যায় পল্লী-মুসলমানদের আনন্দের সামগ্রী আর কিছুই নাই। তাই বলিয়া আমরা একথা কখনো বলি না যে, অবিকল পুঁথি-সাহিত্যের ভাষাই আধুনিক মুসলমানের সাহিত্যের ভাষা হইবে। কারণ ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন কেহই অস্বীকার করিয়া চলিতে পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া পুঁথি-সাহিত্যের সাথে সবদিক দিয়া যোগসূত্র ছিন্ন করিতেই হইবে এমন কথাও মুসলমানরা মানিয়া লইতে পারে না। বস্তুতঃ নজরুল-সাহিত্যের অনেকখানি প্রাচীন পুঁথি -সাহিত্যেরই বিবর্তিত সাহিত্যিক রূপ বহন করিয়া চলিয়াছে। সুনীতিকুমার যদি একথা বুঝিতে পারিতেন, তবে পুঁথি-সাহিত্যকে 'না ঘরকা, না ঘাটকা' বলিতে সত্যই ইতস্ততঃ করিতেন।

এ-বিষয়ে অনেক পরে ১৩৭১-এর ফাল্গুন সংখ্যা 'মাহে নও'-এ আহমদ শরীফ তাঁর 'পুঁথি-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন (প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত),

> আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্যে আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবন-চর্চার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভূ। এ সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালী মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন ও ঐতিহ্যচেতনা। সাহিত্যরচনার শেষ লক্ষ্য যদি সমাজ-কল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে দোভাষী সাহিত্যই গত একশ' বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানের জগৎ ও জীবন-ভাবনার নিয়ামক। এই দিক দিয়ে এ-সাহিত্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিমেয়।

কিন্তু পুঁথি-সাহিত্যের মূল্য ও গুরুত্ববিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। খুব স্বাভাবিক কারণে পুঁথি-সাহিত্যের ধারা অর্ধ-পথে হারিয়ে গেছে, যদিও আমি মনে করি, প্রধানত লোকায়ত মুসলমানের দীর্ঘকালের অতৃপ্ত মনের ক্ষুধার নিবারক এই পুঁথি সাহিত্যের বেদনা ও রৌদ্র-রসের বিপুল ভাণ্ড সাহিত্যের ইতিহাসে স্থানলাভের অবশ্য-অধিকারী। এর সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আরো এইখানে যে, শিষ্ট সাহিত্য যে অভাব মেটাতে পারে নি, এই লোকায়ত সাহিত্য তা পূরণ করেছে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে নজরুল কি এই সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? যদি আদৌ হয়ে থাকেন, সে কতটুকু? তার চরিত্র কী? আশ্চর্যের বিষয়, আহমদ ছফা তাঁর লম্বা প্রবন্ধে তর্ক করলেন অনেক, ক্রোধে বিদ্রুপে ফেটে ফেটে পড়লেন, অনেক জেদ করলেন, কিন্তু পুঁথি-সাহিত্য থেকে এবং নজরুলের কবিতা কি গান থেকে একটাও চরণ উদ্ধার করে দেখালেন না কোথায় উভয়ের মিল বা নৈকট্য।

আলোচনা করতে উঠে নজরুল-অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল আজাদ আহমদ ছফার প্রবন্ধটিকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করলেন, কিন্তু আহমদ ছফা মূল প্রশ্ন যেটা তুলেছিলেন তার বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা যে দিলেন তা নয়। অন্য আলোচক অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দীক তাঁর বক্তব্যটাকে খন্ডন করার কিছুটা প্রয়াস করেন।

আহমদ ছফার প্রতিপাদ্য ঠিক নয়। নজরুলের কবিতার ভাষা পুঁথি-সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়নি। নজরুল-কাব্যে পুঁথি-সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা দেখিয়ে আর কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি কোনো উপযুক্ত পর্যালোচক প্রশ্নটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবেন। সে-কাজ করার সময় তাঁকে আবেগ, বাতিক পরিহার করতে হবে। নজরুলের জীবনচরিতও আমার ভালো করে পড়া হয়নি। জীবনের কোনো পর্যায়ে তিনি কম হোক বেশি হোক পুঁথি পড়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই। ভাবগতভাবে পুঁথির কোনো সুদূর বা অন্তর্লীন প্রভাব নজরুলের কবিতায় পড়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কবিতার ভাষা পুঁথির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত এই সরল ধারণা কেমন করে জন্মালো আমি বুঝতে পারি না। নজরুলের কোনো কোনো কবিতায় অনেক আরবি–ফারসি শব্দ পাওয়া যায় বলে? তাহলে তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা মোহিতলাল মজুমদারকেও পুঁথি প্রভাবিত বলতে হয়। নাকি মুসলমানি বিষয়, ভাব ও অনুষঙ্গের কবিতা ও গান নজরুল অনেক লিখেছেন বলে? তাঁর অনেকগুলি ইসলামি ভক্তি-গান নিবিড় আশ্লেষে ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে অপরূপ। কিন্তু সেই ফোয়ারার উৎস পুঁথি-সাহিত্য নয়। নজরুলের কবিতায় অতিরিক্ত আরবি-ফারসি শব্দ আর ইসলামি বিষয় ভাবনা দেখে যাঁরা পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক খোঁজেন তাঁরা ভুল করেন। কেবল শব্দই ভাষা নয়, শব্দের বিশেষ গাঁথুনি হচ্ছে ভাষা। পুঁথি-সাহিত্যের রয়েছে তার ভাষার বিশেষ গাঁথুনি, বিশেষ বাক্যপ্রকরণ, আরবি-ফারসি শব্দ তো রয়েছেই। আমার হাতের কাছে পুঁথি-সাহিত্যের উপযুক্ত নমুনা এই মুহূর্তে নেই যা দিয়ে আমি তার ভাষার সেই বিশেষ ধাঁচ ও ঢংটি দেখাতে পরি। তবু 'ছহি বড় সোনাভান ' নামক পুঁথির প্রথম কয়টি পয়ার উদ্ধৃত করি,

> আল্লা ২ বল ভাই নবী কর সার ॥ নবীর কালেমা পড়ে হয়ে যাবে পার* আল্লা ২ বল ভাই যত মমিনগণ ॥ মুহম্মদ হানিফার কিছু শুন বিবরণ* যতেক কছেল্লা পাইল হানিফা পাহালওান॥ সে সব দুঃখের কথা করিব বয়ান* বার জঙ্গ করে মর্দ্দ কেতাবে খবর॥ তের জঙ্গ লেখা যায় টুঙ্গির সহর* সোনাভান নামে বিবি বাদসা সে সহরে ॥ কুয়তের হদ্দ আল্লা দিয়াছে তাহারে* একরোজ সোনাভান কহেন উজিরে ॥ এয়ছা কেহ আছে জোরে পাছাড়ে আমারে* উজির কহেন বিবি শুন সে খবর॥ মহাম্মদ হানিফা আছে আরব্ব সহর* হজরত আলীর বেটা রছুলের নাতি ॥ আপনার কুয়তে মর্দ্দ ফেড়ে ফেলে হাতী* বড় জোরওার মর্দ্দ দুনিয়া ভিতরে ॥ লড়িতে তাহার সাথে কেহ নাহি পারে* তাহার সহিত যদি পার লড়িবারে॥ কোমর বান্ধিয়া চল মদিনা সহরে* সোনাভান বলে আমি যাব মদিনায় ॥ হানিফা কেমন মর্দ্দ দেখিব তাহায়* ইত্যাদি।

এটি ভালো নমুনা না হলেও সেই মেজাজটিকে পাওয়া যাবে। পুঁথির ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য আরবি ফারসি উর্দু শব্দের প্রভূত ব্যবহার, তারও বড় বৈশিষ্ট বাংলা প্রত্যয়াদি সহযোগে উর্দু-বাংলার বিচিত্র-নাম ধাতু তৈরী করে তার ব্যবহার, যেমন

নামলো অর্থে 'উতারিল', পাঠাব অর্থে 'ভেজিব', বের হবে অর্থে 'নিকালিবে' যার নমুনা ওই উদ্ধৃতিটিতে নেই। পুঁথির ভাষার এই ভঙ্গির ছায়া নজরুলের কবিতায় কোথাও আমি দেখতে পাইনি। পুঁথির ভাষা-ভঙ্গি পূর্ব -বাংলার কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় দেখতে পাওয়া যেতে পারে, বা পূর্ব- বাংলার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব হয়তো পুঁথি-সাহিত্যে পড়েছে। কিন্তু কৈশোরে ময়মনসিংহের ত্রিশালে কয়েকমাস অবস্থান ছাড়া সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতি পর্বে ওর সঙ্গে বিশেষ যোগ তাঁর কখনো হয়েছিল বা সেই পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন এমন মনে হয় না, যার থেকে পুঁথির সেই গভীর প্রভাব তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে । পূর্ব-বাংলার মাটি, মানুষ ও তার ভাষার সঙ্গে নজরুলের গভীর পরিচয় হয়েছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে । তাঁর কবিতায়, গানে ও গল্পে এর পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব-বাংলার মুর্শিদি ভাটিয়ালির প্রভাব এবং বাউল গানের প্রভাব তাঁর গানে পড়েছে।

তাঁর গুটিদুই বিখ্যাত কবিতা ও একটা পরিচিত গান থেকে এমন কিছু কিছু উদ্ধৃত করি যা দেখেই কেউ হয়তো বলে উঠবেন, এই তো, পুঁথির প্রভাব ছাড়া কী! 'মোহর্‌রম' কবিতায় লিখেছেন,

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া,-
"আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে ,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া-দামেশ্‌কে-
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে?"

'কামাল পাশা' কবিতায় লিখেছেন,

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর-সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

একটা না'ত গানে লিখেছেন,

বারেক মুখে নিলে যাঁর নাম
চিরতরে হয় দোজখ্ হারাম,
পাপীর তরে দস্তে যাঁহার
কওসরের পিয়ালা ॥
মিম্ হরফ না থাকলে যে আহদ্,
নামে মাখা যাঁর শিরীন্ শহদ্,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ
ত্রিভুবন উজালা ॥

কিন্তু এইসব গান, কবিতা মোটেই পুঁথি-সাহিত্যের প্রভাব বা প্রেরণার ফল নয়।

নজরুল বেশ খানিকটা ফারসি জানতেন। তার চেয়ে বেশি জানতেন মনে হয়

উর্দু। তাঁর ভান্ডারে ফারসি শব্দের জোগান ছিল ভালো।. আর কবিতা-গানের উর্দু মানেই হচ্ছে ফারসি (এবং আরবি) শব্দের সাজানো ডালি। কবিতা-গানে নজরুল যে বহুল ফারসি আরবি শব্দ নিয়েছেন সোজাসুজি ফারসি আর উর্দু থেকে, পুঁথি থেকে নয়। তার জন্যে তাঁর বাক্যবন্ধে পুঁথির মেজাজ নেই, তা প্রধানত আদর্শ ও শিষ্ট বাংলা। এ-কথা অবশ্য হয়তো বলা যায়, পুঁথিকাররা বা শায়েররা যেখান থেকে ফারসি-আরবি শব্দ নিতেন, নজরুলও তা সেখান থেকে নিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলতে হবে, শায়েররা কেবল আরবি-ফারসি শব্দ নয়, তাঁদের কাব্যের মুসলমানীকরণের জন্যে বাংলা বাক্যবন্ধের সঙ্গে বিচিত্র উর্দু ঢং মিশিয়ে ভাষাটাকে দোআঁসলা করে নিয়েছিলেন, যার জন্যে ওকে বলাই হয় দোভাষি সাহিত্য। নজরুল তা করেন নি, তাই নজরুলের কোনো কাব্যকেই দোভাষি সাহিত্য বলা হয়না তা তাতে আরবি-ফারসি শব্দ যতই থাকুক না কেন।

ফারসি এবং তার চেয়ে বেশি উর্দুর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ছোট থেকে । নজরুলের বাবা বাড়ি-বাড়ি মিলাদ পড়ে বেড়াতেন। সে কাজ নজরুলও কৈশোরেই করেছেন, কৈশোরেই যে-কাজের অভিজ্ঞতা বর্তমান লেখকেরও হয়েছিল। সেইসব মিলাদ বা মওলুদ শরিফের বই ছিল উর্দুতে। তাই ইসলামি অনুষঙ্গ, আরবি-ফারসি শব্দ আর উর্দুভাষার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সে-পরিচয় পরে আরো বেড়েছিল। সঙ্গীতর্চচার মাধ্যমে এ-ব্যাপারটা আরো বিশেষ নিবিষ্টতা লাভ করেছিল। মনে হয় উর্দু কাওয়ালির প্রভাব তাঁর ইসলামি গানে বিশেষভাবে পড়েছিল। 'কম্‌লিওয়ালা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই কেবল নয়, তাঁর ইসলামি গানের মাতোয়ালা ভাব থেকেও এটা বোঝা যায়।

নজরুল নানাভাবে নানা স্থানে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন । তার সবটাই ধর্মীয় বা মুসলমানি উদ্দেশ্যে নয়। তবে মুসলমানি বা ইসলামি আবহসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি প্রভূত আরবি-ফারসি শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার জন্যে তিনি পুঁথি-সাহিত্যের কায়দায় শিষ্ট বাংলাভাষার আপন চরিত্র বা স্বভাব বা গঠন বদলে দেন নি। উপরে উদ্ধৃত 'মোহর্‌রম' ও 'কামাল পাশা' কবিতায় গোটা উর্দু বাক্য ব্যবহার করেছেনঃ (ক) আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া। (খ) কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই! এগুলি শিষ্ট উর্দু। কারবালা ও কামাল পাশার কাহিনী অন্যান্য বহুতর মুসলিম বিষয়ের মতোই অ-বঙ্গীয়। সেই ভাবের স্ফূর্তি ঘটাতে উর্দুর সহায়তার প্রয়োজন তিনি স্বভাবতই বোধ করেছেন। তাঁর ফারসি-আরবি শব্দ বা উর্দু বাক্যের ব্যবহার, এর সবটাই শিষ্ট, পুঁথির মতো উদ্ভট মিশেল নয়। এই শিষ্টতা সম্পর্কে তিনি কতটা সতর্ক ও সচেতন ছিলেন সেটা বোঝা যায় তাঁর আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের যথাসাধ্য সতর্কতা থেকে। লক্ষ্য করুন, 'মোহর্‌রম' কবিতার প্রথম চরণের 'লাল' শব্দ দু'টি থেকে দ্বিতীয় চরণের 'লা'ল' শব্দটিতে একটি উর্ধ্ব-কমা দিয়ে কীভাবে পৃথক করেছেন। এই উভয় 'লাল'ই ফারসি, কিন্তু দুই লাল-

এর বানান আলাদা, উচ্চারণ আলাদা। প্রথম চরণের 'লাল' বাংলা উর্দু হিন্দিতে বহুলব্যবহৃত লাল। দ্বিতীয় চরণের 'লা'ল' আমরা বাংলায় যাকে বলি মানিক।

কেউ যাতে ভুল না বোঝেন তাই শেষে একটা কথা বলা দরকার। ভাষার শিষ্টতা-অশিষ্টতা ভিন্ন একটা প্রশ্ন। বর্তমান আলোচনায় তাই দিয়ে আমি মোটেই পুঁথি-সাহিত্য ও নজরুল-কাব্যের মূল্য নির্ণয় করিনি। পুঁথি-সাহিত্যের যা লৌকিক মূল্য, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এমনকি সাহিত্যিক মূল্য তাকে আমি খাটো করব সাধ্য কী।

আর একটা কথা। আজকাল এক ঢং হয়েছে বাঙালির তথাকথিত স্বরূপের অন্বেষা। এর মোটামুটি দুটো পরস্পরবিরোধী দিক। এক, আবহমান বাঙালির আপন স্বরূপ; আর এক, ধর্মীয় তথা ইসলামি-মুসলমানি লৌকিকতায় বাঙালির স্বরূপের সন্ধান। উভয় পক্ষই এই স্বরূপের মূল এবং ইতিহাস এবং পরিপ্রেক্ষিত খোঁজার প্রাণান্ত প্রয়াস করছেন। করতে গিয়ে অনেক টানাহেঁচড়া হচ্ছে। আমাদের এককালের এক শক্তিমান মার্কস্‌বাদী কবি ফরহাদ মজহার এই প্রয়াসে নেমে সম্প্রতি চমৎকার এক কাব্য লিখেছেন 'এবাদতনামা'। আহমদ ছফা এই দলেরই তাত্ত্বিক। মুসলমান বাঙালির লোকায়ত গ্রামীণ কৃষ্টিতে ধর্ম ছিল এবং আছে, এ-কথা কে অস্বীকার করবে। কিন্তু ওই জিনিস হিন্দু বাঙালির কৃষ্টিতেও ছিল এবং আছে। আর কেবল বাঙালির কথাই বা কেন, সাঁওতাল, গারো, চাকমা, মুরং, মার্মা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুতর মানবগোষ্ঠীর কৃষ্টিতে তা ছিল এবং আছে। কেবল মুসলমান বাঙালির কৃষ্টির পরিচয় ও ভবিষ্যৎ এই বাংলাদেশে কোন্ বিপদের সম্মুখীন যে কেবল মুসলমান বাঙালিকে আলাদা করে টেনে এনে তার স্বরূপের অনুসন্ধান করতে হবে, তাও আবার নজরুলের মতো কবিকে অবলম্বন করে? সাম্প্রদায়িকতা তাহলে আর কাকে বলে? মানবদৃষ্টি আর বিশ্বদৃষ্টিই বা তাহলে কী? আর মানুষের স্বরূপ কি কেবল অতীতেই হারিয়ে যায়, না ভবিষ্যতেও লুকিয়ে থাকে? অতীতের জটিল গর্ভে যার স্বরূপের সন্ধানই করি না কেন, তার মায়াকল্পের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব আর ব্যর্থতাগুলিকেও টেনে বের করতে হবে। 'বিদ্রোহী' কবি নজরুলের কাব্যের অনুপ্রেরণা খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস থমকে থেমে গেল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পুঁথি-সাহিত্যে? কেন, শাক্ত সাহিত্য আর বৈষ্ণব সাহিত্য কি তার চেয়ে অর্বাচীন? না তিনি ইসলামি গানই কেবল লিখেছেন, কালী-সাধনার গান বা ব্রজের রাখালকে নিয়ে কিছুই লেখেন নি। পূর্ব-পশ্চিম অতীত-বর্তমান মিলে তিনিই তো ছিলেন যা হোক ভরসা। পেঁয়াজ-রসুন সহযোগে পাক করে উত্তম ব্যঞ্জনরূপে যদি তাঁকে একতরফা উদরস্থ করি তাহলে আমাদের আর কী থাকে? কিন্তু এদিকে আবার আর এক আশঙ্কায় মরি। তথাকথিত শিষ্ট ফারসি-উর্দুর সঙ্গে নজরুলের যে সম্পর্কের বয়ান করেছি তাতে আবার তাঁর শেষ সম্বল বাঙালিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে না তো?

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ত্রয়োদশ সংকলন]

নজরুলের কবিতায় আত্মসম্বোধন ও আত্মঘোষণা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯১৭ থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ—এই পঁচিশ বছরে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যজীবন বিস্তৃত। এই সময়সীমার মধ্যে অশ্রান্ত বেগে তিনি রচনা করেছেন কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। তাঁর প্রতিভার প্রধান বাহন কবিতা, গদ্য নয়।

বাংলাকাব্যের আসরে নজরুল যখন এলেন তখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা কাব্য' প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'বলাকা'র উন্মাদনায় তখন কাব্যাকাশ ভরে আছে। আর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের খ্যাতি তখন চূড়ায় উঠেছে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' একান্তই তাঁর নিজস্ব আমদানি নয়। 'বলাকা'র মানবিক পৌরুষদীপ্তি 'বিদ্রোহী'র রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির উত্তেজনায় পুনরুজ্জীবিত।* মোহিতলালের দার্ঢ্য ও বলিষ্ঠতা নজরুলেও ছিল, তা দেখেই হয়ত মোহিতলাল নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মোহিতলালের ক্লাসিক সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা নজরুলের কাব্যস্বভাবে ছিল না, সুতরাং মোহিতলালের সঙ্গে সম্পর্ক গোড়াতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল, তা স্বীকার্য। তা সত্ত্বেও নজরুলের স্বকীয়তা গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট, সোচ্চার। তা এত স্পষ্ট ও প্রখর যে চোখে না পড়ে পারে না। 'বিদ্রোহী' ও 'কামালপাশা' কবিতা দু'টি তার অবধারিত প্রমাণ।

নজরুলের কাব্যচর্চার সময়সীমা খুব প্রসারিত নয়। মাত্র বিশ বছরের (১৯২২-১৯৪২/১৩২৮-১৩৪৮) মধ্যে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন। স্বীকার্য, পরবর্তীকালে তার সবটাই সংকলিত হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।[১]

নজরুলের কবিতার প্রতি পাঠকের সমর্থন তাঁর জীবিতকালে এসেছে অজস্র ধারায়; সেই সঙ্গে তাঁর কবিতার প্রতি কটূক্তিও বর্ষিত হয়েছে। এই প্রশংসা ও প্রতিবাদ, অভিনন্দন ও তিরস্কার তাঁর কবিতার স্বীকৃতিরূপেই বিবেচিত হতে পারে। নজরুল সেই কবিপ্রতিভা যাকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারিনি, পারছিনা, পারব না—এই সত্য মনে রেখেই আজ নজরুল-কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আমার বিশ্বাস, নজরুলের কবিতার আঙ্গিক নিয়ে এখনো অনেক কথা বলার

আছে। তা এখনো–অনেকদিন আমাদের কাব্য–ভাবনাকে নানাভাবে উস্‌কে দিতে পারে। নবপর্যায়ে 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক রূপে কাজী নজরুল ইসলাম বেশ কিছু স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সেগুলির অন্যতম 'আজ চাই কী' ('নজরুল রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত)। এই নিবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন,

> আজ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার তর্জন, দুর্দম দুর্মদ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণ–উন্মাদ আর তাদের হ্রেষা বৃংহনের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ। আজ অলক–তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধক্ ধক্ জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মত ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ডক পরতে হবে। আজ কোমল কুসুমমালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিথ্যাচারী অসুরের অস্থি–কপালের মালা প্রমত্ত বিক্রমে স্ফীত বক্ষে দোলাতে হবে।

নজরুলের কবিতায় শুনি এই চিন্তার প্রতিধ্বনি,

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।
আমি মানি না কো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি। আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন!

[বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা]

অপর-একটি স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'আমার সুন্দর' প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক নবযুগ (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯, ২ জুন ১৯৪২)। সেখানে কবি লিখেছিলেন,

> আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু, আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন। আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম। আমার সমস্ত জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল! আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল! আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে দারিদ্র্যে, অভাবে অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললাম, 'আমি ব্রহ্ম চাই না, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল কর্ম আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রীমাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর, আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, আমার শান্তি নেই।'

('নজরুল রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ২য় প্রকাশ ১৩১৯)

এই মনোভাবই ত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়,

মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে-রণিবে না-
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

[বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা]

এইসব গদ্যাংশ পদ্যাংশে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ অনায়াসে অনুধাবন করা যায়ঃ অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা, অকৃত্রিম সহজ প্রকাশ, আন্তরিক ভাবাবেগ, দৃঢ় প্রত্যয় আর অবারিত সংযমবিহীন প্রকাশ। স্বীকার্য, এসব ক্ষেত্রে সংযম ও আবেগ এ দুয়ের পরিণয় সাধনে নজরুল যত্নবান হননি।

এখান থেকেই নজরুলের কবিতায় প্রধান হয়ে ওঠে দুটি বৈশিষ্ট্য –আত্ম-সম্বোধন আর আত্ম-ঘোষণা।

আমরা তা জানি সাহিত্যে শিল্পে ধর্মে দর্শনে ইগো (ego) –শিল্পী বা ভাবুকের আত্মগৌরব বরাবরই আছে। আমরা এও জানি, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পশ্চিম য়োরোপে তা বিশেষ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ঐ সময়ে চিত্রশিল্পী, দার্শনিক আর ধর্মতত্ত্ববিদেরা নিজেদেরকে ব্যক্তি হিসেবে নোতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। ঐ সময়ের মানুষের শিল্পকীর্তি, চিত্রকলা, স্মৃতিকথা আর পত্রাবলী–ধৃত আত্মভাবনা ষোড়শ শতকের য়োরোপের মানুষের আত্মগৌরব বা আত্মচিন্তা থেকে অনেক বেশি তীব্র, গভীর ও সমস্যামূলক হয়ে দেখা দেয়। শিল্পী ব্যক্তিত্বের এই অহং–চেতনা পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর ও গভীরতর হয়ে ওঠে। তার ফলে আত্ম-আবিষ্কার, আত্ম-সন্ধান আর আত্ম-প্রকাশের নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। অহং (ইগো) চিন্তায় এই বিপ্লব রোমান্টিকতার মূলে সক্রিয়। সেক্‌পীয়ারের হ্যামলেট নাটকের নায়ক আত্ম-পীড়ন প্রকাশ করতে চেয়েছে নিভৃত স্বগত উক্তিতে– This is I, Hamlet the Dane!

এ কোনো রোমান্টিক অহংবাদীর (Romantic egoist) আর্ত উচ্চারণ নয়, এ হ'ল রাজকুমারের কণ্ঠস্বর। গ্যয়টের ওয়ার্থারের এবং শাতোব্রিয়াঁর আতালার দুঃখ-উচ্চারণ থেকে অনেক দূরবর্তী। তেমনি সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনের ট্রাজিক পরিণতি কোনো রোমান্টিক অহংবাদী ব্যক্তিত্বকে উন্মোচিত করে না। কিন্তু একালের লেখক আনুই-এর 'আন্তিগোনে' নাটকের (Antigone by Anouilh) নায়িকা

আন্তিগোনে আবেগধর্মী ব্যক্তিত্ব উন্মোচক সংলাপে নিজেকে ব্যক্ত করে।

এই দুই নায়িকা এক জাতের নয়। সোফোক্লেসের আন্তিগোনে আর আনুই-এর আন্তিগোনে এ দুই চরিত্রের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তুলেছে রোমান্টিকতা-যার মূলে সক্রিয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিমান—এবং অহং-এর প্রবলতা। একালের আন্তিগোনের ট্রাজিক দুঃখ সেকালের আন্তিগোনের দুঃখের সমধর্মী নয়।

এই রোমান্টিক আমি (Le moi romanticque) পশ্চিম য়োরোপের রাজনীতি, কলা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিল আঠার-উনিশ শতকে। প্রথম ক্ষেত্রে দেখা দিলেন গ্যারিবল্‌ডি, জেফারসন ডেভিস, কোদুথ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বায়রন, শাতোব্রিয়াঁ, হাইনে, শপ্যাঁ, দেরাক্রয়, ভিক্তর উগো, ভের্দি। রোমান্টিক অহংবাদী, কবি-নাট্যকার বায়রনকে আমরা অল্পবিস্তর চিনি। জানি, তিনি হয়ে উঠেছেন রক্ষণশীলতা ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়ার বজ্র নির্ঘোষ। ইংল্যাণ্ডের বায়রন এর সঙ্গে স্মরণ করা যায় ফ্রান্সের রোবসপিয়েরের আর দাঁতন–এর নাম। এঁরাও একই ধরনের 'অগ্নিময়ী জীবনশিখা' রূপে ফরাসী বিপ্লবের রক্তরাঙা দিনে দেখা দিয়েছিলেন। স্বীকার্য, গ্যয়টের 'ফাউষ্ট' আর ওআর্ডসওআর্থ–এর 'দ্য প্রিলিউড' এই দীপ্র শিখা রোমান্টিক 'আমি'কে প্রকাশ করেছে। স্মর্তব্য, শেলীর কবিতায় আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বাণী এরই মাধ্যমে বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

এই দীপ্র ক্ষিপ্র প্রবল জীবনীশক্তি সম্পন্ন রোমান্টিক 'আমি'র উজ্জ্বল উদাহরণ বিংশ শতাব্দের বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬/১৩০৬-১৩৮৩)। তাঁর কবিতার এই রোমান্টিক অহংবাদী ব্যক্তিত্বের বজ্র নির্ঘোষ শোনা যায়—যেমন উনিশ শতকের প্রথম পাদে শোনা গিয়েছিল পশ্চিম য়োরোপে 'ম্যানফ্রেড' 'চাইল্ড হ্যারল্‌ড' 'ডন জুয়ান'–এর কবির কণ্ঠে।

রোমান্টিক অহংবাদী লেখকের কাব্য–নাটক–উপন্যাসে প্রায়ই পাওয়া যায় অতিনাটক (মেলোড্রামা), জনতা-সম্বোধন (পাবলিক অ্যাড্রেস), চড়া গলায় রাজনৈতিক ভাষণ (পোলিটিক্যাল ওরেশন), বহুবিধ অত্যাচার দমন-নিপীড়নের প্রবল নিন্দা আর প্রতিবাদ। নজরুলের কবিতায় এইসব লক্ষণ অভ্রান্তভাবে রূপায়িত।

তাই ভরসা করে বলতে পারি, নজরুলের বিদ্রোহ আসলে রোমান্টিক 'আমি'-র প্রবল আত্মপ্রকাশ মাত্র। শেলীর Prometheus Unbound, Act 1, বায়রন এর Childe Harld, Donjuan প্রভৃতি রচনায় যে বজ্র নির্ঘোষ, নজরুলের বিদ্রোহী, ধুমকেতু প্রলয়োল্লাস, কামাল পাশা, শাত-ইল আলব; কবিতায় (অগ্নিবীণা কাব্যে সংকলিত) অনুরূপ নির্ঘোষ, শোনা যায়।

নজরুলের অধিকাংশ কবিতাই জনতা-সম্বোধন (পাবলিক অ্যাড্রেস) ও চড়া

গলায় রাজনৈতিক বক্তৃতার (পোলিটিক্যাল ওরেশন) ঢঙে রচিত। এর জন্য কবিকে নিন্দা না করে এর মাধ্যমে নজরুলের কবি–ব্যক্তিত্বের ও কবিতার চারিত্র্য সন্ধান করা যেতে পারে।

নজরুলের কবিতা সম্পর্কে শোনা গেছে অনেক পরিবাদ এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। সন্দেহ নেই, তার মূলে আছে, কবিতার এই চারিত্র্য–লক্ষণ সম্পর্কে অজ্ঞতা। সে-কারণেই 'বিদ্রোহী' কবিতার ব্যঙ্গ-অনুকরণ সৎপাঠকের অনুমোদন পেতে পারে না। সজনীকান্ত দাসের 'বিদ্রোহী'র ব্যঙ্গ 'ব্যাঙ' অনুকৃতি (শনিবারের চিঠি, ১৯২৪/৪ অক্টোবর)যতটা না পরিবাদ আর অসূয়ার প্রকাশ তার চেয়ে বেশি এই ধরনের কবিতার চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা। আমার মনে হয়, অর্ধ শতাব্দের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমরা এভাবেই সেকালের নজরুল পরিবাদকে কেবল এই কারণেই প্রত্যাখ্যান করতে পারি। কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতি সজনীকান্ত দাসের এবং মোহিতলাল মজুমদারের আক্রমণে যতই ব্যক্তিগত কারণ থাকুক তাকে আমি প্রাধান্য না দিয়ে নজরুলের কবিতার চরিত্র-স্বতন্ত্র্য সম্পর্কে সজনীকান্ত ও মোহিতলালের অজ্ঞতাকেই প্রধান কারণ বলে মনে করি।

নজরুলের কবিতার চরিত্র বিচারে এই স্বাতন্ত্র্যের উপরই আমি জোর দিতে চাই। নজরুলের কবিতার বিষয়, আসলে, তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। তাই নিম্নধৃত অভিমত প্রণিধানযোগ্য,

> যে কোনো কবিতাই কোনো-না-কোনো রকমের সম্বোধন। সম্বোধন খুব প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থাকলেও কবিতা যে 'ওড' কবিতার ধর্মে সমর্পিত হবেই, এমন কোনো নির্দিষ্টতা নেই। কিছু কবিতায় কবিকে কথা বলতেই হয় যখন, তখন তিনি অবশ্যই কারো সঙ্গে কথা বলেন। তিনি প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, অথবা প্রেমের সঙ্গে বা অপ্রেমের, এমনকি প্রকৃতি, ঈশ্বর বা প্রেরণার সঙ্গেও। এই সম্বোধনের সূত্রটি যে মুহূর্তে গৃহীত হয়, সেই মুহূর্তে সম্বোধিতের প্রসঙ্গটিও গুরুতর হয়ে ওঠে।—নজরুলের সম্বোধন প্রবলভাবে অতিশয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। 'বলবীর/বল চির উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!' নজরুল এইভাবে যখন কথা বলেন, তখন একথা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না যে তিনি কোনো বীরব্যক্তিকে আত্মঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করতে চান। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ১৬১-পংক্তি দীর্ঘ এই কবিতায় একই সঙ্গে সম্বোধক ও উদ্বোধক 'বলো' শব্দটি মাত্র ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে; অথচ 'আমি' শব্দ এখানে অন্ততঃ ১৪৫টি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। এই শব্দ দুটির ব্যবহারে আনুপাতিক হেরফের এত বেশি যে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। যাকে প্রাথমিকভাবে সম্বোধনের ক্ষেত্র বলে মনে হয়, কাব্যপাঠের পর আর সন্দেহ থাকে না যে ইতিমধ্যে তার ক্ষেত্র-পরিবর্তন ঘটে গেছে। কবি নিজেকেই এখানে সম্বোধন করেছেন, আত্মশক্তির উপলব্ধি, উদ্বোধন ও তার ঘোষণায় তিনি এখানে অস্থিরভাবে তৎপর।... এখানে নজরুল যে অহংচর্চা করেছেন, তাতে অন্যতর কোনো ব্যক্তিকে

দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বলেই সম্বোধনের প্রাথমিক রূপটি এই রকম সরল প্রত্যক্ষতায় ব্যবহৃত হয়েছে। 'ব্যক্তি' অমিতশক্তি 'ব্যক্তি'- কবি আত্মশক্তির চর্চা করেছেন এবং যে কোন 'ব্যক্তি'ই আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হবেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার সম্বোধন রীতিতে আপাত-বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বস্তুত কোনো হানিকর অসতর্কতার পরিচয় নেই। পক্ষান্তরে তা কবির এই মনোভাবেরই প্রকাশ। 'বিদ্রোহী' কবিতার আচরণ-রীতির এই কাঠামোটি অনুসরণ করলে একটি বিষয় অন্তত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কবি নিজে আত্ম-অনুশীলনে ব্রতী এবং পাঠক কবির এই আত্ম-অভিজ্ঞানের শরীকানা লাভ করছে। কাব্য বিচারে কবি ও পাঠক এই দুটি পক্ষ কল্পনা করে নেওয়াতে সম্ভবত অনেকেই আপত্তি করবেন না। কিন্তু নজরুলের কথা বলার রীতি যে এখানে অনেকখানি ঘোষণাধর্মী তা নিয়ে হয়তো কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে, এই ঘোষণা এক পাক্ষিক নয়, দুই পক্ষে বিধৃত, যার ফলে মোটামুটি এক ধরনের সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই একই রীতিতে 'অগ্রপথিক' (জিঞ্জির) কবিতার সম্বোধনে তিনি মিশ্ররূপ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।' (শক্তিব্রত ঘোষ, 'নজরুল ইসলামঃ উচ্চারণ পদ্ধতি ও বিষয় রেখা' সাপ্তাহিক বসুমতী, বর্ষ ৭৩, সংখ্যা ৪৮-৫০ ১৩৭৬ কলকাতা)।

তাঁর কবিতায় নজরুল সর্বত্র এই ধরনের মিশ্র সাধারণ রীতি ব্যবহার করেছেন, তা নয়। বরং বহুক্ষেত্রেই সম্বোধনের সরল-প্রত্যক্ষতা বিশেষ লক্ষণীয়। তার উদাহরণ যে কোনো মনস্ক পাঠক বা শ্রোতা অনায়াসেই বুঝে নিতে পারেন।

সরল প্রত্যক্ষরীতির উদাহরণ,

১. আদি-পিতা ভাগবান (ফরিয়াদ, সর্বহারা)

২. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান! (দারিদ্র্য, সিন্ধু হিন্দোল)

৩. হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর

হে মোর বিদ্রোহী!

[সিন্ধু, সিন্ধুহিন্দোল]

৪. এস এস এস ওগো মরণ! (মরণ-বরণ, বিষের বাঁশী)

৫. ওরে ও শীর্ণা নদী
দুতীর নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি
নিরবধি? [যৌবন, প্রলয় শিখা)

নজরুলের কবিতায় সম্বোধনের অপর একরীতি হল—আপাতঃ সম্বোধিতই কবিতায় সম্বোধকের স্থান অধিকার করে নেয়। যেমন-

১. 'বারাঙ্গনা' কবিতার (সাম্যবাদী) সূচনায় বারাঙ্গনাকে সম্বোধন -'কে তোমারে বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে? কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে দেখা যায়, বারাঙ্গনা-ই অপরের কাছে আপন অধিকারের কথা জ্ঞাপন করেছে। পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পূণ্যের অধিকার?— এখানে সূচনার সম্বোধনের

উপর আর নির্ভর করা যায় না।

২. 'কৃষাণের গান' কবিতার (সর্বহারা) সূচনায়–ওঠ রে জগদ্বাসী ধর্ কষে লাঙ্গল। দ্বিতীয় পংক্তিতে সম্বোধিত (কৃষাণ) সম্বোধকের ভূমিকা নিয়েছে– আমরা মরতে আছি–ভাল করেই মরব এবার বল্।

৩. 'শ্রমিকের গান' কবিতার (সর্বহারা) সূচনায়–ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল! ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল তৃতীয় পংক্তিতে সম্বোধিত (শ্রমিক) সম্বোধক রূপে দেখা দিয়েছে।–

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল্।

কবি ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান কতোটা, পরস্পর নির্ভরতাই বা কতোটা? সম্বোধিত তথা পাঠক ও কবির পরস্পরতা ব্যাপারটি নজরুল কিভাবে তাঁর কবিতায় নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন?

পূর্বোক্ত আলোচক দেখিয়েছেন, প্রায় সর্বত্রই কবি ও পাঠকের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, নজরুল তাঁর বিলোপ ঘটাতে চেয়েছেন। 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' (অগ্নিবীণা) 'ঝড়' (বিষের বাঁশী) 'কুলি-মজুর' (সাম্যবাদী) 'আমার কৈফিয়ৎ' (সর্বহারা), চল্ চল্ (সন্ধ্যা) কবিতার উদাহরণ তুলে সম্বোধিত পাঠক ও সম্বোধক কবির পারস্পরিক সম্বন্ধ আমরা দেখে নিতে পারি। অতি পরিচিত 'বিদ্রোহী'র কবিতাংশই ধরা যাক,

বল বীর–
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর, হিমাদ্রির।
বল বীর–
আমি চির–উন্নত শির।
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংস
মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।

এই কবিতায় কবির আত্মশক্তির উদ্বোধনই মুখ্য, তা সত্ত্বেও তিনি পাঠকদের মধ্যে আত্মশক্তি সম্পর্কে সত্যবোধ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। বস্তুত প্রত্যেকের মধ্যেই যে অমিতশক্তি সঞ্চয় আছে, এই বোধের ফল তিনি পাঠকদেরকে দিয়েছেন পাঠককে কবিতায় অংশীভূত করে নিয়ে।

নজরুল কবিতার যে অধিষ্ঠান বাংলাকাব্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই রীতিটি তাঁর পক্ষে বিশেষ জরুরী ছিল বলে মনে হয়। তার ব্যবহারকে কবিতায় তিনি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন। নজরুলের কাছে কবি কণ্ঠ (বা ব্যক্তিকণ্ঠ) ও সমষ্টিকণ্ঠ (বা পাঠক কণ্ঠ) ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। মনে হয়, অপরাপর কবির তুলনায় নজরুলের ক্ষেত্রে তা বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, তার কারণ সম্ভবত সমষ্টি

অর্থে নৈর্বক্তিতে সমর্পণ। খন্ডকালের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে–সমকালে–সমষ্টিগত উপযোগিতার ভিত্‌টি সম্পর্কে নজরুলের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। একারণেই তাঁর কণ্ঠস্বর খুব স্বাধীন, চড়া, প্রখর শোনায়। প্রার্থনা করো–যারা কেড়ে খায়/তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/যেন লেখা হয়/ আমার রক্ত–লেখায়/ তাদের সর্বনাশ! ('আমার কৈফিয়ত' সর্বহারা) বা আজ হৃদয়ের জাম–ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও/রং-করা এ চামড়ার যত আবরণ খুলিয়া নাও! (কুলিমজুর; সাম্যবাদী) এসব ক্ষেত্রে কবির কণ্ঠস্বর খুব স্বাধীন খুব স্পষ্ট খুব প্রত্যক্ষ খুব বিশিষ্ট। নজরুলের কবিতায় এই আত্মসম্বোধন ও আত্মঘোষণা অবশ্যস্বীকার্য। সম্বোধনের প্রত্যক্ষতার সঙ্গে যুক্ত আছে ভাষারীতিতে কথ্যভঙ্গির অনিবার্য অনুসৃতি। কবিতায় কথ্যরীতির তাৎপর্য কবিতায় গদ্যানুষঙ্গ, যুক্তিনির্ভরতা ও প্রবহমানতার স্বীকৃতি। নজরুলের কবিতায় আছে প্রথম ও শেষটি। মাঝেরটি নেই, সেখানে আছে আবেগনির্ভরতা। এই গদ্যানুষঙ্গেই এসে পড়ে কাব্য ব্যবহারের বিষয়টি। প্রত্যক্ষ, যথাযথ, অর্থনির্দিষ্ট গদ্যপ্রবাহে যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তা প্রায়শই দৈনন্দিন জীবন নির্ভর কথ্যভাষাশ্রয়ী, ইতর, অশালীন। নজরুলের কবিতায় এ ধরনের শব্দ-ব্যবহার অবিরল। যেমন, 'মোল্লাসাহেব তাই হেসে কুটিকুটি' ('মানুষ' /সাম্যবাদী), 'মানুষের কথা ছেড়ে দাও' ('পাপ'/সাম্যবাদী) 'সার হল তাই শাস্ত্র বওয়া' (জাতের বজ্জাতি/ বিষের বাঁশী), রাজ-সরকার রেখেছেন মান, ('আমার কৈফিয়ত'/ সর্বহারা)–এইসব উদাহরণ কথ্যরীতি আশ্রয়ী। এখানে মন্তব্য সম্বোধনের প্রত্যক্ষতা নজরুলের কবিতায় সব চেয়ে বড় লক্ষণ হওয়ার দরুণ কথ্যরীতি তাঁর কবিতার উদাহরণের পক্ষে একট শর্তের মতো অপরিহার্য হয়ে ওঠে, এই কথ্যরীতি–আনুগত্য নজরুলের কবিতায় শব্দ ব্যবহারে বারবার লক্ষ্য যায়। উদাহরণে বিকৃতি প্রশ্রয় ('আমি ধন্যি, 'বিদ্রোহী), লৌকিক শব্দব্যবহারে ঝোঁক (দেবতার বরে আজ রাজা টাজা হয়ে যাব নিশ্চয় 'মানুষ', সাম্যবাদী; এখন দেখি ভারত জোড়া/পড়ে আছিস বাসি মড়া'–জাতের বজ্জাতি) [বিষের বাঁশী] প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার ('মশা মেরে ঐ গরজে কামান'–সব্যসাচী, 'ফণিমনসা'; 'খোদার উপর খোদকারী'–[সত্যমন্ত্র, বিষের বাঁশী] নানা মুনির নানা মত, ঐ 'কিরে হাত মাথায়', চাষার গান [প্রলয় শিখা] এইসব কথ্যরীতি ভঙ্গিমা প্রয়োগের মাধ্যমে নজরুল তাঁর কথ্য ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। অবশ্যই এ কথা স্বীকার্য কবিতায় গদ্য-পদ্যের অবিরোধ সাধনের কথা নজরুল কখনোই সচেতনভাবে চিন্তা করেননি। তা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তারপরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁদের পরে বাংলাদেশের ও পশ্চিম বঙ্গের একালের কবিরা।

রোমান্টিক অহংবাদী কবি বায়রন হয়ে উঠেছিলেন রক্ষণশীলতা ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বজ্র–নির্ঘোষ। এই আলোচনার সূত্রপাতে সে-কথা উচ্চারণ করেছি। আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর লেখা এক বিরাট ব্যঙ্গ মহাকাব্য 'ডন জুয়ান।'

অত্যাচার, পীড়ন ও আভিজাত্য গৌরবের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সমগ্র কাব্য সাধনায় নানাবিধ সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনীতিক অত্যাচার, পীড়ন, গোঁড়ামি, ভণ্ডামী, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর মতো রোমান্টিক অহংবাদী কবি বাঙলা সাহিত্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করে দিয়েছেন একথা অবশ্যস্বীকার্য। প্রতিবাদী অহংবাদী রোমান্টিক বায়রনের রচনার প্রভাব য়োরোপের মানুষ ও সমাজের উপর ব্যাপক ও দূরবিস্তারী হয়েছিল। তা স্বীকার করে কবি সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড কবিতায় যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন কবি নজরুলের প্রভাব স্বীকার করে আমরা তাঁর প্রতিধ্বনি করে উচ্চারণ করতে পারি– বাঙলাভাষী মানুষ যখন নজরুলের কাব্য পড়ে, তখন তারা,

> Felt him the thunder's roll.
> With shivering heart the strife we saw
> Of passion with Eternal Law,
> And yet with reverential awe
> We watch'd the fount of fiery life
> Which serv'd for that Titanic strife,

(অধ্যাপক ডক্টর অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় একদা তাঁর 'রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ' গ্রন্থে নজরুলকে একজন রবীন্দ্রানুসারী কবি হিসাবেই স্থান দিয়েছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কোথাও কোথাও রবীন্দ্র-অনুসরণ সত্ত্বেও, নজরুল যে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে একজন স্বতন্ত্র ও শক্তিমান কবি হিসাবে, বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার হিসাবে নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, এই সত্য শ্রী মুখোপাধ্যায় তেমন উপলব্ধি করেননি। আশার কথা, তাঁর বর্তমান বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধে পূর্ববর্তী ধারণা ও চিন্তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। নজরুলকে বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ তুলে ধরে তিনি তাঁকে এখানে 'স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের' অধিকারী, 'বাংলা সাহিত্যে 'নতুন প্রাণসঞ্চারকারী', এবং 'অন্যতম প্রধান কবি', হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।–সম্পাদক।)

১. আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী'তে পাঁচ খণ্ডে কবির প্রায় সমগ্র রচনাই অন্তর্ভুক্ত।

–সম্পাদক

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ষোড়শ সংকলন]

নজরুল-কাব্যে ঐতিহ্য চেতনা প্রেক্ষিত 'বিদ্রোহী' কবিতা

মুহম্মদ আবু তালিব

হিন্দু পুরাণে ভৃগু রামের বিচিত্র কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

ভৃগু রাম, নামান্তর পরশুরাম একজন হিন্দু অবতার। ঐতিহ্য অনুসারে, ইনি শ্রী বিষ্ণু/ কৃষ্ণের ষষ্ট অবতার, বাল্মিকী রামায়ণ কথিত রঘু রামের পূর্বসূরী। শ্রীরাম হলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। দেবাদিদেবের মানস-পুত্র ভৃগুরাম ভর্গ দেবের বংশে তাঁর জন্ম হয় বলে তিনি ভার্গব নামেও পরিচিত। পিতা জমদগ্নী, মাতা রেনুকা। এর জীবনের প্রধান তিনটি ঘটনা,

১) ইনি পিতার আদেশে জন্মদাত্রী মাতাকে কুঠারাঘাতে হত্যা করে পিতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন;

২) ইনি ভগবান বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করে স্বকীয় বিশ্বাসের যাচাই করে ছিলেন; এবং শেষে

৩) পরশুর সাহায্যে একুশবার ভারতবর্ষকে নিঃক্ষত্রিয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাতেও পাই,

১) তিনি নর অবতার
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন
হানি কুঠার;

২) আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
স্রষ্টা–সূদন, আমি শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন;

৩) আমি পরশু রামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার

আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

এ সব হিন্দু পুরাণের কাহিনী। এর পাশে য়িহুদী-খ্রীষ্টান ও মুসলমান ঐতিহ্যিক মূর্তি ভংগকারী হযরত ইব্রাহীমের কাহিনী রাখা যায়।

ইব্রাহীম কে?

আল্লাহ–দ্রোহী বাবেল পতি নমরূদের রাজ–ভাস্কর আজরের পুত্র ইব্রাহীম তাঁর পিতাকে লক্ষ্য করে বললেন– 'শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে লাগেনা

(এমন কি কোন ক্ষতিও করতে পারে না) এমন মূর্তির/ দেবতার তুমি পূজা কর কেন?' তিনি আরও বললেন, 'হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত/পূজা ক'রোনা। সে আল্লাহর অবাধ্য। (কুরআন। সুরা মারয়াম ঃ ৪২-৪৩)।' জবাবে পিতা বললেন, 'তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ হচ্ছো? যদি তুমি এ সব থেকে নিবৃত্ত না হও, আমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে তোমাকে হত্যা করব। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।' ইব্রাহীম পিতার কাছ থেকে সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। (মারয়াম ঃ ৪৬)

বিদায়কালে তিনি তাঁর স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আমার গোটা সত্তাকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করলাম, যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই (সুরা আনআম ঃ ৭৯)।'

এরপর তিনি দেব-দেবী মন্দিরে গমন করলেন, বললেন, '(হে দেব-দেবীগণ) তোমরা খাচ্ছনা কেন? তোমাদের কি হয়েছে ? তোমরা কথা বলছ না কেন? অতঃপর তাদের উপর সবলে কুঠারাঘাত করে সব দেব-দেবী মূর্তি চূর্ণ -বিচূর্ণ করে ফেললেন।' (সুরা সাফফাত ঃ ৯১-৯৩)

কারণ পুতুল দেবতার আত্মরক্ষার কোন ক্ষমতা নেই। সংস্কৃতে 'পরশু' মানে কুঠার। পরশুরাম কুঠারধারী দেবতা। তাই নাম পরশুরাম। নামান্তর-ভৃগু রাম। ভৃগু রাম মানে, ভৃগু বংশীয় রাম (ভার্গব)। দেবাদিদেব শিবের তপস্যা করে আশীর্বাদ সূত্রে এই ভয়াবহ পাশুপাত অস্ত্র পরশু লাভ করেন (পাশুপাত অস্ত্র মানে, মহাদেবের আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত)। হিন্দু শাস্ত্রীয় গায়ত্রী মন্ত্রে ভার্গদেবের বন্দনায় বলা হয়,

ওঁৎ সবিতৃ বরেণ্য ভর্গদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো জোন প্রচোদয়েৎ।

ভর্গ দেব হলেন সূর্য দেব, ভার্গব (ভৃঁগু) হলেন তাঁর মানসপুত্র।

আবার ইব্রাহীমের কাহিনীতে আসি।

ইব্রাহীম আল্লাহর নবী/প্রেরিত পুরুষ। তাঁরই বিশেষ নির্দেশে কুঠার (অস্ত্রের) সাহায্যে মন্দিরের সকল দেব-দেবী মূর্তি ধ্বংস সাধন করে অস্ত্রখানি (কুঠার) মন্দিরের সর্ববৃহৎ দেবমূর্তির গলায় ঝুলিয়ে রেখে গোপনে বেরিয়ে গেলেন। উৎসবের দিন সকলে উৎসবে মত্ত থাকায় ব্যাপারটি কেউ লক্ষ্য করেনি। পরদিন ভোরে সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল।। কুরআনে ইব্রাহীমের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

'মূর্তিগুলো কে ভেঙ্গেছে? 'জিজ্ঞেস করলে ইব্রাহীম বললেন, 'ওকে জিজ্ঞেস কর সব বলতে পারবে। ও তো সব দেখেছে'। সকলে এক বাক্যে সাক্ষ্য দিল, ইব্রাহীম নাস্তিক এ কাজ ওর ছাড়া আর কারো নয়। মূর্তি কি কথা বলতে পারে, না দেখতে পারে? বিচারে ইব্রাহীমের অপরাধ সাব্যস্ত হল। সকলেই ইব্রাহীমকে মূর্তিভংগকারী

বিদ্রোহী নাস্তিক বলে সাব্যস্ত করল। তাঁর কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা হল। ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হ'ল। ইব্রাহীমকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হ'ল। কিন্তু কি আশ্চর্য! ইব্রাহীম অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলেন। ইব্রাহীম অগ্নি-বিজয়ী/মৃত্যুঞ্জয় হলেন। আগুনে কি আগুন পোড়ে? ঘটনাটি সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে বলা হয়েছে– আল্লাহ বললেন,

কুলনা ইয়া নারো কুনী বরদাও
ওয়া সালামান আলা ইব্রাহীম।
(২১ ঃ ৬৯)

আমরা বললাম, 'হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা হও, ইব্রাহীমকে শান্তি দাও'।

আবার ভৃগুর প্রসংগ।

ভৃগু তাঁর পাশুপাত অস্ত্রের (পরশুর) সাহায্যে সমকালীন ক্ষত্র–সমাজকে একে একে একুশ বার নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। এই ক্ষত্রীয়গণ তাঁর পিতৃহত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। কিন্তু ভৃগুও অন্যায়ভাবে ক্ষত্রীয় ধ্বংসে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং এই অন্যায়ভাবে ক্ষত্রীয় নিধনে পাশুপত অস্ত্র ব্যবহার করার অপরাধেই অন্যতর অবতার রঘুরাম/ রঘু বংশীয় বীর অবতার রামচন্দ্রকে প্রেরণ করা হ'ল। রামচন্দ্র ছিলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ভৃগু শক্তিমদে মত্ত হয়ে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করায় রামের হাতে পরাজিত ও নির্বীর্য হয়ে পড়লেন। বিধাতা সীমা লংঘনকারীদেরকে কখনও ক্ষমা করেন না। ইতোপূর্বে ভৃগু ভগবান বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাতও করেছিলেন। এবং শেষে ক্ষত্রীয় সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও সীমা লংঘন করার জন্যই তাঁর উপর দেবরোষ পতিত হয়েছিল; সে রোষে তিনি ভষ্মিভূত হয়েছিলেন বলা যায়। পক্ষান্তরে সত্যসন্ধ/ মর্দে মুমিন ইব্রাহীম বিজয়ী হয়েছিলেন।

মুসলিম ঐতিহ্যে ইব্রাহীম ছিলেন মিথ্যা দেবমূর্তি ভংগকারী। ফলে মহাশক্তিশালী নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, হযরত ইব্রাহীমের কাহিনী প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রেও সত্য-কাহিনী। আল্লাহর কালাম/ ওহী. দৈববাণী/ অপৌরাহি তাই কখনও মিথ্যা হতে পারে না। আল কুরআনের দাবী–

১) "আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন (৪ ঃ ১২৫)"

২) "ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।
সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (৬ ঃ ১৬১)।"

৩) "তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না ? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও হত তবে তারা তাতে নিশ্চয়ই অনেক অসংগত কথা পেত (৪ ঃ ১৪৬)।"

৪) "এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের (তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদির) সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে আমি তোমার প্রতি (হ.মু.) সত্যসহ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি (৫ ঃ ৪৮)।"

হযরত ইব্রাহীমের কাহিনীও তার ব্যতিক্রম নয়। কবি আল্লামা ইকবালের উক্তি,

বুৎশিকনী উঠ গ্যেয়ে হায়
জো রহে ওয়ো বুৎগার হায়।
থা বিরহিম পেদর ওয়া
পেছর আজর হায়॥

মানে,
মূর্তি নাশক নাহি কেহ আর
বাকি যারা সব মূর্তিকর,
আজর আবার জনমিল পুনঃ
হয়ে ইব্রাহীমের বংশধর।

[মোহাম্মদ সুলতান। শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া(অনুবাদ)]

আরও কৌতূহলের ব্যাপার, তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও দেখা যাচ্ছে– হযরত ইব্রাহীম ছিলেন সমকালীন মানব-জাতির আদি পিতা (আব্রাহাম)। আরবীতে ইব্রাহীম হলেন ইসরাঈল বংশেরও আদি পিতা (আবীকুম ইব্রাহীম), হিব্রু ভাষায় আব্রাহাম (Abraham) অর্থও সকল জাতির আদি পিতা (Father of Nations), সংস্কৃত ব্রহ্মা (ব্রহ্ম) মানেও তাই। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভারতীয় তথা বিশ্বলিপি জননী 'ব্রাহ্মী' লিপিকেও ব্রহ্মা সৃষ্ট লিপি নামে অভিহিত করা হয়। এই ব্রহ্মা মানব ব্যতীত নয়। মানবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ব্রাহ্মণ্যবাদী জনগণের আদি পিতা ব্রহ্মা। য়িহুদী জাতির আদি পিতা 'যুদাহ' (Judah) গ্রীক Jews ও ছিলেন ইসরাঈল তথা ইব্রাহীমী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ (তুং হিন্দু যদু বংশীয়–যাদব/ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ। এরই একটি শাখা হিব্রু/ শূদ্র অস্পৃশ্য জাতি নামে বহুকাল নিগৃহীত জীবন যাপন করেন। এই হিব্রু ভাষার নামান্তর ইব্রানী সম্ভবত ঃ ইব্রাহীমী (ইব্রীয়)।

ইব্রানী/ Hebrew উভয় নামের ব্যুৎপত্তি ঘটে ইব্রাহীম নাম থেকে। এই হিব্রু জাতির উদ্ধারের জন্য বীর নবী মুসার আবির্ভাব (তুং হিন্দু জাতি)। সবচেয়ে কৌতূহলের ব্যাপার, সামবেদে ওঁ/ মন্ত্রের মূলে যে তিনজন দেবতার নাম জড়িত, তাঁরা হলেন–ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সংক্ষেপে–'ওঁ'। (অ+ উ+ ম= ওঁ)। ইসলাম মতে, এটি হল ইসলামেরও বীজমন্ত্র 'বিসমিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। অর্থ- সৃষ্টিপতি আল্লাহ, রহমান ও রাহীম। সৃষ্টিকর্তার তিনটি গুণনাম। পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের কল্যাণে এই তিনটি নাম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ (হিন্দু ভাষায় যাকে নারায়ণ বলা হয়েছিল) একাকার হয়ে - একে তিন, তিনে এক- নারায়ণ হয়ে পরে বৌদ্ধ মতে 'নিরঞ্জনে' এসে দাঁড়িয়েছিল। এটি আদৌ বহু দেববাদী ছিল না। তুং মধ্যযুগীয় মুসলিম কবির ভাষায় – নিরঞ্জন এক আল্লায় পরিণত হয়েছেন।

এক আল্লাহ নিরঞ্জন যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ সনাতন

ইনি এক ও অদ্বৈত (আল্লাহ = নারায়ণ)।

পরিশেষে এক প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত রেখে আলোচ্য প্রসংগটির সমাপ্তি ঘোষণা করা যাচ্ছে। সে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। প্রথম গৌড় বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আলাউদ্দীন আলী মর্দান খালজী তখন তখত্‌নশিন (১২১০-১২১২ খ্রীঃ)। কামরূপ থেকে 'ভাজের ব্রাহ্মণ' (সম্ভবতঃ কম্বোজ/ (Combodia) এলেন ধর্ম সম্পর্কিত বাহায/ বিতর্ক করতে। গৌড়ের বড় ইমাম হযরত রুকনউদ্দীন আবু হামিদ সমরখন্দী তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। কথা হল পরাজিত হলে পরস্পর পরস্পরের ধর্মগ্রহণ করবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরাজিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে যে কথা-বার্তা হল তা সংক্ষেপে এই –

ব্রাহ্মণ–আপনাদের নবী কে?

কাজী সাহেব– হযরত মুহম্মদ (সঃ)। তিনি সর্বশেষ আল্লাহর নবী ছিলেন।

ব্রাহ্মণ - হাঁ, আমি বিশ্বাস করলাম।

আবার বললেন, 'ইনি কি সেই মুহম্মদ, যিনি 'রুহ'/আত্মা কি? এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'আত্মা আল্লাহর একটি আদেশ/ 'আমর' মাত্র'?

কাজী সাহেব– হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

ব্রাহ্মণ-'আমাদের প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রেও তাঁর নাম পেয়েছি। সেই সংগে আরও দু'জন ইব্রাহীম নবীর নাম পেয়েছি (যথাক্রমে ইব্রাহীম ও মুসা)'। প্রসংগত উল্লেখ্য, ইব্রাহীম ও মুসার কথা আল কুরআনেও পর পর উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত ঃ এটি কুরআনের সুরা 'আলা'র নিম্নলিখিত আয়াতটি হবে – 'ফী সুহুফে ইব্রাহীম ওয়া মুসা (সুরা আলা ঃ ১৮-১৯)'। মানে, পূর্বতন নবী ইব্রাহীম ও মুসার কিতাবে/ সহীফাতে এ কথা আছে। 'সহীফা' হিন্দু ভাষায় 'সংহিতা' (তুং মনু সংহিতা)। উল্লেখ্য, আল কুরআনে আত্মা সম্পর্কিত আয়াতটি হল এই– "ইয়াস আলু নাকা আনের রূহ-ই। কুলির রূহ মিন আমরে রাব্বী। অমা উতিকুম মিনাল ইলমি ইল্লা কালীলা

(সুরা 'বনী ইসরাঈল' ঃ ৮৫)।

মানে, তারা তোমাকে রূহ/আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তুমি বল, আমার প্রতিপালকের আদেশই আত্মা। এবং তোমাদের তার জ্ঞান থেকে অতি সামান্য অংশই দান করা হয়েছে।

এ থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, য়িহুদী-খ্রীষ্টান ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেই আল্লাহর কিতাব/ কালামের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য মিলছে।

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, আমি নর সৃষ্টির গোড়াতেই আমার রূহকে তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছি 'নুফিকতু ফীহে মিররূহিহি।

এরপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইসলাম কবুল করলেন। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিখ্যাত সুফীতত্ত্ববিদ দার্শনিক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। কথিত আছে, ইনি হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের বিখ্যাত 'অমৃত কুণ্ড' গ্রন্থের যথাক্রমে আরবী ও ফারসী তরজমা করে প্রচার করেন বা করান। এবং তার নাম হয়–'হাউজ-উল-হায়াত ও 'বাহারুল হায়াত'। মানে, আব-ই-হায়াত/জীবন বারি(অমৃতের সাগর)। এ সাগরে যে স্নান করে, সে অমর হয়। মুসলিম সুফী সমাজে অমৃত কুণ্ডের কদর হয়েছিল। বলা বাহুল্য, হিন্দু উপনিষদেও এই অমৃতের সন্ধান মেলে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, আখেরী নবী/শেষ নবী রসুলুল্লাহর পূর্ববর্তীকালেও আল্লাহর কিতাব/ কালাম অবতীর্ণ হয়েছিল। কালে কালে অনবধানতা বা অজ্ঞতার কারণে তার অনেক বিকৃতিও ঘটেছিল, কুরআনে তার সংশোধনীও দেওয়া হয়েছিল। তাই কুরআনে নেই, এমন বাণী পেলেই তাকে ভ্রান্ত বলতে হবে, এমন কথা যথার্থ নয়। পবিত্র কুরআনেই পাই– (আল্লাহ বলেন,)'এ কিতাব (কুরআন) মুসার কিতাবের সমর্থক (৪৬ঃ১২), তবে তার ভাষা আরবী' (ঐ পূর্বোক্ত)। আরও কথিত আছে, বিশ্ব বিখ্যাত সুফী পণ্ডিত (হিস্পান/স্পেন দেশীয়) ইবনুল আরাবী অমৃত কুণ্ডের একটি আরবী তরজমা পেশ করেন এবং সেই থেকে ইসলামে হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রীয় সর্বেশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনা (১১৬৫–১২৪০খ্রী) প্রবেশ করে। ইবনুল আরাবীর এই বিশেষ দার্শনিক মত ফারসীতে 'হামাউস্ত'/ 'আনাল হক' দর্শন নামে পরিচিত হয়। আনাল হক মানে আমি খোদা (নই)–'আমি সত্য'। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ইবনুল আরাবীর এই বিশেষ দর্শন শংকরাচার্যের সর্বেশ্বরবাদেরই (অদ্বৈতবাদ) নামান্তর (দ্র. সাংস্কৃতিকী, কলি, ১৯৬১)। অবশ্য ইসলামে এই মতবাদ নিয়ে বহু বাদ–বিতণ্ডার সৃষ্টি হলেও পরে প্রমাণিত হয়েছে, –এই মতবাদ ইসলামে এক সমন্বয়ী দর্শন-চিন্তার উদ্ভব ঘটালেও ইবনুল আরাবীর দর্শন চিন্তা ইসলাম বিরোধী ছিল না। এমন কি তা শংকরাচার্যের দর্শনের অনুসারীও নয়। আল কুরআনের মূল তৌহিদ-চেতনা বিরোধীও নয়। কৌতূহলের ব্যাপার, ঊনিশ শতকের বিখ্যাত ব্রাহ্ম–নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও শংকরাচার্যের দার্শনিক চিন্তার প্রতিবাদ করেছেন (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মচরিত। কলি. ১৯৬২। পৃ. ৩০০)। এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য–কবি আব্দুল কাদির বিরচিত, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকঃ স্মারক বক্তব্যমালা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪। পৃ.৯১–৯৪।

এবার শেষ করি, মূল বক্তব্যে আসি। আলোচ্য ভৃগুরাম/পরশুরাম, রঘুরাম, ইব্রাহীম এমন কি সুফী দার্শনিক 'ইবনুল আরাবী' এঁদের মধ্যে প্রকৃত বিদ্রোহী কে? বিদ্রোহী কবিতার কবি তো নিজেকে 'পরশুরামের কুঠার' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি বলেছেন তিনি? বলেছেন,

আমি সহসা আমারে চিনেছি,
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

এতো বিদ্রোহের কথা নয়, আত্মোপলব্ধির কথা এবং আত্মোপলব্ধি তো ধর্ম দর্শনের মূল কথা।

মান আরাফা নফসাহু ফাকাদ আরফারব্বাহু।

মানে, যে নিজেকে চিনেছে সে খোদাকেও চিনেছে।

তিনি অন্যত্রও বলেছেন,

বিদ্রোহী করেছে মোরে
আমার গভীর অভিমান,

তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন
উচ্ছৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার
তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ
বিদ্রোহী করেছে মোরে
আমার গভীর অভিমান।

এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অভিমানী ভক্ত কি কখনো বিদ্রোহী হতে পারে? তাই বলতে বাধা নেই, নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় সত্যকে হারানো নয়-বিশেষ করে পাওয়ার বিদ্রোহ, সত্যের অনুরোধেও এ কথা বলতে হবে।

শেষ কথা, কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় শেষ করা যায়- ঝগড়া বেধেছে-

মানুষে মানুষে ধর্মে ধর্মে নয়।

মূল ধর্ম একটিই এবং তা হল-তৌহিদ/ এক আল্লাহ ছাড়া দুই নেই,—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (সঃ) একমেবাদ্বিতীয়ম। There is no God but God Jehoba (YAHUA) হাঁ তিনিই ইত্যাদি এবং 'বহুত্ববাদে' (যাকে সংক্ষেপে নাস্তিকতা/জড়বাদ বলে)।

তৌহিদ আর বহুত্ববাদে
বেঁধেছে আজিকে মহাসমর
লা শরিক এক হবে জয়ী
কহিছে আল্লাহু আকবর,
মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে
অন্ধকারের এ ভেদ জ্ঞান
'অভেদ' 'আহাদ' মন্ত্রে টুটিবে
মানুষ হইবে এক সমান।

(নজরুল ইসলাম 'মহাসমর' কবিতা। ১৯৪৭, সওগাত, কলিকাতা, মহাসমর বিশেষ সংখ্যা)।

আল্লাহ আমাদের বুঝবার শক্তি দিন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : নজরুলের প্রেরণা

এম আর আখতার মুকুল

আমরা প্রায়শই 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ' এই দু'টি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সত্যিকারভাবে বলতে গেলে এ দু'টির মধ্যে অর্থের কিছুটা 'ফারাক' বিদ্যমান। অবশ্য 'স্বাধীনতাযুদ্ধ' এবং 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দ দু'টি হচ্ছে একে অপরের সম্পূরক। গবেষকদের মতে মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা হয়েছে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রথম ভাষা আন্দোলন থেকে।

এরপর কয়েক দশক ধরে অত্র ভূখণ্ডের শোষিত জনগোষ্ঠির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে একটার পর একটা যে সব বিক্ষোভ, আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান ও রক্তাক্ত যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে – সবই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের এক বিরাট ও বিশাল প্রক্রিয়ার অংশ বিশেষ। আজও পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। উপরন্তু গত অর্ধ শতাব্দী ধরে অত্র ভূখণ্ডে সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সর্বাত্মক আন্দোলন চলছে, সেটাও এই মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। মোদ্দা কথায় বলতে গেলে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর এই মুক্তিযুদ্ধের একটা উজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে ১৯৭১ সালের ৯ মাসব্যাপী স্বাধীনতাযুদ্ধ।

এজন্যই বলতে হয় যে, বাংলাদেশের বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধ এখনো অসমাপ্ত। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা ভৌগোলিক স্বাধীনতা লাভ করেছি; কিন্তু আজও পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে একথা বলতে হয় যে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রায় ২১ বছর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। এখানেই শেষ নয়। খন্দকার থেকে খালেদা পর্যন্ত ২১ বছর সময়কালে ক্রমাগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের 'বাঙালি' জাতিসত্তার পরিচয়কে 'বাংলাদেশী' করার ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি এবং রাজাকার, আলবদর ও আল্ শামস্‌দের রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। সর্বোপরি এরই জের হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মৌলিক আদর্শ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আর পাকিস্তানপন্থী স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি পুনরায় রাজনীতি করার অনুমতি

লাভ করেছে। ফলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়েছি এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি ও ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হয়েছে।

এদিক থেকে পর্যালোচনা করলে একথা বলতেই হয় যে, দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের সাধারণ নির্বাচন ফলাফল হচ্ছে ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সূচনা। কেননা এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি আবার ক্ষমতাসীন হয়েছে। ফলে বন্ধ্যত্বের অবসানে পুনরায় শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত পথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই। আর এসব লড়াই-এ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান হচ্ছে আমাদের বড় প্রেরণা এবং শাণিত তরবারি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি নজরুলের কবিতা ও গান কি ধরনের এবং কতটুকু প্রেরণা যোগাতে সক্ষম হয়েছে?

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কর্মকাণ্ড এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আমলে। উপরন্তু ধর্মের ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার বছর পাঁচেক আগেই ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই তারিখে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অথচ এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তাঁর রচিত কবিতা ও গান সে আমলে সাধারণ মানুষকে যেভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরীক হতে উৎসাহিত করেছিলো; ঠিক একইভাবে পাকিস্তান ঔপনিবেশবাদের আমলেও নজরুলের কবিতা ও গান পূর্ববাংলার আপামর জনগোষ্ঠিকে পাকিস্তানের শোষক ও শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধেও একটার পর একটা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলো। ইংরেজ আমলে নজরুলের লেখনীতে যেভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলো; ঠিক একইভাবে পাকিস্তান আমলেও নজরুলের কবিতা ও গানের মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলবাদীদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিলো। অবশ্য এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর উচ্চারিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগান মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলো। নজরুলের কবিতা ও গান ছিলো সহায়ক শক্তি। সর্বোপরি এ কথাটা বলতেই হয় যে, সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই-এ যুগে যুগে নজরুল সাহিত্য হচ্ছে মোক্ষম হাতিয়ার।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭১ সালের ৯ মাসে স্বাধীনতাযুদ্ধ সমাপ্ত হলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত পথে অসমাপ্ত

মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে নজরুল-সাহিত্যের উপাদানগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রেরণার উৎস। কিন্তু কিভাবে?

প্রথমেই অবিভক্ত বাংলার দু'জন মনীষীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে। এঁদের একজন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রায় সাত দশক আগেকার কথা। ১৯২৯ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলীকে সভাপতি করে কোলকাতায় গঠিত হয়েছিলো 'নজরুল সম্বর্ধনা সমিতি'। এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে 'সওগাতে'র মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এবং 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস। এ বছরের ১৫ই ডিসেম্বর কোলকাতার 'আলবার্ট' হলে এই সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিলো। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি সভাপতির ভাষণে বললেন,

> ... আজ আমি এই ভেবে আনন্দ অনুভব করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি– বাঙালির কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃস্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতি তাঁকে শুধু বাঙালি রূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু; কিন্তু নজরুল তা' নন। কারাগারের শৃংখল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

এরপর অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন এস. ওয়াজেদ আলী। এই অভিনন্দনপত্র অত্যন্ত সংক্ষেপে নজরুল প্রতিভার মূল্যায়ন করা হলো। এতে বলা হলো যে,

> ... ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা বিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।

সেদিন এই অনুষ্ঠানে অনির্ধারিত বক্তা হিসেবে ভাষণ দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নজরুল সাহিত্যের প্রেরণা সম্পর্কে সেদিন শ্রীবসুর মূল্যায়ন ছিলো সঠিক ও যথার্থ। তিনি বললেন,

> ..... কারাগারে আমরা অনেকেই যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বোঝা যায় যে, তিনি একজন প্রাণবন্ত মানুষ। তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না। নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় — এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব— তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণমাতানো গান শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয় — সমগ্র বাঙালি জাতির।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্যের সবটুকু নয় —আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলা যায়। কেননা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঘটনা পরম্পরায় ইংরেজরা চলে যাওয়ার সময় রাঢ়বঙ্গের বঙ্গভাষীরা নিজেদের পৃথক সিদ্ধান্তে অবাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেছে এবং তাঁদের নতুন পরিচয় হয়েছে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে। তাঁদের জাতীয়তা হচ্ছে ভারতীয়। অন্যদিকে অবিভক্ত বাংলার বৃহৎ অংশ অর্থাৎ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার আদি বাঙালি জনগোষ্ঠির আবাসভূমির নামকরণ হলো 'পূর্ব বাংলা' এবং এই অঞ্চল 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলো। অবশ্য এই নতুন রাষ্ট্রে বাঙালি জনগোষ্ঠিরই হলো সংখ্যাধিক্য।

এরপরেও একটা 'কিন্তু' রয়ে গেলো। ইংরেজ রাজত্বের অবসানে নবগঠিত 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রে পূর্ববাংলায় বসবাসকারী সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠী যেটাকে 'সোবেহ্ সাদেক' অর্থাৎ ভোরের আলো মনে করেছিলো, আসলে তা' সোবেহ্ সাদেক ছিলো না— সেটা ছিলো 'সোবেহ্ কাজের', অর্থাৎ অন্ধকারের সূচনা। অচিরেই বাঙালিরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, তারা উপনিবেশবাদের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক 'বিশ্বাসঘাতক' রাজনীতিবিদের সক্রিয় সহযোগিতায় পাকিস্তানের শাসকবর্গ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বাঙালি জনগোষ্ঠির উপর রাজনৈতিক বশ্যতা ও অর্থনৈতিক শোষণের জগদ্দল পাথরকে চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে। এরই অংশ হিসেবে প্রথমেই বাঙালিদের ভাষার অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রতিবাদ জানালেন কুমিল্লার সন্তান শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঢাকায় ছাত্র সমাজ তখন দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ। সমগ্র পূর্ববঙ্গে ১১ই মার্চ পালিত হলো 'প্রতিবাদ দিবস' হিসেবে। এটাই হচ্ছে বাংলাভাষা আন্দোলনের প্রথম দফা। সেদিন বাংলা ভাষার দাবীতে ঢাকার রাজপথে বিক্ষুব্ধ ছাত্র মিছিলে যাঁরা নেতৃত্বদান করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন তিনি দিন কয়েকের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এটা ছিলো পাকিস্তানী জামানায় তাঁর প্রথম কারাজীবন। তিনি দমবার পত্র নন। মুক্তিলাভ করেই তিনি ২১ শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র বক্তেব্যের প্রতিবাদ জানালেন। আসলে মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা এখান থেকেই।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন দেয়ায় শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন। তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি হলো। এবছরই ঢাকায় একটা ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় মিছিল

থেকেই তিনি গ্রেফতার হলেন। এরপর পাকিস্তানের ২৩ বছরে যতগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে, শেখ মুজিব বার বার সেসব আন্দোলনে গ্রেফতার ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর মোট কারাজীবন হচ্ছে প্রায় ১২ বছর ১১ মাসের মতো। এমনকি তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দুই দুইবার ফাঁসির আসামী পর্যন্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক অকুতোভয় ও নির্লোভ ব্যক্তিত্ব। কারাগারে সমস্ত রকমের দুঃখকষ্ট তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন।

সেক্ষেত্রে শেখ মুজিব তাঁর ইস্পাতকঠিন মনোবলের অধিকারী হলেন কিভাবে? শুধুই কি হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রভাব?

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মনের প্রশান্তির জন্য রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীত ছিলো শেখ মুজিবের সম্বল। আর স্বীয় মনোবল বৃদ্ধি এবং অনুপ্রেরণার উৎস ছিলো নজরুল কাব্য সম্ভার। কারাগারের নির্জন কক্ষে তিনি স্বৈরাচারের অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করার সাহস সঞ্চয় করলেন। রবীন্দ্রকাব্যে তিনি পাঠ করলেন মৃত্যুঞ্জয়ের অভয় বাণী।

এরই পাশাপাশি নজরুলের কাব্য পাঠ করে শেখ মুজিবের মনমানস দেশপ্রেমের ফল্গুধারায় আপ্লুত হলো। তিনি উজ্জীবিত হলেন বিপ্লবের বহ্নিশিখায়। কারাগারে বসেই তিনি প্রতিনিয়ত একাকী গাইতেন 'বিষের বাঁশী' আর 'ভাঙার গান' – 'এই শিকল পরা ছল গো মোদের, শিকল পরা ছল' আর 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করতেন 'সর্বহারা' এবং 'অগ্নি-বীণা'র কবিতা। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার/ লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!' আর সেই অমর বাণী,

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এই কথাগুলো বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পাকিস্তানের তেইশ বছরের রাজনীতিতে শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানী যেখানে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ছিলেন অসমাপ্ত; সেখানে সফল নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অকুতোভয় ও নির্লোভ চরিত্র কিভাবে পূর্ণতা লাভ করলো, সেটা বোঝবার জন্যই আলোচ্য বিষয়গুলোর অবতারণা করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ডিক্টেটর আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমলেই ১৯৬১ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে ভাসানী-মুজিব জুটির নেতৃত্বে ১৯৪৮ সাল থেকেই গণমানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াই অর্থাৎ সার্বিক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলেও ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের পর থেকে বছর কয়েকের জন্য মওলানা সাহেব প্রগতিশীলদের ভিন্ন মঞ্চে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলনে শরীক হতে পারেননি। কিন্তু ঊনসত্তরের আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা ভাসানী জাতীয়তাবাদী শক্তির গার্জিয়ানের ভূমিকা পালন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন কারাগারে ফাঁসির আসামী।

তবে এর পাশাপাশি একটা কথা বলতেই হয় যে, পাকিস্তানের তেইশ বছরে অর্থাৎ যে সময়কালকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে সময় সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো একটার পর একটা যেসব আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তাতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র ও যুব সমাজ। ভাসানী-মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এঁরাও প্রতিটি আন্দোলনে স্বৈরাচারী পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছে; এবং লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও গুলির মোকাবেলা করা ছাড়াও হাজার হাজার কারাবরণ করেছে। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত কোথাও এর সামান্যতম ছন্দপতন পর্যন্ত হয়নি।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে এ ধরনের কঠোর ও আপোষহীন মনোবল সৃষ্টি হলো কিভাবে? গবেষণা করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়কালে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি এতদাঞ্চলে এই বছরগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীতকে ভিত্তি করে। রবীন্দ্র দর্শনের ভাবধারা যেমন সে আমলে আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলো; তেমনি বিদ্রোহী কবি নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীত এঁদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা ছাড়াও আপোষহীন সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিলো। নজরুল জীবনের প্রেমও তো' উদ্দাম, উচ্ছল ও বাঁধনহারা! উপরন্তু তাঁর লেখনীতে সর্বহারার জয়গাথা।

জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান।

এসব কিন্তু সেদিন আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। এঁদের কাছে অকুতোভয় শেখ মুজিব ছিলো তারুণ্যের প্রতীক আর প্রতিবাদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর।

গবেষকদের মতে পাকিস্তানের তেইশ বছরে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যখন ভাসানী-মুজিবের নেতৃত্বে ছাত্র ও যুব সমাজ পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, তখন এঁদের মোকাবেলায় সরকারী ছত্রচ্ছায়ায় ধর্মীয় মৌলবাদী নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ একটাই এবং তা' হচ্ছে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠি ধর্মভীরু নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁরা ধর্মান্ধ নয়। এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠি ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের অভিজ্ঞতার জের হিসেবে ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলো। অত্র ভূ-খণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনী ফলাফল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এক্ষণে পাকিস্তানের মতো একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে কোন্ প্রেক্ষাপটে এবং কিভাবে অত্যন্ত সন্তর্পণে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের দর্শনের বিস্তৃতি লাভ করলো, তা' পর্যালোচনা করা অপরিহার্য মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইংরেজ আমলে গবেষকরা যে পরিধি নির্ণয়পূর্বক বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দান করেছিলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতীয়তাবাদ সেটা থেকে বেশ কিছুটা ভিন্নতর। আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাঢ়বঙ্গে বঙ্গভাষীরা ১৯৪৭ সালে স্বীয় সিদ্ধান্তে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য বাঙালি মুসলমানদের তুলনায় ওঁরা ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে অবাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহুবর্ণের ভারতীয় জাতীয়তাকে বরণ করে নিয়েছে। ওঁরা বঙ্গভাষী নিশ্চয়ই কিন্তু বাঙালি নন। ওঁদের জাতীয়তা ভারতীয়। যেমন নিউজিল্যাণ্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের মাতৃভাষা ইংরেজী হওয়া সত্ত্বেও ওঁরা ইংরেজ নয় — ঠিক তেমনিভাবে ওপার বাংলার জনগোষ্ঠির মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও ওঁরা ভারতীয়। এটাই হচ্ছে বর্তমান শতাব্দীর এক চরম 'ট্রাজেডি'। ওঁরা চিন্তাও করতে পারেন নি যে, প্রথমে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান এবং মাত্র ২৩ বছরের 'ফারাকে' একটা রক্তাক্ত যুদ্ধে 'পাকিস্তান' খণ্ডিত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হবে।

এটা কেমন করে সম্ভব হলো? এক কথায় বলতে গেলে বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং আন্দোলন ও আত্মদানের ফসল হচ্ছে এই বাংলাদেশ। হিসাব করলে দেখা যায় যে, 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রে বাঙালিরা সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে যখন কেবলমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেলো, তখন প্রথম ভাষা আন্দোলনের মাঝ দিয়ে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সঞ্চার হলো। ১৯৫২ সালে যখন পুনরায় শুধুমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো, তখন বায়ান্নর রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের দরুণ সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো জোরদার হলো। এই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে। ক্ষমতাসীন সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগ কার্যতঃ পূর্ববঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এরই জের হিসেবে যখন ১৯৫৫ সালে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র নাম

পরিবর্তন অন্তে ধর্মনিরপেক্ষ 'আওয়ামী লীগ' করা হলো, তখন পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সূচনা পর্ব। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতাই হচ্ছে, জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব শর্ত।

এরই পাশাপাশি পঞ্চাশ দশকে আওয়ামী লীগের মঞ্চ থেকে যখন কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপিত হলো, তখন জাতীয়তাবাদের দাবী হলো সুপ্রতিষ্ঠিত। এরই মোকাবেলায় আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। যেটুকু গণতন্ত্র অবশিষ্ট ছিলো, তার সমাধি রচিত হলো। তখন চারদিকে ভয়াবহ দমননীতির স্টীমরোলার। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলো। কিন্তু তথাকথিত গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে দীর্ঘ ৪৪ মাস পরে ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে পূর্ব বঙ্গের জাতীয়তাবাদী শক্তি আবার প্রতিবাদমুখর হলো।

১৯৬৫ সালে ১৭ দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় রাজনীতির পুরা চেহারাটাই বদলে গেলো। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্ব শাসনের দাবী থেকে আরো একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করলেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা। তাঁর হৃদয়ে তখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অভয় বাণী – 'বাংলার জয় হোক ; বাংলা বাঙালির হোক।' এরই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার বাঙালি জনগোষ্ঠির জন্য উচ্চারণ করলেন নতুন শ্লোগান – 'জয় বাংলা।' অচিরেই পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হলো এই শ্লোগান। 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত পূর্ব বাংলার প্রান্তর। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের একাকী নেতৃত্বে পরিচালিত হলো ৬ দফা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনে যার জন্ম হয়েছিলো, মাত্র দুই দশক সময়কালের মধ্যে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো।

এরপরের ইতিহাস সবারই জানা। বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার লক্ষ্যে দায়ের করা হলো তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই হলো বুমেরাং। পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠির হৃদয়পটে তখন স্বাধীনতার হাতছানি। তাই 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন'– কথাটা পূর্ব বাংলায় তেমন কোনো জনমত গঠন করতে ব্যর্থ হলো। বরং শুরু হলো আইয়ুব বিরোধী রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থান। তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক করেও আর কোনো ফায়দা হলো না। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৬ দফা দাবীতে অটল রইলেন। ফলে ১৯৬৯ সালের ২৪ শে মার্চ ডিক্টেটর আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হলেন।

এবার ক্ষমতায় এলেন আরেক সামরিক ডিক্টেটর জেনারেল ইয়াহিয়া খান । পশ্চিম পাকিস্তানকে শান্ত করার জন্য তিনি এক ইউনিট ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিলেন।

আর পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে 'এক মাথা এক ভোট' এর ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেন। ফলে প্রস্তাবিত ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদের পূর্ব বাংলার হিস্যা দাঁড়ালো ১৬২+৭ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৩৮+৬ জন সদস্য। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য প্রয়োজন হলো ১৫৭ টি আসনের। সত্তরের নির্বাচনে প্রতিটি জনসভায় বঙ্গবন্ধু উপস্থাপিত করলেন তাঁর ৬ দফা দাবী আর ব্যাখ্যা করলেন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার বাঙালি জাতীয়তাবাদের মর্মবাণী। তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' মানে 'ধর্মহীনতা' নয়। ফলে ধর্মীয় দলগুলোর ফতোয়া আর বামপন্থীদের নানা তত্ত্বকথা কিছুই কাজে আসলো না। জনগণের রায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে। আওয়ামী লীগ ১৬০+৭ একুনে ১৬৭টি আসন লাভ করলো।

সামরিক জান্তা প্রমাদ গুণলো। নানা বাহানায় ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু হলে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেদিনের তারিখটা ছিলো ২৬শে মার্চ। নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং ৯১ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য তখন যুদ্ধবন্দী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৩ বছরের স্বপ্ন হলো সার্থক।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে আমরা নজরুলের কবিতা ও গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই পর্বে সময়ের প্রয়োজন হয়েছিলো প্রায় তেইশ বছর। এরপর মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও আমরা নজরুল সঙ্গীতের কথা ও সুরের মূর্চ্ছনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছি এবং অকুতোভয়ে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এজন্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শুরুটা হয়েছিলো বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে। বাংলা ১৩৭৮ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ইংরেজি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মে রোজ মঙ্গলবারে। এদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে টেপে ধারণকৃত প্রথম যে সঙ্গীত প্রচারিত হয়েছিল সেটাই হচ্ছে নজরুলের অমর সঙ্গীত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু ...' এরপর আরো যেসব নজরুল-গীতি প্রচারিত হলো সেগুলো হচ্ছে, 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায়, হেরিনু পল্লীজননী,' 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, আমার দেশের মাটি', 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট' এবং 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' প্রভৃতি গান।

শেষ অবধি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় হলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। গণতান্ত্রিক বিশ্বের ক্রমাগত চাপে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি ফিরে এলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এবং মাত্র ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বাঙলাদেশের জাতীয় জীবনে তখন পর্বত প্রমাণ সমস্যা। বঙ্গবন্ধু সরকার অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করলো।

দেশকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন ছাড়াও বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় ফল-ফুল ইত্যাকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়াও কবির রচিত 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গীত হিসেবে মর্যাদা দান করলেন। এখানেই শেষ নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসুস্থ কবির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও শুশ্রুষার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৭২ সালের ২৪ শে মে তারিখে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসে পৌছালেন। সরকার জাতীয় কবির সেবা-শুশ্রুষা এবং আহার-বাসস্থান সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করলো।

নিয়তির পরিহাসই বলতে হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে ষড়যন্ত্রকারীদের হামলায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার সময় বিদ্রোহী কবি ঢাকার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু তিনি আর বাসায় ফিরে যেতে পারেন নি। ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করলেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখনো অসম্পূর্ণ। তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্বে কর্মকাণ্ড ২১ বছরের ব্যবধানে সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এই কর্মকাণ্ড হচ্ছে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার লড়াই। কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই নজরুলের প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে লোকায়ত জীবন ও চেতনা

ওয়াকিল আহমদ

লোকজীবনের ও নগরজীবনের মিশ্র চেতনা নিয়ে নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৩৩৭) রচিত। চাঁদ-সড়কের প্যাঁকালের পরিবার পাড়া-পড়শী ও পারিপার্শ্বিকতার চিত্রনে লোক-চেতনা এবং কৃষ্ণনগরের নাজির পরিবার ও আনসার-রুবীর প্রেম চিত্রনে নগর-চেতনার পরিচয় আছে। অর্থাৎ উপন্যাসখানি দুটি অংশে বিভক্ত। প্যাঁকালে রাজমিস্ত্রির কাজ করে; সে একেবারেই শ্রমজীবী। নাজির সাহেব শিক্ষিত ও চাকরিজীবী। তিনি মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। আমাদের লক্ষ্য উপন্যাসের প্রথমাংশ। এখানে নজরুল ইসলামের লোকায়ত জীবনবোধ ও চেতনার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। এখানকার কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষা—সবটাই লোকায়ত।

উপন্যাসখানি শুরু হয়েছে তিনটি শব্দের একটি বাক্য দ্বারা। –'পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর।' নদীয়ার কৃষ্ণনগর খেলনা-পুতুলের জন্য বিখ্যাত। 'পুতুল' লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ 'পুতুল-খেলা' গ্রামের বালিকাদের একটি প্রিয় খেলা। তারা পুতুলকে কাপড় পরায়, খাওয়ায়, আদর করে, ঘুম পাড়ায়, বিয়ে দেয় ইত্যাদি। 'পুতুলের বিয়ে' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) নামে নজরুলের একটি নাটিকা আছে। শিশুরা পুতুল বানায় ও তা নিয়ে খেলা করে। বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেন; মানুষের জীবন নিয়ে তিনিও খেলা করেন। মানুষ স্রষ্টার হাতে খেলার পুতুল। চাঁদসড়কের সাধারণ মানুষ জঠর জ্বালা নিবারণে নিত্য সংগ্রাম করে; ধর্মাধর্ম রক্ষা করে চলতে পারে না। এই ক্ষুধার অন্ন জুটাবার জন্য প্যাঁকালে ও মেজ-বৌ খ্রিষ্টান হয়; আবার সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে ইসলামে ফিরে আসে। তাদের আলাদা অস্তিত্ব কোথায়! উপন্যাসে জীবনের এই ইঙ্গিতটাই ঐ বাক্যে নিহিত আছে।

চাঁদসড়কের গ্রামে মুসলমান, খ্রিষ্টান ধর্ম ও দু-চার ঘর হিন্দু বসবাস করে। এদের পেশা কি? এদের পেশা 'জনমজুর'; লেখকের ভাষায়,

> জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে– অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐ রকমের কোনো একটা কিছু করা। আর মেয়েরা ধান ভানে, ঘর-গেরস্তালির কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

লোককলায় (Folklors-এ) যাদের 'লোক' (Folk) বলা হয়-এরা তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি। গ্রামের কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, মুটে-মজুর তথা

খেটে খাওয়া মানুষের জীবনই খাঁটি লোকজীবন (Folklife); তাদের জীবনধারা, জীবনবোধ ও জীবনসংগ্রামে লৌকিক উপাদানের উৎস নিহিত আছে। কলতলায় কলসি ছোঁয়াছুয়ি নিয়ে মুসলমান ও খ্রিষ্টান মেয়েদের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়। এক খ্রিষ্টান মেয়ে এক মুসলমান মেয়ের পানির কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে—তাই নিয়ে তুমুল কলহ ঃ কলহ করেছে প্যাঁকালের মা আর নুলোর মা— সঙ্গে অন্যরা যোগ দিয়েছে। ছোঁয়াছুয়ির কুসংস্কার (Superstition) থেকেই এই বিবাদের সূত্রপাত। কুসংস্কারবোধ মানুষকে কত নিষ্ঠুর করে তোলে—এই বিবাদের মধ্যে তার নিদর্শন আছে। নুলোর মা হিড়িম্বা খ্রিষ্টান; খ্রিষ্টানরা শুকরের মাংশ খায়, মুসলমানের কাছে তা হারাম। গজালের (প্যাঁকালের বড় ভাই) মা গালির ভাষা হিসাবে এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করেছে,

> হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মত চর্বি হয়েছে, না লা?

এদিকে গজালের মার স্বামী ও তিন ছেলের মৃত্যু হয়েছে; হিড়িম্বা তাকে 'ভাতার-পুত খাগী' বলে গালি দিয়েছে। কলহ এক পর্যায়ে চরম রূপ ধারণ করে। লেখক বলেন, 'ঝগড়া তো নয়, মোরগ-লড়াই।' 'পুতুল-খেলা'র মত 'মোরগ-লড়াই' একটি লৌকিক খেলা। মোরগ-লড়াই হয় দু'পক্ষের ট্রেনিং দেওয়া দুই মোরগের মধ্যে, মরণপণ এই লড়াই। খাতুনের মা গজালের মা'র পক্ষ নিয়ে ঝগড়ায় অংশগ্রহণ করে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> খাতুনের মা.... মাঝে মাঝে মূল গায়েনের দোয়ারকি করার মত গজালের মার সুরে মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে, পিলে আর কলসি সমেত সে একেবারে মূল গায়েনের গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল এবং ক্রীশ্চানদের বৌদের লক্ষ্য করে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লিখা ত যায়ই না, শোনাও যায় না।

মূলগায়েন, দোয়ারকি পল্লীগানের আসর থেকে এসেছে। লেটো গানে একজন মূল গায়েন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একাধিক 'দোহার' থাকে। কবির লড়াই, আলকাপ, সারি ইত্যাদি গানেও মূল গায়েন ও দোহার থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম এসব গানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন। মূল গায়েন ও দোয়ারকির উপমা এরূপ অভিজ্ঞতা থেকেই এসেছে। জীবনের সাথে জীবনের যোগ না হলে মিথ্যা হয় গানের পসরা— বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নজরুল ইসলাম কলতলার ঝগড়ার একটি জীবন্ত নাটক চিত্রিত করেছেন—বিষয় ও বিষয়ীর অকাট্য যোগসূত্রের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটার দলে নাচে, সখী সাজে, গান গায়। আঠার-উনিশ বছর বয়সের তরুণ প্যাঁকালে গ্রামের পথ দিয়ে যখন হেঁটে যায় তখন গ্রামের কোন অবিবাহিত মেয়ের মা তাকে দেখে আল্লাহর নামে 'জোড়া মোরগের গোশত' মানত

করে, যাতে তাকে জামাতা রূপে পায়। এখানেও আছে লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার। কামনার বস্তু পাওয়ার জন্য আল্লাহ-রসুল, পীর-ফকির, দেবদেবীর কাছে মানত মানা এদেশের একটা সাধারণ প্রথা। মোরগ মানতের সংস্কার হল 'প্রাণের বদলে প্রাণের কামনা'। Like produces like যাদু বিদ্যার একটি ধারা; একে সদৃশ যাদুবিদ্যা (Sympathetic magic) বলে। কলসি ছোঁয়ার সংস্কারের পেছনে আছে সংক্রামক যাদুবিদ্যা (Contagious magic); স্পর্শের মাধ্যমে একের দোষ অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ছুঁৎমার্গ' সামাজিক ব্যাধির মত প্রবল ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা কমবেশী বিদ্যমান।

গজালের মার একমাত্র কন্যা পাঁচি; সে প্রথম সন্তান-সম্ভাবা। তার প্রসব বেদনা উঠলে মা অনন্যোপায় হয়ে হিড়িম্বার কাছে যায়। সে ভাল ধাত্রী। সে তার হাত ধরে কেঁদে ফেলে এবং তার বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। আগের দিন ঝগড়ার কথা স্মরণ করে হিড়িম্বার প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। গজালের মা বলে, 'না বোন সত্য বলছি, আল্লার কিরে। আমার পাঁচির কাল থেকে ব্যথা উঠেছে। ঝগড়া তোর গজালের মার সঙ্গেই হয়েছে, পাঁচির মার সঙ্গে ত হয়নি।' অকাট্য-যুক্তি। এখানে 'আল্লার কিরে' কাটা অর্থাৎ আল্লার নামে শপথ করা লৌকিক সংস্কারের ফল। কিরা কাটা, দিব্য দেওয়া ইত্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এম. মটিফের (Motif-M) অন্তর্ভুক্ত। পাঁচিকে 'সাধ খাওয়া'তে পারেনি বলে তার মা দুঃখ করেছে। গর্ভবতী মেয়েকে সাধ খাওয়ানো একটি প্রচলিত রীতি। গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য সাধ খাওয়াতে হয় নইলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। গর্ভবতী নারীর নানা খাদ্যের প্রতি আসক্তি জন্মে; তাকে তা খেতে দিতে হয়—চিকিৎসা-বিজ্ঞানও তা সমর্থন করে। এখানে বিজ্ঞান ও সংস্কার একত্রে মিশেছে।

বাড়ির মেজ-বৌর এক ছেলে এক মেয়ে। পৌত্রের চেহারা ও আচরণ দেখে তার বাবা সোভানের কথা মনে পড়ে। সে মনে মনে বলে 'কে বলে সোভান মরেছে? এত সে-ই এসেছে আবার তেমনি খোকাটি হয়ে। এই ত রয়েছে তার গলা জড়িয়ে ধরে।' এই উক্তির মধ্যে 'ছদ্ম জন্মান্তরবাদে'র ইঙ্গিত আছে। হিন্দুগণ জন্মান্তরবাদে (re-birth) বিশ্বাস করে । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' এরূপ জন্মান্তরবাদের কথা আছে।

পূর্বে 'পুতুল খেলা', মোরগ-লড়াই -এর কথা বলেছি, এখন 'বৌ পালালো' খেলার কথা বলতে হয়। নজরুল ইসলাম বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

> ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ক্ষীর খেয়ে মহানন্দে 'বৌ পালালো' খেলছে। ওদেরই একজন পলায়ন পরায়ণা বধূ হয়ে না-জানা বাপের বাড়ির পানে দৌড়েছে এবং তার পিছনে বাকি সবাই গাইতে গাইতে ছুটছে–
>
> বৌ পালালো বৌ পালালো ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে;
> সে বৌকে আনতে যাব মুড়ো ঝ্যাঁটা নিয়ে ॥

এটি গ্রামীণ খেলা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্রে খেলে। নজরুল ইসলাম ছড়াসহ খেলার চিত্রটি তুলে ধরেছেন স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে। এখানেই আছে জীবনের

সাথে জীবনের যোগ। পাঁচির নবজাত শিশুকে মামা প্যাঁকালে দেখবে; গোছল করে সাফ-সুফ হয়ে বোনের আঁতুর ঘরে যায়। মা ছুটে এসে বলে, 'এ্যাঁরে প্যাঁকালে শুধু হাতে দেখবি কি করে!' তার হাতে অর্থ ছিল না, সে সঙ্কুচিত হয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা, কাল কিংবা আর একদিন দেখব এসে। আমার....... মনেই ছিল না যে, শুধু হাতে দেখতে নেই।' নবজাতকের প্রথম মুখ দেখে আত্মীয়-স্বজন টাকা-পয়সা দেয়। এতে ভবিষ্যতে সন্তান ধনবান-ধনবতী হবে। এইটাই সংস্কার। প্যাঁকালে এ-সংস্কারে বিশ্বাসী; এজন্য শিশুর মুখ না দেখে ফিরে আসে। এখানে আছে ট্যাবু (taboo) সংক্রান্ত যাদু। নজরুল ঘটনাক্রম ও চরিত্র-মনের পরতে পরতে লৌকিক চেতনা সংযুক্ত করেছেন।

মেজ-বৌ সেজ-বৌর মৃত্যুপথযাত্রী হাড্ডিসার শিশুকে ঘুম পাড়ায় আর ছড়া বলে,

যাদু আমার লাঙল চষে,
দু'ধারে তার কাল গরু।
যাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব,
পেট মোটা মাজা সরু ॥

অন্যত্র বলেছেন,

ঘুম আয়রে নাইলো তলা দিয়া,
ছাগল-চোরায় যুক্তি করে খোকনের ঘুম নিয়া।

'বৌ পালালো' খেলার ছড়া আগেই উল্লেখ করেছি। উপন্যাসে এরূপ ছড়াও আছে। কলতলার ঝগড়ায় পুঁটির মা এই বলে টিপ্পনি কাটে,

আ-সইরণ সইতে নারি,
সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি।

প্যাঁকালে-কুর্শির প্রেম-ভাব লক্ষ্য করে গাড়োয়ান গেয়ে ওঠে,

ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল!

সেজ বৌ উনুন নিকুতে নিকুতে গান গায়,

নিঠুর কালার নাম করো না,
কালার নাম করিলে প্রাণ-কাঁদিবে,
কালায় পড়িবে মনে গো।
নিঠুর কালার নাম করো না ॥

ছড়া ও গানগুলোর উৎস লৌকিক ছড়া ও গান; নজরুল ইসলাম মুন্সিয়ানার সাথে উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সেগুলো প্রয়োগ

করেছেন।

বিধবা মেজ বৌ রূপসী; দুই সন্তানের জননী হলেও তাকে 'আইবুড়ো' দেখায়। লেখক বলেছেন, 'আগুনের খাপরা'। গ্রামের নারী-পুরুষ সবার নজর তার ওপর। মা পাড়ার লোকের মুখে শোনে, মেজ-বৌ নাকি 'নিকে' করবে। সে মেজ-বৌর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সত্যাসত্য যাচাই না করে কান্না বিদীর্ণ কণ্ঠেই চিৎকার করে বলে,

> ..... আমার জোয়ান পুত খাগী। আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চল্‌লি নিকে করতে!—ভাল হবে না লো, ভাল হবে না। এই আমি বলে রাখছি, বিয়ের রাতেই জাত-সাপে খাবে তোদের দুই জনকেই।

এ হল বিধবা বৌর প্রতি শাশুড়ির অভিশাপ (curse)। গুরুজনের অভিশাপ ফলে—এ সংস্কার লোকসমাজে আছে। 'জাত-সাপ' বলতে বিষধর গোখরা সাপের কথাই বলা হয়েছে। অভিশাপে আছে কৃষ্ণ যাদু গুণ (Black Magic) এটি ডি-মোটিফের (Motif-D) বিষয়ভুক্ত।

পুকুরঘাটে প্যাঁকালে কুর্শির প্রতি প্রেম নিবেদন করে এবং 'আল্লার কিরে' 'খোদার কসম' এবং মসজিদের দিকে মুখ করে কুর্শির 'গা ছুঁয়ে' শপথ করে— সে নিকেও করবে না এবং কুর্শিকে না বলে কোথাও যাবে না। এরূপ আল্লার নামে শপথের কথা পূর্বে বলেছি। গা ছুঁয়ে দিব্যি দেওয়ার মধ্যে কঠিন শর্ত আছে ঃ প্রতিজ্ঞা না রাখলে সমূহ অমঙ্গল ঘটে। এসবই এম-মটিফের অন্তর্ভুক্ত।

প্যাঁকালে আকস্মিকভাবে গৃহ ছেড়ে উধাও হয়—বাড়ির সবাই বিষণ্ণ। মেজ-বৌর ছেলে অত সব বুঝে না। সে বলে 'আচ্ছা মা, ছোট-চা বুঝি বাজানের কাছে চলে গিয়েছে?' মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরে বলে, 'বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন? হুই রানাঘাটে চলে গেছে টাকা রোজগার করতে।'

অলুক্ষণে কথার দোষ কাটানোর জন্য 'বালাই! ষাট' বলা হয়। 'বালাই' (আরবি বলা, ফারসী বালাই) অশুভ; ষাট (ষষ্ঠী)—মঙ্গলের দেবী ষষ্ঠী। ষষ্ঠীদেবীর নাম নিলে অমঙ্গল দূর হয়। সাধারণত হিন্দু সমাজে এরূপ অন্ত বাক্য প্রচলিত। ব্যবহার আধিক্যে তা মুসলিম সমাজে চলে গেছে।

মৃত্যুপথযাত্রী সেজ বৌ মৃত স্বামীর স্বপ্ন দেখে বিশ্বাস করে ছেলের আর তার যাবার সময় হয়েছে। তার উক্তি,

> 'কাল ওর বাবাকে দেখেছিলুম খোয়াবে, বললে, খোকাকে নিতে এসেছি।' আমি বললুম, 'আর আমায়?' সে হেসে বললে, ' তোকে নয়।' আমি কেঁদে বললুম, 'যম তো নেবে, তুমি না নাও।'

কুন্দনন্দিনী মৃত মায়ের স্বপ্ন দেখে বিশ্বাস করেছিল, তার মৃত্যু আসন্ন।

কপালকুন্ডলাও স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় মৃত মায়ের আহ্বান শুনে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়। এসবই লোকসংস্কার; যুগ যুগ ধরে এ সমাজে চলে আসছে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ নেই।

লেখকের বর্ণনায় ও চরিত্রের সংলাপে 'ডাইনী', 'পেত্নী', 'ভূত', 'রাক্কস', 'রাক্কুসী', 'জুজু' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগুলো লোক-ঐতিহ্যগত (traditional)। নজরুল ইসলাম এই ঐতিহ্যের সাথে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে অনেকগুলো প্রবাদ আছে। প্রবাদগুলো লোকসমাজে প্রচলিত। নজরুল কখনো ভেঙ্গে, কখনো অভঙ্গ আকারে প্রবাদগুলো প্রয়োগ করেছেন। প্রবাদ ভাষাকে অর্থবহ ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া হল,

১. গোদের ওপর বিষ-ফোড়া।
২. যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনি ছাই-পাশ নৈবেদ্য।
৩. নিজের বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া।
৪. তেলে মাথায় তেল দেওয়া।
৫. আপন চরকায় তেল দেওয়া।
৬. ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।
৭. সাপের ন্যাজে পা দেওয়া।
৮. মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।
৯. ছুচো মেরে হাত গন্ধ করা।
১০. খাল কেটে কুমির আনা।
১১. সাপের ছুঁচো গেলা-ছাড়তেও পারে না, গিলতেও পারে না।
১২. মশা মারতে কামান দাগা।

আমরা বলেছি, জীবনের সাথে জীবনের যোগ থাকলে সাহিত্য সফল হয়; আমরা আরও বলি, জীবনের সাথে ভাষার যোগ থাকলে রচনা আরো সার্থক ও জীবন্ত হয়। নজরুল ইসলাম লোকজীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন; তিনি ভালবেসে, সহানুভূতির সাথে সে জীবনকে এঁকেছেন। বর্ধমানের চুরুলিয়া তাঁর জন্মভূমি, চুরুলিয়ার সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। নদীয়ার চাঁদ-সড়ক তিনি চোখে দেখেছেন; চাঁদ-সড়কের সাথে তাঁর সম্পর্ক অভিজ্ঞতার। মৃত্যুক্ষুধায় উভয় স্রোত মিশে আছে। নজরুল ইসলামের লোকায়ত চেতনা ও জীবনবোধ এ উপন্যাসের মূল ভিত্তি

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — বিংশ সংকলন

শিশু-সাহিত্যিক নজরুল

আতোয়ার রহমান

নজরুল বাংলা সাহিত্যের সেই সব সব্যসাচীপ্রতিম লেখকদের একজন, যাঁরা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই অবাধে বিচরণ করেন এবং সে বিচরণে সাফল্য লাভ করেন— সাধারণতঃ যা প্রত্যাশিত, তার থেকে অনেক বেশী। তাঁর শিশু-সাহিত্য-চর্চা এমনি অবাধ বিচরণেরই ফল। এর কতোটা স্বেচ্ছাকৃত ছিলো, তা অবশ্যি আমরা জানিনে, কিছুটা অবশ্যই ছিলো, কেবল এইটুকুই বলা সম্ভব। এবং ধরে নিতে বাধা নেই, তাঁর শিশু -সাহিত্য সাধনার বাকী অংশ শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে জাত। আমাদের অভিজ্ঞতাই বলে, উক্ত শ্রেণীর সম্পাদকরা আপন আপন পত্রিকার প্রচারস্বার্থে এমন সব খ্যাতিমান লেখকেরও দ্বারস্থ হন, যাঁরা এমনিতে শিশুতোষ সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহী নন।

কিন্তু নজরুলের শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির মূলে যার প্ররোচনাই থাক, তাঁর নিজের কিংবা অপরের, সে সৃষ্টি প্রতিভার স্পর্শে ঋদ্ধ, যদিও পরিমাণে তা সামান্যই। বাস্তবিক, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বল্পফসল প্রয়াসের এমন সাফল্য খুব কম লেখকের ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। তাঁর কিছু কবিতা—'খুকী ও কাঠবেড়ালী', 'খাঁদু-দাদু', 'প্রভাতী', 'লিচু'-চোর', 'সংকল্প' ইত্যাদি—এবং নাটিকা 'পুতুলের বিয়ে' এখন বস্তুতঃ ক্লাসিক্‌সের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

বলছিলাম, শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুলের সৃষ্টিপ্রয়াস স্বল্পফসল। মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ কবি, তাঁর অধিকাংশ শিশুতোষ রচনাই ছন্দিত। অথচ সব মিলিয়ে এই রচনাগুলির সংখ্যা বোধ হয় একশোও হবে না। এগুলির বাইরে, গদ্যে, তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা মেলে মাত্র একটি, মাত্র একুশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পূর্বোক্ত নাটিকা 'পুতুলের বিয়ে'। আর আছে গদ্যে পদ্যে মেশানো কয়েকটি ছোটো রচনা, যেগুলি দৃশতঃ নাটিকা, কিন্তু অত্যন্ত হ্রস্ব, মিনিট কয়েকের কথোপকথন মাত্র। নজরুলের স্বাক্ষর না থাকলে সেগুলি রসিকজনের কাছে নাটিকা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হত কিনা সন্দেহ, যদিও রচনাগুলির কোনো কোনো ছন্দিত ভাগ বাস্তবিকই সুখপাঠ্য।

নজরুলের ছন্দিত শিশুতোষ রচনার প্রথম সংগ্রহ 'ঝিঙে ফুল'। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ ১৯২৬ সালে। তাঁর দ্বিতীয় শিশুতোষ গ্রন্থ 'পুতুলের বিয়ে'

গদ্য এবং পদ্যের মিশ্র সংকলন। এরও প্রকাশকাল ১৯২৬ সাল। 'পুতুলের বিয়ে'র মুখ্যভাগ ওই নামের নাটিকাটি। বাকী অংশে আছে চারটি গদ্যে পদ্যে মেশানো রচনা আর চারটি কবিতা। পরবর্তীকালে, 'ঝিঙে ফুল'-এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে, তাঁর শিশুতোষ কবিতার আর একখানি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির নাম 'ঘুম-জাগানো পাখী'। মুখ্যতঃ তাঁর গ্রন্থিতপূর্ব রচনাবলী থেকে কিছু কিছু রচনা বেছে নিয়ে আরো দুই-একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পিলে-পটকা', 'পুতুলের বিয়ে' এবং ঢাকার শিশু একাডেমীর প্রকাশনা 'খুকী ও কাঠবিড়ালী'। এগুলিতে অসংকলিত পূর্ব রচনা প্রায় নেই বললেই চলে এবং এগুলির প্রকাশের মূলে আছে প্রধানতঃ ব্যবসায়িক বুদ্ধি। বিস্তারিত আলোচনায় তাই এগুলি সম্পর্কে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। ১৯৮২ সালে আবদুল আজীজ আল-আমানের সম্পাদনায় 'নজরুল কিশোর সমগ্র' নামে একখানি গ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থখানির নামটি বিভ্রান্তিকর। এতে যুবা এবং বয়স্কজনপাঠ্য বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। আবার, এমন কিছু রচনাও আছে, যেগুলি নজরুল ঠিক শিশু-সাহিত্য রচনার জন্যে লেখেননি। যেমন, তাঁর ছেলের কাছে লেখা চিঠিপত্র। গ্রন্থখানিতে অবশ্যি অসংকলিতপূর্ব কতকগুলি রচনা আছে। নজরুল-বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এগুলি ছাড়াও তাঁর কিছু শিশুতোষ রচনা এখনো অসংগৃহীত বা অগ্রন্থিত রয়ে গেছে।

'ঝিঙে ফুল' একটি ক্ষীণকায় গ্রন্থ। এর মূল ভাগে কবিতা আছে মাত্র তেরোটি। আছে ভূমিকাস্বরূপ নাম কবিতাটি। এই কবিতাটিকে নজরুল গ্রন্থের মূল ভাগে স্থান না দিলেও এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশুতোষ রচনা এবং কাব্যিক সৌন্দর্য তাঁর সমগ্র রচনাবলীতেই একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। গৃহস্থের আঙিনার অতি সাধারণ এক সব্জিলতার ফুল এ-কবিতায় বর্ণে গন্ধে অভিজাত বাগানফুলের মর্যাদা লাভ করেছে। সাধারণকে এমন অসাধারণ মর্যাদা দান বুঝি নজরুলের মতো প্রতিভাধরের পক্ষেই সম্ভব। কবিতাটির প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি,

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে কুল—
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙে ফুল॥
পাতার দেশের রাণী বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁজে তব ফু'টে ওঠাতে।

গ্রন্থের মূল ভাগের অধিকাংশ কবিতাই কৌতুকজীবী। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'খুকী ও কাঠবিড়ালী', ' খোকার খুশী', 'খাঁদু দাদু', 'দিদির বে'তে খোকা', 'খোকার বুদ্ধি', ' খোকার গপ্‌প বলা', 'চিঠি', 'লিচু চোর', ' হোঁদুল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন', 'ঠ্যাং-ফুলী' আর 'পিলে পটকা'। অথচ, তৃতীয় এবং সপ্তম কবিতা এখন এতোই প্রচলিত যে, এগুলির যে কোনো আলোচনাই মনে হতে পারে বাহুল্য।। তবু গ্রন্থখানি সঠিক পরিচয়ের জন্যে কবিতা কয়টি সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয়।

প্রথম কবিতাটি বয়সে শিশুপ্রতিম একটি বালিকার কাঠবেড়ালীর কাছ থেকে পেয়ারা আদায়ের প্রয়াসের কাহিনী। অতি স্বাভাবিক কারণেই এই প্রয়াসে অনুরোধ-উপরোধ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রলোভন-তোষামোদ, এমনকি, কিছু ভীতি প্রদর্শন আর ভৎর্সনাও। কাঠবেড়ালীর কাছে মানব-শিশুর পেয়ারা চাওয়া এমনিতে অস্বাভাবিক,— যে-শিশু যখন নিতান্তই শিশু, তখনও। কিন্তু তার চাওয়ার অস্বাভাবিকতা উপরি-উক্ত অনুরোধ-উপরোধ, প্রলোভন-তোষামোদ ইত্যাদির ভঙ্গির গুণে অতি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বাস্তবিক, সে যখন নীচের কথাগুলি বলে, আমরা ভাবতেই পারিনে, অন্য কোনো জীবের উদ্দেশে তার পক্ষে এসব বলা আদৌ সম্ভব নয়,

> কাঠবেড়ালি! বাঁদ্‌রীমুখী! মারবো ছুঁড়ে কিল?
> দেখ্‌বি তবে? রাঙাদা'কে ডাক্‌বো ? দেবে ঢিল!
> পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
> হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে!
> ইস! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
> আমিও খুব পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

'খাঁদু-দাদু' বাংলাদেশের দাদু-নাতনীর রসিকতার সম্পর্কের এক অপরূপ চিত্রণ। এই চিত্রণে একমাত্র সক্রিয় ভূমিকা নাতনীর, উদ্দিষ্ট দাদু এবং শ্রোত্রী মা একেবারেই নীরব। দাদুর নাকের সাধারণ খাঁদাত্ব এ কবিতায় যে সুরসিক বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণে আর মন্তব্যে নানাভাবে হাস্যকর হয়ে উঠেছে, তা কেবল অসাধারণ কল্পনা-শক্তির বলেই সম্ভব। সে কল্পনায় দাদুর খাঁদা নাক কখনো ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে থাকা চামচিকে ছানা, কখনো বুড়ো গরুর টিকে শায়িত কোলা ব্যাঙ। কখনো ঠ্যাং ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শোয়া কাছিম, কখনো জাপানী নোটিস আঁটা চীনাম্যানের নাক। আবার, কখনো শুনি, ও-নাক থ্যাবড়া বনে গেছে দিদিমার ধ্যাবড়া খেয়ে। এমন কল্পনা আরো কিছু আছে। প্রসঙ্গত, লক্ষণীয়, কবিতাটির প্রতি স্তবকে ধুয়া হিসেবে ব্যবহৃত চরণটিতে ('অ মা! আমি হেসেই মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং') লৌকিক রচনার কিছুটা অনুসরণ রয়েছে।

'লিচু-চোর' কাহিনীমূলক কবিতা। এর ঘটনাবলী রীতিমত নাটকীয়। উপজীব্য— পাড়ার কোনো ধনী ব্যক্তির লিচু গাছ থেকে একটি দুরন্ত গ্রাম্য কিশোরের লিচু চুরির প্রয়াস। সেই প্রয়াসের ফল এক দিকে, তার জন্যে করুণ, অন্যদিকে পাঠকের জন্যে কৌতুকজনক। প্রয়াসের প্রথম পর্যায়েই তার জন্যে ব্যর্থতা আসে, গাছে উঠবার সময় ডাল ভেঙে যাওয়ায়। এরপর মালী এবং কুকুরের হাতে তার লাঞ্ছনা আর দুর্ভোগ। লিচু চুরি বা তার দুঃখজনক পরিণতি পল্লী অঞ্চলের এক শ্রেণীর কিশোর মহলে আজও অতি সাধারণ ব্যাপার! নজরুল এই সাধারণ ব্যাপারটিকেই করেছেন পরম উপভোগ্য,—ঘটনাবলীর সুকৌশল বর্ণনায় এবং শব্দাদির সুনিপুণ প্রয়োগে। আমার অবশ্যি মনে হয় চুরিপ্রয়াসী কিশোরটির জবানিতে বর্ণিত এই কাহিনীর ওইটুকুই সব নয়। কবিতাটিতে একটুখানি শিক্ষামূলক কথাও আছে। সেটি হল-তিক্ত অভিজ্ঞতার পর কিশোরটির চুরি ছেড়ে দেওয়ার শপথ গ্রহণ। বলা বাহুল্য, কাহিনীতে এটুকুও উপভোগ্যরূপে নাটকীয়,

যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলো—
মালীর ঐ পিটনীগুলো?
কি বলিস? ফের হপ্তা?
তৌবা—নাক খপ্‌তা!

'খোকার খুশী', 'দিদির বে'তে খোকা', খোকার বুদ্ধি' আর 'খোকার গপ্‌প বলা', নেহাৎই শিশুসুলভ আচরণের কাহিনী। সব কটিরই নায়ক অবিশেষ খোকা। প্রথম কবিতাটিতে দেখি, মামার বিয়ের দিনে সে মণ্ডা গজার ভোগে আগ্রহী, কিন্তু সানাইয়ের বাজনায় বিরক্ত এবং বিয়ে উপলক্ষে মামার উপবাস দেখে ভবিষ্যতে প্রয়োজনকালেও নিজে বর সাজতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যখন সে শোনে মামী ঘরে এলে সে আদর পাবে, তখন তার সব বিরক্তি, সব ভয় কেটে যায়। সে সানন্দে ঘোষণা করে, 'আমি রোজ করব বিয়ে।' দিদির বিয়েতেও খোকা ভোজনে উৎসাহী,—'মনে হয়, মণ্ডা মেঠাই/ খেয়ে তোর আয়েশ মিটাই!' কিন্তু দিদির কান্না দেখে সে চমকে ওঠে, দিদি একলা চলে যাবে জেনে। তার ভালো লাগে না। শেষ পর্যন্ত সে দিদিকে প্রবোধ দেয়,— হয়তো নিজেকেও, —বরের বাড়ী গিয়ে দিদি যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তাকে সোনার কাঠির পরশে জাগিয়ে দেবে। 'খোকার বুদ্ধি'র খোকা আপন বিচারে বীর এবং বুদ্ধিমান। কেননা, তার ভয়ে হাঁস মুরগীর ছানাদের চক্ষু স্থির, সে সাত লাঠিতে ফড়িং মারে, দাঁত দিয়ে আস্ত আলোয়ান ছিঁড়ে ফেলে এবং ন্যাংটা পুঁটোদের দলে সেই রাজা। তবু,

মা বলেন, সে বোকা। এই অপবাদ খণ্ডাবার উপায় কি? অনেক ভাববার পর সে মায়ের কাছেই গিয়ে বলে,

ওগো মা।
আমি নাকি বোকা-চন্দর? বুদ্ধি দেখে যা!
ঐ না একটা মট্‌কু বানর দিব্যি ম্যাচায় ব'সে
লাউ খাচ্ছে? কেউ দেখনি, দেখি আমিই ত সে।
দিদিদের চোখ ছিল ত, কেউ কি দেখেছেন?
তবে আমায় বোকা কও যে!...

মা অবশ্যি এটাকেও খোকার বুদ্ধির পরিচায়ক বলে মানতে রাজী নন। খোকাকে তখন আবার বুদ্ধির খেল দেখাতে হয়।

'খোকার গপ্‌প বলা'য় সে আবোল তাবোল গল্প বলে। কিন্তু বেরসিক দাদা তার কথকতায় বিরক্ত। তিনি তাকে মারধোর করে থামিয়ে দেন। কবিতাটির শেষ অংশ কৌতুককর। কিন্তু মনে হয় এমনটি না হলেই ভালো হত। শিশুসুলভ গল্পবাজিকে মারপিটে ঠাণ্ডা করে দাদা যেমন উচিত কাজ করেননি, দাদার হাতে মার খাওয়ার পর খোকা কেঁদে উঠলে তাই নিয়ে ফুটকি কেটে তেমনি নজরুলও ঠিক করেননি।

একটি লৌকিক ছড়ার ছন্দে লিখিত 'চিঠি' জন্টি নামের কোনো ছোট্ট মেয়ের লেখা চিঠির উত্তর। বলা বাহুল্য, উত্তরটি কৌতুকে উচ্ছল। এর সম্বোধন, সংবাদ আর আশিস অভিবাদনেও সেই কৌতুক প্রবল। যদিও তা কেবল শিশু লোভন। কিন্তু কবিতাটির একটি অংশ বড়োদের জন্যও রীতিমত উপভোগ্য,—যেখানে নজরুল তাঁর পত্রলেখিকার হাতের লেখার বর্ণনা দেন। শিশুর কাঁচা হাতের লেখার এমন (বাস্তবমুখী কিন্তু চমকপ্রদ) বর্ণনা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না,

...তোর অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর
পেট্‌টা কারো চিপ্‌সে
ঠ্যাংটা কারুর লম্বা
কেউ বা দেখতে রঙা!
কেউ যেন ঠিক থাম্বা,
কেউ বা ডাকেন হাম্বা!
থুত্‌নো কারুর উচ্চে
কেউ বা ঝুলেন পুচ্ছে।
এক একটি বানান
হাঁ করে কি জানান!
কারুর গা ঠিক উচ্ছের,...

'হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন' নজরুলের অন্যতম বিখ্যাত শিশুতোষ রচনা। এতে কিন্তু শিরোনামের অনুকরণে হোঁদল-কুঁৎকুত জাতীয় কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিজ্ঞাপন নেই। আছে কিছু ছেলেমেয়ের চেহারা আর চরিত্রের নামানুগ বিশ্লেষণ এবং চরিত্র বা চেহারা অনুযায়ী নামের ব্যাখ্যা। 'হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন' পড়ার আগে এ দেশের কিশোর কিশোরীরা কি কখনো ভেবে দেখেছে, ড্যাবরা ছেলের স্বভাব কেমন এবং হাঁদা ছেলেদের স্বভাব কি? কিংবা প্যাঁটরা ছেলের দেহটি কোন ধরনের এবং বোঁচা দানা খাঁদা-র নাম কি রাখা দরকার? তুবড়ি ছোটানো এই সব ব্যাখ্যার কিছু অংশ,

...নিম্নমুখো ফষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে যান
বদমায়েসীর মাসী পিসি আধখানা চোখ উঁচিয়ে চান।
গাবদা ছেলের মনটি সাদা একটুকুতেই হন খুসী
আদর ক'রে মা তারে তাই নাম দিয়েছেন মনটুসি।...
গাল টেবো যাঁর নাম টেবী তাঁর একটুকুতেই যান রেগে।
কান্ খড়কে মায়ের লেঠা রয় ঘুমুলেও কান জেগে।
পুঁটুরাণী বাপ-সোহাগী নন্দদুলাল মানিক মার
দাদু বুড়োর ন্যাওটা যে ভাই মটরু ছাগল নামটি তার!

আগাগোড়া হাসির দমকে কাঁপানো এই কবিতার শেষ ভাগে হঠাৎ একটু তাল কেটেছে। সেখানে দেখি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে এবং সাত সাগরের ওপার থেকে বন্দিনী দেশলক্ষ্মীকে উদ্ধার করতে যে সক্ষম, বাদল নামের সেই বীর ছেলেটিকে কবি উপহার দিতে চান—ফুলের মালা বা সোনার পদক নয়,-হোঁদল-কুঁৎকুঁতের ছানা। সীরিয়াস বক্তব্যের সাথে হাস্যকর বিষয়ের এই সংযোজন বস্তুত উদ্ভট ব্যাপারের এক বিচিত্র উদাহরণ। নজরুলের চপল চিত্তের অনবধানতায় দেশপ্রাণতা এখানে রসিকতার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

গ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা 'ঠ্যাং-ফুলী' আর 'পিলে পটকার' উপজীব্য তাদের কৌতুক এবং এ-কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে কিছু আঙ্গিক বিকৃতিকে উপলক্ষ করে, কথা আর শব্দের কাতুকুতু দেওয়া প্রয়োগের মাধ্যমে। কৌতুক এখানে তাই কিছুটা কৃত্রিম। যেমন, 'ঠ্যাং ফুলী'র এই অংশে–

বটু তুই জোর্ দে ভোঁ দৌড়,
রাখালে! ভাঙবে গোঁ তোর,
নাদ্না গুঁতোর
ভিটিম্ ভাটিম্!
ধুমাধুম্ তাল ধুমাধুম্
পৃষ্ঠে, মাথায় চাটিম চাটিম!

'মা' এবং 'প্রভাতী' এ গ্রন্থের ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা। চরিত্রে দুটিই নীতিবাদী,

কিন্তু নীতির প্রচারে মিতবাক। রচনা হিসেবে সুখপাঠ্য এবং বাস্তবিকই শিশুভোগ্য, 'প্রভাতী' পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বহুপ্রচারিত,—এ-কবিতার সাথে পরিচিত নন, এমন পাঠক এখন এদেশে বিরল। 'মা' কবিতা হিসেবে সাধারণ, প্রায় সেকেলে, যেমন রচনাভঙ্গিতে, তেমনি বিষয়ের বিশ্লেষণে। হয়তো এ-কারণেই, বিষয় মাহাত্ম্য সত্ত্বেও এবং নজরুলের রচনা হলেও, কবিতাটি পাঠক সমাজে তেমন সমাদর পায়নি।

আগেই বলেছি, 'পুতুলের বিয়ে' গদ্য-পদ্যের মিশ্র সংকলন এবং এই গ্রন্থখানিতে স্বাধীন সত্তায় স্বনামে কবিতা আছে চারটি। কবিতাগুলির নাম 'কালো জামরে ভাই', কে কি হবি বল্', 'সাত ভাই চম্পা' আর 'শিশু যাদুকর'। এগুলির মধ্যে 'প্রথম দুটি হাস্যরসের, তৃতীয়টি শিক্ষামূলক এবং চতুর্থটি বাৎসল্য রসের।

'কালো জামরে ভাই' শীর্ষক রচনাটি আসলে গান। এর রস নিতান্তই হাল্কা। বিভিন্ন ফলের সাথে কালো জামের সম্পর্ক কল্পনা এ বহমান উপজীব্য। ব্যতিক্রম মেলে কেবল শেষাংশে। যেখানে দেখা যায়, অন্যান্য ফলের সাথে কালো জামের সম্পর্ক নির্ণয়ের কারণ কেবল কবির এই ফলটির প্রতি দুর্বলতা,

কালো জামরে ভাই!
আমি কি তোমার ভায়রা ভাই?
লাউ বুঝি তোর দিদিমা
আর কুম্‌ড়ো তোর দাদামশাই ॥...
নোনা মাতা সোনা ভাই তোর
রাঙাদি তোর লাল মাকাল,
ডাব বুঝি তোর পানি-পাঁড়ে
ঢিল বুঝি ভাদু'রে তাল।
গেছো দাদা, আয় না নেমে
গালে রেখে চুমু খাই ॥

'কে কি হবি বল্'ও হাল্কারসের রচনা। এ কবিতায় বোনের এক প্রশ্নের জবাবে সাত ভাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার কথা জানায়। প্রথম ভাইয়ের ইচ্ছে চাপদাড়িওয়ালা কাবলীওয়ালা হওয়ার, দ্বিতীয় জনের পণ্ডিত মশাই, তৃতীয় জনের ফেরীওয়ালা। এ-পর্যন্ত ইচ্ছেগুলো নির্বিরোধ। কিন্তু পরের তিন ভাইয়ের ইচ্ছেগুলি প্রতাপলোভী প্রতিদ্বন্দ্বী। চতুর্থ ভাই চায় জজ হতে, পঞ্চম ভাই জজকে চালান দেওয়ার দারোগার কাজ নিতে, ষষ্ঠ ভাই দারোগা-ভোগানো 'কনিষ্ঠ-বল' অর্থাৎ কনস্টেবলের। সপ্তম ভাইও প্রতাপলোভী, কিন্তু ভিন্ন ধরনে,

আমি হব বাবার বাবা
মা সে আমার ভয়ে
ঘোম্‌টা দিয়ে লুকোবে কোণে
চুনি-বিল্লি হয়ে!

বল্‌ব বাবায়, ওরে খোকা
শীগ্‌গীর পাঠশাল চল্‌ ॥

'সাত ভাই চম্পা' যদিও 'কে কি হবি বল'-এর মতো বিভিন্ন ভাইয়ের জীবন পরিকল্পনার কথা, চরিত্রে সীরিয়াস। এবং এই রচনাটি আসলে একটি কবিতা নয়, চারটি কবিতার গুচ্ছ। এর রচনা ধারাই বলে দেয়, নজরুল এক শিরোনামে শত ভাইয়ের কথা হিসেবে সাতটি কবিতা লেখবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, চার ভাইয়ের কথার পরে আর এগোননি। যথার্থ রসোত্তীর্ণ এই কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতাটি জাগরণমূলক। এতে প্রথম ভাই চেয়েছে সকলকে 'ঘুম-ভাঙা গান' শোনাতে। দ্বিতীয় ভাইয়ের ইচ্ছে রাখাল রাজা হওয়ার, তৃতীয় ভাইয়ের চাষী এবং চতুর্থ ভাইয়ের সওদাগর। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কবিতা পৃথক পৃথক সত্তা সত্ত্বেও বক্তব্যের দিক থেকে এক। রাখাল রাজা নদীর কাছে কর হিসেবে চাইবে ফসল, তা না পেলে নদীকে রাখবে বাঁধ দিয়ে বেঁধে। মেঘের কাছে তার দাবী জলের। তার অন্যান্য দাবীও বস্তুতঃ কৃষকের দাবী। কেবল পরোক্ষভাবে উত্থাপিত। এবং ফুল-ফল-ফসলেরই সমৃদ্ধির দাবী। তৃতীয় ভাই এই সমৃদ্ধিই চেয়েছে অন্যভাবে। সে বলে,

লিখ্‌ব সবুজ কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি,
ওপর হ'তে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।
ধরায় ডেকে বল্‌ব, 'ওগো শ্যামল বসুন্ধরা'
শস্য দিয়ো আমাদেরে এবার আঁচল ভরা!...
খামার ভ'রে রাখব ফসল গোলায় ভ'রে ধান,
ক্ষুধায়-কাতর ভাইগুলিরে আমি দেবো প্রাণ!
এই পুরোনো পৃথিবীকে রাখ্‌ব চির তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটীর রাজা।

'শিশু যাদুকর'-ও উৎকৃষ্ট রসোত্তীর্ণ কবিতা। এর উপজীব্য নবজাতকের প্রতি পিতার বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ বাৎসল্য। বিস্ময় তাঁর শিশুর আবির্ভাবপথের কথা ভেবে, মুগ্ধতা তার রূপে। তাঁর কাছে সে কখনো রূপলোক থেকে আগত রূপকথা, কখনো নির্মল আকাশের চাঁদ; কখনো অমরার প্রজাপতি, কখনো তারা-যুঁই। আবার কখনো বন থেকে পৃথিবীর কোলে নামা একরাশ চুমু। অপিচ, সে ফুলের গন্ধ, পাখীর গান। উপসংহারে তার উদ্দেশে কবির কথা,

...আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।
তোর নামে রহিল রে মোর স্মৃতিটুক,
তোর মাঝে রহিলাম আমি জাগরূক।

প্রসঙ্গত, এই কবিতাটির লক্ষ্য প্রথম সন্তান। 'ছায়ানট'-এর 'চিরশিশু' শীর্ষক গানটিতে আমরা পাই প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর জাত দ্বিতীয় সন্তানের কথা। শিশুর

আবির্ভাবপথ নিয়ে এখানেও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু নবজাতকের রূপ বর্ণনা 'চিরশিশু'তে নেই। তার পরিবর্তে আছে এক শিশু ধারার কথা এবং প্রথম শিশুর কথা ভেবে কান্না,

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ-পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পরলি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ ॥...
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারে বারে নাম হারায়ে ॥...
আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে,
নতুন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওঠে ওরে কণ্ঠ রুখে
উঠ্‌ছে কেন মন ভারায়ে।...

'ঘুম জাগানো পাখী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে, কলকাতা থেকে। এতে কবিতা আছে মোট উনিশটি। কিন্তু এর প্রথম চারটি কবিতা–'ঘুম জাগানো পাখী', 'রাখাল-রাজা', 'মাটির রাজা' আর 'সওদাগর'–'পুতুলের বিয়ে'তে 'সাত ভাই চম্পা' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাইয়ের উক্তি হিসেবে গ্রথিত হয়। 'চিঠি'ও গ্রন্থিতপূর্ব রচনা। এটি 'ঝিঙে ফুল'-এর অষ্টম কবিতা 'ঘুম-জাগানো পাখী'র ত্রয়োদশ এবং সপ্তদশ কবিতা, ঠিক শিশুপাঠ্য নয়। এবং এগুলির প্রথমটি–'নব ভারতের হলদিঘাট' অনেক আগেই 'প্রলয়-শিখা'য় আর দ্বিতীয়টি–'পল্লী-জননী' 'গানের মালা'য় সংকলিত হয়।

গ্রন্থখানির বাকী বারোটি কবিতা 'সানির ইচ্ছা', 'চলবো আমি হালকা চালে' 'কোথায় ছিলাম আমি', 'কিশোর স্বপ্ন', 'সংকল্প', ' ছোট হিটলার', 'মাঙ্গলিক', 'মায়ামুকুর', 'মা', 'বর প্রার্থনা', 'সারস পাখী', আর 'প্রার্থনা'। এই বারোটি কবিতার মধ্যে 'সানির ইচ্ছা' বস্তুত, 'সাত ভাই চম্পা'র পূর্বোক্ত চারটি—বিশেষ করে, চতুর্থটির জের। 'সওদাগর' থেকে পার্থক্য কেবল এইযে সে কবিতার নায়ক বাণিজ্য অভিলাষী, কিন্তু সানি চায় সপ্তসাগরের আধিপত্য। 'চলবো আমি হালকা চালে' সুদীর্ঘ কবিতা—প্রায় একশো চরণের। এ-কবিতার নায়ক ধন জন চায় না, 'ভয় দেখানো' কিছু হওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। এমন কি, কোথাও বাঁধা পড়তেও সে অনিচ্ছুক। তার 'হালকা চালে' চলাটা যে কেমন, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে নীচের দুটি স্তবক থেকে,

চলবো আমি হালকা চালে
পলকা খেয়ার হাওয়ার তালে,
কুসুম যেমন গন্ধ ঢালে

তরল সরল ছন্দে রে।
যেমন চামর হস্ত লুটে
চন্দ্র, ভোরে সূর্য উঠে,
সন্ধ্যা-সকাল সমীর ছুটে
যেমন—সে আনন্দে রে।

গ্রন্থের সপ্তম কবিতা 'কোথায় ছিলাম আমি' রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত 'জন্মকথা' কবিতাটির দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং গভীরভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শিশুর প্রশ্ন ঃ 'এলেম আমি কোথা থেকে?' এবং এর উত্তর দেন তার মা। নজরুলের কবিতায় শিশু তার প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিয়েছে। 'জন্ম কথা'র মা বিস্ময়ের সুরে বলেন, 'সবার ছিলি, আমার হলি কেমনে!' আর, নজরুলের কবিতার মা শিশুর জবানিতে জানান, 'যে খোকারে দেখি—ভাবি, আমার খোকন বুঝি।' রবীন্দ্রনাথের কবিতার এমন প্রতিধ্বনি অন্যত্রও আছে। সেই সঙ্গে রয়েছে কিছু পার্থক্যও। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মা তাঁর শিশুর সম্ভাবনা দেখেছেন তাঁর পুতুল খেলায়, শিবপূজোয়, পুরুষানুক্রমিক আশায়—দেখেছেন গৃহদেবতার কোলে, তাঁর তরুণ অঙ্গেও। নজরুলের শিশু ভাবে, সে ছিলো কাজলা দীঘির পদ্মফুলে, নদীর বন্যায়, ঝড়ের দুরন্তপনায়। শিশুসম্ভব স্থান তাঁর চোখে সন্ধ্যাদীপের শিখা, আকাশ-পাতাল, বর্ষার মেঘ আর ঝরা ফুলও। বস্তুতঃ মায়ের কোলে আসবার আগে সে ছিলো সারা বিশ্বে ছড়ানো। তার ভাষায়,

যা দেখি মা, আজ মনে হয়
সবই মায়ের কোল,
বিশ্বভুবন কোলে করেই
আমারে দেয় দোল।...
তুমিই তো মা ছড়িয়ে আছো
বিশ্বময়ী হয়ে,
তুমিই নাচাও, তুমিই খেলো,
আমায় কোলে লয়ে।

'কিশোর স্বপ্ন' আর 'সংকল্প' ('থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে') চরিত্রে একই গোত্রের। প্রথমটিতে শিশু চায় দেশমাতার দুঃখ মোচনের জন্যে বাইরের জগৎ ঘুরে আসতে, 'সংকল্প'-এর নায়ক চায় বিশ্ব জগতের পরিচয় পেতে। 'ছোট হিটলার' কৌতুকস্পর্শী বীর রসের রচনা। এ-কবিতার নায়ক সানির কাছে আধুনিক কোনো সমরাস্ত্রই গ্রাহ্য করবার মতো বস্তু নয়; এয়ারগান, গুলতি আর 'রাগে-ঘোলা' চোখের মতো অস্ত্র দিয়েই সে হিটলার মুসোলিনিকে ঠাণ্ডা করতে চায়। এবং তার রণকৌশলে মুসোলিনি হেঁসেলে ঢুকে মশলা পিষবেন, হিটলার হবেন উড়ে বামুন। 'মাঙ্গলিক' আর 'মায়া-

মুকুর' প্রেরণামূলক কবিতা। 'বর প্রার্থনা' ব্যাঙ্গাত্মক, দেবী দুর্গার কাছে বরপ্রার্থী কোনো ভক্তের জবানিতে বিবৃত। তার কাম্যবস্তু মোক্ষ নয়, ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য। যার স্বরূপ,

...ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস তাড়া?
বাড়ীওয়ালা আসবে যখন চাইতে বাড়ী-ভাড়া?...
মাগো, রাতে যেন কামড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর, দিনে যেন সইতে না হয় গায়ে মাছির বসা।...
কাঁহাতক আর বেড়াই মাগো হেঁটে হটর হটর,
পেট্রোল যাতে খায় না, দিবি এমনি একটা মোটর।
তোর বৌমার বাক্স ভরে দিস মা কিছু গয়না,
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না...

'সারস পাখী' ব্যতিক্রমধর্মী রচনা— গ্রন্থের অন্য কোনো কবিতার সাথে এর চরিত্রগত মিল নেই। কাব্যিক লাবণিতে ঝলোমল, এ-কবিতা নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশুতোষ সৃষ্টি, যেমন, 'ঝিঙে ফুল'। বিশেষ কোনো বক্তব্য নয়, বস্তুতঃ সৌন্দর্য সৃষ্টিই এর মূল লক্ষ্য। অতি সাধারণ বিষয়ও যে প্রতিভার স্পর্শে অপরূপ সৌন্দর্যের আধারে পরিণত হতে পারে, 'সারস পাখী' তার এক স্মরণীয় প্রমাণ। কবিতাটির প্রথমাংশ,

সারস পাখী! সারস পাখী!
আকাশ-গাঙের শ্বেতকমল।
পুষ্প-পাখী! বায়ুর ঢেউ-এ
যাস্ ভেসে তুই কোন্ মহল?
তোরে ময়ূর-পঙ্খী করি'
পরীস্থানের কোন্ কিশোরী
হাল্‌কা পাখার দাঁড় টেনে যায়
নিম্নে কাঁপে সায়র জল।
গগন-কূলে ঘুম ভেঙে চায়
মেঘের ফেনা অচঞ্চল।

উপরি-উক্ত কবিতাবলী ছাড়াও নজরুলের বেশ কিছু শিশুভোগ্য কবিতা আছে। এগুলির কোনো কোনোটি তাঁর বিভিন্ন বয়স্কজনপাঠ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যেমন, 'ছায়ানট'-এর অন্তর্ভুক্ত 'অমর-কানন', 'নতুন চাঁদ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'মোবারকবাদ' ইত্যাদি। দুটি কবিতা তাঁর মক্তবপাঠ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়,—'চাষী' এবং 'মৌলবী সাহেব'। কবি আবদুল কাদির তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র বিভিন্ন খণ্ডে বেশ কয়েকটি শিশুপাঠ্য কবিতা এবং গান সংকলিত করেছেন। এগুলির মধ্যে আছে 'চড়ুই পাখীর ছানা', 'মুকুলের উদ্বোধন', 'লাল সালাম', 'আবাহন', 'আগা মুর্গী লেকে

ভাগা' ইত্যাদি। আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুল-কিশোর-সমগ্র'-তে কবিতা আছে অনেক। কিন্তু গ্রন্থখানি জগাখিচুড়ি। এর কবিতাভাগের অধিকাংশ কবিতাই শিশু বা কিশোরদের জন্যে লিখিত নয়। ব্যবসায়িক লোভে গ্রন্থখানির কলেবর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এতে এমন কবিতাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা নিছক প্রেমের এবং তাই সর্বতোভাবেই বয়স্কপাঠ্য। যেমন, 'প্রেমের ছলনা'। আবার, নজরুলের ছেলেবেলায় লেখা চিঠিপত্রও এ গ্রন্থে শিশুপাঠ্য বলে বিবেচিত। তবে, 'নজরুল-কিশোর-সমগ্র'-তে সংকলিতপূর্ব কিছু কবিতাও রয়েছে। যেমন, 'ঝুমকো লতায় পাখী', 'আগুনের ফুলকী ছুটে', 'ফিরদৌসের পথ-ভোলা পাখী', 'জিজ্ঞাসা', 'শিশু সওগাত', 'আবীর', 'কিশোর', 'নতুন পথিক', 'ফ্যাসাদ', 'বগ দেখেছ', 'মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়' আর 'নতুন খাবার'। 'প্রজাপতি', 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে', 'ওরে হুলোরে তুই রাত বিরেতে' ইত্যাদি গান নজরুল লিখেছিলেন বয়স্ক পাঠকদের জন্য। কিন্তু এগুলি এখন প্রধানতঃ শিশুদের দখলে।

এই সব ছন্দিত রচনা, পূর্বোক্ত ছন্দিত রচনাগুলির মতোই, নানা ধরনের। এগুলির কিছু নজরুল লিখেছিলেন শিশু-কিশোরদের প্রেরণা দানের জন্য, কিছু বা আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে। বাৎসল্য রসের কবিতাও দুই-একটি আছে। এবং বেশ কয়েকটি কবিতা আর গান হাস্যরসের।

'চড়ুই পাখীর ছানা' আর 'অমর-কানন' নজরুলের স্কুলভিত্তিক রচনা। এক সময়ে তাঁর ইস্কুলের (রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল) দুজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষেও তিনি দুটি কবিতা রচনা করেন,—'করুণ গাথা' আর 'করুণ-বেহাগ'। রচনা হিসেবে পাঠযোগ্য হলেও বিষয়ের অতিসাময়িকতার কারণে এই কবিতা দুটি তেমন উল্লেখ্য নয়। 'চড়ুই পাখীর ছানা' রচনা হিসেবে খুব স্বচ্ছন্দ নয়, কিন্তু বিষয় আর বক্তব্যের দরুণ মনে রাখবার মতো। কবিতাটি লিখিত হয় একটি চড়ুই ছানা নিয়ে দুষ্টু ছেলেদের কাড়াকাড়ি উপলক্ষ করে। শেষ পর্যন্ত একটি মাতৃহারা ছেলে ছানাটিকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়। এই অংশে কবিতাটি রীতিমত মর্মস্পর্শী। ছেলেটির নাম পাঁচু এবং

> মা মরেছে বহুদিন তার, ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ,
> তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠলো বেজে করুণ বেহাগ।
> মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে,
> ছানার দু'টি সজল আঁখি করলে আশিস পরাণ খুলে।
> অবাক-নয়নে মা'টি তাহার রইলো চেয়ে পাঁচুর পানে,
> হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
> পাখীর মায়ের নীরব আশিস যে ধারাটি দিল ঢেলে,
> দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমায়ের বিশ্ব মিলে।

'অমর-কানন' গানটি নজরুল লিখেছিলেন ১৯২৫ সালে, বাঁকুড়া জেলার একটি

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় অমর নামক এক তরুণের চেষ্টায়। গানটিতে অবশ্যি তার প্রতি স্মৃতিতর্পণ নেই, আছে বিদ্যালয়টির পরিবেশ আর ছাত্রদের কাজকর্মের বর্ণনা। জনপ্রিয়তার কারণে গানটি নজরুলের নির্বাচিত গানের সংকলন 'নজরুল-গীতিকা'তেও স্থান পায়। 'অমর-কানন'-এর একাংশ,

...দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব্‌-ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ ॥

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি, নিজে ধরি হাল,
সদা খুশী-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি গো ভেঙে হরিতকি-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় শাখী, গানের মাতন ॥...

প্রসঙ্গতঃ, 'নজরুল-রচনাবলী'-র প্রথম খণ্ডে সংকলিত 'মুকুলের উদ্বোধন' শীর্ষক কবিতাটিকে সম্পাদক আবদুল কাদির 'কোনো বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠানে' পঠিত বলে অনুমান করেছেন। আমার ধারণা, 'লাল সালাম'-ও এমনি কোনো অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। দুটি কবিতাই বাংলা ১৩২৮ সালে কুমিল্লার দৌলতপুরে লিখিত। বিষয়ের দিক থেকে যদিও অতি সাময়িক, দুটি রচনাই সুখ-পাঠ্য। প্রথম কবিতাটির সূচনা ভাগ,

বীণাপানির সুর-মহলের কোন্ দুয়ার আজ খুললো রে,
কোন্ সুখে আজ মন আমাদের দোদুল-দোলায় দুললো রে!
সবুজ শাড়ীর ধানী আঁচল জারুল ফুলের বেগ্‌নী পা'ড়—
উড়িয়ে কে ঐ আস্‌লো রে ভাই আকাশ-বীণায় বাজিয়ে তার।
সোনাল ফুলে লুটালো তার হল্‌দী-রাঙা উত্তরী,
খাপছাড়া ঐ মেঘগুলি যায় ভেসে তারি দূর তরী।...

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নবারুণ' শিশু সাহিত্য সংকলনের অন্তর্গত 'শিশু সওগাত' এবং 'নতুন চাঁদ' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত 'মোবারকবাদ' আসলে উদ্বোধনী রচনা হিসেবে লিখিত। প্রথমটি প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'শিশু সওগাত' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি দৈনিক 'আজাদ'-এর শিশু বিভাগ 'মুকুলের মহফিল'-এর প্রকাশ উপলক্ষে (৭ই আগষ্ট, ১৯৪১)। 'শিশু-সওগাত'-এর লক্ষ্য ছিলো অবিশেষ শিশু —সমগ্র শিশু সমাজ। নজরুল তাদের দেখেছেন নতুন প্রভাতের—এবং সেই সঙ্গে শক্তির প্রতীক রূপে,

...তোরে চেয়ে নিতি রবি ওঠে পূরবে,
তোর ঘুম ভাঙিলে যে প্রভাত হবে।

ডালে ডালে ঘুম-জাগা পাখীরা নীরব,
তোর গান শুনে তবে ওরা গাবে সব।...
তোর দিন অনাগত, শিশু তুই আয়,
জীবন মরণ দোলে তোর রাঙা পায়।
তোর চোখে দেখিয়াছি নবীন প্রভাত,
তোর তরে আজিকার নব সওগাত।

'মোবারকবাদ' যখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিলো 'মুকুলের মহফিল'। যদিও এটি উদ্বোধনী কবিতা, নজরুল এতে 'মুকুলের মহফিল'-এর সভ্যদের উদ্দেশে কিছু মূল্যবান নীতিমূলক উপদেশ দেন। 'আজাদ'-এর এই শিশু বিভাগটির প্রথম পরিচালক(বাগবান) প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং শিশু সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদাব্বের কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত চারটি লাইন মহফিলের সভ্য-কার্ডে মুদ্রিত করেন'

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা অনেক উর্দ্ধে, জেনো;
চাপরাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো!
আল্লার কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিও না নীচু!

'চাষী' এবং 'মৌলবী সাহেব' নীতিবাদী কবিতা এবং প্রসাদগুণে অসচ্ছল। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে শিশু-কিশোররা কবিতা দুটি কখনো আপনা থেকে পাঠ করেছে বলে মনে হয় না।

বাংলা ১৩৪১ সালের 'ছোটদের মধুচক্র'-এ প্রকাশিত এবং 'নজরুল রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত 'আগা মুর্গী লে কে ভাগা' অতি উপভোগ্য হাস্যরসের রচনা। এর লক্ষ্য অর্থব্যবসায়ী আফগান, এদেশে যারা কাবলিওয়ালা বলে পরিচিত। নজরুল এদের নিয়ে কিছু নির্মল কৌতুক করেছেন। গানটির একাংশে দেখা যায়, আগা (গানটির নায়ক) গাছে চড়ে জাম খাওয়ার সময় জাম ভেবে একটি ভোমরা মুখে পুরে ফেলে। ভোমরাটি যখন এর প্রতিবাদে বা যন্ত্রণায় চুঁচুঁ আওয়াজ শুরু করে, তখনও আগা নিজের ভুল বুঝতে পারে না। বরং বলে, কোনো আপত্তিই সে শুনবে না, কালো রঙের সব কিছুই খেয়ে ফেলবে। এটুকু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে লোককাহিনী হিসেবেও প্রচলিত আছে। 'আগা মুর্গী লে কে ভাগা'-র প্রথম এবং শেষ অংশ–

একদা তুমি আগা দৌড়কে ভাগা মুরগী লে কে।
তোমারে ফেলনু চিনে ঐ আননে জমকালো চাপ দাড়ি দেখে'।...

ওপাড়ার হীরু তোমায় দেখেই পালায় পগার-পাড়ে,
'রূপিয়া লে আও' ব'লে ধরলে তাহার ছাগলটারে।
দেখিয়াই মট্‌রু মিঞার মুর্গী লুকায় ঝোপের আড়ে,

তাই কি ছেলেমেয়ে মুর্গী-চোরা বলে ডেকে'॥

'নজরুল-কিশোর সমগ্র'তে সংকলিত পূর্বোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে সাধারণ আনন্দদায়ক রচনা হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'ঝুমকো লতায় জোনাকী' এবং 'আগুনের ফুল্‌কী ছুটে'। কথায় অতি সাধারণ, দ্বিতীয় কবিতাটি কাব্যিক সৌন্দর্যে আর ছন্দের ঝঙ্কারে বাস্তবিকই উপভোগ্য। রচনাটি গীতিধর্মী। এর প্রথম স্তবকটি পাঠকদের জন্যে এখানে উদ্ধৃত করছি,

আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌ কী ছুটে!
ফাগুনের ফুল কি ফোটে নবযুগ-পত্রপুটে
ফাগুনের ফুল কি ফোটে?
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌কী ছুটে!
উল্কার উল্‌কি-লেখায়
নিশীথে পথ কে দেখায়?
আকাশে হজরত আলীর আগ্নেয় 'দুল্‌ দুল্‌' কি ছুটে?
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌কী ছুটে!

'আবাহন' বাৎসল্যরসের দীর্ঘ কবিতা। 'নজরুল-কিশোর সমগ্র'-এর আগে, ১৯৬৭ সালে, 'নজরুল-রচনাবলী'-র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়। চরিত্রে ' কোথায় ছিলাম আমি' আর 'শিশু যাদুকর'-এর সগোত্র, এই কবিতাটি নজরুলের প্রথম জীবনের রচনা এবং 'ঝিঙে ফুল'-এর 'শিশু যাদুকর'-এর মতো এতেও শিশুর অবির্ভাবপথের কথা বর্ণিত হয়েছে। কবিতা হিসেবে এটি 'শিশু যাদুকর'-এর থেকে উন্নততরো। অন্য দিকে, 'ঘুম-জাগানো পাখী'-র 'কোথায় ছিলাম আমি'-তে রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা' শীর্ষক কবিতার যে প্রভাব দেখি, 'আবাহন'-এ তা আরো গভীর এবং আরো প্রত্যক্ষ। 'জন্মকথা'-র মায়ের মুখে শুনি, তাঁর শিশু ইচ্ছে হয়ে তাঁর মনের ভেতরে লুকিয়ে ছিলো। আর, 'আবাহন'-এর মাও স্পষ্টই বলেন, তাঁদের 'সকল ইচ্ছা-'র মূর্তি নিয়ে শিশুর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি অবশ্যি শিশুর মধ্যে তাঁর শৈশব সত্তাকেও ফিরে পান,

... মোদের বুকের কামনায় কি সুপ্ত ছিলি ওরে,
শিশু হয়ে এলি সকল ইচ্ছা মূর্তি ধরে।...
আমার 'আমি' হারিয়ে ফেলে পেয়েছি আজ ফিরে'
বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া আমার 'আমি'টিরে।

প্রসঙ্গতঃ, নজরুলের বাৎসল্যরসের এই জাতীয় অন্যান্য কবিতা কোন্‌ সময়ের রচনা আমরা সঠিক জানিনে। কিন্তু 'আবাহন'-এর প্রথম প্রকাশকাল (১৯২২ সাল) দেখে নির্ভুলভাবেই বুঝতে পারি, এটি তাঁর বিবাহপূর্ব জীবনের রচনা। কিন্তু কবিতাটিতে নবজাতককে কেন্দ্র করে মায়ের যে অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, কুমার নজরুল তাঁকে তাঁর কবিপ্রতিভার বলে বিস্ময়করভাবে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। তবে, রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা' যেমন তার দার্শনিক তত্ত্বের জন্যে ঠিক শিশুজনবোধ্য হয়ে উঠতে পারেনি,

নজরুলের 'শিশু যাদুকর', 'কোথায় ছিলাম আমি' আর 'আবাহন'-ও তেমনি বোধ্যতার দিক থেকে শিশুদের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে।

'নতুন পথিক' শীর্ষক কবিতাটিও শিশু -কেন্দ্রিক। কিন্তু 'শিশু যাদুকর' আর 'আবাহন'-এ শিশু নবজাতক এবং বিশেষ শিশু । আর, 'নতুন পথিক'-এর শিশু অবিশেষ, সাধারণভাবে সকল শিশু । নজরুল তাদের দেখেছেন 'নতুন যুগের মানুষ' রূপে। কবিতাটি ছোটো। তার সবটুকুই এখানে উদ্ধৃত করছি,

নতুন দিনের মানুষ তোরা
আয় শিশুরা আয়!
নতুন চোখে নতুন লোকের
নতুন ভরসায়।

নতুন তারার বেভুল পথিক
আস্‌লি ধরাতে,
ধরার পারে আনন্দলোক
দেখাস্‌ ইশারায়।

খেলার সুখে মাখ্‌লি তোরা
মাটির করুণা,
এই মাটিতে স্বর্গ রচিস
তোদের মহিমায়।

'মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়' আর 'নতুন খাবার' হাস্যরসের কবিতা। প্রথমটি কাহিনীমূলক। বিষয় এবং ভাষার দিক থেকে 'ঝিঙে ফুল'-এর শেষ দু'টি কবিতা — 'ঠ্যাংফুলী, আর 'পিলে পটকা'-র সাথে এর কিছুটা মিল আছে। 'ঠ্যাং-ফুলী' আর 'পিলে পটকা'-তে যেমন, তেমনি এখানেও হাসির উৎস নায়কের আঙ্গিক ত্রুটি আর উদ্ভট আচরণ এবং নজরুলের নিজস্ব ঢঙে গড়া কিছু শব্দ। এ-ধরনে সৃষ্ট হাস্যরস, যতো দূর জানি, বাংলা শিশু সাহিত্যে তাঁর আগে আর কেউ পরিবেশন করেন নি। 'মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌ কুল রায়' যথাসময়ে গ্রন্থিত না হওয়ায় তার সাথে অনেক পাঠকেরই পরিচয় নেই। এখানে মট্‌কুর কিছু পরিচয় দেওয়া হল,

মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়
বেঁটে খাটো নিট্‌পিটে পায়

ছেৎরে চলে কেৎরে চায়।
মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়
পায়ে প'রে গারদা বুট আর পট্টি

গড়াইয়া চলে গাঁঠরি ও মোটটি,
হনু লুলু সুরে গায় গান উদভট্টি
হাঁটি হাঁটি পা পা ডাইনে বাঁয়।
মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়॥

রাস্তায় তেড়ে এল এঁড়ে এক দামড়া।
টুঁস খেয়ে মট্‌কুর ছ'ড়ে গেল চামড়া।
ভয়ে মট্‌কুর চোখ হয়ে গেল আমড়া,
সে উলটিয়ে সাতপাক ডিগবাজি খায়।
মট্‌কু মাইতি বাঁটকুল রায়॥

'নতুন খাবার' সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' জাতীয় রচনা। দুটি ক্ষেত্রেই আজব আজব খাবারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সুকুমার রায়ের কবিতায় আজব খাবারের তালিকাই প্রধান। এবং সে-তালিকার খাবারগুলির উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার উদাহরণ হিসেবে। নজরুল তাঁর কবিতায় কেবল আজব খাবারের নাম জানিয়েই সন্তুষ্ট নন। তিনি তাঁর উল্লিখিত খাবারগুলি তৈরির এবং খাওয়ার পদ্ধতিও বাৎলে দিয়েছেন,

কম্বলের অম্বল
কেরোসিনের চাট্‌নি,
চামচের আমচুর–
খাইছ কি নাৎনি?

আমড়া দামড়ার
কান দিয়ে ঘষে নাও,
চামড়ার বাটীতে
চটকিয়ে কষে খাও! ...

শেয়ালের ল্যাজ
গোটা দুই প্যাঁজ
বেশ ক'রে ভিজিয়ে,
ঘুট ক'রে খেয়ে ফেল।
মুখে কোন্ কথা এল?
'কি মজার চীজ্ ই এ'! ...

'জিজ্ঞাসা' নজরুলের আর একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিশুতোষ কবিতা। দৃশ্যতঃ কিশোরসুলভ কিছু সন্ধিৎসার প্রকাশ হলেও আসলে এটি তত্ত্বমূলক রচনা। নজরুলের

শিশুপাঠ্য কবিতায় তত্ত্ব তথা দর্শন আমরা আগেও দেখেছি—'শিশু যাদুকর', 'আবাহন', 'কোথায় ছিলাম আমি' ইত্যাদিতে। তবে, সে সব কবিতার তত্ত্ব বা দর্শন মানুষের জন্মবিষয়ক। কিন্তু 'জিজ্ঞাসা'য় আমরা তাঁর যে সন্ধিৎসা দেখি, তা ব্যক্ত হয়েছে জগৎ তথা তার পরিচালককে কেন্দ্র করে। কবিতাটির তাই বিকল্প নাম দেওয়া যেতে পারে জগৎ-জিজ্ঞাসা। এখানে নজরুল কিশোর মনের প্রশ্ন হিসেবে যা উত্থাপন করেছেন, তাঁর বিখ্যাত গান ' খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে'-তে আমরা পাই তারই পরিণত, বয়স্কজনসুলভ রূপ। তিরিশের দশকের শেষ দিকে রচিত এবং প্রকাশিত 'জিজ্ঞাসা'-র প্রথম এবং শেষ স্তবক এখানে তুলে দিচ্ছি,

রব না চক্ষু বুঁজি,
আমি ভাই, দেখব খুঁজি
লুকানো কোথায় কুঁজি
দুনিয়ার আজব-খানার !
আকাশের প্যাঁট্ রাতে কে
এত সব খেলনা রেখে
খেলে ভাই আড়াল থেকে,
সে ও ভাই ভারী মজার ! ..

সে কে ভাই রাখাল ছেলে
এত সব খেলমা ফেলে
নিরালায় একলা খেলে
উদাসীন গহন ছায়ায় ?
নিশিদিন কানন-গিরি
তাহারেই খুঁজে ফিরি;
বাঁশী তার আমায় ঘিরি
কেবলই যায় কেঁদে যায়।

আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি, নজরুলের শিশুতোষ রচনাবলীতে গদ্যের পরিমাণ কম। বস্তুতঃ, 'পুতুলের বিয়ে'-র নাম নাটিকা এবং কথোপথন জাতীয় রচনা কয়টির বাইরে তাঁর শিশুভোগ্য গদ্য রচনা নেই বললেই চলে। ছোটোদের জন্যে তিনি সম্ভবতঃ পৃথকভাবে কোনো গল্প রচনা করেন নি। এ-পর্যন্ত তাঁর যে কয়টি শিশুপাঠ্য গল্প পাওয়া গেছে, সেগুলির সবই বিদ্যার্থীদের জন্যে লিখিত এবং তাঁর 'মক্তব-সাহিত্য' নামক পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত।

'মক্তব-সাহিত্য'-এ আমরা গল্প পাই তিনটি। কোনোটিই সম্পূর্ণতঃ মৌলিক রচনা নয়, প্রচলিত কাহিনীর পুনর্লিখন। এগুলির নাম 'ঈদের দিনে', 'মরা কাউয়া' আর 'চাদর'। এগুলির মধ্যে 'ঈদের দিনে' হজরত মোহাম্মদের 'শিশু প্রীতি' তথা

মানবসেবার কাহিনী। বহু প্রচলিত এই কাহিনীতে দেখি, ঈদের দিনে এক এতিম শিশুকে তিনি আপন সন্তানের মর্যাদা দিয়ে ঈদের আনন্দ দান করেছেন। ঈষৎ সংক্ষেপিত এবং সম্পাদিত আকারে রচনাটি বাংলাদেশের স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও পাওয়া যায়। তবে, তাতে নজরুলের নাম কোনোভাবেই উল্লিখিত হয়নি। দ্বিতীয় গল্পটি ঈষৎ কৌতুককর— কোনো বিদ্বান ব্যক্তির সাথে সাংসারিক বিষয় নিয়ে তাঁর গৃহিণীর বিবাদের কাহিনী। গল্পটির প্রথমাংশ,

এক ছিলেন পণ্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার করে বৃদ্ধ বয়সে দিন-রাত বইপত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুঁজে যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছুদিন চললে সংসার চলবে না; উপোস করে মরতে হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পণ্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে বলতে লাগলেন —'এই চোখ বুঁজে টিকি উঁচিয়ে বসে থাকলে ছেলেমেয়েরা খাবে কী? বাড়ীতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এই সব ভণ্ডামী করে কি টাকা পাওয়া যায়?' ...

ওপরের উদ্ধৃতিটুকু থেকে লক্ষণীয়, এর ভাষা অত্যন্ত সরল এবং স্বচ্ছন্দ আর ঢঙে মজলিসী। 'মক্তব-সাহিত্য'-এর অন্য গল্পটিতেও এই ধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এ-ভাষা সর্বতোভাবেই শিশুতোষ গল্পের উপযোগী। গল্প পরিবেশনে আঙ্গিকগত দিক থেকেও নজরুল যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশুতোষ গল্প রচনায় মনোযোগী হলে তিনি যে একজন উঁচুদরের কথাকার হতে পারতেন, তা প্রায় নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে।

নজরুলের শিশুতোষ রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একাঙ্কিকা 'পুতুলের বিয়ে'। তিনি যদি ছোটোদের জন্যে আর কিছু নাও লিখতেন, তবু কেবল এই রচনাটির জন্যেই তাঁকে একজন বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক বলে চিহ্নিত করা যেতো। সব সার্থক শিশু-সাহিত্যেরই একটি বৈশিষ্ট্য হল— এতে লেখকরা ছোটোদের দলে মিশে একেবারে তাদেরই সগোত্র হয়ে পড়েন। এদিকে, নজরুলের নিজেরই উক্তি, 'আমি চির শিশু চির কিশোর'। তিনিই বা তাহলে ছোটোদের থেকে আলাদা হয়ে থাকবেন কেমন করে? বস্তুতঃ তিনিও আর সব সফলকাম শিশু-সাহিত্যিকের মতোই আপন রচনার চরিত্রাবলীর সাথে মিশে গেছেন। অপিচ, তাঁর একটি উপরি গুণ, তিনি কেবল 'চির শিশু চির কিশোর'ই নন, তাঁর মধ্যে মিশে আছে এক বিদ্রোহী, সংস্কারক আর হাসি-গানের পাগলও। 'পুতুলের বিয়ে'তে আমরা তাঁর এই পাঁচমিশেলী রূপ পাই একই আধারে — যে রূপ তাঁর অন্যান্য শিশুতোষ রচনায় রয়েছে বিক্ষিপ্ত হয়ে।

'পুতুলের বিয়ে'র কাহিনী নির্মিত হয়েছে কমলি, টুলি, পঞ্চি, খেঁদি আর বেগম নামের ছোটো ছোট পাঁচটি মেয়ের পুতুল খেলা নিয়ে। কমলি তার দুটি পুতুল ছেলের

জন্যে কনে খুঁজছে। তার একটি ছেলের নাম ফুচুং। সে দেখতে চীনাদের মতো। তার সঙ্গে কেউ তাই মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নয়। আর একটি ছেলের নাম ডালিম কুমার। সে দেখতে রাজপুত্রের মতো। সব পুতুল মেয়ের মায়েরই ইচ্ছে, তাকে জামাই করে। এই নিয়ে বেধে যায় ঝগড়া। শেষে, ফুচুং আর ডালিম কুমারের মা কমলি অনেক চেষ্টায় ফুচুংয়ের জন্যে ঠিক করে একটি জাপানী মেয়ে, যার মা বেগম। আর, ডালিম কুমারের জন্যে বেছে নেয় এক মেম কনে। সঙ্গে সঙ্গে পুরুত ডেকে বিয়ে সেরে ফেলা হয়। তারপর সব মেয়ে একে একে বর কনেদের আশীর্বাদ করে যার যার বাড়ী চলে যায়। সংক্ষেপে এই হচ্ছে 'পুতুলের বিয়ে'র কাহিনী।

কমলি-টুলিরা ছাড়াও নাটিকাটিতে আরো কয়েকটি চরিত্র আছে। বিয়ের আয়োজনের সময় কমলিদের দলে এসে জুটেছে তার দাদা। যার কাজ হল বিয়ের ভোজ খাওয়া আর সবাইকে হাসানো। আরো এসেছেন পুরুত ঠাকুর। যিনি কথায় কথায় 'ধর্ম গেল, জাত গেল' বলে চীৎকার করেন। শেষদিকে একবার কমলির ঠাকুরমার গলাও শোনা যায়। কিন্তু একটি হাঁক দেওয়া ছাড়া নাটিকায় তাঁর আর কোনো কাজ নেই। পুরুত ঠাকুর আর ঠাকুরমা— দুজনেই রক্ষণশীলতার প্রতীক। তবে পুরুত ঠাকুরের রক্ষণশীলতা নমনীয়। তিনি হাওয়া বুঝে চলতেও জানেন।

এই সব পাত্রপাত্রী আর বিষয় নিয়ে লিখিত নাটিকাটি ছোটোদের আচার আচরণ, ভাষাভঙ্গি ইত্যাদির ছোঁয়ায় সুমধুর। এর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির কিছু পরিচয়। এমন কি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব তথা সর্বমানবের একজাতিত্ব বোধের আভাসও এতে পাওয়া যাবে। এছাড়াও রয়েছে আরো দুই একটি ছোটোখাটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ— যেগুলির মধ্যে ফুটে ওঠে নজরুলের প্রগতিশীল মনের পরিচয়।

নজরুল ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একজন বড়ো সমর্থক। সাম্প্রদায়িক বিরোধে তিনি সব সময়ই গভীর বেদনা বোধ করেছেন। তাঁর এই পরিচয় 'পুতুলের বিয়ে'-তে ধরা পড়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে! কমলির ছেলে ফুচুংয়ের সাথে বেগমের মেয়ে গেইশার বিয়ের কথা যখন প্রথম ওঠে, তখন হঠাৎ বৌদি কমলিকে বলে "আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি ক'রে।" সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই এক সাথে এর প্রতিবাদ করে। কমলি আর টুলির ভাষায় সে-প্রতিবাদের নমুনা,

'কমলি। না ভাই, ও কথা বলিস্‌নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা। ...

টুলি। সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম, এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম বলে কি তাকে

ঘেন্না করতে হবে ?

কিন্তু— শুধু কি এই সব কথা ? কমলিরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একখানি গানও গেয়ে ফেলে। এরপর খেঁদির মুখে আর কোনো কথা থাকে না।

কেবল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই নয়, 'পুতুলের বিয়ে'তে নজরুল পরোক্ষভাবে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথাও তুলেছেন। কমলিদের দলে দুটি মেয়ে— খেঁদি আর পঞ্চি—যথাক্রমে বাঁকুড়া আর ময়মনসিংহের বাসিন্দা। তারা নিজ নিজ অঞ্চলের কথ্য ভাষায় কথা বলে। আমরা সাধারণতঃ আঞ্চলিক কথ্য ভাষা শুনে কৌতুক বোধ করি। কিন্তু 'পুতুলের বিয়ে'-র একটি চরিত্রের মুখেও এ নিয়ে কোথাও ঠাট্টা-উপহাসের কথা উচ্চারিত হয়নি। তারা খেলার সঙ্গিনীদের যেমন সহজে গ্রহণ করেছে, আঞ্চলিক ভাষা-বৈচিত্র্যকেও তেমনি স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দু মেয়ে কমলির ছেলে ডালিম কুমার 'সায়েব' আর ফুচুং চীনা এবং মুসলমান বেগমের মেয়ে গেইশা জাপানী। ফুচুং-ডালিম কুমার গেইশার বিয়ে তাই কমলি চট করে মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু এটা নেহায়েৎ ছেলেমানুষী দ্বিধা। কিংবা বলা যেতে পারে, পরিবেশগত সংস্কারের প্রভাব। সে যা-ই হোক, পুরুত ঠাকুর যখন ফুচুং-গেইশার বিয়েতে মন্ত্র পড়তে ইতস্ততঃ করেছেন, তখন কিন্তু তারা আর নীরব থাকেনি। এইভাবে নজরুল তাদের মন থেকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের সব ভাবনা উড়িয়ে দেয়।

আগেই বলেছি' 'পুতুলের বিয়ে'-র একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য, এতে বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির কিছুটা পরিচয় আছে। ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে জুটেছে পাঁচটি ছোটো ছোটো মা। তারা কখনো ছেলেমেয়েদের আদর বা নিন্দা করে ছড়া কাটে, কখনো একের পর এক বিয়ের নানা রকম গান গায়। এই সব ছড়া আর গানের প্রতিধ্বনি, তাদের আঞ্চলিক ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি ইত্যাদির অনেক টুকরো পরিচয় নাটিকাটিতে ছড়িয়ে আছে। আঞ্চলিক লোক-সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে এগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। সব ছড়া বা গান এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটি গান এবং একটি ছড়া এখানে তুলে দিচ্ছি। গানটি বিয়ের, গেয়েছে বেগম,

শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক।
দেয় মোবারক-বাদ আলম রসুলে-পাক আল্লা হক ॥
আজ এ খুশীর মহ্‌ফিলে
দুল্‌হা ও দুল্‌হিনে মিলে
মিলন হ'ল প্রাণে প্রাণে
মাশুক আর আশক ॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এস এ মিলন-উৎসবে,

দোওয়া কর আজ এ খুশীর
গুলিস্তান গুল্‌জার হোক ॥

এবার ময়মনসিংহের মেয়ে পঞ্চির মুখের ছড়া। এই ছড়াটিতে আঞ্চলিক ভাষা ও অত্যন্ত মিষ্টি এক সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে। আঞ্চলিক জীবনযাত্রার একটু আভাষও এতে পাওয়া যাবে। ছড়াটি বরের আশীর্বাদের,

চুল মেলবা সোনার খাড়ে,
নাইবা ধুইবা পদ্মার ঘাড়ে।
ভাত খাইবা সোনার থালে
বেন্নন খাইবা রূপার বাড়িতে।
আঁচাইবা ডাবর-ভরা
পান খাইবা বিরা বিরা।
সুপারি খাইবা ছরা ছরা,
খয়ের খাইবা চাক্কা চাক্কা।
চুন খাইবা খুট্‌রি-ভরা,
পেচ্‌কি ফেলাইবা লাদা লাদা।

বিয়ের প্রসঙ্গে নজরুল এরূপ আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা বাহ্যতঃ তুচ্ছ, কিন্তু এদেশের অনেকের পারিবারিক জীবনে অনেক অশান্তির কারণ। এটি হল বহুবিবাহ সমস্যা। নজরুল অবশ্যি সমস্যাটি নিয়ে প্রত্যক্ষ বা বিস্তারিতভাবে কিছু বলেননি। কিন্তু নাটিকার সংশ্লিষ্ট ঘটনাটুকু থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সমাজের এই সমস্যাটির ফলাফল সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং আর সব সুস্থবুদ্ধি মানুষের মতোই সতীন-সমস্যা সৃষ্টির ঘোর বিরোধী। সব পুতুল-মেয়ের মায়েরই যখন কমলির পুতুল ছেলে ডালিমকুমারকে জামাই করবার সাধ, তখন পঞ্চি প্রস্তাব করে বসে, 'কমলিরে বোনডি ! তোর পোলারে দুইট্যা মায়্যার সাথেই বিয়া দিয়া দে।' কমলি একটু দ্বিধার পর এতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু টুলি ক্ষেপে ওঠে,' কি? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে ? আমি বেঁচে থাকতে নয়। তারপর সে মেয়ে পুঁটুরাণীর হয়ে সতীন-বিরোধী এক দীর্ঘ ছড়া আওড়ে দেয়।

'পুতুলের বিয়ে'-র সংক্ষিপ্ত পরিসরে নজরুল অবরোধ প্রথার ওপরও আঘাত হেনেছেন। এই আঘাত একেবারে প্রত্যক্ষ। সমাজের অঙ্গ হিসেবে মেয়েদের অগ্রগতির যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং অবরোধ প্রথা যে এই অগ্রগতির বিরোধী, নজরুল তা স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন। কমলিদের আসরে আসতে বেগমের একটু দেরী হয়ে যায়। কমলি এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে, 'আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে! আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দার ভিতর বিবি করে রাখতে।' কমলি কথাটা শুনে অবাক, 'মা গো মা! কী হবে! অসৈরণ সইতে নারি! আটবছরের মেয়ে আবার বিবি হবে।' বেগম তখন ছড়া কেটে নিজের মতটাও জানিয়ে দেয়,—

মাগো মা
আমি বিবি হ'ব না!
আম কুড়োবো জাম কুড়োবো, কুড়োবো শুক্‌নো পাতা,
সোয়ামী করবে লাঙল-চাষ, আমি ধর্‌ব ছাতা।

ওপরে যেসব প্রগতিশীল মতামতের কথা বলেছি, শুধু সেইগুলিই 'পুতুলের বিয়ে'-র গুরুত্বের কারণ নয়। গুরুগম্ভীর, হাস্যরসিক, চিন্তাশীল ইত্যাদি নানা ধরনের চরিত্রের রূপায়ন, নাটকীয় ঘটনাবলীর চমকপ্রদ সমাবেশ এবং অতি স্বাভাবিক গতি, মিষ্টি সংলাপ ইত্যাদি নাটিকাটিকে সত্যিই উপভোগ্য করে তুলেছে। চরিত্রগুলি, যদিও শিশু, তাদের ভূমিকায় বা সংলাপে কোথাও কৃত্রিমতা কিংবা অকারণ ছেলে-মানুষি নেই। কমলির দাদা মণি বয়েসে কিশোর এবং এই নাটিকার এক বিশিষ্ট চরিত্র, যদিও তার কাজ কেবল হাস্যরস পরিবেশন। সে এই হাস্যরস পরিবেশন করে কখনো উদ্ভট রান্নার ফর্মুলা বাৎলে, কখনো খুনসুড়িপ্রতিম কথা শুনিয়ে, কখনো বা আজব বিষয়ের গান গেয়ে। বস্তুতঃ, কমলিদের পুতুল-বিয়ের আসরটি সে এমনিভাবে একেবারে মাতিয়ে রাখে। তার একখানি কমিক গান,

হেড মাষ্টারের ছড়ি, সেকেণ্ড মাষ্টারের দাড়ি
থার্ড মাষ্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড-পণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি॥
দাঁড়াইয়া ওই হাই বেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে ভেংচে,
খোঁড়া সেকেণ্ড পণ্ডিত যায় লেং'চে
হুঁকো হাতে বাড়ি,
তার মুখ নয় তোলো হাঁড়ি,
মোর হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ী॥

'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থের গদ্যে পদ্যে মেশানো রচনা চারটির নাম 'জুজুবুড়ীর ভয়', 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি' আর 'নবার নাম্‌তা পাঠ'।

'জুজুবুড়ীর ভয়'-এর সূচনা দুপুরবেলা ছাদে পাঁচটি ছেলেমেয়ের কিৎ কিৎ খেলা দিয়ে। এই খেলায় তাদের মায়ের ঘোর আপত্তি। তাঁর নির্দেশ, দুপুরবেলা ছেলেদের বই নিয়ে বসতে হবে, খুকীকে ঘুমোতে। তাঁর কাছে ধরা পড়বার পর তারা এক আজব কৈফিয়ত দেয়। ছাদে তারা নাকি খেলতে যায়নি, গিয়েছিলো মা-ধরা জুজুবুড়ী তাড়াতে। যে জুজুবুড়ীর কাজ হল সেই সব মাকে শাস্তি দেওয়া, যাঁরা যখন তখন খোকাকে দুধ খাওয়ান, জল ঘাঁটলে বকেন এবং রোদে বেড়াতে না দিয়ে ঘুম পাড়ান। তাদের প্রধান সাক্ষী খুকী। সে বলে,

মা গো, তোরে সত্যি বলি, দেখে এলুম ছাদে গিয়ে
মা-ধরা এক জুজুবুড়ী বসে আছে ঝুলি নিয়ে।

বল্‌লে, " যে মা খোকায় ধ'রে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুঠি ধ'রে তার তিন সের দুধ খাওয়ায় তায়।"
খবরদার মা, দুধ খেতে আর বলিসনেকো দোর দিয়ে। ...

বলাবাহুল্য, মা কোনো সাক্ষ্যে বা শাস্তির উল্লেখেই ভয় পাননি। তিনি ছেলেদের বই নিয়ে বসবার হুকুম দিয়ে খুকীকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেছেন।

'ছিনিমিনি খেলা'-র উপজীব্য কয়েকটি ছেলের পুকুরে খোলামকুচি ছুঁড়ে খেলা। এই খেলার সময় একজন বলে, 'আচ্ছা ভাই, মা যে বলে — জল ঘাঁট্‌লে সর্দি হয়, কই ব্যাঙের ত সর্দি হয় না।' সম্ভবত ঃ এরই উত্তরে পুকুরে ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। তখন ছেলেরা শুরু করে ব্যাঙের উদ্দেশ্যে একটি কৌতুককরণগান। যার মূল বক্তব্য ঃ ব্যাঙের মা যেমন তার বাচ্চাদের জলে ঘুরে বেড়ানোতে আপত্তি করে না, ছেলেগুলির মাও যদি তেমনি লক্ষ্মী হতেন। তাহলে তারাও ব্যাঙের সাথে জলেই থাকতো।

'কানামাছি'-র বিষয়ও খেলা। এই খেলার সময় একজন তালগাছে গুঁতো খায়। তখন আর একজন তালগাছের উদ্দেশ্যে একখানি গান গায়। গানখানি রবীন্দ্রনাথের এই বিষয়ের একটি কবিতার ('তালগাছ এক পায় দাঁড়িয়ে') কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্যি, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের রচনা দু'টির বক্তব্য এক নয়। নজরুলের গানখানি হাসির। তার প্রথমাংশ,

ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মতন পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই॥
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মতন এক পায়ে ভাই
দাঁড়িয়ে আছিস কান ধ'রে ঠায়,
একটুখানি ঘুমোয় না তোর
পণ্ডিত মশাই॥
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?

'নবার নাম্‌তা পড়া' নেহাৎই কৌতুকী। নাম্‌তা পড়তে বসে নবা গান ধরে, 'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল।' অতএব তাকে বাবার কাছে ধমক খেতে হয়। এরপর সে ধরে এক আজব গোছের নামতা,– 'এক্কেকে এক/বাবা কোথায়, দেখ!' ইত্যাদি। এবং নামতার পর গায় একখানি গান। যার বক্তব্য,– নামতা, অঙ্ক বা যুক্ত অক্ষর না থাকলে সে খুশী হত।

'পুতুলের বিয়ে'-র বাইরে এ-পর্যন্ত একটি মাত্র নাটিকা পাওয়া গেছে। এটি ছোট্টো একাঙ্কিকা, নাম 'জাগো সুন্দর চির-সুন্দর'। কল্পনা নামের একটি চরিত্রের পরিচালনায় এক এক কাল্পনিক অভিযানের কাহিনী নিয়ে লিখিত এই একাঙ্কিকাটি হাসি-কৌতুকে ভরপুর হয়েও আদর্শবাদী। এর প্রথমাংশে 'সাত ভাই চম্পা'-র একটি

কবিতাংশ পাওয়া যায়। এর থেকেই নাটিকাটির চরিত্রের তথা আদর্শের পরিচয় মিলবে।

'জাগো সুন্দর চির সুন্দর' রচনা হিসেবে সংযত এবং মার্জিত। এর সংলাপ সুখপাঠ্য। রচনার নমুনা হিসেবে নাটিকাটির একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি, কল্পনা–খুকী তুমি কোত্থেকে এলে? তোমার নাম কি?

বেনু– আমার নাম বেনু। আমি কোথাও থেকে আসি নি, এইখানেই লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছিলুম। সব দেখেছি, সব শুনেছি। ভয়ে কথাটি কইনি।

কল্পনা – তা বেশ, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গল গ্রহে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

বেনু– (ভয় পেয়ে) না! আমাকে 'হেদো'র কাছে নামিয়ে দাও, আমি এক ছুটে বাড়ী পালাব!

ওঙ্কার— তোর আঁচলে কি রে বেনু? অ! আমার হাফ প্যান্টের পকেট থেকে সব মুক্তো-মানিক চুরি করেছিস বুঝি? দে, দে আমার মুক্তো দে।

বেনু– বা রে, তোমার ছেঁড়া পকেট গলে ওগুলো আপনা থেকে আমার কাছে এসেছে! আমি চুরি করব! আচ্ছা, ওঙ্কার দা, তোমরা ব্যাটা ছেলে, তোমরা ও নিয়ে কি করবে? এখন ওগুলো তোমার কাছে থাক। তোমার বউ এলে মালা গেঁথে উপহার দেবো। ...'

নজরুলের শিশুতোষ রচনাবলীর আলোচনায় আমি এইখানেই ইতি টানছি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে নজরুলের স্থান কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর আমি ওপরে আলোচনায় নানা জায়গায় ছড়িয়ে রেখেছি। এখানে শুধু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, তাঁর শিশুতোষ রচনা যদিও পরিমাণে অল্প, তিনি আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্রষ্টা।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা —২য় সংকলন]

নজরুলের 'বিদ্রোহী'

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১. উপক্রমণিকা

'বিদ্রোহী' যেমন নজরুল ইসলামের খ্যাততম কবিতা, তেম্নি বাংলা কাব্যেতিহাসের এক প্রোজ্জ্বল প্রাসাদ। এই কবিতার বিচারে এর রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস, এর লোকপ্রিয়তা ও বিরুদ্ধতা, এর প্রকৃত মূল্যায়নের নানামুখী চেষ্টা, নজরুলের কবিতার অণুবিশ্ব রূপে এর অবস্থান, বাংলা কবিতার ইতিহাসে এর অভিনতুনত্ব— এই সমস্ত দিকই আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। বেদনার সঙ্গে মনে রাখতে হবে : এই কবিতার পাণ্ডুলিপি, খুব সম্ভবত, লুপ্ত হ'য়ে গেছে চিরতরে—পাওয়া গেলে বিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান কবিতার সৃষ্টিপদ্ধতির খানিকটা আঁচ পাওয়া যেতো।

২. রচনা

নজরুলের বন্ধু মুজফফর আহমদের সাক্ষ্য (কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা) অনুসারে, 'বিদ্রোহী' লেখা হয়েছিলো ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে, কলকাতার ৩/৪-সি তালতলা লেনের এক ভাড়াবাড়ির একতলায়। ঐ ঘরে নজরুল আর মুজফফর আহমদ একসঙ্গে থাকতেন। কবিতাটি নজরুল লিখেছিলেন রাতে, সকালে উঠে মুজফফর আহমদকে প'ড়ে শোনান। ('নজরুল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনাল,' ঐ, পৃ. ২৩৭)। কবিতাটির রচনা বিষয়ে মুজফফর আহমদ লিখেছেন ,

> আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না। তার ঘুম সাধারণত দেরীতেই ভাঙত, আমার মত তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভাঙত না। এখন থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে নজরুলের কিংবা আমার ফাউন্টেন পেন ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে তার হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।
>
> [পৃ. ২৩৭, কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা]

৩. প্রকাশ

সেদিনই 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী' পত্রিকা দুটির তরফ থেকে আফজালুল হক ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য নজরুলের কাছ থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নিয়ে যান।

'মোসলেম ভারত'ই প্রথম এই কবিতাটি পাওয়ার সৌভাগ্যের দাবিদার। 'মোসলেম ভারত' অতি অনিয়মিত পত্রিকা ব'লেই অবিনাশচন্দ্রের অনুরোধে ঐ কবিতা 'বিজলী'তেও দিয়েছিলেন—এবং সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রকাশকালে উল্লেখ করা হয়: 'কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছে যে, আমাদের স্থানাভাব হলেও তা 'বিজলী'র পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবার লোভ আমরা সম্বরণ করতে পারলাম না।' 'বিদ্রোহী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'বিজলী' পত্রিকায় ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি (২২শে পৌষ ১৩২৮) তারিখে। ' মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৯২১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর (কার্তিক ১৩২৮) সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়[১] (যদিও পত্রিকাটি বেরিয়েছিলো উল্লিখিত তারিখের অনেক পরে)। সেকালের পত্রিকার একটি রেওয়াজ ছিলো অন্য পত্রিকার শ্রেষ্ঠাংশ উদ্ধৃত করা। 'বিদ্রোহী' এই নিয়মে কয়েকটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়: 'প্রবাসী (মাঘ ১৩২৮), 'সাধনা' (বৈশাখ ১৩২৯), 'দৈনিক বসুমতী', 'ধুমকেতু' (২২শে আগষ্ট ১৯২২)[২] প্রভৃতি পত্রিকায়। মুজফফর আহমদ লিখেছেন,

> সাপ্তাহিক কাগজে বা'র হওয়ার কারণেই কবিতাটির প্রচার খুব বেশী হয়েছিল। কোনো মাসিক কাগজে ছাপা হলে এত বেশী প্রচার হতো না । শুনেছিলেম সেই সপ্তাহের 'বিজলী' দুবারে উনত্রিশ হাজার ছাপা হয়েছিল। অবশ্য, এটা আমি 'বিজলী' অফিস হতে কখনো যাচাই করিনি। ধরতে পারা যায়, প্রায় দেড়-দু'লক্ষ লোক কবিতাটি পড়েছিলেন। তার ফলে নজরুলের কবি-প্রতিষ্ঠা খুব বেশী রকম বেড়ে গেল।
>
> [২৪১, "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা"]

৪. প্রতর্ক ও প্রতিক্রিয়া

'বিদ্রোহী' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মহলে সাড়া প'ড়ে যায়। এই কবিতার অভিনতুনত্বে সচকিত হ'য়ে ওঠেন বাংলা রবীন্দ্রাচ্ছন্ন কবিতার পাঠক, তার ঢেউ গিয়ে লাগে অ-পাঠক বৃহত্তর জনসাধারণ্যে, এমনকি বিরুদ্ধতাও শুরু হ'য়ে যায়। প্রথমেই আমরা কবির 'বিদ্রোহী' ও প্রাসঙ্গিক কবিতাবলির একটি নকশা প্রণয়ন ক'রে নিতে চাই আলোচনার সুবিধার জন্য:

১ 'বিদ্রোহী': নজরুল ইসলাম।[৩]
সাপ্তাহিক 'বিজলী', ২২শে পৌষ ১৩২৮ (৬ই জানুয়ারি, ১৯২২)
'মোসলেম ভারত', কার্তিক, ১৩২৮
পুনর্মুদ্রণ: 'প্রবাসী', মাঘ ১৩২৮
পুনর্মুদ্রণ: 'সাধনা', বৈশাখ ১৩২৯
পুনর্মুদ্রণ : 'দৈনিক বসুমতী'
পুনর্মুদ্রণ : 'ধুমকেতু' প্রথম সংখ্যা, ২২শে আগস্ট ১৯২২

২ 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' : শ্রীমতী লীলা মিত্র। 'ধুমকেতু', আশ্বিন ১৩২৯

৩ 'কবি-বিদ্রোহীর প্রতি': মোহিতলাল মজুমদার। 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৩০

৪. 'ব্যাঙ': সজনীকান্ত দাস।
সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি', ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৪
৫ 'সর্বনাশের ঘণ্টা': নজরুল ইসলাম।[৪]
'কল্লোল', কার্তিক ১৩৩১
৬ 'দ্রোণ-গুরু': মোহিতলাল মজুমদার।
সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' ৮ই কার্তিক ১৩৩১ (২৫শে অক্টোবর ১৯২৪)
৭ 'নিয়ন্ত্রিত': গোলাম মোস্তফা[৫]
'সওগাত', মাঘ ১৩২৮
পুনর্মুদ্রণ : 'সাধনা' বৈশাখ ১৩২৯
৮ 'যৌবন' : সজনীকান্ত।[৬]
৯ 'ধূমকেতু' ঃ নজরুল ইসলাম।[৭]
অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', ২৬শে শ্রাবণ ১৩২৯ (১১ই আগস্ট ১৯২২)
১০ 'বিজয়িনী' : নজরুল ইসলাম[৮]
'মোসলেম ভারত' পৌষ ১৩২৮
১১ 'বিদ্রোহ দমন' : মোহাম্মদ আবদুল হাকিম।[৯]
'ইসলাম-দর্শন'
১২ 'প্রলয়-ভেরী': মোহাম্মদ গোলাম হোসেন।
'ইসলাম-দর্শন':
১৩ 'বিদ্রোহীর বাণী': নজরুল ইসলাম।[১০]
'ভারতী' বৈশাখ ১৩৩১
১৪ 'চির-বিদ্রোহী': নজরুল ইসলাম।[১১]

সেকালের কল্লোল-যুগের তিন নায়ক–বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে তাঁদের তৎকালীন প্রতিক্রিয়ার প্রতিলিখন পেশ করেছেন উত্তর-দিনে । সেই স্মৃতির কণিকামণিকাগুলি আহরণ করা যাক। বুদ্ধদেব লিখেছেন,

> 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হ'লো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।
>
> ['নজরুল ইসলাম', "কালের পুতুল"]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উক্তি ও উপলব্ধি,

> বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় একবার কিন্তু এমনি অকস্মাৎ তুফানের দুরন্ত দোলা লেগেছিল।/ সে দোলা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অনুভব করেননি তাঁদের পক্ষে শুধু লিখিত বিবরণ পড়ে সে অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। /....... রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার তখন মধ্যাহ্ন-দীপ্তি। দেশের যুবজনের মনে তাঁর আসনও পাকা। তারই মধ্যে হঠাৎ আর একটা তীব্র প্রবল তুফানের ঝাপটা কাব্যের রূপ নিয়ে তরুণ মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল–

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি—
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি!

কবিতার ছন্দে ও ভাষায় একি উত্তাল তরঙ্গ। কার কণ্ঠে ধ্বনিত এ প্রচণ্ড কল্লোল?/ কিশোর জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল, জেগে উঠেছিল একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ।/ মনে আছে, বন্ধুবর কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি কাগজ কোথা থেকে কিনে নিয়ে অস্থির উত্তেজনার সঙ্গে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলেছিলেন, পড়। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। রাস্তায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এ কাগজ নিয়ে।/ কি সে এমন কাগজ? নেহাত সাধারণভাবে ছাপা, যতদূর মনে পড়ছে ডবল ডিমাই সাইজ-এর সাপ্তাহিক কাগজ। পাতাগুলো আলগা, সেলাই করা নয়। দাম বোধ হয় চার পয়সা। সেই কাগজ কেনবার জন্যে সারা শহর ক্ষেপে গেছে? কেন?/... পড়লাম কবিতার নাম 'বিদ্রোহী।/....... সেদিন ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে রাজপথে সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে যে, কবিতার জ্বলন্ত দীপ্তি এমন তীব্র যে ছাপার অক্ষরই যেন কাগজে আগুন ধরিয়ে দেবে।/...গাইবার গান নয়, চীৎকার করে পড়বার এমন কবিতা এ দেশের তরুণরা যেন এই প্রথম হাতে পেয়েছিল। তাদের উদ্দাম হৃদয়ের অস্থিরতারই এ যেন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি।/ এ কবিতা যে সেদিন বাংলাদেশকে মাতিয়ে দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে!

['নজরুল-সন্ধ্যা' 'নজরুল প্রসঙ্গে']

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উচ্চারণ,

এ কে নতুন কবি? নির্জীব দেশে এ কার বীর্যবাণী? বাংলা সাহিত্য নয়, সমগ্র দেশ প্রবল নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। এমনটি কোনোদিন শুনিনি, ভাবতেও পারিনি।/ যেন সমস্ত অনুপাতের বাইরে, যেন সমস্ত অঙ্কপাতেরও অতিরিক্ত।/.... গদগদ বিহ্বলের দেশে এ কে এল উচ্চণ্ড বজ্রনাদ হয়ে। আলস্যে আচ্ছন্ন দেশ আরামের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ উদ্দণ্ড মেরুদণ্ডে উঠে দাঁড়াল। [" জ্যৈষ্ঠের ঝড়"]

আমাদের সৌভাগ্য, নজরুলের অগ্রজ তিন প্রধান কবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার—'বিদ্রোহী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম ধাত্রী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন,

পরের দিন সকালে এসে কবি [নজরুল] চারখানা 'বিজলী' নিয়ে গেলো, বললে, 'গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' ....'বেশ, ফিরে এসে বোলো তিনি দেখে কি বললেন।' বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চেঁচাতে থাকে। ওপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন, কী হয়েছে?'—'আপনাকে হত্যা করবো গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।'— 'হত্যা করবো হত্যা করবো' কি, এস, ওপরে এসে বসো।'—'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আপনাকে হত্যা করবো, বসুন, শুনুন।' কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে 'বিজলী' হাতে নিয়ে

> উচ্চৈ:স্বরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো। তিনি স্তব্ধ-বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধ'রে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, কাজী, তুমি আমাকে সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার কবিপ্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।' ['পুরানো কথা', 'মাসিক বসুমতী', কার্তিক ১৩৬২]

রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিলো। সজনীকান্ত দাসের বর্ণনায় আমরা পাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিদ্রোহী' সম্পর্কে মত। সজনীকান্ত দাস লিখছেন,

> ... ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথর' বিভাগে ওই সালের কার্তিক মাসের 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠে মনে ছন্দের দোলা ও ভাবের দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে ছন্দের রাজা বলিয়া তখনই চিনিয়াছিলাম। গান্ধী-বন্দনা কবিতাটি পকেটে এবং নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মনে লইয়া একদিন বৈকালে মফস্বলীয় মূঢ়তাসহ সত্যেন্দ্রনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ালাম। স্বল্পভাষী সত্যেন্দ্রনাথ চক্ষুপীড়ায় অস্বচ্ছ রূঢ় দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভয়ে এবং সংকোচে মরীয়া হইয়া শেষ পর্যন্ত 'বিদ্রোহী' সম্বন্ধে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। বলিলাম, ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু 'আমি'র এলোমেলো প্রশংসা-তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়; এ বিষয়ে আপনার মত কি? প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে একটা মৃদু হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।... সত্যেন্দ্রনাথ আমার প্রশ্নের জবাবে সেদিন মোদ্দা কথাটা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমি কোনদিনই ভুলিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয়, তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। 'বিদ্রোহী' কবিতা কোনও ভাবের ইঙ্গিত দেয় কিনা, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে। [পৃ. ৮৪ "আত্মস্মৃতি"]

সত্যেন্দ্রনাথের সমর্থন স্পষ্ট, 'বিদ্রোহী'র ছন্দের নতুনত্ব ও গুরুত্ব কবিতার নতুন বক্তব্যের সঙ্গে একসুরে সাধা। 'বিদ্রোহী' কবিতার বিশাল খ্যাতি আর-একদিক থেকে ডেকে এনেছিলো বিদ্বেষবিষ। দুটি ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাস ('ব্যাঙ', 'শনিবারের চিঠি', ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৪) ও গোলাম মোস্তফা ('নিয়ন্ত্রিত', 'সওগাত' মাঘ ১৩২৮)। নজরুল ও তাঁর তরুণ বন্ধুরা সজনীকান্তের কবিতাটিকে মোহিতলালের রচনা ব'লে ভুল করেন। ক্রুদ্ধ নজরুল মোহিতলালকে লক্ষ্য ক'রে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' ("ফণিমনসা" গ্রন্থে 'সাবধানী ঘণ্টা' নামে প্রকাশিত) নামে একটি কবিতা লেখেন ('কল্লোল', কার্তিক ১৩৩১)। ক্রুদ্ধ মোহিতলাল জবাবে লেখেন 'দ্রোণগুরু' ('শনিবারের চিঠি', ৮ই কার্তিক ১৩৩১)। মোহিতলাল-নজরুলের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং তা আর-কোনো দিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। এদিকে মোহিতলাল চারদিকে রটাতে থাকেন যে তাঁর 'আমি' শীর্ষক কথিকা থেকে নজরুল 'বিদ্রোহী'র প্রেরণা পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, মোহিতলাল যে-দাবি তুলেছিলেন, 'আমি' কথিকা থেকে 'বিদ্রোহী' উদ্ভূত হয়েছে, তাতে মোহিতলালের প্রাপ্য অনেকে উড়িয়ে দিয়েছেন একেবারেই। কিন্তু কবি মানসের যে-পর্যায়টি প্রেরণার উৎসভূমি, সেই প্রাণনাদেশে মোহিতলালের কথিকাটি নজরুলের 'বিদ্রোহী' ফলাতে সহায়তা করেছিলো— এতে আমি কোনো সন্দেহ দেখি না। নিশ্চয় মোহিতলালের অভিপ্রায় থেকে নজরুলের উৎকাঙ্ক্ষা আলাদা হ'য়ে গেছে; তবু প্রাথমিকভাবে 'বিদ্রোহী'র জন্যে নজরুলের মানসজমি তৈরি করেছে ঐ রচনাটি। আমার মনে হয়: এই বিষয়ে নজরুলের নীরবতা ঠিক তাঁর স্বভাবসম্মত নয়। মুজফফর আহমদ লিখেছেন,'একবার মাত্র শুনে' নজরুল তার দীর্ঘকাল বাদে মোহিতলালের 'আমি' থেকে কি ক'রে সৃষ্টি ক'রে তুলবেন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি? কিন্তু প্রতিভা জ্ব'লে ওঠার জন্যে একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট; এবং আমরা তো জানি শিল্প-ব্যাপারে স্মৃতির ভূমিকা বিশাল ও সংগুপ্ত।

নজরুল প্রসঙ্গে মোহিতলাল-যে কতোখানি যুক্ত ছিলেন, তার সাক্ষ্য নজরুলের পক্ষে ও বিপক্ষে লেখা তাঁর সাতটি কবিতা।[১২] 'বিদ্রোহী' বেরিয়েছিলো পৌষ ১৩২৮-এ; আর আষাঢ় ১৩৩০-এ মোহিতলাল নজরুলকে 'কবি-বিদ্রোহী' সম্বোধন ক'রে লিখলেন,

> মাথায় তোমার কৃষ্ণমেঘের নিশান দোলে!
> নহে ত অশ্রু!–তরল তড়িৎ চোখের কোলে!
> ওকি ও পিপাসা! নিদারুণ আশা বক্ষে ধরি'
> ঘোষিছ প্রলয়-ডমরু-নিনাদ বজ্ররোলে!
>
> মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি?
> কাল-নিশিথিনী বধূ কি তোমার মরণ-লোভী?
> এতটুকু আলো কোথাও নাহি রে!—সৃষ্টি শেষ!
> চিতায় চিতায় ফুৎকারি তাই ফিরিছ কবি!
>
> ['কবি-বিদ্রোহীর প্রতি', 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৩০]

নজরুলের প্রতি মুগ্ধতা তাঁর তখনো ছিলো। বাতাস ঘুরে যায় এরও বছর খানেক পরে, যখন তিনি 'দ্রোণগুরু' লিখলেন 'প্রবাসী'তে (কার্তিক ১৩৩১)। আরো পরে মোহিতলাল একটি গদ্যরচনায় নজরুলের ঠিক 'বিদ্রোহী' কবিতার নয়, বরং 'বিদ্রোহী' সত্তার ঊনতার দিক দেখিয়েছিলেন। 'সাহিত্যের আদর্শ' নামক নিবন্ধে মোহিতলাল লেখেন,

> আমাদের দেশে খুব বর্তমানকালে এমন একটি প্রবৃত্তি দেখা দিতেছে, যাহাতে সাহিত্যের এই নীতি বা আদর্শ একেবারে উড়িয়া যাইতেছে: অতিশয় অমেধ্য এবং মানবাত্মার পক্ষে গ্রানিকর এক শ্রেণীর ভাব ও ভাবুকতা বিদ্রোহের 'রক্তনিশান' উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে। এ বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নাই,

মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী উত্থান কামনা নাই, মানবাত্মার জয়ঘোষণা ইহাতে নাই। কাব্যে কোনও সমস্যার বা মনস্তত্ত্বের দোহাই নাই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়াছে।... মুস্কিল হইতেছে এই যে, 'দুষ্ট খোকা'ও বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে তাহা নাটকের নৃত্য নয়, দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্ম্যের উল্লাস হিসেবেই তাহা উপভোগ্য।

['শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৩৪]

সেকালে সিরিয়াস সাহিত্যালোচনায় মোহিতলাল মজুমদারের মতোই তীক্ষ্ণধী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। ১৩৪৮ সালে রচিত এক সন্দর্ভে কাজী আবদুল ওদুদ লেখেন,

বাংলাদেশে এক শ্রেণীর সাহিত্যরসিক আছেন যাঁরা নজরুল ইসলামকে জ্ঞান করেন একজন যুগ-প্রবর্তক কবি। আজকের দিনে তাঁদের সংখ্যাশক্তি কেমন জানি না, তবে নজরুলের প্রতি তাঁদের কারো অন্তরের গভীর অনুরাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাঁদের প্রতিপাদ্যের প্রধান অবলম্বন এই 'বিদ্রোহী'। তাঁদের ধারণা, এমন একটি ওজস্বিতা নজরুলের এই 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। বাংলার দার্শনিক আবহাওয়ায় ও চিন্তালেশহীন ভাস্বর-ললাট চির-তারুণ্য, এই দ্বিধাহীন দুর্মদ তারুণ্যই বাংলা সাহিত্যে নজরুল-প্রতিভার চিরগৌরবময় দান।/... একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর বিদ্রোহী যুগের রচনা অনবদ্য নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতায়, কবিকল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায়, নজরুলের রচনায় সেটির অভাব মাঝে মাঝে প্রায় বেদনাদায়ক হয়েছে।/...নজরুলের বিদ্রোহী যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে—'বিদ্রোহী'ও সে-সবের অন্তর্গত—বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সংগতি সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও এমন একটা প্রাণশক্তির ছাপ তাঁর বিদ্রোহী যুগের অনেক কবিতায় মুদ্রিত হয়েছে যার জন্য তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার না করেও উপায় নাই। বাস্তবিক আমাদের সাহিত্যে এক ভয়-ভাবনাহীন তারুণ্যের তিনি স্রষ্টা, পুরোপুরি না হলেও লালয়িতা। কিন্তু সাহিত্য-শিল্প হিসাবে এই যুগে তাঁর রেখাপাতে অপরিচ্ছন্নতাও এতখানি প্রকাশ পেয়েছে যে, তাঁর সাহচর্য রসিক পাঠককে আনন্দ যা দেয়, দুঃখও সেই তুলনায় কম দেয় না।[১৩]

['নজরুল ইসলাম', "নজরুল-প্রতিভা"]

কাজী আবদুল ওদুদের উদ্ধৃত রচনার প্রথমাংশের লক্ষ্য খুব সম্ভবত আবুল কালাম শামসুদ্দীন, যিনি প্রথম নজরুল ইসলামকে 'যুগ-প্রবর্তক' কবি ব'লে সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'কাব্য-সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি,

"অগ্নি-বীণা"র যুগে তাঁহার রচনায় বেদনার যে তীব্রতার পরিচয় পাই, তেমন গভীর উপলব্ধির পরিচয় পাই না। এর কারণ তখনও তিনি বেদনা প্রকাশের কেন্দ্রস্থল

খুঁজিয়া পান নাই। তাই তাঁহাকে কখনো বা আনোয়ার পাশার দুঃখে রোদন করিতে দেখি, আবার কখনো বা কামাল পাশার হাতে অত্যাচারী গ্রীকদের পরাজয়ে উৎকট আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখি। কিন্তু নিজের নিপীড়িত দেশ-জননীর মর্মবেদনাকে যেদিন হইতে তিনি হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছেন সেইদিন হইতেই তাঁহার বেদনা প্রকাশের ভঙ্গী পূর্বের মতো অতো তীব্র না হইলেও গভীরতর হইয়াছে। 'বিদ্রোহী' শীর্ষক কবিতাতেই আমরা তাঁহার এই আত্মোপলব্ধির প্রথম পরিচয় পাই। 'বিদ্রোহী' কবিতা হইতেই যে তাঁহার কাব্য রচনায় একটি বিস্ময়কর পরিবর্তনের দিকে সমস্ত সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, আমাদের মতে ইহাই তাহার কারণ।

['সওগাত', পৌষ ১৩৩৩]

এর অনেক বছর পরে আবুল কালাম শামসুদ্দীন কাজী আবদুল ওদুদের 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কিত উক্তির বা সমালোচনার একটি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ উপস্থিত করেছেন,

'বিদ্রোহী' অনবদ্য কাব্য রচনা হয়তো নয়, সমগ্রতার সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে তাতে ত্রুটি হয়তো কিছু কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তাতে করে কাব্যসুষমার এমন হানি হয়নি যাতে রসিক পাঠক আনন্দ লাভের চাইতে দুঃখ পায় বেশী। কাজী আবদুল ওদুদের মতো যে সব কাব্য-সমালোচক 'বিদ্রোহী' সম্পর্কে এ ধরনের মত পোষণ করেন, তাঁরা কাব্যসৌন্দর্যের মাজা-ঘষা অতিরিক্ত পালিশ রূপটা দেখতেই অভ্যস্ত এবং তাকেই কাব্য রচনায় উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড বলে মনে করেন। কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যের স্বল্প পালিশ ঢিলেঢালা স্বাভাবিক রূপও একটা আছে এবং রসিকজনের মনে তাও কম আনন্দ দেয় না। নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী'র কৃত্রিমতাহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্যসৃষ্টি তাই অধিকাংশ রসিকজনের মনে কোনরূপ বিকার সৃষ্টি না করে অনাবিল আনন্দই দিয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই কবিতার অসাধারণ জনপ্রিয়তা সম্ভবতঃ তারই প্রমাণ। ['নজরুলের বিদ্রোহী', "নজরুল পরিচিতি"]

কাজী আবদুল ওদুদ-প্রণীত "রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠ" (১৯২৭) গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে 'সওগাত' পত্রিকার 'নিকষমণি' বিভাগে বলা হয়,

লেখক একস্থানে রবীন্দ্রনাথের 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতার সহিত নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী'র তুলনা করিতে গিয়া নজরুলের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। এ তুলনা না করিলেই বোধহয় ভালো হইত। কারণ, দুটা ঠিক এক পর্যায়ের কবিতা নয়। লেখক বলিয়াছেন, 'নবীন কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত বিদ্রোহী-র আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু সে আবেগ এমন সত্যদৃষ্টি স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই তার অনেকখানি কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর।' অবশ্য লেখক পাদটীকায় সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সত্যকার প্রতিভার স্পন্দনও এর ভিতরে বুঝিতে পারা যায় বলিয়া এই অবিচারমূলক মন্তব্যের অনেকখানি সংশোধন করিয়াছেন। 'বিদ্রোহী'র মধ্যে ভাঙ্গার প্রয়াসই আছে, সৃষ্টির চেষ্টা নাই—তাই দেখিয়াই লেখক বোধ হয় উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ভাঙ্গার এই প্রবল প্রয়াসই যে একটি নূতন বিরাট সৃষ্টির পূর্বসূচনা, লেখক একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। নজরুলের কাব্যগ্রন্থের সহিত যাঁহারা সম্যক পরিচিত তাঁহারাই একথা বুঝিতে পারিবেন। এ কবিতায়ও যে তার কোন ইঙ্গিত নাই, এমন বলা যায় না। Russian Literature -এর সহিত

যাহারা পরিচিত তাঁহারাই এ কবিতার Spirit ধরিতে পারিবেন। কাব্য হিসাবেও ইহা মোটেই 'অকিঞ্চিৎকর' নয় বরং বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক ও অপূর্ব দান।

['সওগাত', চৈত্র ১৩৩৪]

'বিদ্রোহী' তার সমকালে আরো অনেক সপ্রশংস ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলো। সপ্রশংস সমালোচনার কয়েকটি:

১. মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতা দেখা যায় না, তথাপি এই ছন্দেও যে মুক্তবন্ধ কবিতা রচনা করা যায় তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ বাংলার উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

['মাত্রাবৃত্ত ছন্দ': প্রবোধচন্দ্র সেন, 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩০]

২. আমরা বহুদিন পূর্বে কবির যে বিদ্রোহী কবিতাটির প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিয়া সুখী হইয়াছিলাম, সেটি এ সংগ্রহে আছে।

['অগ্নি-বীণা'র আলোচনা, 'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩১]

৩. 'বিদ্রোহী' পাঠে পাঠকের মনে বিস্ময়ের যে ঘোর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কাটিতে না কাটিতে তাঁহার 'পূজারিণী' নূতন বিস্ময় লইয়া উপস্থিত হইল।

[নিকষমণি, 'সওগাত', কার্তিক ১৩৩৫]

৪. নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা', 'সাম্যের গান', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' প্রভৃতি দেশাত্মমূলক কবিতা শুধু আজ নয়—অনাগত বহু দিন ধরিয়া বাংলার যুব জনগণকে আত্মচেতনায় ও গণদেবতার পূজায় উদ্বুদ্ধ করিবে।

['বঙ্গবাণী', ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৯]

৫. 'বিদ্রোহী' দেখবামাত্র নজরুলের ভেতরে আমি হুইটম্যান আর রবীন্দ্রনাথ দুজনকে এক সঙ্গেই পাকড়াও করেছিলাম। তবুও বুঝে নিলাম লেখক বাপকা বেটা বটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী অন্যতম যুগ-প্রবর্তক বাঙ্গালীর বাচ্চা নজরুল।

[সাক্ষাৎকার ঃ বিনয় সরকার, ৬ই জুন ১৯৪৩][১৪]

কয়েকটি বিরূপ সমালোচনা:

১. কবি নজরুল এছলামের মধ্যে খাঁটি কবি প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়া আমরা বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া তিনি আমাদিগকে একেবারেই নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই কবিতায় দু'একটা মোছলমানী শব্দ[১৫] থাকিলেও উহার ভিতরের সব জিনিষটা হিন্দুমতে, বলিতে গেলে উহার কাঠামো হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের সাজ-সজ্জা পর্যন্ত সবই, হিন্দু ধর্মের

আদর্শে অনুপ্রাণিত। কবি নজরুল এছলামের এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা আমাদিগকে নিতান্ত শঙ্কান্বিত করিয়াছে।

['বঙ্গভাষায় মোছলেম প্রভাব', সৈয়দ এমদাদ আলী, 'সোলতান', ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩০]

২. ...কাজী নজরুলের প্রাথমিক রচনায় অনেক সময় ইসলামী ভাব পাওয়া যাইত। তারপর যখন হইতে তিনি বিদ্রোহী সাজিয়া 'বিধাতার বুকে হাতুড়ী' পিটিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতেই মুসলমান সমাজ তাঁহাকে বর্জন করিয়াছে।

['কাজীর কেরদানী': শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, 'ইসলাম দর্শন', মাঘ ১৩৩৪]

৩. যে অসংযত-বাক লেখক নিজকে জগদীশ্বর বা রব্বুল আলামীন আল্লার ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধা না করেন, যিনি আল্লাহকে 'খেয়ালী বিধি' বলিয়া তাঁহার বুকে পদাঘাত করার এমন অনুপম ধৃষ্টতা করিতে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন—এছলামের প্রতি এক রতি মাসা পরিমাণ শ্রদ্ধা ভক্তি বিদ্যমান থাকিতে কোন মুছলমানই তাঁহাকে—আপন বলিয়া গ্রহণ করা ত' দূরে থাকুক—অন্তর হইতে ধিক্কার না দিয়া পারে না। এছলামের চোখে এ অপরাধ অমার্জনীয়। মুছলমান সাহিত্যিকগণ শত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়া এই পাপ আদর্শকে জাতির সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিন-ইহাই আমাদের প্রার্থনা!

['এছলাম ও নজরুল ইসলাম': নজির আহমদ চৌধুরী, 'মাসিক মোহাম্মদী', কার্তিক ১৩৩৫]

'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে সেদিন যে-আলোচনা-প্রত্যালোচনার ঝড় ব'য়ে গিয়েছিলো, তার সাক্ষ্য ১৯২৯ সালেই 'মাসিক সঞ্চয়ে'র একটি প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে,

বিদ্রোহীর বদ-নসীব

'বিদ্রোহী' লইয়া বাংলাদেশে কীরকম হৈ চৈ হইয়াছিল তাহা ভুলিবার নয়। 'প্রবাসী' প্রমুখ অনেক পত্রিকায় তাহা সংকলিত হইয়াছিল। 'উদ্বোধনে'র এক লেখক 'বিদ্রোহী'কে গীতার ছোট সংস্করণ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল প্রবাহে এই প্রশংসার বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আসে; কমিতে কমিতে 'বিদ্রোহী' এখন 'মেকী আস্ফালন' আখ্যায় আখ্যাত হওয়ার অবস্থা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। ভবিষ্যতের কাব্যরসিকের বিচারে আরো কী শুনিব, কে জানে? 'সাপ্তাহিক সওগাতে' বাগ্‌বান্ বাহার 'নজরুলিস্তানে' উক্ত appreciation গুলি জড় করিতেছিলেন। আমরা এখানে পরের কয়েকটি depreciation উদ্ধৃত করিতেছি–

১। 'নবীন কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী'র আবেগ সত্যদৃষ্টি স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই তার অনেকখানি কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর।'–কাজী আবদুল ওদুদ, ১৩৩২।

২। 'আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী'–ইত্যাদিতে বিদ্রোহীর স্বভাবসিদ্ধ রুদ্র নর্তনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত'—এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে দমিয়ে যাওয়ায় কবিতার রসভঙ্গ হইয়াছে।'—আবদুল কাদির, ১৩৩২।

৩। 'নজরুল ইসলামের প্রথম দিককার কবিতা 'বিদ্রোহী' উঁচু দরের কবিতা নয়। নজরুল ইসলাম খুব কিছুদিন জোর গলায় জয়ধ্বনি করলেন, তার অধিকাংশই ফাঁকা আওয়াজ।'–'প্রগতি', শ্রাবণ, ১৩৩৬।

৪। 'আমাদের তথাকথিত কোনোও 'বিদ্রোহী' কবি বড় আশায় তাল ঠুকিয়া নকল পৌরুষের অভিনয় করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বুলবুলের গান তাঁহাকে লজ্জাবতী লতার পাশে আনিয়া ফেলিয়াছে।'— নির্মলকুমার ঘোষ দস্তিদার, 'উপাসনা', আশ্বিন, ১৩৩৬।

['মাসিক সঞ্চয়', পৌষ ১৩৩৬]

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্রোহী' এমনই বিখ্যাত হয় যে তা অচিরাৎ নজরুলের নামের আগে চিরকালের জন্যে যুক্ত হ'য়ে যায়। ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। মাত্র এক বছর পরে ১৭ই জানুয়ারি ১৯২৩ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শিরোনাম হয় 'বিদ্রোহী কবির কারাদণ্ড'। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্রোহী শব্দটি যে নজরুলের নামের পূর্বে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হ'য়ে যায়, তার প্রমাণ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় এরকম বাক্য: 'গতকাল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের অভিনন্দন-উৎসব সোৎসাহে সম্পন্ন হইল।'

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের ঠিক এক বছর পরে ৭ই জানুয়ারি ১৯২৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, তখনই তিনি নিজেকে 'বিদ্রোহী কবি' হিশাবে চিহ্নিত করছেন। কবি লিখছেন: 'শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট।'

১৯২৭-এ ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা বিখ্যাত চিঠিতে কবি লিখেছেন, 'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক ব'লে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি।' ১৯২৯ সালে এ্যালবার্ট হলের বিশাল সংবর্ধনা সভাতেও কবি নিজেকে 'বিদ্রোহী' ব'লে উল্লেখ করেন: 'আমাকে 'বিদ্রোহী' ব'লে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই।'

৫. ১৩২৮-এর রচনাগুচ্ছ

'বিদ্রোহী'-যে-বছর রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো, সেই ১৩২৮-এ নজরুল আর কী লিখেছিলেন? ১৩২৮-এ রচিত কবির রচনার একটি তালিকা পেশ করা যাক,

কবিতা

পলাতকা, আজান, দহনমালা, দুপুর-অভিসার, বিজয় গান, মা, অগ্নি-বীণার উৎসর্গ-গান, কার বাঁশি বাজিল, লক্ষ্মীছাড়া, অনাদৃতা, রণ–ভেরী, বাদল-দিনে, দির-দরদী, অকরুণ পিয়া, আগমনী, আনোয়ার, মরণ-বরণ, খোকার বুদ্ধি, কামাল পাশা, বিদ্রোহী, হারা-মণি, চিরন্তনী প্রিয়া, অ-কেজোর গান, ছলকুমারী, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (তিরোভাব), বিজয়িনী, বন্দী-বন্দনা, নিশীথপ্রীতম, খোকার গল্প বলা, চিঠি, আবাহন, অভিমানী, আরবী ছন্দ।

এ কোন্ পাগল পথিক।	গান
সত্য-বাণী।	গদ্যরচনা
ব্যথার দান (গল্প)	গ্রন্থ

৬. প্রকরণ

নজরুল ইসলাম অলংকারচঞ্চল কবি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তা প্রথম ফুলে-ফলে ভ'রে ওঠে, এবং 'বিদ্রোহী'তে রচিত হয়েছে নজরুলের সমস্ত অলংকারচাঞ্চল্যের এক অণুদুনিয়া। যৌগিক শব্দমঞ্জরীতে, মাত্রাবৃত্তিক ছন্দোপরীক্ষায়, অনুপ্রাসরণণে ত্রয়ী অন্ত্যমিলে, অজস্র মধ্যমিলে, আবৃত্ত পদে, পুরাণপ্রয়োগে, প্রতিমার সচ্ছলতায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যেন কোনো সোনার কলসি ভ'রে উপচে প'ড়ে অঝোর ধারায় মধু ঝরিয়েই যাচ্ছে।

যে যৌগিক শব্দসৃজনে নজরুল বিশিষ্ট, এই কবিতায় আছে তার সুপ্রচুর উপস্থিতি,

চল-চঞ্চল, কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ, ব্যথা-বারিধি, সুর-সৈনিক, ঈশান-বিষাণ, পিনাকপাণি, সৃষ্টি-বৈরী, দাবানল-দাহ, বন্ধন-হারা, তন্বী-নয়ন, ক্রন্দন-শ্বাস, হৃদি-সরসিজ, মরম-বেদনা, প্রিয়-লাঞ্ছিত, বিষ-জ্বালা, চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন, গোপন-প্রিয়া, পথিক-কবি, মরু-নির্ঝর, অচেতন-চিত, মানব-বিজয়-কেতন, বিশ্ব-তোরণ, হিম্মত-হ্রেষা, বাড়ব-বহ্নি, বেণু-বীণ, নিদাঘ-তিয়াসা, বসুধা-বক্ষ, রৌদ্র-রুদ্র, অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল, দেব-শিশু, বিদ্রোহী-বাহী, শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা, ধ্বংস-ধন্যা, বিষ্ণু-বক্ষ, ধূমকেতু-জ্বালা, কাল-ফণী, রণ-ক্লান্ত, ক্রন্দন-রোল, স্রষ্টা-সূদন, যৌবন-ভীতু, চপলা-চপল, চল-ঊর্মি, নৃত্য-পাগল।

'বিদ্রোহী' কবিতায় বিশেষ লক্ষণীয় 'চির' এবং 'মহা' শব্দযোগে যৌগিক শব্দসৃজনের ঝোঁক,

১. চির-বিস্ময়, চির-উন্নত (৫বার), চির-দুর্দম, চির-দুরন্ত, চির-গৃহহারা, চির-ক্ষুব্ধ, চির-শিশু, চির-কিশোর, চির-দুর্জয়, চির-অধীর, চির-বিদ্রোহী।

২. মহা-বিশ্ব, মহাকাশ, মহা-প্রলয় (২বার), মহা-ভয়, মহা-মারী, মহা-হুংকার, মহা-শঙ্খ, মহা-কল্লোল, মহা-সিন্ধু, মহা-ত্রাস, মহা-বিদ্রোহী।

'চির' এবং 'মহা' শব্দ দুটির উপর্যুপরি ও বিচিত্র প্রয়োগ 'বিদ্রোহী' কবিতাকে অনন্ত সময়প্রসৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত ভূগোলের মধ্যে সঞ্চালিত করেছে এবং শেষ সত্য ফলিয়ে তুলেছে এই—নজরুল একাধারে 'চির-বিদ্রোহী' ও 'মহা-বিদ্রোহী'।

অনুপ্রাসের নজির,

১. শির নেহারি' নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

২. ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া

৩. আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি,
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।

৪. আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল;
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।

৫. আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায়
হর্দম ভরপুর মদ।

৬. আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র শিষ্য,
আমি দাবানল দাহ, দহন করিব বিশ্ব।

৭. আমি উজ্জ্বল আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল।

৮. আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর:
আমি বঞ্চিত ব্যথা পরবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা,
প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা ব্যথা সুনিবিড়
চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা,তার কাঁকন-চুড়ির কনকন!

৯. আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন!

১০. আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল;
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।

'বিদ্রোহী'তে আবেগের উদ্দামতা কখনো-কখনো চারিয়ে গেছে তিন পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিলে—উত্তরকালে জীবনানন্দে দেখেছি আমরা এই কুশলতারই ব্যবহার,

১. আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।

২. আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা–
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!

মধ্যমিলের কেন্দ্রদোল,

১. আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ!

২. আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস
আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,

৩. আমি কভু প্রশান্ত, কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী।

৪. আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল- চল-উর্মির হিন্দোল-দোল!

৫. আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর

৬. আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন চিতে চেতন

৭. ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

৮. আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।

৯. জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,

১০. আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্ত্য!

আবৃত্ত পদের উপর্যুপরি প্রয়োগ এই কবিতার (এবং নজরুলেরও) একটি বৈশিষ্ট্য—তিরিশের কবিতায়, বিশেষত, বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এর ব্যবহার প্রবলপ্রচুর,

১. 'বল বীর–/বল উন্নত মম শির' পঙ্‌ক্তিদ্বয় সারা কবিতায় ঈষৎ-পরিবর্তিত হ'য়ে হ'য়ে ঘুরে এসেছে 'বল বীর-আমি চির-উন্নত শির!' (পঙ্‌ক্তি ১১-১২-ও ৪০-৪১)
'বল বীর–/চির-উন্নত মম শির' (২৪-২৫ ও ৫২-৫৩), 'আমি চির—বিদ্রোহী

বীর–/বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।' (১৪০-১৪১)

২. 'আমি' শব্দটি অজস্রবার ব্যবহৃত।

৩. 'বল' কথাটি বেশ কয়েকবার।

৪. ৮৭-পঙ্‌ক্তিতে 'আমি তূরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ আমি উন্মাদ।'
১২৪-পঙ্‌ক্তিতে আবার 'আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ!!'

৫. ১০৩-পঙ্‌ক্তিতে 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী' ১০৭ পঙ্‌ক্তিতে বদলে হয় 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।'

৬. ১৩০-১৩১ পঙ্‌ক্তির 'মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/আমি সেই দিন হবো শান্ত'
১৩৪ পঙ্‌ক্তিতে 'বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/আমি সেই দিন হবো শান্ত।'

৭. পঙ্‌ক্তিচতুরঙ্গ,
আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি পুরাণ প্রয়োগের এক অসামান্য উদাহরণ। মুসলিম, হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ এখানে একত্রীকৃত। আমরা এখানে কবিতাটির পুরাণপ্রয়োগ পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত ক'রে দেখালাম :

পঙ্‌ক্তি

৮ খোদার আসন আরশ ছেদিয়া। ম.

১৪ নটরাজ = শিব। হ.

২২. ধূর্জটি = শিব। 'আমি ধূর্জটি আনি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখী'র পঙ্‌ক্তিতে শিবের ধূম্রবর্ণ জটা চিত্রিত। হ.

৪৪ হোমশিখা = দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক ঘৃতনিক্ষিপ্ত অগ্নি হচ্ছে হোম; তার শিখা হোমশিখা। হ.

জমদগ্নি = জনৈক ঋষি, পরশুরামের পিতা, কামধেনুর অধিকারী। সাগ্নিক কেন? হয়তো জমদগ্নির দুটি ঘটনার আভাস দ্যোতিত: ১. জমদগ্নি তাঁর পুত্রকে আদেশ করেছিলেন জমদগ্নির স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রের মাতা রেণুকাকে হত্যা করবার জন্য; এবং ২.কামধেনুর জন্যে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। হ.

৪৮ ইন্দ্রানী-সূত = ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর পুত্র। ইন্দ্র হলেন দেবরাজ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–সকলেই তাঁর অধীন। ইন্দ্র পুলোমা নামক দানবের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও সীদ্ধ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও বানররাজ বালী তাঁর পুত্র বলে কথিত। হ.

৫৩ ব্যোমকেশ = শিব। গঙ্গা ধারণকালে শিবের জটাগুলি আকাশময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিলো ব'লে তাঁর আর-এক নাম ব্যোমকেশ। হ.

৫৮ ঈশান = শিব, বিষাণবাদক। হ.

৫৯ ইস্রাফিলের শিঙা। ম.

৬০ পিনাক-পাণি = শিব, পাণিতে বা হাতে যার পিনাক বা ত্রিশূল। হ. ধর্মরাজ = যম। ধর্মরাজের দণ্ড = যমদণ্ড। হ.

৬১ প্রণব-নাদ। প্রণব = ঈশ্বরের গূঢ় নাম: ওঁ, ওংকার। হ.

৬২ দুর্বাসা= জনৈক মুনি। অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ও স্বেচ্ছাচারী। বিভিন্ন সময়ে ইনি তাঁর স্ত্রী কন্দলী, দেবরাজ ইন্দ্র ও শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন। হ. বিশ্বামিত্র শিষ্য। হ.

৯৩ বোররাক = 'স্বর্গের পক্ষীরাজ।' ম.

উচ্চৈঃশ্রবা = ইন্দ্রের ঘোড়া, সমুদ্রমন্থনে এর উৎপত্তি। হ.

৯৯ বাসুকি [বাসুকী]=নাগরাজ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে বাসুকীর জন্ম। এঁর রাজধানী ছিলো ভোগবতী পুরী। হ.

১০০ জিব্রাইল= 'স্বর্গীয় দূত।' ম.

১০৩ অর্ফিয়াস [অর্ফিয়ুস]=অর্ফিয়ুস গ্রীক পুরাণোক্ত খ্যাততম কবি ও গায়ক। আপোলো তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন একটি বীণা, মিউজগণ তাঁকে তা বাজাতে শিখিয়েছিলেন, তাঁর বীণাবাদনে শুধু বন্যপ্রাণীকুল আনন্দিত হয়নি, জড় পাহাড় ও তরুও হ'য়ে উঠেছিলো সচল। বর্তমান প্রসঙ্গে এটুকুই জরুরি: অর্ফিয়ুস প্রসঙ্গে ইউরিডিসি ও ডিয়োনিসাস-এর দুটি ঘটনা অতি খ্যাত গ.

১০৭ শ্যাম = কৃষ্ণ। শ্যামের হাতের বাঁশরী = কৃষ্ণের বাঁশি। হ.

১০৯ হাবিয়া দোজখ ='সপ্তম নরক, এই নরকই ভীষণতম'। ম.

১১০ 'আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল-কন্যা।' বিষ্ণু = নারায়ণ, হরি, সৃষ্টির পালনকর্তা ব'লে কথিত। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে এর জন্ম; তপোবলে ইনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। যুগল কন্যা=বিষ্ণুর দুই ভার্যা : লক্ষ্মী বা কমলা ও সরস্বতী বা বীণাপাণি। সর্বলোকের কল্যাণার্থে যুগে যুগে জন্ম নেন ইনি। এঁর প্রধান অবতার দশজন: মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বলরাম (মতান্তরে কৃষ্ণ) ও কল্কি। হ.

১১৩ চণ্ডী= দুর্গা। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী যোগিনী-প্রধানা দেবী। হ.

১২৩ পরশুরাম=বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার (দ্র. ১১০-পঙক্তি)। জমদগ্নির পুত্র। অপর নাম: ভার্গব, জামদগ্ন্য। পরশু (কুঠার)-ধারী যে-রাম –এই অর্থে। ইনি পিতার আদেশে অকুণ্ঠিত চিত্তে কুঠার দ্বারা স্বীয় জননীকে হত্যা করেন। (দ্র.৪৪-পঙক্তি)। হ.

১২৫ বলরাম= বিষ্ণুর সপ্তম অবতার (দ্র. ১১০-পঙক্তি)। কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বসুদেবের ঔরসে রোহিনীর গর্ভে এঁর জন্ম। অপর নাম: বলদেব, বলভদ্র। এঁর প্রধান শস্ত্র ছিলো হল। হ.

১৩৩ ভৃগু=বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মীর পিতা। ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক। ভৃগু বংশের আদিপুরুষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা জানবার জন্যে মুনি-ঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে যান; তাঁকে ইচ্ছে ক'রেই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না-করায় ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে তুষ্ট ক'রে তারপর ভৃগু শিবের কাছে গিয়ে তাঁকেও ইচ্ছাপূর্বক অসম্মান করায় শিবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শিবকে শান্ত ক'রে ইনি বিষ্ণুর নিকটে যান। বিষ্ণু তখন ছিলেন নিদ্রিত; ভৃগু তাঁর বক্ষোদেশে পদাঘাত করায় তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। জাগ্রত হ'য়ে বিষ্ণু রাগ করা দূরে থাক, ভৃগুর পায়ে ব্যথা লেগেছে কিনা জানতে চান। ভৃগু তখন স্থির করেন দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ।

[ম. হ. গ. পৌরাণিক উৎসসূচক: ম.=মুসলিম পুরাণ; হ.= হিন্দু পুরাণ; গ.= গ্রীক পুরাণ।]

এখানে পৌরাণিক এক-একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে যাত্রা করেছেন; কবি এই চরিত্রচয়ের ব্যবহার করেছেন অবিকলভাবে নয়–রূপকার্থে বা প্রতীকার্থে, বাচ্যার্থে নয়–ব্যঙ্গার্থে। পুরাণ ব্যবহারে নজরুল অবলীলাক্রমে এক দেশের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অপর ভুবন: মুসলিম, হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ পাশাপাশি বা পরে-পরে উদ্ধৃত : 'বিদ্রোহী' কবিতায় এই অন্বয় ও স্থাপনা বারংবার সম্পন্ন হয়েছে,

১. ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

২. আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওংকার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুংকার,

৩. ধরি বাসুকির ফণা জাপটি—
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।

৪. আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

যে-পৌরাণিক চরিত্রটি নজরুল সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন, তা হচ্ছে শিবের। 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও বারবার এসেছে শিবের উল্লেখ,

১. আমি ধূর্জটি আনি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
২. আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর
৩. আমি পিনাক-পাণির ডম্বরু ত্রিশূল

প্রতিমার প্রয়োগও 'বিদ্রোহী' কবিতায় উপর্যুপরি,

১. আমি ধূর্জটি আনি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর।
২. আমি দুর্দম মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ!
৩. আমি ইন্দ্রানী-সূত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য;
৪. আমি ব্যোমকেশ, ধরি-বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর
৫. ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া স্বর্গ-মর্ত্য করতলে
৬. আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি

বড়ো অর্থে সম্পূর্ণ 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই অজস্র ছোটো-ছোটো প্রতিমায় পরিকীর্ণ; এবং এইসব প্রতিমা সমগ্রভাবে 'বিদ্রোহী'র কবিতা-বিশ্ব নির্মাণ করেছে। ছোটোছোটো প্রতিমাগুলি জড়ো হ'য়ে যেন তৈরি করেছে এক বৃহৎ প্রতিমার দেবায়তন।

'বিদ্রোহী' কবিতার ছন্দেও আছে পরীক্ষা। ছয় মাত্রার চালের মধ্যে মাঝে মাঝে পাঁচ মাত্রা চারিয়ে দিয়েছেন কবি। এইভাবে আবেগের ছন্দ ব্যাকরণের ছন্দ অতিক্রম করেছে। সুতরাং সৈয়দ আলী আহসান যখন ('নজরুল ইসলামের ছন্দ')[১৬] এরকমভাবে পর্ব ও মাত্রা বিতরণ করেন,

১. আমি। সৃষ্টি, আমি। ধ্বংস, আমি। লোকালয়, আমি। শ্মশান (২),৫,৫,৬,(৩)
২. আমি। অন্যায়, আমি। উল্কা, আমি। শনি (২), ৬, ৫, ২
৩. আমি। বজ্র, আমি। ঈশান-বিষাণে। ওঙ্কার (২), ৫, ৬, ৪
৪. আমি। ধৃষ্ট, আমি। দাঁত দিয়া ছিঁড়ি। বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল (২), ৫, ৬, ৬, ৪

তখন তা অযথার্থ মনে হয়। কেননা ২-৫-৬-৩-৪ ইত্যাদির একত্রিত বিতরণ মাত্রাবৃত্তে কিভাবে সম্ভব? আমার বিবেচনায় নিচের মতো ফাঁক-ফাঁক ক'রে

চরণগুলি সাজালে, এবং ঐভাবেই পাঠ করলে, যেমন ধ্বনির দিক থেকে ঠিক থাকে তেম্নি ছন্দও অস্খলিত মনে হবে,

১. আমি। সৃষ্টি, আমি। ধ্বংস, আমি। লোকালয়,
আমি। শ্মশান (২,৩) (২,৩) (২,৪) (২,৩)

২. আমি। অন্যায়, আমি। উল্কা, আমি। শনি (২,৪) (২,৩) (২,২)

৩. আমি। বজ্র, আমি। ঈশান-বিষাণে। ওঙ্কার (২,৩) (২,৬,৪)

৪. আমি। ধৃষ্ট, আমি। দাঁত দিয়া ছিঁড়ি। বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল। (২,৩) (২,৬,৬,৪)

এখানে কেবল প্রথম অতিপর্ব ও শেষ অপূর্ণ পর্ব উপস্থিত (প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে); তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে প্রথমাংশে প্রথম অতিপর্ব ও শেষে অপূর্ণ পর্ব উপস্থিত, দ্বিতীয়াংশে মধ্যবর্তী পর্বটি সম্পূর্ণ; চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে প্রথমাংশে প্রথমে অতি পর্ব ও শেষে অপূর্ণ পর্ব উপস্থিত; দ্বিতীয়াংশে মধ্যবর্তী দুটি পর্ব এই কবিতার মূল ছন্দোমাত্রা–ছয় মাত্রার ছন্দে—সিদ্ধ। ছয় মাত্রার ছন্দে যে-একঘেয়েমি আসতে পারতো ঐসব ব্যতিক্রম তা মুছে ফেলেছে এবং আবেগের ওঠাপড়ার সঙ্গে চমৎকার সাযুজ্য রচনা করেছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'বাংলা ছন্দ' ("সাহিত্যচর্চা") প্রবন্ধে নিজের কবিতা থেকে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশি নেই;–এ যুগের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করবার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে-পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে— সেইটে কাব্যের ছন্দলোকে নিঃসংশয় রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহ'লে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা ?' (কবিতার আত্মা ও শরীর', "কবিতার কথা") এই দৃষ্টিবিচারে 'বিদ্রোহী' কবিতা নতুন তাৎপর্য-বিদ্যুৎ হানতে থাকে।[১৭]

১. ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'বিদ্রোহী'। সাহিত্যে নজরুলের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। এই অনধিক তিন বছরের মধ্যেই নজরুলের পরিচিতি ও খ্যাতি ক্রমব্যাপ্ত হচ্ছিলো। আর প্রথম থেকেই 'মোসলেম ভারতে' (সম্পাদক: মোজাম্মেল হক) লিখে আসছিলেন তিনি। ' বিদ্রোহী' যে-সংখ্যায় ছাপা হয়, 'মোসলেম ভারতে'র সেই সংখ্যাতেই মুদ্রিত হয় নজরুলের যুদ্ধ-পোশাকে ফোটো: 'হাবিলদার কবি নজরুল ইসলাম'। আর ছবির নিচে মুদ্রিত হয় সদ্য প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' থেকেই তিনটি লাইন:

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা;
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
আমি উন্মাদ, আমি ঝন্‌ঝা।

২ কবি আবদুল কাদির লিখেছেন: 'যতদূর মনে পড়ে, প্রথম সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে 'বিদ্রোহী' পুন মুদ্রিত হয়েছিল'। ('ঢাকায় নজরুল', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', ৫-৬ সংখ্যা, শীত-বসন্ত ১৩৭৭)

৩ নজরুলের "অগ্নি-বীণা" গ্রন্থভূর্ত।

৪ নজরুলের"ফণিমনসা" গ্রন্থভূর্ত। গ্রন্থভূর্তিকালে কবিতার শিরোনাম রাখা হয় 'সাবধানী ঘন্টা' এবং কবিতার অনেক স্থানে পরিবর্তিত হয়।

৫ গোলাম মোস্তফার "রক্তরাগ" গ্রন্থভূর্ত।

৬ সজনীকান্ত দাসের "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত।

৭ নজরুলের "অগ্নি-বীণা" গ্রন্থভূর্ত।

৮ নজরুলের "ছায়ানট" গ্রন্থভূর্ত।

৯ 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন আবদুল কাদির তাঁর একটি গ্রন্থালোচনায়('নজরুল একাডেমী পত্রিকা', গ্রীষ্ম-বর্ষা ১৩৮৪)।

১০ নজরুলের "বিষের বাঁশী" গ্রন্থভূর্ত।

১১ নজরুলের "শেষ সওগাত" গ্রন্থভূর্ত।

১২ বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আমার 'মোহিতলালের সাতটি কবিতা/নজরুলের উদ্দেশে', "নজরুল ইসলাম/ কবি ও কবিতা"।

১৩ "নজরুল প্রতিভা" (১৯৪৯)। পরে কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'শাশ্বত বঙ্গে'র অন্তর্ভূত।

১৪ "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (প্রথম ভাগ, ১৯৪৪) গ্রন্থ থেকে "সমকালে নজরুল ইসলাম" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে বিনয় সরকার জানিয়েছেন:

'এই কবিতার চরম তারিফ করেছিলাম প্রবাসে "ফিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" বইয়ে (বার্লিনে) ১৯২২।' বিদেশে ও বিভাষায় 'বিদ্রোহী' কবিতার অনুবাদ ও আলোচনা-সমালোচনা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যপঞ্জি প্রণীত হওয়া দরকার।

১৫ ইসলামী ও হিন্দু শব্দ ও ভাবাবহ শব্দ ব্যবহারের যথাযথ হিসাব দাখিল করেছেন সৈয়দ আলী আশরাফ:

'বিদ্রোহী কবিতাটিই ধরা যাক। মুসলিম জীবন ও ঐতিহ্যবোধক মাত্র নয়টি শব্দ রয়েছে–আরশ, বেদুইন, চেঙ্গিশ, ইস্রাফিল, জিব্রাইল, অর্ফিয়াস, হাবিয়া দোজখ এবং জাহান্নাম। অথচ হিন্দু উপকথা থেকে রয়েছে তিরিশটি উপমা।

['নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ', "নজরুল ইসলাম"]

১৬ 'নজরুল ইসলামের ছন্দ', "নজরুল ইসলাম": সৈয়দ আলী আহসান। পরে ঐ গ্রন্থটি লেখকের "কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা" সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭ আমার 'আচ্ছাদিত বারান্দা' ("করতলে মহাদেশ") প্রবন্ধে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার ছন্দ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — প্রথম সংকলন]

নজরুলের মনোভূমি ও বিদ্রোহী

খালেদা হানুম

এক

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কালের সমস্ত প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্যকে লালন করেও নবতর বাণী ও সুরের উদগাতা হিসেবে বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বিচিত্রধর্মী সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান। কবি নজরুলের মানসপটে 'বিদ্রোহী'র অবস্থান নির্ণয় ও এই কবিতার একটি ব্যাপকতার বিশ্লেষণ আমাদের লক্ষ্য।

নজরুল সম্পর্কে যে কথাটি প্রথমতঃ বলার তা হলো, তিনি একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী শিল্পী। পরিবেশ থেকে অনুশীলনের সুযোগ তাঁর খুব কমই হয়েছে। যেটুকু লাভ করেছেন তার সদ্ব্যবহার করেছেন অবিশ্বাস্য রকম সফলতার সঙ্গে।

(ক) চুরুলিয়ায় পিতৃব্য বজলে করিমের ভাষাজ্ঞান ও কাব্যগীতি তাঁকে শব্দ সম্পদ সম্পর্কে সচেতন করেছে প্রথম জীবনেই।

(খ) বাড়ীর গ্রামীণ পরিবেশের লোকজ উপাদান লেটোদল, ঝুমুরদল, যাত্রা গান এ সমস্তর অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতা তাঁর মনোজীবনকে সর্বদাই দেশের মাটির প্রতি তথা নাড়ীর প্রতি সম্পৃক্ত রাখতে সহায়তা প্রদান করেছে।

(গ) প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান কবির দুই দশকব্যাপী শিল্প সাধনাকে নানাভাবে ঋদ্ধ করেছে।

(ঘ) সংগীত অর্থাৎ সুরসৃষ্টি ছিল নজরুলের একক সত্তাঃ তিনি যুগপৎ কবি ও সঙ্গীতকার। এর মধ্যে ভিন্নতা নেই।

সতের বছর বয়সে বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দেবার পূর্বে তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল জীবন ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল তাঁর সুহৃদবর্গের অন্যতম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং দরিরামপুর বিদ্যালয় ও সিয়ারশোল রাজস্কুলের শিক্ষকবৃন্দের।

শৈলজানন্দ তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কবিতায় এবং নজরুল গদ্যে। পরবর্তীকালে এ দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছিল। শৈলজানন্দ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন উপন্যাস ও গল্প লিখে আর নজরুল কবিতা ও গানে। অবশ্য নজরুলের উপন্যাস ও প্রবন্ধও বাংলা সাহিত্যের গদ্যের ভুবনে অনুল্লেখ্য নয়।

দুই

বাংলা সাহিত্যের উষালগ্ন পরিক্রমায় আমরা বিস্ময়ে লক্ষ্য করি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এ ছিল কবিতার ভুবন। তাও পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। এর মধ্যে মোড় বদল, নতুন বৈজয়ন্তী যে স্বমহিমায় উদ্দীপ্ত হয়নি তা নয়। তুর্কী আক্রমণের পরেই নতুন চিন্তা এল; প্রাচীন ভারতীয় আর্যশব্দে নতুন বিদেশী শব্দ যোজনা ঘটলো। ১৪৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে বাংলা কাব্য সম্ভারে আরও বিস্তার লাভ করলো। কবিতার বাণীতে উচ্চারিত হলো মানবতার উদাত্ত উচ্চারণ। কালের ধ্বনিতে বপন করা হলো কালোত্তীর্ণ বীণার ধ্বনি। উনবিংশ শতকের স্বর্ণযুগে যাকে নবজন্মের যুগ (rebirth) রেঁনেসাসের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সে যুগেই মাইকেল মধুসূদন আনলেন প্রলয়ঙ্করী পরিবর্তন। প্রাচ্য ও প্রাচীন এই দুই মহাকাব্যের কলেবর থেকে বের করে আনলেন নতুন সম্পদ। কবিতার আঙ্গিকে সংযোজিত হলো ভিন্ন স্বাদ। যা একমাত্র Milton ঘটিয়েছিলেন তাঁর Paradise lost-এ। এ কোন রাম? এ কোন রাবণ? তাঁদের চরিত্রের পুরাতন ঐতিহ্যকে স্মরণ করেও নবকলেবর ধারণ করলো; শুধু তাই নয় শব্দ শিল্প ও ছন্দ প্রকরণের নিগড়ও তিনি ভেঙ্গে দিলেন। বাংলা কবিতায় তাঁর হাতেই রচিত হতে পারলো দ্রোহ চেতনায় ভাস্বর নবতর মানবিক চিন্তার স্ফুরণ। গগনবিদারী যার শৌর্য; হৃদয়বিদারী যার পুত্রশোক। পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি হলো। কবিতার বাক্যে নতুন শব্দ এলো। ছন্দ প্রকরণে পয়ারের অচলায়তন ভেঙ্গে গেল। মাইকেল সৃষ্টি করলেন অমিত্রাক্ষর যার প্রধান অবলম্বন ছিল বিদেশী Blank Verse এবং দেশী পয়ারের মধ্যেই। তাঁর আত্ম-জৈবনিক খণ্ড রচনা চতুর্দ্দশপদী কবিতা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। মাইকেলের পরে বাংলা কবিতায় এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি। সমগ্র অস্তিত্ব তাঁর এক সুললিত সংগীত। সেখানে নির্মাণ আছে, প্রসার আছে, বিচিত্র ভুবন আছে- আছে তাল সুর ও ঐক্য। তাই ধূসর চিত্তবৈকল্য তার কাব্যে গানে ধরা পড়েনা। আশী বছর বেঁচেছিলেন তিনি। তাঁর বনফুলকে সৃষ্টি কর্ম হিসেবে নিলে ১৪ বছর বয়সেই তাঁর সক্ষম শিল্প সৃষ্টিতে যাত্রা শুরু। অর্থাৎ ১৮৭৫ সালেই যাঁর আত্মপ্রকাশ, ১৯৪১ সালের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সৃষ্ট বিস্তৃত সুরভিত বিচিত্র কবিতা, নাটক, উপন্যাস রচনার যে ধারা সে ধারাকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে শতাব্দীব্যাপী। তবু কেন রবীন্দ্র বলয় থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা? তারও কারণ আছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত যে আকাশ তার আশে পাশের গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় জানা astronomer এর অন্যতম আরাধ্য বিষয়। রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন তুংগশীর্ষে তখন করাচির সেনানিবাস থেকে একজন অপরিচিত যুবকের নিকট থেকে এসেছিল সওগাত পত্রিকায় ছাপানোর জন্য লেখা 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী।' ১৩২৬ সালে। বাংলা সাহিত্যে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

একই বছরে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' বের হলো বংগীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। নজরুল সম্পর্কে আবেগ-বিহ্বল না হয়েও বলা যায় 'মুক্তি' নিয়ে এল বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক অভিনব পরিবর্তনের বাণী।

তিন

বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে নজরুল হাবিলদার পদে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধের অনুশীলনের মধ্যে কাব্যচর্চার বিরাম ছিল না। একজন সহযোগী মৌলভির কাছ থেকে আরবী, ও বিশেষতঃ ফারসী ভাষাটা নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করলেন তিনি। যার ফলস্বরূপ আমরা 'দিওয়ানে হাফিজ' ও 'রুবাইয়াত-এ ওমর খৈয়াম'কে প্রত্যক্ষ করেছি।

জন্মাবধি দুঃখের দহনে পিষ্ট হয়েও কবি ছিলেন আশাবাদী, বরাবর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রথম জীবনের লেখাতে এর আভাস পাই,

চাষ কর দেহ জমিতে হবে নানা ফসল এতে।

হাফিজের অনুবাদেও এ আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে,

দুঃখ কি ভাই! হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে।

সৈনিক হয়ে ফিরে আসার সময়ে এবং পরে সে আশাবাদ বিফলে যায়নি। তাঁর কল্পনা দৃষ্টিতেও এতটুকু ধূসর আঁচড় পড়েনি।

নজরুল সম্পর্কে অবহিত সকল সুধীজনই জানেন করাচি থেকে তিনি আর কোথাও যাননি। অথচ তাঁর সেই সময়কার লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সুষমা ও সৌরভ। 'ব্যাথার দান', 'মেহের নেগার', 'রিক্তের বেদন'এর অন্তর্নিহিত সৌকর্যে এর পরিচয় আছে।

১৯২০ সালের প্রথম দিকেই কবি ফিরে এলেন। এই সময় কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ স্থাপিত হয়। কবির জীবনে কমরেডের স্নেহ ও অনুপ্রেরণা দুইই উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১৯২০ থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই এই বাইশ বছর নজরুলের শিল্পজীবন পরিব্যাপ্ত। এই সময়কালের বিশ্বের কথা মনে রাখলে বলতে হয় এ দুই দশক ছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পালা বদলের মোড় বদলের সময়। সমাজচিন্তা ও জীবনচিন্তায়ও এল অনেক পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব তৎকালীন সাহিত্যকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিল। অর্থনৈতিক মন্দা, মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠার প্রবণতা পুরোনো চিন্তা চেতনা থেকে বের হয়ে মুক্ত নিরপেক্ষ ভাবাশ্রয়ী দর্শন কবি শিল্পী সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছিল

তখন।

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম তিন বছর ভিন্ন জগতে কাটিয়ে দেশে ফিরে এসে প্রত্যক্ষ করলেন মাতৃভূমির হতদশা। সর্বহারাদের জন্য খাদ্যের বস্ত্রের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। দুঃখুমিয়া বা তারা-খ্যাপা তখন দুর্মর যৌবনের অধিকারী। একদিকে দেশের শৃঙ্খলাবস্থা, অর্থনৈতিক সংকট অন্যদিকে তাঁর লেখনী নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল আত্মপ্রকাশের নিবিড় তাড়নায় চঞ্চল বলা চলে। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সান্নিধ্যে এসে রাজনীতির দীক্ষা নজরুলের অন্তরে তখনই সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এরমধ্যে হঠাৎ আলী আকবর খান নামে একজন সাংবাদিকের অপ্রতিরোধ্য স্নেহের প্রেরণায় কবি কুমিল্লায় যান। তখন কলকাতার সাহিত্যজগতে কবির পরিচিতি ঘটেছে। আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা ঘটে। তাঁর সঙ্গে বিবাহের সমস্ত আয়োজনও সম্পন্ন হয়। কিন্তু কি এক অজানা কারণে বিয়ে নিষ্পন্ন হতে না হতেই তিনি সেখান থেকে একরকম পালিয়ে আসেন আশালতা সেনগুপ্তর বাড়ীতে। এ কারণে কবির মনে যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রকাশ দেখি পরবর্তী রচনা 'বিদ্রোহী'তে।

কুমিল্লা থেকে এসেই তিনি পুনরায় সৃষ্টিকর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেন। মাইকেলের সঙ্গে নজরুলের এই বিষয়ে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় কবির মনে সামাজিক আঘাত যতই দুঃসহ হোক না কেন শিল্প সৃষ্টিতে ফুল ফুটিয়েছিল অনেক। কুমিল্লা থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ হলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যথার্থ কবি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। নজরুলের কবি জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তারও পরে যখন তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করলেন।

চার

প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্রোহী' এনে দিল নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য সম্মান। বলা বাহুল্য প্রশংসা ও নিন্দাবাদ দুইই কবির ভাগ্যে জুটেছিল। যেমন জুটেছিল মাইকেলের। সেকালে 'ছুছুন্দরী বধ' কাব্যে কবির বিরুদ্ধে বিষোদগারের নমুনা প্রত্যক্ষ করি। 'বিদ্রোহী' লিখে কবি নজরুল হিন্দু মুসলিম উভয়েরই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ছোলতান পত্রিকায় (১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৯) 'বঙ্গ ভাষায় মোসলেম প্রভাব' নিয়ে সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেছেন,

> কবি নজরুল ইসলামের মধ্যে খাঁটি কবি প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্রোহী কবিতা লিখিয়া তিনি আমাদের একেবারেই নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই কবিতায় দুএকটি মোসলমানী শব্দ থাকিলেও উহার

ভিতরের সব জিনিষটা, হিন্দুমতে। বলিতে গেলে উহার কাঠামো হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের সাজসজ্জা পর্যন্ত সবই হিন্দু ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত। (পৃঃ ৪৭-৪৮।)

শনিবারের চিঠি অপর পিঠে ১৮ই আশ্বিন ১৩৩৯ একটি ব্যঙ্গ কবিতা ছাপলেন।

ব্যাঙ

আমি ব্যাঙ/ লম্বা আমার ঠ্যাঙ/ ভৈরব বরসে বর্ষা আসিলে/ ডাকিরে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ/ আমি ব্যাঙ...... /আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই/ আমি বুক দিয়া হাঁটি/ ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই/ আমি ভীম ভুজংগ/ফণিনী দলিত ফণা/আমি ছোবল মারিলে/নরের আয়ুর মিনিটে যে যায় গণা/আমি নাগ শিশু, আমি ফণিমণসার/ জংগলে বাসা বাঁধি/আমি বে'অব বিস্কে/সাইক্লোন আমি, মরু সাহারার আঁধি----

(দ্রঃ 'দেশ' পত্রিকার ২২ জুন '৯১ সংখ্যায় মুস্তফা নুরউল ইসলামের 'সমকালে নজরুল ইসলাম', গ্রন্থ সম্পর্কে চিত্তব্রত পালিতের আলোচনা। পৃঃ ৫৭)

বলা বাহুল্য এ নিন্দাবাদমূলক সমালোচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বিদ্রোহীর স্রষ্টা হবার পরই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে একটা কালোত্তর প্রতিভার উন্মেষের কথা সুধীজন জানলো।

১৯২২ সালে 'বিদ্রোহী' 'বিজলি' 'মোসলেম ভারত পত্রিকা' এবং পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কমরেড মুজফফর বলেছেন, 'সেদিন পত্রিকা বিক্রির নমুনা দেখে বোঝা যায়- দেড় লক্ষ লোক বিদ্রোহী পড়েছিল সেবার'। কেন? কি ছিল সে কবিতায়? প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্রোহী' একটি যুগান্তকারী রচনা। একটি মাত্র কবিতার ভাব সম্পদে কবি যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করেছেন তা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। দীর্ঘ কবিতা অনেকের আছে। T. S. Eliot এর 'Waste land'ও দীর্ঘ কবিতা এবং বহু উপাদান ও উপচারে সমৃদ্ধ। কিন্তু 'বিদ্রোহীর' স্বাদ আলাদা। নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধন হারা'য় আমরা বিদ্রোহীর কিছু আভাস পেয়েছি। কবির অন্তরস্থিত যৌবন তরঙ্গেরই একটি অস্থির ঢেউ এই 'বিদ্রোহী'। শাসন না মানা, বেপথু পথিকের আলোক সন্ধান কবির অন্যতম জীবন দর্শন। রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের 'সবুজের অভিযান' কবিতায় নতুনের, নবীনের জয়ধ্বনি আছে। যারা শাস্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত তাদের প্রতি কটাক্ষও আছে। 'বিদ্রোহী'তে আছে বাংগালী মায়ের দামাল ছেলের শির উত্তোলন। বলাবাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে কবিতায় ঐ রকম পরিবেশ সৃজন সম্ভব হতো না। যোদ্ধার বেশ শুধু তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে ছিলনা এ ছিল তাঁর আত্মার আচ্ছাদন। কমরেড মুজফ্ফর লিখেছেন কবি যখন যুদ্ধ ফেরৎ এলেন তখন তাঁর বাক্স পেটরা থেকে নিম্নলিখিত জিনিষপত্র বের হয়েছিল, তার বর্ণনা নিম্নরূপ,

এই সময় নজরুলের সম্বল— 'লেপ তোশক, পোশাক পরিচ্ছদ, সৈনিক পোশাক,

শিরওয়ানি, ট্রাউজার্স, কালো উঁচু টুপি, একটি দূরবীন (বাইনোকুলার), কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ও দেওয়ান-ই-হাফিজ'। বলা বাহুল্য ছোট এই বর্ণনা কবির মনোজগতের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করছে। যুদ্ধের তাঁবুতে থাকাকালীন কবি দওয়ান-ই-হাফিজ মূল ভাষায় পাঠ করেন। হাফিজের অনুবাদ কর্মের মধ্যে নজরুলের কিছু গজল গানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন,

জাগো সাকী হামদরদী,
জাম বাটিতে দাও শরাব।
চুলোয় যাক এই দুঃখ ব্যথা ধুলোয় থাকুক সব অভাব।
ভয় কি সখি করবে নিন্দা শাস্ত্র শকুন বন্ধুরা;
হায় বদনামে মোর পরোয়া থোরাই-
চালাও পান্‌সী দাও সুরা।

এ সবের মধ্যে নতুন যুগের নতুন মূল্যবোধের প্রতি কবির আকর্ষণ যে প্রবল ছিল এটা বেশ বোঝা যায়। তাই যুগের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ও সমর্পণের মধ্য দিয়েই বিদ্রোহী কবিতার উচ্চারণ ঘটলো— এটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পাঁচ

কবি জীবনের বহু রহস্যময় দিক এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। কবির যুদ্ধ যাত্রা এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার এই সময়টুকু কবির জীবন মানস বিশ্লেষণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় অধ্যায়। কেন তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন? দেশোদ্ধারের প্রেরণায়? দেশ তো তখন বৃটিশ শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি ইংরেজের হয়েইতো লড়বেন। সতের বছরের একটি কিশোরকে যুদ্ধের দামামা উন্মত্ত করে দিল ভাবতেই বিস্ময় জাগে। যুগের হুজুগ মেনে নেওয়া যায় না। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই জানেন কবির সঙ্গে তার সহপাঠী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রতিপত্তিশীল মাতামহের প্রভাবে তাঁকে সে যাত্রা থেকে বিরত করা হয়। নজরুল গেলেন। আর চট্টগ্রাম থেকে গেলেন মাহবুব উল আলম। মাহবুব উল আলমের যুদ্ধে যাবার পেছনে কারণ ছিল। শ্বশুরবাড়ীর লোক তাঁর পুরষ্কার নিয়ে ধিক্কার দিয়েছিল। তাই পল্টনে গেলেন। তাঁর 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' সেই ইতিহাস বহন করে। নজরুলের অন্তরস্থিত কিছু অজানা তথ্য আমরা বিদ্রোহীর' মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। 'বিদ্রোহী' নজরুলের আত্মার সব বৈভবকে, অভিব্যক্তিকে, জিজ্ঞাসাকে, আশাকে, ঘৃণাকে, স্মৃতিকে একত্রিত করে মানবতন্ত্রীর সূক্ষ্ম তারে আঘাত হেনেছে। সেই সুর ছন্দে বাণী বিন্যাস তাঁর একক সৃষ্টি। মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' নামক প্রবন্ধের সঙ্গে ভাবগত মিল যদি কেউ খুঁজে পান তা হবে একান্তই কাকতালীয় ব্যাপার।

'বিদ্রোহী' যে শুধু বাক্য বিন্যাসের স্থূল প্রতিকৃতি নয় তা কবি সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র

মিত্রের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

> নজরুল ইসলাম চিরবিদ্রোহী সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা আন্দোলনের উর্ধ্বে তুষার শিখরের মতো স্থির।
>
> সমস্ত উন্মত্ত বেগের পিছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি স্থৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতই নজরুল ইসলামের নাম বংলা সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকতো।

(দ্রঃ সুফী জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত 'নজরুল প্রতিভা পরিচয়' গ্রন্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঝড়' নামক প্রবন্ধের (৪৭২-৭৩ পৃঃ) অংশবিশেষ।)

'বিদ্রোহী' ১৪৯ পংক্তির একটি দীর্ঘ কবিতা। ৮টি স্তবক। ভাব সম্পদে আছে এক বন্ধনহারা চিত্তের প্রকাশ ও অভিলাষ। হিন্দু পুরাণ, মুসলিম ঐতিহ্য, গ্রীক পুরাণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। কবির বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। দূরন্ত যৌবন তাঁর দেহে, মনে। স্বভাবতই মনে আসে আলী আকবর খানের বাড়ী থেকে অনেকটা প্রতারিত হয়ে এসে কবি যেন সর্বসমক্ষে জানিয়ে দিলেন প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলাম নামের ব্যক্তিটি কে। কোন ধাতুতে গড়া তাঁর মন মানস। ভারতীয় দর্শন, ইরানের সুফীবাদ এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অহংবোধ। বিদ্রোহের প্রতিটি ছত্রে তাই স্পষ্ট প্রতিবাদের ধ্বনি। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে আশ্চর্য সৌম্য, স্থির, স্নিগ্ধ সংগীতের প্রলেপ। জ্বালা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবন থেকে পলায়নপরতা নেই। হতাশার গ্লানি নেই।

'বিদ্রোহী' নানা বর্ণের, রূপের, স্বাদের, সৌরভের সমারোহে সমৃদ্ধ। একটি মাত্র কবিতায় স্বীয় ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে। যুদ্ধ প্রত্যাগত নজরুল প্রত্যক্ষ করেছেন এ দেশের হতদশা। শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয় অবক্ষয়মুখী সমাজের ভগ্নদশাতে তিনি সোচ্চার, উদাত্ত আহ্বান জানালেন। মানবতার মহিমা নতুনভাবে ঘোষিত হলো। এ যেন এক মহিমাময় উষায় দিবাকরের বার্তা।

শির নেহারী আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

একই কবিতায় 'অনিয়মের' স্রষ্টা কবি তাঁর অন্তরের আসল সত্তাটিকে প্রকাশ করেছেন এভাবে

আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল

রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের' মত সম্মিলন ঘটালেন ইতিহাস ও পুরাণের,

আমি বেদুইন, আমি চেংগিস

আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।

এই অনিকেত কবি, সকল নিয়ম, না মানাই যার একমাত্র নিয়ম তিনি বিদ্রোহী

ভৃগুর মত ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেবার স্পর্ধা করেছেন।

'বিদ্রোহী' কবিতার শব্দশৈলী ও উপমা রচনার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। এখানে তিনি দেশী-বিদেশী শব্দের যে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, ধ্বনি বিন্যাস ও অনুপ্রাস রচনায় যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা' বিস্ময়কর।

শুধু তাই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা, শাক্ত ভাব, গ্রীক পুরাণ, ইসলামী দর্শন এ সমস্তই এসেছে সহজভাবে কবিতার অনুষঙ্গে। বীন বাদনরত গ্রীক অর্ফিয়াস, ছিন্নমস্তাচণ্ডী, ইস্রাফিল, বাসুকির ফণা, এর সঙ্গে স্বর্গের পক্ষীরাজ বোর্‌রাকের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি।

আপাততদৃষ্টিতে অসম এই সম্মিলনে যা কবির মনোভূমির সঙ্গে একাত্ম, তা হল একটি স্বাধীন সত্তার ভুবনে কবি মানসের বিজয় পতাকা উত্তোলন করতে চেয়েছেন। সমুদ্রের মহা কল্লোলের ধ্বনিতে শুনেছেন বিচিত্র রাগিণী। তিনি যে চির পথিক। ঘরছাড়া। গৈরিক পৃথিবীতে গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় শ্যামল ছায়া দেখেছেন, সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন ঘনশ্যামের হাতে বাঁকা বাঁশীর।

'বিদ্রোহীর' শব্দ সম্পদ অভিনব। কবিতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দ ছন্দের ঝঙ্কার পাঠকের কানকে সজাগ রাখে। প্রথম স্তবকেই 'ধীর' 'শির', 'হিমাদ্রীর', জয়শ্রীর' এই শব্দগুলো বিশিষ্ট অর্থ বহন করছে। সমিল মুক্তক ছন্দের প্রবহমানতাকে স্বচ্ছন্দ রাখতে সহায়কও হয়েছে। একদিকে অনুপ্রাস অন্যদিকে ব্যঞ্জন বর্ণের আধিক্য থাকলেও শ্রুতিকটু হয়নি। বস্তুতঃ এই কবিতার উপাদান-সামগ্রী তথা শব্দরাজি, ধ্বনিচিত্র ও চিত্রকল্প 'বিদ্রোহী'-কবি মানসের একটি সার্থক রূপায়ণ।

ছয়

বাংলা কবিতার স্বভাবে যে নতুন সম্ভাবনা উপ্ত ছিল তা একদা যেমন উচ্চকিত ও দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছিলেন মাইকেল, একদিন তেমনি সে সম্ভাবনাতে সৌকর্যের শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন নজরুল; তাঁর 'বিদ্রোহী' রচনার মাধ্যমে। 'বিদ্রোহী' কবিতার সিঁড়ি দিয়ে বাংলা কবিতা আন্তর্জাতিক ভুবনেও একটি ভিন্ন মাত্রা অর্জন করলো। যুদ্ধোত্তর কালের (প্রথম মহাযুদ্ধ) সমগ্র পাঠককুল সেদিন নিরীক্ষণ করলো উদ্দাম সাফল্যের মধ্যে নতুন মূল্যবোধের দৃপ্ত ইঙ্গিত। ক্ষয়িষ্ণু দিগ্‌ নির্দেশনাহীন সমাজের জিজ্ঞাসাগুলো এতদিন জমেছিল পুঞ্জীভূত বহ্নির মতই। নিরাসক্ত ভাবসাধনার অবকাশ তখন আর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অসীম সৌন্দর্য চেতনায় ধ্যানমগ্নতা অন্তরে স্বস্তির প্রলেপ দিলেও তাতে ধূমায়িত ক্ষোভ নির্বাপিত হচ্ছিল না।

বস্তুতঃ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পরে রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাও 'ভূধর হইতে ভূধরে' ছুটে চলতে চেয়েছে। ছুটে চলা, স্রোতস্বিনী নদীর মতই জীবনকে প্রবহমানতার

দোলাচলে নিক্ষেপ করার অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ থেকেই এসেছে। সৌম্য, স্থির অচঞ্চল ভাবের আড়াল থেকে তিনি জীবনকে তথা নদীর স্রোতকে 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারে'র সঙ্গে তুলনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

নজরুল এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী। তবে ব্যতিক্রমী চেতনায় উদ্দীপ্ত। তাই 'বিদ্রোহী' তাঁর ব্যতিক্রমী মানস সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ। এ কবিতা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাবার তাগিদ দিয়েছে। নজরুলের সমগ্র কবিকর্মের পুরোধা হয়ে আবিস্কৃত হয়েছে 'বিদ্রোহী'।

'বিদ্রোহী' কবিতার অন্তরঙ্গ সুরে ধারাক্রম পরিদৃষ্ট হয়না। কারণ শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট ভাবসম্পদকে কেন্দ্র করে এটি গ্রথিত হয়নি। এজন্য সুশৃংখল বাণীবিন্যাসে এ কবিতা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু আপাতবিরুদ্ধ অসামঞ্জস্য হৃদয় কথনে তিনি কারুর অনুসারী নন। এখানেই তার অনন্যতা । নাতিদীর্ঘ শিল্প জীবনে সমন্বয় সাধন তথা কোন কিছুতেই পরিমিতির পরিচয় দিলেন না যে কবি, 'বিদ্রোহী' সেই শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, বৈদগ্ধ ও চিত্ত উন্মোচনের বোধন। এখানে তিনি একক পথচারী। হুইটম্যান, ভ্যানগগের মতই একা।

উনিশ শতকে ইউরোপে, কাব্য সাহিত্যে যেমন এক বিপুল নবজাগরণের সাড়া পড়েছিল তেমনি চিত্রশিল্পেও এর প্রতিফলন হয়েছে। ফরাসী চিত্রকর সিজান, গগাঁ, দেগাঁ এবং ভ্যানগগের শৈলীতে দেখা গেল নবতর বিন্যাস। এরা impressionist এঁদের চিত্রের রং-এ ও রেখায় এল নতুন শৈলী। এঁদের মধ্যে ভ্যানগগের জীবন ও শিল্পকৃতির সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য আছে। ভ্যানগগের পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। ভ্রাতা লিও আর্ট ডিলার। পরিবার পরিজনের মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর বারবার বিরোধ হয়েছে। নিকটজনদের চিরাচরিত ঈশ্বর বিশ্বাসে তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। এজন্য তাকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। এই নিঃসঙ্গ পথচারী শিল্পী বার বার মানসিক ভারসাম্যও হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চিত্রে এসেছে নতুন সৌরভ যা নবতর জীবন ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। প্রকৃতির সান্নিধ্যই ছিল তার আকাঙ্খিত। একদিকে সূর্যালোকের প্রখর দাবদাহ, অন্যদিকে অস্তাচলের শুচিস্নাত স্নিগ্ধতার ঔজ্জ্বল্য। তাঁর স্বল্প পরিসরের জীবনে ছিল অস্থির চিত্ততা । কিন্তু শিল্প নির্মাণে ছিল যে বৈভব তা তুলনা রহিত। (দ্রঃ VanGogh, I am Danlon, London, 1974)। হুইটম্যানের 'song of myself'এই সুদীর্ঘ কবিতায় যে দার্ঢ্য, অহংবোধ সঞ্চরণশীল জীবন ভাবনার প্রতীকী চিন্তার পরিচয় আছে'বিদ্রোহী'র সঙ্গে তার একটি সুদূর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য, নজরুলের কবিতায় বিদেশী ভাব সম্পদের প্রভাব ও অনুশীলন এই পর্যায়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন, সৈয়দ আলী আহসান তার 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে, যা ১৯৫৪ সালে মখদুমী ও আহসানউল্লাহ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত।

সৈয়দ আলী আহসান মূলতঃ নজরুলের 'অগ্রপথিক' কবিতা ও হুইটম্যানের 'pioneers, o pioneers' কবিতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। 'বিদ্রোহী'র নয়। নজরুল তাঁর 'বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য' প্রবন্ধে বিশ্ববরেণ্য কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে শেলী এবং হুইটম্যানের উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ নজরুল রচনা সম্ভারঃ আবদুল আজিজ আল আমান সম্পাদিত পৃঃ৩৩০। হুইটম্যানের 'song of myself' এই সুদীর্ঘ কবিতাটির একান্নটি স্তবক। বিদ্রোহীর মত ভাবসম্পদে এর বাণীবিন্যাস নেই, বস্তুতঃ ভাবের বৈপরিত্যও এর অন্যতম সম্পদ।'song of myself' এ কবি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এভাবে,

> I celebrate myself, and sing myself, and what I assure you shall assume,
>
> It is time to explain myself-let us stand up .....
>
> I have said that the soul is not more than the body, and I have said that the body, is not more than the soul, and nothing, not God, is greater to one than one's self is,
>
> The past and present wilt-I have filled them, emptied them, and proceed of fill my next fold of the future-----
>
> Do I contradict myself?
>
> (I am large, I contain multitudes.)

(দ্রষ্টব্য)ঃ Leaves of Grass and selected prose by Walt Whitman, Edited with an Introduction, by John Kowen Hoven, professor of English, Barnerd College, NY, 1924)

নজরুল বর্তমান বিশ্বসাহিত্য প্রবন্ধটিতে হুইটম্যানকে ধরাধামের কবি হিসাবেই কবিতাটিতে উল্লেখ করে যা বলেছেন তার অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে নজরুলের মানসিকতার একটি স্বচ্ছ পরিচয় মেলে যা বিদ্রোহীর মৌল আবেদনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত— মূলতঃ নজরুল সত্যসন্ধানী সুরস্রষ্টা। তাঁর সমগ্র কাব্য সাধনায় তারই অনুসরণ। হুইটম্যান এর মত আপাত বিরুদ্ধ ভাবের সঙ্গে আছে এক সুমহান সুসঙ্গতি। 'বিদ্রোহীর' মধ্যেও আছে আপাত বিরুদ্ধভাবের ঐক্যতান।

> আমি শ্রাবণ প্লাবন বন্যা
> কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা
> আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়
> আমি অজর, অমর, অক্ষয়, আমি অব্যয়।

'বিদ্রোহীতে' কবির বিচিত্র অনুভূতিগুলোর অভিব্যক্তির প্রকাশ ও অভিলাষ ঘটেছে নানারূপ, সৌরভ ও গৌরবের মহিমায়। সে মহিমা মূলতঃ মানুষের ললাটে বিজয়

তিলক। যা ক্ষণস্থায়ী নয়। কালজয়ী।

তথ্যপঞ্জি

আতাউর রহমান (১৩৯৮) ঃ *প্রতিকূল স্রোতের যাত্রী'* / দৈনিক ইত্তেফাক , ৮ই জ্যৈষ্ঠ।
চিত্তব্রতপালিত(১৯৯১) ঃ 'নজরুল চরিতের উপাদান'। সাপ্তাহিক দেশ। ২২জুন সংখ্যা। কলিকাতা
প্রেমেন্দ্র মিত্র(১৯৮৪) ঃ 'ঝড়' । দ্রষ্টব্য, সুফি জুলফিকার হায়দার সম্পাদিত *'নজরুল প্রতিভা পরিচয়'* ঢাকা।
মুস্তাফা নূর উল ইসলাম (১৯৮৩) ঃ *সমকালে নজরুল ইসলাম* / ঢাকা শিল্পকলাএকাডেমী।
রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক(১৯৮২) ঃ *কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা।* ঢাকা, মল্লিক ব্রাদার্স।
(১৯৯১) ঃ 'নজরুল সম্পাদনা' *দৈনিক সংবাদ,* ৮ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ঢাকা
শাহাবুদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত১৯৮৯) ঃ *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ* (আবদুল কাদির)। ঢাকা, নজরুল ইন্সটিটিউট

নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা

আবুল হাসানাত

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি আধুনিককালে। এর আগে উপন্যাস রচিত হয়নি, কারণ, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্য মানুষের মন জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতুহলী হইয়া না উঠে ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকে না। পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল— অর্থাৎ মানুষ আদিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আপেক্ষিক জ্ঞানে লব্ধ আধিভৌতিক কার্যকারণের উপর আস্থাবান হইল— তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার অহেতুক কৌতূহল উদয় হইল। তদানুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিও নূতন রূপ লইল, নভেল। দেব-দেবী যক্ষ-রক্ষ রাজা-রানী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের বর্ণহীন কাহিনীতে উৎসাহ জাগিল। টাইপ বা অভিব্যক্তির এবং হীরো ও অতি-মানবের স্থান লইল সাধারণ লোক, যে লোক বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অথবা শ্রেণীর মুখপাত্র নয়, যে নিজেরই প্রতিনিধি।'[১]

বাংলায় উপন্যাস সত্যিকার অর্থে, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা রচিত হয়। তাঁর 'দুর্গেশ নন্দিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৫।

মীর মশাররফের 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রকাশকাল ১৮৮৫। এ জন্যে ডঃ এনামুল হক বলেছেন, '১৮০০ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২১-১৮৮৭), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ সাহিত্যিকদের অক্লান্ত চেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানান শাখায় গদ্য রীতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পাশ্চাত্য-প্রভাব দীপ্ত কাব্যধারা যখন পূর্ব-বিবর্তিত, সবে তখনই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানেরা প্রবেশ করিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙলার মুসলমানদের এই যে অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কালের বিলম্বিত প্রবেশ, এটাই আধুনিক সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বল্পতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।[২]

কাজী নজরুল ইসলামের আগে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯০) মোজাম্মেল হকের 'জোহরা' (রচনা ১৯১৭, প্রকাশিত ১৯৩৫), মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' (১৯১৪), মতিয়র রহমানের 'মোক্ষপ্রাপ্তি' (১৯০৯-১০-এ

মিহির ও সুধাকর-এ প্রকাশিত), ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায় নন্দিনী' (১৯১৮), বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' (১৯৩০), কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩), লুৎফর রহমানের 'রায়হান' (১৩২৬), শাহাদাৎ হোসেনের 'মরুর কুসুম', কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে', 'আজাদ', শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলীর 'বঙ্কিমদুহিতা', আকবর উদ্দীনের 'মাটির মানুষ' (১৯২৯-এ মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত), গোলাম মোস্তফার 'রূপের নেশা' (১৩২৬) ও মাহবুব-উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন হারা' (১৯২৭) 'কুহেলিকা' (১৩৩১) ও 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) এই তিনটি উপন্যাসের কথা আমরা জানি। কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' ১৯২২ এ রচিত; মৃত্যুক্ষুধা-৩০ এ। ফলে এ কথা বলা সঙ্গত যে, তিনি বেশ প্রস্তুতি নিয়ে 'মৃত্যুক্ষুধা' রচনা করেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন, 'স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় এবং সন্ত্রাসবাদের আরম্ভ হয়। বাঙলাদেশে 'অনুশীলন সমিতি' ছিল সন্ত্রাসবাদের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র। সমিতির সভাপতি ছিলেন পি. (প্রমথ) মিত্র ও অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন সহকারী সভাপতি। ঢাকার শাখাটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যুগান্তর দলের কৃতিত্বও স্মরণযোগ্য।

লক্ষণীয়, স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বঙ্গভঙ্গ প্রতিকারের মধ্যে আর সীমিত ছিলনা। বয়কট আন্দোলন চলেছিল; তবে বিলেতী দ্রব্য বর্জন নয়, বিদেশী শাসনের অবসানের লক্ষ্যে ধাবিত হল। নরম-গরমের দ্বারা কাজ হবে না ভেবে সন্ত্রাসীরা বোমা, রিভলভার, পিস্তলের শরণাপন্ন হল।

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু শহীদ হলেন; একজন আত্মহত্যা করে, অন্যজন ফাঁসীতে। মুরারী পুকুর বাগানের বিপ্লবী কেন্দ্রে পুলিশ তল্লাসী চালালে অরবিন্দ সহ অনেক নেতাই ধরা পড়েন। পুলিশ ১৯২৫ এ কলকাতায় দুটো বোমার কারখানা আবিষ্কার করেন। সূর্য সেন অস্ত্রের জন্যে ধরা পড়লেন না। পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা চার্লস টেগার্টকে গোপীমোহন সাহা হত্যার চেষ্টা করেন. কিন্তু ভুলক্রমে ডে নামক এক সাহেবকে হত্যা করেন। ধরা পড়েন তিনি এবং ফাঁসী হয়। এ ছাড়া অসংখ্য তরুণ-তরুণীর প্রাণ ঝরে যায় এ আন্দোলনের। এবং ১৯৩০ এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল।

১৯২০ যে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাংলায় যে পার্টিকেন্দ্র স্থাপিত হয় তার প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ।' ১৯২৫ এ সি.পি.আই. জন্ম নিল। মুজফ্ফরের 'নবযুগ' নজরুলের 'ধূমকেতু' কম্যুনিজম প্রচার করতে থাকে।

নজরুলের মতো আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক ও কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে সন্ত্রাসী আন্দোলনের, শহীদদের বীরত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ, সংগ্রাম ও মৃত্যুর জন্যে নিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই দেখি তাঁর দুটো উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ও আনসার অহিংসার পথে পা না বাড়িয়ে গান্ধীমতবাদে বিশ্বাসী হয়েও বিপ্লব ও সন্ত্রাসের সহিংস পথে পা বাড়িয়েছিল।

এখন প্রশ্ন খ্রীস্টান চরিত্রগুলো? নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে থাকতে এ-ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তবে মুসলমানদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা যে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা দিচ্ছিল তার শুরু বহু বছর পূর্ব থেকে। মুনসী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ ও জমিরুদ্দীনের জীবনী ও রচনা থেকে আমরা তা জানতে পারি। নজরুল স্বভাবতই মুসলমানদের দারিদ্র্য, মিশনারীদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে থাকবেন, এবং তারা যে ধর্মের আকর্ষণে নয়, দারিদ্র্যের জন্যই ধর্ম ত্যাগ করেছেন তাও বুঝতে পেরেছিলেন। অভিজ্ঞতার এই দীপ্ত অভিব্যক্তি 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস।

'মৃত্যুক্ষুধা'র আরম্ভ হয়েছে কৃষ্ণ নগরের চাঁদ সড়কের এক বস্তি এলাকায়। দারিদ্র্য জর্জরিত একটি পরিবার। প্যাঁকালে ও তার মা এবং তিন ভাবী ও তাদের ছেলেমেয়েরা। সীমাহীন এদের দারিদ্র্য; কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়ে যেতে তারা দ্বিধা করে না। দারিদ্র্যের নিস্পেষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিধবা মেজ বউ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নজরুল ইসলাম তাদের এই জীবনের চিত্রটি দক্ষ শিল্পীর মতো তুলে ধরতে পেরেছেন। এটা ফটোগ্রাফী নয়; জীবন্ত জীবন-চিত্র। নজরুলের এটা একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। উপরন্তু, জীবনের এই সুখ-দুঃখের বর্ণনায় তিনি বাস্তববোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তাও প্রশংসনীয়। বস্তির একটি চিত্র তুলে ধরছি, এতে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে,

গজালের মা বেশ চিবিয়ে বিচিয়ে বলছে,

> হারামখোর খেরেস্থান কোথাকার। হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়ারের মত চর্বি হয়েছে না? গজালের মাকে আর অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসীটা খপ করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে অঙ্গ দুলিয়ে চ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তা' বলবি বৈ কি লা সুট্‌কি। ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-বাধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা।'
>
> গজালের মা রাগের চোখে তার ভরা কলসীর সব জল মাটিতে ঢেলে ফেলে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, 'ওলো-আগ-ধুমসী। ওলো ভাগলপুরের গাই। ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো। আমার ছেলে জজ সাহেবের খানসামা ছিল, জজ সাহেবের লো, ইংরেজের।
>
> পুটের মাও খেরেস্তান; তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়াজীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে বলে উঠলো, মা সইরণ সইতে নারি, সিদেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি। বলি, ও গজালের মা, ঐ জজ সাহেব আমাদের জাত। আমরা আমাদের জাত জানিস?

শুধু এই নয়, নজরুল প্যাকলের সংসারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অভাব, যন্ত্রণা, আশা-নিরাশার এক স্মরণীয় চিত্র অথচ তা ফটোগ্রাফী হয়ে ওঠে নি। প্যাকালে, তার মা, বড় বৌ, মেজ বৌ, সেজ বৌ সবাই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল। দু-চারটি ঘটনা, সামান্য বর্ণনায় নজরুল এদের যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা শক্তিশালী কথাশিল্পীর দুর্লভ গুণ বলে বিবেচিত হবে।

উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত 'মৃত্যুক্ষুধা' একটি সফল উপন্যাস; কিন্তু তারপরেই চোরাবালি। পাঠকের পক্ষে এটা এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে দেখি, আনসার, নাজির সাহেব, লতিফা বা বুঁচি রুবিকে; উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড যেন। 'মৃত্যুক্ষুধা'য় তারা কোনো নতুন তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রথমাংশের চমকপ্রদ বাস্তবতা কুশলী পরিবেশ-সৃষ্টি ও চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতা যে শক্তিশালী শিল্পীর পরিচয় বহন করে, শেষাংশের তরলতা, ভাবালুতা ও অবাস্তবতা খেয়ালীপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। নজরুল ইসলাম এখানে তাঁর চিরন্তন দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নিজের ছায়ায় আনসার চরিত্র নির্মাণ করেছেন। রুবিকে দিয়ে ভালবাসিয়েছেন, বুঁচিকে দিয়ে প্রীতি-ধন্য করিয়েছেন। মেজবৌর দুর্বলতা দেখিয়েছেন। আসল বক্তব্য গেছে হারিয়ে। এলো রাজনৈতিক কর্মী আনসার। সেই কর্মী কোনো সুষ্ঠু বক্তব্যে উপন্যাসটির গৌরব বৃদ্ধি করে নি। সে মেথর–রিকশাওয়ালাদের কাছে মেঠো বক্তৃতা দিয়েছে; জেলে গেছে; ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে; রুবিকে ক্ষুধিত অজগরের মতো গ্রাস করেছে। মেজবৌ, প্যাকালে, বড় বৌদের যে দুঃখময়, কষ্টময়, বিষাদবেদনাঘন ছবি আঁকলেন তার কী হলো? নজরুল ইসলামের পুতুল–খেলার কৃষ্ণনগর যেন কোন খেয়ালি শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলা ঘর। আমরা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, 'শিশু-খেলার 'মৃত্যুক্ষুধা' যেন কোনো খেয়ালি শিশু-লেখকের (অপটু) খেলাশেষের ব্যর্থ শিশু-খেলা'।

রুবি বুঁচিকে লিখেছে,

> দুদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি বন-হরিণীর।
>
> সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগলো। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয় – ওর জন্য। এ সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয়, এ যে ওরও মৃত্যু। ও যে মৃত্যুজর্জর, আমাকে গ্রাস করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ ওর আছে?
>
> আমি জানতাম এ রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি। নইলে যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর। তাকে এ মৃত্যুক্ষুধায় পেয়ে বসলো কেন?'
>
> উপন্যাসটির শেষের এই পরিণতি আকস্মিক। 'সারা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ওটা বিন্যাস হয়ে আসে নি।[৪]

প্রশ্ন হলো, যে অসহনীয় দারিদ্র্যের জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করা-ই নজরুলের প্রধান উদ্দেশ্য তা শেষ পর্যায়ে রুবি ও আনসারের প্রসঙ্গ এনে কী 'মৃত্যুক্ষুধা' নামকরণের যাথার্থ্য প্রমাণ করলেন নজরুল ? মৃত্যুপথযাত্রী আনসারের যৌনক্ষুধাই বড়ো? না মৃত্যুপথযাত্রী একজনের জীবনক্ষুধা? যদি দু'টোই সত্য হয়, তাহলে দারিদ্র্যের যে অকপট উপস্থাপন তার তাৎপর্যময়তায় সম্পন্ন করেন নজরুল তার সার্থকতা কোথায়, কীভাবে? এবং এটাই নজরুলের বৈশিষ্ট্য। শেষ রক্ষা তিনি করতে পারেন না। চিন্তা-ভাবনার সুসঙ্গত অভিব্যক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। চিন্তা চেতনা-ভাবনার ও উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের সামগ্রিক রূপ জীবন্ত রেখায় বাণী-রূপ দেওয়ার প্রয়াস ভাবাবেগ, উদ্দামতা ও অস্থিরতার চোরাবালিতে আটকিয়ে যায়।

রুবির চিঠির কিছু অংশ লক্ষ্য করা যাক,

> আমি ঘরে ঢুকে বললাম, 'আমি এসেছি'। সেকি আনন্দ তার চোখে মুখে! সে 'রুবি' বলে মুর্ছিত হয়ে পড়লো।
>
> 'আচ্ছা, বুঁচি, তুই ঘুমন্ত অজগরের জাগরণ দেখেছিস? শিউরে উঠিস নে, সব কথা ভাল করে শোন্।
>
> দুদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে।'

এই আবেগ-দীপ্ত মথিত হৃদয় তো নজরুলেরই। প্রাণধর্মের তাগিদে চলা আবেগতাড়িত মানুষের ধৈর্য সংযম কোনটাই থাকে না, থাকে না মোহমুক্ত বিবেচনার শক্তি। ফলে নজরুল ইসলাম প্রেমে বা কোন বিশেষ নারী প্রেমে নিষ্ঠ ছিলেন না; তাঁর নিজের কথায় যৌবনে 'প্রেম সেথা চির মেঘ আবৃত তনু—সেথা ভোলে তনু মায়ায়'। রূপবতী ও যৌবনবতী নারী তাঁকে আকৃষ্ট করত, অথবা নারীর লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণের শক্তি ছিল তাঁর। যুদ্ধে যাবার আগেই কোন এক কিশোরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, এ অনামিকাকেই তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' উৎসর্গ করেছিলেন, দ্বিতীয়টির সন্ধান মেলে গার্ডের বাড়িতে, তৃতীয় জন নার্গিস, চতুর্থ জন দুলি ওরফে আশালতা প্রমীলা, ঢাকায় পঞ্চম জন ফজিলাতুন্নেসা, হয়তো রানু সোমও, জাহানারা চৌধুরী ও উমা মৈত্রের প্রতি গুণানুরাগ তো ছিলই, হয়তো রূপানুরাগও ছিল।[৫]

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও প্রবহমান। তাই উপন্যাসের মূল সুরটি অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি; মূল লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়েছেন; লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরন্দাজের মতো ব্যর্থ হয়েছেন। ঔপন্যাসিক নজরুল সফলতার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পতিত হলেন। 'মৃত্যুক্ষুধা'র প্লট অসাধারণ। যে বিষয়টি তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রমাণ রাখে। সাহিত্যে নির্বাচন একটি বড় কথা। এটা সাহিত্যিকদের সমস্যাও বটে। সে দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি মূল কাহিনীটি ধরে রাখতে পারেন নি, সরে গেছেন। আবেগের কাছে হেরে গেছেন।

উপন্যাসে যে বিশেষ দিকটি অনুধাবন করার বিষয় তা হচ্ছে জীবনের সমগ্রতা- আংশিক দিক- অংশ ও সমগ্র— এবং বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জীবনের অভিব্যক্তি ঘটানো। জীবন তো কেবল অনায়াস প্রবাহ নয়; সেখানে ঢেউ ওঠে, উত্তাল হয়, তীরে আছড়ে পড়ে; দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বৈরীতে জীবনের জটিলতা- জীবন সরল রেখা নয়, বঙ্কিম, জটিল, কুটিল— জীবনের জটিল কুটিল অষ্টাবক্র স্বরূপকেই তুলে ধরতে হয়। নজরুলের এ অনুশীলন ছিলো না - সে মন-মেজাজ- মানসিকতাও ছিলো অনুপস্থিত।

নজরুল এ-সব জানতেন না তা নয়। তাঁর 'বিশ্ব সাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রমাণ স্বরূপ। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় নজরুল ইসলামের মৃত্যুক্ষুধার প্রকাশের সময় বঙ্কিম তো বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক'(১৯২৬), জগদীশ গুপ্তের 'বেদে'র প্রকাশকাল ১৯২৮। তিনি এসব পড়েছেন। হামসুন, বোয়ারও পড়েছেন।

যাহোক, এই উপন্যাসের একটি দিক উল্লেখ করার মতো, তা এর ভাষা; যেমন,

ক. এরা যেন মৃত্যুর মাল গুদাম। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই, আমদানী হতে যতক্ষণ, রফতানি হতেও ততক্ষণ। (পৃ. ৩)

খ. স্নান করে সে বাড়ি ফেরে। সারা শরীর তার ঝিম ঝিম করতে থাকে। যেন তাড়ি খেয়েছে। মাথার দুপাশের রগ টিপটিপ করে। বিশ্ব সংসার মুছে যায় তার চোখের সামনে থেকে। সে কেবল ভীত মিষ্টি কণ্ঠের আকুলতা শোনে আর শোনে, 'কেউ দেখে ফেলবে, দেখে ফেলবে।'....... তার তাকে লজ্জা নাই, লজ্জা শুধু দেখে ফেলার লোককে।

ওদের লজ্জা যেন ওদের জন্য নয়, অন্যের জন্য। তারা দুজনে চলে-চিরচলা রক্তরাঙা পথে। যে পথ ফরহাদ-মজনু, লায়লি-শিরি, গোলে-বকৌলি, মহাশ্বেতা-পুন্ডরীক, আরো কত জনের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। চির যৌবনের চির কণ্টকাকীর্ণ পথ। চিরকালের রোমিও জুলিয়েট, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেন ওরা। (পৃ ৪৫-৪৬)

গ. মসজিদে সন্ধ্যার আজানের শব্দ কান্নার মত এসে কানে বাজে। ও যেন কেবলি স্মরণ করিয়ে দেয় বেলা শেষ হয়ে এলো, আর সময় নাই।

সন্ধ্যার নামাজ যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ-কামনা (পৃ.১)

মুহম্মদ আব্দুল হাই যথার্থই বলেছেন, 'মৃত্যুক্ষুধাই নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পেটের ক্ষুধা মানুষকে তিলে তিলে কি ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার ধর্ম-বিশ্বাস এবং জন্মার্জিত সংস্কার কিভাবে শিথিল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নজরুল তার ছবি এঁকেছেন এ উপন্যাসে, কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের একটি

দরিদ্র মুসলমান ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে ধুঁকে মরেছে এবং এ ঘরেরই বিধবা মেজ-বউ ক্ষুধা ও সমাজের উৎপীড়নে কিভাবে এখানকার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের হাতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে আর্থিক মুক্তি পেয়েছে তার নিখুঁত এবং জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল।'[৬]

আর একটি দিক লক্ষণীয়। মুহম্মদ আবদুল হাই তার উল্লেখ করতে ভুলেন নি। 'বাক্য বিন্যাসে কৃষ্ণনগরের বাকভঙ্গী, চটুলতা এবং ইডিয়ম অনায়াসে ব্যবহার করে ভাষার প্রাণশক্তি ও ধারণ-ক্ষমতা যেমন বাড়িয়েছেন, তেমনি কাব্যিক বর্ণনায় ভাষাও হয়েছে অনুরূপভাবে লালায়িত। বর্ণনা ভঙ্গির সাবলীল স্নিগ্ধ মাধুর্যে প্রত্যেকটি উপন্যাসই হয়েছে এক একটি গদ্যকাব্য। তাঁর গদ্য-রীতি থেকে উপন্যাস বর্ণিত কাহিনী অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সহজ নয়। কাহিনী যেমন শিথিল বিন্যস্ত, ভাষাতেও তেমনি পড়েছে তাঁর দুরন্ত কবিমন ও দুর্বার যৌবনের গতিমুখর ছাপ'।

ফলে 'মৃত্যুক্ষুধা' নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলেও, বাঙলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য একটি উপন্যাস হতে পারল না। এর মূলে রয়েছে নজরুলের ব্যক্তি-সত্তার অভিব্যক্তি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তথ্য নির্দেশ

১. সেন, সুকুমার–বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।

২. হক, এনামুল–মুসলিম বাংলা সাহিত্য।

৩. সেন, রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, প্র. স. ১৯৭৫ পৃ.১০।

৪. মোমেন, নুরুল–ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম। নজরুল পরিচিতি, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৬২, পৃ. ৯০

৫. শরীফ, আহমদ–একালের নজরুল, প্র. স. ১৯৯০ পৃ. ২৭

৬. হাই, মুহম্মদ আবদুল, নজরুল পরিচিতি, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ.৯৫।

৭. ঐ, প্রঃ ৯৮

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্দশ সংকলন]

নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহ : প্রস্তাবনা

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাংলা ভাষার কবি নজরুল ইসলাম এই ভাষারই এক মুখ্য পুনর্নির্মাতা। তাঁর সাহিত্যিক অভিব্যক্তির রূপাশ্রয় এই ভাষারই গদ্যে ও পদ্যে। তবে অলঙ্কারাশ্রয়ী কবিতাই তাঁর প্রধান অভিব্যক্তি। আর সে কবিতাও বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন দ্বন্দ্বের, বিভিন্ন ছন্দের। গদ্যেও প্রকাশিত হয়েছেন তিনি। সে গদ্য আবশ্যকীয়ভাবেই 'কবির গদ্য'। 'তাঁর গদ্য কবির গদ্য, তিনি– গদ্যের কবি'। (আসগর ১৯৯০ : ৭৮) গদ্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর অনায়াস পদপাত লক্ষণীয়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কথিকা, পত্রসাহিত্য ইত্যাকার বিভিন্ন আঙ্গিকের গদ্য লিখেছেন তিনি। কোনো কোনো গবেষকের মতে কবি–নজরুল ও গদ্যশিল্পী নজরুলের সৃষ্টিসম্ভার সংখ্যায়তনিক বিচারে প্রায় সমান। নজরুলের গদ্যবিষয়ক একটি গবেষণা গ্রন্থে (পুর্বোক্তঃ ২১–২৩) ৪২টি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি ৪১টি গদ্যপুস্তক/পুস্তিকার তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তবে সৃষ্টি-প্রাচুর্যে ও গুণগত মানে নজরুলের গদ্য পদ্য কোনোক্রমেই তুল্যমূল্য নয়। নজরুলের কাব্যভাষার উপরিতলের প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে 'মুসলমানী বাঙ্গালা'র একান্ত নজরুলীয় ব্যবহার, যা তাঁর গদ্যে প্রায়–অনুপস্থিত। 'অথচ মুসলমানী বাঙ্গালায় তাঁর কোনো গদ্যরচনা নেই।' (কাদির ১৯৮৬ : ৭৫)। নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহের এক প্রধান হাতিয়ারও হচ্ছে এই 'মুসলমানী বাঙ্গালা'। এ-ছাড়া কবিতায় নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহের আরেক মুখ্য হাতিয়ার লৌকিক শব্দ, বাকবন্ধ, ভঙ্গি ইত্যাদির ব্যবহার। কিন্তু গদ্যে তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী প্রদর্শিত পথেরই এক বিমুগ্ধ পথিক। 'নজরুল যদি তাঁর জবরদস্তি হাতে 'আলালী' গদ্যের বিকাশ–সাধনে উদ্যোগী হতেন, তবে হয়তো বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও 'মুসলমানী বাঙ্গালা'র প্রবেশ সুঠাম হতো। যে কারণেই হোক, নজরুল সে–প্রয়াস করেননি।' (কাদির ১৯৮৬ঃ ৭৬) তবে নজরুলের গদ্য বৈশিষ্ট্যহীন বা স্বকীয়তা-বিবর্জিত বলা যাবে না কোনোমতেই। তাঁর গদ্যভাষা যেমন 'কবিত্বময় তেমনি ব্যঞ্জনাময়। অনুপ্রাস ও উপমা এ গদ্যকে দিয়েছে লিরিক কবিতার লালিত্য ও সুর ঝংকার।' (কাদির ১৯৮৬ : ৭৬) অর্থাৎ কবি–নজরুলের গদ্য-রচনা তাঁর কবিতারই এক সম্প্রসারিত এলাকা, এক সম্পূরক প্রবাহ। এর ভাষা কবিতারই ভাষা। ফলত তাঁর ভাষা-সম্পর্কিত আলোচনা বলতে আসলে তাঁর কাব্যভাষার আলোচনাকে বোঝায়। বর্তমান নিবন্ধও মূলত তাঁর কাব্যভাষা-কেন্দ্রিক।

২

কবিতার ইতিহাস টেকনিকের বিবর্তনের ইতিহাস—এ কথা পূর্ণ সত্য নয়, তবে প্রায়-সত্য। টেকনিক বা আঙ্গিকের পাশাপাশি বিষয়ও কবিতার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। বিষয়কে যদি বলি কবিতার শরীর, টেকনিক তার সজ্জা। একে অন্যের আবরণ ও আভরণ। ফলত বিষয়হীন টেকনিকসর্বস্ব কবিতা যেমন গৌণ কবিতা, তেমনি বিষয়জটিল টেকনিকহীন কবিতাও প্রায়শ গৌণ কবিতার গোত্রভুক্ত। তবে কি কবিতা বলতে বিষয় ও টেকনিকের সমানুপাতিক মেলবন্ধনই বোঝায়?—হ্যাঁ, যৌক্তিক উত্তর তো তা-ই হবার কথা। কিন্তু কবিতা তো অঙ্কশাস্ত্র নয়। কবিতার যোগফল দুয়ে দুয়ে চার না—হবারই কথা। এখানে কিঞ্চিৎ ঊনতা বা কিঞ্চিৎ অতি—পূর্ণতা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে একথা মানতে বাধা কোথায় যে, টেকনিক যেখানে বিষয়ানুগ ও বিষয়গামী, সেখানেই কবিতার সাফল্য পূর্ণতায় উন্মোচিত। সফল কবিতার একটি বিশেষ প্রবণতা এই যে, এখানে বিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টেকনিকেরও পরিবর্তন ঘটে। এমনকি একই কবিতায় একাধিক মুড বা ভাবাবহ থাকার কারণে টেকনিকের ক্ষেত্রেও একাধিক মোড়-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কবিতার টেকনিক যে পরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল, এ-কথা আজ স্বীকৃত সত্য।

কিন্তু বিষয়? বিষয়ের কি পরিবর্তন ঘটে কবিতায়? সহজ উত্তর, হ্যাঁ, ঘটে, ঘটেই তো। চলমানতার সাক্ষী আমাদের এই নিত্যনৈতিমিত্তিক পৃথিবী, এ পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে অহর্নিশ, সেইসঙ্গে বিবর্তিত হচ্ছে মানব—সমাজ ও তার কর্মপ্রবাহ। এই চলমানতার সাক্ষী যে কবিতা, তার বিষয়ও চলিষ্ণু। খণ্ড ঘটনা ও খণ্ড কালাশ্রিত কবিতার বিষয়ও খণ্ডিত, সেহেতু তা পরিবর্তনাশ্রয়ী ও অপৌনপৌণিক। কিন্তু মনু বা আদম থেকে একালের আধুনিকতম মানুষটি পর্যন্ত মানুষের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, তার অন্তর্প্রবাহ মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুচ্ছ-শাসিত। এই অনুভূতিগুচ্ছ বহিরঙ্গে চলিষ্ণু, কিন্তু অন্তরঙ্গে অচঞ্চল। কাম-ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ-ক্লেশ-মমতা—প্রেম-অপ্রেম-মানবিক এই অনুভূতিমালা সর্বকালেই গ্রাহ্য ও অভিন্ন, যদিও তার প্রকাশভঙ্গি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দেশে-দেশে কালে-কালে বিভিন্ন। কবিতার মৌলিক ভিত্তি মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুচ্ছ, কেননা কবিতা মূলত অনুভূতিগ্রাহ্য শিল্প। অ-কবিতার সঙ্গে কবিতার দূরত্ব কেবল ছন্দ-মিল-ধ্বনিসাম্য-চিত্রকল্প ইত্যাদির কুশলী ব্যবহারেই নয়, বিষয়ের ভেতরস্বভাবেও। যা কিছু নিরেট গদ্যে উচ্চারণযোগ্য, কবিতায় তার উচ্চারণ অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য মাত্র। পক্ষান্তরে গদ্যের আটপৌরে ভাষা যাকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না, তাই কবিতার প্রকৃষ্ট উপাদ্য। ফলত প্রকৃত কবিতার আবেদন ও আশ্রয় মানুষের অনুভূতিময় রহস্যালোক।

মৌলিক অনুভূতির মতো কাব্যবিষয়ের এই মৌলতাশ্রয়ী অনুভূতিগ্রাহ্যতাও সর্বকালে সর্বদেশে সাধারণভাবে অপরিবর্তিত। তাইতো দেখি সাড়ে সাতশো বছর আগে তুরস্কের এক প্রায় অক্ষরজ্ঞান-বিবর্জিত কবি ইউনুস এমরে-র কবিতার ভাবলোকের সঙ্গে বাংলার বাউলগোত্রীয় কবিদের অনুভূতিলোকের অভিন্নতা এক হার্দ্য বাস্তবতা।

বাংলা কবিতার ইতিহাসও কি ভিন্ন কথা বলে? না, বলে না। আদিপর্বে চর্যাপদের কবিরা যেমন হাঁড়িতে ভাত না থাকার কথা বলেন, একালের বাস্তববাদী কবির যুগবাণীতেও ভিন্ন শব্দবন্ধে সেই অন্নকষ্টের কথাই পুনরুচ্চারিত হয়। তবে ইউনুস এমরের সংগে লালনের বা ঢেন্ডণপাদের সঙ্গে সুকান্ত-র কবিতার অন্তর্সত্য একরৈখিক হলেও তাঁদের কবিতার বহির্সত্য, অর্থাৎ টেকনিক বা প্রকাশ-প্রকরণ সমরৈখিক নয়। প্রকাশ-প্রকরণ বা টেকনিকের এই পরিবর্তন কেবল ভিন্ন ভাষাশ্রিত বা ভিন্ন কালাশ্রিত কবির কবিতায় নয়, একই ভাষার একই কালের ভিন্ন ভিন্ন মুখ্য ও মৌলিকতাপ্রবণ কবিদের কবিতায়ও দৃষ্টিগ্রাহ্য। সমকালবাসী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-জীবনানন্দের কাব্যপার্থক্যও মূলত তাঁদের টেকনিকে। চর্যাপদের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কিংবা চণ্ডীদাসের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের পার্থক্যও মূলত তাঁদের কাব্যশরীরে। অধিকন্তু, একই বিষয়ে দুজন শক্তিমান কবির রচিত কবিতার পার্থক্যও মূলত এই প্রকাশকৌশলের পার্থক্য। কবিতার স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি কবির স্বাতন্ত্র্যও এই প্রকাশ-প্রকরণ বা টেকনিকের ভিন্নরূপতার নিরিখেই সনাক্তযোগ্য। স্বতন্ত্র কবি মানেই স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি, স্বতন্ত্র টেকনিক।

আর অদ্যাবধি কবির প্রকাশ-প্রকরণের একমাত্র অবলম্বন তাঁর ভাষা। স্বতন্ত্র কবির ভাষা তো স্বতন্ত্র বটেই, যে কবি যতবেশি মৌলিকতাপ্রবণ ও স্বতঃস্ফূর্ত, তাঁর ভাষাও ততবেশি মৌলিকতার নিকটবর্তী। অন্যদিকে ভাষার ক্ষেত্রে সযত্ন পরিচর্যা এবং পৌনপুনিক অনুশীলনও কবিকে এই স্বতন্ত্র ভাষার অধিকার দেয়। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা তাই প্রবহমান ভাষার সঙ্গে সমান্তরাল থেকেও আলাদা। কবির আত্মোন্মোচিত অথবা আবিষ্কৃত রূপৈশ্বর্যে সমন্বিত হয়ে চলমান আটপৌরে ভাষাটি হয়ে ওঠে একান্তভাবে ঐ কবির। ফলে চলমান ভাষাও নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত হয়। এই যুক্তিই এমন এলিয়টীয় মন্তব্যের জন্ম দেয় যে, কবি তাঁর গোত্রের ভাষাকে পরিশুদ্ধ করেন।

৩

কাজী নজরুল ইসলাম কি তেমন একজন কবি যিনি তাঁর গোত্রের ভাষাকে পরিশুদ্ধ করেছেন?—এর উত্তর অবশ্যই ধনাত্মক। বাংলা কাব্যভুবনের তিনি এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তবে কবিরও আগে তিনি এক স্বতন্ত্র মানুষ। তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য যতখানি সযত্নচর্চিত ও স্বোপার্জিত, তার চেয়ে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা—বাহিত। লেটোর দলের বালক গায়ক বাংলার সীমানা পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ও আরবসাগর পার হলেন, সৈনিকের পোশাক গায়ে চড়ালেন এবং পুনরায় ফিরে এলেন স্বগৃহে, এই বাংলায়।

তারপর নিজেকে স্বঘোষিত 'বিদ্রোহী'র আসনে বসালেন। তাঁর এই ভ্রমণে-বিবর্তনে দৈবের সহগামিতা ছিল কিনা কে জানে, যদিও কবি নিজে তেমনটিই অনুমান করেছিলেন। তবে এ কথা মানতে অসুবিধা নেই যে, তাঁর এই যাত্রা কোনো পরিবেশ বিচ্ছিন্ন অন্তর্যাত্রা নয়। বহু মানুষের একজন হয়ে, সকলের মাঝখানে নিজের অনন্যতাকে অঙ্গীকৃত রেখেই সম্পন্ন হয়েছিলো তাঁর এই ব্যক্তিক বিবর্তন। 'আমার আমি যে কত অতল অসীম'—কবি নিজেই কি তা জানতেন? না, জানতেন না। বিভিন্ন বিপর্যয়মুখী বিপরীত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে কখানো সমান্তরালবর্তী হয়ে, কখনো তার ভিতর ডুব-সাঁতার কেটে নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন তিনি। তিনি মানে কাজী নজরুল ইসলাম, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের উন্মাতাল বঙ্গবিশ্বের এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিবিশ্ব, যার ভিতর উন্মুক্ত ছিলো এক আলাদা দুনিয়া। নিজের ভেতরকার এই আলাদা দুনিয়ার স্রষ্টা তিনি নিজেই; স্রষ্টা, কিন্তু কারিগর নন। ছিল সৃষ্টি সুখের উল্লাস, ছিল না হাতুড়ি-বাটালির শ্রমক্লান্তি আর একঘেঁয়েমি। ব্যক্তিদ্রোহ আর সমাজদ্রোহের সম্মিলনে সে ব্যক্তিবিশ্ব স্বতশ্চল, তার গতি সতত আন্দোলিত। তাঁর বাণী আগুনের তৈরি, তার সুর হাবিয়ার হলকা। আর এই বীণার যিনি বাদক, তিনি সব আচার-অনাচার-সনাতন-পুরাতনের বৈরী। তিনি জাহান্নামের আগুনে বসে পুষ্পের হাসি হাসলেন। তাঁর এই বিষম হাসি এই অভিনব বাঁশি এই ভয়ঙ্কর সুর যে শব্দে যে চিত্রে যে রাগিণীতে উপস্থাপিত, তা সমকালের অচেনা। এই অভাবিতপূর্ব আগন্তুক অভিব্যক্তিই সৃষ্টিপিয়াসী নজরুলের ভাষাকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। যাঁরা সে ভাষা পাঠ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করেছেন তার দাহিকাশক্তি। মাঘনিশীথের শীতার্ত রাতে বাঙালি যেন উষ্ণতার স্পর্শ পেয়েছে তার আগুনে। ফলে তাঁর উচ্চারণ মাত্রেই জনতার কণ্ঠে লাভ করে পুনর্জন্ম। তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে গানের ভাষা আর শ্লোগানের ভাষা। এমনি করে তিনি তাঁর গোত্রের ভাষাকে পরিশুদ্ধ করার কাজে গ্রহণ করেন এক স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা। আর সামাজিক বিদ্রোহের পাশাপাশি সূচিত করলেন এক নীরব ভাষা-বিদ্রোহ।

স্বতন্ত্র ভাষার অধিকার নিয়ে জন্মেছেন অনেক কবিই, এবং এই বাংলা ভাষাতেও। যেমন মাইকেল, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বুদ্ধদেব বসু। তাঁদের সঙ্গে নজরুলের ভাষার পার্থক্যও এখানে যে, তাঁদের ভাষা সম্পূর্ণতই সাহিত্যের ভাষা, যা মুখের ভাষার কাছাকাছি ছিল না, কিংবা আসতে পারেনি কালের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গেও। সযত্ন-চর্চিত এই ভাষার কারিগরেরা, তাই, স্বসৃষ্ট সাহিত্যদ্বীপেও কতকাংশে যেন স্বেচ্ছানির্বাসিত। তাঁদের ভাষা আলাদা, সে ভাষার পাঠক ও সমঝদারও আলাদা, বাংলা ভাষার স্বাভাবিক সম্পদ ও দার্ঢ্যগুণের আওতায় তাঁরা নির্মাণ করেছেন নিজস্ব দ্যুতিময় শব্দগুচ্ছ। কিন্তু নজরুলের ভাষার চারিত্র্যই যেন অন্যরূপ, তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতোই উন্মাতাল, বৈপরীত্য কন্টকিত, দামামার ধ্বনিতে উচ্চকিত, যা তাঁকে এবং তাঁর সময়বাসী সকলকে জাগ্রত করে, উদ্দীপ্ত করে। এর কারণ নজরুলের ভাষা ব্যক্তির ভাষা হয়েও, সাহিত্যের ভাষা হয়েও, জীবন নামক এক ব্যাপকতার ভাষা।

নজরুলের বহুখ্যাত অভিধা 'বিদ্রোহী'। তাঁর বিদ্রোহ চিহ্নিত হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহরূপে। তাঁর কণ্ঠকে বলা হয়েছে উচ্চকণ্ঠ। বুদ্ধদেব বসু নজরুলের সাহিত্যকৃতিতে সাহিত্যিক বিদ্রোহের হদিস পাননি। ভাবতে অবাক লাগে, বুদ্ধদেব বসুর মতো সতর্ক সাহিত্য সমালোচক নজরুল সম্পর্কে এমন একদেশদর্শী মন্তব্য করেছেন।

তিরিশী সাহিত্যরুচির এক প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভাষার সচেতন সংকোচন। যাকে সাহিত্যিক পরিভাষায় পরিমিতি বা সংহতি বলেও সনাক্ত করা যায়। ধ্রুপদী সাহিত্যের এক বিশিষ্ট লক্ষণ এই কৃচ্ছ্রতা বা কার্পণ্য। কিন্তু যে-মেজাজের সাহিত্য-স্রষ্টা নজরুল ইসলাম, তাতে কৃচ্ছ্রতা আরাধ্য নয়, বরং তা বহুলাংশে পরিত্যাজ্য। একজন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিচার করতে হয় তাঁর বিরোধী প্রবণতার নিরিখে নয়, বরং তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার রূপায়নের সাফল্যের নিরিখে। নজরুলের ভিতর উপ্ত যে প্রবল প্রতাপান্বিত সাহিত্যিক বিদ্রোহ, তা তাঁর বিরোধী প্রবণতার হাত ধরে বেড়ে ওঠেনি, ওঠার কথাও ছিল না। নজরুলের সাহিত্যিক বিদ্রোহ তাঁর আত্মোন্মোচনের অকৃপণ পথে সহস্র ধারায় উচ্ছ্রিত। সে বিদ্রোহ শব্দচিত্রের সচেতন গ্রহণ-বর্জন বা সূত্রার্পিত নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ নয়, নয় তা স্ব-আরোপিতও। সে বিদ্রোহ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সহগ মাত্র। তিনি বিদ্রোহ করেছেন সমগ্র সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে, আর তাঁর বিদ্রোহের প্রকাশ ভাষাও নির্মিত এই সমাজকাঠামোর ভিতরে প্রচলিত–অপ্রচলিত সকল ধারাকে গ্রহণ করে, কাউকে বর্জন করে বা উপেক্ষা হেনে নয়। স্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্সম্পদ ও বহির্সম্পদকে গ্রহণ না করার হীনমন্যতা থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি, যেমন ছিলেন অন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ সম্পদকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উদারচিত্ত। এমন প্রসারিত চিত্তের আবির্ভাব বাংলার সাহিত্যজগতে তাঁর পূর্বে ঘটেনি। তাই তাঁর আগে বাংলা ভাষার সম্ভাবনাও এতোটা প্রসারিত হয়নি।

অন্যপক্ষে, তাঁর বিদ্রোহ বিষয়ানুগ ও স্বতশ্চল। নজরুলের খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সব কবিতাই এ সত্যের দ্যোতক। 'বিদ্রোহী' শীর্ষক সেই অতিপরিচিত কবিতার কথাই ধরা যাক। এই কবিতার নির্মাণ কি সযত্ন-চর্চিত কোনো কুশলীর হাতের কসরৎ –জাত? নাকি বারবার মার্জনা– পরিমার্জনার পথ ধরে দিনের পর দিন অক্লান্ত শ্রমে-ঘর্মে নির্মিত হয়েছে তার উদ্দাম শরীর? না, হয়তো এর কোনোভাবেই নয়। অচিন্ত্যপূর্ব এক সার্বভৌম কবিকল্পনার দখলীভূত ও ভূতবিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনোভাবে সম্ভব ছিল না এমন একটি কাব্যভাষার অধিকার অর্জন, যা তার অন্তর্প্রবাহী বিষয়ের প্রায় অবিকৃত গমনভঙ্গীর প্রতিনির্মাণ। শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে রচিত আরো অনেক উত্তীর্ণ কবিতার দৃষ্টান্ত মেলে বাংলা ভাষায়, মেলে নজরুলেরই আরো অনেক কবিতাতেও। কিন্তু 'বিদ্রোহী'র ছন্দ পরিকল্পনা ও চিন্তার সমগ্রতা বাংলা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। 'বিদ্রোহী'র নির্মাণ–নকশাও অভাবিতপূর্ব। তার কোনো প্রতিপক্ষ আজো

নেই, থাকবেও না সম্ভবত। এ কবিতা নজরুলেরই 'স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী' (মোহিতলাল)। (মাহফুজউল্লাহ ১৩৮০ ঃ ২০৯) আসলে নজরুলের সব দ্রোহ-বিদ্রোহের মূল কথাই হচ্ছে 'স্বতঃউৎসার'। হতে পারে, সাহিত্যের কৌশলগত বিদ্রোহীদের কাছে এই 'স্বতঃউৎসার' তেমন কোনো গ্রাহ্য বিষয় নয়। অথচ কে না জানে, কৌশলগত আন্দোলন কখনো জন্ম দেয়নি মহৎ প্রতিভার। কৌশলগত আন্দোলন সাহিত্যে নতুন প্রবণতার সূত্রপাত করে মাত্র, যা বড় কোনো প্রতিভার হাতে পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃতি পায়। নজরুল সেই ধরনের বড় প্রতিভারই একটি, যার মধ্যে ঐতিহ্যবাহিত ও কৌশলগত আন্দোলনের অসংখ্য ইতিবাচক দিক মিলে-মিশে পূর্ণতায় অভিষিক্ত। তেমনি একটি দিক হচ্ছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক শব্দগুচ্ছের সঙ্গে ধ্বনি, অর্থ ও ঐতিহ্যাবহের সঙ্গতি রেখে নতুন শব্দগুচ্ছের অভিনব ব্যবহার। নজরুলের কবিতায় যত ভাষার যত দ্যোতনার যত অভিনব চেহারার শব্দ ব্যবহৃত, তাঁর আগের কোনো কবিতাতে এমনটি ঘটেনি। বাঙলা ভাষার প্রচলিত শব্দের পাশাপাশি এ ভাষারই অবহেলিত লোকজ শব্দরাজির ব্যবহার ঘটিয়েছেন তিনি। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা কাজ করেছে তার উৎস হিসেবে। ব্যবহার করেছেন কথ্যরীতির শব্দ ও ছন্দ। ব্রজবুলির আশ্রয়ে যেমন নির্মিত তার কাব্যশরীর তেমনি ধৃত হয়েছে গজলের উপযোগী ফারসী আবহের শব্দশাসিত বাকবন্ধ। বাংলা ভাষায় যৌগিক শব্দ-নির্মাণে তাঁর ভূমিকাও প্রায় পথিকৃতের। হাই-ফেন সহযোগে এই শব্দগঠন প্রক্রিয়া মূলত জয়েস বা ডিলান টমাসের শব্দগঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। (সৈয়দ ১৯৭৭ঃ ১৮২-১৮৫) শ্বাসঘাত-প্রধান শব্দ আর ধন্যাত্মক শব্দব্যবহারও তাঁর কবিতারই প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রেও তাঁর কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এখনো অনুপস্থিত। পুরান-নির্ভর শব্দের ব্যবহারেও তিনি অকৃপণ। হিন্দু-পুরাণ, মুসলিম পুরাণ, গ্রীকপুরাণ, বৌদ্ধ পুরাণ, –অধীত বা শ্রুত বা চর্চিত বা অভিজ্ঞতালব্ধ–তাঁর জ্ঞানলোকের সব অতীত–ভাণ্ডার থেকেই শব্দ ছেঁকে তুলেছেন তিনি। গদ্যে 'মুসলমানী বাঙ্গালা'র ব্যবহার না করলেও কবিতায় তিনি এই 'বাঙ্গালা'কে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব ভাষা নির্মাণের মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে। নজরুলের বহু আগেই আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো বাংলা কবিতায়। ভারতচন্দ্র হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও আরবি-ফারসি শব্দের বিস্তর ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু সে ব্যবহার কৌশলগত ও অভিনবত্বপ্রয়াসী। নজরুল বাংলা ভাষার বহমান প্রবণতার সঙ্গে পুঁথি সাহিত্যের 'মুসলমানী বাঙ্গালা'র অন্তর্সম্পদকে অন্বিত করলেন, সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি শ্রবণশোভন ও দ্যোতনাময় আরবি-ফারসি শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের ব্যবহার করলেন। তাঁর আরবি-ফারসি শব্দমালা কাব্যশরীরে স্থান করে নিলো বিষয়ের আত্মিক তাগিদেই। এমনটি ঘটেছে তাঁর অসংখ্য কবিতায়। এমনি এক কবিতা ঃ 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম'। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) -এর আবির্ভাব ও তিরোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে ধ্বনিসাম্য বজায় থেকে অর্থানুগভাবে যে

অজস্র আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে এই কবিতায়, তা সমগ্র বাংলাভাষার স্বভাবেই সঞ্চারিত করেছে নতুন চলমানতা। অজানা-অচেনা শব্দ পদে পদে, তবু অর্থোদ্ধারের জন্য থমকে যেতে হয় না, সচেতন পাঠককে ব্যাকুলচিত্তে সমাপ্ত করতে হয় এর পাঠ, এবং সব অর্থ উদ্ধারের আগেই কবিতাটি অধিকার করে বসে পাঠকের মন ও মনন। পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাষায়, পাঠকের বোধের উপর এ-ই হচ্ছে সফল কবিতার সর্বাত্মক আক্রমণ। নজরুলের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেকেই আরবি-ফারসি শব্দ ও ইসলামি মীথের ব্যবহার করলেও নজরুলের সঙ্গে প্রায়-সকলেরই একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নজরুলের ব্যবহার ঐ শব্দের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও কাব্যিক আবহের পরম্পরাকে স্বীকার করেই, যা অন্যদের বেলা খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

সচেতন নিরীক্ষাপ্রসূত নয় কি তাঁর এইসব ব্যবহার? সে যা-ই হোক, এ তাঁর নিজস্ব পথে নিজস্ব প্রবণতারই বিস্তার। তাঁর ভাষা তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-জাত ও মানসম্মত। বাংলা ভাষার শরীরে এতদিন এ অপূর্ণতাটুকু ছিল বড় প্রবল, বড় প্রকট; নজরুল পেশল হাতে এই অপূর্ণতা ভরিয়ে দিলেন, ভরিয়ে দিলেন বাংলা ভাষাকেই।

নজরুলের ভাষা-বিদ্রোহের মুখ্য হাতিয়ার তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুচ্ছে ব্যবহৃত যৌগিক শব্দ, শ্বাসাঘাত প্রধান ধ্বনিগুচ্ছ এবং ইসলামি অনুষঙ্গে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দমালা। এ শব্দগুচ্ছ ছন্দ ও অলঙ্কারশাসিত। অসংখ্য ছন্দের ব্যবহার করেছেন তিনি, যা তাঁর ভাষাকে অবশ্যই বৈচিত্র্যময় করেছে। মাত্রাবৃত্ত তাঁর প্রিয় ছন্দ, তবে স্বরবৃত্তেও তিনি সচ্ছন্দ। অক্ষরবৃত্তে লিখেছেন অপেক্ষাকৃত কম। হয়তো এ-কারণেই যে, অক্ষরবৃত্ত বাঙলার প্রধান প্রবাহ, বহুচর্চিত। এ-ছাড়া প্রায়–অপ্রচলিত সংস্কৃত ছন্দ, আরবি ছন্দ, ফারসি ছন্দ ইত্যাদির বিস্তর পরীক্ষা করেছেন তিনি। অর্ধ-শতাধিক ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতায়। ছন্দের পাশাপাশি অলঙ্কার–ব্যবহারে ছিল তাঁর অনায়াস দক্ষতা। কবিপ্রসিদ্ধি, রূপক, প্রতীক, অনুপ্রাস, মিল, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, নরত্বারোপ, চিত্রকল্প, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ ইত্যাদির অভিনবত্ব তাঁর কবিতার দৃশ্যমান শরীরকে করেছে ঋদ্ধ ।(সৈয়দ ১৯৭৭ : ১৮২-২৭৭) ভাষার প্রসারতা নির্মাণে নজরুল–ব্যবহৃত অলঙ্কার ও ছন্দের ভূমিকা অবশ্যই আলাদাভাবে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

৪

নজরুল সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন বাংলা ভাষার ঐতিহ্যানুগ চলমানতাকেও। আগেই বলেছি, গাথা-পুঁথি-নির্ভর লৌকিক ও লোকজ আবহের পাশাপাশি গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাও ব্যবহৃত তাঁর কবিতায়। মুসলিম পুরাণের পাশাপাশি যেমন হিন্দু পুরাণ, বৌদ্ধপুরাণ, গ্রীকপুরাণ, তেমনি ইসলামি শব্দের পাশাপাশি এসেছে, তৎসম, তদ্ভব, প্রাকৃত, ব্রজবুলি, ইংরেজি–ফরাসি শব্দপুঞ্জ। এতো বিচিত্র উৎস ও

ঐতিহ্যজাত শব্দের সমন্বয়ে তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে বাংলার সব গোত্রের সব সম্প্রদায়ের বাণীভঙ্গিরই এক সমন্বিত রূপ। নজরুল যৌক্তিকভাবে এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন যে, আজকের বাঙালি সমাজ এক যৌগিক সমাজ, তার জাতিসত্তাও এক যৌগিক জাতিসত্তা। বহু পথ বহু মত বহু সম্প্রদায়ের মিলনমোহনায় সৃষ্ট বাঙালির অভিব্যক্তি এক মিশ্র অভিব্যক্তি। আবদুল ওদুদ কথিত নব-সংস্কৃতির রূপায়নের দায়িত্বও বুঝি নিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। সে নব-সংস্কৃতি বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মিলিত সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি রূপায়িত হয়েছে নজরুলের জীবনে ও কবিতায়। ওদুদের নব-সংস্কৃতির ধারণা ব্যাপকতর অর্থে ধর্মান্ধতা-বিবর্জিত বাংলার সকল সম্প্রদায়েরই মিলিত সাংস্কৃতিক চেতনা। এই চেতনা আধুনিক বাঙালিরই চেতনা। আদি-পর্বের বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মিলিত প্রবাহ। অথচ পরিণত পর্বের বাঙালি সংস্কৃতির তৃতীয় প্রধান শক্তি মুসলমানের সংস্কৃতি। এই তিন সংস্কৃতির ত্রিমোহনায় দাঁড়িয়ে আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি। নজরুল আধুনিক বাঙালির প্রথম পরিশ্রুত প্রতিকৃতিরূপে সেই সংস্কৃতিরই প্রবক্তা। (হুদা ১৩৯৫ ঃ ৪০) তাঁর ভাষাও সেই সংস্কৃতিরই যৌক্তিক ও বিবেকী অভিব্যক্তি।

নজরুল-পূর্ব বাংলা ভাষার চরিত্র বহুলাংশে খন্ডিত ও একদেশদর্শী। নজরুলের ভাষা সেই একদেশদর্শীতার বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ উনতার বিরুদ্ধে পূর্ণতার। তাঁর ভাষা প্রকাশিত হলো সেই উদার শক্তিমত্তারূপে, যা হামদ, নাত ও কীর্তনকে পাশাপাশি বরণ করার শক্তি রাখে। আসলে আধুনিক বাঙালির যে মূর্ত প্রতিকৃতি নজরুল, তাঁর ভাষা ব্যক্তির হয়েও এক বৃহৎ সমষ্টির। এ-ভাষা সমকালের ও সর্বকালের বাঙালির সমগ্রত্বের ভাষা।

তথ্যনির্দেশ

১৯৬৯	রফিকুল ইসলাম	নজরুল-নির্দেশিকা
১৯৭৭	আবদুল মান্নান সৈয়দ	নজরুল ইসলাম ঃ কবি ও কবিতা
১৯৭৮	করুণাময় গোস্বামী	নজরুলগীতি প্রসঙ্গ
১৯৮৩	শাহাবুদ্দীন আহমদ	নজরুল সাহিত্যদর্শন
১৯৮৬	আবদুল কাদির	যুগকবি নজরুল
১৯৮৭	আবদুল মান্নান সৈয়দ	নজরুল ইসলাম, কালজ কালোত্তর
১৯৯০	রফিকুল ইসলাম	kazi Nazrul Islam, A New Anthology
১৯৯০	সৈকত আসগর	নজরুলের গদ্য রচনা ঃ ভাবলোক ও শিল্পরূপ
১৩৮০	মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্	নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ
১৩৯৫	মুহম্মদ নূরুল হুদা	রবীন্দ্রপ্রকৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ষোড়শ সংকলন]

নজরুলের কবিতায় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

১

নজরুলের কবিতায় যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতটি বচিত হয়েছে তার পেছনে কবির সচেতন কোন প্রচেষ্টা কার্যকর ছিল না। অনেকটা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, তাঁর কবিতার অন্যান্য অনায়াসলব্ধ প্রকাশের মতই, নজরুলের আন্তর্জাতিকতাবোধ ক্রমান্বয়ে ঘনবদ্ধ হয়েছে, রূপ নিয়েছে একটি সার্বজনীন ভাবনার। তিরিশের বাংলা কবিতার যে আন্তর্জাতিক, বিশেষতঃ পশ্চিম, আবহ্ দেখা যায়, তা কবিদের সচেতন পঠন-পাঠন ও সাধনার অর্জিত রূপ। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয় দিক দিয়ে তাঁরা পশ্চিম থেকে ধার করেছেন, তাঁদের অনেক প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্প উঠে এসেছে পশ্চিমের পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও মীথ্ থেকে। আধুনিক কবিতা যেখানে বোধ ও বুদ্ধির মিলিত ফসল, সেখানে প্রজ্ঞার অনুশীলন আধুনিক কবিদের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিকতার রাস্তায় নিয়ে যাবে এ কোন বিচিত্র ব্যাপার নয় এবং এর ফলে বাংলা কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে, গতিশীল হয়েছে, চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। তবে এর উল্টোদিকে, অকারণ ও অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে, কোন কোন ক্ষেত্রে মেকীত্বেরও সঞ্চার হয়েছে এবং কবিতার দেশজ আবহটি বিনষ্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে স্থাপন করতে গিয়ে কোন কবি তাঁর নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হলে তিনি গ্রহণযোগ্যতা হারান। এই বৃহত্তর গ্রহণ ও সার্বজনীন হওয়ার প্রক্রিয়াটি জটিল বটে। তিরিশের কবিদের মত মেধা ও মনীষা না থাকলে, চিন্তার সাবলীলতা ও একই সঙ্গে বিস্তৃত পরিধি না থাকলে, এই প্রক্রিয়ায় কোন কবির আবেদন কখনো দীর্ঘমেয়াদী হবে না।

নজরুলের আন্তর্জাতিকতা যতটা তাঁর শৈলীতে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত। পশ্চিম থেকে আঙ্গিক ও শৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর ধার ছিল নগণ্য— ওমর খৈয়াম বা হাফিজের প্রকাশভঙ্গী অথবা হুইটম্যানের বলিষ্ঠ, প্রত্যয়মণ্ডিত চড়াগলাটি তিনি বিভিন্ন কবিতায় ধরে রেখেছেন, কিন্তু এ সবকিছুর পেছনে তাঁর নিজস্ব ও দেশীয় ঐতিহ্যবোধ ছিল প্রবল। এমন কি সনেটের[১] আঙ্গিকও তাঁর হাতে একটি নিজস্বতা অর্জন করেছে। কিন্তু ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুগতভাবে নজরুলের মানসে একটি আন্তর্জাতিকতাবোধ ছিল স্পষ্ট। তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের নানান আন্দোলন থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন, সাম্যবাদী বিপ্লবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা

করেছেন, পরাধীন ভারতের গ্লানি বিশ্বের স্বাধীনতাহীন অন্যান্য জনগোষ্ঠির গ্লানির সাথে এক করে দেখেছেন, বিশ্বের সর্বত্র যুদ্ধকে ঘৃণা করতে শিখেছেন। বিশেষ করে তাঁর কবিতায় যে গণমানুষের উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ আছে, তারা ভারত তথা সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগে শোষিত, নিপেষিত শ্রমজীবী মানুষের কথা এত দরদ দিয়ে আর কেউ বলেনি। নজরুলের আগে এতখানি সর্বভারতীয় ও সর্বদেশীয় কবি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ আসেননি। আন্তর্জাতিকতা নজরুল কাব্যের একটি অন্যতম পরিচয়।

২

নজরুলের বিদ্রোহের সামাজিক রাজনৈতিক— অর্থাৎ বিষয়বস্তুগত রূপটিই তাঁর কবিতায় প্রবল। প্রচলিত প্রকাশভঙ্গী বা প্রকাশরূপের বিরুদ্ধে কোন দ্রোহ করে তিরিশের কবিদের মত তিনি একটি নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করেননি। নজরুলের স্বকীয়তা তাঁর উপলব্ধির বৈচিত্র্য ও প্রকাশের ভিন্ন প্রয়োজনে আপনা থেকেই নির্ধারিত হয়েছে। তিনি প্রচলিত প্রকাশভঙ্গীকে ব্যবহার করেছেন, প্রয়োজনবোধে ভাঙ্গচুর করেছেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য পূর্বসুরী এবং সমকালীন কবিদের বিপরীতে কোন নিজস্ব বাকরীতি উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু নজরুলের কবিতার তথাপি একটি প্রবল নিজস্বতা আছে এবং রবীন্দ্রনাথের আদিগন্ত জ্বলজ্বলে উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই তা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নিজস্বতা, কষ্টার্জিত ছিলনা তার জন্য, যদিও এর পেছনে বহু ঐতিহ্য, বিচিত্র নানা অভিজ্ঞতা, অবলোকন-আনুধাবন কার্যকর ছিল। রোমান্টিক কবিদের মত তাঁর কল্পনা সকল বাধা ও বন্ধনকে অতিক্রম করে তাঁর প্রকাশকে করেছে তীব্র, এবং প্রচণ্ড আবেগ ও উচ্ছাসমথিত হয়ে যে ভাষা শেষ পর্যন্ত সংহত রূপ নিয়েছে, তা ঐ কল্পনারই নির্ভরযোগ্য বাহন। ভাব ও প্রকাশের এত তাৎক্ষণিক যোগাযোগ খুব কমই দেখা যায় বাংলা কবিতায়। নজরুল তার ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় দেয়াল তুলে দেয়নি বলে অনেক সমালোচক তাঁকে দোষারোপ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, 'অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষ। যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে, ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেন নি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।' কিন্তু এধরনের সমালোচনার সমস্যা হল এই যে, যে কবির যে চরিত্র তাকে ঐভাবে না দেখে ভিন্ন একটি মান আরোপের চেষ্টা হয় তাঁর কাব্য বিচারে, এবং কবির সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে একটি সহজ ও আরোপিত মাপকাঠিতে ফেলে অত্যন্ত সরলভাবে বিশ্লেষণ করার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় ঐ ক্ষেত্রে! নজরুলের কাছে সুধীন্দ্রনাথের মত চিন্তাশীল কাব্য রচনার আশা করা একজন রোমান্টিক কবির কাছ থেকে পোপ বা ব্রাউনিং-এর মেজাজের কবিতা আশা করার সামিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে নজরুলের কবিতা কোন বোধহীন স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে উৎসারিত ছিলনা।

তাঁর কবিতায় আবেগ, উচ্ছ্বাস বা 'হৈ চৈ' ছিল বটে, কিন্তু অনেক স্থানে তার প্রয়োজন ছিল। তিনি দেশ ও জাতিকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, তাদের চেতনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচাতে। দেশ ও কালের মানুষের প্রতি এই প্রত্যাশার জন্যই তার কবিতার সুরটি এত চড়া। তা'ছাড়া রোমান্টিক কবিদের মত, কোন কোন সময় তাদের থেকে অনেক বেশী মাত্রায় তিনি আত্মমগ্ন ও 'আমি' কেন্দ্রিক ছিলেন; যার ফলে কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিটি কোন দ্বিতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু নজরুলের এই বাঁধনহারা রূপটি কখনো নিজ দেশ ও কালকে বিস্মৃত হয়নি, বরং তাদের উপর নির্ভর করেই তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রকাশের প্রথম স্তরে ব্যক্তি বা আমি দ্বিতীয় স্তরে দেশ ও সমাজ তৃতীয় স্তরে বিশ্ব বা সর্বদেশ।

বস্তুত ঃ নিজের সম্বন্ধে ও নিজের দেশের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকলে, নিজের কৃষ্টি- ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সুদূর গভীরে শিকড় প্রোথিত থাকলেই শুধু সেই কবির জন্য আন্তর্জাতিকতার মাত্রটি অর্জন সম্ভব। নজরুলের আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিত বিচারে তাঁর 'আমিত্বকে' খুঁটিয়ে দেখতে হবে, দেখতে হবে তাঁর স্বদেশানুভূতি, দেশপ্রেমকে। প্রবল আমিত্ব নিয়েও নজরুল আসলে তাঁর সমাজেরই প্রতিভূ, তাঁর দেশ তথা সারা বিশ্বের একজন সাধারণ নাগরিক হুইটম্যানের মত এই 'আমি'টি অসাধারণ, শুধু উপলব্ধি ও অনুভবের জন্য, তার সামাজিক অবস্থানের জন্য নয়, এবং তাকে বিশ্বের যে কোন স্থানে স্থাপন করলেও চরিত্রের কোন পরিবর্তন হবে না, তার পরিচয় বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হবে না।

নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে বিশাল আমিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাতে বিদ্রোহী ও প্রেমিক, প্রতিবাদী ও যোদ্ধা, কোমল ও ভয়ংকরের সংমিশ্রণটি অভূতপূর্ব; এবং বিদ্রোহী চরিত্রের পরস্পর-বিরোধী প্রকাশগুলি অনুভূতির এক তীব্র মধ্যকেন্দ্রে সমন্বিত। কবিতাটিতে হুইটম্যানের প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এমন কি তাতে স্বদেশীয় মোহিতলালের 'আমি'র ছায়াপাত নিয়েও কথা উঠেছে; কিন্তু কবিতাটির যে বৈশিষ্ট্যের কথা অনুল্লেখিত রয়ে গেছে, তা হল এর তিনস্তর বিশিষ্ট বিন্যাস। যে আমি বা মহাবিদ্রোহী কবিতার কেন্দ্রীয়-শক্তিকে গতিময় করেছে, সে একজন একক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর মাধ্যমে প্রথমতঃ তাঁর দেশকাল ও সমাজ এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বের বা মহাজগতের ধ্যানধারণা ও পরিচয়সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিধারায় নজরুলের 'আমি' একই সাথে প্রবহমান। কবিতাটি খুঁটিয়ে দেখলে এই ত্রিধারা বিন্যাসের আরো একটি কাঠামোগত রূপ পাওয়া যাবে, তা হল স্ব, স্ববিরোধ ও স্বপ্রতিসংহরণের অবদান। নজরুল প্রথম তাঁর বিদ্রোহীকে স্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন, তার বক্তব্যের জোরালো সত্য একটি দ্রোহের চিত্র অঙ্কন করেছে। কিন্তু এর পরই স্ববিরোধ, যার দেখা পাওয়া যায় চরিত্রটির আপাতঃ বৈপরীত্যে। কিন্তু এ

দুয়ের সমন্বয়ে নজরুল একটি স্বপ্রতিসংহরণের আভাষও দিয়েছেন, যা বিদ্রোহী চরিত্রের শেষতম প্রকাশ। নিজস্ব বা ব্যক্তিক স্বাধীনতা সমাজের পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হতে বাধ্য; কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে চরিত্রটি বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন বিবেচিত হওয়ার পর এই স্বাধীনতা পরাধীনতাটির প্রশ্নই হয়ে দাঁড়ায় আপেক্ষিক। হুইটম্যানের The Song of Myself কবিতায় এতখানি সুচিন্তিত বিন্যাস চোখে পড়ে না। কবি সেখানে বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতরে এত দ্রুত যাত্রা করতে থাকেন যে সমস্ত চিত্রটি সততঃ অস্পষ্টতায় মোড়া থাকে; ঘাসের পাতা থেকে সৌরজগতের মহাকালিক প্রেক্ষিতে এত ক্ষিপ্রতার সাথে কবি আনাগোনা করেন যে নজরুলের তিনটি স্তর অতিক্রম করে নিমেষেই এই 'আমি' এক অতিকায় পুরুষ হয়ে ওঠে, যার ঈশ্বরতুল্য বিশালতা ও সর্বশক্তিময়তা তাকে সাধারণ পাঠক থেকে দূরে নিয়ে যায়। নজরুলের বিদ্রোহীর মত হুইটম্যানের আমি এতটা কাল বা দেশ-মুক্ত হতে পারে না, এবং তার আন্তর্জাতিক চরিত্রটিও অতি-মার্কিন পরিচয়ের জন্য সুস্পষ্ট নয়।

নজরুলের আন্তর্জাতিকতা সুস্পষ্ট হয় তাঁর দেশ ও কালচেতনার পটভূমিতে। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনচিন্তাকে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার দুই প্রকাশ বলে দেখা হয়, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের একজন স্বাধীনতাকামী কবি হিসেবে তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমজনিত কোন গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা দেখা যায়নি কখনো। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু ইংরেজ জাতির প্রতি অকারণ বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। তাদের ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি, অত্যাচার, অবিচারকে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু কোনো দিন বলেননি শ্বেতাঙ্গ জাতি নিপাত যাক। দেশাত্মবোধক অনেক গান ও কবিতায় তিনি নিজের শুদ্ধ দেশপ্রেমকে মহিমান্বিত করেছেন কিন্তু একই সাথে বিশ্বের মানুষের জয়গান গেয়েছেন, তাদের দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত হয়েছেন। 'ধুমকেতুর পথ' (রুদ্রমঙ্গল) এ নজরুল বলেছেন,

> ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে ... পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

নজরুলের আন্তর্জাতিকতার প্রথম শর্ত হচ্ছে স্বদেশপ্রেম। যে দেশকে ভালবাসে তার পক্ষেই বিশ্বকে ভালবাসা সম্ভব। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক স্বাধীনতার। তৃতীয় বিশ্বে এই শতাব্দীতে যারা এই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন — ফ্রান্‌জ ফ্যানন, নেরুদা, লরকা, নাজিম হিকমত— প্রত্যেকের কবিতায়

স্বদেশপ্রেমের রাস্তা ধরেই বিশ্বের মুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছে। নজরুল বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমকালীন মুক্তি-সংগ্রাম ও সংগ্রামী কবিদের অনেকের সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। কিন্তু বড় কথা হল, নজরুলের মত প্রতিভার বিকাশের জন্য এই জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় নয়। বস্তুতঃ, মহীউদ্দিন নজরুল সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে একস্থানে লিখেছেন 'নজরুল যথেষ্ট ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন, সে রকম কিছু আমি দেখিনি। তাঁর রচনায় বিদেশী কবিদের কোনো সৃষ্টির ছায়া আছে কিনা আমার দৃষ্টিতে সেটা ধরা পড়েনি। তাঁর সকল সৃষ্টিতে নিজস্ব ভাবের ছবি স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। তিনি মানুষকে অধ্যয়ন করেছেন, চলেছেন মানুষের মধ্যে।' নজরুল নিজস্ব অবলোকনের মাধ্যমে মানুষ ও সমকালীন বিশ্বে তার স্থানকে নিরূপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, মানুষের আত্মার মঙ্গলের পাশাপাশি তার মানসিক, জাগতিক, রাজনৈতিক মুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু শুধু আপোষহীন নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি সূচিত হতে পারে। এজন্য তাঁর কবিতায় একজন প্রবল পুরুষের আবাহন করা হয়েছে, তার আবির্ভাবকে স্বাগত জানানো হয়েছে নানা ভাবে।

> বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো
> ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও।
>
> – কে আছে বীর এসো।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে এই প্রবল পুরুষের হঠাৎ আগমন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সহ পৃথিবীর যে কোন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কেন্দ্রে যে চেতনা কাজ করেছে, তাকে একটি ঘনবদ্ধ রূপ দেয়ার জন্য যুগে যুগে তেমনি একটি বিশাল ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে, বলা যায়, বিপ্লব তার নিজস্ব চালিকা-শক্তি ও নিয়ন্তাকে প্রতীকী রূপে একজন প্রবল পুরুষের মধ্যে ন্যস্ত করে। নজরুলের কবিতায় যে বিপ্লব-বিদ্রোহের জন্য অপেক্ষা তা বিদ্রোহীর মত একজন শক্তিধর অতিমানবের উত্থানের জন্য রুদ্ধশ্বাস প্রার্থনা। মোহিতলালের 'আমি'র সাথে নজরুলের 'বিদ্রোহী'র তফাৎ এই স্থানে যে মোহিতলালের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্যক্তিনির্ভর, একটি ব্যক্তিগত অনুধাবনের মূর্ত ও প্রচণ্ড রূপ তিনি তাঁর 'আমি' তে ন্যস্ত করেছেন। 'আমি'র বিরাটত্ব মুহূর্তে অতিজাগতিক মাত্রা লাভ করেছে, দেবত্বের সুউচ্চ আসনে সে আসীন হয়েছে,

> আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভোনীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্ত সীমান্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন ...

মানুষ বা microcosm এই যে macrocosm এ ব্যাপ্তি লাভ করল, এর পেছনে ভাববাদী প্রভাবটিই প্রধান। এখানে সেই প্রচণ্ড বিদ্রোহের কথা নেই, যে

নিমেষে এই 'আমি' কে সর্বযুগের সর্বমানুষের প্রতিভূ করে নিতে পারে। নজরুলের ত্রি-স্তর বিশিষ্ট বিন্যাস-পদ্ধতির জন্য microcosm-macrocosm দ্বৈত্য ছাড়াও একটি তৃতীয় প্রেক্ষিত রচিত হয়েছে বিদ্রোহীর চরিত্রে—তার আন্তর্জাতিকতা। কোন ভাববাদী বা mystical চেতনার ভারে নজরুলের প্রবল আত্মদর্শন নুয়ে পড়েনি। বরং দেখা যায়, যত শক্তি সঞ্চয় করছে এই বিদ্রোহী, যত তার ঘৃণার তীব্রতা বাড়ছে শোষক, শাসক, ভণ্ডামী কপটতার বিরুদ্ধে, তত প্রকৃত হয়ে উঠছে তার চরিত্র, তত কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে নিপীড়িত জনমানুষের। কাজী আবদুল ওদুদ নজরুলের চরিত্রে এক গোপন লীলাবাদ কার্যকর দেখতে পেয়েছিলেন, যে লীলার দৃষ্টিতে 'ভালোমন্দ, পাপপূণ্য শেষ পর্যন্ত নেই — ভালোমন্দ, পাপপূণ্য, জন্মমৃত্যু, উত্থানপতন, সবকিছুই ভগবানের লীলা।' অনেক সমালোচক এই লীলাবাদের একটি বিশেষ প্রকাশ দেখার চেষ্টা করেছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়। কিন্তু অন্ততঃ এই কবিতায় নজরুলের লীলাবাদ ক্রিয়াশীল নয়। তাঁর প্রেমের, প্রকৃতির এবং আধ্যাত্মিক কবিতায় তার দেখা পাওয়া যায়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র এবং সমকালীন বিশ্ব প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং মানবজাতির দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্লেদ ও গ্লানির পটভূমিতে 'বিদ্রোহী'র আত্মপ্রকাশ একটি সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনাও বটে। বিদ্রোহীর মধ্য দিয়ে নজরুলের জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং তাঁর সুস্থ আন্তর্জাতিকতাবোধের একটি সমন্বিত প্রকাশ ঘটেছে; কোন প্রচ্ছন্ন লীলাবাদের নয়। যে ঈশ্বর এখানে তাঁর প্রতিপক্ষ তা ভণ্ড পুরোহিত ও কপট ধর্মতন্ত্রীদের অবদান, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির সুন্দর ও মঙ্গল চিন্তার দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারায় উদ্ভূত কোন ঈশ্বরচেতনার ফসল নয়। তেমন ঈশ্বরচেতনা নজরুলের কোন কোন কবিতায় পাওয়া যায়।

'বিদ্রোহী' থেকে কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হবে যে নজরুল এই কবিতা রচনার সময় দেশ ও বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়ন-নির্যাতন, ভণ্ডামী ও কুশাসনের প্রসঙ্গটিকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন,

১. আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর

২. আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী মানব-বিজয়-কেতন

৩. আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার

নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার

যে বিশ্বকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার প্রত্যয় বিদ্রোহীর কণ্ঠে উচ্চারিত, সে বিশ্ব নিজস্ব নিয়মেই বাতিল হয়ে গেছে। নজরুল এখানে ধ্বংসের চিত্রটি বিশদভাবে এঁকেছেন, গড়ার প্রসঙ্গটি উহ্য রয়ে গেছে, কারণ পৃথিবী আবার তার নিজস্ব নিয়মেই সৃষ্টিকে বরণ করে নেবে। বিদ্রোহীর বিশ্ব পরিক্রমণ শেষে প্রেমিক রূপে আত্মপ্রকাশ

তার প্রচণ্ড মারণমূর্তির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়। ভাঙ্গা ও গড়া, প্রেম ও যুদ্ধ, ধ্বংস ও সৃষ্টি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো অমোঘ এবং পূর্ব নির্ধারিত ঘটনাচক্র। এই দ্বৈরথেই 'আমি'র সাথে বিশ্ব, নিজ দেশের সাথে আন্তর্জাতিকতার সম্পর্কটি নির্ণিত। এ কারণে নজরুলের কবিতার সর্বত্র ব্যক্তি কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় ঃ কোন বিশ্বাস, আচার বা আনুষ্ঠানিকতা স্থানিক ও কালিক হলে ব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশের তা পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের চিরন্তন দিকটি নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে, আনুষ্ঠানিক দিকগুলিকে তিনি ঘৃণা করেছেন। রাজনীতির উদারপন্থী মতবাদকে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন, যা সর্বদেশ ও সর্বমানুষের কল্যাণে লাগতে পারে তাকে স্বাগতম জানিয়েছেন, কিন্তু তাত্ত্বিকতা ও কোন্দলের দিকটি সযত্নে পরিহার করেছেন। এই সবই তাঁর সুস্থ আন্তর্জাতিকতাবোধের পরিচয়। একইভাবে, নজরুলের ব্যঙ্গ গান ও পরিহাস-বিদ্রুপের কবিতার পেছনেও যে যুগ ও কালচেতনার দেখা পাওয়া যায়, তা শুধু ঐ সময়ের বা ঐ ঘটনাপঞ্জীর পারম্পর্যে গড়ে ওঠা নয়, বরং সর্বযুগ ও সর্বকালের পরিপ্রেক্ষিতেও।

৩

নজরুল সমকালীন বিশ্বের নানা মতবাদ, ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পাঠক না হলেও এদের একটি নির্যাস তাঁর কবিতায় কোন না কোনভাবে উপস্থিত। এই উপস্থিতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেই, বা তা তেমন উল্লেখযোগ্যও নয়, তবুও অবাক হতে হয় এই ভেবে, তাঁর মত কম শিক্ষা ও সুযোগ নিয়ে একজন মানুষ শুধু মেধা ও মননের সাহায্যে সমকালকে এত সুন্দরভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছেন কী-ভাবে। নজরুলের একজন সমালোচক, ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত, সমকালীন মতবাদ ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে যেসবের উপস্থিতি নজরুলের কাব্যে দেখতে পেয়েছেন, তার একটি বিবরণ দিয়েছেন 'নজরুল কাব্যগীতিঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন' গ্রন্থে। তিনি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে লিখেছেন,

১. বিশেষ করে সাম্যের সমর্থনে ও প্রেরণায় রচিত 'সর্বহারা' গ্রন্থের দশটি কবিতা, যেমন সর্বহারা, কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান, ছাত্রদের গান ইত্যাদি কবিতায় মার্কসীয় চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। (পৃঃ ১২৯)

২. এছাড়া নজরুলের সমাজবিষয়ক চিন্তার মধ্যে শেলী, গোর্কি ও হুইটম্যানের প্রভাব অনস্বীকার্য। মানব প্রগতির প্রশ্নে যোহান বোয়ার ও বেনাভ্যাঁর এবং নীতিবোধের প্রশ্নে নজরুলের সঙ্গে রুশোঁর প্রচুর মিল আছে। (পৃঃ ১৩১)

এর সাথে আরো যোগ করা যায় পারস্যের হাফিজ ও ওমর খৈয়াম, রাশিয়ার মায়াকোভস্কি ও গোর্কি এবং বিংশ শতাব্দীর আরো অনেক ইংরাজ ও মার্কিন কবি। কিন্তু সরাসরি প্রভাব বলতে যা বোঝায়, সেই অর্থে এঁদের কেউই নজরুলের জন্য অপরিহার্য ছিলেন না, এবং তাঁর কাব্য বিচারে এদের গুরুত্ব ছিল প্রাসঙ্গিক মাত্র।

নজরুল তাঁর সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যকে 'স্বপন-বিহারী' ও 'মাটির দুলাল' এই দুই বিভাজনে ফেলেছেন এবং জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে গোর্কি, বার্নার্ডশ' ও বেনাভাঁরে প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন। কল্পনাপ্রবণ ও বাস্তববাদীদের কোন্ গোত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি বেশী, তা বুঝতে দেরী হয় না তাঁর গোর্কি-প্রশস্তি থেকে। নজরুলের মতে, 'গোর্কির পর যে সব কবি লেখক এসেছেন তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার মত কিছু আছে কিনা তা আজও বলা দুষ্কর।' নজরুলের নিজের যে কোন কবিতার দিকে চোখ ফেরালে বোঝা যাবে তিনিও আসলে ঐ মাটির দুলাল,

পাথুরে পাহাড় কেটে'
নিঙাড়ি' নীরস ধরা,
আনিরে ঝর্ণা-ধারা
এ নিখিল শীতল -করা
আজি সে গাঁইতি শাবল
কোথায় গেল, হাতে কি নাই।
[চাষার গান]

কার্ল মার্ক্স-এর দর্শনের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, শুধু তাই নয়, মার্ক্স-এর মতবাদের মধ্যে তিনি শোষিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন 'দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্ক্স যে মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে। জার গেল— জারের রাজ্য গেল— ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি শাবলের ঘায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।' নজরুল শোষণমুক্ত সমাজের যে চিত্র দেখেছেন আজীবন, মার্ক্সবাদী মতবাদের ভিত্তিতে সংঘটিত রুশ বিপ্লবের মধ্যে তার তাৎপর্যময় বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করলেন। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় বিপ্লবের যে প্রশস্তি তিনি রচনা করেন তার মধ্য দিয়ে মানুষের বিপ্লবী সত্তার একটি প্রতীকী তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করেন ঃ বিপ্লব ভয়ংকর কিন্তু সুন্দর —'কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।' তাছাড়া 'ব্যথার দান'-এ রুশ বিপ্লবের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইংগিত করেছেন। লালফৌজের প্রতি নজরুলের সমর্থন ও নৈতিক একাত্মতা ঘোষণা তো ইতিহাসের ব্যাপার।

ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত আরো লিখেছেন যে 'জার্মানীতে হিটলারের অবাধ তাণ্ডব, উগ্র জাতীয়তাবাদের উল্লাস ও উদ্দামতা, মুসোলিনীর মদমত্ততা ও গণতন্ত্রের সমাধি সারা ইয়োরোপের মাটিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ফলে নজরুল রাজনীতিগতভাবে আন্তর্জাতিকতার প্রতি ঝুঁকে ও তাঁর কাজে আন্তর্জাতিকতার সমর্থন করে পাঠক মনে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। উপরন্তু নজরুলের জীবনে রাজনীতিগত কারণ ও প্রগতিপন্থী ধ্যানধারণার দরুন আন্তর্জাতিকতা তাঁর কাব্যে গৃহীত ও সমাদৃত।' বলাবাহুল্য মন্তব্যটি একপেশে এবং অসম্পূর্ণ। ইউরোপের ঘটনার সাথে নজরুলের

আন্তর্জাতিকতার সরাসরি যে সংযোগ ছিল তা ইতিহাসের রাস্তা ধরেই — তিনি হিটলার বা মুসোলীনির উত্থানের কারণে আন্তর্জাতিক হননি, বরং তাদের স্বৈরাচার তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধের একটি নতুন ভূমি সৃষ্টি করেছে মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের পর থেকেই নজরুলের আন্তর্জাতিকতাবোধ স্পষ্টতর রূপ ধারণ করে। রুশ বিপ্লব, ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় নজরুলের রাজনীতিতে প্রবেশ, ইংরেজের দমন নীতি ইত্যাদি দীর্ঘদিন থেকেই নজরুলের মন ও মানসকে একটি সর্বদেশীয় রূপ দিয়েছে। সর্বোপরি' নজরুলের আন্তর্জাতিকতা কোন সময়ে বা ঘটনাক্রমে অর্জিত বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রলক্ষণ নয়, বলা যায় কবি-জীবনের শুরু থেকেই তিনি একটি বিশাল গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, এবং দেশ, জাতি ও কালের সংকীর্ণ গণ্ডীকে পার হয়ে এসেছিলেন।

নজরুলের প্রগতিপন্থী চিন্তাধারা তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ তীব্রতর করার পেছনে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিল, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুলিতে সর্বত্রই একটি বিশ্ব প্রেক্ষিত রচিত হয়েছে। এমন কি স্বদেশপ্রেমের কবিতায়ও তিনি দেশকে অতিক্রম করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত মানবপ্রেমী, এবং তার ধর্ম ছিল ধর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মবাদ বা সেকুলার স্পিরিচ্যুয়ালিজম্। বলাবাহুল্য এ-দুই বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিকতা অর্জন সম্ভব হয় না। নজরুলকে নানাভাবে দেখানোর প্রচেষ্টা, অপচেষ্টা হয়েছে; ধর্ম ও জাতিগত সংকীর্ণ অনেক উপাধি-পরিচয়ে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে, কিন্তু নজরুল মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; বিশেষ কোন দেশেরও তিনি নাগরিক হতে অস্বীকার করেছেন। 'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় তিনি বলেছেন,

> পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,
> য়ুরোপ, রাশিয়া, আরব, মিসর, চীনে,
> আমরা আজিকে এক প্রাণ এক দেহ,
> এক বাণী —'কারো অধীন র'ব না কেহ।

অথবা, 'গোড়মি ধর্ম নয়' কবিতায়

> কেন কেহ হয় চিরদরিদ্র কেহ চিরধনী হয়,
> কেন কেউ অভিশপ্ত কাহারো জীবন শান্তিময়?
> কোন শাস্ত্রী বা মৌলানা বল, জেনেছে তাহার ভেদ?

এবং,

> তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
> তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলেরে থাকে ঘিরে

তবে সাম্যবাদের উপর অবিচল বিশ্বাস নজরুলের আন্তর্জাতিকতাকে সংহত করেছে। সাম্যবাদের মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান-কে এক হতে

আহ্বান করেছেন, শ্রমিক-মজুর- মেহনতী ও শোষিত মানুষকে এক কাতারে সামিল হবার ডাক দিয়েছেন এবং একই ভাবে দেশ ও জাতির বিভেদ-চিহ্ন ভুলে বিশ্বের মানুষকে একই সংগ্রামে অংশীদার হতে বলেছেন। 'সর্বহারা'র প্রতিটি কবিতাতেই এই আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে,

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ীর সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।

[ফরিয়াদ]

নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা ও গানের সাথে তাঁর সকল পাঠক পরিচিত আছেন, পুনরুল্লেখ তাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এসব সাম্যবাদী রচনার মূল উৎস ও অনুপ্রেরণা নজরুলের অখন্ড মানবচিন্তায় যার পরিচয় কোন শ্রেণী, জাতি বা দলে বিভক্ত নয়। 'লাঙল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ ১৯২৫ সালে গঠিত মজুর স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পত্রিকাটি সাম্যবাদের ও সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রবক্তা রূপে পরিচিত হয়, কিন্তু তার থেকে বেশী নজরুলের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার বাহক ও প্রচারক হিসেবে পত্রিকাটির গুরুত্ব। এখানে নজরুল যে পরিচয় তুলে ধরেছিলেন তাঁর সমাজ ও মানব দর্শনের, তাকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ বললে অত্যুক্তি হবে না। বলাবাহুল্য, ভারতে কোন প্রথম সারির কবি এতখানি নিষ্ঠা নিয়ে শোষিত মানুষের বঞ্চনা ও যন্ত্রণা নিয়ে কথা বলেন নি, বা নজরুলের মত প্রতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতাকে পরিপক্ক করেন নি। সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সোমেন চন্দকে বাদ দিলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য চিন্তা ভাবনা হয়নি বাংলা সাহিত্যে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাস দুঃখ দারিদ্র্য, নিষ্পেষণ শোষণের ইতিহাস এবং আমাদের জীবৎকালীন ইতিহাসে যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ; উপনিবেশিকতা মন্বন্তর মহামারী, কৃষক বিদ্রোহের উদাহরণ কম নয়। নজরুল এসব থেকে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রত্যয়মণ্ডিত কণ্ঠে তা উপহার দিয়েছিলেন দেশ ও জগৎকে। সমালোচকরা নজরুলের চড়াগলাকে অকাব্যিক বলেছেন, তাঁর স্বতস্ফূর্ততাকে সন্দেহ করেছেন ভনিতা বলে, স্বভাব কবির দুর্বলতা খুঁজেছেন তার কাব্যে কিন্তু তাঁরা একটি জিনিস বিস্মৃত হ'ন। শোষণ নিপীড়ন নির্যাতন ও অতি দরিদ্রের গ্লানি নিয়ে যখন নজরুল লেখেন, তার ভাষাও কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীন হতে পারে, হওয়াটাই স্বাভাবিক, এসব নিয়ে লিখলে সেই লেখায় উত্তাপ সঞ্চারিত হবে না এমন নিদানিক শীতলতা ও সংযম তথাকথিত কোন বুদ্ধিবাদী কবির পক্ষে দেখানো সম্ভব হলেও নজরুলের পক্ষে তা ছিল অপ্রয়োজনীয়। (বলাবাহুল্য আমাদের বুদ্ধিবাদী কবিরা তেমন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন অথবা লিখে থাকলেও এমন পরোক্ষভাবে এবং ধার করা অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন যে, শৈলীগত

চমৎকারিত্ব বজায় রাখা সহজ হয়েছে তাঁদের পক্ষে) নজরুলের অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিক, সম্পূর্ণ এবং অনাবৃত প্রকাশেই ছিল আগ্রহী। একজন বহুতল-অধিকারী কবির পক্ষে অভিজ্ঞতার অকপট প্রকাশ ও অনুভূতির ক্ষণিক সঞ্চারই বোধ করি ইপ্সিত। যে বহুতলের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাতে আছে ব্যক্তি, দেশ ও কাল, সর্বদেশ ও মহাকাল, জাতি আন্তর্জাতিকতা। একই সাথে সর্বত্র সমান দক্ষতায় ব্যাপৃত থাকতে পারতেন নজরুল। এবং এইভাবে এক ও অনেকের, নিকটের ও দূরের সর্বমানুষের কবিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তিনি।

শৈলীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার প্রভাব খুব স্পষ্ট ছিল না নজরুলে। তথাপি বলা যায় হুইটম্যানীয় দীর্ঘ চরণ যেভাবে অনেক কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছিলেন, তাতে ভাবের দীর্ঘায়িত ও বলিষ্ঠ প্রকাশটিও সফলভাবে হতে পেরেছে। পারস্যের গজলের ছন্দ ও শব্দবিন্যাস কিভাবে নজরুল ব্যবহার করেছেন, তা অনেক সমালোচক দেখিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে সমর-সঙ্গীতের অঙ্গ সৌষ্ঠবের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে, সামরিক পরিভাষায় যে ছন্দকে Tempo-di-Verse ও Tempo-di-Marcia বলা হয়, তার প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর 'চল্ চল্ চল্' রণসঙ্গীতে। এছাড়াও সময় সময় মিশর বা মধ্যপ্রাচ্যের গানের সুর, ইংরেজী গানের সুর তাঁর গানে এসেছে। নজরুলের বন্ধু ও শিল্পী নিতাই ঘটক বর্ণনা করেছেন 'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি' গানটি কিভাবে ইংরেজী ছায়াছবি 'পেগান লাভ সং' এর একটি গান 'কাম টু মি হোয়ার দি মুন বিমস্' এর অনুসরণে রচিত (নজরুল ছায়াছবিটি দেখেছিলেন)। কিন্তু এসবের যে সম্মিলিত অর্থ, তা হল নজরুলের সচেতন ও উদারনৈতিক শিল্প চিন্তা। তিনি মনের চারদিকে কোন দেয়াল রচনা করেন নি — যা গ্রহণযোগ্য ভেবেছেন, গ্রহণ করেছেন —উৎস যেখানে বা যা-ই হোক না কেন। তাঁর দৃষ্টি সমকালকে অতিক্রম করে অসীমে স্থাপিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন তাঁর বিদ্রোহীর মত—'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' এই বাঁধনহীন কবিসত্তায় সর্বকাল ও সর্বদেশ যে ছায়া ফেলবে, তা সহজেই ধরে নেয়া যায়।

১. নজরুল কোনো 'সনেট' রচনা করেন নি; তবে তাঁর রচিত অনেক গান বা গীতি-কবিতায় 'সনেট'- এর সংহতি ও চারিত্র্য -লক্ষণ রয়েছে বলে সমালোচকদের কারো কারো অভিমত।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — তৃতীয় সংকলন]

নজরুলের পত্রোপন্যাস ঃ গঠনকৌশল ও বক্তব্য

শান্তনু কায়সার

গ্যাটের উপন্যাসত্রয়ী (ট্রিলজি) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমারসেট মম উল্লেখ করেছেন, রিচার্ডসনের উপন্যাস বা রুশোর la Nouvelle Heloise এর মত চিঠির ভঙ্গীতে লেখা উপন্যাস সে সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। উপন্যাস লিখতে গিয়ে গ্যাটে ঐ রীতিরই অনুসরণ করেছেন। এর অন্যতম কারণ হিসেবে মম উল্লেখ করেছেন, একজন অদক্ষ ঔপন্যাসিকের জন্যে গল্প বলার সেটাই সহজতর পথ। উপন্যাসের জন্যে প্রক্রিয়াটিকে 'বাতিল' বলে গণ্য করেও তিনি বলেছেন, এর কিছু গুণগত দিকও রয়েছে। হারম্যান মেলভিল fiction সম্পর্কে যে বলেছেন it should present another world but one to which we feel the tie ('The Confidence Man') তাতে ঐ গুণগত দিকসমূহের একটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মম উল্লেখ করেছেন, ভিন্ন পদ্ধতিতে যেখানে কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সংশয়িত হতে পারে এই রীতিতে বর্ণিত ঘটনা সেক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বাঁধন-হারা' রচনা করেন তখন অন্যসব বিবেচনার সঙ্গে এ দুটি বিষয়ও তাঁর বিবেচনায় ছিল বলে মনে হয়। যখন এই পত্রোপন্যাসটি 'মোসলেম ভারতে'র প্রথম সংখ্যা (১৩২৭ এর বৈশাখ) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন তিনি সদ্য যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক। কিংবদন্তী তুল্য কবিখ্যাতি অর্জন করতে তিনি তখনো শুরু করেননি। 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতি কথা'য় মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, 'একটি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে কাজী নজরুল ইসলাম থাকতে এলো, আর কার্যত ওখান থেকেই বের হতে যাচ্ছিল 'মোসলেম ভারত' নামক পত্রিকাখানি। ওই বাড়ীতে আফজালুল হক সাহেবের বড় তখতপোশখানাই ছিল 'মোসলেম ভারতে'র অবিজ্ঞাপিত সম্পাদকীয় দফতর। নজরুল যেদিন এসেছিল সে রাত্রেই তাকে দিয়ে আফজাল সাহেবের ঘরে আমরা গান গাইয়ে নিয়েছিলাম সেকথা আমি আগে বলেছি। 'মোসলেম ভারতে'র কিছু কিছু লেখা প্রেসে চলে গিয়েছিল। পরের মাসেই বের হবে কাগজখানা। আমার সম্মুখে সেই রাত্রেই 'মোসলেম ভারতে' লেখা দেওয়ার বিষয়ে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের কথাবার্তা হয়ে

গেল।... এর আগে তার কয়েকটি লেখা অন্যান্য কাগজে ছাপা হয়েছিল। নজরুল বলল সে একখানা পত্রোপন্যাস লেখা শুরু করেছে। তার ক'খানা পত্র সে যে করাচীর সেনানিবাস হতে লিখে এনেছিল, একখানা ফুলস্ক্যাপ ফলিও সাইজের খাতা খুলে আমাদের তা সে দেখিয়েও দিল। আফজালুল হক সাহেব রাজী হলেন যে, পত্রোপন্যাসখানা তিনি তাঁর কাগজে ছাপাবেন। তারপর নাম নিয়ে কথা উঠল। নজরুল বলল, 'তহমীনা' কিংবা 'বাঁধন-হারা' নাম দিতে পারেন। বলাবাহুল্য, আমাদের 'বাঁধন-হারা' নামটিই পছন্দ হলো। নজরুল কেন পুস্তক খানার 'তহমীনা' নাম দিতে চেয়েছিল তা জানিনে, তবে পুস্তকে কোনো মেয়ের নাম 'তহমীনা' আছে বলে মনে পড়ছে না। হয়তো নামটি কল্পনায় ছিল। পরে সে মত পরিবর্তন করেছিল।' মুজফ্ফর আহমদের এই বিবৃতি থেকে 'বাঁধন-হারা' রচনাকালে নজরুলের মানসপ্রবণতা ও উপন্যাস-পরিকল্পনার সন্ধান মেলে। 'বাঁধন-হারা'য় তহমিনা বলে কোনো চরিত্র সত্যিই নেই, কিন্তু নজরুলের তিনটি উপন্যাসের সব কটিকে বিবেচনায় নিলে তিনি কেন ঐ উপন্যাসটির নাম 'তহমিনা' রাখতে চেয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। মুজফ্ফর আহমদ বলেছেন, 'মোসলেম ভারতে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সময় এর প্রথম কটি পত্র লেখা হয়েছিল; সম্পূর্ণ উপন্যাসটি নয়। তহমিনা বলে কোন চরিত্র 'বাঁধন -হারা'য় না থাকলেও তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা'য় এ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে। চরিত্রটির সঙ্গে 'বাঁধন-হারা'র সাহসিকার গভীরতর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'মোসলেম ভারতে' উপন্যাসটি প্রথম কিস্তি ছাপা হওয়ার সময় নজরুল নিশ্চিতই তাঁর উপন্যাসে এই চরিত্রটির আগমন ঘটাননি। কারণ, ছয় নং-এর মাহবুবাকে লেখা রাবেয়ার চিঠিতে প্রথম সাহসিকা চরিত্রের উল্লেখ পাই; তার দু'টি চিঠির পর রাবেয়া তার সই সাহসিকাকে চিঠি লেখে। আর সাহসিকা যখন চিঠি লেখে (যাতে তার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত, যার মধ্য দিয়ে নজরুল-পরিকল্পিত চরিত্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটে) তখন উপন্যাসের আর দুটি মাত্র চিঠি বাকী থাকে। নিঃসংশয়ে বলা যায়, নজরুল ঐ চরিত্রটিকে প্রথম তহমিনা হিসেবেই ভেবেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ক বিবেচনার পরে যে সামাজিক বক্তব্য তিনি ঐ উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের তৎকালীন বিকাশের ধারায় তিনি নিশ্চিতই সমাজের কোনো নারীকে তার বাহক হিসেবে তখন পর্যন্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারমুক্ত নারী হিসেবে তাই তিনি সাহসিকা চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পরিকল্পিত ঐ চরিত্রটি তাঁর মনে থেকে গিয়েছিল। যার প্রকাশ পরবর্তীকালে 'কুহেলিকা' উপন্যাসে ঘটে। নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাই আমরা তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করি। গুরুজনদের সম্মুখে প্রেমাস্পদকে তর্কে আহ্বান জানাতে এ কারণেই সে দ্বিধান্বিত নয়। 'বাঁধন-হারা'র সাহসিকা নূরুল হুদাকে সরাসরি 'বাঁধন-হারা'

হিসেবে উল্লেখ করলেও নজরুলের তিনটি উপন্যাসেরই প্রধান চরিত্রের প্রকৃতিও তাই। 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীর ও 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসার নূরুল হুদার সগোত্র এবং এরা সকলেই নজরুলের প্রতিকৃতিকেই ধারণ ও প্রকাশ করেছে। গ্যাটের উপন্যাসত্রয় The Sorrows of Werther, Wilhelem Meisteps Apprenticeship ও The Elective Affinities যেমন স্পষ্টত আত্ম-জৈবনিক তেমনি নজরুলের উপন্যাসত্রয়ও তাই।

কিন্তু প্রশ্ন এই, প্রথম উপন্যাস রচনায় নজরুল কেন অপ্রচলিত একটি উপন্যাস-আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন? এখানে উল্লেখ্য, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে তিনি এই উপন্যাসটি ছাড়াও 'রিক্তের বেদন' গল্পটিও রচনা করেন। এই গল্পটি দিনপঞ্জীর আকারে লেখা। উভয় গল্প ও উপন্যাসে বঙ্গভূমির বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে করাচী সেনানিবাস ও তৎপার্শ্ববর্তী পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে। বঙ্গভূমির সালার ও করাচী সেনানিবাস উভয় রচনায় প্রাপ্তব্য। আবার উভয় লেখায়ই সময়কে একই পদ্ধতিতে (কখনো কখনো স্থানসহ) চিহ্নিত করা হয়েছে। 'রিক্তের বেদন'-এ যেমন আছে 'নিশিভোর' 'ঐ, প্রত্যূষে', 'নিশীথ', 'শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি', 'মেঘম্লান সন্ধ্যা', 'সাগরবেলা' তেমনি 'বাঁধন-হারা'য় লক্ষ্য করা যায়ঃ 'সন্ধ্যা', 'প্রভাত', 'বিকেলবেলা', 'প্রভাত-চায়ের টেবিল সম্মুখে', 'দুপুরবেলা' 'নিঝুম রাত্তির', 'নিশীথ রাত্তির', 'দুপুর রাত্তির'। ছোটগল্পের অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব কলেবরের দিনপঞ্জীর প্রক্রিয়াটিই হয়তো 'বাঁধন-হারা'র পত্র পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, অথবা এই উভয় পদ্ধতিতেই নজরুল তাঁর প্রাথমিক আত্মপ্রকাশকে সহজসাধ্য বিবেচনা করেছেন। কিন্তু 'অদক্ষ' ঔপন্যাসিকের 'সহজতম' পথ সন্ধানের জন্যেই কি নজরুল বেছে নিয়েছিলেন ঐ পত্র-পদ্ধতি? মনে হয় না। যে জটিল আত্মগত ভাবনাকে তিনি লালন করেছেন, তার প্রকাশের জন্যেই অপরিহার্য ছিল এই পদ্ধতি। মেলভিল বর্ণিত another world যার সঙ্গে বস্তু-পৃথিবীর যোগসূত্র রয়েছে তাকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রন করার দায়িত্ববোধ থেকেই অনুসৃত হয়েছে এই শিল্পরীতি। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উদাহরণ থেকে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। এই উপন্যাসের কথক শ্রীবিলাস। দামিনী ও শচীশ চরিত্রদ্বয় উপন্যাসে প্রধান। এ বিষয়ে শ্রীবিলাসের ব্যাখ্যাঃ 'এই নাট্যের মুখ্যপাত্র যে দুটি তাদের অভিনয় আগাগোড়াই আত্মগত—আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ আমি নিতান্তই গৌণ।' কিন্তু শ্রীবিলাসের সর্বজ্ঞাত প্রেক্ষণবিন্দু ঔপন্যাসিকের ক্ষমতা ও দৃষ্টিকোণ অর্জন করেছে, যেটি হয়তো ঔপন্যাসিকের নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে অনুসরণ ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতো না। নজরুলও 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের চরিত্র সমূহকে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞাত অবস্থান থেকে অবলোকন করতে চাওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুকে স্পষ্ট হতে দিতে চেয়েছেন। এই বাস্তব ও শৈল্পিক প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিক নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন,

চরিত্রগুলো নিজেরাই তাদের অন্তরঙ্গ উচ্চারণে এগিয়ে এসেছে। পত্র এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার। যে কথা সামনা সামনি বলা যায় না, তা খুব সহজেই চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। অন্যদিকে চিঠি যেহেতু শুধুমাত্র লেখক ও প্রাপকের মধ্যেই যোগসূত্র ঘটায় সেহেতু তৃতীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে তা হয়ে ওঠে অধিকতর সত্যসন্ধ উচ্চারণ। এভাবেই পত্রোপন্যাস অধিকতর বিশ্বস্ততা অর্জন করে। আবারো রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মেঝো বউ মৃণাল তার চিঠির সুরুতেই জানাচ্ছে, 'চিরদিন কাছেই পড়ে আছি— মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি, চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি'। দেখা যাচ্ছে, চিঠি শুধু বর্ণনা নয়, ঘটনার গুণগত পরিবর্তন ও বিকাশের ইঙ্গিতবাহী। এই গল্পের বিন্দু তাই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করবার আগে মৃণালকে চিঠি লিখে যায়। কিন্তু ঐ চিঠি এত দাহ্য ক্ষমতার অধিকারী ছিল যে তার শ্বশুর পক্ষের লোকেরা তা মৃণালের হাতে পৌছুবার আগেই নষ্ট করে ফেলে। চিঠির এই ক্ষমতাটিও নজরুলের 'বাঁধন-হারা'য় লভ্য।

এখন দেখা যাক, নজরুল উপন্যাস ও পত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে 'বাঁধন-হারা'য় কী ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। রাবেয়াকে লেখা চিঠিতে সাহসিকা লিখছেঃ 'যদিও আমি গল্প-উপন্যাস লিখে থাকি, কিন্তু আমার এই প্রিয়জনদের চিঠি লেখবার সময় আর কিছুতেই সব কথা বেশ গোছালো করে লিখতে পারিনে। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু তা যেন আমার কাছে ভাই বেশ মিষ্টি লাগে। এতে কেরদানী করে লেখবার চেয়ে যে আসল প্রাণটুকু—সত্যের সত্য-মিথ্যা ধরা পড়ে যায়।' মাহবুবাকে লেখা চিঠিতে তার ভাবী রাবেয়া লিখছে, 'আমাদের অনেক ঘরের কথা তোকে জানিয়ে দিলাম এইজন্যে যে, তোর উপন্যাস আর গল্প পড়ার ভয়ানক সখ। আর এটা নিশ্চয় জানিস যে; গল্প-উপন্যাস সব মনগড়া কথা, তাই আমাদের এই সত্যিকারের ঘটনাটা তোকে উপন্যাসের চেয়েও হয়তো বেশী আনন্দ দেবে। এতে লজ্জার কিছুই নেই, আর এরকম করে বলা বা লেখাও মেয়েদের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। মেয়েরা যা একটু লজ্জাশীলা থাকে বিয়ের আগেই, তারপর বিয়ে হয়ে গেলেই (তাতে যদি ছেলের মা হল, তাহলে ত কথাই নেই) তাদের সামনের দিকটার এক হাত ঘোমটা পিছন দিকে দু'হাত ঝুলে পড়ে। তাছাড়া, এ আমাদের ননদ-ভাজের ঘরোয়া গোপন চিঠি। এ ত আর অন্য কেউ দেখতে আসছে না।' নূরুল হুদাকে লেখা চিঠিতে তার বন্ধু মনুয়র বলছে, 'তুই আমার এইসব মনস্তত্ত্বর বিশ্লেষণ দেখে আমায় ঔপন্যাসিক ঠাউরাসনে যেন।' পত্র গুচ্ছে একটি অনাড়ম্বর ও অন্তরঙ্গ পরিবেশ ও কাঠামোর সাক্ষাৎ পাই। নূরুল হুদার ২১শে জানুয়ারীর ঈষৎ দীর্ঘ চিঠিটি 'প্রভাত' ও 'বিকেলবেলা'য় লেখা। তার জবাব দিতে গিয়ে রবিয়লও তার ঐরকম দীর্ঘ চিঠিটি প্রভাত ও দুপুরে লেখে। অথচ মেয়েদের দীর্ঘতর চিঠিগুলো বিরতিহীন একটানে

লেখা। সেগুলোর কোন কোনটি অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যখন দেখি তা 'নিঝুম রাত্তির' বা 'দুপুর রাত্তিরে' লেখা। সাহসিকার চিঠিটি 'সকাল'-এ লেখা। এ ঘটনাটিও স্বাভাবিক। কারণ, সে তথাকথিত সাংসারিক দায় থেকে মুক্ত। অবশ্য 'নিঝুম রাত্তিরে' সোফিয়াকে লেখা দীর্ঘ চিঠিটি লিখতে গিয়ে মাহবুবা ঘুমিয়ে পড়েছিল। 'চিঠিটা শেষ না করেই দেখচি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' 'কলেজ ক্লান্ত' মনুয়র তার চিঠি শেষ করছে এভাবে, 'যাই, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।' সই মাহবুবাকে সোফিয়া লিখছে, 'আচ্ছা ভাই কলমিলতা! তুই আমার নূরু ভাইজানকে খুব জান্ থেকে ভালবাসিস, না? সত্যি করে লিখিস ভাই— নৈলে আমার মাথা খাস। যদি ঝুট বলিস তাহলে তোর সাথে (এই আঙ্গুল ফুটিয়ে বলছি) আড়ি–আড়ি–আড়ি। তিন সত্যি করলাম একেবারে।' নূরুল হুদাকে রাবেয়া তার চিঠির অন্তিম পংক্তিতে লিখছে, 'এখন আসি ভাই। খুকী ঘুম থেকে উঠে কাঁদচে। শীগগীর উত্তর দিয়ো।'

কিন্তু নজরুল এখানে যে ভিন্ন জগৎ উন্মোচন করতে চেয়েছেন সেটি কী? 'বাঁধন-হারা'য় এর কোন সরল জবাব নেই। যে নূরুল হুদাকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত তার জীবন ও চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা উপন্যাসে প্রতিফলিত। বন্ধু মনুয়রকে লেখা চিঠিতে নূরুল হুদা বলছে, 'আমার লিখতে বসলে কেবলই ইচ্ছা হয় যে হৃদয়ের সমস্ত কথা, যা হয়ত বলতে সঙ্কোচ আসবে, অকপটে লিখে যাই। কিন্তু সবটা পারি কই?' এই না পারার যন্ত্রণা উপন্যাসটির কাঠামোয় ক্রিয়া করে চলেছে। উপন্যাসের শেষ চিঠিটিও সে-ই লেখে। তাতে তার ও মাহবুবার ছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের ও পাঠকদের একটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিবৃত্ত হয় (যেমন সাহসিকা লিখছে রাবেয়াকেঃ 'নূরুটাতে আর মাহবুবাটাতে একটা কোন গুপ্ত জটিলতা আছে, যেটার খেই আমি আজো পাচ্ছিনে') ঃ 'যে মাহবুবা একদিন স্বেচ্ছায় আমাকে পাওয়ার লোভ দুহাতে ঠেলে দিয়েছিল, আমার মহৎ জীবন পাছে বিবাহের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়, তাই আমাকে নিজে হাতে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিলে— তাকে যদি আজ অযথা সন্দেহ করি, তাহলে আমার ইহকালে পরকালে কোথাও মুক্তি হবে না, সাহসিকাদি।' কিন্তু তারপরেও তার 'চিরউদাসী' 'চিরবৈরাগী' রূপ ও বন্ধন-ভয়ের কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলে না। সে ভাবী রাবেয়াকে চিঠিতে লিখেছে, 'মানুষের যেখানে ব্যথা সেইখানটা টিপেও সে আরাম পায়। অন্তরের বেদনাও ঠিক ঐ ধরনের।' তাতে বেদনার প্রকৃতির একটি বিমূর্ত রূপ কল্পনা করা গেলেও বেদনাটি যে কী তা অসনাক্তই থেকে যায়। মনীশ ঘটক তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'কনখল'-এ তাঁর কৈশোরকে প্রায় আক্ষরিকভাবে উন্মোচন করেছেন। কিন্তু নজরুলের 'বাঁধন-হারা'র নূরুল হুদার শিকড়টি যে কৈশোরে প্রোথিত তাকে উপন্যাসে ত নয়ই নিজের জীবনেও তিনি সম্পূর্ণ গোপন করে গেছেন। 'যুগ-স্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন লিখেছেন, 'চিরচঞ্চল নজরুল এইসময় একদিন উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে নাম লিখিয়ে

করাচী পাড়ি দিলেন। পিছনে পড়ে রইলো তাঁর স্কুল, আর ইতি হল তাঁর পড়াশুনার। কেন, কি কারণে তিনি স্বেচ্ছায় এই মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সে গোপন কথাটি তিনি কাউকে বলেননি। আমরা বহু চেষ্টা করেও তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি বার করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন অতি সুকৌশলে। এর ভেতর কি গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে?'

তবে 'বাঁধন -হারা'র নূরুল হুদার মধ্যে যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে এক ধরনের ক্ষোভ ও নৈরাজ্যিক প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ উপন্যাসেই রয়েছে। ভাবী রাবেয়াকে লেখা চিঠিতে সে উল্লেখ করেছে, 'মানুষকে আঘাত করে, হত্যা করেই আমার আনন্দ। আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুশমনী মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর। সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারবো না। আমাকে লক্ষ জীবনের জাহান্নামে পুড়িয়ে আমায় কবজায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীমের নেই। তাঁর সূর্য, তাঁর বিশ্ব গ্রাস করবার মত ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে। আমি তাঁকে ভয় করব কেন? —আপনি আমায় শয়তান বলবেন, আমার এ ঔদ্ধত্য দেখে কানে আঙ্গুল দেবেন, জানি,—ওহ, তাই হোক! বিশ্বের সব-কিছু মিলে আমায় 'শয়তান পিশাচ' বলে অভিহিত করুক, তবে না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই। আঃ... যে মানুষের স্রষ্টাকে আমি ভয় করিনে, সেই মানুষকে ভয় করে আমার অন্তরের সত্যকে গোপন করব কেন?' (এই চিঠির শেষে তার নাম স্বাক্ষরের আগে সে নিজেকে 'নরপিশাচ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে, মনুয়রকে লেখা প্রথম চিঠিতে নিজেকে সে বলেছে 'হতভাগা', তাকেই লেখা অন্য চিঠির শেষে সে হয় ' স্বেচ্ছাচারী', সাহসিকাকে লেখা উপন্যাসের সর্বশেষ চিঠিতে তার পরিচয় 'অভিশপ্ত নূরুল হুদা')। সাহসিকাকে লেখা রাবেয়ার চিঠিতেও বিষয়টি সমর্থিত হয় ঃ 'নূরুটা ক্রমেই স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে দেখচি, আবার এ খবর শুনলে তো সে বিধাতা পুরুষের সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করবে।' নূরুল হুদার এই আচরণ ও প্রবণতাকে সাহসিকা ব্যাখ্যা করেছে রাবেয়াকে লেখা তার চিঠিতেঃ 'যারা এইসব 'স্রষ্টার বিদ্রোহী' তরুণদের গালি দেয় তারাইবা 'স্রষ্টার রাজভক্ত' প্রজা হয়ে সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোন খবরা-খবর রাখে কি? আর পাঁচজনের মত শুধু চোখ বুঁজে অন্ধবিশ্বাসে অন্ধের মতন হাতড়িয়ে বেড়ানোতেই কি সে অনাদি অনন্ত সত্যকে তারা পাবে? যারা এইরকম বিদ্রোহীদের নাস্তিক ইত্যাদি বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তাড়া করে তারা আস্তিক হয়েই সে পরমপুরুষের কতটুকু খবর রাখে?' সাহসিকা আরও বলছে, 'বিদ্রোহী হওয়া তো একটা মস্ত শক্তির কথা।...তাছাড়া, প্রত্যেকের আত্মারও তো একটা স্বতন্ত্র গতি আছে। আর সকলের মত একজন গড্ডালিকা প্রবাহে যদি না চলে তা বলে কি তার পথ ভুল? বিশেষ করে বিদ্রোহী হবার যেমন শক্তি থাকা তেমনি অধিকারও থাকা চাই! কই, আমি তো বিদ্রোহী হতে

পারিনে, তুমিতো হতে পার না; আমাদের মাঝে যে সে বিপুল সহ্য-শক্তি নেই।... বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে বা মাকে মা না বলে, কিম্বা বলে যে এরা তার বাপ-মা নয়, তাহলে কি সত্যি সত্যিই তার পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হয়ে যায়? যে ক্ষুব্ধ অভিমান তার বুকে জাগে তার শেষ হলেই মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে ফের মায়ের কোলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ে।...এই বাঁধন-হারা নূরু যেন বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের দুলাল –ঠিক 'কোল-পোঁছা' ছেলের মত আবদেরে, একজিদ্দে, একরোখা—আর তাদের কথায় বিদ্রোহী। ...বিশ্ব-মাতা এখন তাকে ধুয়ে-মুছে রগড়ে সাফ করে নিচ্ছেন, আর সেও হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে। মা যেদিন কোলে নিয়ে চুমো খাবেন সেদিন কোথায় থাকবে ওর ভূতোমি আর কোথায় থাকবে এই কান্না আর লাফালাফি। তখন সব সুন্দর, সুন্দর।' সাহসিকার এই বক্তব্যকে নজরুল নিজেই তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে সত্য বলে প্রমাণ করেন যখন তিনি বলেন, 'অনাগত অবশ্যাম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আবাহন আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন... প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কারাগার মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনার রক্ত-ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শান্ত, আমায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো না আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আত্মার কারাবাসকে—অমৃতের পুত্র আমি, হাসি-গানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবো। চির শিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, আমার দুঃখ নাই, কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে।'

কিন্তু নজরুলের এই মনোভঙ্গী খুব সরলরৈখিক ছিল না, ছিল না নির্দ্বন্দ্বও। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর পূর্বোক্ত স্মৃতিকথার 'শেষ কয়েকটি কথা' অধ্যায়ে এর একটি ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন,

> নজরুল ইসলাম যে বন্ধুদের ভিতরে নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করত সেটা সে সরবেই করত। তাতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। নজরুলের বন্ধুরা

সকলেই তা জানতেন।[১] কিন্তু কেন সে নিজেকে নাস্তিক বলত? শুধু নজরুলের রচনা পড়লেই চলবে না, আমার মতে নজরুলকেও অধ্যয়ন করা আবশ্যক। তখন আমি যা বুঝেছিলেম তা হচ্ছে এই। ১৯২০-২১ সালে নজরুলের ভিতরে অদম্য আবেগ ছিল। নূতন নূতন চিন্তাধারাকে আঁকড়ে ধরার জন্য সে তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার ভেতরে যে সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা ঘুমিয়েছিলেন তাঁরা তখন জেগে উঠে 'না না' করছিলেন। ১৯২০ সালে শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সহিতও নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয়। এই পরিচয় অল্পদিনের ভিতরেই খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিণত হয়। জেল হতে মুক্তি পেয়ে আবার পরে শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ কোনো রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদান করেন নি। তিনি তাঁর দাদা শ্রী অরবিন্দ ঘোষের চিন্তাধারাটিরই তখন ধারক ও বাহক ছিলেন। তারও কিঞ্চিত ছোঁয়া নজরুলের মনে লাগা অসম্ভব নয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বইয়েরই 'কবিতা রচনার বিশেষ উপলক্ষ' অধ্যায়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, 'তখন আমরা 'নবযুগ' কাগজ বার করছি আর থাকছি ৮/১ টার্ণার স্ট্রীটে। বারীন্দ্র কুমার ঘোষেরা থাকতেন শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রীটে। তাঁদের সাপ্তাহিক 'বিজলী'ও প্রকাশিত হত ওই ঠিকানা হতেই। শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশের, তখনও দেশবন্ধু হন নি, মাসিক কাগজ 'নারায়ণে'র পরিচালনার ভারও ছিল শ্রী বারীন ঘোষদের হাতে। নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁদের তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। কিন্তু তাঁরা নজরুলের 'বাঁধন-হারা' হতে, তখন 'মোসলেম ভারতে' ছাপা হচ্ছিল, ছোট ছোট অংশ 'নারায়ণে' তুলে দিয়ে তার ওপরে ভালো মন্তব্য লিখতেন। 'আদি পুরোহিত' ও 'সাগ্নিক বীর' রূপে শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের ওপরে নজরুলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তার ওপর, তাঁরা তার লেখা সম্বন্ধে ভালো বলছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে নজরুলের আগ্রহ খুব বেড়ে যায়। সে তখন ছন্দে শ্রী বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে একখানা ছোট্ট পত্র লেখে। (১৯২০ সালের এই ছন্দোবদ্ধ পত্রখানাই হচ্ছে ১৯২২ সালে মুদ্রিত 'অগ্নিবীণা'র উৎসর্গের গান)। তা থেকে নজরুলের মনে আধ্যাত্মিক ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল এ কথা বলতে চাইনে, শুধু যোগাযোগের ব্যাপারটা আমি এখানে দেখালাম। সে যে নিজেকে বারে বারে নাস্তিক বলে ঘোষণা করেছিল তা ছিল তার আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকত্বের হাত থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টা পুরো উনিশ শ' বিশের দশক তাকে সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির ও ধ্যানী যোগীর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাত্মবাদের এই ছোঁয়া সত্ত্বেও একারণেই একই সঙ্গে নজরুলের সামাজিক বোধ ও সচেতনতাও তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেজন্যে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে 'ভগবান চর্চা' সত্ত্বেও সামাজিক প্রসঙ্গের তীক্ষ্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ঃ 'যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি—কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার ও প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই— আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।' একই কারণে 'বাঁধন-হারা'র সাহসিকা নূরুল হুদার 'বিদ্রোহে'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রতারণা ও

সামাজিক ভণ্ডামিকে চিহ্নিত করতেও ভোলেনা ঃ 'মন্দিরে গিয়ে পূজো করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য? এগুলোতো বাইরের বিধি। কিন্তু এগুলোকেই কি তারা ভাল করে মেনে চলতে পারে? মন্দিরে গিয়ে দেবতার মুখস্ত মন্ত্র আওড়ায়, কিন্তু মন থাকে লোকের সর্বনাশের দিকে। মসজিদে গিয়ে নামাজের নিয়ত করেই ভাবে যতসব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা। এই ভণ্ডামি, এই প্রতারণাইতো এদের সত্য!' 'আবার এই ... অন্ধবিশ্বাসীর দল? বেচারারা কিছুই না পেয়ে পাওয়ার ভান করে চোখ বুঁজে বসে আছে। অথচ এঁদের শুধোও, দেখবে, দিব্যি নাকি কান্না কেঁদে লোক-দেখানো ভক্তি-গদ গদ কণ্ঠে বলবে, 'আহাঁ হাঁ মরি! মরি! ঐ ঐ দেখ তিনি।' মিথ্যার কি জঘন্য অভিনয় ধর্মের নামে—সত্যের নামে! ঘৃণায় আপনিই আমার নাক কুঁচকে আসে।' সে কারণেই সাহসিকা বলে, 'আমি...ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশী ভক্ত, বেশী পক্ষপাতী।' নূরুল হুদা, অতএব, বাঁধনহারা হলেও লক্ষ্যচ্যুত নয়। বাঙালী পল্টনে যোগদানের বিষয়ে মনুয়রকে সে নানা কথা লিখলেও বা তাতে প্রচণ্ড আবেগের তোড় থাকলেও আসল কথা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। সে লিখেছে, 'এ ব্যাটারা ত বুঝবেনা যে, আমি কি জন্য পল্টনে এসেছি। ... আমি রাজা ও দেশের জন্যে আসিনি'। 'তাহলে? যে সামাজিক শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য বাঙালী এই প্রথম লাভ করেছে তাকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত? আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য'। ঐ শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল তা বোঝা যাবে ফৌজী জীবনে নজরুলের সহকর্মী ও কবির প্রীতিভাজন পান্নালাল সিংহের বক্তব্য থেকেঃ 'এ কথা তো সহজেই অনুমেয় যে, আমাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল 'যুদ্ধ বিদ্যা শিখে ব্রিটিশদের দেশবিতাড়িত করবো।' (নজরুল সখা পান্নালাল/মানস বন্দোপাধ্যায়, সংবাদ সাময়িকী, ১৭ আশ্বিন, ১৩৯১)। পরবর্তীকালে অসি নিয়ে না হলেও তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর অস্ত্র মসী নিয়ে নজরুল এ দেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়াবার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'বাঁধন-হারা'র নূরুল হুদার ঐ লক্ষ্য বিষয়েও আমাদের কোনো সংশয় থাকেনা যখন দেখি জনৈক সামরিক ইংরেজ কর্মকর্তাকে ঘুষি মেরে সেনানিবাসে সে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে।

নজরুল যে বলেছেন, শুধু শাসন ও শোষণই নয়, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি সমান সোচ্চার ছিলেন তার প্রমাণ 'বাঁধন-হারা'তেও পাওয়া যায়। সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ক বিশ্লেষণ থেকে এর সাক্ষ্য মেলে। সই সোফিয়াকে লেখা মাহবুবার চিঠিতে বিষয়টি এভাবে উত্থাপিত ঃ 'এঁদের সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, থুবড়ো আইবুড়ো মেয়ের শত চড়ে রা বেরোবে না, কায়াটিত নয়ই, ছায়াটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পাবে না, গলার আওয়াজ টেলিফোন যন্ত্রের মত হবে, কেবল যাকে বলবে সেই শুনতে পাবে।' 'খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখকষ্ট সহ্য করতেই

পাঠিয়েছেন. আমাদের হাত্-পা যেন পিঠমোড়া করে বাঁধা, নিজে কিছু বলবার বা কইবার হুকুম নেই। আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ, সব দোষ চাপাই নন্দ ঘোষস্বরূপ অদৃষ্টেরই ওপর। সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো মামুলী কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজ তক অ-দৃষ্ট ।.... আমাদের কর্ণধার মর্দারা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি। আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হয়নি এখনো—কারণ আমরা যে খালি রক্তমাংসের পিণ্ড। ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তক-নাগাদ নাকি আমরা দাসীবৃত্তিই করে আসছি, কারণ হজরত আদমের বাম পাঁজরের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি। বাপরে বাপ। আজ সেই কথা টলবে? এসব কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে পড়ে। কোন্ কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষের পায়ের নীচে বেহেশত, আর সে সব কেতাব আইনকানুনের রচয়িতা পুরুষ।' এই আত্ম ও সমাজ সচেতন মেয়েটির ভাগ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে তার মায়ের জবানীতে তার বর্ণনা ঃ 'আমার ভায়েরা বীরভূম জেলার শেঙানের এক খুব বড় জমিদারের সঙ্গে মাহবুবার বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করেছেন। তিনি এক মস্ত হোমরা-বুনিয়াদি খান্দানের,তবে বয়েসটা চল্লিশ পেরিয়ে পড়েছে এই যা। কিন্তু তাঁর আগের তরফের বিবির এক মেয়ে, আর কেউ নেই। তারো আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারো ঘরে ছেলেমেয়ে। বরের বয়েসটা একটু বেশী, তা হলে আর কি করবো। গরীবের মেয়ের জন্য কোন্ নওয়াবজাদা বসে আছে বল! এই মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে। মাহবুবাও মত দিয়েছে—এ শুনে তোমরা ত আশ্চর্য হবেই, আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি।... আল্লাহ এত দুঃখও লিখেছিল অভাগীর কপালে! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, বুবু সাহেবা, বুক ফেটে যাচ্ছে।' এই বিয়ের সংবাদ জেনে সাহসিকা রাবেয়াকে লিখেছে, 'একা মাহবুবার মা বেচারীইবা রাক্ষুসী হবে কেন, রেবা? এরকম রাক্ষুসী মা—যারা জেনে শুনে মেয়ের সর্বনাশ করে— তোদের সমাজে, হিন্দুর সমাজে, এমনকি আমাদের স্বাধীন (ব্রাহ্ম) সমাজেও তো কিছু আশ্চর্য নয়, আর কমও নয়। এইতো সতীত্বনাশ।' এ বিষয়ে স্বয়ং মাহবুবার জবানবন্দী 'আমার স্বামী দেবতা মানুষ। অর্থাৎ দেবতার যেমন ঐশ্বর্যের অভাব নাই, আবার লোভেরও ঘাটতি দেখিনি তেমনি'। আমাদের সমাজের স্ত্রী শিকারী অর্থাৎ স্বামীর শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে শিকার করেন আমাদের। ... কোথাও ভাল শিকার আছে শুনলেই পুরুষরা ছোটেন সেখানে, সেই শব্দভেদী বাণের কল্যাণে তাঁদের হয়ে যায় শাপে বর— কিন্তু এই হতভাগিনীদের বরই হয়ে ওঠে শাপ।' 'এখন তিনি সোনার দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছেন। তাঁর গোশ্‌ত খাওয়া এবং বিবাহ করা দুই শখই অক্ষয় হয়ে গেল। বিজ্ঞানের জয়জয়কার হোক, আমাদের মত বহু হতভাগিনীর স্বামীর যৌবন এই বিজ্ঞানের কৃপায় অটুট হয়ে রইল।' নজরুল নিজে ও তাঁর চরিত্ররা বিদ্যমান বাস্তবতা থেকেই

নারীর অবস্থান বিষয়ক সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যায় পৌঁচেছেন। তাহলেও মনন ও সচেতনতার মধ্য দিয়ে যে ঔপন্যাসিকদ্বয় নারীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের, ডরোথি রিচার্ডসন ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসেও নারীর এই অবস্থানগত ব্যাখ্যা সমর্থিত। ওঁরা দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার অংশ হিসেবেই নারী সাংস্কৃতিক সচেতনতা অর্জন করেছে। কিন্তু যেহেতু পুরুষ নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বিন্যাসেরই সে অংশ সেহেতু গৃহিণী নিরপেক্ষ ভূমিকায় উত্তরিত হলেও তার মুক্তি শেষ পর্যন্ত অনায়ত্ত ও অনার্জিতই থেকে যায়। ফলে নারী পুরুষ-শাসিত অর্থনীতি ও সমাজেরই ভগ্নাংশে পরিণত হয়। কিন্তু তাহালেও, ঐ বন্দীত্বের মধ্যেও জেগে থাকে তার সচেতন জিজ্ঞাসা। আর আমাদের সমাজে যেখানে নারীর গৃহিণী ভূমিকা থেকেই মুক্ত নয় সেখানে এ বন্দীত্ব তীব্রতর হয়েই দেখা দেয়। আবার একই সঙ্গে, কূটাভাসচিতভাবে, তার সচেতনতাও অধিকতর তীব্রতা অর্জন করে। এরই সাক্ষ্য হিসেবে উদ্ধৃতাংশ সমূহের দাহকে অনুভব করা প্রয়োজন।

'বাঁধন-হারা'র শেষ চিঠিটি ছাড়া বাকি চিঠিগুলোর সময়সীমা প্রায় ছয়মাস–২০শে জানুয়ারী থেকে ১লা আষাঢ়। চিঠিগুলোর স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্যে তাতে বাংলা বা খ্রীষ্টিয় কোনো সালেরই উল্লেখ নেই। নূরুল হুদার লেখা শেষ চিঠির তারিখ ২৩শে চৈত্র। চিঠির বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, এটি পরের বছরে লেখা। কারণ অতদিনে মাহবুবার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। নূরুল হুদাও লিখেছে, 'এই শেষ চিঠিটা লিখতেও একটা বছর পেরিয়ে গেল'। পত্রের মধ্যে উল্লেখিত হওয়ার ঘটনাক্রমের হঠাৎ ঝাঁকুনি বা বিশেষ বাঁক পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক মনে হয়নি বরং চিঠিতে উল্লেখিত ঐ ধরনের বিষয় ও ঘটনা খাপ খেয়ে কিংবা মানিয়ে গেছে। মাহবুবাকে বিয়ে না করে নুরুল হুদার হঠাৎ সেনাবাহিনীতে চলে যাওয়া, মাহবুবার হঠাৎ বিয়ে বা স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যু—এই সব ঘটনাই পাঠকের অগোচরে ঘটে। পাঠক যখন ঘটনাটি কোন পত্র লেখকের কাছ থেকে জানতে পান তখন আবেগের পরিবর্তে তার সঙ্গে ঘটনার মাত্রা ও ব্যাখ্যা যুক্ত হয়। এভাবে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞাত অবস্থানের পরিবর্তে পত্র লেখকের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তাতে যুক্ত হলেও পাঠকের পক্ষে অধিকতর নির্লিপ্ত মূল্যায়নের সুযোগ ঘটে। ধ্রুপদী কাহিনী বুননের এই রীতিটিকে নজরুল ইসলাম তাঁর 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম না হলেও এর সম্ভাবনাটিকে তিনি নিশ্চিতই উপলব্ধি করেছিলেন।

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরুল হুদাই শুধু বন্ধন থেকে মুক্তি খোঁজেনি, তার স্রষ্টাও এখানে উপন্যাস-আঙ্গিকের বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। এই মুক্তির ইচ্ছা অবশ্য অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রায় সব ছোটগল্পই উত্তমপুরুষে বর্ণিত। তাতে কল্পনা ও বিষয়ের ব্যবহারে অকৃপণ হওয়া সম্ভব। 'বাঁধন-হারা'য় পত্র-আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর বিষয় ও চরিত্রসমূহকে বিস্তৃত সারল্যে অনুভব ও

ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর ভাষা প্রায়শ গদ্যকাব্য ও এই শিল্প-আঙ্গিকটি কাব্যোপন্যাসে রূপান্তরিত হতে চেয়েছে। মনুয়রকে লেখা নূরুল হুদার চিঠিতে বৃষ্টি ও ঝড়োত্তর করাচীর স্নিগ্ধ নৈসর্গিক বর্ণনায় ঐ কাব্য-লক্ষণকে চিহ্নিত করা যায়। নূরুল হুদা লিখেছে ঃ 'কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে— যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলি পিঠের ওপর এলায়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে! এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলটপালট করবার যোগাড় করেছিল তা আর এখনকার এ সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানী রং-এর ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাপী-নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাউনি চেয়ে আছে। আর আর্দ্র ঋজু চুলগুলি বেয়ে এখনো দুএক ফোঁটা করে জল ঝরে পড়ছে। আর নিবেদিত অরুণের রক্তরাগের ছোঁয়ায় সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মতো ঝিলমিল করে উঠছে। কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক, তার এই গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য, আমার কাছে এতই খাপছাড়া খাপছাড়া ঠেকছে যে, আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছিনে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা, মেঘে মেঘে জটলা, তার উপর হাড়-ফাটানো কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস; করাচী বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দরের ধারে গাছপালা শূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু থুরু বুকে কেঁপেছে, আর এখনকার এই শান্ত-শিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার ওপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুঙ্কার তুলে বেচারীকে আরও শঙ্কিত করে তুলেছে; বিজুলীর তড়িতালোকে চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে, আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার সঙ্গে হো হো করে হেসেছে। তারপর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্ত-শিষ্ট মূর্তি, যেন কিচ্ছু জানেন না।

সেই সঙ্গে নজরুল এই উপন্যাসে যুক্তিপরম্পর ঋদ্ধ শাণিত গদ্যও লিখেছেন। অবশ্য তার সঙ্গে মিশেছে আয়রনি, উইট ও পানের বিচিত্র স্বাদ। পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণগুলির সঙ্গে যদি মনে রাখি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মত জরুরী কিন্তু স্পর্শকাতর বিষয়েও তিনি এই উপন্যাসে মন্তব্য ও ব্যাখ্যা করেছেন, তাহলে তাঁর গদ্যের আপাত মধুর রূপটির আড়ালে এর সত্য রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মধুর' ঐ রচনারীতি বিষয়ে মনুয়র লিখেছেঃ 'আমার এ বিকট রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক,এমনকি অনেকে একে ফাজলামি বা বাঁদরামী বলেও অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু আমার এ হালকাভাবের কথা হালকা ভাষাতেই বলা উচিত বলে মনে করি।' সে-ই নূরুল হুদার পূর্বোদ্ধৃত নিসর্গদৃশ্যের পুনর্বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, বর্ণনাটি 'আন্দাজিক্যালি' হবে। কিন্তু বালক বয়সে রচিত 'আই অ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং-এর মতো এই লঘুতার অতি ব্যবহার তাঁর রচনারীতিকে কোথাও কোথাও বিনষ্ট করলেও বিভিন্ন পত্রে লৌকিক প্রবাদ ও বাকরীতির স্বচ্ছন্দ ব্যবহার নজরুলের

গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নজরুল খুব স্বাভাবিক কারণেই এই উপন্যাসেও প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এর সত্যরূপটি ও ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে। তার আগে তাঁর 'স্বামীহারা' গল্পের একটি বাক্য লক্ষ্য করা যাক ঃ 'দোওয়া করি তুই চির এয়োতি হ।' 'দোওয়া'কে যদি মুসলিম জীবনের শব্দ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে 'এয়োতি' হতে পারে হিন্দু পরিবেশায়িত শব্দ। এই দুই মিলে যে বাক্য রচিত তাতে কি নজরুলের অভিপ্রায় ছিল কোন বাঙালী আবহ ফুটিয়ে তোলা? মনে রাখলে বুঝতে সুবিধা হবে যে, 'অসচেতন' ব্যবহারে অভিপ্রায়টির খাঁটি রূপই প্রকাশিত হয়। 'বাঁধন-হারা'য় আয়শা, রকিয়ার মেয়ে সোফিয়ার বিয়ে উপলক্ষে রকিয়াকে লেখে ঃ 'তার মাথার সিঁদুর হাতের পঁইচি অক্ষয় হোক।' এই বাক্যে হিন্দু জীবনের আবহ যতটা প্রতিফলিত তার চেয়ে বেশী সোফিয়ার প্রতি আয়েশার শুভকামনা উচ্চারিত। ঐ শুভকামনাকে স্পষ্ট রূপ দেবার জন্যেই প্রতীক দুটির ব্যবহার। প্রতীক দুটিকে আয়শা তার পরিপার্শ্বে এতটা সহজ স্বচ্ছন্দে লক্ষ্য করেছে যে প্রিয়জনের কল্যাণ কামনায় তার মানবিকতাটুকুই বড় হয়ে উঠেছে, এর সম্প্রদায়গত রূপ নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'য়ের উদাহরণ থেকে বিষয়টি আরো ভালভাবে বোঝা যেতে পারে। এখানে মুসলিম মেয়ে ফাতেমা হিন্দুর মন্দিরকে 'মসজিদ' মনে করে পুঁটিকে বলে, 'তা চল্, মোরা ঐ মসজিদের মদ্দি যাই।' এখানেও সম্প্রদায়গত পরিচয়টি লুপ্ত হয়, শব্দ শব্দাতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় তার মানবিকতাকে উন্মোচন করে।

আত্মহত্যা করবার আগে কবি ও ঔপন্যাসিক সিলভিয়া প্লাথ তাঁর মাকে সর্বশেষ চিঠিতে লিখেছেন, 'সকাল চারটেয় উঠে কবিতা লিখেছি, তারপর নতুন উপন্যাস খসড়া করছি।' আর নজরুল তাঁর প্রথম উপন্যাসে পরবর্তীকালে উন্মোচিত তাঁর কবি-পরিচয়ের রুদ্র ও কোমল— এই দুই প্রধান রূপের খসড়া করেছেন। সেজন্যে, উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা যাই থাক, এটি নজরুল ও নজরুল-সাহিত্য অনুধাবনে এক চাবি-সূত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

১. নজরুল ইসলাম বিশের দশকে তাঁর বন্ধুদের ভিতরে নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করতেন, —এমন তথ্য নজরুলের অন্য কোনো বন্ধুর রচনায় বা স্মৃতিচারণে তেমন মেলে কি? -স. ন. ই.প.।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্থ সংকলন]

চলচ্চিত্রে সবাক-পর্ব ও নজরুল

অনুপম হায়াৎ

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সংগে জড়িত হন। এই তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত। উপ-মহাদেশীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বছরই মুক্তি পায় উপ-মহাদেশের প্রথম সবাক চিত্র 'আলম আরা', প্রথম বাঙলা সবাকচিত্র 'জামাই ষষ্ঠী', ঢাকায় নির্মিত হয় প্রথম নির্বাক ছবি 'শেষ চুম্বন' এবং কাজী নজরুল ইসলাম চিত্র-পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, নিযুক্ত হন মডার্ন থিয়েটারস লিমিটেড কোম্পানীর সুর-ভাণ্ডারী। কোনো বাঙালী মুসলমান এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে চিত্রজগতে সরাসরিভাবে কাজী নজরুল ইসলামের যোগদান যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও। চিত্রজগতে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম পরিচালক, সংগীতকার, গায়ক, গীতিকার, কাহিনীকার। আর উপমহাদেশের কোন সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের মধ্যেও চিত্রজগতে তিনি বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন পথিকৃৎ। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলাম যতটা সরাসরি জড়িত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র ঠিক সেভাবে জড়িত ছিলেন না। যদিও এঁদের কাহিনী চলচ্চিত্রে বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত নজরুলের প্রধান একটি স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স' গঠন এবং সেখান থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজিতব্য ছবি 'মদীনা'র জন্য তিনি গানও লিখেছিলেন। সে সবই এখন গবেষণার বিষয় এবং ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বায়োস্কোপ, রেডিও এবং গ্রামোফোন চালুর যুগে। এটা অত্যন্ত লক্ষণীয় ব্যাপার যে, জন্মের ২৫/৩০ বছরের মধ্যেই কাজী নজরুল বিজ্ঞানের এই তিন মাধ্যমেই সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে উপ-মহাদেশের প্রথম বায়োস্কোপ দেখান হয়। এর কিছুকাল পরই কলকাতা, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, ভোলায়ও বায়োস্কোপ প্রদর্শিত হয়। অবিভক্ত বাংলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নির্মাণ ও প্রযোজনার কৃতিত্ব ঢাকার মানিকগঞ্জের বগজুড়ি গ্রামের হীরালাল সেন(১৮৬৬-১৯৭১), তাঁর ভাই মতিলাল সেন (১৮৭০-১৯৪৮) ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'দি রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানী'র। হীরালাল সেন যখন তাঁর বায়োস্কোপ কোম্পানী নিয়ে উপ-মহাদেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরছিলেন তখন পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম নেন কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, যাঁর মেধা ও মননের স্পর্শে উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র ও সাংবাদিকতা।

নজরুলের বয়স যখন ১৪ তখন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বেতে মুক্তি পায় উপ-মহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র 'রাজা হরিশ চন্দ্র' দাদাভাই ফাল্‌কের পরিচালনায়। এদিকে কলকাতায় চিত্র-প্রদর্শন ব্যবসাতে জাঁকিয়ে বসেন পার্শী জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান (১৮৫৬-১৯২৩)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর নাম 'ম্যাডান থিয়েটারস'। ম্যাডান ছিলেন একজন মঞ্চাভিনেতা। তিনি মঞ্চে নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনি কলকাতায় আসেন মঞ্চাভিনয়ে সুযোগ পাওয়ার আশায়। এই সূত্রেই বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার বায়োস্কোপকে তিনি ব্যবসায়িক সফলতার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বেছে এবং ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শন-ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের দিকে চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠান থেকে নির্মিত প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র 'বিল্ব মঙ্গল' মুক্তি পায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর। ছবিটির পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ ছবির অন্যতম নেপথ্য সহকর্মী ছিলেন ঢাকার নওয়াব এস্টেট-এর দেওয়ানের পুত্র প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। ম্যাডান কোম্পানী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪০/৫০টি নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে থেকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যোগ হয় 'শব্দ' অর্থাৎ সবাকচিত্রের জন্ম হয়। ভারতীয় দর্শকরাও বিজ্ঞানের এই নতুন সংযোজনের স্বাদ পায় বিভিন্ন বিদেশী সবাক-চিত্রের মাধ্যমে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩ মার্চ মুক্তি পায় উপ-মহাদেশের প্রথম সবাক-চিত্র বোম্বের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানীর 'আলম আরা'। এ ছবির পরিচালক ছিলেন এম. এম ইরানী ও নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন জোবায়দা। বাংলায় সবাক-ছবি নির্মাণের ঢেউ এসে লাগে কলকাতায়ও। এ ক্ষেত্রে ম্যাডান কোম্পানীই বাংলা সবাক-চিত্র নির্মাণের প্রথম উদ্যোগ নেয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় অমর চৌধুরীর পরিচালনায় ওই বছরের ১১ এপ্রিল মুক্তি পায় প্রথম ছবি 'জামাই ষষ্ঠী'।

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে সবাক-চিত্রের শুরু হয় 'মুন্নি বাঈ'-র 'জয় জয় ভবানীপতি' গানটির চিত্রায়নের মধ্যে দিয়ে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী ক্রাউন সিনেমায় এটি মুক্তি লাভ করে। এ ঘটনার মাত্র সাত দিন পরই কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটারস লিঃ-এর সুর-ভাণ্ডারী নিযুক্ত হন বলে 'দৈনিক বঙ্গবাণী'তে খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়,

> ম্যাডান থিয়েটারস লিঃ বাঙ্গালা গানের টকি নির্মাণ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ কবি ও

> সঙ্গীতকার নজরুল ইসলামকে সুর-ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের এ মনোনয়ন যথার্থ হইয়াছে, কারণ, অধুনা বাংলার তরুণ কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কিছুকাল ম্যাডান কোম্পনী নট-নটীদের সুর পরীক্ষার জন্য কেবল গান আবৃত্তির সবাক-চিত্রই নির্মাণ করিবেন, পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' তাঁহারা সবাক করিয়া তুলিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ম্যাডান থিয়েটারসে কাজী নজরুল ইসলামের যোগদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিস্মৃতপ্রায় গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটি উদ্ধারের কৃতিত্ব সাহিত্যিক-গবেষক শেখ দরবার আলমের। এই তথ্যটি উদ্ধারের ফলে চিত্রজগতের সবাক-পর্বে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান সম্পর্কে অনেক কিছু জানা বা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন ম্যাডান থিয়েটার-এ যোগ দেন তখন তিনি কবি, সাংবাদিক, গীতিকার, সুরকার, বক্তা হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে। ইতিমধ্যেই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার আলবার্ট হলে তিনি পেয়েছেন জাতীয় সংবর্ধনা।

চলচ্চিত্রে বাক বা শব্দ সংযোজনের ফলে গান ও আবহসংগীত ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ তথা বাণিজ্যিক সাফল্যের নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে কলকাতার বিখ্যাত চলচ্চিত্র-নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটারস সে সময়কার জনপ্রিয় সংগীত-তারকা কাজী নজরুল ইসলামকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নেন। ম্যাডান থিয়েটারস ইতিপূর্বে নির্বাক-যুগে গিরিশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্র-কাহিনীর চিত্রায়ন করলেও কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন উপেক্ষিত। অথচ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেকর্ড, মঞ্চ, নাটক এবং কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে নজরুলের কবিতা, গল্প ও গান প্রকাশ-প্রচার-ব্যবহৃত হয়েছে।

চলচ্চিত্র সবাক হওয়ার মুহূর্তে ম্যাডান থিয়েটারস লিঃ-এর রুস্তমজী দুতিয়াল এবং জাহাঙ্গীর ম্যাডানরা নজরুলের সৃষ্টিশীল সংগীত-প্রতিভাকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, সে-সময় ম্যাডান থিয়েটারসই প্রথম কাজী নজরুল ইসলামকে চলচ্চিত্র-শিল্পের সংগে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানান। ওই সময় কলকাতায় আরো অনেক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমন, আরোরা সিনেমা কোম্পানী, দি ইণ্ডো বৃটিশ ফিল্ম কোঃ, কোহিনুর ফিল্ম কোঃ, তাজমহল ফিল্ম কোঃ, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট, ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস, প্রতিভা সিনেমা কোম্পানী, প্রভিন্সিয়াল ফিল্ম প্রোডিউসার্স, নিউ থিয়েটারস প্রভৃতি।

কাজী নজরুল ইসলামকে ইংরেজী ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম বাংলা সবাক-চিত্রে ('নারী') দেখা যায় বলে অশোক মিত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তাহার (কাজী নজরুল ইসলাম) কবিতাবৃত্তির চিত্র ও শব্দ আজিও আমাদের মানসপটে দীপ্তমান।'

কি উপলক্ষে, কোথায়, কারা কাজী নজরুল ইসলামের স্বকণ্ঠে আবৃত্তির সবাক

চিত্র তুলেছিলেন লেখক অশোক মিত্র সে-সব সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। তবে এ সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে যা থেকে 'সবাক চিত্রে' কবির প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে সে-সময় ম্যাডান থিয়েটারস লিঃ বাংলা গানের টকি নির্মাণ শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন নট-নটীর স্বর পরীক্ষার জন্য কেবল গান আবৃত্তির সবাক চিত্রনির্মাণ করবে। এই উদ্দেশ্যেই ম্যাডান থিয়েটারস লিমিটেড কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়োগ করে। কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটারসে যোগদানের পর পর ৩০/৪০টি নির্বাচিত দৃশ্য (নাটক ও সংগীত) বাক সংযোজিত হয়ে ১৯৩১ খৃঃ ১৩ মার্চ মুক্তি লাভ করে। কালীশ মুখোপাধ্যায় ও গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ তাঁদের গ্রন্থে 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' ও 'সোনার দাগ' এ এসব নির্বাচিত দৃশ্যে অংশ গ্রহণকারীদের কয়েকজনের নাম যেমন, অহীন্দ্র চৌধুরী, দানী বাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দে, কৃষ্ণ চন্দ্র দে, সরযুবালা, রেনুবালা, অমর চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁরা সবাই ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্টজন, কেউ সতীর্থ এবং শিষ্য-শিক্ষকও। তাঁদের অনেকেই পরে কাজী নজরুল ইসলামের চলচ্চিত্র-পরিচালনা, সংগীত-পরিচালনা, রচিত গান ও কাহিনীতে অংশ নিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতার আবৃত্তির চিত্রায়ন সে সময় ম্যাডান থিয়েটারস করেছিল কিনা এ ব্যাপারে তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ নেই। অবশ্য চিত্র -জগতে নজরুলের সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য যেমন 'ধ্রুব'র পরিচালক, বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স গঠন ইত্যাদি তাঁদের গ্রন্থে নেই। তবে কবিকে প্রথম 'সুর-ভাণ্ডারী' নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটারস হয়তো এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে অন্যান্যের সংগে কবির আবৃত্তি-দৃশ্যও চিত্রায়ন করে থাকবে।

গ্রামোফোন রেকর্ড ও চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রথম দিককার গায়ক-সুরকার গীতিকার নায়ক হীরেন বসু পরিবেশিত তথ্যে জানা যায় যে, ১৯৩১ সালে হিজ মাস্টারস ভয়েস (এইচ. এম. ভি) ছাড়েন হীরেন বসু, কাজী নজরুল ইসলাম ও ধীরেন দাস। এর কারণ ছিল, প্রকাশিত রেকর্ডে কেবলমাত্র শিল্পীদের নাম থাকত, সুরকার-গীতিকারদের নাম থাকতনা। রেকর্ডে সুরকার-গীতিকারদের নাম মুদ্রণ, রয়ালটির হার বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রশ্নে কোম্পানীর সংগে বনিবনা না হওয়ায় এই তিনজন এইচ. এম. ভি ছাড়েন।

এইচ. এম. ভি ছেড়ে হীরেন বসু গেলেন কলম্বিয়ায়, সেই সংগে যোগ দেন ম্যাডান কোম্পানীতে সুরকার, গায়ক, নায়ক হিসেবে। তাঁর সংগে ধীরেন দাসও। হীরেন বসু তুলসী লাহিড়ীকেও টেনে নেন। একই দলে কাজী নজরুলও যোগ দেন ম্যাডান থিয়েটারসে।

সবাক-যুগের প্রাথমিক পর্বে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি চালু হয়নি। তখন অভিনেতা-

অভিনেত্রীকে নিজেই ক্যামেরার সামনে গান গাইতে হত। অন্যজন সুটিংয়ের সময় ক্যামেরার পাশে থেকে গান গাইতো আর অভিনেতা/অভিনেত্রীরা সেই গানের সময় ঠোঁট মেলাত।

১৯৩১ সালের ২৭শে জুন মুক্তি পায় দ্বিতীয় বাংলা সবাক চিত্র 'জোর বরাত'। ছবির নায়ক ছিলেন জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় আর নায়িকা ছিলেন কানন বালা। ছবিতে পর্দায় প্রদর্শিত নায়কের মুখের গানগুলো গেয়েছিলেন নায়ক (এবং সংগীত পরিচালক) হীরেন বসু। জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির প্রযোজনায় ছিল ম্যাডান থিয়েটারস।

'জোর বরাত' ছবি সম্পর্কে হীরেন বসুর লেখা,

> ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। সুটিং চলছে 'জোর বরাত' ছবির। জানালার ধারে রাখা বিরাট অর্গান। নায়ক জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানালার দিকে মুখ করে গেয়ে চলেছেন 'কে নিবি গো...' লক্ষ্য, পাশের বাড়ীতে নায়িকা কানন দেবীকে গান শোনানো। নায়িকাও সে গান শুনছেন কান পেতে। দু'টি ক্যামেরা কাজ করে চলেছে ফ্লোরে। প্রথম ক্যামেরায় রয়েছেন ইটালিয়ান ক্যামেরাম্যান মার্কনি আর অন্যটিতে যতীন দাস। স্টুডিওর অন্য দিকটিতে মাইক ঝুলছে। সংগীত-পরিচালক হীরেন বসুও গেয়ে চলেছেন 'কে নিবি গো.....'। এ ভাবেই সূচনা হলো বাংলা সিনেমার গানের।

বাংলা সবাক তৃতীয় ছবি 'ঋষির প্রেম'-এ নজরুলের সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানীতে হীরেন বসু, ধীরেন, দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানন দেবী, সরযুবালাও জড়িত হন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডান প্রযোজিত ৮/৯টি ছবি মুক্তি পায়। এ সবের মধ্যে ছিল জামাই ষষ্ঠী, জোর বরার্ত, ঋষির প্রেম, তৃতীয় পক্ষ, প্রহলাদ, লায়লা। ওই বছর নিউ থিয়েটারস-এর একটি মাত্র সবাক চিত্র 'দেনা-পাওনা' মুক্তি পায়। কয়েকটি নির্বাক ছবিও ওই বছর মুক্তি পায়। এর মধ্যে ছিল গুপ্তরত্ন, মরণের পরে, টাকায় কি না হয়, বালিকা বধূ জীবন প্রভাত, চুপ, দি রোমাণ্টিক লাভার, চাষার মেয়ে, চরিত্র, বিবাহ-বিভ্রাট, দেবী চৌধুরাণী, গীত, গ্রহের ফের।

ম্যাডান প্রযোজিত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত সব সবাক চিত্রেই 'সুর-ভাণ্ডারী' হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান থাকার কথা। কিন্তু সেকালের এসব ছবির প্রিণ্ট ও প্রচার/পুস্তিকা দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণে নজরুলের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটারসের 'সুর-ভাণ্ডারী' নিযুক্ত হলেও ১৯৩১ খৃঃ মুক্তিপ্রাপ্ত ম্যাডান থিয়েটারসের ৭/৮টি ছবিতে 'সুরকার বা গীতিকার' হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম পাওয়া যায় না। যেমন তিন রীলের 'জামাই ষষ্ঠী'র সংগীত-পরিচালক নীরোদ মুখোপাধ্যায়, চার রীলের 'জোর বরাত' এর সংগীত-

পরিচালক-গায়ক-গীতিকার হীরেন বসু, নায়িকা কানন দেবী, 'ঋষির প্রেম'এর সংগীত-পরিচালক হীরেন বসু ও ধীরেন দাস, গীতিকার হীরেন বসু ও কৃষ্ণচন্দ্র দে, গায়ক হীরেন বসু ও ধীরেন দাস, গায়িকা কানন দেবী ও সরযুবালা।

সে বছরের শেষ ছবি ছিল 'প্রহলাদ'। এ সম্পর্কে হীরেন বসুর মন্তব্য, 'সুর মঞ্চানুসারী। ছবির গায়ক-গায়িকা জ্যোতি (প্রহলাদের ভূমিকায়), শান্তিগুপ্তা (কয়াধু), মৃনাল কান্তি ঘোষ, ধীরেন দাস, নীহার বালা, বীণাপানি। শেষের দু'খানি ছবিতে (নিউ থিয়েটারসের 'দেনা পাওনা' ও ম্যাডানের 'প্রহলাদ')। সংগীত পরিচালক-এর নাম ছিল না।'

কিন্তু নজরুল-গবেষক অশোক কুমার মিত্র ম্যাডানের 'প্রহলাদ' ছবিতে ধীরেন দাসের কণ্ঠে কয়েকখানি সুশ্রাব্য নজরুল রচিত গান (সুরসহ) শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি ভুলক্রমে ছবির নাম 'প্রহলাদ চরিত্র' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এ ছবিতে নজরুলের ক'টি এবং কি কি গান ছিল তা উল্লেখ করেন নি।

পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর 'প্রহলাদ চরিত' নাটক ও যাত্রা হিসেবে-ইতিপূর্বে বহুলভাবে মঞ্চস্থ ও প্রশংসিত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে যতীন দাস ও টমাস মার্কনীর ক্যামেরায় সবাক 'প্রহলাদ' পরিচালনা করেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এ ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩১ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার ক্রাউন সিনেমায়।

> অশোক মিত্র লিখেছেন, ম্যাডান থিয়েটারস লিঃ প্রযোজিত 'বিষ্ণুমায়া' ও 'প্রহলাদ চরিত' নামক দুইখানি পৌরাণিক চিত্রে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কয়েকখানি অতি সুশ্রাব্য গীত তাহার সতীর্থ ও অনুরাগী শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দাশের কণ্ঠে গীত হইয়া যে মোহন মায়াজাল রচনা করিয়াছিল, তাহা আজ সুদীর্ঘ ৩৭ বছর পরেও আমাদের মনে ধ্বনিত হইতেছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অশোক মিত্র ছাড়া সবাক-যুগের সূচনা-লগ্নে কোনো ছবিতে নজরুল-গীতি ব্যবহারের কথা আর কোনো লেখক, গবেষক, জীবনীকার, চলচ্চিত্র-ইতিহাসবিদ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকা, সুরকারদের লেখা বা স্মৃতিকথায় উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯৩১ খৃঃ কাজী নজরুল ইসলাম 'ধুপছায়া' নামে একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং সে-ছবির সংগীত পরিচালনা করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। এতে তিনি বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং পংকজ মল্লিক কণ্ঠদান করেন বলে জানা যায়।

কিন্তু বিভিন্ন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'ধুপছায়া' (১৯৩১) এর কোন উল্লেখ নেই। ছবিটি কোন প্রযোজনা-প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরী হয়েছিল, কোন তারিখে, কোন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল, এর সংগে জড়িত শিল্পীকুশলী কারা ছিলেন সে-সব সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। কালীশ মুখোপাধ্যায়-এর 'বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের

ইতিহাস', প্রণব বিশ্বাসের 'বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস', গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের 'সোনার দাগ', অরুন দত্তগুপ্তের 'বাংলা সিনেমা' প্রভৃতি গ্রন্থে 'ধুপছায়া' নামে কোনো ছবির নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এমনও হতে পারে যে, 'ধুপছায়া'র প্রাথমিক কাজ বা কিছু শুটিং হয়েছিল, পরে তা আর এগোয়নি বা মুক্তি পায়নি। চিত্রজগতে বহু ছবির নাম ঘোষণা, মহরত হওয়া, শ্যুটিং, রেকর্ডিং হওয়া এমন কি সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও মুক্তি না পাওয়ার নজীর রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত ও অভিনীত 'ধুপছায়া' হতে পারে তেমনি একটি অসমাপ্ত বা সর্বসাধারণ্যে অ-মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। ভবিষ্যতের গবেষণায় হয় তো 'ধুপছায়া' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

অশোক কুমার মিত্র পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, 'বিষ্ণুমায়া' নামে আরেকটি ছবিতেও ধীরেন দাস কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ও সুরে গান গেয়েছিলেন। 'বিষ্ণুমায়া' আমাদের কাছে আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক—আব্বাসউদ্দীন আহমদ অভিনয় এবং সেই সংগে গান গেয়েছিলেন। আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনীতে এই তথ্য রয়েছে। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচয়িতারা আব্বাসউদ্দীনের নাম এ ছবির বেলায় উল্লেখ করেন নি। 'বিষ্ণুমায়া'ও পৌরানিক কাহিনী-নির্ভর। ম্যাডান থিয়েটারস প্রযোজিত এ ছবির পরিচালনায় ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে অভিনয় করেন অহীন্দ্র চৌধুরী, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কার্তিক চন্দ্র দে, কার্ত্তিক রায়, রেনুবালা, শিশুবালা, উমাশশী, কানন দেবী, গনেশ গোস্বামী, বেলারানী, জ্যোতি, ধীরেন প্রমুখ। ধীরেন দাস এ ছবিতে 'নারদ' এর ভূমিকায় আর আব্বাসউদ্দীন 'অংকুর'এর ভূমিকায় রূপদান করেন। 'বিষ্ণুমায়া' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৬ মার্চ কলকাতার ক্রাউন ও এম্প্রেস থিয়েটারে।

১৯৩২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে ছিল রবীন্দ্র-কাহিনী 'নটীর পূজা', 'চির কুমার সভা', দ্বিজেন্দ্র-কাহিনী 'পূনঃজন্ম', শরৎকাহিনী 'পল্লী সমাজ', বঙ্কিম কাহিনী 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (ম্যাডান থিয়েটারস) এবং 'চিরকুমারী' (ম্যাডান থিয়েটারস)। এ বছর সর্বাধিক ছবি মুক্তি দেয় নিউ থিয়েটারস। আর বেশীরভাগ ছবিই ছিল সংগীত বহুল, নিউ থিয়েটারসের প্রতিটি ছবির সংগীত-পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এ বছরে সংগীতবহুল হিট ছবি ছিল দেবকী কুমার বসু পরিচালিত 'চণ্ডীদাস' (নিউ থিয়েটারস) কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারস-এর ছবিগুলোর সংগীত-পরিচালক, গীতিকার, গায়ক, গায়িকাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ম্যাডানের 'বিষ্ণুমায়া' ছবিতে কানন দেবী অভিনয় ও গানে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন বলে কালীশ মুখোপাধ্যায় ও গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ উল্লেখ করেন।

১৯৩৩ খৃঃ মুক্তি পায় ম্যাডান থিয়েটারসের 'কলংক গুঞ্জন', 'জয়দেব', 'রাধাকৃষ্ণ', নিউ থিয়েটারসের 'কপাল কুণ্ডলা', 'মীরাবাঈ', 'সীতা', রাধা ফিল্মসের 'শ্রী গৌরাঙ্গ', ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজের 'বিল্ব মঙ্গল', 'যমুনা-পুলিনে', 'সাবিত্রী'। এসব ছবির

মাধ্যমে রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, সুরকার হিসেবে একচেটিয়াভাবে কর্তৃত্ব করেন। আর গীতিকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অজয় ভট্টাচার্য, হীরেন বসু, তুলসী লাহিড়ী, হেমেন্দ্র কুমার রায় ১৯৩৩ সালের বিভিন্ন ছবিতে গান লিখেন।

এই দাপটের ভীড়ে চলচ্চিত্র-অঙ্গনে এলেন বাংলার 'বিদ্রোহী' 'সীমার বাঁধন টুটে' একাধিক ভূমিকা নিয়ে।

কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাস' গ্রন্থে ১৯৩৩ সালে কলকাতায় নির্মীয়মান চিত্র সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে,

> শ্রীমতি পিরোজ ম্যাডানের প্রযোজনায় পায়োনিয়ার ফিল্মস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০, বটতলা স্ট্রীটে এদের কার্যালয় স্থাপিত হয়। বিদেশীয় ছবিকে ডাবিং পদ্ধতিতে এরা ভাষান্তরিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'অতসী তুফান' নামের ছবিতে ডাবিং পদ্ধতিতে এরা প্রথম ছবির কাজ শুরু করেন।
>
> পায়োনিয়ার ফিল্মস নিরঞ্জন পালের ওপর অনুরাধা দেবীর 'মা' (বাংলা) চিত্রের পরিচালনার ভার দেবেন বলে সংবাদ রটে।

পায়োনিয়ার গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুব চরিত্র' অবলম্বনে' 'ধ্রুব', চিত্র জগতের নতুন তারকা কাজী নজরুল ইসলাম—পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, গায়ক এবং অভিনেতা রূপে। 'ধ্রুব'-র দুই পরিচালকের আরেকজন সত্যেন্দ্রনাথ দে।

'ধ্রুব' নির্মিত হয় ম্যাডান থিয়েটারসের অঙ্গ-সংগঠন পায়োনিয়ার ফিল্মসের ব্যানারে। কাজী নজরুল ইসলামের পরিচালনা, সুর, গান ও অভিনয় এবং অন্যান্য পাত্র-পাত্রী, শিল্পী, কলা-কুশলীদের সহায়তায় 'ধ্রুব' সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তৈরী করে নতুন দৃষ্টান্ত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী কলকাতায় মুক্তি পায় 'ধ্রুব'।

স্বীকৃতি

১। কালীশ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাস, কলকাতা।
২। গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ ঃ সোনার দাস, কলকাতা।
৩। প্রণব বিশ্বাস ঃ বাঙলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস, কলকাতা।
৪। অরুন দত্ত গুপ্ত ঃ বাংলা সিনেমা, কলকাতা।
৫। শেখ দরবার আলম ঃ অজানা নজরুল, ঢাকা।
৬। অশোক কুমার ঃ নজরুল প্রতিভা পরিচিতি, ঢাকা।
৭। বাবু রহমান ঃ চলচ্চিত্রে নজরুল ও তার গান, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, হেমন্ত,১৩৯৩, ঢাকা।
৮। ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত ঃ নজরুল চরিত মানস, কলকাতা।

৯। আসাদুল হক ঃ চিত্রপুরীর আঙ্গিনায় কবি নজরুল, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মাঘ, ১৩৯৫ (১৯৮৯ইং), ঢাকা।

১০। আবদুল মান্নান সৈয়দ ঃ 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', ঢাকা।

১১। আব্বাসউদ্দীন আহমদ ঃ আমার শিল্পীজীবনের কথা, ঢাকা।

১২। হীরেন বসু ঃ বাংলা সিনেমার গান, দেশ বিনোদন সংখ্যা, ১৩৯১, কলকাতা।

১৩। পঞ্চবর্ষী, জাতিস্মরের শিল্পলোক, নবকল্লোল, শ্রাবণ ১৩৬৯, কলকাতা।

নজরুলের 'আজাদ' মুক্ত মুসলমানের প্রতিকৃতি

খুরশেদুল ইসলাম

একটি অপূর্ব অনলস জীবনময়তায় নজরুলের নানা সত্তা অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যে কবিতায় ও সঙ্গীতে। তন্মধ্যে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা সর্বাধিক উজ্জ্বল, অনিন্দ্য-বেদনার অসামান্য রক্তরাগে শিখান্বিত। বিদ্বজ্জন সমাজেতো বটেই, সাধারণ্যেও দ্বিধাহীন স্বতঃস্ফূর্ততায় যে বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যটি তাকে সনাক্ত করে তা হচ্ছে 'বিদ্রোহী কবি'। তাঁর প্রসঙ্গে প্রায়শঃ আমরা তাঁর নামটি উহ্য রেখে কেবল বিদ্রোহী কবি—এই অভিধাটি উচ্চারণ করি।

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা মুখরতা পেলেও তাঁর প্রেমিক সত্তা, মানবতাবাদী আত্মসত্তা, ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ, জাতীয় পুনর্জাগরণবাদী ঐতিহ্য চেতনা প্রভৃতি ছন্দস্পন্দনময় উত্তালতায় পাঠক চিত্তকে কম আন্দোলিত করে না। তাঁর 'আজাদ' শীর্ষক কবিতাটি পাঠকালে এই সত্য দীপ্যমান হয়। বিশ শতকের প্রথম পাদে মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই কবিতাতে উন্মোচিত, একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্রের সন্দীপক সোনালী গ্রন্থনা একে সবিশেষ তাৎপর্য মন্ডিত করেছে।

বস্তুতঃ এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালীন দশকগুলোয় অতিবাহিত হয়েছে নজরুলের কৈশোর ও যৌবনসন্ধি। অন্যপক্ষে বিশ্বের জন্য সেই সময়-পরিসর ছিল রক্তাপ্লুত উত্তেজনা এবং হিংসাত্মক রক্তপাতের কাল। ষোড়শ-সপ্তদশ বয়সের তরুণ নজরুল আপন স্বভাবের পারবশ্যে হয়েছিলেন সেই উত্তেজনার অধিগত; সহিংসতার সামীপ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন একটি যন্ত্রনাকাতর পৃথিবী। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন 'হাবিলদার নজরুল' যুদ্ধ-ফেরৎ যুবক দৃপ্ত দম্ভের যৌবন অঙ্গে ধারণ করে আবির্ভূত হলেন আমাদের কাব্যক্ষেত্রে। অতীত-ঐতিহ্যের প্রাণময়তায় উদ্বুদ্ধ নজরুল ছিলেন তাঁর কালের সন্তান। তাই অনিবার্যভাবেই তার চেতনায় প্রবহমান ছিলো উনবিংশ শতকের সামূহিক উত্তরাধিকার।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে সংগঠিত শিল্প বিপ্লবের উৎস ছিল উত্তম মানব মেধা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং তজ্জাত নানা প্রযুক্তির উদ্ভাবন। সূচনাপর্বে মানুষের শুভবুদ্ধি এবং ইহজাগতিক কল্যাণকামিতা ছিল এই বিপ্লবের অন্তর্গত মৌল প্রেরণা। ফলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদিতা একটি প্রসন্নতা পেয়েছিল শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু বিশ

শতকে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই প্রসন্নতা বহুলাংশে রূপান্তরিত হলো জিঘাংসার হাতিয়ারে। সহিংসতা প্রাধান্য পেল পর পর দু'টি মহাযুদ্ধে, এবং এই শতকের প্রথমার্ধেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কদর্য প্রসূন এই সহিংসতাকে নজরুল প্রত্যক্ষ করলেন, ব্যক্তিগত জীবনে এর অভিজ্ঞতাকে ধারণ প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিকরূপে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এবং এ কারণেই তিনি তাঁর সময়কালের দুঃস্বপ্নের ইতিহাস থেকে জাগ্রত হয়েছেন, কখনও শান্তি ও প্রাচুর্যময় মুক্ত জীবনের সোনালী বীক্ষণে তিনি মগ্ন হয়েছেন। কিন্তু কালের করাল গ্রাস তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি।

নজরুলের সময়কালে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে দু'টি চৈতন্য যুগ প্রবলভাবে প্রবহমান দেখতে পাই। একটি যুক্তিবাদী বা জ্ঞানবাদী যুগ (এজ অব সায়েন্স), অন্যটি সহিংসতা বা জিঘাংসাবাদী যুগ (এজ অব ভায়োলেন্স)। কবি ডব্লিউ এইচ অডেন এর সঙ্গে একটি নতুন চৈতন্য যুগ সংযোজন করেন। ই. এম. ফরস্টার এটিকে উৎকণ্ঠার যুগ বা এজ অব এ্যাংজাইটি বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অডেন সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন বাংলা কাব্যের প্রেক্ষাপটে নজরুল সম্পর্কেও ভাবগত দিক থেকে সেকথাটি সম্যক প্রযোজ্য। ফরস্টার বলেছেন,

> It is no wonder that a famous modern poet W. H. Auden, who was born in 1907 in England and who has lived for long periods in the United States, should have hit upon yet another title for the 20th century—the Age of Anxietry.

বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দী জীবন-বিধ্বংসী নিষ্ঠুরতার অপঘাতময় দু'টি মহাযুদ্ধের নৃশংসতায় ক্লিষ্ট। অতএব এই শতকের খ্যাতনামা স্পর্শকাতর আধুনিক কবি অডেন যে একটি নতুন যুগ নামাঙ্কিত করবেন, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

প্রাক-বিংশ শতকে রেনেসাঁ, ক্লাসিজম, নিউ ক্লাসিজম, রিজন, সেন্টিমেন্টালিজম, রোম্যান্টিসিজম, নিউ-রোম্যান্টিসিজম প্রভৃতি যুগপর্ব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কেবল বিশ শতকে এসেই মহাযুদ্ধের সহিংসতার কারণে মানুষের বিষয়ে সৃজনশীল মানুষের প্রবল উৎকণ্ঠাকে লক্ষ্য করি। বিশেষতঃ কবিদের কেউ কেউ বিপুল ব্যগ্রতার সঙ্গে সেই উৎকণ্ঠার উন্মোচন ঘটিয়েছেন তাঁদের কাব্যে-কবিতায়। ইংরেজী কাব্যে অডেন যা করেছিলেন বাংলা কাব্যে নজরুলও তাই করেছিলেন। নজরুলের উৎকণ্ঠা ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধে জারিত, মুসলমান সমাজের হীনাবস্থাকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত হয়েছে, শাখা বিস্তার করেছে। 'আজাদ' এই উৎকণ্ঠার অন্যতম ফলশ্রুতি।

অডেনের মতো নজরুলও ছিলেন এই শতকের প্রথম পাদে বাংলা ভাষার একজন অত্যুজ্জ্বল কবি। রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে আপন প্রতিভার অলোকসামান্য স্পর্শে বাংলাকাব্যে তিনি একটি নতুন চৈতন্য যুগের সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলেছিলেন, এবং সেজন্যে তখনকার বিদগ্ধ সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁকে 'যুগস্রষ্টা কবি' বলে আখ্যায়িত করেন।

ইংল্যান্ডে জাত অডেনের দীর্ঘ সময় পরিসরসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস তাঁর কাব্যমানস জীবনে সংশয়াতীতভাবে তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করেছিল। দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে যে জাতি একটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করে এবং সেজন্যে তার একজন মহান রাষ্ট্রনায়ককে জীবন দিতে হয়, সে জাতির জীবনাবেগ ও ভাবাবহ অনিবার্যভাবেই অডেনের মেধা, মনন ও প্রতিভাকে একটি অনাময় মানবিক প্রত্যয়ের ঘনিষ্ঠতায় আপ্লুত করেছিল।

একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের উষর প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করেও বাংলাদেশের স্নিগ্ধমধুর শ্যামলিমার ছায়াঞ্চলে নজরুল অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর কৈশোর ও যৌবন-সন্ধির শ্রেষ্ঠাংশ। পরিপূর্ণ যৌবনে হৈ চৈ আর কোলাহল ছড়িয়ে তিনি বেড়াতে এসেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের ঢাকা শহরস্থ বাসভবনে, –সুযশ আর সুখ্যাতির সৌরভে মৌ মৌ কিছুটা সময় তিনি কাটিয়েছেন এখানে, ভক্তজন পরিবেষ্টিত হয়ে, উচ্ছ্বাসে আনন্দে। অন্যপক্ষে কুমিল্লার দুই লাবণ্যময়ী কন্যার সঙ্গে পর পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন বলে কুমিল্লা শহরে এবং কুমিল্লার এক পল্লী গ্রাম দৌলতপুরে তাঁর সৃজনমুখর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশ কিছুদিন তিনি অবস্থান করেছিলেন। আর তাই তাঁর চিত্তোদ্যম ও মানসপ্রবণতা জীবনবাদী কাব্য সাধনার লক্ষ্যে চালিত হয়েছে, তাঁর স্বভাবে, সৃষ্টিশীলতায়, স্পর্শকাতরতায়, হৃদয়াবেগ ও মননে সমতুল্য সংহতি পেয়েছে কড়ি ও কোমলের উপস্থিতি, এবং সেই সূত্রেই ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক স্বাজাত্য-চেতনা তাঁকে দান করেছে একটি গৌরবময় জীবন-দৃষ্টি।

নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন দারিদ্র্যে পতিত এমন একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে যেখানে বিরাজমান ছিল ইসলামী জীবনাবহ। অতি শৈশবে তিনি পবিত্র কুরআন পাঠ শিখেছিলেন, এবং শৈশবেই মক্তবে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিয়েছেন; মস্‌জিদে মুয়াজ্জিন এবং ইমামের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর তাই বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন আশ্রিত জীবন মহিমা তাঁর আত্মসত্তা ও সমৃদ্ধিকে ইসলামী ঐতিহ্যের অভিসারী করেছে। পলাশীতে পরাজিত রাজ্যহারা মুসলমান, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-নিগড়ে নিষ্পেষিত মুসলমান এবং সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজের ভেদবুদ্ধিজাত বৈষম্যের শিকার মুসলমান নজরুলের চিত্তে একটি বিপ্লবারূঢ় সংবেদনের উত্থান ঘটিয়েছিল। তিনি তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে দীপঙ্কর সত্যকথার উচ্চারণ করেন। এই সত্যকথা যেমন রচনা করেছে তাঁর ভাবুকসত্তার বাণীচিত্র তেমনি তা তার পাঠকদের মনোজগতে সম্ভব করেছে ঐতিহ্যপরায়ণ জীবনবোধের উদ্ভব, নির্মাণ করেছে মুক্ত মুসলমানের প্রকৃত জীবনালেখ্য, প্রকাশ করেছে তাদের বিষয়ে কবির অসামান্য উৎকণ্ঠা। অডেনের মতোই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাকাব্যে তিনি সংযোজন করেছেন একটি নতুন যুগের শিরোনাম, উৎকণ্ঠার যুগ বা 'এজ অব এ্যাংজাইটি'।

'আজাদ' ১৩৪৭ সনে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মাত্রাবৃত্তে রচিত, অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ১১৪ পংক্তির এই কবিতাটি ইসলামী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জ্বল; নাট্যগুণ সম্পন্ন জাগরণধর্মী একক কণ্ঠের উচ্চারণে একটি মনোলগ।

কবিতার শুরুতেই নজরুল এমন একজন মুক্ত মুসলমানের সন্ধান নিচ্ছেন যিনি যথার্থই আজাদ,-স্বাধীন চিত্তসত্তা ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী, বিশ্বাসীদের প্রাণপুরুষ; যাঁর উদার মানবতার বাণী নিখিল বিশ্বের মানুষকে ব্যগ্র করে, ব্যাকুল করে। শব্দের ব্যঞ্জনায় যে পুরুষ আভাসিত হন, সেপুরুষ বিশ্বনবী, মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ),

> কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান? /আল্লাহ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ? /কোথা সে আরিফ', কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর? /মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর। /কে পিয়েছে সে তৌহিদ সুধা পরমামৃত হায়?/ যাহারে হেরিয়া পরাণ পরম শান্তিতে ডুবে যায়।

কবিতা অগ্রসর হয়ে গেলে হযরতের বিশ্বজনীন আদর্শের অনুগামী ও অনানুগামী মানুষের চিত্র উন্মোচিত হয়। কবি ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করেনঃ পার্থিবভাবে রসুলে করিম অবস্থান না করলেও তিনি রেখে গেছেন আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কুরআন; রোজা, নামাজ, কলেমা। কবির প্রশ্নঃ তথাপি মুসলমান 'শবের মতো ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?'. উত্তরটি কবিতার অভ্যন্তরে আমরা পেয়ে যাই। আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সর্বনাশা আত্মবিস্মরণে নিমজ্জমান আজ দলে দলে রূপান্তরিত হয়েছে শক্তিশৌর্যহীন 'কলের পুতুলে'। গভীর সংক্ষোভের সঙ্গে কবি উচ্চারণ করেন,

> নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে-ইহারা মুসলেমিন!/ পরম পূর্ণ শক্তি উৎস হইতে জনম লয়ে/কেমন করিয়া শক্তি হারাল। এ জাতি? কোন্ সে ভয়ে/তিলে তিলে মরে, মানুষের মতো মরিতে পারে না। তবু?/আল্লাহ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!/ খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফের ভরা।

কিন্তু কাফের কারা? প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার পরিপন্থী বক্তব্য উপস্থাপন করেন কবি। আত্মশক্তিতে যার বিশ্বাস নেই, 'শত ভীতি'র অন্তরাল যাদের বন্দী করে রেখেছে জরার শৃঙ্খল সে-ই কাফের। কবি বলেন,

> কাফের তারেই বলি যারে ঢেকে আছে শত ভীতি জরা।

অন্যপক্ষে প্রকৃত মুসলমান হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে অজ্ঞানতার অন্ধকার আবৃত্ত করে রাখেনি, সত্য এবং জ্ঞানের সূর্যালোকে যিনি দীপ্যমান। তার বিষয়ে কবির বক্তব্য,

> আল্লাহ আর তাহার মাঝারে আবরণ নাই এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই-

একজন সত্যিকার মুসলমান মানবমুক্তির সংগ্রামী চেতনাবোধের চিরন্তন প্রতিভু। তিনি হবেন শক্তির অধিকারী। কিন্তু সেই শক্তিমানের বৈশিষ্ট্য কি ? কবি উত্তরে জানানঃ তিনি,

যার পানে চায়-সেই যেন পায় তখনি
অমৃতবারি,
যারে ডাকে-সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি,
অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যাহারে স্পর্শ করে সে অমনি হয়ে ওঠে অমৃত।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মি' হয়েও জয় করিতে পারে এই চরাচর।

কিন্তু যখন সেই শক্তিমান মুসলমান, তার ভূমিকার কথা বিস্তৃত হন তখন কবি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম.............

অতএব মুক্ত আত্মার অধিকারী যে মুসলমান শাশ্বত তারুণ্যের অপরাজেয় প্রত্যয়ে শক্তিমান যে মুসলমান, তাকেই কবি আহ্বান করেন,

আজাদ-আত্মা! আজাদ-আত্মা! সাড়া দাও,
দাও সাড়া!
এই গোলামীর জিঞ্জীর ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া।
হে চির অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো?
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্দাবাদের বাহন সাজো!

ইসলাম নারীর লাঞ্ছনা সহ্য করে না; নারী মাতা, নারী ভগ্নী। প্রকৃত মুসলমানের নিকট নারীর ইজ্জত একটি পবিত্র আমানত, এদের লজ্জা নিবারণ তার পৌরুষের প্রতিশ্রুতি। শিশুদের প্রতিও একজন মুসলমানের দায়িত্ব প্রায় তার জীবনের সমতুল্য। একইভাবে ধনীর স্বত্বে ক্ষুধিতের অধিকার ইসলামী সাম্যবোধের একটি অনন্য অঙ্গীকার। কবি বলেন,

ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিতা মাতা ভগ্নিরা চেয়ে আছে,
ওরে লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদের কাছে।
ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলেমেয়ে দুধ নাহি পেয়ে হায়,
তোমরা তাদের বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায়?

....

ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার, সঞ্চিত যার রয়
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয়।
মানুষের দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়,-

ঐতিহ্য চেতনার অনুরাগে উজ্জ্বল, আমাদের কাব্যসাহিত্যের প্রবুদ্ধ পুরুষ কাজী নজরুল এভাবেই আপন ভাব ও নির্বচনে নির্মাণ করেছেন প্রকৃত মুক্ত মুসলমানের প্রতিকৃতি, সত্য-সন্দীপক জীবনালেখ্য।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ত্রয়োদশ সংকলন]

অগ্নিবীণা-কাব্য পাঠের ভূমিকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) স্বকালবিদ্ধ যুগন্ধর কবি। সাহিত্যের কালজয়ী আবেদন এবং প্রবহমান প্রাসঙ্গিকতার বিচারে কেবল যুগন্ধরই নন, তিনি যুগোত্তীর্ণও বটে। নবজাগ্রত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চৈতন্যের সাগরমন্থন শেষে বাংলা কাব্যে তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত অন্তর্দ্বন্দ্বময় সমাজপ্রবাহে কাজী নজরুল ইসলাম উপাগত হন পরাক্রমশালী বিদ্রোহীর ভূমিকায়। উনিশ শতকে বাঙালির সীমাবদ্ধ নবজাগরণকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন সচেতন ভাবে; জনমূলসংলগ্নতা তাঁর কবিচৈতন্যে এনেছিল নতুন মাত্রা। 'বিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্তের ক্রমঅপসৃয়মান , ভগ্নপক্ষ, নৈরাশ্যমগ্ন ও চূর্ণস্বপ্ন সমাজচেতনা প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাস্পর্শী নজরুল ছিলেন মূলতঃ তারুণ্যশাণিত, আবেগে-সংরাগে উচ্চকিত, জীবনার্থে স্বপ্নময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী, অস্তিত্ববিস্তারে সীমাহীন, রোমান্টিক অনুভবে প্রেম-সৌন্দর্য-মুগ্ধ এবং অচরিতার্থতা ও ব্যর্থতায় ছিলেন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী।'[১]

নজরুল ইসলাম মূলত রোম্যান্টিক কবি। রোম্যান্টিসিজম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী চেতনায়। নজরুল ইসলাম রোম্যান্টিসিজমের সদর্থক গুণগুলিকে আত্মস্থ করেছিলেন, তাই রোম্যান্টিসিজমের গভীরতর রূপটি তাঁর কাব্যে সমধিক প্রকাশিত। বস্তুত, রোম্যান্টিকপ্রেরণা পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে মানবীয় আদর্শে করেছে মহীয়ান। নজরুল 'একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য' নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রোম্যান্টিক অনুভবে তিনি প্রত্যাশা করেছেন সুষম সুন্দর কল্যাণময় সমাজ। তাই তিনি বিদ্রোহ করেছেন অন্যায় অসত্য আর অসুন্দরের বিরুদ্ধে; কবিতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, সামন্তপ্রথা শাস্ত্রাচার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। নজরুলের আশ্চর্য বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সমগ্র জাতিকে লোকপুরাণের সোনার কাঠির স্পর্শে মুহূর্তেই উজ্জীবিত করেছে, করেছে সন্দীপিত। অত্যাচার উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীপুরুষ হিসেবে, স্বাধীনতার সপক্ষে মুক্তি-আন্দোলনের তূর্যবাদক সেনানী হিসেবে, সর্বোপরি নিপীড়িত মানবতার কবি হিসেবে তিনি হয়েছেন নন্দিত, পেয়েছেন বরমাল্য।

'অগ্নিবীণা' (১৯২২) নজরুল ইসলামের প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামূহিক অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার-আকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক আলোড়ন উদ্দীপনার পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে আলোচ্য কাব্য। পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সচেতন ভারতবাসী যখন অবতীর্ণ হয়েছে কঠিন সংগ্রামে, ঠিক তখনি 'অগ্নিবীণা'-য় বিদ্রোহের সুরমূর্ছনা তুললেন নজরুল। সমগ্র জাতি মুহূর্তেই জেগে উঠলো বিদ্রোহীর উচ্চকণ্ঠ আহ্বানে, বিদ্রোহী কবি অভিধায় নজরুল হলেন অভিনন্দিত। বস্তুত, 'অগ্নিবীণা' নজরুলের প্রাতিস্বিক কবিচৈতন্যের সামূহিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশক। ভাবপরিমণ্ডল, জীবনার্থ এবং প্রকরণ প্রকৌশলে 'অগ্নিবীণা' বাংলা কাব্যধারায় এক সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ।

বিদ্রোহ চেতনা

ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্তমূল্যবোধ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহীরূপে 'অগ্নিবীণা' কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন নজরুল। রোম্যান্টিক অনুভববেদ্যতায় মানবতার সপক্ষে তিনি উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী; সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের আকাঙক্ষায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে এবং জীর্ণ–সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যে অনুপ্রবেশের পূর্বে আমরা নজরুলমানসের এই বিদ্রোহীসত্তার স্বরূপসন্ধানে উদ্ধৃত করতে চাই তাঁর কয়েকটি অভিমত,

ক. আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত যদি লাথি মারতে পার, তা হ'লে ভগবানও তা বুকে করে রাখে। ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভাগবানও তোমার পায়ের ধূলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবীণা, বাজাও দামামা–দুন্দুভি! বল, যে যায় যাক সে, আমি আছি। বল আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থরথর ক'রে কেঁপে উঠুক! বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরওনা বিদেশীরও না।[২]

খ. পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।
আর এই বিদ্রোহ করতে হ'লে –সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে–

আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ।[৩]

গ. আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি,—মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, —আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—তার জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার

উপর অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।[৪]

ঘ. আমরা অবিনশ্বর। আমাদের একজন যায়, একশ' জন আসে। আমাদের একবিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে একলক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশু বসুমতী বিদীর্ণ ক'রে উঠে আসে। আমরা অদম্য। আমাদের একজন বাঁধা পড়লে একশ' জন ছাড়া পায়, সহস্র ভুজগ ছুটে এসে তার স্থান পূর্ণ করে।
আমরা দেশ-শত্রু বিভীষণের মহাকালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ! পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা তক্ষক হয়ে, সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করি। আমাদের বিদ্রোহ যারা দেশ জয় করেছে তাদের উপর নয়, আমাদের বিদ্রোহ দেশদ্রোহীদের উপর।[৫]

—স্পষ্টতই লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নজরুলমানসের বিদ্রোহীসত্তার মৌলচারিত্র হয়েছে উন্মোচিত। পরাধীনতার গ্লানিতে নজরুলচিত্ত দীর্ণ হয়েছে, এবং এই গ্লানি থেকে মুক্তির অভিলাষে তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। তবে, কেবল দেশের স্বাধীনতাকামনাতেই তাঁর বিদ্রোহীচিত্তের তৃপ্তি ছিলনা--তাঁর বিদ্রোহ ছিল একাধারে ভাববাদী ও বস্তুবাদী। তাঁর বিদ্রোহ ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার, সকল আইন-কানুনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ, ইতিহাসনিন্দিত চেংগিসের মতো নিষ্ঠুরের জয়গানে মুখর, ভৃগুর মতো ভগবানের বুকে পদাঘাত-উদ্যত, মানবধর্ম-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প, ধ্বংসের আবাহনে উচ্ছ্বসিত, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় উদ্বেলিত।[৬]

'অগ্নিবীণা' কাব্যে নজরুল ইসলাম কবিতাকে স্থাপন করেছেন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন বাস্তবতার জটিল আবর্তে। কবিতা তাই হয়ে উঠেছে সামাজিক দায়িত্বপালনের শাণিত আয়ুধ। 'অগ্নিবীণা' কাব্যে নজরুলের বিদ্রোহচেতনার মাঝে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ক. অসত্য অকল্যাণ অমঙ্গল এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ;
খ. স্বদেশের মুক্তির জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এবং
গ. কবির শৃঙ্খল-পরা 'আমিত্ব'কে মুক্তি দেয়ার জন্য বিদ্রোহ।

বস্তুত, নজরুলের বিদ্রোহীমানসতার মাঝে এই ত্রয়ীধারাই সক্রিয় থেকেছে। সমালোচক, কখনো আবার, নজরুলের বিদ্রোহের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সীমাহীন নৈরাজ্য এবং হতাশা।[৭] কোন সমালোচক আবার সেখানে খুঁজে পেয়েছেন আধ্যাত্মচিন্তা।[৮] একথা অনস্বীকার্য যে, নজরুলের বিদ্রোহ দর্শন-পরিশ্রুত নয়; বরং তা একান্তই রোম্যান্টিকতাজাত।[৯] এই বিদ্রোহের উৎস স্রষ্টার আবেগ-উদ্বেল চিত্ত, সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা-শাসিত কোন কবিহৃদয় নয়। তাই নজরুলের বিদ্রোহীসত্তার নানা মাত্রা আবিষ্কার করা সম্ভব।

নজরুলের বিদ্রোহীসত্তাকে যে-ভাবেই দেখা হোক না কেন, তা ছিল মূলত সৃষ্টিশীল। নৈরাশ্য হতাশা আর নৈরাশ্যবাদিতা কোনক্রমেই তাঁর কবিমানসকে আচ্ছন্ন করেনি। তাঁর বিদ্রোহ সৃষ্টিশীল বলেই তিনি ধ্বংসের মাঝে খুঁজে পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির আশ্বাস। অসুন্দরের মৃত্যু কামনা করে তিনি বরণ করেছেন চিরসুন্দরকে।

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? –প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন–জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে–বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে'–
ভেঙে আবার গ'ড়তে জানে সে চির-সুন্দর![১০]

বিদ্রোহকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য নজরুল ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যের স্মরণ করেছেন। এক ঐতিহ্য থেকে আরেক ঐতিহ্যে নজরুলের পদচারণার উদ্দেশ্য ছিল সমাজ বিনির্মাণের জন্য বিদ্রোহের সপক্ষে শক্তির সন্ধান করা। 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় তিনি দেবী চন্ডীর অসুরনাশিনী শক্তি আহ্বান করেছেন সামাজিক অসুর-শক্তিকে ধ্বংস করার বাসনায়। এখানেও ধ্বংস শেষে কবি কামনা করেছেন সৃষ্টির উল্লাস,

দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চন্ডী-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ!
শ্বেত-শতদল বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

[রক্তাম্বরধারিণী মা]

পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ নজরুলের কবিচেতনায় ধরা দিয়েছে শক্তির অফুরন্ত উৎস রূপে। 'মহররম' কবিতায় কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনীকে বিদ্রোহের সপক্ষ শক্তির উৎস হিসেবে কল্পনা করেছেন নজরুল। তাই বিদ্রোহের পথে এগিয়ে আসার জন্য ত্যাগধর্মে উদ্বুদ্ধ হতে যুব সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি,

ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা,–
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।

[মহররম]

একথা অনস্বীকার্য যে নজরুল ইসলাম বিদ্রোহ করেছেন অসত্য-অন্যায়– অকল্যাণ ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে—সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে।

সন্দেহ নেই, তাঁর বিদ্রোহ মানুষের প্রতি মানুষের কল্যাণবোধ থেকে উৎসারিত। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আমিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার মুক্তিপ্রত্যাশী। নবজাগরণের ফলে ধর্মশাসিত শৃঙ্খল-পরা মানুষের মুক্তি ঘটেছে, মুক্তি ঘটেছে মানুষের অবরুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের। 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি' এই নবজাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শিল্প-প্রতিনিধি। মহাকাশ ছাপিয়ে, ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে নজরুল হয়েছেন বিশ্ববিস্তারী—আমিত্বের অহঙ্কারে নিজেকে উন্মোচিত করেছেন এই প্রত্যয়দীপ্ত চরণগুচ্ছে,

আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!
আমি চির বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

[বিদ্রোহী]

'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'শাত-ইল্-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'আগমনী' প্রভৃতি কবিতায় কবি বিদ্রোহের সপক্ষে তারুণ্যশক্তির উদ্বোধন কামনা করেছেন। 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার' কবিতায় কবি অসীম সাহসিকতা ও ত্যাগের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন বিদ্রোহীর আবির্ভাব প্রত্যাশায়। যেমন, 'আনোয়ার' কবিতায়,

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও -নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার!

[আনোয়ার]

কাজী নজরুল ইস্লামের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার মূলীভূত প্রেরণাশক্তি রোম্যান্টিকতা। রোম্যান্টিকতার অন্তর্প্রেরণায় তিনি কখনো উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী। কখনো-বা গেয়েছেন প্রেম-সৌন্দর্যের গান। তাঁর কবিপ্রতিভায় বিদ্রোহ ও প্রেম মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে– সৃষ্টি হয়েছে এই অসামান্য চরণ, 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্য।' উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নজরুলের এই বিদ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রোম্যান্টিকচেতনারই এপিঠ-ওপিঠ বিদ্রোহ আর প্রেমভাবনা। বস্তুত, নজরুলের বিদ্রোহচেতনা ও প্রেমভাবনা অন্তরসম্পর্কে একে অপরের পরিপূরক। 'অগ্নিবীণা'র উদ্দাম বিদ্রোহই 'সিন্ধু-হিন্দোল'–'চক্রবাক' কাব্যে রোম্যান্টিক কবিপ্রতিভার দ্বিবিধ মানসপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়--একদিকে অনুধ্যেয় সৌন্দর্য, প্রেমের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং এর ব্যর্থতায় হতাশা-পরাজয়-যন্ত্রণা ও স্বপ্নলোকে পলায়ন; অপরদিকে থাকে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার দুর্জয় সংগ্রাম ও বিদ্রোহ।[১১] এই দু'ধারাতেই নজরুলের অনায়াস বিচরণ বাংলা কাব্যধারায় তাঁর প্রাতিস্বিকতার পরিচয়বাহী।

পুরাণ ও ঐতিহ্যস্মরণ

'অগ্নিবীণা' কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব বিদ্রোহ, আর এই বিদ্রোহের সপক্ষে শক্তিসঞ্চয়ের বাসনায় নজরুলের ইতিহাস–ঐতিহ্য-পুরাণস্মরণ। ইতিহাস-ঐতিহ্য সমকালীন জীবনচেতনার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বিকীরণ করতে পারে নতুন অর্থ, নবতর তাৎপর্য।[১২] সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার যাদুস্পর্শে সংরক্ত সমকালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে অতীত ঐতিহ্য লাভ করে পুনর্জন্ম। মিথ বা পুরাণ সুপ্ত অবস্থায় প্রত্নপ্রতিমা রূপে বিরাজ করে মানুষের সামূহিক নির্জ্ঞানে।[১৩] ঐতিহ্যের মতো পুরাণও কবিপ্রতিভার জিয়নকাঠির স্পর্শে সমকালের সঙ্গ সংলগ্ন হয়ে বিদ্যুৎদীপ্তিতে হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। পুরাণের স্তরীভূত আবরণে সমকালীন জীবনযন্ত্রণার অভিঘাত তুলে কবি নতুন করে আবিষ্কার করেন পুরাণের সুপ্ত সম্ভবনা।[১৪] বস্তুত, আধুনিক মানুষ পুরাণস্মরণের মাধ্যমে পেতে পারে জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থের সন্ধান।[১৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী অবক্ষয়, বিপর্যয় ও শূন্যতার পটভূমিতে জীবনের পরমার্থ আবিষ্কারে নজরুল সচেতনভাবে স্মরণ করেছেন ঐতিহ্যিক পৌরাণিক নানা চরিত্র ও অনুষঙ্গ। অবরুদ্ধ বর্তমান থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় মিথের জগতে মহৎ কবিচৈতন্যের এই প্রত্যাবর্তন–প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়,

> These considerations of the role of myth in great poetry of the post may throw some light upon the Predicament of the poet and the unpromising estate of the poetry in our non-mythological present. The poet of today– and by that I mean the poetic impetus in all of us today–is profoundly inhibited by the dearth of shared consciousness of myth.

'অগ্নিবীণা' কাব্যে নজরুলের অন্যতম স্বাতন্ত্র্য এই যে, ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য ব্যবহারে তিনি অর্জন করেছেন সমান সাফল্য। নান্দনিক ঐকান্তিকতায় এবং জৈবসমগ্র ঐক্যসূত্রে দুই ভিন্ন উৎসের শিল্প উপাদান 'অগ্নিবীণা' কাব্যে সৃষ্টি করেছে মূর্ছনার একক সুর। এ–সূত্রে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নজরুলের ঐতিহ্যিক–উত্তরাধিকার প্রসঙ্গটি। উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় নজরুল ইসলাম ছিলেন ঋদ্ধিশালী।[১৭] নজরুল জন্মসূত্রে ভারতীয়, তাই ভারতীয় উত্তরাধিকারকে তিনি আপন উত্তারাধিকার বলেই জেনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ধর্ম–সূত্রে তিনি ছিলেন পশ্চিম এশীয় তথা ইসলামের অতীত গৌরব এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তিনি সচেতনভাবেই উভয় ঐতিহ্যকে লালন করেছেন আপন কবি সত্তায়। তাই একই কবিতায় ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সার্থকভাবে তিনি মেলাতে পেরেছেন পশ্চিম এশিয়ার অতীত ইতিহাস; যে হাতে তিনি লিখেছেন শ্যামা-সঙ্গীত, সেই হাত দিয়েই লিখতে পেরেছেন গজল আর ইসলামী গান।

সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যচেতনা বাংলা কাব্যে নজরুলের প্রাতিস্বিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-

নির্দেশক। সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যচেতনার এটাই অন্যতম লক্ষণ যে, তা অতীত ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সৃষ্টি করে নব-প্রতিনব ঐতিহ্য, ঐতিহ্যিক উপাদান আর পৌরাণিক চরিত্রের ঘটে নবজন্ম। নজরুলের ঐতিহ্যসাধনা ইতিহাস আর পুরাণের অন্ধ অনুকরণ নয়; বরং ঐতিহ্যের অবয়বে তিনি স্থাপন করেছেন সমকালের জীবনভাষ্য, পুনর্মূল্যায়নের আলোয় তা বিকিরণ করেছে নতুন ব্যঞ্জনা।[১৮] নজরুলের সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যচেতনা সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য এখানে স্মরণীয়,

> ঐতিহ্যের লঙ্ঘন তিনি করেননি–, পুরাতন পুঁথিসাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত বলে বাঙলার বিপুল মুসলমান কৃষক–সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সহজ আত্মীয়তা। ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে।[১৯]

নজরুলের পুরাণ ও ঐতিহ্যসচেতনতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে 'অগ্নিবীণা' কাব্যে। নজরুল তাঁর কবিতায় পুরাণ ব্যবহার করেছেন একদিকে ঔপনিবেশিক সমাজকে ভাঙার উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে সেই ভাঙনের মধ্য দিয়েই নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়। এক্ষেত্রে নটরাজ শিব এবং দুর্গার চিত্রকল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর পুরাণস্মরণের দ্বৈত-উদ্দেশ্য। কেননা শিব এবং দুর্গা–দুটি পৌরাণিক চরিত্রেই আছে ধ্বংস ও সৃষ্টি যুগল-অনুষঙ্গ। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় শিবের নটরাজমূর্তির চিত্রকল্পে নজরুল উপস্থাপন করেছেন তাঁর মানসআকাঙ্ক্ষা,

> দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
> আলো তার ভরবে এবার ঘর।
> ....
> ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
> বধুরা প্রদীপ তুলে ধর্!
> কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর!
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
>
> [প্রলয়োল্লাস]

'বিদ্রোহী' কবিতায়ও আছে এই শিব-স্মরণ। শৈব-মিথিক অনুষঙ্গে এখানে কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন বিদ্রোহের আগুন, সৃষ্টির উল্লাস,

> আমি ধূর্জটি, আনি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
> আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী–সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
> ....
> আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
> বল বীর
> চির-উন্নত মম শির।
>
> [বিদ্রোহী]

যেমন নটরাজ শিব, তেমনি আদ্যাশক্তি দুর্গাও উদ্দীপ্ত করেছে নজরুলকে, দুর্গার

ধ্বংস-সৃষ্টির যুগলসত্তায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর অন্বিষ্ট। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' এবং 'আগমনী' কবিতায় আছে দুর্গার চণ্ডীরূপ, আছে তার সৃষ্টিশীলতার অনুষঙ্গ। সমকালীন অবক্ষয় এবং বিপন্নতা অতিক্রমের বাসনায়, অপশক্তি-ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষায় দুর্গার দ্বৈতসত্তা স্মরণ করেছেন নজরুল। পুরাণের দুর্গা সমকালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বিকিরণ করেছে নতুন ব্যঞ্জনা–

দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ -স্তূপ!
শ্বেত-শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

[রক্তাম্বরধারিণী মা]

'আগমনী' কবিতার সূচনায় নজরুল এঁকেছেন দুর্গার ধ্বংসাত্মক চিত্র, অত:পর সৃষ্টিশীলতার অনুষঙ্গ। যুবসমাজকে বিদ্রোহের সপক্ষে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন নজরুল—তাঁর এই বিদ্রোহ যেমন ধ্বংসাত্মক, তেমনি একই আধারে সৃষ্টিশীলও বটে। তাই অসুরনাশিনী চণ্ডীর সমূহ ধ্বংসযজ্ঞের ওপর তিনি কামনা করেছেন দুর্গার শারদীয় কল্যাণী মাতৃরূপ,

ভুলে যাও শোক–চোখে জল ব'ক
শান্তির --আজি শান্তি–নিলয় এ আলয় হোক।
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক!
মা'র আবাহন–গীত চলুক।
দীপ জ্বলুক!
গীত চলুক!!
আজ কাঁপুক মানব–কলকল্লোলে কিশলয়সম নিখিল ব্যোম!

[আগমনী]

'কামাল পাশা', 'আনোয়ার','শাত্-ইল্-আরব', 'খেয়াপারের তরুণী', 'কোরবাণী', 'মহর্‌রম' প্রভৃতি কবিতায় নজরুল ইসলাম পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন শক্তির উৎস-সন্ধানে। 'কোরবাণী' কবিতায় যুবসমাজকে বিদ্রোহীসম্ভব করে তোলার মানসে তিনি তাদের আহ্বান করেছেন হযরত ইবরাহীমের ত্যাগধর্মে উদ্বুদ্ধ হতে,

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য–গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।
জোর চাই, আর যাচ্‌না নয়,
কোরবাণী–দিন আজ না ওই?

বাজ্‌না কই? সাজ্‌না কই?
....
আজ আল্লার নামে জান্‌ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
[কোরবাণী]

'মহর্‌রম' কবিতায় কবি মহর্‌রমের শোককে শক্তিতে রূপান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল বিশ্বাস করেন, শোককে শক্তিতে পরিণত করতে পারলেই দেশের মুক্তি হবে ত্বরান্বিত। তাই তাঁর আহ্বান,

ফিরে এলো আজ সেই মহর্‌রম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
[মহর্‌রম]

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন জনজীবনসম্পৃক্ত কবি; তাই তাঁর ঐতিহ্যবোধও ছিলো জীবনসম্পৃক্ত। অতীত ঐতিহ্যকে তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি, বরং সৃষ্টি করেছেন নতুন ভাবে, নতুন জীবনভাবনায়। ব্যাপক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন বলেই নজরুল একই সঙ্গে ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-অনুষঙ্গ ব্যবহারে অর্জন করেছেন পরম সিদ্ধি।

শব্দচেতনা

বিষয়ভাবনা এবং জীবনার্থের মতো, শব্দব্যবহারেও 'অগ্নিবীণা' কাব্যে প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন নজরুল। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের পরে শব্দ ব্যবহারে ব্যক্তিগত রূপসজ্জার প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি নজরুল ইসলামের কবিতায়। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রেরণায় নয় বরং আবেগের প্রাবল্যে নির্বাচিত হয়েছে তাঁর শব্দমালা। কোনরূপ বিচার-বিবেচনার দাসত্ব স্বীকার না করে স্বাধীন স্ফূর্তিতে তিনি চয়ন করেছেন তাঁর প্রিয় শব্দরাজি। আমরা লক্ষ্য করি, 'অগ্নিবীণা' কাব্যে ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দের মধ্যে নেই কোন জাত বিচার। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত 'ভেদিয়া', 'ছেদিয়া', 'ভীম ভাসমান মাইন', 'ঠমকি ছমকি, 'হরদম ভরপুর মদ','তুড়ি দিয়া' ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যবন্ধ অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যে নজরুলের শব্দচেতনায় এখানেই স্বাতন্ত্র্য যে, তিনি ধ্বনিপ্রবাহের অনুগামী করে শব্দের মধ্যে নিয়ে এসেছেন প্রবল জীবনাবেগ। শব্দব্যবহারের এই নতুন পরীক্ষা আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশকে সদর্থকমাত্রায় করেছে প্রভাবিত।

শব্দ ব্যবহারে নজরুলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বাংলা কাব্যে তিনি একটি নিজস্ব কবিভাষার জনয়িতা। রৈবিকস্বাতন্ত্র্যের পর বাংলা কাব্যে তিনি যথার্থ অর্থেই নির্মাণ করেছেন একটি নতুন কবিভাষা। অভিধান-অন্তর্গত শব্দরাজিকে ব্যক্তিত্বের

আবেগে-সংরাগে বিমন্ডিত করেছেন তিনি; প্রচলিত শব্দরাজি তাঁর হাতের ছোঁয়ায় বিকিরণ করেছে নতুন অর্থ। নজরুলের কবি-চেতনার কুললক্ষণ উৎকীর্ণ হয়ে আছে 'অগ্নিবীণা'-র শব্দ-শরীরে। 'অগ্নিবীণা'র মুখ্য বিষয় বিদ্রোহ হলেও, নজরুলের কবিমানসের অন্যতম উপাদান প্রেম ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার অনুষঙ্গও আমরা লক্ষ্য করি আলোচ্য কাব্যে। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রবল বিদ্রোহের মাঝেও যে চরণগুচ্ছ ধারণ করে আছে নজরুলের প্রেম ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার বোধ, এ প্রসঙ্গে তা উদ্ধারণীয়,

আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!

আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর।

[বিদ্রোহী]

উপর্যুক্ত কবিতাংশের আবেগী শব্দরাজি বহন করছে নজরুলের প্রেমচেতনার পরিচয়। সমগ্র 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যাটার্নের ভেতরে এই স্তবকটি, স্বরগ্রামের তীব্র ব্যবধান সত্ত্বেও, কেবল আবেগের আন্তরিকতায় সুন্দরভাবে মিশে আছে। বিশেষ করে 'যৌবন-ভীতু পল্লীবালা' আমাদের অভিজ্ঞতাকে এক চকিত মধুর সৌন্দর্যবোধে আলোড়িত করে। এ কেবল কবির মুহূর্তের উপলব্ধি হয়ে থাকেনি, সমগ্র বৈষ্ণব কবিতার কিশোরীকে যেন বর্তমানের ভেতরে সংস্থাপিত করে আমাদের ইতিহাস-চেতনায় শিহরণ এনেছে। শব্দ এখানে কবির আবেগকে সঙ্গীতের দ্রুতগামিতা দান করেছে।[২০]

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য-সচেতনতা নজরুলের কবিভাষায় নিয়ে এসেছে প্রাতিস্বিক মাত্রা। বস্তুত, শব্দচেতনায় 'সেকুল্যারাইজেশন' নজরুলের কবিসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় পুরাণের নানা শব্দ ও চরিত্র তাঁর কবিতায় যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি সমগুরুত্বেই ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা অনুসঙ্গ-- তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশেই শিল্প-সার্থকতায় ব্যবহৃত হয়েছে আরবি-ফারসি শব্দ। কখনে কখনো একই স্তবকে, এমন কি একই চরণে ব্যবহৃত হয়েছে এই দ্বিবিধ উৎস থেকে চয়ন-করা শব্দরাজি। যেমন,

আমি সন্নাসী, সুর-সৈনিক
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,

আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দন্ড,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচন্ড।
[বিদ্রোহী]

—এখানে সন্ন্যাসী, গৈরিক, বজ্র, ওঙ্কার, পিনাক-পাণি, ত্রিশূল, ধর্মরাজের দন্ড, চক্র, মহা শঙ্খ, প্রণব-নাদ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে জৈবঐক্যসূত্রে মিলে গেছে বেদুঈন চেঙ্গিস, কুর্ণিশ, ইস্রাফিলের শিঙ্গা প্রভৃতি শব্দ।

'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আরবি-ফারসি শব্দের সাবলীল ব্যবহার। ইতঃপূর্বে সতোন্দ্রনাথ দত্ত এবং মোহিতলাল মজুমদার কবিতায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন আরবি-ফারসি শব্দ। তবে এ-ক্ষেত্রে বাংলা কবিতায় নজরুল নিয়ে এসেছেন নতুন মাত্রা। বক্তব্যের অনিবার্য প্রয়োজনে নজরুল ব্যবহার করেছেন—আরবি-ফারসি শব্দ। তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দরাজি প্রকরণসজ্জার স্থূল পরিসীমা অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে বাচ্যার্থের ব্যঞ্জনালোকে। তৎসম-তদ্ভব এবং আরবি-ফারসি শব্দের শিল্পিত ব্যবহার সঙ্গতির সুষমায় কখনো কখনো নিয়ে এসেছে ব্যঞ্জনার বিদ্যুৎদীপ্তি,

কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ী-মুখে সারি গান -লা শরীক আল্লাহ্।
[খেয়া পারের তরণী]

—কবিতার প্রয়োজন, আবেগের রূপায়ণে বাংলা শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের এই অপূর্ব মেলবন্ধন নজরুলের কবিভাষায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নজরুল বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আরবি-ফারসি বা ভারতীয় পুরাণ-আশ্রয়ী শব্দরাজি ব্যবহার করেননি, বরং আবেগের দাবিতেই তাঁর কবিতায় প্রযুক্ত হয়েছে ওইসব শব্দ। সার্বজনীন অনুভূতি প্রকাশের জন্য নজরুল তৎসম-তদ্ভব-দেশী এবং আরবি-ফারসি শব্দ সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। শব্দ ব্যবহারে নজরুলের কৃতিত্ব হলো—নতুন হোক পুরাতন হোক, দেশী হোক বিদেশী হোক—শব্দের সঙ্গীতধর্ম ও ধ্বনিগুণ ব্যবহারে তিনি ছিলেন অসাধারণ কুশলী শিল্পী।

অলঙ্কার ও চিত্রকল্প

'অগ্নিবীণা' কাব্যে অলঙ্কার ও চিত্রকল্প নির্মাণে প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন নজরুল। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের সাহায্যে নজরুল প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিআত্মার বাসনা। অলঙ্কারের তুলনায় 'অগ্নিবীণা' কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার অনেক বেশী। তবে যে সীমিত অলঙ্কার রচিত হয়েছে আলোচ্য কাব্যে, তাতেই ধরা পড়েছে নজরুলের স্বাতন্ত্র। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'অগ্নিবীণা' কাব্যের অধিকাংশ উপমা-উৎপ্রেক্ষা আবেগধর্মী, কল্পনাপ্রসারী গুণ এবং ব্যঞ্জনার মাধুর্যে অলঙ্কারের সীমানা

পেরিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে চিত্রকল্পে। 'কামাল পাশা' কবিতায় শহীদ সৈনিকের শোকাকুল বধূর বেদনাকে প্রকাশ করতে কবি ব্যবহার করেছেন সন্ধ্যাকাশের রক্ত রং আবীর রঙ-এর সন্ধ্যাটাই যেন সৈনিক বধূর বিষণ্ণতার চিত্ররূপ,

হৌ হৌ হৌ!
সত্যি তো ভাই! সন্ধ্যেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!
শহীদ সেনার টুক্‌টুকে বৌ লাল–পিরহান পরা,
স্বামীর খুনের ছাপ–দেওয়া,তায় ডগ্‌ডগে আন্‌কোরা!
[কামাল পাশা]

রং-এর ব্যঞ্জনা এবং আবেগের প্রসারতায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারটি এখানে উত্তীর্ণ হয়েছে চিত্রকল্পের সীমানায়। শহীদ সৈনিকের স্মৃতি তার বধূর চোখে ধরা দিয়েছে আর একটি উৎপ্রেক্ষায়, কল্পনাপ্রসারী গুণধর্মের স্বাতন্ত্র্যে সেটিও রূপান্তরিত হয়েছে চিত্রকল্পে,

কল্‌জে যেন টুক্‌রো–ক'রে কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের,–শিউরে ওঠে গা'টা।
আস্‌মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই
[কামাল পাশা]

'ধূমকেতু' কবিতায়ও উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে কবি নির্মাণ করেছেন চিত্রকল্প,

কচি শিশু-রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া ঝাল
আর বন্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া, এসিড, পটাস, মোন্‌ছাল,
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি
দাহ করি,
আর সৃষ্টিরে আমি চুষে খাই!
[ধুমকেতু]

'মহর্‌রম' কবিতায় সদ্যবিধবা সকীনার বেদনা–প্রকাশক উৎপ্রেক্ষাটিও সৃষ্টি করেছে চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা–

কেঁদে গেছে থামি' হেথা মৃত্যু ও রুদ্র
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র!
[মহর্‌রম]

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতোই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও মূর্ত অর্থাৎ ক্লাসিকধর্মী উপমা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের কবিপ্রেরণা রোম্যান্টিক, কিন্তু কবিতায় অলঙ্কার নির্মাণ-কৌশল ক্লাসিকধর্মী, বিশেষত উদ্দীপনামূলক কবিতায়।[২১] 'ধুমকেতু' কবিতায় এরূপ একাধিক উপমার সন্ধান পাই আমরা। মানুষের মনগড়া বিধাতার স্থবির রূপের বিনাশসাধনের উদ্দেশ্যে ভগবানের অসহায় রূপ নিম্নোক্ত

উপমায় উদ্ভাসিত হয়েছে

> কাল-বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার
> তখনি রক্ত শোষে না রে তার,
> দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্র চন্ড সুখে
> পুচ্ছ সাপটি' খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে;
> তেমনি করিয়া ভগবানে আমি
> দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী,
> ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি' পিশাচের হাসি
> এই অগ্নি-বাঘিনী আমি সে সর্বনাশী!
> [ধূমকেতু]

পৌরাণিক অনুষঙ্গ এবং পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাদান-আশ্রয়ে চিত্রকল্প রচনায় সবিশেষ সার্থকতার পরিচয় রেখেছেন, নজরুল। নজরুলের কবিতায় দৃশ্যরূপময় চিত্রকল্পের সংখ্যাই অধিক। তবে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পও তাঁর কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যাবে। যেমন,

ক. দুষ্‌মন লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্‌ মিল্‌,
[শাত্‌-ইল্‌-আরব]

খ. নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
[খেয়া পারের তরণী]

গ. ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপ্‌টা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
[প্রলয়োল্লাস]

ঘ. আজ আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া
ঐ শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া!
[আগমনী]

ঙ. আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলী প'রে,
আঁধার শাড়ী প'রবে এখন প'শবে যে তোর গোরের বাসর ঘরে!
[কামাল পাশা]

--এখানে প্রথম চিত্রকল্পত্রয় (ক, খ এবং গ) দৃশ্যরূপময়, চতুর্থ চিত্রকল্পটিতে দৃশ্যময়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘ্রাণময়তা, আর পঞ্চম চিত্রকল্পে কবির আবেগ চিত্ররূপময় হয়ে কল্পনায় সম্প্রসারিত হয়েছে কবরের চিরঅন্ধকার বর্ণচেতনায়। 'ক' সংখ্যক চিত্রকল্পে শত্রুর রক্তকে শাত্‌ ইল-আরব নদীর উর্মিমালার ঝিল্‌মিল্‌ চিত্রের মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। আলোচ্য চিত্রকল্পে উপমানের মধ্যে দৃশ্যময়তা, অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনা ও উপলব্ধির সূক্ষ্মতা সঞ্চার করেছেন কবি। 'খ' সংখ্যক চিত্রকল্পে কেয়ামত রাত্রির

ভয়াবহতা দৃশ্যময় করতে সাগরের উত্তাল উর্মিমালা এবং নটরাজ শিবের তান্ডব-নৃত্যের মাঝে কবি নির্মাণ করেছেন সাদৃশ্য। সামূহিক অবচেতনায় বিরাজমান শিবের তান্ডবে নৃত্যের উপমানচিত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকল্পটি কল্পনাপ্রসারী চারিত্রধর্মে হয়ে উঠেছে অনন্য। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতেও পাই কবির মানস-অভীপ্সা প্রকাশের বাহন হিসেবে নটরাজ শিবের নৃত্যাশ্রয়ী চিত্রকল্প। 'ঘ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে দেবী দুর্গার আগমন–লগ্নে বাংলার শরৎপ্রকৃতির অহঙ্কার শিউলিফুলের সৌরভকে কবি ধারণ করতে চেয়েছেন ঘ্রাণচেতন চিত্রকল্পে। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে রক্তাক্ত সন্ধ্যাকাশ আর জমাট রক্তের টুকরো কালো কলিজা থেকে কবির কল্পনা সম্প্রসারিত হয়েছে কবরের কালো আঁধারে–কল্পনাপ্রসারী মাধুর্য এবং মননদ্যোতক ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে চিত্রকল্পটি হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট।

নজরুলের কবিপ্রেরণার মৌলধর্ম রোম্যান্টিকতা। রোম্যান্টিক মানসপ্রবণতার আন্তরধর্মে তিনি কখনো বিদ্রোহ করেছেন, কখনো-বা প্রেম ও সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় উচ্চারণ করেছেন রক্তিম বাসনা। 'বিদ্রোহী' কবিতার উদ্দাম বিদ্রোহের মাঝেও নজরুল প্রকাশ করেছেন তাঁর আবেগ-উষ্ণ মানস আকাঙ্ক্ষা,

> আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
> চিত– চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
> আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন,
> আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন–চুড়ির কন কন্।
> আমি চির-শিশু, চির-কিশোর
> আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
>
> [বিদ্রোহী]

–উপর্যুক্ত কবিতাংশ আবেগের লাবণ্যে, কল্পনার মাধুর্যে রূপান্তরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে উত্তীর্ণ হয়েছে সার্থক চিত্রকল্পে।

আধুনিক কবিতায় মানুষের মগ্নচেতনার অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যয় এবং সামূহিক নির্জ্ঞান মিথ আকারে চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে।[২২] 'অগ্নিবীণা'র অনেক চিত্রকল্পে আমরা আধুনিক কবি-চৈতন্যের এই প্রবণতা লক্ষ্য করি

'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী' প্রভৃতি কবিতায় আমরা পুরাণ-আশ্রিত বহু সার্থক চিত্রকল্পের সন্ধান পাই। এসব কবিতায় সমকালস্পর্শী মানসপ্রবণতার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে মিথের ঘটেছে পুনর্জন্ম। তবে, উল্লেখ করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে নটরাজ শিবই নজরুলের মিথ-বলয়ের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর মর্মকোষ ও অস্তিত্বমূল উৎসারিত অভীপ্সার প্রত্নপ্রতিমা।[২৩] 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় তাই দেখি, একের পর এক শিব–আশ্রিত চিত্রকল্প নির্মাণ করছেন নজরুল,

> ক. আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,

সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল!
[প্রলয়োল্লাস]

খ. দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন–কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
[ঐ]

গ. দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
[ঐ]

–প্রথম উদ্ধৃতিতে 'প্রলয় নেশার নৃত্য-পাগল' অনুসঙ্গে আমাদের অবচেতন অভিজ্ঞানে দৃশ্যময় হয়ে ওঠে শিবের ধ্বংসাত্মক তান্ডবনৃত্যের নটরাজমূর্তি। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে শিবের 'নয়ন-কটায়' 'বহ্নিজ্বালা' এবং 'ত্রস্ত জটা'র অনুষঙ্গে চিত্রিত হয়েছে ঘনায়মান প্রলয়। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে প্রলয় শেষে শিবের সৃষ্টিশীল সত্তায় জাগরণের প্রসঙ্গ শিশু চাঁদের আলোর অনুষঙ্গে হয়েছে রূপময়। ধ্বংসের শেষে সুষম সুন্দর সমাজনির্মাণের জন্য নজরুলের মানস–আকাঙ্ক্ষা তৃতীয় চিত্রকল্পে হয়েছে অভিব্যঞ্জিত। চিত্রকল্পের শরীরে মুখরিত হয় কবির গুঢ়তম সত্তা[২৪] পরম প্রত্যাশা—উপর্যুক্ত চিত্রকল্পসমূহের মাধ্যমে আমরা লাভ করতে পারি নজরুলমানসের গূঢ়তম অন্তর্সত্তার পরিচয়।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আকরম হোসেন বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (ঢাকা, ১৯৮৫) পৃ, ৬৭

২. কাজী নজরুল ইসলাম 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', নজরুল-রচনাবলী প্রথম খন্ড (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃ. ৬৭৩

৩. কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'র পথ', নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭

৪. কাজী নজরুল ইসলাম 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ.৭২২

৫. কাজী নজরুল ইসলাম 'বিষ-বাণী', নজরুল–রচনাবলী, পূর্বোক্ত,৬৯৩

৬. কবীর চৌধুরী 'নজরুল–কাব্যে বিদ্রোহের স্বরূপ', নজরুল-সমীক্ষণ (সম্পাদক-মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), (ঢাকা, ১৯৭২), পৃ. ১৫৫

৭. আতাউর রহমান, কবি নজরুল (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃ.৪৫

৮. কাজী আবদুল ওদুদ 'কবি নজরুল ইসলাম', নজরুল-সমীক্ষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

৯. সুশীলকুমার গুপ্ত, নজরুল-চরিতমানস (কলিকাতা ১৯৭৭), পৃ. ১০৮

১০. কাজী নজরুল ইসলাম 'প্রলয়োল্লাস', 'অগ্নিবীণা', নজরুল-রচনাবলী, পূর্বোক্ত। বর্তমান প্রবন্ধে 'অগ্নিবীণা', কাব্যের উদ্বৃতিসমূহ নজরুল-রচনাবলীর পূর্বোক্ত সংস্করণ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

১১. সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১২. T.S. Eliot 'Tradition and the Individual talent' in Twentieth Cecntury Criticism: The Major Statements (Editor-william J. Handy of Max westbrook), New Delli, 1974) p. 29

১৩. Northrop Frye: 'The Archetypes of Literature' In Twentieth Centurry Criticism: The Major statements, ibid p.240

১৪. Richard Chase: 'Notes on the study of Myth' in Twentieth Century Criticism: The Major statements, ibid p. 250

১৫. Northrop Frye: 'Myth, Fiction and Displacement' in Twentieth century Criticism: The Major statements ibid p, 164

১৬. Philip Wheelwright: 'Poetry, Myth, and Reality' in Twentieth Century Criticism: The Major Statement, ibid pp. 165-66

১৭. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, 'নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস' নজরুল-সমীক্ষণ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

১৮. রফিকুল ইসলাম 'কাজী নজরুল ইসলামঃ জীবন ও কবিতা' (ঢাকা,১৯৮২)পৃ. ৩১৭

১৯. হুমায়ুন কবিরঃ 'বাঙলার কাব্য' (কলিকাতা, ১৩৬৫), পৃ. ৯১

২০. আবু হেনা মোস্তফা কামাল 'নজরুল-কাব্যে শব্দ ব্যবহার' আবেগ-উদ্দীপনার-অনুষঙ্গ 'নজরুল' সমীক্ষণ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

২১. রফিকুল ইসলাম 'নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার' সাহিত্য পত্রিকা, (সম্পাদক, নীলিমা ইব্রাহিম) অষ্টাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (ঢাকা, ১৩৮১) পৃ. ১৩

২২. বার্ণিক রায় 'কবিতাঃ চিত্রিত ছায়া (কলিকাতা, ১৩৭৮), পৃ. ৩৪

২৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', পূর্বোক্ত , পৃ. ৬৭—৭১

২৪. অমলেন্দু বসু, 'সাহিত্যলোক' (কলিকাতা, ১৯৭), পৃ. ৪০.

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্দশ সংকলন]

সংবাদপত্রে নজরুল বিরোধী প্রতিক্রিয়া

তিতাশ চৌধুরী

১

বাঙলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন নজরুলকে যুগ-প্রবর্তক কবিরূপে আবিষ্কার করেন। আর বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'নজরুল সাহিত্যে নতুন যুগ এগিয়ে এনেছেন।'

এই 'নতুন যুগে'ও অনেক সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে। তবে সব পত্র-পত্রিকাই নজরুলকে সুনজরে দেখেনি। কোনো কোনো পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অশালীন, নগ্ন এবং দুর্ভাগ্যজনক। এর মধ্যে ইসলাম দর্শন, মোসলেম জগৎ, ছোলতান, মোসলেম দর্পন, বঙ্গনূর, মোহাম্মদী, প্রবাসী ইত্যাদি অন্যতম। মোটকথা, তৎকালীন দু'চারটি পত্রিকা ছাড়া বাদবাকিগুলির ভূমিকা খুব সুখকর ছিল না। একদিকে ইসলামী তাহ্‌জীব-তমদ্দুনপুষ্ট পত্রিকা, অন্যদিকে প্রবাসী আশীর্বাদ পুষ্ট শনিবারের চিঠি নজরুলকে বিচিত্রভাবে লাঞ্ছিত ও তাক্‌ বা টারগেট করার চেষ্টা করেছে।

ডক্টর মুস্তফা নূরউল ইসলাম-এর কথা প্রসঙ্গত এখানে স্মরণ করা যায়। তিনি বলেন, 'সেই ১৯২২ থেকেই 'ইসলাম–দর্শন' পত্রিকায় নজরুল-বিরোধী জেহাদ ঘোষিত হয়। সে জেহাদ-অভিযানে সকলে যোগ দেয়, গোঁড়া ইসলামবাদী মহলের পত্র-পত্রিকা-'মোসলেম জগৎ', 'মোসলেম দর্পন', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী' ইত্যাদি। তীব্র কটুবাক্যে নজরুলকে আক্রমণ করে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হল— 'লোকটা মুসলমান না শয়তান', 'ইসলাম বৈরী মুসলমান কবি', 'কাজীর কেরদানী', 'এছলাম ও নজরুল সাহিত্য'। অন্যদিকে 'নজরুল–বিরোধিতার সর্বাত্মক অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিল 'প্রবাসী' কর্তৃপক্ষপুষ্ট' 'শনিবারের চিঠি'। ১৯২৪ থেকে সে বিরোধিতার সূত্রপাত, এবং কয়েক বৎসর ব্যাপী তা অব্যাহত থাকে। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। —নজরুলের সাহিত্যাদর্শ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে ছিল 'শনিবারে চিঠি'র আক্রমণ।' (সমকালে নজরুল ইসলাম, ম.স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৩। পৃষ্ঠাঃ এগার–তের।) এবং এ-ভাবেই দুই বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নজরুলকে লড়তে হয়েছিল।—তাঁর সময়ে ও কালে। 'শনিবারের চিঠি'র বিরোধিতার কথা এই মুহূর্তে বাদ দিলেও ইসলাম-দর্শন, মোসলেম জগৎ, বঙ্গনূর, মোহম্মদী, নওবাহার প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকার কথা উল্লেখ প্রয়োজন।

'প্রয়োজন' এ-কারণে যে, তৎকালীন মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকাগুলি কিভাবে তীব্রভাবে-খাড়াভাবে এবং ভয়ংকরভাবে ইসলামের নামে নজরুলকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছিল তা আজ ভাবতেও কষ্ট হয়। মূলত নজরুলের প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ এবং সম্পাদিত পত্রিকা 'ধুমকেতু' নিয়েই মুসলমান সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রিকা তুমুল হৈ চৈ শুরু করে। নজরুলকে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার সাপেক্ষে এইসব পত্রিকা তাঁর (নজরুলের) কৃতকর্মের জন্য অনবরত তাঁকে গালাগালি— যেমন কাফের, ফেরাউন, নমরুদ, শয়তান, খোদাদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী,ধর্মজ্ঞানশূন্য বুনো বর্বর, কুলাঙ্গার, আজাজীল ইত্যাদি ছাড়াও তাঁকে এক নম্বরের ইসলামের শত্রুরূপে গণ্য করেছিল। সুতরাং তৎকালীন ইসলাম ভাবাপন্ন পত্রিকাগুলি নজরুলকে কিভাবে নাজেহালও পর্যুদস্ত করেছিল তার একটি জীবন্ত চিত্র এখানে তুলে ধরাই আমার এই নিবন্ধের মৌল প্রতিপাদ্য।

২

ইসলামপন্থী একটি বিশেষ গোষ্ঠী নজরুলকে প্রথম থেকেই গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে নজরুলকে ইসলামের শত্রুরূপেই সর্বত্র চিত্রিত করেছে। এর কিছু নজির পাঠকদের কৌতূহল-নিবৃত্তি মানসে এখানে হাজির করছি।

'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২৯ সালের সংখ্যায় 'ধূমকেতু' শিরোনামে জনাব সায়েদুল ইসলাম লেখেন,

> ইহা বাঙ্গালার কুশিক্ষিত তরুণ-তরুণীর চির-চঞ্চল চিত্তাকাশ-বিচরণকারী একখানি অর্ধ সাপ্তাহিক ব্যঙ্গপত্র। অর্থাৎ শ্লেষ-বিদ্রুপ, ঠাট্টা, তামাশা, স্বেচ্ছাচার ও অনাচারের একটি জীবন্ত অপগ্রহ। তবে নাম-মাহাত্মে 'ধূমকেতু'র এই নব অবতার ধর্ম ও নীতিদ্রোহিতায় এবং দেশ সমাজের অনিষ্টকারিতায় প্রকৃত ধূমকেতু হইতেও অধিক ভয়ঙ্কর।

'ধূমকেতু' সম্পর্কে ইসলাম দর্শন পত্রিকার এটিই শেষ কথা নয়। ইসলাম দর্শন পত্রিকার কার্তিক, ১৩২৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়,

> ইসলাম-দর্শনের গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা অমঙ্গলের অগ্রদূত 'ধূমকেতু' ও উহার স্বেচ্ছাচারী 'সারথি'র সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনীতি বিবর্জিত 'ধূমকেতু'কে সতর্ক ও সংযত করা।
>
> কিন্তু তাহার পর হইতে 'ধূমকেতু'র ধর্মদ্রোহিতা এবং উহার স্বেচ্ছাচারিতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, -'রক্তাম্বরধারিনী মা' ও 'ভৃগু বন্দনা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মা ভৈঃ' 'ব্যোম কেদার ব্যোম ভোলানাথ' 'হল বলরাম স্কন্ধে, 'বোল হরি-হরি বোল' প্রভৃতি কোফরী কালাম তাহার মুখ দিয়া অনর্গল এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে, আমরা বাধ্য হইয়া ভাবিয়াছিলাম, হাবিলদারের এরূপ উৎকট অবতারকে সমালোচনা করিয়া সংযত করিবার চেষ্টা করা পন্ডশ্রম মাত্র।.... কিন্তু দুষ্ট 'ধূমকেতু' ও উহার দুর্বিনীত সারথি এখন কেবল হিন্দু পুরানের চর্বিত চর্বনে ক্ষান্ত না থাকিয়া পবিত্র

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরা-শরীয়তের উপব পর্যন্ত শয়তানী আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান সমাজ চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

ইসলাম দর্শন পত্রিকার একই সংখ্যায় 'মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ' এর 'লোকটা মুসলমান শয়তান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে বলা হয়,

> যখন 'ধূমকেতু' প্রথম উদয হয়, এবং বসরা-প্রত্যাগত উদ্দাম যুবক 'হাবিলদাব' কাজী নজরুল ইসলামকে উহার 'সারথী' বলিয়া জানিতে পারি, তখনই বুঝিয়াছিলাম, 'ধূমকেতু' মোসলেম গগনে প্রকৃত ধূমকেতু রূপেই উদয় হইতেছে। 'মোসলেম ভারতে'র 'বিদ্রোহী' কবিতায়ই কাজীর কাবামৎ জাহির হইয়াছিল। তারপর 'ধূমকেতু' প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে গরল উদগীরণ করিতেছে। এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখাব পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুযানী মাদ্দায় ইহাব মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ ...
>
> নবাধম ইসলাম ধর্মেব মানে জানে কি? খোদাদ্রোহী নবাধম নাস্তিকদিগকেও পবাজিত কবিয়াছে। সে খোদাতালাকে বাম, কৃষ্ণ, বা নানক, চৈতন্য কিংবা বাইবেলেব সদাপ্রভু পাইযাছে কি যে, তাঁহার 'পিলে চমকিয়ে' দেওয়া হইবে? লোকটা শযতানেব পূর্ণাবতার। ইহাব কথা আলোচনা কবিতেও ঘৃণা বোধ হয়। দুর্মতি তারপর মোটা মোটা হরফে ছাপিযাছে-'ইসলামেব বিশেষত্ব তলোযার; দাড়িও নয়, নামাজ-বোজাও নয়।.....
>
> একটা ধর্মজ্ঞানশূন্য বুনো বর্ববেব নিকট, অকাট মুর্খের নিকট আব কি আশা কবা যাইতে পাবে? কলমের মুখে যাহা আসিতেছে, তাই লিখিতেছে।

খাঁটি ইসলামী আমলধারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ কবা হইত বা উহার মুন্ডুপাত করা হইত নিশ্চয় ইত্যাদি। ইসলাম দর্শন পত্রিকা অপেক্ষা মোসলেম জগৎ, মোসলেম দর্পন ও সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর ভূমিকাও কম কঠিন-কঠোর ছিল না। নজরুলকে এ-পত্রিকাগুলিও কম গালি দেযনি।

' মোসলেম জগৎ'-এর ১৫ই জুলাই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যার এক সম্পাদকীয নিবন্ধে বলা হয়,

> 'আত্মশক্তি'র ১২ই আষাঢ় সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের 'ইন্দ্রপতন' নামে একটি কবিতা বাহির হইয়াছে। কবিতাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্দেশে লিখিত।.........'ইন্দ্রপতনে' ইসলাম ধর্মের প্রতি, ইসলাম ধর্মগুরু জগৎ-পূজ্য হজবত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি নজরুল মারাত্মক বিসদৃশভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। —নজরুল! তোমার লেখনীকে অভিসম্পাৎ, তোমাব কবি-প্রতিভাকে শত সহস্র ধিক্কার।' ইত্যাদি।

' মোসলেম দর্পণে'র ভূমিকাও এ-ক্ষেত্রে কম উজ্জ্বল নয়। আগস্ট, ১৯২৫ সালের মোসলেম দর্পনে 'ইসলাম-বৈরী মুসলমান কবি' শিরোনামে বলা হয়,

> 'আত্মশক্তি' পত্রিকার ১২ই আষাঢ় তারিখের সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের 'ইন্দ্রপতন'

> নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।. ... . আমরা এই কবিতা পাঠে যার পর নাই মর্মাহত হইয়াছি। কারণ তিনি যে গুরুতর স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্মজ্ঞানহীনতা ও বিবেকশূন্যতার পবিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান মাত্রই ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। .. ..'ইন্দ্রপতন' কবিতায় যে ধর্মেব অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে,—তাহাতে কবি নজরুল ইসলাম সমগ্র মুসলমান সমাজের নিকট অপরাধী'। ইত্যাদি।

অন্যদিকে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র ২৭শে নভেম্বর ১৯২৫ সালের সংখ্যায় 'সাহিত্যে ব্যবসাদারী' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়—নজরুলকে ব্যঙ্গ ও হেয় করার উদ্দেশ্যে। তাতে বলা হয়,

> 'বিদ্রোহী'র কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাহেবের দু'খানা নূতন বইয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হয় একখানা 'পূবের হাওয়া' অপরখানি 'ছায়ানট'। আমি এই দুইখানি পুস্তকই কিনেছিলাম কিন্তু পুস্তক পড়ে তার কাব্য সৌন্দর্যে যতটা না মুগ্ধ হয়েছি, তার চেয়ে বেশী আশ্চর্যান্বিত হয়েছি কবির অপূর্ব ব্যবসাদারীতে। এই উভয় পুস্তকে একই কবিতা ছাপা হয়েছে—তাও দু'একটি নয়, বাইশটি –অবশ্য অন্য কবিতাও দুইখানা–কেতাবেই কিছু কিছু আছে। সাহিত্যে ব্যবসাদারী হিসাবে কাজী ছাহেবের নূতনত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।'

ইসলাম দর্শন পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩২ সালের সংখ্যায় জনৈক আবু নূর 'বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য ও সাহিত্যিক' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর সারা প্রবন্ধে নজরুলকেই টারগেট করা হয়েছে এবং নজরুলই তাঁর কুৎসা ও ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রবন্ধটিতে প্রসঙ্গত তিনি বলেন,

> নজরুল ইসলাম নামক হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের বাহবাপ্রাপ্ত জনৈক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের 'অগ্নিবীণা' এবং আরও কি একা খানি বই পড়িয়াছি। উক্ত দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে উহার লেখক একজন ধর্মদ্রোহী কুলাঙ্গার তাহা সহজেই বুঝিতেই পারা যায়। .... আমরা একাধিকবার বলিয়াছি–সত্য ও তথ্য ছাড়া ধর্মভাব বিবর্জিত, আধ্যাত্মিকতার আস্বাদশূন্য লেখা কখনো সাহিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।.... তাহার অধিকাংশ কবিতাই সত্য ও তথ্য ছাড়া গাঁজাখোরের ভাব, ভাষা ও ছন্দহীন অসংবদ্ধ প্রলাপ মাত্র।..... সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, হতভাগা ধর্মদ্রোহী পাষন্ড হজরত ইব্রাহীমের (আঃ) সঙ্গে মিঃ সি, আর দাসের এবং বিবি মরীয়মের সহিত চরিত্রহীনা বারাঙ্গনার তুলনা করিয়া এবং রোজা, নামাজ, হজ, যাকাত, কেতাব, কোরান, পীর পয়গম্বর সম্বন্ধে মরদুদ কাফেরের ন্যায় মুখে যা আসে তাই বলিয়া, অভিশপ্ত ইবলিস অপেক্ষাও পামরতার পরিচয় দিয়াছে। ইত্যাদি।

ইসলাম দর্শন-পত্রিকার ১৩৩৪-এর মাঘ সংখ্যায় শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'কাজীর কেরদানী' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে তাতে বলা হয়,

> কাজী নজরুলের প্রাথমিক বচনায় অনেক সময় ইসলামী ভাব পাওয়া যাইত। তারপর

> যখন তিনি 'বিদ্রোহী' সাজিয়া বিধাতার বুকে হাতুড়ী পিটিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় হইতেই মুসলমান সমাজ তাহাকে বর্জন করিয়াছে। এই স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতার অবতারটিকে অনেক হিন্দু কিছু দিন মাথায় করিয়া নাচিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল। তাই তিনি 'আমি কি হনু রে' মনে করিয়া ফুলিতে ফুলিতে একেবারে ঢোল হইয়া বসিয়াছেন।

অন্যদিকে 'মাসিক মোহাম্মদী', পত্রিকার ১৩৩৫ সালের কার্তিক সংখ্যায় জনৈক নজির আহমদ চৌধুরীর 'এসলাম ও নজরুল ইসলাম' শীর্ষক একই ওজনের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে বলা হয়,

> নজরুল ইসলাম বড় কবি কি ছোট কবি, যুগ-প্রবর্তক ভাবুক, কি কতকগুলি বঙ্গালা শব্দ-সমাস সম্বল গভীরতাহীন কথার কালোয়াৎ এ-সব আলোচনা করিব না..... যে কবিতাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার কবি স্ফূরণ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়—সেখানে তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব হইতেছে খোদাকে অস্বীকার করিয়া, অমান্য করিয়া, অপমান করিয়া। উদাহরণ স্বরূপ মুসলমান পাঠক-পাঠিকাগণকে কবির 'অগ্নিবীণা' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। খোদাতালার প্রতি অতি জঘন্য ভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তাঁহার এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। কবি সেখানে নিজের বিদ্রোহীরূপের পরিচয় দিতে দিতে মোছলেম বাঙ্গালার সম্মুখে যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন—কোন আজাজীলই আজ পর্যন্ত ততটা করিতে সাহসী হয় নাই।–এছলামের চোখে এ অপরাধ অমার্জনীয়। —বর্তমান যুগে তিনি যে এছলামের সর্বপ্রধান শত্রু তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত 'নওবাহার' পত্রিকার ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর, অসংযত এবং বেদনাদায়ক। ১৩৫৬ সালের 'মাঘ' সংখ্যার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে নজরুল সম্পর্কে বলা হয়,

> ... এমন কোন দেব-দেবী নাই যার বন্দনা–গান তিনি গান নাই। অবশ্য বহু আরবী ফারসী শব্দ এবং ইসলামী ভাবধারাও তিনি প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গৌণ, মুখ্য নহে। —দেব-দেবীদের বেলায়, তিনি আদৌ 'বিদ্রোহী' নন, তিনি 'বিদ্রোহী' শুধু খোদার বেলায়।

'নওবাহার' পত্রিকার ১৩৫৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার এক সম্পাদকীয় স্তম্ভে উল্লেখ করেন,

> ..আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, নজরুল অপেক্ষা ইসলাম বড়। যদি জানিয়া শুনিয়া কেহ সেই সব আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করে বা সমর্থন করে, তবে তাহা দস্তুর মতো ইসলামদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এবং এ-ভাবেই ইসলাম দর্শন, মোসলেম জগৎ, মোসলেম দর্পণ, মাসিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ইত্যাদি কাগজ কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছিল। তাঁকে এবং তাঁর বিচিত্র রচনাকে তীব্র কটু বাক্যে তুড়ি মেরে

উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। 'ইসলাম গেল গেল' জাহির করে বাঙলার জনগণের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইসলামপন্থী দলের পত্রিকার কোনো চেষ্টাই যে ফলবতী হয়নি তা কেবল আবুল কালাম শামসুদ্দীনের একটি আলোচনার মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

'কাব্যসাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান' শীর্ষক রচনাটি সওগাত–এর ১৩৩৩-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়,

> –এই যুগ-প্রবর্তক কবি–প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম। —মুসলমানদের মধ্যে একদল তাঁহাকে কাফেরের 'ফতোয়া' দিয়া তাঁহার পরকালের ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। আবার আরেক দল তাঁহার মধ্যে অনৈসলামিকতা আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন এবং তাঁহার লেখায় অতীত যুগের ইসলামী গৌরবের কোনো কথা থাকে না বলিয়া আফ্‌সোস করিতেছেন–
>
> কাজেই নজরুল ইসলামের কাব্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসলামিকতার ধোঁয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমরা প্রবৃদ্ধ কাব্য-উপভোগের 'ফল বলিয়া মনে করিনা, বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হই। তাঁহার কাব্যে যদি মানবতার মঙ্গল নিহিত থাকে এবং তাহার সৃষ্টিতে যদি কোন সত্যের আভাষ থাকে, তবে তাহাতে ধর্মের অনুশাসনের অনুরূপ কথা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।—
>
> নজরুলের কাব্যে এই সত্য -শিব–সুন্দরের সাধনা আছে কিনা, তাহাই শুধু বিচার্য; তাহাতে ইসলামের আদর্শ আছে কিনা, সে প্রশ্ন উত্থাপন নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। নজরুল ইসলাম মুসলমান; সুতরাং তাঁহার কাব্যে ইসলামের বিশিষ্টভঙ্গীর ছাপ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্য সমালোচক ঐ বিশিষ্ট ভঙ্গীর ছাপ না থাকিলেই তাঁহার কাব্যকে সরাসরি কাব্য সাহিত্যের আসর হইতে নামাইয়া দিতে পারেন না। তিনি তাঁহার কাব্যে সত্য-শিব-সুন্দরের অনুসন্ধান করিবেন।...
>
> নজরুল ইসলামের রচনায় ইসলামী প্রকাশভঙ্গী নাই বলিয়া যাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কথা যে সত্য নহে, ইহা যাঁহারা নজরুলের 'কামাল পাশা' 'আনোয়ার', 'শাতিল আরব', 'কোরবানী', 'মহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' প্রভৃতি কবিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। এমন ইসলামী প্রকাশভঙ্গীযুক্ত চমৎকার রচনা বাংলা সাহিত্যে আর নাই।----
>
> নজরুল ইসলাম বাংলার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙালী জাতি। সুতরাং এ-জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী ও হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশভঙ্গীরই ছাপ দিতে হইবে। নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের এই আলোচনায় যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, অকাট্য যুক্তি, মননশীলতা ও উদারনৈতিক মানসিকতার সুস্পষ্ট রূপ পরিস্ফুট হয়েছে– তা অন্যত্র দুর্লভ।

৩

নজরুলকে তাৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি করা নিয়েও বেশ কিছু লেখালেখি, সম্পাদকীয় মন্তব্য–এমন কি বাদ-প্রতিবাদ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। নজরুলকে জাতীয় কবি করতে হলে তাঁর লেখারও শুদ্ধিকরণ বা পাকিস্তানীকরণ দরকার। নজরুল বিরোধী পত্রিকা 'নওবাহারে'ই এ–সম্পর্কে বিচিত্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সম্পাদকীয় ইত্যাদি লেখা হয়। একই সঙ্গে নজরুলের লেখা কতটা পরিত্যাজ্য আর কতটা গ্রহণযোগ্য তাও বিচার -বিবেচনা করা হয়। এ-ক্ষেত্রে, বলতেই হয়, 'নওবাহার' পত্রিকার ভূমিকাই দুর্ভাগ্যজনকভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি গোলাম মোস্তফা 'নজরুল-কাব্যের অপরদিক' শীর্ষক এক নিবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন,

> নজরুলকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নজরুলের সবচেয়ে বড় অপবাদ যদি কিছু থাকে, তবে এই। নজরুল যা নয়, তাঁর উপর তাই আরোপ করিলে তাঁকে হেয় করা হয়।
>
> পাকিস্তানের কবি হওয়া দূরের কথা, নজরুল ছিলেন ঘোর পাকিস্তান বিরোধী। তিনি গাহিয়াছেন 'অখন্ড ভারতের গান', তিনি দেখিয়াছিলেন 'হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টির 'হরগৌরী' রূপ।........
>
> তিনি ছিলেন আগে ভারতবাসী, পরে মুসলমান। মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি যত কবিতা ও যত গান লিখিয়াছেন, সমস্তই ভারতী মার্কা। 'ভারত জননী'র জন্য সমস্ত দেব-দেবীর আহ্বান ও প্রশস্তি-গান তিনি গাহিয়াছেন।--
>
> আপন আপন জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের রূপায়নই ত কবি-সাহিত্যিকদের ধর্ম। কবি নজরুল ইসলাম এইখানে চরম পরাজয় জানিয়াছেন।-------
>
> ইসলামের আলোকে দেখিলে দেখা যায়, ইসলামের সনাতন আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা তাঁর কাব্যে আছে। পাকিস্তানের আলোকে দেখিলেও দেখা যায়, পাকিস্তানের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা তিনি বলিয়াছেন।
>
> [নওবাহার, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৭]

অন্যপক্ষে, মোহাম্মদ আরশাদ আলী (ইব্রাহীমপুরী) 'নজরুল প্রসঙ্গে' বলেন,

> আজ নজরুল-কাব্যের যে-ভাবে চর্চা চলেছে তা আমাদের পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক বা ক্ষতিকর তা দেখতে হবে আগে। –তাঁর কাব্যে পাকিস্তানের জন্য আদর্শ বা প্রেরণা কতখানি পাওয়া যেতে পারে, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে।------
>
> নজরুল কাব্যের পাকিস্তানী সংস্করণ বের করা এবং আদর্শহীন কবিতা যা আমাদের পক্ষে মারাত্মক তা ban করে দেওয়া।
>
> [নওবাহার, আশ্বিন, ১৩৫৭]

জনাব মোহম্মদ আরশাদ আলীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে মৌলানা আতহার আলীও 'নজরুল প্রসঙ্গে' বলেন,

> পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি, নজরুলের যে সব কবিতায় কুফর-কালাম আছে, তাহা যেন বাজেয়াফ্‌ত করিয়া আমাদিগকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেন।
>
> [নওবাহার, আশ্বিন, ১৩৫৭]

একই সংখ্যায় নওবাহারের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও বলা হয়,

> ....তাঁহারা চান নজরুল-কাব্যের শুদ্ধিকরণ।.....এ অবস্থায় নজরুল কাব্যের পাকিস্তান-সংস্করণ বাহির করিবার প্রস্তাব পুনরায় আমরা দেশবাসী ও পূর্ব পাক গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করি।

নজরুলের রচনা ছাঁটাই-বাছাই সম্পর্কে সবচেয়ে মারাত্মক লেখাটি তৈরি করেন কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর 'নজরুল কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ' রূপে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন,

> নজরুল কাব্যের পাকিস্তান সংস্করণ প্রকাশ করিবার যে প্রস্তাব আমরা করিয়াছি; বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। অনেক উকিল বন্ধুও জানাইয়াছেন যে, তাহাতে আইনঘটিত কোন বাধারই সৃষ্টি হইবে না। এখন প্রয়োজন হইবে ছাঁটাই করার। কোন্ পুস্তকে কোন্ অংশ বর্জনীয়, তাহাই এখন আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে--
>
> এ-প্রসঙ্গে কবি গোলাম মোস্তফার 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থের ছাঁটাই এর একটি নমুনা হাযির করি। 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থে মোট ১২টি কবিতা আছে। প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রনভেরী, শাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবাণী ও মোহররম। এর ১২টি কবিতার মধ্যে, গোলাম মোস্তফার কথায় '৭টি ইসলামী ভাবাপন্ন, বাকি (৫টি প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী ও ধূমকেতু) ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। কাজেই আমাদের মতে এ-গুলি বর্জন করিতে হইবে।
>
> [নওবাহার, কার্তিক, ১৩৫৭।]

'নওবাহার'-এর পাশাপাশি অন্যান্য দু'একটি পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। আজাদ, মাহেনও প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা বরাবরই উজ্জ্বল। নজরুলকে-নজরুলের সত্তাকে এই পত্রিকাগুলি যথার্থভাবে তুলে ধরেছে। যেমন,

> পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্যের ইঙ্গিত তাঁহার (নজরুলের) প্রতিভাই বহন করিয়া আনিয়াছিল।---পূর্ব পাকিস্তানের জবান কিরূপ হইবে, তার সুর কিরূপ হওয়া চাই তার নির্ভুল পরিচয় তাঁহার রচনায় রহিয়াছে। এই হিসাবে আমরা তাঁহাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় ভাবের সার্থক উদগাতা বলিয়া অভিনন্দন না জানাইয়া পারি না।
>
> [আজাদ, সম্পাদকীয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭]

পক্ষান্তরে আবদুল মওদুদও 'নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> ভারতের গোলামীর জিঞ্জীর ভেঙে ফেলবার জেহাদে নজরুল ছিলেন বাঙালী মুসলমানের চারণ কবি। আর এ কথায় সন্দেহ নেই যে, আত্মচেতনা, স্বাধিকারবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবীর পথে নজরুলেরই কলম ও কণ্ঠ বাঙালী মুসলমানকে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা দিয়েছে, উৎসাহ জুগিয়েছে। অতএব এই দুইদিক থেকে বিচার করলে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক নজরুলকে সানন্দে তাদের জাতীয় কবি হিসেবে বরণ করে নেবে বলেই আমার বিশ্বাস। [মাহে নও, কার্তিক, ১৩৫৭।]

মুজিবর রহমান খাঁও তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি' শীর্ষক রচনায় প্রায় একই কথা বলেন,

> কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ব-পাকিস্তানের আদি জাতীয় কবি বললে অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন এবং বলবেন–এ কেমন করে হয়? নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। ---সুতরাং নজরুল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলা যায় না। কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন, আর সমর্থন করুন–আসলে তাঁর লেখায় যাকে বলে পাকিস্তানবাদ, তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে।--- কবির পরিচয় তাঁর কাব্যেই ভাল করে পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম তাই সবচেয়ে ভাল করে ধরা দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায়। এখানে তাঁকে আমরা পাকিস্তানবাদের প্রথম সফল রূপকার হিসাবেই দেখতে পাই। নজরুল ইসলাম জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন–'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল/, ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।' এ-গানটি থেকে আর বিন্দুমাত্র ভুল হবার অবকাশ থাকে না যে, নজরুল ইসলাম মুসলিম জাতীয়তার চারণ-কবি। [মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৫১।]

৪

পাকিস্তান আমলে নজরুলকে জাতীয় কবি করা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় যতই বাক্-বিতন্ডা হোক না কেন বাস্তবে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কবির মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করা হয়নি। কেবল বাঙলাদেশ আমলে নজরুলকে আনুষ্ঠানিকভবে জাতীয় কবির মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করা হয়। বাঙলাদেশের কিছু সংখ্যক যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত সাহিত্যিক নজরুলকে নিয়ে যে-স্বপ্ন দেখে আসছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ একটি জাতির আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা স্বপ্ন-কল্পনা ও চিন্তা-চেতনা যাঁর কবিতা-গানে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে ও গল্প-উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়–তিনিই কেবল জাতীয় কবির শিরোপা অর্জন করতে পারেন। স্বীকার করতেই হয় নজরুলের কবিতা-গান ও অন্যান্য রচনায় বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্খা ও ধ্যান-ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ প্রয়োজন নজরুল বেড়ে ওঠার কালে ইসলাম দর্শন, ইসলাম দর্পন, মোসলেম জগৎ, বঙ্গনূর, ছোলতান, মোহাম্মদী, নওবাহার প্রভৃতি কাগজ তাঁর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদে যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল কোনো জাতির সমসাময়িক

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

গোঁড়া ইসলামপন্থী কাগজগুলি নজরুলকে অনবরত তাক বা টার্গেট করার অভিপ্রায়ে লিপ্ত ছিল। মোটকথা, নজরুলের নানা খুঁত ও দোষ-ত্রুটি খোঁজাই যেসব পত্র-পত্রিকার মৌল উদ্দেশ্য অথবা নিন্দা বা কুৎসা রটানোই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁদের আর কোনো যুক্তি-তর্ক বিচার বিশ্লেষণের দরকার হয় না। যেমনটি বিখ্যাত কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেন,

> নিন্দা করাই যাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁদের আর কোনো ছল খুঁজতে হয় না। অতি আধুনিক পর্যায়ভুক্ত সকল রচনার মধ্যেই যে তাঁরা নিন্দার কারণ দেখতে পেতেন, তা নয়, কিন্তু দেখতে চান বলেই দেখতে পান। ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করবার জন্যই তাঁরা উন্মুখ, তাই অনিন্দ্যনীয় যে কিছু থাকতে পারে, এ–কথা তাঁরা আসলেই মানতে চান না
>
> [প্রগতি, চৈত্র ১৩৩৪।]

বস্তুত ইসলামপন্থী পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর উপর্যুক্ত কথাগুলি যে ষোলআনা সত্য এ কথা বললে বোধ হয় কোনো অত্যুক্তি করা হয় না।

মূলতঃ নজরুলের ক্ষেত্রে এ সব পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তা সত্ত্বেও, ওই কঠিন সময়ে নজরুল যে তাঁর আদর্শ, সত্য ও স্বপ্ন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি—এটাই ছিল সবচেয়ে আশার কথা। আর নজরুলের বিরুদ্ধে যাঁরা ব্যঙ্গ ও নিন্দা প্রচারণায় ব্যাপৃত ছিল পক্ষান্তরে তারা তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকেই বাড়িয়ে তুলেছিল বলে মনে হয়। এখানেই ছিল হয়তো নজরুলের জিৎ।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ত্রয়োদশ সংকলন]

প্রেমের কবিতায় নজরুলের বর্ণবৈচিত্র্য চিত্রশিল্পের দৃষ্টিতে

কাজী মোজাম্মেল হোসেন

মানব-মানবীর হৃদয়ের গভীরে যখন কোন অনুভূতির প্রাণসঞ্চালন ঘটে, তখনই তাকে প্রেম নামে আখ্যায়িত করা চলে। প্রেম হৃদয়ের অনুভূতিমাত্র, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিমূর্ত ভাবই এরমধ্যে বেশী প্রকাশ পায়।

নর-নারী পরস্পরগত আকর্ষণের প্রতিশব্দকেও প্রেম বলা যেতে পারে। প্রেমের অন্তর্গূঢ় রহস্য একমাত্র প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরের কাছেই একান্ত ভাবে জ্ঞাত। স্রষ্টার সৃষ্টির মৌল প্রেরণাও কিন্তু প্রেম। প্রেমের শাব্দিক অর্থ যদি আকর্ষণ বলে ধরে নেয়া যায়, তা' হলে সে আকর্ষণ এ'নিখিল সৌরজগতের প্রতি গ্রহ-উপগ্রহ, এমন কি গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্ট প্রতি অণু-পরমাণু পর্যন্ত, একে অপরের সাথে প্রেমের বন্ধনে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

জীবনের গভীরতম অনুভূতিপ্রকাশ একমাত্র প্রেমের মধ্যদিয়েই সম্ভব। প্রেম, তা ব্যক্তিপ্রেমই হোক বা বস্তুপ্রেমই হোক-শিল্পীর শিল্প উপকরণের প্রধান কাঁচামাল। শুধু আঁকিয়ে শিল্পীর কেন, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, সবার কর্মপ্রেরণার যোগানদাতাও 'প্রেম'।

প্রেম কখনো একা পথ চলে না। সাথে নিয়ে চলে বিরহ-ব্যথা-বেদনা। প্রেমানুভূতি সাময়িক, কিন্তু বিরহ-বেদনার আবেগ দীর্ঘস্থায়ী।

প্রেমের কবিতা রচনায় নজরুল একজন বড় মাপের কবি, একজন সার্থক কবি একথা বলার অপেক্ষা করেনা। গল্প, উপন্যাস সহ বহু বিদ্রোহী কবিতা নজরুল লিখলেও প্রেমের কবিতায় তাঁর জুড়িমেলা ভার। প্রেমের কবিতায় মিষ্টি-মধুর রঙ ব্যবহার, প্রিয়ার রূপ বিন্যাস, অপূর্ব চিত্রকল্প তৈরীতে নজরুল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। জীবনের গভীরে প্রবেশ করে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা কবি অর্জন করেছেন, তা দিয়ে প্রেমের কবিতা রচনা করে মানব মনে স্থায়ী আসন রচনা করেছেন প্রেমিক কবি নজরুল।

সব শিল্পের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, যেমন আছে চিত্রকলার। নীরব ভাষায় একজন চিত্রকর আপন মনের ভাবকল্পনা–অনুভূতি, রঙ-রেখা দিয়ে প্রকাশ করে

চলেছেন যুগ যুগ ধরে। চীন দেশে প্রচলিত একটি ইংরেজী উক্তি থেকে এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে,

One picture is worth more than ten thousand words'

শিল্পী রঙ-তুলি আর ক্যানভাসকে উপকরণ করে ছবি এঁকে আপন মনের ভাব-কল্পনায়, প্রেম-বিরহের সার্থক রচনা যেমনি সবার সামনে উপস্থিত করে আনন্দ পান, নজরুলও ঠিক তেমনি একজন দক্ষ চিত্রকরের মতো হৃদয়ের গভীর আবেগ অনুভূতিগুলো শব্দ আর ছন্দের সুন্দর উপকরণে, রঙ তুলির কোমল পরশে একের পর এক বর্ণময় করে তুলেছেন তাঁর প্রেমের কবিতা সমূহে। আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন কবি নতুন নতুন সৃষ্টিতে। পাঠকও অভিভূত হয়েছেন কবির প্রেমের কবিতার স্বকীয় উপলব্ধি, অনুভব, সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতার পরিচয় পেয়ে।

তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্টের অর্থ সত্যের প্রকাশ (Execution of truth)এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চির মঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশ হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।[২]

আর্ট সম্পর্কে নজরুলের উপরোক্ত উক্তিটি সত্যি সুন্দর। সত্য প্রকাশ আর্টের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য। যিনি সুন্দরভাবে সত্যকে যে কোন মাধ্যমে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, নজরুলের মতে তিনিই একজন বড় শিল্পী।

নজরুল একজন সৎকবি। তিনি নিজের-ধ্যানে যাকে সত্য বলে অনুভব করেছেন, তাকে প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করেন নি। 'রাজবন্দীর জবানবন্দীতে' নজরুল বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

> আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেয় আমি বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।[৩]

> বাহিরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বা আপন মনের ভাবনা-বেদনা কল্পনাকে যে লেখক—অনুভূতি স্নিগ্ধ ছন্দবদ্ধ, তনুশ্রী দান করতে পারেন, তাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি।[৪]

নজরুল-মানসের বর্ণময় অদ্ভুত সৃষ্টির সাক্ষাত মেলে তাঁর প্রেমের কবিতায়। তাঁর প্রেমের প্রতিটি কবিতায় যেমনি পরশ মেলে কবির অন্তরের অন্তরতম গভীর অনুভূতি, তেমনি মেলে বহুল বর্ণমিশ্রিত প্রেমের সুন্দর চিত্রকল্প। আধুনিক কালেও কবির প্রেমের কবিতাগুলো সকল পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে অনুভূতি জাগাতে অনন্য।

নজরুল-মানসের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে তাঁর প্রেমের কবিতা সমূহে। মানব মনের যথার্থ প্রকাশই চিত্রকলা, কবিতা-শিল্প, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও একই,

> যেহেতু সাহিত্য ও ললিত কলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ এজন্য তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ।

প্রেমের কবিতা রচনায় নজরুল এক অসাধারণ কবি প্রতিভার অধিকারী। প্রেম বা প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতাবলীতে নজরুলের হৈ চৈ ও চড়া গলার সুর, খুবই কম। এখানে কবি আশ্চর্যভাবে রসনিমগ্ন। তাঁর কোন কবিতাই কল্পনাক্লিষ্ট বলে মনে হয় না। ঘর্ম-বিন্দুর পরিচয় নজরুলের কোন কবিতাতেই পাওয়া যায় না। কবির প্রতিটা কবিতায় রয়েছে কবিতা-প্রীতি ও আবেগের পরিচয়। একটা সহজ-উচ্ছ্বাস ও মধুর রসোচ্ছলতা তাঁর কবিতাগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় 'ইমপ্রেশনিজম্'-এর স্বাদ মেলে। ফরাসী চিত্রশিল্পে সর্বপ্রথম ইমপ্রেশনিজম্ রীতির প্রচলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে। পরে তা' সংক্রমিত হয়ে নজরুলের কবিতায়ও পরশ দেয়। ইমপ্রেশনিজম্-এর মূলতত্ত্ব হল, চৈতন্যের অবদমন শক্তি শিথিল করে দিলে, মগ্ন চৈতন্যের নানা উপাদান চেতনার স্তরে ভেসে ওঠে। এ সব উপাদান নির্বিচারে কবিতায় স্থান দিয়ে রচিত হয় ইমপ্রেশনিস্টিক কবিতা।

নির্জ্ঞানের নিয়মহীন রাজত্বের উপাদান ব্যবহারের ফলে কবিতা হয়ে পড়ে ভাষা–ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘনকারী এবং মননগ্রাহ্য আকারহীন। এ'চিত্রকল্পগুলো শব্দের আভিধানিক অর্থের সীমানা ছাড়িয়ে এক রহস্যালোকের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে। ফলে অতিসাধারণ বস্তু যার স্বাভাবিক বিষয় কখনো রহস্যাবৃত হয়ে, কখনো ভয়ংকর রূপে, কখনো আবেগ উদ্দীপ্ত আকার নিয়ে, পাঠক মনের সজ্ঞান বিচার বুদ্ধিকে ধাক্কা দেয়।

আঁকিয়ে শিল্পীদের মতে 'ইমপ্রেশনিজম্' হল– দৃশ্যের দর্শনে তাঁদের অন্তরে প্রত্যাভিজ্ঞতার পূর্বে যে চকিত সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি হয়, তাকেই শিল্পে রূপদান করতে হবে। খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে, ছবির বিষয় বস্তুর আকার সংক্ষেপ করে, বাইরের কাঠামোকে যথাযথ রূপ না দিয়ে, বস্তুরূপ-রঙ শিল্পের অস্তিত্বের সংবেদন স্তরে যে ছাপ রেখে যায়, তার আভাস থাকবে ইমপ্রেশনিষ্টিক চিত্রকলায় ইমপ্রেশনিজম্ তত্ত্বের আরও সহজ ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায়,

> চারপাশের বস্তু বিশ্ব সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত কোন ধারণার সাহায্য না নিয়ে রূপ রঙে বস্তুটি যে ভাবে দেখেন, শিল্পী তাকেই রং–আলোছায়া সমেত এঁকে বসিয়ে দিতে চান। এইজন্যই এদের ছবিতে খণ্ডাংশগুলি বা রঙের ভিন্ন ভিন্ন ছোঁয়াগুলির কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, সবটা মিলিয়ে দেখলে একটা সামগ্রিক আবেদন উদ্ভাসিত হয়।[৮]

যেমনটি দেখছি, তেমনটি আঁকব না । যেমনটি জানি, তেমনটি আঁকব। ইমপ্রেশনিস্টিক চিত্রকলার শিল্পীদের এটাই মূলমন্ত্র। তাঁদের মতে, উপলব্ধিই হল শিল্পের সবচাইতে বড় উপাদান। ফলে দৃশ্য-এর চেয়ে 'দ্রষ্টা' বড় হয়ে ধরা পড়ে ইমপ্রেশনিস্টদের চোখে।

নজরুলের বহু প্রেমের কবিতায় এহেন উপলব্ধি-বোধের উপাদান বিদ্যমান। নজরুল তাঁর কবিতায় প্রিয়াকে যেমন দেখেছেন, তাঁর হুবহু বাস্তব প্রতিকৃতি কবিতার রঙে আঁকেন নি। বরং তিনি তাঁকে যেভাবে অনুভব করেছেন, সে অনুভূতির এক বর্ণময় সুন্দর চিত্রের দর্শন মেলে তার প্রেমের কবিতায়। ফলে ইমপ্রেশনিস্টিকের ছোঁয়া তাঁর কবিতায় লেগেছে, এটা স্পষ্ট করে বলা চলে। 'মানস বধু' কবিতায় কবির ইমপ্রেশনিস্টিক ভাব লক্ষণীয়,

সিঁথির-বীথির খ'সে পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙ্গুর চোয়ায়।

ছন্দ গেঁথে মানুষকে ঘুম পড়িয়েছেন বাংলার অনেক কৃতি কবি, কিন্তু ঘুমন্ত, অসাড় জীবনকে জাগিয়ে তোলার এমন অগ্নিময় মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন একমাত্র নজরুল। নজরুল তাই বিদ্রোহী–চিরবিদ্রোহী। সমাজ–সংস্কার এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এমন তেজোদীপ্ত ভাষায় বিদ্রোহ করতে শোনা যায়নি পৃথিবীর কোনো বিদ্রোহীকে। সেদিক দিয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে নজরুল শ্রেষ্ঠ।[৭]

প্রাথমিক অবস্থায় কবি নজরুল আমাদের কাছে ধরা দেন 'বিদ্রোহী' কবি হিসেবে। বাংলার অগ্নিযুগের পুরোহিত, 'অগ্নিঋষি' কাজী নজরুল ইসলামকে, 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থই বিদ্রোহীর আসনে উপবিষ্ট করিয়েছে। তাঁর কবিতায় অগ্নি-বাণী ধ্বনিত হলেও হৃদয়-বীণায় ছিল মধুর আবেগ। ফলে কবির বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকৃতই কোন বিদ্রোহী-বাণী বহন করেনি। এর আরও সুন্দর প্রমাণ মেলে কাজী আব্দুল ওদুদ 'নজরুল' প্রবন্ধে 'বিদ্রোহী' কবিতার ভাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে,

কবির প্রায় ২৩ বৎসরের বিপুল সাহিত্য সাধনার উপর চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকৃতই কোন বিদ্রোহ-বাণীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনা–এক অদ্ভুতপূর্ব আত্মবোধ–সেই আত্মবোধের প্রচন্ডতায় ও ব্যাপকতায় কবি উচ্চকিত প্রায় দিশাহারা।[৮]

নজরুল–মানসে বিদ্রোহ ছিল। প্রচলিত রাজনীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, রীতি–নীতি, সংস্কার ইত্যাদি সব কিছুর বিরুদ্ধেই তিনি সর্বদা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ'সব প্রতিবাদ বিদ্রোহের লক্ষণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা'বলে তাঁর একমাত্র পরিচয় যদি বিদ্রোহী হয়, তা'হলে তাঁর কবি প্রকৃতির প্রতি খুব সুবিচার করা হবেনা বলে আমার

বিশ্বাস।

নজরুল বিদ্রোহী কবি, এটা তাঁর খণ্ড পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতার প্রধান উপকরণ 'প্রেম'। এর আরও জোরালো উক্তি মেলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বিদ্রোহী প্রেমিক' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে,

> নজরুল ইসলামকে তো আমরা অনেকদিন ধরে এই খণ্ড-পরিচয়ে জানলুম। এখন খুব স্পষ্ট গলায় বলা দরকার যে, বিদ্রোহ তাঁর কবিতার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয়। তাঁর কবিতায় আর একটি প্রধান উপাদান ভালবাসা। তাঁর মতন এতটা জোরালো রোল তুলে সম্ভবতঃ আর কেউ কখনও বিদ্রোহের দামামা বাজাননি। ঠিক কথা। কিন্তু প্রেমের-কথাই বা তাঁর মতন এমন মধুর গলায় আর ক'জন কবি বলতে পেরেছেন? অনেকের ধারণা বিদ্রোহী কিংবা যোদ্ধার গলায় প্রেমের কথা ঠিক মানায় না। খুবই ভুল ধারণা। যোদ্ধারাই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রেমিক।[৯]

কবি নজরুলের নামের পূর্বে 'বিদ্রোহী' শব্দটা এখন একটা নামের ভূষণ বলেই মনে হয়। এ যথার্থতা মেলে ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তের উক্তিতে,

> বিদ্রোহী কবিতাটি সেকালে এতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে এই বিশেষণটি এখনো নজরুলের নামের পূর্বে ভূষণের মতো শোভা বর্ধন করেছে।'[১০]

নজরুল যে প্রেমের কবি, তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর বর্ণময় প্রেমের কবিতার চিত্রকল্প সমূহে। প্রণয়ের স্বভাব সম্পর্কে অধ্যাপক আলী আশরাফ সুন্দর মন্তব্য করেছেন। যা নজরুলেরও হৃদয়ের কথা। অধ্যাপক আলী আশরাফের মতে,

> যাকে ভালবাসা যায়, তাকে দেবী মনে হয়। মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। উচ্ছলতা, উচ্ছ্বাস এবং সর্বস্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি এই প্রণয়ের স্বভাব।[১১]

নজরুলের প্রেমের কবিতায় এ'উক্তির সার্থকতা মেলে। তাঁর প্রেমের কবিতায় রয়েছে প্রকৃতি এবং মানবীয় প্রেমের গভীর অনুভূতির ছাপ। নজরুলের সুগভীর ও প্রত্যয়োজ্জ্বল মানব প্রেম, তাকে প্রেমের কবিতা লিখতে বাধ্য করেছে। তিনি তাঁর প্রেমের কবিতায়, প্রেমিকাকে দেবী রূপে আখ্যায়িত করেছেন। কবি তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে পূজা করেছেন প্রেয়সীর। কবির কাছে প্রেমলীলা, দেবপূজারই সামিল ছিল। এরই ফলে নজরুলের লেখনিতে জন্ম নিয়েছে 'পূজারিণী'-র মত প্রেমিকার আহাজারির সুন্দর বর্ণবহুল চিত্রকল্পের।

চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধ'রে মোর অনাদৃতা সীতা!
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস বালিকা
.....যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছে ভালো,
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!

(পূজারিণী)

নজরুলের সৃষ্ট প্রেমের কবিতায় বর্ণবহুল অঙ্কিত চিত্রাবলীর চরিত্রগুলো একান্ত ভাবেই মানবিক। তাঁর প্রেমের কবিতায় নায়ক-নায়িকারা কখনো প্রেম-প্রফুল্ল, কখনো বিরহ যন্ত্রনায় কাতর, কখনো ধূলিমলিন, কখনো শিশিরস্নাত। এদের প্রেম আছে, বিরহ আছে, মিলন আছে, আছে বিচ্ছেদ। নজরুলের প্রেমের কবিতায় এতসব অনুভূতির মধ্যেও রয়েছে মানবীয় প্রেমের এক অসাধারণ বর্ণচ্ছটা। যা দিয়ে তিনি যেমনি তাঁর কবিমানস সাজিয়েছেন, তেমনি রাঙিয়ে তুলেছেন তাঁর শিল্পী মানসের বিরাট ক্যানভাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে নজরুল বিদ্রোহী কবি নন, প্রেমের কবি। তাঁর 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যে একটা অন্যতম সিম্বলিক কবিতা তাতে সন্দেহ নেই। যার মূলে কাজ করেছে তাঁর অপ্রতিহত দুর্দান্ত পৌরুষ, উদ্দাম উন্মুক্ত হৃদয়াবেগ।

এ'কবিতায় কবি উচ্চারণ করেছেন 'মহা প্রলয়ের 'আমি নটরাজ','আমি ধূর্জটি', 'আমি সাইক্লোন', 'আমি সৃষ্টি', 'অমি ধ্বংস', 'আমি রৌদ্র রুদ্ররবি', 'আমি দাবানল-দাহি, দাহণ করিব বিশ্ব' ইত্যাদি বিদ্রোহাত্মক বিশেষণসমূহ। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, একই কবিতায় এত বড় বিদ্রোহের পরিকল্পনার পাশে–'আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন', 'আমি চপল মেয়ের ভালবাসা', তার কাঁকন চুড়ির কন্ কন্', বাণীসমূহে বিদ্রোহের প্রতীক–কল্পনার সামান্যতম আবেগ পর্যন্ত নেই। বরং সেখানে দেখা যায় বিরহ-কাতর এক প্রেমিক মনের কাকুতি মিনতির ধূসরবিষাদ ছায়া। দৃষ্টান্ত,

চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর্ থর্ থর্
প্রথম পরশ কুমারীর।
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল করে দেখা অনুখণ,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার
কাঁকন চুড়ির কন্ কন্

ভগবানের বুকে পদ-চিহ্ন এঁকে দেয়ার মতো দুরন্ত সাহসের যিনি অধিকারী তিনিই আবার কি'করে বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি হতে পারেন? ষোড়শীর হৃদপদ্মদল যেখানে উদ্দাম প্রেমের জোয়ারে কম্পমান, সেখানে বিদ্রোহীর বর্ণময় চিত্র অনুপস্থিত! ফলে বিদ্রোহী কবিতায় নজরুলকে আমরা পাই প্রেমিক কবি হিসেবে।

মানব-হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চালন, চিরন্তন সত্য। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে এ'সত্য আরও বেশী চিরন্তন হয়ে ধরা পড়ে তাঁদের সৃষ্টি কর্মে। প্রেমানুভূতির মধ্যদিয়ে একজন আঁকিয়ে এঁকে ফেলতে পারেন একটা মাস্টারপীস চিত্রকর্ম। কবি নজরুলের

প্রেমের কবিতায় এমনি বহু মাস্টারপীস কবিতার নজির বিদ্যমান, যার প্রেমানুভূতি যুগ যুগ ধরে অবিকল থাকবে।

বাল্মিকীর ক্রৌঞ্চমিথুন বিয়োগজনিত শোক-শ্লোক থেকে কবিতার জন্ম। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের অনেকেই কবির কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। বৈষ্ণব কবিরা দীর্ঘ পাঁচশত বছরের সাধনায়, বৈষ্ণব কবিতার যে ধারা সৃষ্টি করেন, তার মূল সুরও ছিল প্রেম।

ষষ্ঠদশ শতকের কবি দৌলত কাজী'র 'সতীময়না', এবং সপ্তদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী', যার মূল সুরও ছিল মানব-মানবীয় প্রেম।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় কবিদের প্রেমকাহিনীর উপর ভিত্তি করে আধুনিক কবিরাও প্রেমকে কবিতার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, কায়কোবাদ, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল এমনকি পল্লীকবি জসিমউদ্দিন-এর কবিতায়ও ধরা পড়েছে পূর্বসুরীদের মতো রাখালীয়া প্রেমের অদ্ভুত প্রেম কাহিনী।

তবে, বৈষ্ণবযুগ থেকে আধুনিক কালের কবি শামসুর রাহমানের কবিতার পর্যালোচনা করলে, জসিমউদ্দিনের পুর্ব পর্যন্ত যার কাব্য প্রেমের উষ্ণ পরশে পাঠক হৃদয়ে প্রেমানুভূতি জাগাতে বেশী সক্ষম হয়েছে, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।

ভাবতে অবাক লাগে, যার বাল্যকাল দুঃখে কেটেছে, যিনি 'দুখু মিয়া'[১২] বিশেষণে ভূষিত ছিলেন, সৈর্নিকের খাতায় নাম লিখিয়ে যিনি করাচীর উত্তপ্ত তাঁবুতে বাস করেছেন, যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখেছেন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ', 'আনন্দময়ীর আগমনে'র কবিতা লিখে রাজদ্রোহীর অভিযোগে জেলে যান, বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যাকে 'উম্মাদ'[১৩] বলে ডাকতেন, যিনি 'তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচতেন',[১৪] তাঁর মতো একজন বিদ্রোহী কবি-মানসের পক্ষে এতগুলো প্রেমের কবিতা কি করে সৃষ্টি হতে পারে!

প্রেম, মানবের সহজাত ধর্ম। নজরুলের ব্যক্তি প্রেমের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রেমের কবিতায় সুন্দর রূপ নিয়ে পাঠক মনে চঞ্চলতা.সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর প্রেমের কবিতায় কঠোর-কোমলের যে বৈপরীত্য, সে বৈপরীত্ব্যে তাঁর সৃষ্ট নারী অনন্যা। কোথাও সে হৃদয়-রাজ্যের একক সম্রাজ্ঞী, কোথাও বিরহ বিধুর-প্রিয়া, কোথাও মানস-বধু, কোথাও কম্পিতা-কুমারী, কোথাও মমতাময়ী মা।

নারী প্রেম, নজরুলের 'প্রেমের কবিতার' মূল উৎস। এ উক্তির জোরালো প্রমাণ মিলবে নিম্নোক্ত বাক্যসমূহে,

> নজরুল প্রেমের কবি। ধুলোমাটির তুচ্ছ মানুষের প্রেমই তাঁর সম্পদ। তাঁর সমস্ত

কবিতা রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যথায় ও কামনায় ভরপুর। যে ব্যথা তিনি পান নাই-সেই অপরূপ ব্যথার গান বিনাইয়া বিনাইয়া তিনি গান নাই। নিত্যকার মানুষ যে ব্যথা পায় কাঁদিয়া আকুল হয়-তাহারই ব্যথায় সিন্ধু মথিত করিয়া কবির কাব্য জন্ম নিয়াছে।[১৫]

নজরুলের প্রথম জীবনের লেখাগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তার অধিকাংশ লেখাই প্রেমের ব্যর্থতায় ভরপুর। যে বয়সের লেখায় উল্লাস, আনন্দ এবং চঞ্চলতায় ভরপুর থাকার কথা, সেখানে তার পরিবর্তে আমরা পাই হতাশাগ্রস্থ এক যুবক মনের পরিচয়। এর কারণ প্রথম যৌবনে ব্যক্তি প্রেমের ব্যর্থতা। এর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 'ব্যথার দান' গল্পের উৎসর্গপত্রের ছোট কবিতাটি,

মানসী আমার
মাথার-কাঁটা নিয়েছিলুম বলে
ক্ষমা করোনি,
তাই বুকের কাঁটা দিয়ে
প্রায়শ্চিত্ত করলুম।

নজরুল-মানসে প্রেমের উৎস খুঁজতে গিয়ে কবির কৈশোর জীবন, (৫ম শ্রেণী, ১৯১০) থেকে সেনাবাহিনীতে যোগদানের (১৯১৭) পূর্ব পর্যন্ত সময়ের প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, তার বেশীর ভাগ সময়টুকুই আমাদের অজানা। নজরুলের 'চিঠি' এবং 'সুন্দরী' কবিতা দু'টো ঠিক এর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। ফলে, কিশোর প্রেমের এক রোমাঞ্চকর বর্ণাভ চিত্রকল্প কবিতা দুটোর মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ কৈশোর-যৌবনের শুরুতেই কবি ভাললাগা ভালবাসার সিঁড়ি ভাঙ্গতে শুরু করেছিলেন। তবে কবির সে ভালবাসা সফলতার পরিবর্তে চরম ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল, এর প্রমাণ তার বহু কবিতার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবির কৈশোর প্রেমের সুন্দর অনুভূতির স্পষ্ট সমর্থন মেলে নিম্নের টুকরো অনুভূতির মাধ্যমে,

বিনু!
তোমার আমায় ফুল পাঠিয়েছিনু
মনে কি তা'পড়ে?
সে দিন সাঁজে নতুন দেখা বোশেখ মাসের ঝড়ে
আমবাগানের একটি গাছের তলায়
দুইটি প্রাণই দুলেছিল হিন্দোলেরই দোলায়?
[চিঠি]

সুন্দরী গো সুন্দরী
ঘরটি তোমার কোন দোরী?
সুন্দরী গো সুন্দরী!
কোন সে পথের বাঁকটিতে
কলসী নিয়ে কাঁখটিতে

থমকে যাও আর চমকে চাও
দুলিয়ে বাহু কুন্দরী?
[সুন্দরী]

সৃষ্টিশীল রচনার জন্য প্রয়োজন হৃদয়াবেগ—স্বতঃস্ফূর্ততা। হৃদয়াবেগ আপনা আপনি জাগেনা। হৃদয়-বীণার তারে আঘাত না করলে যেমনি কম্পনের সৃষ্টি হয়না, তেমনি সুরের মূর্ছনাও হয়না। আবেগ তৈরীর জন্য হৃদয়াঘাত হানতে হয়। সে আঘাত সুখেরও হতে পারে দুঃখেরও হতে পারে।

যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথেই নজরুল ব্যক্তিজীবনের সকল ব্যথা-বেদনা, হতাশা-বঞ্চনা ঝেড়ে মুছে, তাঁর ছন্নছাড়া মন খুঁজে পেতে চেয়েছিল এক নারীর অনাবিল প্রেম-প্রীতি, আর ভালবাসা। কবির কৈশোর-যৌবনের সংসার বিমুখ মন খুঁজে ফিরছিল সংসারের সাথে একটা আপোষ মিমাংসা। এখান থেকেই প্রেমিক নজরুলের প্রেমের আর এক নতুন অধ্যায় শুরু। এ অধ্যায়ের অনবদ্য প্রকাশ, তাঁর যৌবনের শেষসীমা থেকে বার্ধক্যের পূর্বসীমার সকল কবিতা।

প্রেমিক নজরুলের প্রেমের নতুন অধ্যায়ের নায়িকা সৈয়দা খাতুন, ওরফে নার্গিস আসার খানম। নার্গিসের স্মৃতিভরা বিশাল ক্যানভাস কবি নানা রঙ-এ এমন ভাবে রাঙ্গিয়ে রেখেছেন যার মাধ্যমে কবি আজও সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন।

সেনাদলের বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে যাবার পর (১৯২০), বাইশ বছরের যুবক নজরুল কোলকাতার ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে প্রথম আস্তানা গাড়েন। 'ভিশতি বাদশাহ্', 'বাবর' প্রভৃতি নাটকের লেখক কুমিল্লাবাসী আলী আকবর খান এর সাথে নজরুলের সেখানেই প্রথম পরিচয়। পরিচয় গাঢ় হওয়ার সুযোগে আলী আকবর একদিন নজরুলকে প্রস্তাব দিয়ে বললেন,

> চলুন কাজী সাহেব, আমার সঙ্গে আমাদের দেশে। আমাদের বাড়ীতে দিন কতক থেকে আসবেন।[১৬]
>
> মুজফ্ফর আহমদের বারণ সত্ত্বেও একদিন নজরুল আলী আকবরের সঙ্গে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এটা ১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের ঘটনা।[১৭]

আলী আকবরের বাড়ীতে নজরুল-মানসে যে মানসীর প্রেমের ছোঁয়া প্রথম লাগে, তার বিররণ ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত এভাবে বর্ণনা করেছেন,

> ....নজরুলের থাকাকালীন আলী আকবরের বিধবা বোন এই বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁর বিবাহযোগ্য মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পরে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মলাভ করে। মেয়েটির নাম সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগম। শোনা যায়-মেয়েটি নজরুলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়।[১৮]

নার্গিসের প্রেমে নজরুল নিজকে উজাড় করে দিয়েছিলেন, এ'কথা সত্য। এর আরও প্রমাণ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানা পত্র। বিবাহের ব্যাপারে নজরুলের

হৃদয়ে যে ভাবপ্রবল উন্মাদনা ও বিচলতা উপস্থিত হয়েছিল, তা অনুভব করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩২৮ সালের ২৫শে জৈষ্ঠ্য, নজরুলের উদ্দেশ্যে একখানা পত্র দেন। পত্রের একজায়গায় ছিল,

> লিখেছিসঃ 'এক অচেনা পল্লী বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোন নারীর কাছে এখনও হইনি।'[১৯]

পরবর্তী ঘটনা মুজফ্‌ফর আহমদ এভাবে বর্ণনা করেছেন,

> --আলী আক্‌বর বুঝেছিলেন নজরুল ইসলাম বিয়ে সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ। এই অবস্থায় খান সাহেব কোনো একটা অছিলা ধরে বিয়েটা ভেঙ্গে দিতে চাইছিলেন। তাই তিনি কাবিননামায় একটা শর্ত রাখতে চাইলেন যে, বিয়ের পর নজরুল ইসলাম নার্গিস বেগমকে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাবে না, দৌলৎপুর গ্রামে এসেই সে তার সঙ্গে বাস করবে। এই অপমানজনক শর্ত মেনে না নিয়ে নজরুল ইসলাম বিয়ের মজলিস হতে উঠে চলে গিয়েছিল।[২০]

প্রেয়সী নার্গিস, যাকে কবি বাস্তবে পেয়েও পাননি,তারই স্মৃতি কবি জীবনভর অন্তরের অন্তঃস্থলে লালন করেছেন। নার্গিসই কবির প্রেমের কবিতার উৎস, জীবন দেবতা—কাব্যের প্রেরণাদায়িনী। নার্গিসকে ভোলা কবির পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি। নার্গিসের রঙ্গিন স্মৃতি কবির অন্তর আজীবন মথিত করেছে। সুদীর্ঘ ষোল বছর পর নার্গিসকে লেখা প্রথম এবং শেষ চিঠিতেও নার্গিসের প্রতি কবির গভীর ভালবাসার প্রমাণ মেলে,

> তোমার আজিকার রূপ কি জানিনা। আমি জানি তোমার সে কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবী মূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলেনা। পাষাণ বেদীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনা বেদী-পীঠ! আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ, তাই তাকে পেতে চাইনে।[২১]

নার্গিসের প্রেমাঘাতই নজরুলের প্রেমের কবিতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১-৭-৩৭ সালে নার্গিসকে লেখা পত্রে নজরুল লেখেন,

> তুমি এই আগুনের পরশ-মণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণরূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, সে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভলোবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত মান্দারের মত চিরঅম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।[২২]

নজরুলের কাব্য-মানসী, ধ্যানের সামগ্রী সবই ছিলেন নার্গিস আসার খানম। কুমিল্লায় প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্তির পর সবার ধারণা ছিল কবি আর লিখতে পারবেন না। কিন্তু আশ্চর্য, ছয়মাস মাত্র না লেখার পর কবির কলম থেকে আবার কবিতা বইতে লাগল, ঠিক যেন পাগলা-ঝোরার স্রোতের মতো।

> কিন্তু হতাশ প্রেমিকের কবিতা নয়,-নূতন জীবনের গান, শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়ানোর গান। আমার মনে হয় গীতি-কবিতা লেখাও নজরুল সেই প্রথম শুরু করল।[২৩]

ছন্নছাড়া–বাঁধনহারার কবি, নার্গিসকে নিয়ে একসময় ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে সে বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়ায় কবিমনে যে ধূসর রঙ এর জন্ম হয়েছিল, যে ধূম্রজাল কবি প্রতিভায় বাধা সৃষ্টি করেছিল, সে জাল ডিঙ্গিয়ে ধূসর-কালোসহ বিষাদযুক্ত রঙ দিয়ে কবিমানস সাজিয়ে, নজরুল সৃষ্টি করেছিলেন 'চক্রবাক', 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সিন্ধু-হিন্দোল' আর 'পূবের হাওয়া'র মত কাব্য গ্রন্থের বহু কবিতা। যার মূল সুর-স্বর এবং রঙ ছিল ব্যর্থ প্রেমিকের করুণ আহাজারি! অনাদৃতা, পূজারিণী, চৈতীহাওয়া, ছল-কুমারী, হিংসাতুর, তোমারে পড়েছে মনে, বিধুরা পথিক-প্রিয়া কবিতা সমূহে প্রেমের যে উষ্ণ পরশ মেলে, তা নার্গিসকে ঘিরেই রচিত।

প্রেমিক নজরুলের প্রেমের আর এক অধ্যায় কুমিল্লার কান্দিরপাড়ের গিরিবালা দেবীর তনয়া আশালতা সেনগুপ্তা, প্রমীলা। ১৯২১ সালের মার্চ–এপ্রিল, আলী আকবরের বাড়ি বেড়াতে যাবার পথে নজরুল প্রথম কান্দিরপাড়ে শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাসায় কিছুদিন বেড়ান। সেখানেই প্রথম নজরুল-প্রমীলার পরিচয়। প্রমীলার জন্য নজরুলের প্রেমানুভূতির সুন্দর বর্ণনা মেলে এম, এ মজিদ–এর 'নজরুলের প্রেমের কবিতা'–গ্রন্থে

> 'বিবাহ–বিচ্ছেদের পর নজরুলের বিরহ-হৃদয়ের আহাজারী সইতে না পেরে আপন মনে কেঁদে ফিরছিল কান্দিরপাড়ের এক বালিকার মন। হঠাৎ করে নজরুল আবিষ্কার করে ফেললেন একদিন সেই বালিকার অপ্রকাশ হৃদয়-কাকুতি। তাই তাঁকে নিয়ে কবি লিখলেন 'বিজয়িনী' কবিতা। এই 'বিজয়িনী'র ভিতর দিয়ে স্বীকৃতি দিলেন কবি কুমারী আশালতা সেনগুপ্তার। এরপর এই বিজয়িনী-ই 'পূজারিণী' রূপে চটুল ছন্দে পা ফেলে প্রবেশ করলেন কবির হৃদয়-মন্দিরে।'[২৪]

'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায়, 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের অপরাধে কুমিল্লা থেকে নজরুলকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয় কবির। জেলে বসে দৌলতপুরের শত স্মৃতি বিজড়িত প্রিয়া-বিরহে কবির বুক ছিল শত ছিন্ন। বহরমপুর জেলে বসে কবি যখন জানেন, তাঁর পূজারিণী কবি-হৃদয় পরিত্যাগ করে কোন এক হিন্দু যুবকের হৃদয়-মন্দির রাঙাতে যাচ্ছে। তখনই তাঁর বিরহের আগুন জ্বলন্ত অঙ্গারে রূপান্তরিত হয়ে বুক চিরে বেরিয়ে আসে 'অভিশাপ', 'আড়াল', 'আলতা স্মৃতি'র মতো কালো ঘননীল রঙযুক্ত কবিতা সমূহ। প্রকাশ পায় 'দোলন চাঁপা'র মত প্রেম-বিরহের অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে (১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৩), প্রিয়া-বিচ্ছেদে কবি-হৃদয় ছিল শত ছিন্ন, ক্ষত-বিক্ষত। কাল বিলম্ব না করে কবি সোজা চলে যান প্রমীলার কাছে। শত বাধা অতিক্রম করে তাঁদের ঘরবাঁধার আয়োজন করা হয়েছিল ২৫শে এপ্রিল, ১৯২৪ সালে। এরপর থেকেই কবির কবিতায় আসে আর এক নতুন পরিবর্তন। কবিতার বিষয়, চিত্রকল্পসহ রূপ-রঙের বহুল পরিবর্তন এ সময়েই চোখে ধরা পড়ে। সৃষ্টি হয় প্রেমের কবিতার নতুন নতুন রঙ, উপমা এবং প্রতীকি রস।

প্রেমের কবিতা প্রেরণাদাত্রী নার্গিস-প্রমীলা ব্যতীত ফজিলতুন্নেছা সহ আরও

অনেকের নিকট নজরুল কৃতজ্ঞ। এদের প্রেম-বিরহের ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই নজরুলের তুলিতে সৃষ্টি হয়েছিল 'রহস্যময়ী', 'কৌতুকময়ী', 'এ মোর অহংকার' এর মত বর্ণবহুল নিখুঁত হৃদয়গ্রাহী চিত্রাবলীর মতো কবিতাসমূহ।

নজরুলের প্রথম থেকে শেষ অবধি সকল কবিতার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তা'হলো পৌরুষ। এ' পৌরুষ–মহিমায় তাঁর সমস্ত কবিতা উজ্জ্বল। প্রেমের কবিতায়ও পৌরুষ বিদ্যমান। এ কারণে নজরুলের কবিতা অন্যান্য কবিতা থেকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী।

রোমান্টিক কবি মাত্রেই জগৎ–জীবনের এক স্বপ্নময় চিত্র অঙ্কন করেন। লকাসের কথায় বলা যায়,

> Romantic literature is a dream picture of life yielding sustenance and fulfilment for impulses cramped by society or reality.[২৫]

উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, স্বপ্ন দেখা তখনই সম্ভব হয়, যখন সচেতন মনের বাস্তব চেতনার শাসন-বন্ধন ঘুচে যায় এবং অবচেতন মন প্রাধান্য লাভ করে। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন আর কিছুই নয়, মানব মনের অবদমিত আশা-আকাঙ্খা, সাধ-সাধনার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। স্বপ্নের মধ্যে অবচেতনের প্রভাব অধিক মাত্রায় প্রবল হওয়ার কারণে, রোমান্টিক শিল্পী-সাহিত্যিক কবিরা জীবনভর স্বপ্ন দেখতে পারেন।

স্বভাবধর্মে নজরুলও একজন রোমান্টিক কবি। অনুভূতির প্রাধান্য, সুদূরের প্রতি ব্যাকুলতা, প্রাচীনে পুনরাবর্তন, সৌন্দর্য পিপাসা, প্রচলিত নিয়ম-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা, প্রকৃতি প্রীতি, সবই রোমান্টিকতার লক্ষণ এবং সব লক্ষণগুলোই নজরুলের মধ্যে বর্তমান ছিল। 'ওগো চক্রবাকী', 'চক্রবাকী', 'বাতায়নপাশে গুবাক তরুর-সারি' কবিতাগুলো কবির রোমান্টিকতারই ফসল। নজরুলের প্রেমের কবিতায় রোমান্টিক রূপ-রস-বর্ণ থাকলেও, আবেগ এবং অনুভূতি প্রবণতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তিনি যখনই যা অনুভব করেছেন, তখনই তা কাব্যে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে, তাঁর কবিতায় একাধিক অনুভূতি প্রকাশের পরিবর্তে একই প্রেমানুভূতি বার বার অনুভূত হয়েছে। প্রেমের বিদ্বেষ, অনুতাপ, ক্রোধ, অভিমানের করুণ চিত্রও কিন্তু প্রেমানুভূতি থেকে বাদ পড়েনি।

শিল্পী-মানসের উপর ভর করে যেমনি শিল্পকর্ম অঙ্কিত হয়, তেমনি কবিতা সর্বত্র কবি-মানসের উপর নির্ভরশীল। কবিমানস রচিত হয় দেশ-কাল, পাত্র-সমাজ ও রাজনৈতিক প্রভাবের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ দিয়ে। যুদ্ধ ধ্বংস রাজনৈতিক দ্বিধা, আর্থিক বুনিয়াদে ফাটল, সাংস্কৃতিক সংকট এর পটভূমিতে নজরুল প্রতিভার উন্মেষ ঘটায়, কবির সৃষ্ট কবিতায় দ্বিধা–দ্বন্দ্ব জটিলতা, ব্যর্থতা-হতাশার প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ স্বাভাবিক। ফলে, কবির প্রেমের কবিতায় রঙ, উজ্জ্বলের পরিবর্তে ধূসর, নীল, ছাই, মলিন,

গাঢ়নীল, পাণ্ডুর রঙ-এর প্রভাবই বেশী। যার অন্তর্নিহিত ভাব বিষণ্নতা।

নজরুলের প্রেমের কবিতার বিশাল ক্যানভাস বিষণ্নতায় ভরপুর, কারণ কবি জীবনভর আঘাত নিয়ে পথ চলেছেন। ব্যক্তিজীবনে নজরুলের আঘাত এসেছিল নানা দিক থেকে। বাল্যে পিতৃ বিয়োগ, সংসারের আর্থিক অনটন, বিভিন্ন জায়গায় চাকুরী ও লেখাপড়া, মায়ের সাথে অভিমান, কৈশোর-প্রেমের ছলনা, যৌবনে নার্গিস খানমের চরমতম আঘাত, প্রমীলার প্রেমে ব্যর্থতার আশঙ্কা, সব মিলিয়ে নজরুল-মানসে সৃষ্টি হয়েছিল এক বিরাট ক্ষত, যার আঘাত তাকে জীবনভর বইতে হয়েছিল। ফলে, তার সৃষ্টির মূলসুরই ছিল বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত। ফলে, কবির ক্যানভাস উজ্জ্বল রঙ—গোলাপী, সিঁদুর-হলুদ—এর পরিবর্তে বিষাদের রঙে রঞ্জিত।

দেশ-কাল পাত্রের প্রভাব শিল্পী-সাহিত্যিকের উপর পড়া স্বাভাবিক। নজরুল-প্রতিভা যে যুগের ভিতর উদিত এবং অস্তমিত, সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১)। রবীন্দ্র-নজরুলকে অনেকে বিপরীত ধর্মী কবি বলে আলাদা করে দেখলেও, প্রথমাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম, প্রকৃতি-প্রণয় এবং বঙ্গমন্ত্রের ঋষিরূপ, নজরুলকে প্রভাবিত করেছে। নজরুলের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব বাদ দিলেও সতেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২–১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭–১৯৫৪) এবং মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮–১৯২২)-এর সঙ্গে নজরুল-মানসের ভাবধারা এবং প্রকাশরীতির অন্তরঙ্গ সহৃদয়তা আবিষ্কার করা যায়। তবে, নজরুলের পূর্বসুরীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছেই নজরুল বেশী ঋণী। এক সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে সত্যতা অনুধাবন করা যাবে,

> কাজী নজরুলের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেকে নিজের শক্তিকে অপমান করেন, যেমন কাজী সত্যেন দত্তকে আদর্শ করতে গিয়ে নিজেকেও অপমান করেছেন, আদর্শকেও করেছেন।[২৬]

প্রেমকে বলা যায় পঙ্কজ। এর মধ্যে যেমন স্বর্গসুধা আছে, তেমনি আছে নরক জ্বালা। প্রেম দেহগত অথবা দেহনির্ভর হতে পারে। দেহের মধ্যে এর অবস্থান অথচ দেহকে অতিক্রম করে এর যাত্রা উর্ধ্বে। প্রেমের ধারণার ক্ষেত্রে কবি নজরুলের সাথে মোহিতলাল মজুমদারের খুবই নৈকট্য উপলব্ধি করা যায়। মোহিতলাল মানবিক প্রেমের আধিক্য বর্জন করে দেহাত্মবাদের মহিমা কীর্তন করেছেন। কিন্তু নজরুলের মানবিক প্রেম, অনেক স্থানে স্বভাব সুন্দর দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। নজরুলের কবিতায় প্রতিফলিত যে ব্যক্তিজীবনের প্রেম, সে প্রেমের বিচ্ছিন্ন অনুভূতির সাথে পরিচিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম–তাঁর প্রেমের কবিতা সমূহ।

নজরুল তাঁর প্রেমের কবিতায় যেখানে শব্দ দিয়ে প্রেমানুভূতি প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে রঙ ব্যবহার করে সে অনুভূতি আবেগময় করে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলে তার মধ্যে সব

ধরনের প্রেমানুভূতি প্রকাশের সহায়ক রঙ খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রেমের কবিতা রচনায় কবি যে স্পষ্ট বর্ণবিভার বলিষ্ঠ রেখা ব্যবহার করেছেন, তাতে নজরুলের অধিকতর কবিশক্তি ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। নজরুলের দক্ষ তুলির পরশে প্রাণহীন প্রতিমার পরিবর্তে রক্তমাংসের মানবীই শক্ত হাতে ধরা পড়েছে তাঁর প্রেমের কবিতার ক্যানভাসে।

সব শিল্পেরই মূল উপাদান থাকে; চিত্রকলার রঙ, ভাস্কর্যের কাঠ-সিমেন্ট- পাথর, সঙ্গীতের সুর, কবিতার শব্দ ইত্যাদি। এর মধ্যে রঙ একটি অসাধারণ প্রকাশক্ষম শিল্প উপাদান। যার সাহায্যে অঙ্কন শিল্পী তাঁর ভাব-কল্পনার বিস্তার সাধন করে থাকেন। প্রকাশ ক্ষমতার প্রাচুর্যের কারণেই রঙের প্রয়োগবিধি জটিল এবং অনবরত পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তঃসার থেকে রঙ-এর স্বভাব আবিষ্কার করেন এবং নিজস্ব প্রয়োগ পদ্ধতিতে তা সুস্পষ্ট করে তোলেন।

বস্তুর ভেতর শিল্পসত্ত্বা যেভাবে সত্যকে আবিষ্কার করে, তারই দৃশ্যগত রূপান্তর ঘটে শিল্পী-সাহিত্যিক-কবির চিত্রকল্পে, বর্ণবিভার সাহায্যে। একজন শিল্পী, অথবা একজন কবি, বর্ণচিত্রের মাধ্যমে তাঁর অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং অনুভূতির কোন্ প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করবেন, তা সূত্রে ফেলে বলা অসম্ভব।

শিল্পী দেলাক্রোয়ের বিশ্বাস, রঙের রঞ্জনগত যে আভা, তা সীমাহীন। রঙের রঞ্জনগত আভা কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে, বস্তুকে নির্ণয় এবং অবস্থিতি দান করতে সাহায্য করে। রঙ-এর সম্ভাব্য মিশ্রণ এবং দীপ্তক প্রকাশ যে কত প্রকার হতে পারে, তা সংক্ষিপ্ত গণনায় নির্ণয় করা যায় না। ফলে একজন শিল্পী রঙএর হাজারো বর্ণবিভার সাহায্য নিয়ে, চিত্রের সব ধরনের অনুভূতি অতি সহজে প্রকাশ করতে পারেন।

রঙের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিল্পী মতিস-এর ব্যাখ্যা হল,

> রং-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্রের প্রকাশময়তাকে যতটা সম্ভব সফল করা।[২৭]
>
> পল সেজা (paul Cezanne) প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, কোনও কোনও রং সামনে এগিয়ে আসে বলে মনে হয়, আবার কোনও কোনও রং পিছনে সরে যায়।[২৮]

অর্থাৎ রঙ ব্যবহার করে বস্তুকে খুব কাছেও নিয়ে আসা যায়, আবার বহু দূরেও নিয়ে যাওয়া যায়। গল্প-কবিতায় শব্দের সাহায্যেও একাজটা সম্ভব।

মানুষের মানসিকতার সাথে রঙ-এর একটা গভীরতম সম্পর্ক আছে। আমাদের শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রের পটভূমি বেশীর ভাগ মলিন রঙে রঞ্জিত থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়েও আমাদের ছবিতে 'লিমোন ইয়েলো', 'ম্যাপগ্রীন', 'ভারমিলিয়ন রেড', ব্যবহার করতে তুলি কেঁপে ওঠে, এর একমাত্র কারণ প্রকৃতি। বাংলার যে আকাশ আমরা সর্বদা দেখি তা কিন্তু সবসময় স্বচ্ছ দেখিনা। আকাশ মেঘযুক্ত থাকায়, মেঘের প্রতিফলন প্রকৃতিতে পড়ে। ফলে, দিগন্তরেখা যেমনি সবুজত্ব হারিয়ে কালোতে

পরিণত হয়, তেমনি দূরের পানি, মানুষ সবই কালো দেখায়। নজরুলের প্রেমের কবিতা প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

বর্ণবিভার বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে শিল্পী-মানসের কারণে। বাস্তব জীবনে যে শিল্পী-কবি যত স্বচ্ছল এবং আনন্দ উল্লাসে ভরপুর, তাঁর ব্যবহৃত রঙ ও তত স্বচ্ছল, উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত। বিপরীতে ক্ষয়িষ্ণু এবং জীর্ণ জীবনের প্রতিনিধিত্বকারী কবি-শিল্পীর শিল্পীকর্মে উজ্জ্বল স্বচ্ছল রঙের প্রাধান্য মোটেই থাকবে না।

একসময় বস্তুচিহ্নিত করণের প্রধান উপকরণ হিসেবে রঙ ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে চিত্রকলায় রঙ-কে 'আকৃতির মূলাধার' হিসেবে ব্যবহৃত করা হচ্ছে, অলঙ্করণ হিসেবে নয়। রঙ চিত্রকলার একটা প্রধান উপকরণ,

> রঙ আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রঙ সেখানে, রঙ যেখানে রূপ সেখানে, এই হল স্বভাবের নিয়ম।[২৯]

কবিতায় রঙ মুখ্য নয়। অথচ অনভূতি প্রকাশে কবির অজান্তে অজস্র রঙ কবিতায় মিশ্রিত হয়ে কবিতার শোভা বৃদ্ধি করে চলে। ফলে, কবি চিত্ররসিকের আবেগ প্রকাশের সহায়ক বর্ণবিভার প্রকৃতি জানা একান্ত প্রয়োজন। দর্শন-প্রক্রিয়ায়, রঙ সবচেয়ে আবেগময় ভূমিকা পালন করে। দৈনন্দিন কর্মধারায় আমরা বর্ণবিভার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে বাস করি। আমাদের মানস-চৈতন্য, প্রতিনিয়ত রঙ-এর প্রতি নানা আকর্ষণ তৈরী করছে। কারো আকর্ষণ নীলের প্রতি, কারো লালের। কারণ সব রঙেরই আছে একটা নিজস্ব আবেগ, বৈশিষ্ট্য এবং আভাগত প্রসারতা। রঙ অঙ্কিত সীমানাকে বিলুপ্ত করে দৃষ্টির সতত কমনীয়তা চর্তুদিকে ছড়িয়ে দেয়।

রঙের অসাধারণ প্রকাশক্ষমতার কারণে নীল, স্নিগ্ধতা এবং নির্জনতার প্রতীক হয়ে ব্যবহৃত হয় কবিতা চিত্রকলায়। কালো— শোক, লাল—উষ্ণতার ব্যঞ্জনা আনে; হত্যা-ধ্বংস এবং অগ্নিদাহের ইঙ্গিত বাহক হিসেবে লালকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লাল সম্ভ্রমেরও সূচনা করে। দৃষ্টি সীমায় লাল নৈকট্যের আবেগ আনে। বিপরীতে নীল দৃষ্টিসীমাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ফ্রাঙ্ক কূপার বলেছেন,

> আমরা যখন রুচির কথা বলি তখন সাদা অথবা কালো রংটি চোখের সামনে ভাসে। মদের রং এবং তেলের রঙও সাদা। হলুদ হচ্ছে লেবুর রং, খড় অথবা পাকা ভুট্টার রং। এটা একসময় লজ্জার রংও ছিলো, দেহ-পসারিণীদের দোকান ঘরের চিহ্ন ছিলো। আবার হলুদ এককালে রোমান সম্রাটদের প্রিয় রং ছিলো, তেমনি ছিলো চীন সম্রাটদের। মিশরে হলুদ ছিলো দুঃখ প্রকাশের রং। বেগুনী ছিলো আবেগের এবং বিনয় ও মর্যাদার রং। তাই বিশপদের গাত্রাবরণ বেগুনী। সবুজ হচ্ছে উচ্ছল প্রান্তরের রং–সজীবতার এবং ফলবানতার।[৩০]

শিল্পের বিষয় প্রকাশে যেমন সুচিন্তিত অভিব্যক্তি, মননশীলতা, সুস্থ রুচিবোধ,

সৃজনাত্মক প্রয়াস, যত্ন ও নিষ্ঠা'র বিশেষ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সুন্দর ও সুচিন্তিত রঙের প্রয়োগ। রঙ ছবির আকর্ষণীয় ক্ষমতা ও নান্দনিক মূল্য বাড়িয়ে দেয়। একটি আনন্দ–উৎসবের চিত্রাঙ্কনে যে বর্ণের সঠিক প্রয়োগ হবে, সে বর্ণের ছায়া দুঃখ ও বিষণ্নতা প্রকাশে ব্যর্থ হবে। এর প্রধান কারণ অনুভূতি প্রকাশে রঙ একটি অসাধারণ প্রকাশক্ষম শিল্প উপাদান।

শিল্প একটি মানস-প্রক্রিয়া—বিজ্ঞানের বিচারকে শিল্প অস্বীকার করেনা, কিন্তু হৃদয়ের অভিপ্রায়কে সে মান্য করে। রঙ এর মিশ্রণকে শিল্পীর জানতে হয় এবং এর প্রয়োগগত জ্ঞানের সাহায্যে শিল্পী রঙ-এর তাৎপর্য প্রকাশ করে। আলোর মধ্যে চলে রঙের খেলা। আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে রঙেরও পরিবর্তন ঘটে। আলোর স্বাভাবিক আবহকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন রূপে রঙ-এর বিমিশ্রণ ঘটানো হয়। নজরুলের প্রেমের কবিতায় ব্যবহৃত রঙসমূহের প্রতিস্পন্দনগত পরিচয় নির্ণয়ের জন্য রঙ-এর একটি বিভাজন-জনিত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে কবির প্রেমের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকী রঙ-এর অভিব্যক্তি এবং মনোভাব পাঠকের কাছে রহস্যাবৃত্ত অতিক্রম করে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

উজ্জ্বল লাল, প্রাথমিক রঙ-এর একটা অন্যতম রঙ। এ'রঙ সাধারণত উষ্ণ, দীপ্ত, অগ্নিশিখা, অস্তগামী সূর্যের ছাপ বয়ে এনে মানুষের মনে অস্থিরতা, উষ্ণতার ভাব সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মলিন লাল-দীপ্ত, উষ্ণতার পরিবর্তে বিষাদ-বিষণ্নতার ছাপ বয়ে আনে। কমলা-হৃদয়াবেগ, কামনা, উষ্ণভাব সহ নৈকট্য, হলুদ-(উজ্জ্বল) ত্যাগ, উৎফুল্লতা, ধর্মীয় আবেগ; হলুদ (মলিন)–মৃত্যু, বিষাদ-এর অনুভূতি মানব মনে জাগাতে সক্ষম। তেমনি নীল (মলিন)-নিরুৎসাহ; নীল (উজ্জ্বল)-সততা, ন্যায়পরায়ণতা; নীল (স্বচ্ছ)–প্রশান্তি, মোহনীয়তা, শীতলতা; সবুজ—নীল কোমলতা, স্পর্শকাতরতা; সবুজ (উজ্জ্বল)–প্রাচুর্য, সজীবতা; সবুজ (মলিন)– ঈর্ষা, লোলুপতা, পরিপক্কতা; বেগুনী—মহত্ত্ব, আবেগ, বিনয়, মর্যাদা বোধ প্রকাশ করে। হাল্কা লাল—অহংকার বোধ; রক্তিম (ভোরের-আকাশ)–আশা, প্রসন্নতা; গোলাপী প্রফুল্লতা; সিঁদুর–ভালোবাসার প্রতীক; সাদা— পূর্ণতা, পবিত্রতা, বার্ধক্য এবং শান্তির প্রতীক; ধূসর–পিঙ্গল— উদাসীনতা, বিস্মৃতি, শূন্য প্রান্তর; ধূসর—উদাসীনতা, দুঃখ-মলিনতা; এবং কালো— শোক, বিষাদ-এর ভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

নারীর প্রেমের বাস্তব প্রকাশ নজরুলের প্রেমের কবিতাসমূহ। কবির প্রেমের কবিতায় অসংখ্য রঙ-এর মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি তাঁর কবি-মানসে, প্রিয়া বিরহ-মিলনের এক অদ্ভুত রঙিন চিত্র এঁকেছেন। এ চিত্র আত্মস্থ করতে হলে কবির প্রেমের কবিতার প্রতিটি রঙ খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ভাবতে হবে, আবেগ প্রকাশে কবি কোন্ রঙ সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

নজরুল তাঁর প্রেমের কবিতায় রঙ ব্যবহারে এতই সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন যে অনেক সাধারণ রঙ, কবির হাতের পরশে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। নজরুলের প্রেমের কবিতা পাঠে অবাক হতে হয় এ' ভেবে যে, রঙ দিয়ে তিনি কবি-মানস সাজিয়েছেন না কবি মানসকে রঙের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবিতায় কবি এমন দক্ষতার সাথে রঙ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে কখনো সেগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আবার কখনো তা কল্পনা-সম্ভার হয়ে আমাদের হৃদয়ে ধরা দিয়েছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতার আঙ্গিক তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্যচেতনার মধ্যে সুতীক্ষ্ণ সংবেদনশীল রঙ-মিশ্রণ। প্রকৃতিলোক থেকে উপরকরণ সংগ্রহ করে, কবি তাঁর ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতার, স্পর্শ-কাতরতার, শ্রুতি-চেতনার স্বাদ, ইন্দ্রিয়বেদিতায় এবং শরীর চেতনায় কবিতাকে করেছেন রসঘন ও আস্বাদযোগ্য।

কবি নজরুল আধুনিক কবিদের মধ্যে সার্থক বর্ণসচেতন প্রেমের কবি। চিত্রকলার মতো কবিতায়ও এক বা একাধিক শব্দ-বর্ণ, ছন্দ-মাত্রা এর সাথে সামান্য একটু রঙের প্রলেপ লাগিয়ে কবিতার চিত্রকল্পকে করে তোলা যায় অধিক হৃদয়গ্রাহী এবং আবেগপ্রবণ। নজরুল তাঁর কবিতায় বর্ণবিভার-সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে, বস্তুকে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে হৃদয়-গভীরে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন। সক্ষম হয়েছেন রঙ দিয়ে প্রেমের কবিতাকে আরও আকর্ষণীয় এবং প্রেমময়ী করে তুলতে।

রঙের নানা আভা, বিভাজন, ঘনত্ব এবং উজ্জ্বলতা'র বিচিত্র প্রকারভেদ ঘটিয়ে চিত্রকলা এবং কবিতায় সুন্দর চিত্রকল্প তৈরী করা যায়। আঁকিয়ে শিল্পীরা চিত্রকর্মে যেমন নীলের প্রলেপ দিয়ে একাকীত্ব, নির্জনতা, বিষন্নতা অথবা দুঃখবোধের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন, কবিরাও ঠিক তেমনি একই ভাব প্রকাশ করেন কবিতার চরণে নীল শব্দ ব্যবহার করে। এমনি ভাবে লালের বিচিত্র আভা দিয়ে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকরা ক্ষোভ, ভালবাসা এমন কি প্রেমাঘাতও প্রকাশ করে থাকেন।

আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা আদিম যুগের মানুষ হলেও রূপ ও রঙের অবিচ্ছেদ্য মিলন বিষয়ে তারা অজ্ঞ ছিলনা। অতীত থেকেই মনের ভাব প্রকাশে রঙের প্রতীক ব্যবহার করে আসছিল। আদিম যুগে রেড ইন্ডিয়ানরা কালো রঙ ব্যবহার করত শোকের-নিরাশার প্রতীক হিসেবে। মেটে এবং ধূসর রঙ-শুষ্কতা, মৃত্যু, পীত নীল রক্ত-পরিণত শক্তি, সবুজ রঙ-তারুণ্য, আশা; শুভ্রবর্ণ-শান্ত সুন্দর, ঊষার নির্মলতা, শুচিতা ইত্যাদি ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হত। নজরুল-জীবনানন্দ দাশ-রবীন্দ্রনাথ, মৌলিক যে কোন একটি মাত্র রঙ ব্যবহার করে-তাঁদের হৃদয়ানুভূতি দর্শকের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করাতে যেমন সক্ষম হয়েছেন, তেমনি আঁকিয়ে শিল্পী

মতিস-ভ্যানগগ-সেজান সক্ষম হয়েছেন একই রং ক্যানভাসে লাগিয়ে হৃদয়ের ভাব প্রকাশে। রঙ ব্যবহার করে স্রষ্টা যেমন পাঠক-দ্রষ্টাকে কাছে টানতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি দূরেও সরিয়ে দিয়েছেন। শিল্পী ভ্যানগগ তাঁর আত্মপ্রতিকৃতিতে শুধুমাত্র নীল রঙ ব্যবহার করে আমাদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে একাকীত্বের ভাব চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।পিকাসোও একসময় ছবিতে শুধুমাত্র নীলের আভা ব্যবহার করে অদ্ভুত বিষণ্নতার ভাব দর্শক-সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। পরবর্তীকালে গোলাপী'র আভা দিয়ে পিকাসো তাঁর প্রেমের দুর্লভ আবেগময় মুহূর্তগুলো ক্যানভাসে আবদ্ধ করে ধরে রেখেছেন।

প্রেমের কবিতার চিত্রকল্প তৈরীতে নজরুল যে সব মৌলিক রঙ এবং তার আভা ব্যবহার করেছেন তা' একান্ত তার নিজস্ব। এ রঙ ব্যবহারে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে আবেগময়ী এবং হৃদয়গ্রাহী, যার প্রমাণ মেলে দোলন চাঁপা, ছায়ানট, পূবের হাওয়া, চক্রবাক,সিন্ধু-হিন্দোল কাব্যগ্রন্থের–পূজারিণী, অভিশাপ, কবিরাণী, পিছুডাক, বিজয়িনী, প্রিয়ার-রূপ, চৈতী হাওয়া, আলতাস্মৃতি, বিধুরা, পথিক-প্রিয়া, মানস বধু, ছলকুমারী, বিরহ্-বিধুরা, তোমাকে পড়িছে মনে, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, হিংসাতুর, বর্ষাবিদায়, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি, নদীপারের মেয়ে, এ মোর অহংকার, আড়াল, অপরাধ, শুধু মনে থাক, মাধবী প্রলাপ—গোপন প্রিয়া, বাসন্তী, চাঁদনী রাতে, অনামিকা প্রভৃতি প্রেমের কবিতায়। এ'সব কবিতায় বিচিত্র রঙের আভা এবং মিশ্রণের মধ্যে ধূসর, সাদা, নীল, লাল, হাল্কা লাল, সবুজ, হলুদ, পাণ্ডুর, কালো, সোনালী, রূপালী, গোলাপী, বাদামী, নম্রনীল, গভীর নীল, সিঁদুরে লাল, হিঙুল, কাঁচা-সবুজ, মলিন সবুজ, কামরাঙা রঙ, জামরুলের রঙ, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। কবির প্রেমের কবিতায় এ রঙগুলির প্রয়োগ যেমন অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত এর মিশ্রণ দিয়ে কবি—অনুভূতি'র প্রচ্ছন্ন প্রকাশ।

কবিতা সাহিত্য অথবা চিত্রকলায় শিল্পী-মানসের আবেগের উপর নির্ভর করেই চলতে থাকে রঙ মিশ্রনের পালা। ভাব প্রকাশের সহায়ক রঙ তৈরীর পর, তা যথাস্থানে ব্যবহার করে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মকে করে তোলেন অর্থবহ। নজরুল কাব্যগ্রন্থের প্রেমের কবিতাসমূহের রঙ ব্যবহার, এর ব্যতিক্রম নয়। মানসিক-প্রতিক্রিয়ার নানা রঙ উদ্ভবের পেছনে একটা পটভূমি অবশ্যই কাজ করে। নজরুলের-প্রেমের কাব্যগ্রন্থের-কবিতা'র রঙ খোঁজার পূর্বে কবিতার পটভূমির দিকে একটু দৃষ্টি দিলে রঙের যথার্থ ব্যবহার আরও সুন্দর ভাবে অনুধাবন করা যাবে।

দোলন-চাঁপা (আশ্বিন, ১৩৩০, অক্টোবর, ১৯২৩) নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হলেও তাঁর প্রথম প্রেমের কবিতার বই। যার মধ্যে কবির প্রেম-বিরহের ব্যর্থতা এবং প্রমীলার প্রণয়ের সংশয় ও অনিশ্চয়তা ধরা পড়েছে।

> দোলন-চাঁপা কাব্যগ্রন্থের পটভূমি সম্পর্কে 'ফসল' পত্রিকার মন্তব্য হল, কবির কারাবাসের সুযোগে তাঁর মানসী-প্রিয়া তাকে অগ্রাহ্য করে অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হতে যাচ্ছেন, এই পটভূমিকায় রচিত হয় দোলন চাঁপা।[৩১]

'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থ ১৯টি কবিতার সমষ্টি। এর মধ্যে পূজারিণী, অভিশাপ এবং কবিরাণী কবিতায় কবির রঙ ব্যবহারের কৌশলগত দিকের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

পূজারিণী (দোলন চাঁপা)

কবিতাটি কবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। বিদ্রোহী কবিতা যেমন কবির সমস্ত কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি প্রেমের ব্যতিক্রমধর্মী শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পূজারিণী'। প্রেম-পিপাসার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে ঐ কবিতায়। পূজারিণী কবির জীবন্ত মানস-প্রতিমা। কবির কাছে প্রেমলীলা দেবপূজারই সামিল। তাই প্রেমলীলার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে কবি নানা উপমা, প্রতীক এবং মনভোলানো রঙের মধ্য দিয়ে কবি পূজারিণীর বিরহ-মিলন, আশা-নিরাশা, মান-অভিমান প্রভৃতির দ্বন্দ্বমুখর ও অম্লমধুর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এই কবিতায়।

নার্গিসকে হারিয়ে অশ্রুজলে বুক ভিজিয়ে কবি যখনই কুমিল্লার গোমতীর তীরে এসে দাঁড়ান, তখনই পূণ্য গোমতীর তীরে কবির সাক্ষাত ঘটে প্রমীলা দেবীর সাথে। এক নারী কবিকে দেন উপেক্ষা, অপরজন কবির জন্য নিয়ে আসেন পূজার উপচার, কুমারী হৃদয়ের নৈবেদ্য। এ কারণেই প্রমীলাদেবী কবির কাছে বরণীয় হন পূজারিণী হিসেবে।

> যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো
> আপনারে দাহ করি মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
> বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
> চিনি প্রিয়া চিনি তোমা জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি।

কবি-মানসের আবেগ, অনুভূতি মিশ্রিত যে সব রঙ মিশিয়ে নজরুল তাঁর পূজারিণী'কে সাজিয়েছেন তার তালিকা নিম্নরূপ,

অবেলায়, ধুলিঅন্ধ, দিবাযামী, তব অপরূপ রূপ, রাজহংসী জিনি, শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে দাহকরি, জ্বালিয়েছ আলো, দিনান্তের প্রান্তে, বসন্তের শেষে, আশাম্লান, রাঙা নিশি ভোর, উষা-সম, অভিমান-রাঙা, আধ-রাতে, গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,অন্ধকার, সকরুণ আলো, কান্না-রাঙা মুখ, পোড়া প্রাণ, নগ্ন-নীল, রক্ত রাঙা, রক্তমাখা প্রাণ, রক্ত অশ্বে চড়ি, অশ্রু-রাঙা, রাঙা পদ্মসম, রক্ত-ঝরা রাঙা বুক, রাগ-রাঙা আলো, বসন্তের শেষে, রাঙা-সুখ স্মৃতি, নীল কণ্ঠ কবি।

কবিরাণী (দোলনচাঁপা)

প্রিয়তমার কাছ থেকে প্রেমের মদিরা পান করে কবির 'পূজারিণী' 'বিজয়িনী' হলেন। বিজয়িনী-তে সৈনিক কবি তাঁর সমরজয়ী অমর তরবারী বহনের অক্ষমতা জানিয়ে প্রিয়ার কণ্ঠে হার মানা হার পরিয়ে দিয়ে মুক্তি চেয়েছেন তাঁর যুদ্ধবাজ মনোভাব থেকে। পরে প্রিয়ার ভালবাসার পরশ পেয়ে কবি যথার্থ কবি হয়ে প্রিয়াকে বরণ করেন 'কবিরাণী' করে। প্রিয়ার-গভীর ভালবাসারই ফল কবির কবিত্ব। যার প্রকাশ কবিতায় কবি এ'ভাবে করেছেন,

তুমি আমায় ভালবাস, তাইতো আমি কবি।
আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালবাসার ছবি।

কবি-রাণী কবিতায় প্রত্যক্ষ কোন রঙ-এর নাম উল্লেখ না থাকলেও প্রভাত আলো, সন্ধ্যাতারা, পূবের অরুণ রবি প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে, হৃদয়গ্রাহী রঙের সমন্বয়ে কবিরাণী'কে কবির ক্যানভাসে রাঙিয়ে রেখেছেন জীবন ভর।

অভিশাপ (দোলনচাঁপা)

মানবাত্মাকে একমাত্র ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ফুল ফোটে পূজার জন্যে। আপনাকে অসঙ্কোচে বিলিয়ে দেয়ার নামই পূজা। এ' পূজা যিনি গ্রহণ করেন, মানুষ তাকে দেবতার চেয়ে বড় মনে করে আপন বুকে স্থান দেয়া স্বাভাবিক। 'কবিরাণী', 'পূজারিণী', 'আশা' (প্রমীলা)-কে নজরুল তাঁর মনমন্দিরে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু হুগলী জেলে বসে যখন কবি জানতে পান, তাঁর পূজারিণী তাকে পরিত্যাগ করে কোন এক হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে বিজয়িনী বেশে চলে যাচ্ছেন, তখনই নজরুল হৃদয়ের জ্বলন্ত অঙ্গার গাঢ় নীল রঙে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসে বুক চিরে 'অভিশাপ'-এর মত দীর্ঘ কবিতা।

এ কবিতায় কবি তার আনন্দ বিষাদের অনুভূতি প্রত্যক্ষ নীলের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। অস্ত পারের সন্ধ্যা তারা, নিচিত রাতে, শিউলি ঢাকা, শিশির-সেঁচা রাত্রি, দোঁলন-চাঁপা, চৈতী-রাতের চাঁদনী, আকাশ ছাওয়া তারায় তারায় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে কবিতায় কবি সুন্দর একটি রঙিন চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ' কবিতায় প্রতীকী রঙের ব্যবহার কম।

ছায়ানট (আশ্বিন, ১৩৩২; সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)

কল্পনামাধুর্য, নিসর্গসম্ভোগ, প্রেমের অন্তরঙ্গ আস্বাদনের রঙিন চিত্রে ভরপুর নজরুলের 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থ। মানবিক প্রেমের মৌলসুর এ কাব্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

কবির বেদনা সুন্দর প্রকাশোন্মুখ মূর্তি এর প্রতি কবিতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে।[৩২]

এ' কাব্যগ্রন্থের বিজয়িনী, আলতা স্মৃতি, প্রিয়ার-রূপ, মানস-বধু, বিধুরা, পথিক-

প্রিয়া, চৈতী হাওয়া প্রভৃতি কবিতা সৃষ্টির পটভূমিকা সহ কবিতায় ব্যবহৃত রঙ এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবসমূহ খুঁজে বের করাই হবে প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজয়িনী (ছায়ানট)

কবিতাটি 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। কবি কুমিল্লায় (১৩২৮) কবিতাটি রচনা করেন। বিদ্রোহী কবি যুদ্ধজয়ী তরবারীর ভার বহনে অসমর্থ হয়ে, তার প্রেম প্রতিমার কাছে ধরা দিয়ে শান্তি লাভের চেষ্টায়, পূজারিণী'কে বিজয়িনী রূপে পাবার প্রবল আকাঙ্খাই ব্যক্ত করেছেন 'বিজয়িনী' কবিতায়। প্রমীলার সাথে কবির প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের প্রকাশ্য ঘোষণা আমরা পাই 'বিজয়িনী' কবিতায়।

প্রিয়ার প্রেমের বিচিত্র রূপের চেয়ে অশ্রু কোমল রূপের প্রতিই কবির আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। বিদ্রোহী কবির রক্ত রথের চূড়ায় বিজয়িনীর নীলাম্বরীর আঁচল উড়ায়ে কবি তাঁর তূণ নিঃশেষ করে বিজয়িনীর জয়মাল্য রচনা করেন। পূজারিণীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কবি হন সত্যিকার বিজয়ী।

হে মোর রাণী! তোমার কাছে হারমানি আজ শেষে।
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।

ছোট্ট এ কবিতায় কবির রঙ মিশ্রণ তেমন নেই বললেই চলে। শুধু দুটো মৌলিক রঙের উচ্চারণ আছে এ' কবিতায়, রক্ত রথের চূড়ে এবং নীলাম্বরীর আঁচল। বিজয়িনী কবিতায় কবির ব্যবহৃত রক্ত-রথ কোন ক্রমেই 'ক্রিমসন রেড' নয়, বরং 'ভারমিলিয়ন রেড', যা সিঁদুরে রঙ—ভালবাসার প্রতীক। একই ভাবে নীলাম্বরীর নীল বিষাদের নীল, 'পারসিয়ান ব্লু' নয়, বরং এ'নীল ময়ুরপুচ্ছ নীল -যা ভালবাসার ইঙ্গিতবহ।

আলতা স্মৃতি (ছায়ানট)

একটি রোমান্টিক কবিতা। রোমান্টিকের সংজ্ঞা হল,

সকল প্রকার বাস্তব সম্পর্কবোধহীন একরূপ তুরীয় কল্পনাকে বুঝায়-যে কল্পনা আকাশেই ফুল ফুটাতে পারে, মাটিতে এর বীজ বপন করতে হয় না।[৩]

কবি হৃদয়ের মর্মফাটা বেদনার এক সুন্দর চিত্রকল্প আলতার লাল রঙ-এর মধ্য দিয়ে 'আলতা স্মৃতি'তে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি বহরমপুর জেলে (১৩৩১, অগ্রহায়ন) লেখা। কবির কবিরাণী, পূজারিণী লাল আলতা পায়ে পারে তাকে ছেড়ে অন্যের ঘরণী হতে চলেছে, প্রিয়া বিচ্ছেদের এহেন বুকফাটা, ক্ষোভ, কতো যে তীব্রতর করে ছন্দ আর রঙ-এর মিশ্রণে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ 'আলতা স্মৃতি'র নিম্নোক্ত চরণে,

আমার প্রাণের রক্ত-কোমল
নিঙড়ে হ'ল লাল পদতল,

সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় ব'য়েছিল
আল্‌তা যে দিন প'রেছিল।

কবিতাটি 'কল্লোল', পৌষ, ১৩৩১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একই সংখ্যায় 'আলতাস্মৃতি'র পরিচিতি লিখতে গিয়ে লেখা হয়,

> কবি নজরুল ইসলাম তাঁর চিঠিপত্র, গল্প-কবিতা, সব লাল কালিতে লেখেন। এবার বুকের রক্ত দিয়ে আলতা স্মৃতি লিখেছেন। যারা এমনি ধারা একজনের বুকের রক্ত দিয়ে নিজের পায়ে আল্‌তা পরে, কবি তাদের থামতে বলছেন। আমারই বুকের রক্ত দিয়ে তুমি যুগে যুগে আল্‌তা পরছ নারী, রক্ত নিয়ে খেলা এবার সাঙ্গ কর।[৩৪]

লাল রঙ উত্তেজনার রঙ হলেও, এখানে কবি লালকে হিংসার প্রতীক-হিসেবে ব্যবহার করে হৃদয়াবিদারক কান্নার রোল সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আঙুরের রঙ সবুজ সতেজ, যা কোমল তারুণ্যের প্রতীক—তাকে নিঙড়ে কবি তাঁর হৃদয়জ্বালার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ কবিতায় লালের বিচিত্র আভার মাধ্যমে কবির আহত-চিত্তের সুন্দর ক্যানভাস ভরে তুলেছেন এভাবে,

> রাঙা পায়ে রাঙা আলতা, আলতা যে দিন পরেছিলে, আমার রক্তে চরণ রেখে আমার প্রাণের রক্ত-কমল, নিঙড়ে হ'ল লাল পদতল, দাঁড়িয়ে আমার রক্ত বুকে, অধর আঙুর নিঙ্‌ড়েছিলে আমার যত চুমের লীলা, তোমার পায়ে আল্‌তা পরায়, সেই আল্‌তা চরণ, মরণ চোষা রক্ত-আমার, অলক্তকের রক্ত ধারায় ইত্যাদি।

প্রিয়ার রূপ (ছায়ানট)

কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিকা আশালতা সেনগুপ্তার দেহজ রূপ বর্ণনার এক অদ্ভুত শিল্প তুলে ধরেন

অধর নিস পিস্‌
নধর কিস মিস্‌
রাতুল তুলতুল কপোল;
.....নাসায় তিল ফুল
হাসায় বিলকুল।

কবিতায় প্রিয়ার লোভনীয় দেহজ রূপ বর্ণনায় কবি নিম্নোক্ত রঙ ব্যবহার করে প্রিয়ার রূপ, পাঠক চিত্তে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন; রাতুল তুলতুল কপোল, নধর কিসমিস নাসা-তিলফুল, সিঁদুর মুখটুকু, হিঙুল টুকটুক, ললাট ঝলমল, টিপটি টল টল, দীপটি জ্বলজ্বল, আনার লাল লাল, তিলের দাগ তার, নীলের রাগ ভর চুমোর ইত্যাদি।

চৈতী হাওয়া (ছায়ানট)

চৈত্রের স্মৃতি মন্থন করে লেখার কারণে কবি এ' কবিতার নামকরণ করেছেন 'চৈতী হাওয়া'। কুমিল্লার কান্দিরপাড় এসে গোমতীর তীরে ভ্রমণকালে কোন এক সময় কবির মনে পড়ে গিয়েছিল অতীত এক চৈত্রের কথা। যে চৈত্রের বসন্তে কবি-

প্রিয়া কবির কাছ থেকে হারিয়ে যায়। চৈত্রের এক বসন্তে কবি-প্রিয়ার পরিচয় হয়, আর এক বসন্তে প্রিয়াবিহনে কবি কেঁদে ফেরে গোমতীর তীরে।

চৈতী হাওয়া কবিতায় কবি-প্রিয়া নার্গিসকে হারানোর ব্যথা-বেদনার রঙ রূপ-রস তুলির কোমল পরশে এমন অদ্ভুত করে জীবন্ত করে তুলেছেন, যার ফলে এ' কবিতা 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

চৈত্রের বসন্তে প্রিয়াদর্শন না পেয়ে কবির বিষাদক্লিষ্ট ব্যাকুল সুর স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রকাশ পায় এ'ভাবে,

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত-তোমার দেখ নেই।

দীর্ঘ এ' কবিতায় হারিয়ে যাওয়া অতীত স্মৃতির রোমন্থন করতে গিয়ে নীল, কালো, অন্ধকার, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষাদময় রঙগুলো কখনো প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারিত হয়েছে, আবার কখনো প্রতীকের মাধ্যমে ব্যবহার করে কবির অনুভূতি পাঠক হৃদয়ে সংক্রামিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ লক্ষণীয়,

হারিয়ে গেছে অন্ধকারে, আকুল অন্ধকারে, শীতল কালোজল, ব্যথার-নীলোৎপল, আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ, মহুয়া মউ, কৃষ্ণা-বউ, টগর, চাঁপা, বেল-চামেলি-যুঁই, হাল কলমী, গোলাপ হয়ে, চাঁপা গুঁজে ঠোঁটে দিতাম মউ, কাজল দীঘির, মৃণাল ফুটত কমল ঝিলে, সাগর-দীঘির-নীল, সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে, ঝুরছে গোলাবজাম, কামরাঙা রাঙলে ফের, জামরুলের রস, নীল-কমল, কমলা লেবুর ফুল, নীল ঘনায়, পড়ছে রাঙা পা, ইত্যাদি। আনন্দের চেয়ে বিষাদেরই রঙ কবি এ কবিতায় বেশী ব্যবহার করেছেন।

বিধুরা পথিক-প্রিয়া (ছায়ানট)

কুমিল্লার দৌলতপুর গ্রামে লেখা নজরুলের আর একটি বর্ণ বৈচিত্রময় প্রেমের কবিতা 'বিধুরা পথিক-প্রিয়া'। এ' কবিতায় যার মুখচ্ছবি কবির হৃদয়পটে ভেসে উঠেছে তিনি কবির মলিন নয়না, হারানো প্রিয়া, নার্গিস আসার খানম। পরদেশী পলাতকা, নলিন-নয়না প্রিয়াকে আবার খুঁজতে গিয়ে কবির চোখে যে বাদল-ছায়ার ঢল নেমেছিল, তারই করুণ আহাজারি কবি কতগুলো চিত্তাকর্ষক রঙ দিয়ে, এ' কবিতায় ফুটিয়ে তুলে পাঠক হৃদয়ে অনুভূতির ছোঁয়া জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। প্রিয়া-বিধুর মুখচ্ছবির রঙ এ' কবিতায় এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে,

আজ নলীন-নয়ান মলিন কে বল সখি বল বল।
পড়ল মনে কোন পথিকের বিদায় চাওয়া ছল ছল!
...... শীতের শেষের ঝরা পাতায় বিদায় ধ্বনি ও,
কোন্ কালোর কোন ভালোরে বাসলে ভালো, আ-হা

খুঁজছ মেঘে পরদেশী কোন পলাতকার নয়ন-অমিয়?

চোখের জলে বুক ভিজিয়ে হারানো প্রিয়াকে খুঁজতে গিয়ে কবি যে বিষাদ রঙসমূহ ব্যবহার করেছেন তার তালিকা নিম্নরূপ,

নলীন নয়ান মলিন কেন, মেঘের পানে চেয়ে, ঐ সুদূরের পথ বেয়ে, শীতের শেষে ঝরা পাতায়, কোন্ কালোর কোন্ ভালোরে, খুঁজছ মেঘে, আলো-ছায়া, বাদল-চাঁদের মেঘলা মায়া, সবুজ দেশের অবুঝ পাখী, ইত্যাদি। উল্লিখিত রঙগুলো কবির ব্যর্থ-প্রেমের ক্যানভাস রাঙাতে সহায়ক। শুধু তাই নয়, একজন দক্ষ আঁকিয়ের মনেও উল্লিখিত রঙগুলো করুণ রসের সঞ্চার করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

মানস-বধু (ছায়ানট)

মানসীর দেহজ রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকৃতির বহু রঙ-রেখা-উপাদান ব্যবহার করে কবি রচেন 'মানস-বধু' কবিতা। কোন এক দূরের পলক হারা মানস-বধু, স্বপ্নে পাওয়া মানস-বধুর জন্য কবি যুগযুগ ধরে অপেক্ষায় থাকবেন মিলনের আশায়। কবির স্বপ্নে পাওয়া মানস-বধুর রূপ বর্ণনায় কবি লিখেছেন,

ম্লান্ তার লাল্ গালের লালিম
রোদ-পাকা আধ-ডাশা ডালিম
গাগরী ব্যথার ডুবায় কে তার টোল-খাওয়া গাল-চিবুক কুয়ায়॥

মানস-বধু কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়ার রূপ অরূপ করে তুলতে প্রচুর রঙের উপমা তুলে ধরেন, যা অন্য কোন কবিতায় পাওয়া ভার। সবুজ লাল-হলুদ সহ অসংখ্য রঙ দিয়ে কবি তাঁর মানসী'কে নিম্নোক্ত উপমায় সাজিয়েছেন,

ছাঁচি পানের কচি পাতায়, পাতার কোলে ছায়া দোলে, মলিন হাওয়া, সবুজ ধোয়ায়, সিঁথির বীথির খ'সে পড়া, পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে, মুখ মুছে যায় সন্ধ্যা এসে, নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোঁয়ায়, পান্না-ক্ষরা, ম্লান, তার লাল্ গালের লালিম, রোদ-পাকা আধ-ডাশা ডালিম, ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি, দু'চোখ ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায়, হিম-ভেজা দুধ ঘাসের রোয়ায়, নিশিথ রাতের স্বপন হেন, ইত্যাদি।

পূবের হাওয়া (আশ্বিন, ১৩৩২, ১৯২৫)

সাঁইত্রিশটি কবিতা নিয়ে প্রথম 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। 'ছায়ানট'–এর একই প্রেমানুভূতির করুণ-বিষাদ এবং আন্তরিক সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থের 'বিরহ-বিধুরা' কবিতার রঙ বিশ্লেষণই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিরহ-বিধুরা (পূবের হাওয়া)

'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা, কুমিল্লা লেখা। কবির লেখা এ

কবিতা, চির বিরহিনী দূর প্রবাসী প্রিয়তমার বিরহ-বিধুর অনুভূতিগুলো এভাবে উচ্চারিত হয়েছে প্রতি স্তবকে,

> কার তরে ফুল শয্যা বাসর সজ্জা নিজেই লজ্জা পায়
> পীতম আমার দূর প্রবাসে দেখবে কে সাজ-সজ্জা হায়।

বিচিত্র রঙের আভা-মিশ্রিত কবির বিরহ-বেদনার আহাজারি প্রিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করতে কবি সাহায্য নিয়েছেন নিম্নোক্ত বিষাদ বর্ণযুক্ত রঙ এবং আবেগ। প্রতীকী রঙও কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর; ছাই, এ পোড়া মুখ, সুরমা রেখা, কাজল হরফ, লাল–রঙিলা, মেহ্‌দি হেনার ছাপ ঘষা, পানের-পিকের হিঙুল রঙ, অঙ্গ রাঙা আগুন, প্রিয়ার ফাগুন প্রভৃতি শব্দ যুক্ত রঙ, প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায়।

চক্রবাক (ভাদ্র ১৩৩৬; ১৯২৯)

কবির হারানো প্রিয়াকে খুঁজতে গিয়ে যাকেই কবি হাতের কাছে পেয়েছেন, তাকেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কবিমন কারো কাছে তৃপ্তি পায়নি। 'দোলন-চাঁপা' থেকে শুরু করে 'ছায়ানট' হয়ে 'সিন্ধু-হিন্দোল' পর্যন্ত কাব্য গ্রন্থের প্রায় সকল কবিতায় কবি তাঁর কাব্য-মানসীকে বার বার পেয়েও হারিয়েছেন। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে কবি পুনরায় নতুন উদ্যোগে তাঁর কাব্য মানসীকে নতুন রঙে সাজিয়ে কাছে পাওয়ার চেষ্টায়ও পুনরায় ব্যর্থ হয়েছেন। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর পূজারিণী, কবিরাণী, বিধুরা প্রিয়ার পুরানো স্মৃতির মর্মবেদনা।

১৩৬১ সালে 'নলেজ হোম' কর্তৃক নজরুলের 'চক্রবাক' গ্রন্থের যে সংস্করণ বের হয়, সেখানে নলেজ হোমের কর্মাধ্যক্ষ গ্রন্থের সূচনায় মূল সুরটি এ'ভাবে পাঠকের কাছে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন,

> প্রেম আর প্রকৃতি নিয়েই কবির কারবার, কবি নিজের প্রিয়াকে দেখেন প্রকৃতির ভিতরে। প্রকৃতি আর প্রিয়া একাকার হয়ে যায়। 'চক্রবাকের' মূলসুরও তাই। এখানে বিপ্লবী কবির বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায়না, শোনা যায় না তাঁর সোচ্চার উক্তি। এখানে ওঠে সারেঙ্গীর টুং টাং, গজলের গুনগুনানী, আছে সজল মেঘের ছায়া, কর্ণফুলির ছলছল ব্যথা, চক্রবাক-চক্রবাকীর মুখর–বিরহ, এ কবিতা সেদিক থেকে নতুন শুধু নয়, অভিনব।

'চক্রবাকে'র মূলসুর কাজী মোতাহার হোসেন এ'ভাবে ব্যক্ত করেছেন,

> চক্রবাকের অনেক কবিতায় যে হতাশার সুর অভিমানী কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ্য ক'রেই হয়েছে বলে মনে হলেও খুব সম্ভবত: তাতে কবি নজরুলের মনে নানা মিশ্র ঘটনার স্মৃতির একটা সমবেত ছাপ পড়েছে।[৩৫]

নার্গিস আসার খানমকে প্রথম এবং শেষ লেখা পত্রের 'পুনশ্চ' উদ্ধৃতিতেও নজরুল রচিত চক্রবাকের মূলসুর উপলব্ধি করা যায়।

আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ! তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে।[৩৬]

'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তোমাকে পড়েছে মনে, বর্ষাবিদায়, এ মোর অহংকার, বাতায়ন পাশে-গুবাক-তরুর সারি, কবিতার রঙ ব্যবহার নিয়ে এখানে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে,

তুমি মোরে ভুলিয়াছ (চক্রবাক)

ফজিলতুন্নেছাকে ঘিরে প্রেমের রহস্যময় উপলব্ধির বিচিত্র বিন্যাস ধরা পড়েছে কবির চক্রবাক কাব্যের দীর্ঘতম কবিতা, 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' কবিতায়। ফজিলতুন্নেছার প্রতি কবির কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও ফজিলতুন্নেছার কাছ থেকে কবি তেমন কোন সাড়া পাননি। তবে কবির প্রাথমিক ভালবাসাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন, তেমন প্রমাণও নেই।

আলোচ্য কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে কতগুলো ধুসর-বিবর্ণ শব্দে এবং প্রতীকের মাধ্যমে। প্রিয়ার রূপ, বিরহ-বেদনার সহায়ক রঙ হিসেবে কবিতার চরণগুলো এ'ভাবে ব্যক্ত করেছেন,

জ্বেলেছিলে দীপালী আলোক, ভুলে পরেছিলে ফুল নোটন খোঁপায়, নীলাভ তোমার আঁখি, গোধুলী বেলায়, বেলাশেষে, ম্লানিমা ঘনায়, সন্ধ্যায় বসে, আঁখি দীপ, দূর তারোকালোক, মুখ-কমল হয়ে উঠেছিল, রাঙা হয়ে, কমল-দল, ধ্রুবতারা সম, অবসান-গোধূলির মলিন-আলোকে, কঠিন শুভ্র, ভোরের উষসী, দিনের আলোর তাপ, কালজল, নীলিমা-মঞ্জুষা, মুক্তামণি বিচিত্র নক্ষত্রমালা-চন্দ্রদীপ জ্বালি, শাওনের মেঘ, শ্বেতকবরী সখি, হেমন্তের-সন্ধ্যা, কাজল আঁখি, হলুদ চাঁপার ডালে, রাতে আজো খুঁজে ফিরি, জ্বলে দীপ বিষাদিনী ক্লান্ত, কাঁপে দীপশিখা, অলক্ত রাঙা, ম্লানবেনী-খসা ফুল, নিশি প্রভাতে, শ্রাবণ মেঘে, নিশিশেষে নিভে গেছে দীপালী আলোক, দীপালী জ্বালিয়াছিল গিয়াছে নিভিয়া ইত্যাদি।

তোমাকে পড়িছে মনে (চক্রবাক)

এই কবিতায় বর্ষার বর্ষণমুখর ও বিরহকাতর রাত্রিতে প্রিয়াকে কবির মনে পড়েছে। স্মরণ পারের প্রিয়া, যাকে কবি জীবনেও পাবেনা, তাঁর উদ্দেশ্যে আপন মানসপটে প্রিয়ার বর্ণবহুল তৈলচিত্র রচনা করে কবি-প্রিয়াকে অমর করে ধরে রেখেছেন। কবিতাটি কবির বিরহ-ব্যথার হতাশ্বাসে তীব্র মধুর। কবি এবং তাঁর প্রিয়া, উভয়ের বিরহব্যথায় নিখিল বিরহের মহাসঙ্গীত কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এভাবে,

আমার বেদনা আজি রূপধরি' শতগীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে বিরহিনী-তব তরে ঝুরে!
এ-পারে ওপারে মোরা নাই নাই কুল!
তুমি দাও আঁখিজল, আমি দেই ফুল।

কবির ধারণা, আনন্দ কোলাহলে প্রেমের প্রকৃত মূর্তি ফোটেনা। তাই কবি বিরহের গভীরে প্রেমের ধ্যান করতে উৎসুক। স্মরণপারের প্রিয়া, যাকে তিনি কখনও জীবনে ভুলতে পারেন না, তিনি এককালের কবি-প্রেয়সী নার্গিস আসার খানম। নার্গিসের স্মৃতিচারণের বিরহব্যথার তীব্র মধুর সুর, মলিন-বিষাদ, আভাযুক্ত রঙের মাধ্যমে কবিতার ক্যানভাস রাঙিয়েছেন এ'ভাবে,

যুথিকার অশ্রু-সিক্ত, ঝিলমিল-তলে, ম্লান লুলিত অঞ্চলে, নিভে যায় শিয়রের বাতি, সাথে জাগে বরষা-বাতি, সিক্ত-পক্ষ পাখী, আঁখির ঘন-নীলাঞ্জন -ছায়া, শ্রাবণের অশান্ত পবন, নেভে বিজলী দীপ ইত্যাদি।

বর্ষা-বিদায় (চক্রবাক)

এই কবিতায় কবি প্রকৃতির একটি সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কবির প্রতীক বাদলের পরী, যাকে স্মরণ করে কবি অশ্রুসিক্ত। সে পরী, কাজল মেয়ে- ভরা ভাদরে কবিকে ছেড়ে তুষার হিম-গিরি-শিরে চলে যাবে, সে বিচ্ছেদ যেন কবি সহ্য করতে পারছিলেন না। কবি-প্রিয়া কঠিন তুষার দেশে গিয়ে ধ্যান-মগ্না তপসিনী হয়ে তপস্যা করবে, আর কবি তার আশায় দিন কাটাবে, এটা কি করে সম্ভব! প্রিয়বিচ্ছেদে প্রিয়ার কি বুক কাঁপবে না?

তুমি চলে যাবে দূরে,
ভাদরের নদী দু'কুল ছাপায়ে কাঁদে ছল ছল সুরে!
যাবে যবে দুর হিম-গিরি-শিরে, ওগো বাদলের পরী,
ব্যথা ক'রে বুক উঠবেনা কভু সেথা কাহারেও স্মরি?

বাদলের পরী-ফজিলতুন্নেছা, যাবে দূর হিম-গিরি-শিরে। যেথা নাই জল, আছে নির্মম শুভ্রতা-কঠিন তুষার। প্রিয়া-বিচ্ছেদের করুণ-বিষাদ রঙে ভরপুর এ'কবিতার প্রতিটি চরণ। বাদলের পরীর বিদায় লগনে কবি-মনের আবেগ, উচ্ছ্বাস যে সব প্রতীক এবং রঙের মিশ্রণে প্রকাশ পেয়েছে, তা এভাবে লক্ষণীয়,— বাদলের-পরী, কেতকী পাতার তরী, ভাদরে পড়িয়াছে মনে, পাণ্ডুর-কেয়া-রেনু, সিক্ত শেফালী, নিশি ভোর অনুপম, কাজল মেয়ে, উদাস আকাশ, শুভ্র ধবল কাশফুল, কদম-কেশর, হিম-গিরি-শিরে, নির্মম শুভ্রতা, রজনীর রজনীগন্ধা ইত্যাদি।

এ মোর অহঙ্কার (চক্রবাক)

কবির আর একটি দীর্ঘ কবিতা, কবির এ কবিতায় প্রিয়ার শাশ্বত যৌবনরূপ ধরা পড়েছে। কবি প্রিয়া ফজিলতুন্নেছাকে নিয়েই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ গড়ার ইচ্ছা পোষণ করেন কবি। কবির সঙ্গে প্রিয়ার সম্পর্ক নিত্যকালের। প্রিয়া কবিকে ভুললেও কবির কিছু যায় আসেনা, কবি ঠিকই তাঁর প্রিয়ার-আশায় ফুলে ফুলে মালা গেঁথে যাবেন, এ অহঙ্কারের আনন্দে কবি নিম্নোক্ত আনন্দধ্বনি করেছেন,

তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন।
কাজ কি জেনে –কাহার আশায় গাঁথছি ফুল হার,
আমি তোমার গাঁথছি মালা এ মোর অহঙ্কার।

প্রিয়ার উদ্দেশে রচিত মালায় রয়েছে হাজারো রঙের রঙিন ফুল। কবির অনুভূতি এবং মানসীর রূপ প্রকাশে কবির বর্ণ প্রকাশ হয়েছে এ'ভাবে;—রূপের রাণী, গভীর বেদনার, হাজার তারা, অশ্রুজলে, প্রিয়ার আঁখিজল, প্রদীপ জ্বালবে তুমি, খুশীর রঙে ঝরবে সোনা, বকুল যুথী, তারার ফুল, ঈদের প্রথম চাঁদ, কুসমী রাঙা, চৈতী সাঁজে, রঙের রাঙা বান, রঙীন সাঁঝে, আলোয় আলোয় হল মগন ইত্যাদি।

বাতায়ন-পাশে -গুবাক তরুর-সারি (চক্রবাক)

কবিতাটি প্রকৃতি প্রেমের কবিতা হিসেবে স্মরণীয়। আবেগের গাঢ়তা, আন্তরিকতার গভীরতা এবং সর্বোপরি স্মৃতিস্বপ্নের বর্ণবিন্যাস কবিতাটিকে অনবদ্যরূপে মণ্ডিত করেছে। কবি-প্রিয়া প্রকৃতিতে একাকার হয়ে যাওয়ায় কবি প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। চট্টগ্রামের হাবীবুল্লাহ বাহারের বাড়ীর গুবাক-তরুর-সারির সঙ্গে কবি অন্তরঙ্গ ভাষণে রত। গুবাক-তরুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ীর আঁচল খানি

প্রকৃতিকে ঘিরে কবির এ' কবিতা। প্রকৃতি থেকে প্রচুর রঙ নিয়ে কবি তাঁর কবি মানস ভরিয়ে রচনা করেছেন এক অপূর্ব বর্ণবিভার কবিতা। যার প্রমাণ কবির নিম্নোক্ত শব্দসমূহে,

পাণ্ডুর হয়ে এল, জানালার ঝিলিমিল, অস্ত-আকাশ, কাঁদিতেছে চাঁদ, নিশীথ রাতের বন্ধু, আঁখির কাজল লেখা, সুনীল ঝালর দোলে, পাতার হরিৎ আঁচলে, চাঁদের বিষাদ আলো, মলিন মাটির বন্ধনে ইত্যাদি।

নদী পারের মেয়ে (পূবের হাওয়া)

পূবের হাওয়া কাব্যগ্রন্থে (১৩৩২ সাল, ১৯২৫), 'নদী পারের মেয়ে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'পূবের হাওয়া'য় 'ছায়ানট'-এ ঝংকৃত প্রেমের করুণমধুর ও আন্তরিক সুরই ধ্বনিত হয়। 'নদী পারের মেয়ে' কবিতাটি কবির আর একটি বর্ণবহুল কবিতা। এখানেও কবির একই সুর ভেসে আসে, 'বিরহ বড় ভাল লাগে'। এ কবিতায় কবি প্রিয়ার স্মৃতিচারণ করে প্রেম-বিরহ, অভিমানের কিছু উক্তি এভাবে প্রকাশ করেছেন,

নদী পারের মেয়ে!
আমার ব্যথার মালঞ্চে ফুল ফোটে তোমায় চেয়ে',
শীতল নীরে নেয়ে ভোরে ফুলের সাজি-হাতে;
রাঙা উষার রাঙা সতীন দাঁড়াও-আঙিনাতে।

বর্ণবহুল প্রকৃতিনির্ভর এ কবিতায় কবির প্রতীকী বর্ণের উদাহরণ লক্ষণীয়,

গানের কমল, আলতা-রাঙা পা, কমল খানি, কনক-চাঁপা, টগর-মালা-হেনার গুছি, রাঙা উষা, রাঙা সতীন ইত্যাদি।

সিন্ধু-হিন্দোল (১৩৩৪ সাল, ১৯২৭)

এ কাব্যের স্থায়ীভাবও প্রেম। মানবীয় প্রেম যে দেহস্পর্শী হতে পারে তার প্রমাণ মেলে এ কাব্যের অনেক কবিতায়। কবি-শিল্পীরা অনেক সময় প্রকৃতি-প্রেমের মধ্যেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকেন। কবি নজরুল তাঁর বহু কবিতায় মানবীয় প্রেমের সাথে প্রকৃতিপ্রেম এক করে প্রকাশ করেছেন। এর ফলে তাঁর প্রেমের কবিতা আরও প্রেমময় হয়ে ধরা দিয়েছে পাঠক হৃদয়ে।

'সিন্ধু-হিন্দোল'কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় 'সওগাত' পত্রিকার মন্তব্য,

> নজরুল ইসলামের কাব্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, তাঁহার 'অগ্নীবীণা' হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কবিতাগুলি পর্যন্ত সমস্ত কবিতারই যে একটি বিশেষত্ব সর্বাগ্রে পাঠকের চোখে পড়ে, তাহা হইতেছে পৌরুষ। এই পৌরুষ-মহিমায় তাঁহার সমস্ত কবিতাই উজ্জ্বল। এমন কি প্রেমের কবিতাগুলিতেও এই পৌরুষ বিদ্যমান। যেন মনে হয়, ইহা পুরুষের প্রেম, নারীর প্রেম নহে। নারীর প্রেমে কাঁদুনি বাহুল্যে বাংলা কবিতার পাঠকের অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। নজরুল-প্রতিভা, কাব্যের এ' একঘেঁয়ে রূপ পালটিয়ে দিয়েছে।[৩৭]

'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে কবির অপূর্ব কাব্য-প্রতিভার পরিস্ফুটন হয়েছে। এ' কাব্যের কবিতায় কবির বিরহাক্রান্ত, বিদ্রোহাত্মক এবং ভোগোন্মুখ রূপ চিত্রিত হয়েছে। ভাবসম্পদ, বর্ণবৈচিত্র্যে এবং আবেগঘনতায় কবি সিন্ধুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা প্রকাশ করে, নিজের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে চিত্রিত করেছেন নানা বর্ণবিভার সাহায্যে। চন্দ্র-প্রিয়াহারা সিন্ধু তাঁর কাছে চিরবিরহ- বেদনার প্রতীক। বিদ্রোহী কবির বিরহ যন্ত্রণাবিদ্ধ। তাই সিন্ধুর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সেতু সহজেই নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছে।

মাধবী-প্রলাপ (সিন্ধু-হিন্দোল)

কবিতার মধ্যে কবির ভোগোন্মুখ, জীবনোৎসুক এবং কামনাতুর প্রেমের নিবিড় সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। কবি ফটোগ্রাফার নন, শিল্পী। মাধবী-প্রলাপে কবি তাঁর বাণীতে কবিতার প্রেমিকাকে মাংসলোলুপতার দৃষ্টিতে দেখলেও কবির হৃদয় নিঙড়ানো

রস দিয়ে, প্রেম-প্রবল উষ্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে— প্রেমিকাকে শিল্পে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির 'মাধবী-প্রলাপ' কবিতার মধ্যে কামচারিতার আধিক্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে,

> কবিতাটিতে একটা মাংসলোলুপতা ফুটে বের হচ্ছে। নারীকে শুধু মাংসপিন্ড ভেবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কবি ত ফটোগ্রাফার নন, কবি শিল্পী।[৩৮]

মোহিতলাল মজুমদার' মাধবী-প্রলাপ' কবিতার দেহাত্মক প্রেমের নগ্নরূপের জন্য নজরুলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এ'ভাবে,

> আধুনিক 'তরুণ' সাহিত্যিকের বালক-প্রতিভা কাব্যকাননে 'কাম-কন্টক-ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি'র চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।[৩৯]

শিল্প সুন্দরের প্রতীক, কুৎসিৎ নয়—সৃষ্টি। বসন্তের আগমনে কবি প্রকৃতির মধ্যে সুতীব্র সম্ভোগ-তৃষ্ণার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করে, বর্ণবহুল শব্দ-চিত্র এঁকে তাঁর মানবিক প্রেমসম্ভোগের প্রবল পিপাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতার নিম্নোক্ত চরণে, এভাবে,

> তার নিধুবন-উন্মন,
> ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
> বুকে পীন যৌবন উঠিছে ফুঁড়ি,
> মুখে কাম-কন্টক- ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি।
> করে বসন্ত বন-ভূমি সুরত কেলি,
> পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতি বেলি!

কবিতার চরণে কবি তাঁর কামনা দেবীকে হৃদয়ের যে সব উষ্ণ রঙ্ দিয়ে রাঙিয়েছেন, তা সত্যি অদ্ভুত। কবির অন্য কোন কবিতায় এত রঙের সমাহার দেখা ভার। উদাহরণ লক্ষ্যণীয়,

মুখে কাম-কন্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি, বসন্ত-বনভূমি, কাঁপে মালতি-বেলি, ঝুরে-কামেনী, কাঁঠালী চাঁপা, জামরুল কিশোরী, কাম্ রাঙার-কপোল, পলাশ-মুকুলে, রাঙা-বৌ, কুমকুম, রাঙা হল আঁখি, নার্গিসফুল, সুর্মা মাখায় নীল ভোমরা, কালো কোয়েলা, কাজল আঁখি, অস্ত-চাঁদ, মিশকালো দোয়েল, ঝরে মরমরা বিদায় পাতা, অশোক শিমূলে হল রাঙা, বসন্ত-বনভূমি-রাত-পরিমল, ওড়ে চন্দন খসা, ডালিম ডাঁশায়, পলাশ-মুকুল, নব শশীকলা, সাদা মেঘ, শ্বেত সারসী, পরীদের তরী, শ্বেত চন্দন লীলা ইত্যাদি।

আধুনিক মানুষের চিন্তা, হৃদয়-মননের কাছে সমাজ সভ্যতা এবং সময় দাবি করে সামগ্রিক সচেতনতা। নজরুলের আহত সত্তায় প্রেমের প্রলেপ দিয়ে, রূপ রেখার সমন্বয়ে কবি যে চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন, সেখানে রঙের ভূমিকাই প্রধান। কবিতায়

নজরুল ব্যবহৃত রঙসমূহ যতনা দৃশ্যগত, তার চেয়ে অধিক অনুভবগত। কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিটি রঙ ও তার প্রতিটি আভা কবির অনুভূতিকে সুন্দরভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রেমের কবিতায় নজরুলের রঙ ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সার্থকতাই হল, প্রতিটি রঙই সেখানে বিচিত্র অর্থময় ব্যঞ্জনায় বিধৃত এবং রঙের একই রূপ ক্ষেত্রভেদে বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রেমের কবি নজরুল, অধিকমাত্রায় একজন বর্ণসচেতন কবি। এ' কথা মনে রেখে তার প্রেমের কবিতা পড়লে বোঝা যাবে, কবি ছন্দ-ধ্বনি-শব্দ দিয়ে কবিতায় তাঁর প্রেমানুভূতি যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা কখনো আকর্ষণীয় হত না, যদি না তাতে কবি লাল-নীল হলুদ-এর মত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের রঙের প্রলেপ না লাগাতেন।

হৃদয়ের কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা[৪০]

এ সব নিয়ে নজরুল ইতিহাসের অভিনব বর্ণ আবিস্কারের উদ্দেশ্যে নেমেছিলেন। কবির কাব্য-ভাবনা এবং বর্ণচেতনা পরস্পর পরিপূরক। কবির বর্ণেরা প্রতিভাময় এবং একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত- যাকে বলা যায়, নিস্পৃহ সুন্দর। প্রেমের কবিতায় কবির বর্ণব্যবহার বিচিত্র, প্রকরণও ভিন্নতর-কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কখনো কল্পনাসম্ভব হয়ে তা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়।

রঙ, রূপের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রূপ যেখানে-রঙও সেখানে, এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বজগতের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াদি, কবিতা-শিল্প-সাহিত্যে এ' নিয়ম বলবৎ। কবি-প্রিয়ার আনন্দ-বিরহের রূপ বর্ণনায় কবি-মানসে সর্বদা ভেসে উঠেছে একাধিক রঙের আভা। এরই ফলে কবিতায় কবি-প্রিয়া, রূপ-রঙে হয়ে উঠেছে অধিক আবেগময় এবং জীবন্ত।

রঙ ছাড়া রূপের প্রকাশ অসম্ভব। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিই এর জন্য যথেষ্ট,

এক রাঙা রূপ, পাঁচ রাঙা রূপ এ রয়েছে, বদ-রঙ রূপ তাও আছে; কিন্তু রঙ ছাড়া রূপ তা কোথায়? রূপছাড়া রঙ তা ও নেই! কচি পান পাকা পান শুকনো পান তিন অবস্থাতেই রূপ ও রঙ নিয়ে বর্তে আছে। নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতার গেরুয়াতে গিয়ে পৌছায়। পাতার রূপেরও অদল বদল হয়ে চলছে কালে কালে। রূপে রঙে কোথাও বিচ্ছেদ নেই।[৪১]

রূপ আর রঙ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তির ক্ষেত্রে কথাটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য কবিতা-চিত্রকলায়। কবিতায়, রূপকে কমনীয়- মোহনীয় করে তুলতে হলে বর্ণন ছাড়া গতি নেই। কথার সার্থকতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দর করে তুলে ধরেছেন এভাবে,

কবিতা লিখেই কিছু বলি, আর ছবি দিয়েই বা কিছু জানাতে চলি বর্ণন ছাড়া গতি নেই; নিছক রূপ নিয়ে রচক মানুষ কোথায় কারবার করল তা, উদাহরণ হল—বিজ্ঞানের বই এবং তার পাতায় পাতায় নানা নকসাগুলো, অঙ্ক-শাস্ত্রের পাতায়

> ন-কড়া ছ-কড়া টানগুলো। কিন্তু মানুষ যেখানে রস দিয়ে কিছু বলতে গেলে সেখানেই রূপের সঙ্গে রঙও এসে পড়লো।[৪২]
>
> .... বলার বেলায় রূপ রঙ ভাব ইত্যাদিকে পৃথক করে দেখি, কিন্তু ছবি রচনার বেলায় এদের আর আলাদা করে দেখা চলেনা, এ ওর সঙ্গে মিলে দেয় পরিপূর্ণ রূপটির ছন্দ।[৪৩]

প্রিয়াই হোক- প্রকৃতিই হোক, রূপে-রঙে মিলিয়ে দেখাই সহজ ও স্বাভাবিক। তবে অনেক সময় রূপের আকর্ষণ—রঙের আকর্ষণের চেয়ে বেশী হতে পারে, আবার রঙের আকর্ষণ, রূপের বিপরীতও হতে পারে। নজরুলের প্রেমের কবিতায় রূপ ও রঙ বাক্য এবং অর্থের মতো মিলে আছে। তবে কবির অনেক কবিতায়— রূপের চেয়ে রঙের প্রাধান্যই বেশী। রঙ ব্যতীত রূপের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। প্রমাণ নিম্নোক্ত,

> যখন দূরে থেকে হিমগিরি দেখি তখন রূপ রঙ সমভাবে মনের উপরে কাজ করে। রঙের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে রূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না এবং সে দেখায় রসও পাওয়া যায় না— নিরর্থক দৃষ্টি বদল হয় মাত্র বস্তুর সঙ্গে।[৪৪]
>
> রঙ ফলাইতে কবির কি আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।[৪৫]

উপরোক্ত উক্তি রবীন্দ্রনাথ 'কাদম্বরী'র মহাকবি 'বাণভট্ট-'র কবিতায় রঙ ব্যবহারের নিপুণ দক্ষতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্যবহার করেছেন।

বর্ণপ্রেমিক কবি, নজরুলের প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও একই উক্তি সত্য-সুপ্রযুক্ত। নজরুল নানা বর্ণ দিয়ে রূপ ফোটাতে নিপুণ ছিলেন। কবির কবিতায় 'মহাশ্বেতা' নামটাই যথেষ্ট বর্ণনা হতে পারত। কিন্তু কবি তা না করে মহাশ্বেতার রূপ বর্ণনা করতে হাজারো রকমের সাদা রঙের অবতারণা করে প্রতিষ্ঠিত করেন এ মহাশ্বেতাকে।

নজরুলের প্রেমের কবিতার রঙ-এ আছে কবি-হৃদয়ের বিরাট অংশ। এর মধ্যে রয়েছে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ, অনুভূতির-রঙ। কবিতায় প্রেমিকার রূপ-লাবণ্য বাড়িয়ে তুলতে এ' রঙ অতুলনীয়।

রঙ একটি অসাধারণ প্রকাশক্ষম শিল্প-উপাদান। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তঃসার থেকে রঙের স্বভাব আবিষ্কার করেন। রঙ ব্যবহারে শিল্পীর অনুভূতি- অভিজ্ঞতা অঙ্কের মত হিসাব করে মিলানো সম্ভব নয়। শিল্পী সত্তা যে ভাবে আবিষ্কার করেন, তারই দৃশ্যগত রূপান্তর ঘটে চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু— বর্ণবিভায়। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-এর রঙ তৈরীর প্রচুর অবকাশ আছে। তবে রঙের ব্যবহার অবশ্যই বক্তব্যের সহায়ক হতে হবে। হতে হবে নান্দনিক গুণমানের।

প্রেমের নান্দনিক অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে নজরুল তাঁর কবিতায় যে সব রঙ ব্যবহার করেছেন তা তাঁর একান্ত নিজস্ব আঙ্গিকে সৃষ্ট। কবি প্রেম-বিরহের সুতীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা থেকে উপকরণ নিয়ে, আপন ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতা, স্পর্শকাতরতা এবং শরীর চেতনার স্বাদ মিশিয়ে, তার প্রেমের কবিতা করেছেন রসঘন—আস্বাদযোগ্য।

কবিতায় বহু বর্ণের প্রয়োগ ঘটিয়ে, সার্থক বর্ণসচেতন কবি হিসেবে নজরুল সবার মাঝে আসন পেতে বসতে সক্ষম হয়েছেন। কবির উল্লিখিত প্রেমের কবিতা সমূহে, যে সব রঙ প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে প্রেম-বিরহের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে, ধূসর, লাল, নীল, হলুদ, সাদা, গোলাপী, সবুজ, খয়েরী, সোনালী, রূপালী সহ কামরাঙা, জামরুলের রঙ, পলাশ-মুকুল, নীল ভ্রমরা, আলতা রাঙা, সিঁথির সিঁদুরের রঙ, কাঁচা আঙুরের রঙ, ছাচি পানের কচি-পাতার রঙ, মেহেদী রঙ, পানের পিকের হিঙুল রঙ, কুমকুমের রঙ, মিশকালো সহ আরও বহু অনুভূতিপ্রবণ রঙ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

প্রেমের কবিতায় রঙের শব্দমালা গাঁথায় নজরুল সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক সাধারণ-অদেখা রঙও তাঁর হাতের পরশে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। নজরুলের কাব্যভাবনা এবং বর্ণচেতনা পরস্পর পরিপূরক। তাঁর বর্ণেরা প্রতিভাময় এবং একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত—যাকে বলা যায়, নিস্পৃহ-সুন্দর।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় ব্যবহৃত রঙের অনুভূতি খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রঙের অভিন্নবাদিতা চিহ্নিত করে, প্রতিটি রঙের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিস্পন্দনগত পরিচয়ের একটি তালিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। যার মধ্যে কবির ব্যবহৃত প্রতীকী রঙের মনোভাব, অভিব্যক্তি, পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। প্রক্রিয়াগত তালিকার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রেমের কবিতার রঙ খুঁজলে অনুভূতিশীল পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না, কবি কোন্ রঙ কোন্ অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক করে তা ব্যবহার করেছেন।

নজরুলের প্রেমের কবিতা প্রেমিকার প্রেমাঘাতেরই ফসল। প্রমাণ, নার্গিসকে লেখা শেষ চিঠি, '... যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অখন্ড প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-বেদীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ। আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ, তাই তাকে পেতে চাইনি।' প্রেমাঘাতে কবি হৃদয় যে ক্ষতবিক্ষত, তার প্রমাণ তার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ এবং রঙ। কবিতায় ব্যবহৃত রঙগুলো কবি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি, করেছেন প্রতীকী অর্থে। প্রেমাঘাতের ক্ষত চিহ্ন কবি তাঁর কবিতায় উজ্জ্বল লাল, নীল, গোলাপীর পরিবর্তে 'ধূসর মলিন ছাই'-এর প্রতীক দিয়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন।

চিত্রকলায় লাল, নীল এবং হলুদ রঙ প্রাথমিক স্তরের রঙ। দুটো প্রাথমিক রঙ একত্রে মিশালে তৈরী হয় দ্বিতীয় স্তরের রঙ। তেমনি একটি প্রাথমিক ও একটি দ্বিতীয় স্তরের রঙ মিলে তৈরী হয় তৃতীয় স্তরের রঙ। প্রাথমিক রঙগুলোর উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বেশী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়-স্তরের রঙ সংমিশ্রণের-ফল। এতে রঙ তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে ক্রমান্বয়ে-ধূসরের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে মিশ্র রঙের সাথে সাদার মিশ্রণ ঘটালে, মূল রঙ আরও উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে পান্ডুর অথবা ছাই রঙ-এ পরিণত হয়। এ কারণে ধূসর কোন রঙ-এর পর্যায়ে পড়ে না। এটা একটি রঙের নাম মাত্র। মিশ্রণের ফলে মৌলিকত্ব হারিয়ে বিরহ-বেদনাক্লিষ্ট ভাব জাগাতে 'ধূসর' খুবই ফলপ্রসূ রঙ। নজরুল এ' রঙের বৈচিত্র্য, বিশালতা, নিবিড়তা, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবলোকন করে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করে সার্থক করে তুলেছেন তাঁর প্রেমের কবিতা।

কবি নজরুল প্রেমের অমরতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন সত্যিকার প্রেম বিচ্ছেদের মধ্যে সার্থক হয়। মিলনে প্রেমের ঘটে সঙ্কোচন, বিরহে সম্প্রসারণ। এ কারণেই কবির প্রেমের কবিতার প্রধান রঙ 'ধূসর'। ধূসর শব্দ অথবা প্রতীকের মধ্যদিয়ে নজরুল তাঁর প্রচলিত সমাজ জীবনের অনভ্যস্ত শূন্যতাময় স্বপ্নিল অনুভবকে প্রতিবিম্বিত করতে চেয়েছেন নানা ভাবে।

ধূসরতা-জীবনের অচরিতার্থতা ব্যর্থতার, ক্লান্তির অবসন্নতা মৃত্যুর রঙ,[৪৬]

উক্তির সারবত্তা মাথায় রেখে কবির প্রেমের কবিতা পাঠ করলে দেখা যাবে, ধূসরের বিষণ্ন আমেজ ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতার বহু চরণে এভাবে;- 'এত দিনের অ-বেলায়/ প্রিয়তম!' (পূজারিণী)— 'মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে' (বিধুরা–পথিক)। 'ধূলি অন্ধ ঘূর্ণিসম/দিবাযামি' (পূজারিণী)— 'হাসি হেরে কেঁদেছিনু তুমি কার পোষাপাখী কান্তার বিধুর' (পূজারিণী)— 'ঐ সুদূরের পথ বেয়ে কি দূরের পথিক গেছে চলে' (বিধুরা-পথিক)— 'পোড়াপ্রাণ জানিলনা কারে চাই/ চিৎকারিয়া ফেরে তাই/ কোথা যাই' (পূজারিণী)— 'মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু/ পদতলে ধূলি, উর্দ্ধে তোমার শূন্য গগন মরু/ বাতায়ন পাশে গুবাক তরু' (বাতায়ন পাশে গুবাক তরু)— 'হয়তবা অকারণে ম্লানিমা ঘনায়' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)— 'পরায়ে কাজল মন বেদনার/ ডাগর করে নয়ন তোমার' (আড়াল)— 'নলিন নয়নে ফুলের বয়ান মলিন এ দিনে/ রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেক বেদীনে?' (মানিনী)— 'কার তরে? ছাই এ-পোড়া মুখ আয়নাতে আর দেখবো না' (বিরহ-বিধুরা) কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনায়!' (এ মোর অহঙ্কার)— 'জীবন দেবী/ আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল' (বিজয়িনী)— 'তুমি শাওনের মেঘ যথায় তথায়/ কেবলি-কাঁদিয়া ফের— কাঁদাই স্বভাব' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)—

'পরায়ে কাজল মন বেদনায় / ডাগর করে নয়ন তোমার' (আড়াল)

অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের সারবস্তু হল, কোন দৃশ্য দেখামাত্র শিল্পীর মনে যে মানসিক চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি হয় তার হুবহু রূপদান করা। অভিব্যক্তিবাদীদের মতে, কালো মানেই সব রঙের অবলুপ্তি, আলোর নির্বাসন। ফলে দীর্ঘ দিনের ব্যবহৃত কালো রঙ, যা শোক-মৃত্যু অথবা বিষাদের প্রতিনিধিত্বমূলক রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তা অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের তুলির পরশ থেকে বাদ পড়ে যায়। তবে কবি-সাহিত্যিকদের চিত্রকল্প থেকে কালো আজও বাদ পড়েনি। এরা বস্তুর রূপগত দিকে গুরুত্ব না দিয়ে আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি শব্দ-ছন্দ-উপমায়-ফুটিয়ে তোলার প্রতি বেশী আগ্রহী বলে, কালো রঙ আজও তাঁদের উপমার রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রেমের কবিতায় নজরুল কালোকে ব্যবহার করেছেন ধূসরের প্রতিশব্দ হিসেবে। এ' রঙের মধ্যে কবি তাঁর—বিগত জীবনের বেদনাক্লিষ্ট রূপ-রেখা অঙ্কন করে তাঁর হারানো প্রিয়াকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কবির বিশ্বাস, আলোর সহোদরা অন্ধকার। আলোর যেমনি রূপ আছে, আঁধারের রূপও তেমনি কম বিস্ময়কর নয়। আঁধার, কালো,-শোকের প্রতীক। বিষণ্নতা, মৃত্যু, দুঃখবোধ, বিরহকাতরতার আবেগ কবিতা-ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে কালোর সাহায্য অবশ্যই লাগবে। নজরুলও কালোর সাহায্য নিয়েছেন। তিনি তাঁর ধূসর থেকে ধূসরতর আবেগ ফুটিয়ে তোলার জন্য কালো ব্যবহার করেছেন প্রতীকী রূপে এভাবে, ধূম ধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু ধূমে (পূজারিণী), বিষাদের অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুছবে (অভিশাপ), ইত্যাদি।

প্রিয়ার তিলের দাগ বর্ণনায় কবি কালো ব্যবহার করে এ'রঙের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছেন। বিষাদের পরিবর্তে কবির পরশে কালো হয়েছে লোভনীয়-মোহনীয়। 'আনার লাল লাল/দানার তার গাল/তিলের দাগ তার ভোমরা' (প্রিয়ার রূপ)—

নিশীথ অন্ধকারে প্রিয়ার অভয় বাণী শুনে কবি পুলকদীপ্ত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা মেলে 'পূজারিণী' কবিতার চরণে এভাবে, 'বিস্ময় পুলক দীপ্ত ঝলকে ঝলকে/ বলেছিল গলেছিল গাঢ়ঘন বেদনার মায়া, করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিনী/ অন্ধকার নিশীথিনী কবি।'

চৈতী হাওয়া'য় কবি-প্রিয়া হারিয়ে কালোর প্রতীক দিয়ে কবি শোক প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় কালোর সাথে অন্যান্য রঙ মিশিয়ে,

> মিশকালো মোষকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদ আলাদা রঙ আলাদা আলাদা রূপ[৪৭]

প্রকাশ করে কবি প্রিয়াকে পাঠক সম্মুখে পরিচয় করিয়েছেন এ'ভাবে; 'হারিয়ে

গেছে অন্ধকারে পাইনি খুঁজে আর' (চৈতী হাওয়া)— 'হাতড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়া আকুল অন্ধকার' (চৈতী হাওয়া)— 'শূন্য ছিল নীলোৎপল' (চৈতী হাওয়া)— 'কোন্ কালোর কোন্ ভালোরে ভাসলে জলে' (বিধুরা পথিক- প্রিয়া)— 'গভীর ব্যথার ছায়া দোলে' (মানসে -বধূ)— 'নিশীত রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর-সারি' (বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর-সারি)— 'তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখি জল রেখা' (বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি)— 'তোমার বনের লতায় পাতায়/ কালো মেঘে তার আলো ছড়ায়' (অপরাধ শুধু মনে থাকে)— 'আজি কি তোমার চন্দ্রের বুকে কালো কলঙ্কের ছাপ?' (আড়াল)— 'উড়িয়া বেড়ায় সখি/ কামিনী কাজল আঁখি' (মাধবী-প্রলাপ)— 'ঐ বিষ মাখা মিশকালো দোয়েলীর বিষ' (মাধবী-প্রলাপ)— 'সূর্মারেখার কাজল হরফ নয়নাতে আর দেখ্‌বো না' (বিরহ-বিধুরা)।

চিত্রকলায় কালোর বিপরীত রঙ সাদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে চিত্রকলায় সাদা, শুভ্রতা, পবিত্রতা-শান্ত সুন্দর ভাব, উষার নির্মলতা, শুচিতা'র প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসৃছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সকল সুস্থ এবং কল্যাণময়ী মানুষ এক বাক্যে 'সাদা'-কে যুদ্ধবিরোধী- তথা শান্তির প্রতীক রঙ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। ফলে-এর অর্থ হয়েছে আরো বিস্তৃত ও সংহত।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় ব্যবহৃত সাদাকে পাই বিশেষ এক ঐতিহ্য-মন্ডিত রূপে। কবি তাঁর কবিতায় সুদূর অতীতকে বুঝানোর উপমা হিসেবে সাদা রঙ ব্যবহার করে, চমৎকার ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে সাদাকে ব্যবহার করেছেন এ'ভাবে,

'দূরে সাদা মেঘ ভেসে যায়-শ্বেত সারসী' (মাধবী- প্রলাপ)— 'আবার যে দিন, শিউলি-ফুটবে ভরবে তোমার অঙ্গন' (অভিশাপ)— 'খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে ঠোঁটে দিতাম মউ (চৈতি হাওয়া)— 'দুষ্ট রাজহংসী জিনি চিনি সব চিনি' (পূজারিণী)— 'পড়ল মনে টগর চাঁপা বোন চামেলী যুঁই' (চৈতী হাওয়া)— 'স্মরণ পারের গন্ধ পাঠায় কমলা লেবুর ফুল' (চৈতী হাওয়া)— 'খোঁপায় গুঁজে কনক-চাঁপা গলায় টগর মালা/ হেনার গুছি-হাতে বেড়াও নদী-কূলে বালা'— 'ভূঁই-তারকা সুন্দরী/ সজনে ফুলের দল ঝরি' (চৈতী হাওয়া)— 'শ্বেত চন্দন লাল/করেছি লেপন?' (মাধবী প্রলাপ)— 'তুমি আমার বকুল যুথী-মাটির তারা ফুল', (এ মোর অহংকার) ইত্যাদি।

শুভ্রতা-পবিত্রতা এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে কবি সাদা রঙ যে ভাবে কবিতায় ব্যবহার করে ভাব প্রকাশে তৃপ্ত হয়েছেন, তার উদাহরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়; 'আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার-অঙ্গন' (অভিশাপ)— 'সুন্দর, কঠিন, শুভ্র, ভোরের উষসী '(তুমি মোরে ভুলিয়াছ)' চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ-ঘাসের রোয়ায় '(মানস-বধূ)' ফুটবে আবার দোলন-চাঁপা চৈতী রাতের-চাঁদনী' (অভিশাপ) কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে' ('বর্ষা-বিদায়)' 'শ্বেত কবরীর সাথি

আমি হেমন্তের সন্ধ্যা কুহেলিতে/দাঁড়াই দিগন্তে আমি (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)'।

কবির ক্যানভাসে রোমান্টিক ভাব প্রকাশে সাদার ব্যবহার আরও অদ্ভুত;—'শিউলি ঢাকা মোর সমাধি' (অভিশাপ)', 'ঝরিছে শিশিরসিক্ত শেফালি নিশি ভোর অনুপম! (বর্ষা-বিদায়)।

বার্ধক্য–পূর্ণতার প্রতীকী রংও 'সাদা'। তবে কবি নজরুল প্রেমের কবিতায় শোক প্রকাশে সাদা রঙ ব্যবহার করে সবাইকে অবাক করেছেন এভাবে, 'সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা' (বর্ষা–বিদায়)। 'ওকি পাইয়া পীড়ন-জ্বালা/তপ্ত উরসে বালা/ শ্বেতচন্দন লালা/করেছে লেপন?' (মাধবী-প্রলাপ)।

সবুজ, প্রাণশক্তির প্রতীক, তারুণ্যের রঙ। তারুণ্যের আশা-আকাঙ্খা ফুটিয়ে তুলতে এ' রঙ সহায়ক। যৌবনে কবির শান্ত-সৌম্য-নির্জন মানস মগ্ন ছিল বাংলার আকাশ-বাতাস, নদী-মাঠ, সবুজ ক্ষেতের ভালবাসায়। নিসর্গের মিষ্টি সবুজ, কবিকে সম্মোহিত করলেও প্রেমের কবিতায় কবির সবুজের পরশ একটু ভিন্নতর ভাবে লেগেছে। কবি তাঁর কবিতায় স্যাপগ্রীন (কাঁচা সবুজ) ব্যবহার করেছেন প্রেমিকার মুখচ্ছবির সৌন্দর্য এবং সতেজতার উদ্দেশ্যে। উদাহরণ,

'কামরাঙা রাঙলে ফের। পীড়ন পেতে ঐ মুখের' (চৈতীহাওয়া)— 'যেন ছাচি পানের কচিপাতা প্রজাপতির ডানায় চোঁয়ায়' (মানস-বধূ)— 'বিধুর-অধর-সীধু যেন নিঙরে কাঁচা আঙুর চোয়ায়' (মানস-বধূ)— ' সে যে সবুজ দেশের অবুঝ পাখী কখন্ এসে যাচবে বাঁধন' (বিধুরা পথিক-প্রিয়া)-প্রভৃতি।

সবুজ অশান্ত কবিচিত্তে তৃপ্তি-শান্তি এবং আশার সঞ্চার করলেও, কবিতায় মলিন সবুজ ব্যবহারে ঈর্ষা, লোলুপতা এবং চির নীরবতার ভাব সহ বিস্বাদের স্বাদ ফুটিয়ে তুলতে কবি সার্থক হয়েছেন তার প্রেমের কবিতায়। উদাহরণ লক্ষণীয়; 'আকাশ ঢেকেছে তার পাখা/ কামনার সবুজ বলাকা' (অ-নামিকা)— নিবিড় নয়ন পাতার কোলে/ গভীর ব্যথার ছায়া দোলে (মানস-বধূ)। 'অধর -আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষ্ণা শুষ্ক মুখে' (আলতা-স্মৃতি)— 'মলিন চাওয়া (ছাওয়া) যেন দূরের সে কোন সবুজ ধোঁয়ায় (মানস-বধূ)। কবি শিল্পীর কাছে অনুরাগের-রঙ ফুটে ওঠে প্রেমের বিচিত্র উদ্দীপনায়। নজরুলের প্রেমের কবিতায় বিষণ্নতার ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও রোমান্টিক ভাব-ভাবনা যে বিরল, এমন কথা ঠিক নয়। লাল রঙ এবং লালের নানা বর্ণবিভার মধ্যদিয়ে নজরুল তাঁর কবিতায় এক উজ্জ্বল প্রেমভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এ'ভাবে; 'আপনারে দাহ করি মোর বুকে জ্বালিয়াছ আলো' (পূজারিণী)— 'লাল রঙিলা করবো না করবো না কর মেহ্‌দী হেনার ছাপ ঘ'সে' (বিরহ-বিধুরা)— সেদিন যে জ্বলছিলে দীপালী আলোক' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)।

যুবক কবির অনেক কবিতা যৌবনের রক্তরাগে 'ক্রিমসন রেড'-(রক্তলাল) হয়ে

উঠেছে বটে, তবে কবির সমসাময়িক ঐতিহাসিক নিধনযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দ্বন্দ্বময় মানস যন্ত্রণা–সংকুল অবস্থা, 'ক্রিমসন রেড'-এ ব্যক্ত হয়েছে তীব্র ক্ষোভের অনুভূতি।

চিত্রাঙ্কনে লাল রঙ উষ্ণতা-উত্তেজনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'লাইট রেড', ভোরের আকাশের মত লাল -আশা, প্রসন্নতা; ঈষৎ হরিৎ বর্ণের লাল -উৎসাহের ভাব প্রকাশে সহায়ক; 'ভারমিলিয়ন রেড', সিঁদুর লাল ভালবাসার প্রতীকী রঙ।

নজরুলের কবিতার উষ্ণতা–উত্তেজনা, গ্লানি এবং বিক্ষত মানসিকতার সহযোগী হিসেবে লাল রঙ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার উদাহরণ,

'হাহাকার–করতালি বাজা! জ্বালা তোর-বিদ্রোহের/ রক্ত শিখা অনন্ত পাবক' (পূজারিণী)— 'আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চুড়ে/ বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে, (কবিরাণী)— 'হিংসা হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা' (পূজারিণী)— 'আমার প্রাণের-রক্ত কমল/নিঙড়ে হল লাল-পদদল' (আলতা স্মৃতি— 'আন্ তোর বহ্নি রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী' (পূজারিণী)— 'আপনারে দাহকরি মোর বুকে জ্বালিয়াছ আলো,/বারে বারে করিয়াছ তব পূজারিণী' (পূজারিণী)— 'চরণ অলক্ত–রাঙা দুটি বালু কণা' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)— 'পোড়া প্রাণ জানিলনা কারে চাই' (পূজারিণী)— 'কাঁটা-বেঁধা রক্তমাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে' (পুজারিণী)— 'আমার-রক্তে চরণ রেখে তাহার বুকে মরেছিলে/আলতা যেদিন পরেছিলে' (আলতা-স্মৃতি)— 'ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী/জাগিলনা পাষাণ প্রতিম' (পূজারিণী)— 'চোখপুরে লাল-নীল, কত রাঙা, আবছায়া ভাসে' (পূজরিণী)— 'হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রুরাঙা বেদনার রসে যেতো ছেয়ে' (পূজারিণী)— 'জ্বলে উঠে-এইবার-মহাকাশ ভৈরবের নক্ষত্রজ্বালা' (পূজারিণী)।

পায়ে রক্তজবা লাল পদ্মের অর্ঘ দিয়েও প্রেমিক পূজারিণীর মন জয় করতে পারেন নি। বিনিময়ে পূজারিণীর কাছ থেকে পেয়েছে আঘাত। 'পূজারিণী' কবিতা নজরুলের আঘাতেরই ফসল, যার প্রধান রঙ লাল। প্রমাণ হিসেবে কবিতার উক্তিই যথেষ্ট,

'এই ভাঙ্গা বুক/ঐ কান্না -রাঙা মুখ থুয়ে লতা-সুখে/বল্ মোরে বল্' (পূজারিণী)। 'রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়ে'। 'যতদিন দেখেনি তোমার বুক ঢাকা রাঙা-রাঙা আলো'। 'জীবনের ফোটো ফোটো-রাঙা নিশি-ভোর। 'তারপর অনাদরে বিদায় অভিমানে রাঙা।' 'যা বলি ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্তঝরা প্রাণ-রাঙা অশ্রু-ভাঙ্গা ভাষা'। 'রক্ত-সুধা বিষ আন্ মরণের ধর্ টিপে টুটি'। 'ভুখারীর রাঙা বুকে পুলকের রাঙা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে।' 'সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি'। 'কুসমী রাঙা শাড়িখানি/ চৈতি সাঁজে পরবে রানী/আকাশ গাঙে জাগবে

জোয়ার রঙের রাঙা বান' (এ মোর অহংকার)।

উজ্জ্বল বর্ণ হিসেবে লালকে নজরুল তাঁর রোমান্টিক আকুলতার আকাঙ্খায় ব্যঞ্জিত করেছেন। প্রিয়ার দেহজ-রূপ বর্ণনায় কবি এ'রঙটি যথাতথা ব্যবহার করেছেন এ'ভাবে,

'তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে দিতে পারে মোর/সব জ্বালা সব দগ্ধক্ষণ' (পূজারিণী)। 'অধর নিস্‌পিস্/নধর কিসমিস্/রাতুল তুলতুল কপোল' (প্রিয়ার-রূপ)। 'যেন কোন রূপ কমলেতে মোর ডুবে গেছে আঁখি' (পূজারিণী)। 'ছিল আশা ছিল সিক্ত, বিশ্বটারে টেনে ছিঁড়ে এর রাঙা/পদতলে ছিন্নরাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে' (পূজারিণী)। 'সিঁদুর মুখটুকু/ হিঙুল টুকটুক। দোলক ঘুমায় বুকেই' (প্রিয়ার-রূপ)। 'কুমারী বুকের এতসব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো' (পূজারিণী)। 'ললাট ঝলমল/মলাট মল্‌মল্/টিপটি টল্ টল্ সিঁথির' (প্রিয়ার-রূপ)। 'রাগে অনুরাগে রাঙা হ'ল আঁখি বন-বৌ'র (মাধবী প্রলাপ)। 'আনার লাল লাল /দানার তার গাল/তিলের দাগ তায় ভোমর' (প্রিয়ার রূপ)। 'কার রাঙা পায়ে সাগর বাঁধিয়া করিয়াছি মঞ্জীর' (আড়াল)।

ইমপ্রেশনিষ্ট বা 'বিম্ববাদী শিল্পী', বস্তুতে আলোর প্রতিফলনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রঙ দেখতে পান। বস্তুর কোন নিজস্ব রঙ নেই। একটি প্রধান উৎসের প্রতিফলনে হাজারো রঙের প্রতিফলন ঘটে বস্তুর উপর।

বৈপরীত্যের মাধ্যমে একটি বস্তু দৃষ্টিগোচরে আসে। যেমন সাদার বিপরীতে কালো। আকাশের বিপরীতে গাছগুলোকে সুস্পষ্ট দেখায়—সবই বৈপরীত্যের কারণে। বস্তুর যে অংশে আলোর পরশ লাগে সে অংশের দীপ্তি, ছায়াচ্ছন্ন অংশগুলোর চেয়ে বেশী থাকে।

জলের মধ্যে মাছকে কখনো সোনালী, কখনো লাল-নীল-হলুদ দেখার একমাত্র কারণ আলোর প্রতিফলন। মেঘমুক্ত আকাশপানে তাকালে দেখা যাবে নীলাভ সমুদ্রে নক্ষত্ররাশি ভেসে বেড়াচ্ছে। আবার মেঘের আনাগোনায় জ্যোৎস্নার রঙ পরিবর্তিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। প্রথমে রূপালী জ্যোৎস্না অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, পরে বিকেলের মেঘের অবগুণ্ঠনে হলুদ জ্যোৎস্না, সবশেষে অস্পষ্টতায় ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো হয়ে ধরা দেয় বিম্ববাদী কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের চোখে।

আলোর প্রতিফলনে বস্তুর বর্ণবিভার অদ্ভুত পরিবর্তন, সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধরা পড়ে নজরুলের প্রেমের কবিতা, পূজারিণী, অভিশাপ, চৈতীহাওয়া, বিধুরা-পথিক, মানসবধু, বাতায়ন পাশে-গুবাক-তরুর সারি, এ মোর অহংকার, অপরাধ শুধু মনে থাক, আড়াল, তুমি মোরে ভুলিয়াছ প্রভৃতির বিভিন্ন চরণে।

উক্ত কবিতা কবির স্বপ্ন এবং অতীত ইতিহাসের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। স্মৃতি এবং

স্বপ্নের বিশিষ্টবর্ণগুলো, কবিতার আবেগ বাড়িয়ে পাঠক চিত্তে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর বিকিরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বিম্ববাদী কবির মত নজরুল এখানে বস্তুর কোন স্থায়ী রঙ না দেখে, বস্তুর তাৎক্ষণিক বর্ণ সমাবেশ অবলোকন করে, কলমের-আঁচড়ে আলোর সংকেতে কবিতায় বিভিন্ন অনুভূতি সঞ্চার করতে চেয়েছেন এভাবে,

'ধূলি অন্ধ-ঘূর্ণিসম দিবা যামি' (পূজারিণী) 'দিনান্তের প্রান্তে বসি' আঁখি নীরে তিতি/আপনার–মনে আমি ভাবি দূর দূরান্তের স্মৃতি' (পূজারিণী), 'অস্ত পারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুছবে (অভিশাপ), 'জীবনের ফোটা ফোটা রাঙানিশি ভোর' (পূজারিণী), 'ফুটবে আবার দোলনচাঁপা চৈতীরাতের চাঁদনী' (অভিশাপ), 'পাহাড়তলীর শালবনায়/বিষের মত নীল ঘনায়!' (চৈতীহাওয়া), 'ওযে গুবাক–তরুর চিকন পাতার বাদল–চাঁদের মেঘলা মায়া' (বিধুরা-প্রিয়া), 'নিবিড় নয়ন পাতার কোলে/ গভীর ব্যথার ছায়া দোলে' (মানস–বধূ)। 'ওগো বন্ধুরা, পান্ডুর হয়ে এলো বিদায়ের রাতি' (বাতায়ন পাশে–গুবাক-তরুর-সারি), 'তোর রূপে আমার ভুবন/ আলোয় আলোয় হল মগন' (এ মোর অহংকার), 'তোমার–বনের লতায়-পাতায়/ কালো মেঘ তার আলো ছড়াক'(অপরাধ শুধু মনে থাক), 'আমার তারার মলিন আলোক/ ম্লান হয়ে যাবে দীপ শিখা চোখে' (আড়াল), 'নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালী আলোক' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'ললাট ঝলমল্' (প্রিয়ার রূপ)।

বস্তু বহুশত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত থাকে। কবি সেগুলো হৃদয় তাপের উপলব্ধিতায় এনে, আস্বাদ নেন একান্ত মমত্ববোধে। এতেও কবির বর্ণপিপাসু আত্মার তৃপ্তি না হওয়ায়, তাঁর দৃষ্টি পড়ে আকাশের দিকে। দৃষ্টিসীমায় ভেসে ওঠে সাদা মেঘরাশি, কখনো রক্ত–মেঘ মন্দিরের বেদী, কখনো গগনে নিভে যাওয়া বিজলীর দীপ, আবার কখনো কখনো শাওনের মেঘ, রাঙা উষার-রাঙা সতীন। অনেক সময় কবি মেঘের পানে তাকিয়ে অশ্রুজলে বুকও ভিজিয়েছেন। মেঘের গাঢ়-লঘু দীপ্তি নির্মাণে কবির কবিতায় চরণগুলো এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে,

'তোমার আঁখির ঘন-নীলাঞ্জন-ছায়া/গগনে আজ ধরিয়াছে কায়া' (তোমারে পড়িছে মনে), 'খুঁজেছে মেঘে পরদেশী কোন পলাতকার নয়ন অমিয়?' (বিধুরা পথিক-প্রিয়া), 'বাদল-চাঁদের মেঘ্লা মায়া'(বিধুরা পথিক-প্রিয়া), 'কালো মেঘে তার আলো ছড়াক' (অপরাধ শুধু মনে থাক), 'স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে ও কি!/ মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!' (গোপন প্রিয়া), 'কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘ' (বর্ষা-বিদায়), 'আমার অশ্রুমেঘে ভেসে গেল তব ফুল-উৎসব!, (আড়াল), 'দূরে-সাদা মেঘ ভেসে যায়–শ্বেত সারসী' (মাধবী–প্রলাপ), 'তুমি শাওনের মেঘ' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'অশ্রুর শ্রাবণ–মেঘে হারাইয়া ও সখি' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে' (বিধুরা পথিক–প্রিয়া)।

প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে আলোর সাহচর্যে আপন রূপ পালটাচ্ছে রাত্রি থেকে ভোরের আলোয়, ধূসর গোধুলী থেকে সন্ধ্যার গভীরে। নজরুল দ্রুততার সাথে প্রকৃতির পরিবর্তিত অপরূপ রূপ ধরে রেখেছেন শব্দ-ছন্দের সমন্বয়ে তাঁর কবিতায় নানা আলোর বর্ণবিভায়।

আলোর রঙ লাল। এ'লাল উষ্ণ নয়, স্নিগ্ধ। কবি বিম্ববাদী বিজ্ঞ কবিদের মতো কবিতায় লাল রঙ ব্যবহার করে দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোর বিচিত্র এফেক্ট ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর প্রেমের কবিতায়। দুপুরের আলোর রঙ কবি কখনো মেঘমলিন, কখনো কমলা, কখনো জাফারানী রঙ দিয়ে সাজিয়েছেন। বিকেলের আলোর রঙ কবির কাছে কখনো হাল্কা লাল; সকালের আলো সুন্দর, কঠিন-শ্রভ্র; চৈতী আকাশের রঙ-রঙের রাঙা বানের মতো কবির কাছে মনে হয়েছে।

শিল্পীর মতো কবির চোখও লালের মধ্যে বহু দীপ্তিগত প্রকাশ ধরা পড়েছে। নজরুলের প্রেমের কবিতার রঙগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে কবি লাল-হলুদের মিশ্রণ ঘটিয়ে রঙের দীপ্তিগত আভার পরিবর্তন করে গোলাপী তৈরী করে, উষ্ণ লালকে শীতল করে তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে প্রফুল্লতার ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এ'ভাবে,

'উন্মুখ বেদনামুখী আমি উষা-সম' (পূজারিণী), 'পদতলে ছিন্নরাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে' (পূজারিণী), 'আপন জেনে হাত বাড়ালো/আকাশ-বাতাস-প্রভাত আলো' (কবিরাণী), 'অধর নিস্‌পিস্/নধর কিসমিস্/রাতুল তুলতুল কপোল' (প্রিয়ার-রূপ),'কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিলে' (চৈতী হাওয়া), 'জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম' (অহঙ্কার), 'আমার প্রাণের রক্ত কমল/নিঙড়ে হল লাল' (আলতা স্মৃতি), 'ম্লান তার লাল গালের লালিম' (মানস-বধূ), 'রোদপাকা আধডাশা ডালিম' (মানস বধূ), 'রক্ত-কমল কুড়ির সম চিবুকটি তার নামায়' (ছল-কুমারী), 'ও মুখ কমল হয়ে উঠেছিল রাঙা হয়ে' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'ভাসাই আমার গানের কমল তোমার পানে চেয়ে' (নদী পারের মেয়ে),'কামরাঙারা রাঙলে ফের পীড়ন পেতে ঐ মুখের' (চৈতী হাওয়া), 'রাঙা বৌ-বনবধু রাগিল না কি!' (মাধবী-প্রলাপ), 'রসের পীড়ায় টস্‌ টসে বুক ঝুরছে গোলাবজাম' (চৈতীহাওয়া)।

'ভারমিলিয়ন রেড', সিঁদুর লাল—কবিতা, সাহিত্য এবং চিত্রকলায় প্রেমের প্রতীকী রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। প্রমীলার সিঁথিতেও কবি দীর্ঘদিন এ' প্রতীক লক্ষ্য করেছেন।

প্রেমের কবিতায় নজরুল সিঁদুর রঙ ব্যবহার করেন ভালবাসার এক অদ্ভুত আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, যা ধরা পড়ে কবির বিভিন্ন কবিতায় এ'ভাবে,

'সিঁদুর মুখটুকু/ হিঙুল টুকটুকু দোলক ঘুম যায় বুকেই' (প্রিয়ার-রূপ), 'সিঁথির-

বীথির খ'সে পড়া কপোল ছাওয়া চপল অলক' (মানস-বধু), 'আলতা রাঙা পা দু'খানি ছুপিয়ে নদী জলে' (নদী পারের মেয়ে), 'তার আঁখি হাসি কুমকুম/ ভাঙিল কি কাঁচা ঘুম?' (মাধবী প্রলাপ), 'হয়তবা অকারণে গোধুলী বেলায়/ হয়তবা অকারণে ম্লানিমা ঘনায়' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'হিজল শাখায় ডাকত পাখী, বউগো কথা কও' (চৈতী হাওয়া), 'পাশে লাজ-বাস বিসরি'/ জামরুল কিশোরী' (মাধবী-প্রলাপ)।

লাল রঙ যখন গ্লানি, বিক্ষত মানসিকতা, ধ্বংস, সংঘর্ষ এবং তাপের অনুভূতি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে তখন তার লেখনী থেকে বেরিয়ে আসা চরণগুলো নিম্নরূপ, 'আজ বিদ্রোহীর-এই রক্ত রথের চুড়ে/ বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে' (বিজয়িনী), 'চোখপুড়ে লাল-নীল কত রাঙা আবছায়া ভাসে/ আলো আসে' (পূজারিণী), 'যা বলিব আজ ইহা গান নহে ইহা শুধু রক্তঝরা প্রাণ রাঙা/ অশ্রু-ভাঙ্গা ভাষা' (পূজারিণী), 'সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে ক'রেছিলে/ আলতা যেদিন পরেছিলে'? (আলতা- স্মৃতি), 'জ্বাল দীপ বিষাদিনী ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'তোমার গগনে নিভে যাবে বিজলীর দীপ' (তোমারে পড়িছে মনে), 'ম্লান তার লাল্ গালের ডালিম' (মানস-বধু)।

প্রেমের কবিতায় -নজরুল 'লাল' রঙের সমর্থক রঙ হিসেবে রাঙা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো রাঙার পরিবর্তে কবি পিঙ্গল, কুমকুম, আলতা, জাফরানী, কিস্‌মিস, আনার, গোলাবজাম, জামরুল, ডালিম-এর রঙ ব্যবহার করে লালের আভা প্রকাশ করেছেন। রক্তকমল, পিকের হিঙুল-রঙ, গোধুলীবেলা, কমল-ঝিল রাঙা মুখ, রক্তমাখা প্রাণ, হোম শিখা, রাগ রাঙা আলো, দাহকরি, রাঙা নিশি, রাঙা মুখ-স্মৃতি, রাঙা বান ডাকা, রক্ত রথ প্রভৃতি প্রতীক শব্দ লাল রঙের সমর্থক রঙ হিসেবে ব্যবহার করে কবি তাঁর কবিতায় প্রেমভাবকে আরও বেশী আবেগময় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। লালের এহেন প্রয়োগ সত্যি অপূর্ব। লালের-নানা বর্ণবিভা সৃষ্টিতে নজরুল একজন দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রেমের কবিতায়।

সোনালী আনন্দের রঙ-আবেগের রঙ। এ রঙ প্রেমের রঙও বটে। উজ্জ্বল স্বপ্ন এবং পরিচ্ছন্ন আনন্দের ভাব সোনালী রঙ দিয়ে যেভাবে প্রকাশ করা যায়, অন্য রঙে তেমন সম্ভব নয়।

নজরুলের প্রেমের কবিতা বিরহ-বেদনা এবং প্রিয়া-মিলনের আহাজারিতে ভরপুর হলেও কবিতায় প্রিয়ার রূপ-লাবণ্য, স্বপ্নিল-আনন্দভাব ফুটিয়ে তুলতে 'সোনালী' ব্যবহারে ভুল করেন নি কবি।

'প্রজাপতির-ডানা ঝরা সোনার টোপাতে' (চৈতী হাওয়া)' থাকবে তুমি ছায়ার সাথে/মায়ার মত চাঁদনী রাতে!' (গোপন প্রিয়া), 'বন্দিনী! মম সোনার ছোঁয়ায় তব ঘুম ভাঙাইনু!' (আড়াল), 'মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ/ সোনার সোনায় বিনা প্রয়োজন?'

(ভীরু), 'খুশীর রঙে রাঙাবে সোনা ধূলি মুঠিরে' (এ-মোর অহংকার)।

রূপালী আলো, রূপালী-চাঁদ, রূপালী রঙ মানব মনে শান্ত-স্নিগ্ধ ভাবনায় সাহায্য করে। নজরুল-মানস অশান্ত, অস্থির এবং প্রেমচঞ্চল থাকলেও, প্রেমিকার শীতল পরশে কবি-মানসে জেগেছিল শান্ত-স্নিগ্ধ ভাবরাশি। একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে, অভিনব রঙ আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে প্রেম, হতাশা, স্মৃতি প্রভৃতি ভাব-ভাবনা ও অনুভূতিকে 'রূপালী রঙ ' বা প্রতীকের মাধ্যমে, কবি তাঁর কবিতার-চরণে অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদাহরণ লক্ষণীয়,

'আকাশ ভরা-হাজার তারা' (এ-মোর অহংকার), 'ধরা পড়েছে, দ্বিতীয়ার চাঁদ ইহুদী দুল' (চৈতী হাওয়া), 'ছিল না তো স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ' (এ-মোর অহংকার), 'আধ খানা চাঁদ আকাশ পরে' (এ-মোর অহংকার)', 'হাজার তারার মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন' (মালিনী), 'ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পার্সি দুল' (এ-মোর অহংকার), 'যেন গুবাক-তরুর-চিকন পাতায় বাদল চাঁদের মেঘলা মায়া' (বিধুরা পথিক-প্রিয়া), 'যে চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই' (গানের আড়াল)। 'জ্যোৎস্না তাহার তোমার ধরায়/যদি গো এতই বেদনা জাগায়' (অপরাধ শুধু মনে থাক), 'থাকবে তুমি ছায়ার সাথে মায়ার মত চাঁদনী রাতে!' (গোপন প্রিয়া), 'কল্পনাতে থাকবে তোমার চাঁদ চুয়ানো মুখ'! (গোপন প্রিয়া) ইত্যাদি।

কবি মানেই চিত্র শিল্পী, বাণীচিত্র শিল্পী। কবিতার বাণীতে রঙের ছোঁয়া দিয়ে নজরুল বর্ণবৈভবের পরিচয় দিয়েছেন রঙের বিপরীত সমাবেশ ঘটিয়ে। দক্ষ চিত্রকর যেমনি একটি উজ্জ্বল রঙ-এর বিপরীতে আর একটি উজ্জ্বল রঙ সাজিয়ে রঙের সমতা আনেন, তেমনি নজরুল তার কবিতায় লালের বিপরীত নীল সাজিয়ে, বিদ্রোহ-প্রেমভাবের পাশাপাশি উদাস-বিষাদ ভাব এনে সুন্দর ভাবের রঙের সমতা সৃষ্টি করেছেন এ'ভাবে,

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে

[বিজয়িনী]।

আর্টিস্ট কবিভক্ত। এরা একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা । উন্নততর সৃজনীক্ষমতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক। এদের মন এমনই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার এদের পক্ষে সহজ। রূপ ভেদাভেদ জ্ঞান ও রহস্য প্রকাশই আর্টিস্টের প্রধান কাজ। এ কারণে 'আর্টিস্ট' শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 'রূপদক্ষ' হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কবিতায় রঙ ব্যবহারে নজরুল একজন 'রূপদক্ষ'। অন্যান্য রঙের মতো প্রেমের কবিতায় কবির নীল রঙের ব্যবহার অতি চমৎকার। চিত্রকলায় নীল সাধারণতঃ প্রশান্তি, ন্যায় ও সততার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মলিন নীল নিরুৎসাহ ভাব

প্রকাশের সহায়ক রঙ। কবিমানসের সহায়ক ভাব ফুটিয়ে তুলতে প্রেমের কবিতায় কবি যে নীলের ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব রঙ। কবির কাব্যদর্শনের নিগূঢ় বক্তব্য, ব্যথা-বেদনা, দ্বন্দ্ব প্রকাশে নীলের ব্যবহার এক অদ্ভুত প্রাণচঞ্চলতার সৃষ্টি করেছে। অনুভবগত বিষয়ের অনুসঙ্গে 'নীল' রঙ-এর ব্যবহারে নজরুল আধুনিক মননের পরিচয় দিয়েছেন। কতো বিচিত্রভাবে তাঁর কবিতায় এ বিশেষ বর্ণটি উপস্থাপিত হয়েছে, তার কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল 'তব প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি' (পূজারিণী), 'চাইবে কেঁদে নীল নভোগায়' (অভিশাপ), 'মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে' (বিধুরা পথিক-প্রিয়া), 'নীলাভ তোমার আঁখি হয়েছে ম্লান' (তুমি মোরে ভুলিয়াছে), 'আজ নলিন নয়ন মলিন কেন বল সখি বল বল' (বিধুরা পথিক–প্রিয়া), 'নীলিম-আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেঘ-অবগুণ্ঠন ফেলে' (মিলন-মোহনায়)', 'ওকে সূর্মা মাখায় নীল ভোমরা পাখায়', (মাধবী-প্রলাপ), 'যখন ধরণী-নীলিমা মঞ্জুষা খুলি' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর-দীঘির নীল!' (চৈতী হাওয়া), 'বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে' (কবিরাণী) প্রভৃতি কবিতার চরণে কবি মানসে প্রেমিকার প্রশান্তি ভাবই প্রকটভাব ফুটে উঠে।

আধুনিক মননজাত যন্ত্রণাসঙ্কুল দ্বন্দ্বময় মানসিকতার অনুসঙ্গে 'নীল' কবির লেখনীতে এসেছে এ'ভাবে; 'আজ নলিন নয়ন মলিন কেন বল সখি বল বল' (বিধূরা পথিক–প্রিয়া)। 'নলিন নয়ান ফুলের–বয়ান মলিন এ-দিনে' (মালিনী)। 'পাহাড়তলীর শালবনায়/বিষের মত নীল ঘনায়' (চৈতী হাওয়া), 'সেই চাহনী নীল কমল/ ভ'রল আমার মানস জল' (চৈতী হাওয়া), 'কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল' (চৈতী-হাওয়া), 'কপোল–কোল্ ছায়/চপল টোল, তায়/ নীলের রাগ তার চুমোর' (প্রিয়ার-রূপ), 'দেবো যে-বিষ প্রাণ করেছি নীলের নয়ন-গালা (দহন-মালা) ইত্যাদি।

রোমান্টিক এবং ভয়াল উপমার অনুসঙ্গে কবি নীল রঙ ব্যবহার করেছেন আর এক অভিনব পন্থায়,

'ওকে সূর্মা মাখায়–নীল ভোমরা পাখায়/ কালো কোয়েলার রূপে ওকি' (মাধবী-প্রলাপ), 'ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি, –তোমার সুনীল ঝালর দোলে' (বাতায়ন পাশে-গুবাক–তরুর সারি), 'চপল টোল, তার /নীলের রাগ তায় চুমোর' (প্রিয়ার রূপ)।

নীল প্রাথমিক রঙগুলোর অন্যতম একটি রঙ। নীলের সাথে অন্য রঙের মিশ্রণের ফলে দ্বিতীয় স্তরের রঙে পরিণত হয়ে নীলাভ রূপ ধারণ করে, যা প্রাথমিক নীলের চেয়ে আরও মিষ্টি রঙ। কবি নজরুল নীলের সমর্থক রঙ 'নীলাভ' ব্যবহার করে কবিতায় সুন্দর-স্বপ্না ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন।

'নীলাভ তোমার আঁখি হয়েছে ম্লান'। 'তোমার আঁখির ঘন নীলাঞ্জন ছায়া'।

'যখন ধরণী নীলিমা মঞ্জুষা খুলি'। 'কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল', ইত্যাদি শব্দের মধ্যদিয়ে নীলের বর্ণবিভা আরও সুন্দর ভাবে উপলব্ধিতে আসে। 'লিমন ইয়েলো' বা কাঁচা হলুদ, চিত্রকলায় উৎফুল্লতা এবং আনন্দের ভাব প্রকাশের সহায়ক রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বসন্তের আবেগ এবং ধর্মীয় পবিত্রতার ভাবও সুন্দর ভাবে এ রঙ-এর মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব। কবি মানসের বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশের জন্য নজরুলের কবিতায় লাল-নীল, সাদা-কালোর মতো হলুদের ব্যবহারও ব্যাপক। এ রঙের মধ্যে আছে কবির হৃদয়ের অংশ—এ শুধু বস্তুর রঙ নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ এবং অনুভূতির অপরূপ আলিম্পন।

'তোমার-পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদনী ঘুমাবে যখন' (বাতায়ন পাশে-গুবাক-তরুর-সারি)। 'হলুদ চাঁপার ডালে কেবলি বাতাসে/উহু উহু উহু করি। বেদনা জনায়!' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)। 'কদম্ব যুথির সখারে চাহিনা আমি' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ)। 'কাননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে' (বর্ষা-বিদায়)। 'তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদনী ঘুমাবে যবে' (বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর-সারি)ইত্যাদি চরণে, নজরুলের মানস-প্রেমের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

লক্ষণীয় বিষয়- নজরুলের প্রেমের কবিতায় 'লিমন ইয়েলো'র পরিবর্তে 'ইয়েলো অকার'-এর ব্যবহার প্রচুর। হেমন্তের পাকা ধানের-রঙ' 'ইয়োলো অকার'। হেমন্তে-গাছের পাতার সবুজত্ব হারিয়ে হরিৎ, পান্ডুর বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কাশ-হোগলার বনের সাথে নদীর চলমান শক্তি রহিত হয়ে সেও যেন হলুদ হয়ে যায়। ধানক্ষেত পাকা হলুদে ভঁরে ওঠে, ফসলের ভারে নুয়ে পড়ে, ফসল কাটার অপেক্ষার মৃত্যু-যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। সবুজ দূর্বা ঘাস বিবর্ণ হলুদ হয়ে মৃত্যুর দিন গোনে। সুতরাং এ'রঙ বার্ধক্যের রঙ, পাতা ঝরার পূর্বাভাসের রঙ। এর মধ্যে উৎফুল্লতার চেয়ে বিষণ্নতার ভাবই বেশী প্রকাশ পায়। বিবর্ণ হলুদের মধ্যে কবি জীবনানন্দ দাশ হতাশা ও রোমান্টিকের নানা ভাব আবিষ্কার করেছেন। তিনি এ'রঙে মৃত্যুর ছায়া দেখেছেন, দেখেছেন বাঙালী নারীর আটপৌরে লাবণ্য।

নজরুলও হেমন্তকে আবিষ্কার করেছেন রোমান্টিক শূন্যতা-বোধের মধ্য দিয়ে। এ'রঙে কবির বিহার ছিল স্বচ্ছন্দ। তিনি 'ইয়েলো অকার'-কে হতাশা, মৃত্যু এবং বিষাদের রঙ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তার কবিতায়। কবির প্রেমানুভূতি-এ রঙের বিহারে সামান্যই ফুটে উঠেছে। বিষাদ-বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুর ভাব প্রকাশে বিবর্ণ হলুদের ব্যবহার কবির বর্ণনা থেকেই উদ্ধৃতি দেয়া হল,

'শীতের শেষের ঝরা পাতার বিদায়-ধ্বনিও', (বিধুরা পথিক প্রিয়া), 'ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি/দু' চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙ্গায়' (মানস বধু), 'ওগো বন্ধুরা! পান্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি' (বাতায়ন পাশে-গুবাক-তরুর-

সারি), 'তোমার কপোল পরশ না পেয়ে পান্ডুর কেয়া-রেণু', (বর্ষা-বিদায়), 'ঝরে ঝর ঝরে মরমী বিদায়-পাতা' (মাধবী-প্রলাপ)।

ইয়েলো অকার দ্বিতীয় স্তরের রঙ। মিশ্রণে রঙ এর বিচিত্র বিভাজন ঘটে, ঘটে আভাগত তারতম্য। ইয়েলো অকার বার্ধক্যেব এবং মৃত্যুর রঙ বটে, —তবে নিঃসন্দেহে একটি মিষ্টি রঙ। এর সাথে সাদার মিশ্রণ ঘটিয়ে এ রঙ-কে আরও মোহনীয় করে তোলা যায়। নজরুলের প্রেমের কবিতায় মিশ্র-ইয়েলো অকারের আকর্ষণীয় রূপ অনুভূত হয়,

'ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি' (মানস বধু), 'মহুয়ার মন্দসম মদির নিঃশ্বাস' (তুমি মোরে ভুলিয়াছ), 'হল ঘুমভাঙ্গা লাজে কামরাঙ্গা কপোল' (মাধবী-প্রলাপ), 'মুখে কাম-কন্টক ব্রণ মহুয়া কুড়ি' (মাধবী-প্রলাপ)।

সমার্থক অনুভব রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে কবি বিবর্ণ হলুদের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, 'বাসি-বিবর্ণ', 'পান্ডুর', 'হরিৎ', 'মহুয়া কুড়ি', 'বিদায়পাতা', 'ঝরা পাতা', 'শুকনো পাতা' ইত্যাদি।

'অন্তর বাজে তো যন্তোর বাজে', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি। অন্তর-তাড়নার ফল নজরুলের প্রেমের কবিতা। প্রেমের কাব্যের ধমনীতে কবি নতুন রক্তের সঞ্চালন করেছেন। কবির প্রেমের কবিতায় আছে মাহাত্ম্য, অপূর্ব রঙ-রূপের সমাহার। দৃশ্য-গন্ধে-স্পর্শে-শ্রবণে অতি সমৃদ্ধ, তাকিয়ে দেখার আনন্দ এর মধ্যে প্রচুর। কবিতার প্রতি পংক্তিতে খুঁজে পাওয়া যায় রঙ-এর বহুমাত্রিক ব্যবহার। অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে আসা রঙ দিয়ে কবি তাঁর কবিতায় সব রঙ ফলিয়েছেন। নানা উপমা, প্রতীক এবং ধ্বনি বিশ্লেষণের সহযোগে প্রেমের কবিতার রঙের ফসল উৎপাদিত। বিরহ-মধুর রঙ ফলাতে তাঁর মত পারদর্শী কবি ক্ষণজন্মা। রঙ-তুলিতে নয়, কবিতার বাণী-বিন্যাসে একাধিক রঙের-বিচিত্র আভা, আলোছায়া সমর্থক মিষ্টি মধুর রঙ, নজরুলই প্রথম প্রেমের কবিতায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতায় কবি-সৃষ্ট রঙ, নিঃশব্দে বহন করে চলছে নিভৃত হৃদয়ের অনুভূতির সার্থক বিস্তার।

নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে, যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর। ভক্ত, কবি-শিল্পী সেই শক্তিমান পুরুষ, যারা অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে আবিষ্কার করেন, বিরহের মধ্যে প্রেমের সম্প্রসারণ ঘটান। প্রেমাঘাতে মানুষ আত্মহারা হয়, ভেঙ্গে পড়ে,-কিন্তু কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক প্রেমাঘাতকে শিল্পের উপকরণ ধরে অপরূপ শিল্প তৈরী করেন। অ-সুখের মধ্যে, অসুন্দরের মধ্যে শিল্পী শিল্পরস- খুঁজে বের করেন বলেই শিল্প সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য।

উৎকৃষ্ট ও সুন্দর মনের অধিকারী কবি নজরুল। প্রেম সৌন্দর্যবোধ তাঁর কবিতার

প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্ণময়তা কবির কবিতার অলংকার। কবি প্রেমাঘাতে হয়েছেন বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর 'রক্তরথের চূড়ায়' প্রিয়ার নীলাম্বরী আঁচল তিনি উড়িয়েছেন। চিত্তের বিদ্রোহ প্রশমিত করে প্রিয়ার পদতলে নিজেকে লুটিয়েও মানস-প্রিয়ার আঘাত তাকে ঘর ছাড়া করে–করে বিদ্রোহী-প্রেমিক। এরই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় কবির প্রেমের কবিতায় ব্যবহৃত রঙে-রসে।

উপসংহারে এ'কথা বলা যায় যে, নজরুল আধুনিক বাংলা কবিতার দু'শো বছরের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান কবি। প্রেমের কবিতায় তাঁর বর্ণবোধ সার্থক এবং শিল্পগুণমন্ডিত। কবির আবিষ্কৃত অক্ষরগত বর্ণমালা দিয়ে আপন মনের প্রেম-বিরহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকট-সংঘাত সহ রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিদেশী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, হিন্দু-মুসলমানদের সংঘাত, সাম্যবাদ, মুসলমান ঐক্যের প্রয়াস, যুগের অস্থিরতা, উন্মাদনা, জটিলতা ও বিরোধিতার যে শিল্প মূর্তি রঙ-রূপ-লাবণ্যে নির্মাণ করেছেন, বাংলা কবিতার ইতিহাসে তা' বিরল। আজও অত্যাধুনিক কবিবৃন্দের অনেকের কাব্যে নজরুল-ঐতিহ্যের স্রোত বয়ে চলেছে, ভবিষ্যতেও তা প্রবাহিত থাকবে।

নজরুল নিজের ভেতর নিজের কাংখিত রঙের ভুবন নির্মাণ করেছিলেন। আর ভক্ত, পাঠক-সমালোচকদের করেছেন সে ভুবনের অধিবাসী। এরই কারণে কবি যুগের হয়েও যুগকে অতিক্রম করে যুগান্তরের অমর জীবনীশক্তি লাভ করেছেন। এখানেই কবি এবং তাঁর কবিতার অপ্রতিরোধ্য বিজয় যাত্রার অভ্রান্ত প্রমাণ।

তথ্য নির্দেশ

১ রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথঃ সুধা বসু। প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১, কলিকাতা 'প্রাক্-কথন' থেকে গৃহীত, পৃঃ ৭

২ বাংলা সাহিত্যে মুসলমানঃ যুগবাণী

৩ নজরুল-চরিতমানসঃ ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত। দ্বিতীয় দে'জ সংস্কবণ, ১৩৯৫, কলিকাতা, পৃঃ ৩৮১

৪ সাহিত্য সন্দর্শনঃ শ্রীশচন্দ্র দাশ। বর্ণ-বিচিত্রা, পুণর্মুদ্রন, আগষ্ট–১৯৮৮, পৃঃ ৩৫

৫ সাহিত্যের পথেঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃঃ ৫৫

৬ কবিতার চিত্রকল্প-কবি জীবনানন্দ দাশঃ শ্যামলকুমার ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪, পৃঃ১৯৩-৯৪

৭ প্রেমের কবিতাঃ নজরুল ইসলাম। প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮, সাহিত্যম, কলিকাতা, 'প্রকাশক' থেকে গৃহীত।

৮ কবি নজরুলঃ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃঃ২৩-২৪

৯ নজরুল স্মৃতিঃ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। সাহিত্যম্, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৯৩

১০ নজরুল-চরিতমানসঃ ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত। দ্বিতীয় দে'জ , সংস্কবণ ১৩৯৫. কলিকাতা, পৃঃ ১২৩

১১ নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়ঃ অধ্যাপক আলী আশরাফ, পৃঃ ২৭-২৮

১২ বিদ্রোহী কবি নজরুলঃ লক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস। আদিত্য প্রকাশালয়, কলিকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৯৩, পৃঃ৭

১৩ 'নজরুলের সঙ্গে কারাগারে'ঃ নবেন্দ্রনারায়ন চক্রবর্তী ঃ পৃঃ ৪০

১৪ নজরুল-চরিতমানসঃ ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত। দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, ১৩৯৫, কলিকাতা, পৃঃ ৯৩

১৫ নজরুল কথাঃ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। সাহিত্যম, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃঃ ১৮৯

১৬ কাজী নজরুল ইসলামঃ মুজফ্ফর আহ্মদ। মুক্তধারা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃঃ ১০১

১৭ নজরুল-চরিতমানসঃ ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত। দ্বিতীয় দে'জ, সংস্কারণ, ১৩৯৫, কলিকাতা, পৃঃ ৫৩

১৮ পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫৪

১৯ পূর্বোক্ত। পৃঃ৫৪

২০ কাজী নজরুল ইসলামঃ মুজফ্ফব আহ্মদ। মুক্তধারা, ঢাকা ২য় প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃঃ১১৮১২

২১ নজরুলের প্রেমের কবিতাঃ এম, এ, মজিদ। সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ৫৮

২২ পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৭১

২৩ কাজী নজরুল ইসলামঃ মুজফ্ফর আহমদ, মুক্তধারা, ঢাকা ২য় প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃঃ১৩২

২৪ নজরুলের প্রেমের কবিতাঃ এম, এ মজিদ, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ৫৮

২৫ নজরুল প্রতিভাঃ মোবাশ্বের আলী। মুক্তধারা, ঢাকা, ৩য় সংস্কবণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৬৮

২৬ প্রগতিঃ সম্পাদক অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। পৌষ, ১৩৩৪, ঢাকা

২৭ শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্যঃ সৈযদ আলী আহ্সান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৯০ পৃঃ ৫৫

২৮ Art in the western world: David M. Rubb and J.J. Garrison. Harper and Row, New York, 1966. পৃঃ ৪১৪

২৯ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীঃ শ্রী অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, চতুর্থ 'রূপা' সংস্করণ, ১৯৮৮, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫৬

৩০ Frank Kupka by Vudmilla Vacntova, 1968, P. 117.

৩১ ফসলঃ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা ১৩৬৫, পৃঃ ২৭০।

৩২ ব্রজবিহারী-বর্মনঃ আমার দেখা নজরুল (ফসল, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৬৫, পৃঃ ২৭০)।

৩৩ নজরুল-প্রতিভাঃ মোবাশ্বের আলী, মুক্তধারা, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৬৭।

৩৪ নজরুল অন্বেষাঃ রাজিয়া সুলতানা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬, ঢাকা, পৃঃ ১৩০

৩৫ নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা , প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা।

৩৬ নজরুল রচনাবলী আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ২৩৫।

৩৭ সওগাতঃ জৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৫ (১৯২৮)।

৩৮ কালিকলমঃ ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৩৩ (১৯২৭)।

৩৯ শনিবারের চিঠিঃ মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যের আদর্শ প্রবন্ধ, কার্তিক ১৩৩৪।

৪০ কবিতার কথাঃ জীবনানন্দ দাশ, পৃষ্ঠা-১

৪১ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীঃ শ্রী অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, চতুর্থ 'রূপা,সংস্করণ, ১৯৮৮,কলিকাতা, পৃঃ ৩৫৭।

৪২ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৬০।

৪৩ ঐ ঐ ঐ পৃঃ৩৬৪।

৪৪ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৬২।

৪৫ প্রাচীন সাহিত্যঃ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৬-৬৭।

৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসঃ শ্রী-সুকুমার সেন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৬৫।

৪৭ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীঃ শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ 'রূপা, সংস্করণ, ১৯৮৮, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫৮।

নজরুল ইসলামের মানবিকতা ও আধুনিকতা

আবু জোবায়ের

নজরুল ইসলাম সবার আগে মানবিকতার কবি এবং সেই সঙ্গে তিনি একজন আধুনিক কবি। মানবিকতা বলতে কি বোঝায় তা আগে বুঝতে হবে। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও সংস্কারের বেড়াজাল উন্মুক্ত ক'রে উদার মানবিক জীবনচেতনা যা মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে, চেতনায় দীপ্র করেছে এবং জীবন সম্বন্ধে অফুরন্ত আশাবাদ বুকে নিয়ে জীবনের গৌরব ঘোষণা করেছে, তাই মানবিকতার উদ্বোধন। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ শিরোপা এই মানব বিজয়ে। কিন্তু এ চেতনা এসেছিলো ইউরোপ খণ্ডে। আর আমাদের দেশে, যেহেতু দেশ ছিলো পরাধীন, এ চেতনা এসেছে অনেক বিলম্বে উনবিংশ শতকের মধ্যপর্বে। তাও আবার বিশেষ মহলে ছিলো সীমাবদ্ধ। এবং বলাই বাহুল্য, মূল রেনেসাঁসের যে মানব-চেতনা তা আজো, এই বিংশ শতকের শেষ পর্বেও, আমাদের দেশে আসেনি, আসতে দেয়া হয়নি। এর অন্তর্গত মানবিক চেতনা ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে অনেকের কাছে, তবু মানুষ যেহেতু শ্রেণী-বিভাজনে বন্দী, শ্রেণী বৈষম্য যেহেতু হাজারো নিগড়ে বেঁধে রেখেছে মানুষকে, কাজেই বলা যায়, আজো আমাদের দেশের দারিদ্র্য-পীড়িত শতকরা নব্বই জন মানুষ চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বলতে গেলে অনেকটা মধ্যযুগীয় বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাস করছে। যারা মানবিকতার উদার আলো হাওয়ার খবর রাখেন, জ্ঞানের আর জীবন-চর্যার ব্যাপারে অবহিত আছেন, তাদের জন্য এটা একটা জাতীয় লজ্জা যে, তাঁরা ঐ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য সুখবর আনতে পারছেন না। সাম্রাজ্যবাদী মহল যারা তারা তো মানবতার শত্রু, তারা মানুষের মুক্তিকে শতাব্দীর অন্ধকারে পেছনে ঠেলে দ্যায়। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম আধুনিক মুক্তিপিপাসু মানুষের সব চেয়ে বড়ো কাম্য। এই মুক্তির নামই মানবিকতা। এই মানবিকতায় স্বর্গপ্রাপ্তির আশ্বাস একমাত্র বড়ো কথা নয়, বরং তা হয় তো অনেকের দৃষ্টিতে মিথ্যা কথা, কিন্তু জীবনের অমিত তেজ আবিষ্কার ক'রে উদার আলো হাওয়াতে মানুষের মুক্তিই বড়ো কথা। এ এক পরম স্পর্ধা, সৃষ্টির অকুতোভয় জীবনবাদী বিশ্বাস।

আমাদের দেশের পটভূমিতে এই মানবতাবাদী চেতনাকে বিশেষ তাৎপর্যে বিবেচনা করতে গেলে তার আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রশ্নটা অবশ্যই বড়ো ক'রে দেখতে হবে এবং সেই সাথে আসতে হবে মানবিক মুক্তি। এদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহু আন্দোলন হয়েছে এবং সে-সবের

লক্ষ্য মানবিক মুক্তি। এই সব আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এবং মানুষকে মুক্তির পথে উত্তীর্ণ করবার জন্য যাঁরা মানবতাবাদী ভূমিকা পালন করেছিলেন নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। এখানে কবি হিসাবে, জীবনবাদী প্রবক্তা হিসাবে, যুগের কর্ণধার হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা সমূহকে তিনি মানবিকতার অজস্র পথে প্রবাহিত করেছিলেন। আর্থ-সামাজিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি, চেতনার জড়ত্বের মুক্তি, আবার জীবনবাদী সুস্থ মানবিকতার উত্তরণ, মানবিকতার স্থানিক ও আন্তর্জাতিক দিগন্ত প্রসারণ, জাতিভেদ ও বর্ণের বিলোপ সাধন করে মহামানবিকতার যজ্ঞে সকলকে সশ্রদ্ধ আবাহন–এ সবই নজরুলের মানবিকতার বৈশিষ্ট্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার অমেয় প্রভাব তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিলো, তবু বলতে হয়, তিনি (নজরুল) বুঝি গভীর মানবিক প্রেমে আরো একধাপ বেশি এগিয়ে ছিলেন। তিনি দারিদ্র্যের জ্বালা বুকে নিয়ে দুঃখী মানুষের দিকে তাকিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে বাধা বোধ করেননি– এইখানে তিনি অনেকের চাইতে বেশি ডেমোক্রাট। বেশি হৃদয়বান (humanist)। কেউ কেউ বলেন, নজরুল বিশেষ কোনো পন্থায় নির্দিষ্ট রীতিতে আর্থ-সামাজিক মুক্তি খোঁজেন নি, অর্থাৎ তিনি শ্রেণী-সচেতন চিন্তাবিদ হিসাবে যুগের জন্য এবং শ্রেণীর জন্য কর্মপন্থা বাতলাননি, যার জন্য তিনি সমগ্রভাবে মানবতার কথা বলেছেন কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত মানুষের যে-সব বাস্তব সমস্যা তাকে খতিয়ে দেখেননি ও সেই অনুযায়ী কর্ম পদ্ধতির কথা বলেননি। একথা সংকীর্ণ অর্থে যথার্থ হলেও তাঁর উদার মানবিকতা সমগ্রভাবে মানুষের মুক্তি-অন্বেষী ছিলো, সেখানে কে হিন্দু, কে মুসলমান বা কে কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন, তা তাঁর কাছে বড়ো ছিলোনা। তবে অত্যাচারী যারা তাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিলো উৎপীড়িতের জন্য। তাঁর বিখ্যাত কবিতাসমূহে তাঁর এই তীব্র অসন্তোষ তথা সংগ্রামের কথা বারেবারে ব্যক্ত হয়েছে । তাঁর ভূমিকা ছিলো দেশকে জাগানো, অত্যাচারীর মোকাবিলা করা। আবার এতদ্দেশীয় জাড্য থেকে মুক্তির জন্য তাঁর কতোনা গানের ঝঙ্কার, কতোনা কবিতার অজস্র আস্বাদন, কতোনা প্রেমের ফল্গুধারার উদ্বর্তন। একজন কবি সেই উন্মাতাল ঝড়ো হাওয়ার দিনে তাঁর দেশের জন্য যা করার তা করেছিলেন। তাঁর বাড়তি সৌভাগ্য ছিলো, একই সঙ্গে দারিদ্র্যের জ্বালার বিরুদ্ধে সংগ্রামী পুরুষ তিনি, আবার সৈনিকের সাহসও বুকে ছিলো তাঁর। তাই দেশের প্রচণ্ড ডামাডোলে তিনি সংক্ষিপ্ত বিশ বছরের সাহিত্য তথা সঙ্গীত সাধনার ভিতর দিয়ে বাঙালি জাতিকে এক অনাস্বাদিত প্রেরণা দিতে পেরেছিলেন। সেটাই বা কম কিসে ?

তাঁর মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর উজ্জীবনী-শক্তি, তাঁর চেতনার রঙের বৈচিত্র্য, তাঁর মানবিক প্রেম এবং তাঁর উদার আন্তর্জাতিকতা। কবি-প্রতিভা হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এসবের সমবায়ী শক্তিতে। তিনি তথাকথিত বড়ো Intellectual নন্ কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দীপ্র ও দীপ্যমান এবং তিনি জীবনস্রোতে অবগাহনকামী, মানবতা তাঁর

নিশান ও প্রেরণা। তিনি বহুবিচিত্র জীবনের আস্বাদন লাভ ক'রে তা মানবতার কাছেই পরিবেশন করেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলই মানবিক দিগন্তে সব চাইতে বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, এবং এই ব্যক্তিত্ব অর্জনে তিনি জীবনের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছিলেন সর্বাধিক। জীবনকে ভালোবেসেই তবে তিনি জীবনবাদী। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলা সাহিত্যে এই দু'জন কবি, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম সর্বাধিক মানবিক প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন এবং আমরা ধন্য হয়েছিলাম, তবু হয়তো ঠিক যে, প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথে লীলার প্রকাশ দেখা গেলেও নজরুলে ঐ ভাবাচ্ছন্নতা পেয়ে বসেনি, যার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে তিনি বেশি বাস্তববাদী, বেশি জীবনবাদীও—সীমিত অর্থে হলেও নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন একটা mission সামনে রেখে এবং তা হলো, পরাধীন জাতির গ্লানি মোচনের সর্বাঙ্গীন ব্রত এবং সাথে সাথে এতদ্দেশীয় মানুষের জীবনের চিরকালীন নির্জীবতা ও জাড্য থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করা। তিনি সেই কাজ পরিপূর্ণরূপেই করেছিলেন। কারাগারে গিয়েও তিনি মুক্তির গান গেয়েছিলেন। দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন মহত্তর সাধনার পথের পথিক হবার জন্য। আবার তিনিই জীবনের পাত্র পূর্ণ ক'রে এই মরার দেশে বরাভয় বাণী সঞ্চার করেছিলেন। তিনি 'মুক্তি' বলতে নিছক পারলৌকিক বেহেশতের কথা বলেননি, যেমনটি ভাবতেন তাঁর কালের অনেকেই, বরং তিনি জীবনকে দেখার ও উপলব্ধি করার জন্য নতুন জীবনমন্ত্র দিয়েছিলেন। তবু অনেকে তাঁর প্রগলভ 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' ইত্যাদি রকমের মন্তব্য কিংবা কখনো ইসলামী গানের আধিক্যে পরস্পর-বিরোধী ভাবাবেগের পরিচয় খোঁজেন। কিন্তু এর জবাব তো একটাই, তিনি ব্যক্তিত্বের পরম উদ্বোধন করেন যেমন, অন্যদিকে ইসলামের ধর্মীয় আবেগসমূহকে অতীতের ছায়াচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দিয়ে এতদ্দেশীয় মুসলমানের জন্য একটি ধর্মীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলেন। এই ধর্ম-মাহাত্ম্য তাঁর মানবিকতাকে ক্ষুণ্ন করেছে কিনা তাই শুধু বিচার্য।

কিন্তু তিনি অহংবাদী egoistic যা কিনা বিধাতার বুকে হাতুড়ি শাবল চালায় কিংবা তাঁর বুকে পদচিহ্ন আঁকে, এ ধরনের ব্যাখ্যা তথা তিনি ধর্মচিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। অতএব তিনি প্রতিক্রিয়াশীল—এই মানসিকতা সত্যের অপলাপ মাত্র। আসল কথা, শৈল্পিক দৃষ্টিতে জীবন জগৎ ঈশ্বর ইত্যাদি ধারণা প্রথাসিদ্ধ, গতানুগতিক ও আক্ষরিক ধারণাসমূহকে অতিক্রম ক'রে যায় না কি?

শেষ বিচারে ধর্ম প্রতিক্রিয়াশীল কিনা তা এক কথায় বলা যাবেনা, তবে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার তথাকথিত বুজরুকি ইত্যাদি ব্যাপার যে প্রগতিশীল জীবন চেতনার অন্তরায় তা অবশ্যই বলা যায়, কিন্তু নজরুল যে সে অর্থে ধর্মভীরু ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য।

আজ আমরা যে অর্থে প্রগতিশীলতা ও মানবিকতার কথা চিন্তা করি, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে সমাজে তা সম্ভব ছিলনা। ত্রিশের কবিরা একটা উদার দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু তাতে মোহবিলাস যতোখানি ছিলো, পাশ্চাত্যের ভাবাবেগ যতোখানি ছিলো, এতদ্দেশীয় জীবনের প্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনাদর্শ তেমনটিই মোটেই ছিলোনা। একমাত্র নজরুলেই দেখি যথার্থ যুগপ্রতিনিধিত্ব করবার দুর্দমনীয় সাহস ও বাস্তব জ্ঞান। অপরেরা Intellectual দিগন্ত আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ কেউ মার্কসীয় তত্ত্বকে মেলাতে চেয়েছিলেন, তবু সব মিলিয়ে তাতে স্থায়ী কোনো জীবনদর্শন গ'ড়ে ওঠেনি। নজরুলের বিশিষ্ট অবদান, তিনি যুগকে আর তার সমস্যাকে চিহ্নিত করেছিলেন। এটি এজন্যই সম্ভব হয়েছে যে, তিনি ছিলেন গভীর অর্থে আশাবাদী, মানবিকতায় বিশ্বাসী, অপরদিকে বিদগ্ধ ত্রিশের কবিগোষ্ঠি ছিলেন ছিটেফোঁটা আশাবাদী হয়েও যুগের নঞর্থক চিন্তাচেতনায় সমাচ্ছন্ন।

নজরুলের অনুসৃত মানবিকতার উদ্বোধনে তাঁর সামনে যে জিনিসটা কাম্য ছিলো, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা তথা বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও ঐক্য এবং জাতীয়তাবোধ, তা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তীকালে যা ঘটেছে অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান, এবং আরো পরবর্তীকালে যে সার্বিক পরিচয় রাখছি আমরা, তাতে তো মনে হয়, নজরুলের স্বপ্নের ও সাধনার বাংলাদেশ আজ নানান সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন। এর দায়ভাগ আমাদেরই।

কিন্তু নজরুল তাঁর গানে যে মানবিকতার সুর বিস্তৃত করেছিলেন তা তাঁকে একই সঙ্গে একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী তথা শ্রেষ্ঠ জীবনবাদী রূপে চিহ্নিত করেছিলো। তিনি জীবনকে যেন দেখেছিলেন সুরের মোহনায়, অতএব জীবনকে আর তার ব্যথা আনন্দ ও বিভিন্ন আবেগকে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ করা ও সুরময় করা তাঁর পক্ষে যতোখানি সহজ ছিলো তাতেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁর গুরুতুল্য রবীন্দ্রনাথও সুরের সাধক, তবু সমান্তরাল ভাবে একই পরিবেশে তিনি যে সুরের বন্যা বইয়ে দিতে পেরেছিলেন তাতে তাঁর মানবিক প্রেমই সুর হ'য়ে ঝরে পড়েছিলো। প্রেমের, মান-অভিমানের, স্বদেশ প্রেমের, স্বাধীনতার, বিদ্রোহের এবং বহুমুখী মানবিক আশা-আকাঙ্খার মূর্ত অভিব্যক্তি তাঁর গানের ভুবন।

২

আধুনিকতা ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই বলেন, নজরুল ঐ পরিমাণ আধুনিক ছিলেন না, কিংবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না, যতোটা আধুনিক আজকের চিন্তাবিদ, কবি, বিজ্ঞানী প্রমুখ ব্যক্তি। তাঁদের ধারণা, চিন্তার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম যে সংযোজন সম্ভব হয়েছে তাইত আধুনিকতা। কিন্তু এ-তো ভাসাভাসা উদ্দেশ্যহীন বক্তব্য। যে-কালে এবং যে-সভ্যতায় আমরা বাস করি তার অন্তর-প্রকৃতিতে কিছু কিছু লক্ষণ সৃষ্টি হয় যা সমগ্র জীবন-যাত্রাকে প্রভাবিত করে। সেই লক্ষণগুলিই বিশিষ্ট আবেগে

ধরা পড়ে যাদের চেতনায় তারা সেই কালের আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের প্রতিনিধিত্ব সেরে বিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত তার চিন্তার অংশীদার ছিলেন। অতএব বিংশ শতকের প্রধান প্রধান যুগচৈতন্যের সাথে তিনি একাত্ম। তাঁর প্রয়াণের পর নিঃসন্দেহে আরো অনেক কিছু ঘটেছে,— যান্ত্রিকতা বেড়েছে, মানবিক মূল্যবোধ কমেছে, বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। এবং সমগ্রভাবে একটি চৈতন্য সৃষ্টি হয়েছে যা জটিল মানসিকতাসমূহকে ধারণ করতে পারে, তার তাৎপর্য উপস্থিত করতে পারে। হয়তো তাতে প্রাগ্রসর চেতনা আছে, হয়তো অবনমনও আছে, আরো অনেক কিছু আছে, তা হলে আধুনিক মানস একটি ক্রম-উত্তরণের মধ্য দিয়ে চলেছে অবশ্যই। তবু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল তাঁদের অমেয় জীবনবাদী প্রভাবে আধুনিক মানসেরই তীর্থপথিক। মোটামুটিভাবে মধ্যযুগীয় মানস ও আধুনিক মানস এই রকম ভাগ করলেই বুঝতে সুবিধা হয় যে, একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিংস্র ও অমানবিক জীবনচর্চা, অন্যদিকে আধুনিক মানবিকতার উত্তরণের ভিতর দিয়ে নিরন্তর জয়যাত্রা এই বিচারে নজরুল কতোখানি আধুনিক তা তো সহজেই বোঝা যায়। নজরুলের আধুনিকতার মূল সুর মানবিক উত্তরণ, তার জয়যাত্রা, তার হিংসায়-উন্মত্ত-দিকে-দিকে প্রেম, কল্যাণ, আলো। বিশেষ কালের সামাজিক চেতনা ও অন্যান্য চেতনা বুকে নিয়েই তিনি অগ্রযাত্রী—এই অর্থেই তিনি আধুনিক। তাঁর আধুনিকতায় হেঁয়ালী নেই, অধঃপতন স্পর্শ করার ও নির্ণয় করার মনোবিলাস নেই, বিকৃতি নেই। কল্যাণ-মন্ত্রই তাঁর আধুনিকতা। তিনি তাঁর কালের অনেকের মতো মরুপথে হারানো যাত্রী নন। তাঁর স্থির লক্ষ্য মানবতার মুক্তি, এই বিংশ শতকেই বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ-অধ্যুষিত বিশ্বে বাঙালি ও ভারতীয় সমাজের মুক্তি। এবং আরও বৃহত্তর অর্থে পরাধীন ও নিপীড়িত মানবমণ্ডলীর মুক্তি।

আধুনিকতার কবি হিসাবে আমরা পাশ্চাত্যের এলিয়ট, পাউণ্ড কিংবা পূর্বগামী বোদলেয়ার প্রমুখের কথা স্মরণ করি এবং ভাবি, তাঁরা যুগসচেতন কবি হিসাবে বর্তমান জীবনের যে-সব ব্যাধি, বিকার ইত্যাদি লক্ষ্য করেছেন কিংবা এ কালের যে অস্থির জীবনাচরণ বা তার গতি প্রকৃতি ইত্যাদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং যার ফলে জন্ম হয়েছে আধুনিক অবক্ষয় ও মনোবিকলনের সাহিত্য, জয়েসের ইউলিসিসের মতো উপন্যাস—এ সবই আধুনিকতা। তা হ'লে সমাজতান্ত্রিক জীবনের লক্ষ্যে জীবনের যে দুর্দমনীয় আশা-আকাঙ্খা ও কর্মের হাতছানি, নতুন পৃথিবী গড়ার যে সাধ ও সাধনা, তা কি আধুনিকতার পরিচয়বাহী নয়? dialectic সমাজ-পটভূমিকার নিরিখে নজরুল সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না, কিন্তু বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর লক্ষ্যও তাই। অতএব তাঁর আধুনিকতাও নিবদ্ধ ছিলো ব্যক্তির ও সমাজের ক্রম-অগ্রসরমানতার চিন্তা-চেতনার মধ্যেই। নজরুলের সমকালীন যাঁরা তাঁরা রবীন্দ্র-

প্রভাব এড়াবার জন্যই বুঝি ব্যস্ত হলেন, সে তুলনায় যুগের আকাঙ্খিত মুক্তি খোঁজাটা তাঁদের কাছে ছিল গৌণ। কিন্তু নজরুল তুলনায় তথাকথিত কম Intellectual হলেও যুগের আকাঙ্খাকে যেভাবে বাঙ্ময় করেছিলেন তা কি কম গৌরবের কথা?

কিন্তু নজরুলের আধুনিকতা বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়, তাঁর মানবিকতার সূত্র ধরেই তিনি আধুনিক। আধুনিকতা ব্যাপারটা তাঁর কাছে ছিলো উপসর্গ মাত্র। তিনি অক্লেশে সব কিছুকে হজম ক'রে উদার মানবিকতায় ঋদ্ধ ছিলেন।

৩

কবির উল্লেখযোগ্য কবিতাসমূহের অনেক কবিতাই হয়তো পাঠকের মনে পড়বে। লক্ষণীয় যে, এতোদিনে বাংলা কবিতায় তিনি যেন নতুন ধারা সংযোজন করতে চাইছেন, এবং অনেকক্ষেত্রে সফল ভাবে তিনি তা করেছেন। তাঁর রচনার সুর ও ব্যঞ্জনা আলাদা, তাঁর style আলাদা। কোথাও যে দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা নাই এমন বলা যাবেনা তবু তাঁর আবেদন নুতন আমেজ আনে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত তাঁর গতিশক্তিতে, উজ্জীবনী শক্তিতে। কিংবা গ্যয়টে (Goethe) বায়রন সম্পর্কে যা বলেছেন, তাঁর 'sincerity and strength' নজরুলের বেলায়ও প্রযোজ্য। আর যে grandeur dash and daring বায়রনের জন্য সত্য ছিলো তা নজরুলের জন্যও সত্য মনে করা যেতে পারে। প্রত্যেক বড়ো কবির একটি স্বভাব ধর্ম থাকে, সেই বিচারেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের যে আদর্শ, পাশ্চাত্যের শেক্সপীয়রের কিংবা গ্যয়টের সেই আদর্শ নয়, অথচ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সীমানায় বড়ো কবি, এবং স্থান-কাল অতিক্রম করেও বড়ো কবি। নজরুলও বিচার্য তাঁর নিজের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী, এবং তাতে আমরা দেখতে পাই, he is in the main different from the rest, অর্থাৎ তাঁর কালের অন্যান্য কবিদের চাইতে তিনি different। এর দ্বারা একথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে তিনি সবার চাইতে বড়ো। বলার কথা, তিনি স্বতন্ত্র।

১. ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? –প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন–জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

কিংবা যখন গান দিয়ে ভরে তোলেন ব্যক্তি তথা সমাজ-জীবনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী মহৎ ছন্দ

২. চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে বাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
চল্ চল্ চল্... ...ইত্যাদি।

তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধাই হয়না, এ রচনার কবি ও গীতিকার কে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে নৈর্ব্যক্তিকে পৌঁছে দিতে পারাতেই কবিতা তথা আর্টের সার্থকতা। নজরুল যেখানে সফলভাবে তা করেছেন সেখানে তিনি অনেকের তুলনায় স্বতন্ত্র,

অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব গৌরবেই স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার ব্যাপার যে নজরুল মানবিকতাকে শুধু মানবিক-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি মানব ও প্রকৃতিকে একই সঙ্গে ওতপ্রোতভঅবে দেখেছেন, যার ফলে মানুষের চিন্তা চেতনা ও ভাবের অভিব্যক্তি প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বৃহৎ ব্যাপ্তি খুঁজে পেয়েছে। তাঁর উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয় থেকে এসে একটি ব্যাপ্ত পটভূমি রচনা ক'রে জীবনের সম্প্রসারিত চেতনার কথা বলেছে এবং জীবনের বিস্ময় ও শক্তি আবিষ্কার করেছে। সব বড়ো কবিই তাই করেন। রবীন্দ্রনাথ অনেকের চাইতে আরো মহৎ পরিবেশ রচনা করেছেন, এবং তা সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, প্রকৃতির অনির্বচনীয়তা, মানব, মহামানবতা, সব মিলে বিস্ময়কর শক্তি ও সম্ভাবনা হয়ে তাঁর সামনে দেখা দিয়েছিলো। প্রাচ্যের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বাড়তি একটা গৌরব ছিলো, তা তাঁর প্রকৃতিপ্রেম। আমাদের নজরুলেও দেখি প্রকৃতি-প্রেম কতো অজস্রভাবে গানে গানে ভরে দিয়েছে তাঁর কণ্ঠ। এছাড়া আরো কতো বিচিত্র আমেজ তাঁর কবিতায়। কখনো দেখি, পারস্যের বসরা গোলাপ বাগানের ছন্দ নিয়ে রোমান্টিক ব্যাকুলতা, কখনো বাংলা দেশের বেণু-বনের উদাস হাওয়ায় দোলানো চপল ছন্দ। কখনো অগ্নিবীণা আর বিষের বাঁশীর তীব্র নাদ, আবার ইসলামী ঐতিহ্যের ঝংকৃত মুহূর্ত,

সরাইখানার যাত্রীরা কি
'বন্ধু জাগো' উঠলো হাঁকি ?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখী
গুলিস্তানে চললো উড়ে।

আজ কি আবার কাবার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হতে।
নামলো কি ফের হাজার স্রোতে
হেরার জ্যোতি জগৎ জুড়ে ?

কিংবা,

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার! বলে সাবধান করছেন জাতিকে ভীষণ ভরা দুর্যোগের কালে, কারণ পার হতে হবে একসাথে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে। কবি তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি লিখেছিলেন এমন একটি ক্রান্তিলগ্নে যখন এই হতভাগ্য দেশে দেবদেবী প্রভাবিত এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেশে মানুষের মুক্তির পথ অনেকখানি অবরুদ্ধ থাকায় গোঁড়ামীসর্বস্ব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও অপরপক্ষে তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের জঘন্য অমানবিক অত্যাচার, এই দুইয়ের বিরুদ্ধে কবি 'কালী'-র ভীষণা মূর্তিকে স্মরণ করে প্রতিকার কামনা করেছিলেন। কবিতাটি নানা দিক দিয়ে রূপক, কিন্তু কি মর্মান্তিক বাস্তবতাবোধ ও

জ্বালা নিয়ে তিনি এটি লিখেছিলেন তা ভাবলে আজো আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে,

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী ?

অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন একটি কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে', কিন্তু এই দুটি কবিতার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটা যে কতো বেশি তা যে কোন সচেতন পাঠক বুঝতে পারেন। নজরুলের কবিতা কঠোর বাস্তববাদের রূপক-ব্যাঙ্গে বিদ্রূপে বেদনায় জর্জরিত। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ঐ 'আনন্দময়ী সনাতন 'আনন্দময়ী', কাল্পনিক আনন্দময়ী, কিন্তু তাঁর চারপাশে দারিদ্র্যের করুণ ছবি, তবু প্রতিবাদ নেই। এক ধরনের passive resignation মাত্র। দুঃখিনী মেয়ে করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে 'আনন্দময়ী'র দিকে।

কবিকে যে এতদ্দেশীয় বাংলাদেশের মানুষ জাতীয় কবি আখ্যায় ভূষিত করেছে তা যে-অর্থে সত্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে সেই অর্থেই জাতীয় কবি বলতে পারেন, কারণ তিনি তো উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের কবি। আর মানবতাবাদী কবি হিসাবে নজরুল কতো বড়ো কিংবা বড়ো নন্ সে বিচার তাঁর কাব্য সমালোচকেরা অবশ্যই করবেন। তবু একথা ঠিক যে, তিনি অজস্র বাঙালি পাঠকের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং বিশেষ সময়ে বিশেষ তাৎপর্যের কবিতা লেখার জন্য যেমন, আন্তরিকতা ও সহানুভূতির জন্যও তেমনই, তিনি বাঙালি পাঠকের অন্তরে জাগ্রত থাকবেন।

নজরুলের কবিতায় রোমান্টিকতার স্বরূপ সন্ধান

রহিম আজিজ

রোমান্স, রোমান্টিক, রোমান্টিকতা ইত্যাদি শব্দের অর্থের মধ্যে গুণগত অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শিথিলভাবে এগুলো বহুমাত্রায় প্রায় একই রকম অর্থ প্রকাশ করে থাকে। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই পরিলক্ষিত হবে যে, রোমান্টিকতা বা রোমান্টিসিজম[১] সাহিত্যের একটি চিরকালীন ধারা বা শাশ্বত স্রোত যা কালে কালে দেশে দেশে বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভেতর থেকে তাদের সৃষ্টিকর্মে নানাভাবে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ইংরেজী সাহিত্যে Romantic Movement[২] হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে সে ধরনের Movement না হলেও তার প্রভাব পড়েছে অনেক কবির উপর এবং অনেকেই আবার স্বভাবজাত রোমান্টিক কবি।

রোমান্টিক কথাটির পাশাপাশি আবার ক্লাসিক কথাটি এসে দাঁড়ায়। শব্দ দু'টি নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার জগতে এত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে যে তাদের সঠিক সংজ্ঞা ও অর্থ নির্ণয় করা বেশ দুরূহ।[৩] 'খুবই সূক্ষ্ম প্রশ্ন-ক্লাসিক কি? সময় ও অবস্থাভেদে প্রশ্নটির উত্তর এক রকম নাও হতে পারে।... প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্লাসিক হচ্ছেন অতীতের এমন লেখক যিনি প্রশংসায় ভাস্বর, অতি উৎকৃষ্ট এমন কোন রচনাশৈলীর প্রবর্তক যা যুগ যুগ ধরে অনুসৃত'।[৪] লেখকদের ক্ষেত্রে Classicus শব্দটি ওলাস জেলিয়াস (Aulus Gelius) প্রথম ব্যবহার করেছিলেন যা-দিয়ে বোঝানো হত 'মহৎ লেখক বা বিশিষ্ট লেখক'।[৫] ক্লাসিক শব্দটি সাধারণভাবে কালজয়ী লেখকের চিরায়ত বা চিরঞ্জীব লেখা সম্পর্কে প্রযোজ্য। 'ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের সাহিত্যাদর্শ হল এরিস্টটল প্রবর্তিত সাহিত্যতত্ত্ব।.... গ্রীক সাহিত্যকে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য বলা হল, কারণ গ্রীক সাহিত্যের রূপ ও রীতি বিশুদ্ধ মানবিকতার আলোকে সমুজ্জ্বল এবং যার আবেদন বিশ্বজনীন। এর ফলে গ্রীক সাহিত্যের রীতির অনুকরণ করাই হলো ক্লাসিক্যাল রীতি, গ্রীক সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল রীতির অনুকরণে লাতিন সাহিত্য রচিত হল। আবার লাতিন সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল রীতির অনুকরণ করা হল ফরাসী সাহিত্যে। ফরাসী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল রীতির অনুকরণ হল ইংরেজী সাহিত্যে'।[৬]

বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্নভাবে এরিস্টটলের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করায় তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠল নানা মতভেদ এবং সাহিত্য থেকে অন্য সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল রীতির অনুকরণও যথাযথ হল না। 'ফলে ক্লাসিক্যাল রীতি বলতে এক নতুন জাতের কৃত্রিম রীতির আবিষ্কার হল–এই কৃত্রিম রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হল–সাহিত্যের জগতে নতুন একটি দলের সৃষ্টি হল– তা হলো রোমান্টিক দল।'[৭] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবিরা ফরাসী ও ল্যাটিন কবিদের অনুপ্রেরণায় ভাবানুভূতির আন্তরিকতাহীন বিদ্যাবুদ্ধিজাত ব্যঙ্গ কবিতাকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বিবেচনা করায় সেই শতকের শেষের দিকে তাদের বিরুদ্ধে টমাস গ্রে, উইলিয়াম কলিন্স, উইলিয়াম ব্লেক, রবার্ট বার্ণস প্রমুখ বিদ্রোহের সূচনা করেন এবং ওয়াডর্সওয়ার্থ–ও কোলরিজ Lyrical Ballad (১৭৭৮) প্রকাশের মাধ্যমে 'Romantic Movement' এর সূত্রপাত করেন।[৮] যে-কোন নতুন ভাবদৃষ্টি বা আন্দোলনের পেছনেই থাকে নানা কারণ; Romantic Movement এর পেছনেও তেমনি নানা বিষয় সক্রিয় ছিল।

(এক) রুশো Emile, The Social Contract, Neev Heloise ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে 'মানব জীবনের মর্যাদাবোধ, প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক এবং 'প্রেমের অভাবনীয় শক্তি' সম্পর্কে জনমনকে সচেতন করে তোলেন।[৯]

(দুই) জার্মান দর্শন মানুষের ভাবজগতে যুগান্তর আনে। ক্যান্ট বস্তুজগতকে 'কবির আত্মরসে রসায়িত অখন্ড সৌন্দর্যরূপে'[১০] অনুভব করেন এবং রুশোর চেয়ে উগ্রতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া জার্মান দর্শনের আরেক তত্ত্ব চিৎ (mind) ও জড়ের (Matter) অদ্বৈতবাদ রোমান্টিক ভাবকল্পনাকে আন্দোলিত করে।[১১]

(তিন) ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯–৯৯) সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সারা পৃথিবীকে আন্দোলিত করে। 'ইংল্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছিল সেই গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করল আমেরিকাকে স্বাধীনতা দান করে। ফরাসি দেশের বিপ্লবের শিক্ষা সেই গণতন্ত্রকে আরো বেশি করে উজ্জ্বল করল।'[১২] স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি কবিদের ভেতর জাগ্রত হওয়ায় এবং জাতির অতীত গৌরব ও মহিমাকে পুনরুদ্ধারের প্রেরণায় তারা অতীতকে নতুন করে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ কবিদের ভেতর অতীতচারণা লক্ষ্য করা যায়। স্মরণীয় যে, 'অতীত চারণা রোমান্টিকতার একটি লক্ষণ।'[১৩]

(চার) সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান চেতনার অগ্রযাত্রায় যন্ত্র-সভ্যতার আবির্ভাবে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থের অসম বণ্টনের কারণে মালিক শ্রেণীর ভেতর অপচয় এবং শ্রমিক শ্রেণীর ভেতর ক্ষুধা ও দারিদ্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ্যাডাম স্মিথ 'wealth of nation' এ শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকারের জন্য এবং টম পেইন Rights of Man' এ দাস প্রথা বিলোপের জন্য সোচ্চার উচ্চারণ করেন।[১৪]

(পাঁচ) বিজ্ঞান-চেতায় ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের অন্তঃসারশূন্যতাকে উপলব্ধি করায় মানুষ সকল প্রকার কুসংস্কার ও ভণ্ডামী পরিত্যাগের মাধ্যমে ধর্মের নব মূল্যায়ন করতে সক্ষম হল। নতুন জ্ঞানের আলোকে 'চার্চের ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতাকে অস্বীকার করে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার জয় ঘোষণা করল'।[১৫]

রোমান্টিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকরা বিভিন্ন কথা বলেছেন। Watts Dunton একে 'বিস্ময়রসের পুনর্জীবন' (Renacence of Wonder), Victor Hugo একে 'সাহিত্য উদার প্রাণতা' এবং Brundetiere' একে 'সাহিত্যে আত্মমুক্তি'[১৬] বলে অভিহিত করেছেন। Pater রোমান্টিকতাকে the addition of strangeness to beauty বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে-The essential clements of the romantic spirit are curiosity and the love of the beaucty.[১৭]

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে অনেক 'রোমান্স কাব্য'[১৮] রচিত হয়েছিল। 'রোমান্স কাব্যের ও বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক কবির ভেতরই রোমান্টিকতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদনের 'মেদনাদবধ কাব্যে'র ক্লাসিক স্থাপত্যের ভেতর ছিল রোমান্টিকতার ফোয়ারা। তাঁর সমকালে গীতিকবি বিহারীলালের ভেতর পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজি রোমান্টিক আন্দোলন শুরু হবার প্রায় শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালের পরিবেশে মাইকেল বা ঈশ্বর গুপ্ত বিরাজ করলেও বৈষ্ণব পদাবলী, বিহারীলাল এবং শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোমান্টিক মহাকবিরাই তাঁকে আকর্ষণ করেছিলেন। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত রোমান্টিক মানসের অধিকারী।'[১৯] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমান্টিকতার সকল বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়নি। বিশেষ করে 'শেলির অশান্ত চিত্তবিক্ষোভ, কীটসের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যমুখিনতার আত্যন্তিক সংকীর্ণতা এবং কোলরিজের অতিপ্রাকৃতে অংশগ্রহণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কচিৎ লক্ষিত হয়।'[২০]

রোমান্টিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাতেই যথাযথভাবে পাই। রোমান্টিকতার যে সব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ভেতর অনুপস্থিত ছিল, নজরুলের ভেতর সেগুলো ছিল সুস্পষ্ট। নজরুল তাঁর রক্তে শেলী কীটসকে প্রবলভাবে অনুভব করেছেন—একথা তিনি নিজেই এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। শেলী কীটসের মত নজরুল উত্তুঙ্গ রোমান্টিক কবি ছিলেন বলেই নিজের ভেতর তাদেরকে অনুভব করেছেন।[২১] নজরুল যে জন্মগতভাবেই প্রবল রোমান্টিক মানসের অধিকারী তা তাঁর জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই প্রমাণ করে। তাঁর রোমান্টিক মনোবৃত্তি জীবনে কোথাও তাকে বেশি দিন স্থির থাকতে দেয়নি। আজীবন 'বাঁধনহারা' নজরুল তাঁর রচিত 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের নায়কের মতই রোমান্টিক। তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের আনসারের সাথে তাঁর চরিত্রের অনেক মিল রয়েছে—একদিকে বিপ্লবী, অন্যদিকে

স্বপ্নাতুর-কল্পনাবিলাসী প্রেমিক। উপন্যাসের ক্ষেত্রেই যেখানে রোমান্টিকতার মাত্রা এত বেশি, কবিতায় তো আরো বেশি। শিশু-কিশোরদের উপযোগী কবিতাতে তাঁর রোমান্টিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বন্ধনমুক্তি বা শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষা খুবই উজ্জ্বল। 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে'—জগৎকে দেখার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই রয়েছে কবিআত্মার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার স্পৃহা বা সুদূরের আকাঙক্ষা। মানবাত্মার মুক্তির স্পৃহা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে যতটা ছিল রবীন্দ্র-কাব্যে ততটা ছিল না। কিন্তু নজরুলের বিদ্রোহীর ভেতর মানবাত্মার যে জাগরণ ঘটেছে তার আকাঙ্ক্ষা, গতি ও বেগ মাইকেলের রাবণের চেয়ে অনেক বেশি—'বল বীর। বল উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর।' (বিদ্রোহী)। নজরুলের ভেতর এসেছিল আত্মজাগরণের প্রবল জোয়ার। যে জন্য বলেছেন-'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাধ।'-নিজেকে যথার্থভাবে চিনতে পেরেছেন বলেই তিনি সমস্ত অসুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন। রোমান্টিক মনে থাকে এক সুন্দর পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা। নজরুলের ভেতর এই আকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি চেয়েছেন শোষণ-বঞ্চনামুক্ত এক সুন্দর পৃথিবী। কিন্তু তিনি তা পাননি; পেয়েছেন জগৎ ও জীবনের চারপাশে পরাধীনতা, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, শোষণ-এককথায় অসুন্দরকে। এই অসুন্দর থেকে পরিত্রাণের জন্য জীবনানন্দ নির্জনতার বোধিকে বেছে নিয়েছেন এবং কল্পনায় প্রকৃতির ভেতর এক সৌন্দর্যের ভুবন নির্মাণ করে আত্মতৃপ্তি খুঁজেছেন। কিন্তু নজরুল অন্যায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে অসুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করে সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ করতে চেয়েছেন অর্থাৎ সুন্দরের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিদ্রোহী হয়েছেন বলে তার এ বিদ্রোহ রোমান্টিক মানসপ্রবণতার বলিষ্ঠ প্রকাশ। প্রলয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভেতর প্রবল-এ জন্য ছিল যে 'প্রলয় নতুন সৃজন বেদন'। মূলতঃ সৌন্দর্যের ভুবন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি বলেছেন-'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান" (বিদ্রোহী)। Walt whitman যেমন বলেছেন-I pass death with the dying and birth with the new wash'd babe. (Song of myself)[২২]

শাসক ও শোষক শ্রেণীর তৈরী 'মানব বৈরী, মানবতা বৈরী'[২৩] নিয়মের বেড়ীতে বন্দী মানুষের মুক্তির প্রত্যয় নিয়ে সব অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে নজরুল জোরালো কণ্ঠে বলেছেন- 'আমি মানি নাকো আইন'। শেলীর Prometheus যেমন অমানুষিক নিয়ম-কানুনের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর-নজরুলের বিদ্রোহীও তেমনি। শেলীর Prometheus এর ভেতর অধীনতার সামান্যতম চিন্তাও ছিল না,

> Submission, thou dost know I can not try. For what submission but that fatal word. The death-seal of mankinds captivity. Like the sicilians hair-suspended sword. Which trembles o'er his crown, would be accept. Or could I yield? Which yet I will not yield, (Prometheus Unbound, Act 1)[২৪]

নজরুলের বিদ্রোহীর ভেতরও বশ্যতার কোন চিন্তা চেতনা ছিলনা। তাঁর তেজোময় আত্মদীপ্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার বলিষ্ঠ উচ্চারণ–'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস/আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ' (বিদ্রোহী)। মুক্তির প্লাবনে তার যৌবনের জোয়ার উপচে পড়েছে–'আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ' (বিদ্রোহী)। মনে পড়ে whitman এর 'I am satisfied, I see, dance, laugh sing.'[২৫] মূলতঃ বিদ্রোহীর রোমান্টিক পুরুষ-কণ্ঠ নজরুল, রোমান্টিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ধর্মের কুসংস্কার এবং ভন্ডামীকে নজরুলের রোমান্টিক মানস ও মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা সহ্য করতে পারেনি বিধায় অত্যাচারী 'মোল্লা পুরুত' শ্রেণীর প্রতি তাঁর কণ্ঠে ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে–'তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী/ মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী/ কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালা পাহাড়?/ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার' (মানুষ)। নজরুল বাংলা সাহিত্যের সৈনিক কবি; দেশের স্বাধীনতার জন্য ছিল তাঁর প্রবল সংগ্রাম-স্পৃহা। দেশের মুক্তির জন্য সৈনিকের আত্মোৎসর্গকে কবি 'কামাল পাশা' কবিতায় গৌরবের বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন। 'রণভেরী', 'খেয়াপারের তরণী' 'আনোয়ার', 'কোরবানী', 'মোহররম' ইত্যাদি কবিতায় দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কবিকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে কবির রোমান্টিক মানসের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ছিল তাঁর কাছে সবকিছুর উর্ধ্বে। 'ভাঙার গান' (১৯২২) কাব্যে স্বাধীনতার জন্য কবি 'বৃটিশ বিরোধিতাকে কবিতার প্রত্যক্ষ আবেগ হিসেবে'[২৬] গ্রহণ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা কামনায় 'ভাঙার গান' কবিতায় কবির চিত্তবিক্ষোভ বিপ্লবের জোয়ার এনেছে। 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট/..... লাথি মার ভাঙ রে তালা/যত সব বন্দী শালায়/ আগুন জ্বালা/ আগুন জ্বালা..।' মনে পড়ে শেলীর কবিতায় দেশবাসীর প্রতি জাগরণের উদাত্ত আহ্বানের কথা– 'Awaken, awaken, awaken/The slave and the tyrant are twin-born foes;/ Be the cold chains shaken/To the dust where your kindred repose, repose.' (An ode)[২৭]

স্বাধীনতার জন্য, সুন্দরের জন্য নজরুলের বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর 'অগ্নিবীণা', 'ভাঙার গান' ছাড়াও 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা', (১৯২৬), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) 'চন্দ্রবিন্দু' (১৯৩০) ইত্যাদি কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে।[২৮] সর্বহারা কাব্যের 'কৃষাণের গান' , 'শ্রমিকের গান, 'ধীবরের গান', 'রাজা প্রজা', ' চোর ডাকাত'; 'ফণিমনসা' কাব্যের 'শ্রমিক মজুর', 'জাগরুক সূর্য' এবং 'নতুন চাঁদ' কাব্যের 'ওঠ্‌রে চাষী', 'ঈদের চাঁদ' ইত্যাদি কবিতায় সাধারণ মানুষের উপর নানা অত্যাচার-অবমাননা, -বঞ্চনার জন্য কবির কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর বেজেছে। কৃষক, শ্রমিক ধীবর সবাইকে কবি ডাক দিয়েছেন সমস্ত অন্যায় অত্যাচার তথা অসুন্দরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সুন্দরকে আনার জন্য–'আজ জাগরে কৃষাণ,

সব গেছে কিসের বা আর ভয়/ এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।' (কৃষকের গান) 'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল/ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল' (শ্রমিকের গান) 'আমরা নীচে পড়ে রইব না আর/শোন্ রে ও ভাই জেলে/ এবার উঠব সব ঠেলে; (ধীবরের গান)। সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদের জন্য ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক কবি শেলীও কৃষক-তাঁতীদের ডাক দিয়েছেন,

Sow seed-but let no tyrand reap
Find wealth-let no imposter heap
Weave robleslet not the idle wear
Forge arms-in your defence to bear.
[song to the men of England][২৯]

মূলতঃ ধর্মের নামে ভন্ডামী, দেশের পরাধীনতা, শাসক শ্রেণীর শোষণ তথা সমস্ত অন্যায় অবিচারের অবমাননার বিরুদ্ধে নজরুল ইসলামের এই বিদ্রোহ তাঁর রোমান্টিক মানসজাত ফসল। তাঁর বিদ্রোহে সুন্দরকে লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষার বীজ নিহিত রয়েছে।

নজরুল ইসলামের প্রবল সংগ্রাম চৈতন্য যেমন উত্তুঙ্গ রোমান্টিকতার·ফসল তেমনি তাঁর প্রেমারতিও রোমান্টিকতার ফসল। একই উৎস ভূমির ফসল বলেই তাঁর বিদ্রোহী একদিকে চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, প্রলয়ের নটরাজ, বেদুঈন, চেঙ্গিস অন্যদিকে বন্ধনহারা কুমারীর বেণী তন্বী–নয়নে বহ্নি, ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, চপল মেয়ের ভালবাসা ইত্যাদি। কবির রোমান্টিক প্রেমারতি এবং আত্মরতি প্রাধান্য পেয়েছে 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চোখের চাতক', 'চক্রবাক', 'বুলবুল' ইত্যাদি কাব্যে । কবির স্বপ্ন সহচরী অনাগত প্রিয়ার বন্দনা 'অনামিকা' কবিতায় তীব্র জীবন-পিপাসা ও দেহকামনার সাথে উচ্চারিত হয়েছে- 'তোমারে বন্দনা করি/ স্বপ্ন সহচরী /লো আমার অনাগত প্রিয়া/ আমার পাওয়ার বুকে না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া/তোমারে বন্দনা করি..../হে আমার মানস-রঙ্গিনী/ অনন্ত যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা সঙ্গিনী।' এমন মনোদৈহিক প্রেমের তীব্র আকুলতা ইংরেজ রোমান্টিক কবি কীটসের কবিতাতেও লক্ষ্য করা যায়,

Pillowed upon my fair love's ripening breast
To feel for ever its soft fall and swell.
Awake for ever in a sweet unrest;
still, still to hear her tender-taken breath
And so live ever-or else swoon to death.
(Bright star,would I were stead fast)[৩০]

নজরুল ইসলামের অনেক কবিতায় প্রিয়ার রূপ মাধুর্যের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। যেমন–'মৃণাল হাত/নয়ন পাত/ গালের টোল/চিবুক দোল/সকল কাজ/ করায় ভুল/ প্রিয়ার মোর/কোথায় তুল?' (দোদুল-দুল)। 'প্রিয়ার রূপ' এবং 'দোদুল দুল' কবিতা

দুটোতে রূপ বর্ণনার Sensuousness নয়, বরং sensuality রই পরিচয় পাওয়া যায়।'[৩১] মূলতঃ নজরুল ইসলামের রোমান্টিক প্রেমানুভূতি, 'দেহ' এবং 'আত্মা' জাত। Whitman এর মত তিনিও বলতে পারতেন, 'I am the poet of the body/And I am the poet of the soul.' (song of myslf)[৩২]

কবি মোহিতলাল বলেছেন, 'আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের দেহলী পরে/ পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ ফুল সাজাইনু থরে থরে।' (স্মরগরল)। কবি মোহিতলালের প্রেম দেহকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ জৈবিক বৃত্তির পথ ধরে ফুটে উঠেছে কিন্তু নজরুল ইসলাম প্রেমকে শুধুমাত্র জৈবিক বৃত্তি না জেনে, তাকে বিস্ময়, বেদনা ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করায় প্রেমানুভূতিতে গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে অতৃপ্তি বোধ, আর্তি আকুলতা, হৃদয় যন্ত্রণা ইত্যাদি এত ব্যাপ্তি ও গভীরতার সাথে প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলা কাব্যে আর কারো ভেতর এমনভাবে প্রকাশ পায়নি। মূলতঃ রোমান্টিক আর্তি আকুলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে নজরুল অন্যান্য বাঙালী কবিদের অতিক্রম করেছেন। যেমন 'পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই/চীৎকারিয়া ফেরে তাই–কোথা যাই/কোথা গেলে ভালবাসাবাসি পাই'?(পূজারিণী)। রোমান্টিকতা থেকে জাত নার্সিসাস সুলভ আত্মমুগ্ধতাও তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রবল বেগে—'কস্তুরি হরিণ সম/আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ–অন্ধ–মন মৃগ সম/আপনারই ভালবাসা/ আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা।' (পূজারিণী)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের ক্ষেত্রে মিলনের আনন্দ উচ্ছ্বাসই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি 'বিরহের অনুভূতির মধ্যে এক নতুন সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন, বলেছিলেন–চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন চিরবিচ্ছেদ করি জয়'।[৩৩] কিন্তু নজরুলের কবিতায় প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহের ভাবটাই প্রধান এবং সেই বিরহের শূন্যতায় আর্তি অশ্রু-হাহাকারের আবেগ প্রচণ্ড রকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'সিন্ধু' কবিতায় কবি সাগরের ভেতর নিজের স্বরূপকে লক্ষ্য করে তাই বলেছেন, 'তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার/ মধ্যে কাঁদে বারিধারা, সীমাহীন, রিক্ত হাহাকার' (সিন্ধু)। প্রেমে বিরহের আধিক্যের জন্য নজরুলের কবিতায় রোমান্টিক বেদনাবিলাস অতিমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় কবি প্রিয়ার বিরহ বেদনা ব্যথিত; তিনি তাকে স্মরণ করেছেন—'হাসতে তুমি দুলিয়ে জল/গোলাপ হয়ে ফুটত গাল/থল কলমী আউঁরে যেত তপ্ত ও গাল ছুঁই/বকুল শাখা ব্যাকুলহত টলমলাত ভূঁই'। কবির সাথে তার প্রিয়ার পরিচয় হয়েছিল এক বসন্তে, এখন আরেক বসন্ত যায়, কিন্তু প্রিয়ার দেখা নেই। তাই 'কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর/কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?' (চৈতী হাওয়া), এই কবিতায় রোমান্টিক স্মৃতিচারণের ফলশ্রুতিতে বিরহের বিষণ্ন সুর যেভাবে বেজেছে—তা শেলীর কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়—

The world is dreary /And Iam weary /of wandering on without thee, Mary/ A joy was ere while/in the voice and thy smile/And tis gone, when I should be gone too, Mary. (To Marry Shelly)[৩৪]

'গোপন প্রিয়া' কবিতাতেও প্রিয়ার জন্য বিরহভাব ফুটে উঠেছে, প্রিয়ার বিরহে কবি মূহ্যমান নন, কেননা প্রিয়ার মূর্তি তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে, প্রিয়া হয়েছে তাঁর কাব্য রচনার প্রেরণাদায়িনী। তাই কোনকিছুর আশা না করেই কবি তাকে ভালবেসে যাবেন, 'শিল্পী আমি, আমি কবি/ তুমি আমার আঁকা ছবি/ আমার লেখা কাব্য তুমি, তুমি আমার রচা গান/ চাইব নাক; পরাণ ভরে করে যাব দান।' তাঁর কবিতায় যে প্রেম পরিলক্ষিত হয়েছে তা অন্ধ, অবুঝ, দুর্বোধ্য এবং রহস্যময়। কবি বলেছেন—'বন্ধু হৃদয় এমনি অবুঝ কারো সে অধীন নয়/যারে চায় শুধু তাহারেই চায়–নাহি মানে লাজ ভয় (কর্ণফুলী)। রোমান্টিক মনে থাকে সুদূরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ; নজরুলের কবিতায় প্রেমের অনুষঙ্গে তা প্রকাশিত হয়েছে, 'বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজন পুরে/ ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে'। (দূরের বন্ধু)। নজরুল ইসলাম প্রেম বলতে অনেক ক্ষেত্রেই যা বুঝেছেন তা হচ্ছে–নিঃশেষে আত্মদান। তাঁর উপন্যাসগুলোতেও প্রেমের ক্ষেত্রে এই ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা'য়–প্রেমের জন্য রুবি ঘর ছেড়ে মৃত্যুর পথযাত্রী হয়েছে। নজরুল প্রিয়ার কাছে এ ধরনের প্রেমের প্রত্যাশাতেই বলেছেন, 'কোথা মোর ভিখারিণী পূজারিণী কই/ যে বলিবে ভালবেসে সন্ন্যাসিনী আমি/ ওগো মোর স্বামী। রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়িনী নই' (পূজারিণী)। প্রেমের ক্ষেত্রে চিরন্তন বা শাশ্বত সৌন্দর্যকে খুঁজেছেন বলেই ছলনাময়ী–দ্বিচারিণীকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। তবে প্রিয়া দ্বিচারিণী হলেও তার পুরাতন প্রেমকে অস্বীকার করেননি; বরং সেই প্রেমের বিরহের ব্যথা–বিষ পান করে তিনি নীলকণ্ঠ হয়েছেন, 'তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী/ ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি'। প্রবল রোমান্টিক মানসপ্রবণতার জন্যই তাঁর প্রেম পিপাসা বিস্তৃত আকারে উচ্চারিত হয়েছে, 'প্রেম এক; প্রেমিকা' সে বহু/ বহু পাত্রে ঢেলে পিব সেই প্রেম/সেই শরাব লোহু। (অনামিকা)। বিদ্রোহী কবি হিসেবে নজরুল ইসলাম বেশি পরিচিতি পেলেও মূলতঃ তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। তিনি বিদ্রোহী হয়েছেন প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্যই এবং নিজেকে বিজয়ী ভেবেছেন প্রেমের ভেতর–'আজ বিদ্রোহীর এই রক্তরথের চূড়ে/ বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে/ যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে/ আমি বিজয়ী আজ নয়নজলে ভেসে' (বিজয়িনী)।

রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতি প্রেমিক; জীবনের বহুবিধ ভাবনাকে তারা প্রকৃতি সংলগ্ন করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ প্রকৃতিকে আপন আপন ভাবনায় ব্যবহার করেছেন। নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর 'বিদ্রোহী' প্রকৃতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেছে, 'আমি এলোকেশী ঝড় অকাল বৈশাখীর।' প্রকৃতি প্রেমিক নজরুল রোমান্টিক আর্তিতেই কাল বোশেখীর ঝড়কে স্বাগত জানিয়েছেন, 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর (প্রলয়োল্লাস)। কবির বিদ্রোহী সত্তা ভয়ঙ্কর কাল

বৈশাখী ঝড়ের মত প্রবল বেগে এগিয়ে এসে অসুন্দরকে ধ্বংস করে সুন্দরকে সৃষ্টি করবে, 'ভেঙ্গে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর'। (প্রলয়োল্লাস)।

রোমান্টিক কবিরা প্রেম-বিরহ-মিলন-এসবকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ও ভাবমূর্তিতে উপস্থাপন করেন। নজরুল ইসলামের কবিতাতেও তা লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রেমের বিরহকে প্রকৃতির পটভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। 'বরষা', 'বাদল দিনে', 'মাতাল হাওয়া', 'বিধূরা পথিক প্রিয়া'–এসব কবিতায় কবি বর্ষার পটভূমিকায় বিরহকে তুলে ধরেছেন। 'সিন্ধু' কবিতায় সাগরের সাথে কবির একাত্মতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয়া চন্দ্রকে হারিয়ে সিন্ধু বিরহী; কবির কাছে সিন্ধু, 'চির বিরহ বেদনার প্রতীক তার বিদ্রোহও এই বিরহ বেদনা সঞ্জাত। নজরুল ইসলামও বিদ্রোহী এবং বিরহ যন্ত্রণাবিদ্ধ বলে সিন্ধুর সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক, 'এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া/তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।' কবি প্রেমের মান-অভিমান-রহস্য-এসবকেও প্রকৃতির ভাবমূর্তিতে তুলে ধরেছেন, 'মানিনী ঝেঁপেছে মুখ নিশীথিনী কেশে? ঘুমায়েছে একাকিনী জ্যোছনা বিছানে?/ চাঁদের চাঁদনী বুঝি তাই এত টানে/ তোমার সাগর-প্রাণ জাগায় জোয়ার?/ কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার?' (সিন্ধু) কবি সিন্ধুর বিদ্রোহী ও বিরহী রূপের মধ্যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে নমস্কার জানিয়েছেন– 'হে মহান। হে চির বিরহী/ হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী। সুন্দর আমার/ নমস্কর।' 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতায় কবিপ্রিয়া প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার, 'জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল/ তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল/ আমার প্রিয়ার/ তোমার শাখার পল্লব–মর্মর /মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।' 'কর্ণফুলী' কবিতাতেও কবি নদীকে প্রকৃতির সাথে এক করে ফেলেছেন, 'তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে যাওয়া ভাগীরথী/ তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতি?'

নজরুল ইসলামের রোমান্টিক মানস আরো প্রকাশ পেয়েছে–বাসন্তী, ফাল্গুনী, রাখীবন্ধন, চাঁদনীরাতে–ইত্যাদি কবিতার প্রকৃতি বর্ণনায়। কবি শহীদ সেনাদের মৃত্যুকেও প্রকৃতির ভাবমূর্তিতে তুলে ধরে রোমান্টিক আকুলতার পরিচয় দিয়েছেন, 'আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্তচেলী পরে/ আঁধার শাড়ী পরবে এখন পশবে যে তোর গোরের বাসর ঘরে।' (কামাল পাশা)। এখানে রক্তচেলী পরা সন্ধ্যা মেয়েকে শহীদের বৌ, আঁধারকে শাড়ি ও গোরকে বাসর ঘর রূপে কল্পনা করায় কবির রোমান্টিকতার চরম উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

রোমান্টিক কবিদের ভেতর অতীতচারণা লক্ষ্য করা যায়। অতীত ঐতিহ্য এবং মীথকে রোমান্টিক মানস প্রবণতায় নতুন করে তারা উপস্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মানস পরিভ্রমণ করেছে ভারতীয় পুরাণের রাজ্যে। নজরুল ইসলামের রোমান্টিক মানস ভ্রমণ আরো বিস্তৃত। তিনি ভারতীয় গ্রীক, মুসলিম–ইত্যাদি পুরাণের

রাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। সৌন্দর্যের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল বলেই তিনি অসুন্দর, পুরাতন ও পঙ্কিলকে ভেঙে একটি সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি খুঁজেছেন 'যৌবন দৃপ্ত বেগবান সাহসী পুরুষ'কে;[৩৫] যে অসুন্দরকে ধ্বংস করে সুন্দরকে নির্মাণ করতে সক্ষম। এই বেগবান পুরষকে কবি ভারতীয় পুরাণে শিবের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বলে 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় নটরাজ শিবের চিত্র এনেছেন, 'আসছে এবার অনাগত প্রলয়–নেশার নৃত্য পাগল/ সিন্ধু পারের সিংহ দ্বারে ধমক হেনে ভাঙতে আগল।' সিন্ধু পারের বিশাল পটভূমিতে এখানে শিব উপস্থাপিত। 'প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল'– অর্থাৎ অসুন্দরকে ধ্বংস ও প্রলয়ের নেশায় উন্মত্ত শিব এগিয়ে এসে জীর্ণ পুরাতন সমাজকে ধ্বংস করে নির্মাণ করবে নতুন সমাজ/ তাই এবার মহানিশার শেষে/ আসবে উষা অরুণ হেসে। করুণবেশে।' অর্থাৎ ধ্বংসের পরে আসবে সৃষ্টি। নতুন আলোর উষা, এখানে নতুন সৃষ্টির প্রতিরূপক (Allegory)। প্রেম ও সৌন্দর্যের একটা প্রতিরূপক কবি নির্মাণ করেছেন–'দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু–চাঁদের কর/ আলোয় তার ভরবে এবার ঘর।' এখানে "শিশু-চাঁদ" রোমান্টিক মনের নতুন সুন্দর সমাজের প্রতীক।[৩৬]

'বিদ্রোহী' কবিতাতেও কবি নটরাজ শিবের ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে রোমান্টিক আকুলতাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি, 'মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ।' আবার বলেছেন–'আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন হারা ধারা গঙ্গোত্রীর' অর্থাৎ গঙ্গাধারাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার কথাও বলেছেন। কবির প্রত্যয়–'আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগলকন্যা।' সৃষ্টির পালনকর্তা হিসেবে ভারতীয় পুরাণে বিষ্ণুর খ্যাতি আছে। বিষ্ণু যুগে যুগে সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'যুগলকন্যা' হচ্ছে এখানে বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী বা বীণাপাণি।' বিষ্ণুর কল্যাণরূপের মতো তার পত্নীদ্বয় মানুষের কল্যাণ ও শুভাশুভের প্রতিরূপক। লক্ষ্মী অর্থাৎ ধনদেবী এবং সরস্বতী অর্থাৎ বাগ্‌দেবী মানুষের শুভাশুভের বিধান কর্ত্রী। 'বিশেষ করে বাগ্‌দেবী সরস্বতী মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন, সত্য ও সুন্দরের পালনকর্ত্রীও তিনি।'[৩৭] এই মীথ ব্যবহারে কবির সৌন্দর্য–আকাঙ্ক্ষা তথা রোমান্টিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সৌন্দর্য কামনা বা রোমান্টিক ব্যাকুলতার প্রাবল্যের জন্য কবি মীথকে নতুনভাবে নির্মাণ করে তৃপ্তি খুঁজেছেন। কবি বলেছেন, 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।' ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–এই তিনজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা জানার জন্য নিদ্রিত বিষ্ণুর বুকে ভৃগু পদাঘাত করেছিল। ভারতীয় পুরাণে ভগবান বিষ্ণু কল্যাণের দেবতা। কিন্তু নজরুল ইসলাম এখানে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিরূপক হিসেবে ভাগবানকে কল্পনা করেছেন এবং বিদ্রোহী ভৃগু শুধু দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত নয়।[৩৮] 'খেয়ালী বিধির বক্ষ' বিদীর্ণ করার অভিপ্রায়ের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে। মূলতঃ নজরুলের

কবিতার চরণে যে মীথের ব্যবহার তা কবির রোমান্টিক মানসেরই বিস্তৃতবহিঃপ্রকাশ।

ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কতকগুলো আলাদা বৈশিষ্ট্য বা রোমান্টিক আদর্শ পরিলক্ষিত হয়েছিল। যেমন '(১) বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে গতানুগতিক প্রচলিত ধারা অনুসরণ করার পরিবর্তে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রবণতা। –ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের লিরিক্যাল ব্যালার্ডস এর দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮০০) ভূমিকায় বলা হল যে, কবিতার বিষয় হবে 'Common life' এর, ভাষা হবে–'a selection of language really used by men,' (২) 'লিরিকাল ব্যালাডস' এর ভূমিকায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বার বার ভাল কবিতাকে বর্ণনা করেছেন–the spaontaneous overflow of powerful feeling' বলে। এখানে জোর পড়ল স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর, –কীটস লিখলেন If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all'[৩৯]

নজরুল ইসলামের কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং কবির মানসপ্রবণতা বিশ্লেষণ করলে এইসব রোমান্টিক আদর্শ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 'বিদ্রোহী' কবিতাতে নজরুলের বিদ্রোহ শুধু ভাবনায় নয়, ভাষা এবং ছন্দের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। মাইকেল মধুসূদন বিদ্রোহ করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখে আর নজরুল ইসলাম বিদ্রোহ করলেন মুক্তক মাত্রাবৃত্তের ছন্দে কবিতা লিখে। কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নজরুল নতুনত্বের দাবীদার—'অগ্নিবীণা' শব্দ ব্যবহার বাংলা কবিতার বহুদিনকার অলস শব্দ সুষমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। শব্দকে নজরুল ইসলাম একটি প্রবল স্রোতধারার প্রবাহের মতো ব্যবহার করেছেন; যে ভঙ্গিকে ইডিথ সিটওয়েল পর্বত শিখর থেকে নিম্নভূমিতে গড়িয়ে পড়ার ভঙ্গি বলে আখ্যাত করেছেন।'[৪০] মূলতঃ 'অগ্নিবীণা' কাব্যে 'যে কবি–কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রবীন্দ্রনাথের যুগে তা এক বিস্ময়কর কলধ্বনি। ধ্বনি বিন্যাসের নতুন প্রযত্নে, শব্দ ব্যবহারের একটি হিল্লোলিত তরঙ্গাঘাতে, বক্তব্যের একটি নিশ্চিন্ত উদ্দাম দ্বিধামুক্ত গতিতে বাঙলা কাব্যে 'অগ্নিবীণা' একটি অভিনব সংযোজন। ভক্তি ও নিবেদনের বিনয়াবর্তে যে বাংলা কবিতা এতদিন রবীন্দ্র–কাব্যের ধ্যান গম্ভীরতায় স্থিত ছিল, নজরুল ইসলাম সে কবিতায় একটি অবলীল স্বাধীন স্ফূর্তি এবং অবাধ আবেগ সঞ্চার করলেন।"[৪১] রবীন্দ্র রোমান্টিকতার বাইরে নজরুল ইসলাম নতুন রোমান্টিকতার প্রাণপুরুষ। তাঁর কাব্যের রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো একথাই প্রমাণ করে যে তিনি বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বড় রোমান্টিক কবি।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রোমান্টিকতার জন্য তার কবিতাগুলো রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়েনি। বরং কবিতাগুলো সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বিধায় ক্লাসিক স্থাপত্যের মতো ভাস্বর হয়ে আছে। নজরুল ইসলাম একই সঙ্গে রোমান্টিক এবং ক্লাসিক কবি। কেন না 'ক্লাসিক হচ্ছেন সেই লেখক যিনি মানুষের আত্মাকে সমৃদ্ধ করেছেন, জ্ঞানের অনুভূতির

ভান্ডারে নতুন সম্পদ সংযোজন করেছেন, মানবতাকে দিয়েছেন কোন দ্ব্যর্থহীন নৈতিক সত্যের নিশ্চিত সন্ধান কিংবা কোনো শাশ্বত আবেগের অনন্য উপলব্ধি, অনিবার্য করে তুলেছেন অগ্রগতির কোনো নতুন ধাপ; যিনি তাঁর চিন্তাধারাকে, অনুসন্ধানের ফলকে-আবিষ্কৃত বিরল সত্যকে তুলে ধরেছেন ব্যাপ্ত উদারতায়, রুচির পরিশীলনে, যুক্তিবিচারের প্রশান্তিতে ও সৌন্দর্যের দীপ্তিতে; যিনি স্রষ্টার আসনে বসে অনন্য শৈলীতে কথা বলেছেন, অথচ বলেছেন মানুষের মনের কথাই' ।[৪২] নজরুল ইসলামের রোমান্টিক মানসের মধ্যে ক্লাসিকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে বিদ্যমান তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

(১) 'Romanticism, genarally speaking, is the expression in terms of art of sharpened sensibilities, heightened imaginative feeling and although we are concerned only with its expression in literature. Romanticism is an imaginative point of view that has influenced many art foms and has left its mark also in philosophy and history. The loose popular meaning attached to the word indicates roughly its defects rather than its merits, for it is often used as synonymous for extravagances and sentimentality. `Arthur Compton-Rickett-A history of English Literatrue -Universal Book stall, New Delhi-Pep-1989, page 292

(২) C.T. Onibns (Edited) The shorter Oxford English Dictionary Oxford University press London, 3rd Edition, 1970, page-1750

(৩) ডঃ শীতল ঘোষ-ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস-বর্ণালী, কলিকাতা দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৮৯, পৃঃ২৭৭

(৪) আবুল কাসেম ফজলুল হক (অনুঃ)-ক্লাসিক কি? (মূল-চার্লস-অগাস্টিন সাঁত্‌বভ)- লোকায়ত পত্রিকার প্রধান সম্পাদক একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯২, ঢাকা, পৃঃ-৮

(৫) প্রাগুক্ত-পৃঃ ৮-৯

(৬) ডঃ শীতল ঘোষ-প্রাগুক্ত-পৃঃ২৭৭।

(৭) প্রাগুক্ত-পৃঃ২৭৮।

(৮) শ্রীশ চন্দ্র দাশ-সাহিত্য সন্দর্শন (ভূমিকা রুহুল আমিন উদ্বেল) বর্ণবিচিত্রা, ঢাকা (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই) পৃঃ ১৯৩।

(৯) প্রাগুক্ত-পৃঃ ১৯৪

(১০) ঐ।

(১১) ঐ।

(১২) ডঃ শীতল ঘোষ-প্রাগুক্ত-পৃঃ ২৮৮।

(১৩) প্রাগুক্ত–পৃঃ ২৮৮।
(১৪) প্রাগুক্ত–পৃঃ২৮৫-৮৬
(১৫) প্রাগুক্ত – পৃঃ ২৮৭।
(১৬) শ্রীশ চন্দ্র দাশ–প্রাগুক্ত–পৃঃ ১৯৫।
(১৭) Arthur compton Rickett, Ibid, page-292.
(১৮) রহিম আজিজ–বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসঃ রোমান্স প্রসঙ্গ–'শিল্পতরু' (সম্পাদক আবিদ আজাদ), ঢাকা ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯২, পৃঃ ৮১
(১৯) দীপ্তি ত্রিপাঠী–আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়–দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৮, পৃঃ–১৭
(২০) প্রাগুক্ত–পৃঃ ১৯।
(২১) মোবাশ্বের আলী–নজরুল প্রতিভা–মুক্তধারা, ঢাকা। তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃঃ ১০৫-১০৬।
(২২) সৈয়দ আলী আহসান (অনুঃ ও সম্পাঃ) হুইটম্যানের নির্বাচিত কবিতা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ–সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ ৯৭।
(২৩) শাহাবুদ্দীন আহমদ–'নজরুলের চিন্তা'–'শিল্পতরু', (সম্পাদক আবিদ আজাদ) ঢাকা, নজরুল সংখ্যা ১৯৯০, পৃঃ–৩৫।
(২৪) Thomas Hutchinson (Edited)- The complete poetical works of Percy Bysshe Shelly-Oxford University press, London, rep, 1960, page-216–17.
(২৫) সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭।
(২৬) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান–বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত–(আধুনিক যুগ) বইঘর, চট্টগ্রাম, ৩য় সংস্করণ,১৯৬৮, পৃঃ ৪২২।
(২৭) Thomas Hutchinson-Ibid, page-575.
(২৮) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান–প্রাগুক্ত–পৃঃ ৪২২
(২৯) Thomas Hutchinson-Ibid, page-573.
(৩০) Louis Untermeyer (by)-A Treasury of Great Poems'-New York, sixteenth printi, page-1175.
(৩১) মোবাশ্বের আলী –প্রাগুক্ত–পৃঃ১১১।
(৩২) সৈয়দ আলী আহসান–প্রাগুক্ত–পৃঃ ১০০।
(৩৩) দীপ্তি ত্রিপাঠী–প্রাগুক্ত–পৃঃ ১২৪।
(৩৪) Thoman Hutchinson-Ibid-page-582.
(৩৫) মাহবুব সাদিক–মিথ–ঐতিহ্য চেতনা এবং নজরুলের কবিতা–'শিল্পতরু' (সম্পাদক আবিদ আজাদ), ঢাকা, নজরুল সংখ্যা ১৯৯০, পৃঃ ৪৭।
(৩৬) প্রাগুক্ত– পৃঃ ৫০
(৩৭) প্রাগুক্ত– পৃঃ ৫৩
(৩৮) প্রাগুক্ত– পৃঃ ৫৪

(৩৯) কবীর চৌধুরী–সাহিত্য কোষ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃঃ ৫৩।

(৪০) সৈয়দ আলী আহসান–আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে– আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭০, পৃঃ–১৪।

(৪১) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান– প্রাগুক্ত–পৃঃ ৪২১–২২

(৪২) আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রাগুক্ত–পৃঃ১২।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা —ষোড়শ সংকলন]

নজরুল ইসলামের কাব্য-বিচার সময়ের প্রেক্ষিতে

রবীন্দ্র গুপ্ত

আমাদের মনের একটি দুর্মর কুসংস্কার এই যে, কবিতাকে আমরা কবির রচনাকর্ম মনে করি না; কবিতা হল দৈববাণী। রবীন্দ্রনাথও কবিকর্মের পুরো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ 'রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য বর্তমান।' রবীন্দ্রনাথ কবির এই অন্তরতম রচনাকারীকেই মেটাফিজিক্যাল জীবনদেবতা বলেন– কবিজীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ে।

আবেগের নির্জন স্মৃতিচর্বনায় কবিতার জন্ম, আমাদের শিখিয়েছে উইলিঅম ওয়ার্ডস্বার্থ, ওয়ার্ডস্বার্থের অন্তরঙ্গ বন্ধু কোলরিজের কথা ভিন্ন। তাঁর মতে কবিতা হল, উত্তম শৃঙ্খলায় গ্রথিত উত্তম শব্দাবলী ('Best Words in their Best Order')। আবার ঐ রোমান্টিক কবিপঞ্চকের অন্যতম শেলীর ধারণা একেবারে আলাদা। কবিরা তাঁর মতে, বিশ্বের অ-স্বীকৃত বিধায়ক; বিশ্বরহস্য কবির কাব্যে অভিব্যক্তি পায় –শাশ্বত সৌন্দর্যের পর্দা একটির পর একটি উন্মোচিত হতে থাকে।

কিন্তু এইসব সংজ্ঞা কেবল কবিতার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টামাত্র। কাকে বলব Best words ? কিংবা Best order ? একটি বিষাদের তীরে ক্রৌঞ্চীকে নিহত হতে দেখে আদিকবির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াইতো স্বতোৎসারিত হয়েছিল– মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমং শাশ্বতী সমাঃ। Recollected in tranquillity না হয়েও তো শোকের অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া কাব্য হতে পেরেছে। বাল্মীকির তাৎক্ষণিক কবিতা স্ফুরণের ইতিহাসেই ওয়ার্ডস্বার্থের সংজ্ঞা নাকচ হয়ে যায়।

এত কথা বলার অর্থ, এমন কবির সংখ্যা বিশ্বে নগণ্য নয়, যাঁরা প্রধানত অব্যবহিত প্রেম বেদনা ক্রোধ ও ঘৃণার রূপকার। রক্ত–মাংসের মানুষ হিসেবে তাঁরা এমনই জীবন্ত যে চোখের সামনে পড়শীকে কেউ অকারণে নির্যাতন করলে তাঁরা রুখে দাঁড়াবেনই। অন্যায়কে তাঁরা অন্যায় বলবেনই। মানবতার মূল্যই তাঁদের নান্দনিক প্রেরণার ও গোড়ার কথা। তাতে কবিতার জাত যায় না। কারণ অনুভবের আন্তরিকতাই সেখানে উক্তিকে 'অসামান্য' (বেস্ট?) করে তুলছে। ম্যালার্মে হয়ত সেজন্যই বলেছেন, Poetry is memorable speech. 'স্মরণীয়', বিশেষণ যোগ হওয়াতেই ভাষণের চরিত্র পাল্টে গেল। আর ময়দানী কোলাহল রইল না। তবু জীবনের সঙ্গে সরাসরি যোগটাই

তো সেখানে কবিতার শক্ত শিকড়। (অবশ্য সর্বত্র তা নাও হতে পারে।) উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধে যোগ দিয়ে বুঝেছিলেন, যুদ্ধের নামে প্রচারিত আদর্শের জিগির কত অসত্য এবং যুদ্ধের ক্রুরতায় সব মানবিক মূল্যের মৃত্যু, কিন্তু যুদ্ধ তো আপৎকালীন অবস্থা, তাকে নিয়ে লেখা কবিতার স্থায়িত্ব কোথায়? তবু 'There is pity in the war and poetry is in the pity?' যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার করুণায় কবিতার জন্ম।

ওয় হুইটম্যান, পাব্‌লো নেরুদা, মায়াকভস্কি, নজরুল ইসলাম, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করবে কে? যে আলেকজাণ্ডার পুশকিন ডিসেম্বরপন্থীদের সমর্থন করেছিলেন, তার সঙ্গে পরের পুশকিনের কবিতার পার্থক্য করা সম্ভব নয়। যে- শেলী স্কাইলার্কের, তিনিই তো 'ওড টু লিবার্টি'-রও কবি। অন্য একটি প্রবন্ধে, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা প্রসঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করেছি, নতুন যুগ পায় নতুন কবিকে এবং নতুন কবিভাষা সৃষ্টি হয় সময়েরই তাগিদে, তারপর অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে সেই কবিতা সময়কে লঙ্ঘন করে যায়। অনুভবের সততা এবং কল্পনার বিস্ফারে অন্বয় ঘটলে তবেই তরুণ বা প্রবীণ কোন কবি নতুন উপমা উৎপেক্ষা রূপক তৈরি করতে পারেন- প্রযত্ন ব্যতিরেকে। এই অন্বয় কবিতাকে সিদ্ধির শিখরে পৌঁছে দেয়। যেমন, সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিবক্ষিত শব্দাবলী ঃ জীর্ণ সংস্কারের খিল/ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে /ঘৃণার কামান দাগি/ অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা/ সহানুভূতির চিঠি/স্মৃতির ফেউ/ সর্বনাশের খাল/ রাত্রির বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল- ইত্যাদি।

এই নিরিখে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার দিকে ফিরে তাকানো যায়। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁর অকস্মাৎ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকচিত্তজয়, তিনের দশকে বহুপ্রজ নজরুল প্রতিভার নানামুখে অনর্গলিত প্রকাশ এবং চারের দশকে হঠাৎ স্তব্ধতা- আমাদের বিশেষ করে ধূমকেতুর উপমাই মনে করিয়ে দেয়। বিজলী, মোহাম্মদী বা সওগাত এমন কোন উল্লেখযোগ্য বহু প্রচারিত সাময়িক পত্র ছিল না; প্রবাসী ভারতবর্ষের মতো তো নয়ই; তবু অগ্নিবীণার কিছু কবিতা ঐসব অল্পখ্যাত পত্রিকায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তাই প্রবাসীর মতো বনেদী পত্রিকাও পাঠক চাহিদার কথা ভেবে, তখনকার বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন- নজরুল- কবিতার পুনর্মুদ্রণ করে। অথচ তখনও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসীর শীর্ষপুরুষ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কি সেই কবিতা, যার জন্য বাংলা সাহিত্যে এমন আলোড়ন ? সেই কবিতা, এখন অতি-পরিচিত, নজরুলের, 'বিদ্রোহী'।

বল বীর-
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি, আমারি, নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির!

বল বীর–
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি,
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি,
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে, রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

এতো সম্পূর্ণ নতুন জগৎ, দৃপ্ত সতেজ, বক্তব্য নতুন, বলার ভঙ্গিও নতুন। একই সঙ্গে আনন্দের প্রাপ্তি এবং পরম বিস্ময়ের প্রবল ধাক্কা। এতো রবীন্দ্রলালিত বাংলা কবিতার ভাব ধারার অনুগামী নয়।

তখন রবীন্দ্রনাথের বলাকা-পলাতকা-পূরবী পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গেছে। তার আগে গেছে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালী'র স্বেচ্ছানির্বাসনের পর্ব। সেখানে তাঁর নিজস্ব ঈশ্বর-ভাবনা, রূপ-অপরূপের সম্পর্ক সন্ধান। রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনায় তখন 'আমি'র চেয়ে 'তুমি' বড়ো।

ক. আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।

খ. পাখিরে দিয়েছ গান
গায় সেই গান,
দিয়াছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আরও আগে চিত্রাতেই বলেছেন,

গ. মেলেছ বিঘোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার
রহস্য ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে।

অবশ্য মানসী সোনারতরী চিত্রা কল্পনা কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় স্বদেশের দূর্গতি, অতুলন দারিদ্র্য, পরাধীনতা, মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমের সীমাবদ্ধতা কবির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তবু মানুষের ব্যক্তি–আমিকে প্রথম সর্বশক্তিমান বলে কুর্নিশ জানানোর কৃতিত্ব নজরুলেরই প্রাপ্য। একথা বলে বোঝাতেই হয় যে বিদ্রোহী-র পঙ্ক্তিগুলি কোন তেজী আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষের দৃপ্ত ঘোষণা। তাঁর অনুজ্ঞাবোধক চরণগুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করে। প্রথম স্তবকে তিনবার নয়, আটবার আছে 'বল'– পাঠকদের তিনি শপথ করিয়ে নিয়েছেন ঃ তারপর সমগ্র কবিতায় আছে একশ উনপঞ্চাশ বার 'আমি' এবং আমিত্ব-সংশ্লিষ্ট (মম, মোর, আমার) পদ। 'মহাবিশ্ব' 'মহাকাশ' 'ভূলোক দ্যুলোক গোলক', এক নিশ্বাসে উচ্চারিত শব্দগুলি কল্পনাব্যাপ্তির

পরিচয় দেয়। 'মহাকাশ ছাড়িয়ে' না বলে, 'মহাকাশ ফেড়ে, বললে সেটা হয়ে ওঠে টেনশন ওয়ার্ড, তেমনি 'তিনলোক' ভেদ করে খোদার আসন আরশ ছিন্ন করে ওঠার ক্রমটিও বাংলা কবিতায় অভাবিতপূর্ব। 'চিরবিস্ময়ে' উচ্চারণের আগেই পরম বিস্ময়ের বোধ জাগে পাঠকের। তারপর, 'মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে'- চূড়ান্ত বিস্ময়ের। 'বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর'– পরাধীনতায় ম্রিয়মান দেশের পক্ষে, আ-চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ কমনীয় কান্ত কাব্য-ঐতিহ্যের পক্ষে– এরকম বলিষ্ঠ উচ্চারণ পাঠকচিত্তে সাড়া না জাগিয়ে পারে না।

নজরুলের কাব্যবিচারে বিদ্রোহী, আমার কৈফিয়ৎ, ফরিয়াদ, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, হিন্দু-মুসলমান, অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত, কৃষকের গান, শ্রমিকের গান, ছাত্রদলের গান প্রভৃতির বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলেছেন,

> কবি, তব উঠে এসো- যদি থাকে প্রাণ
> তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
> বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা-সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।
> – এ দৈন্য মাঝারে কবি,
> একবার নিয়ে এসো বিশ্বাসের ছবি।

কিন্তু অন্যতর আহ্বানে কবির সৃষ্টিপ্রতিভা কেবল 'অপমানিতের মরমবেদনা'-র স্বরূপ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারেননি। 'দুঃসময়' কবিতার গভীর মর্মজ্বালা কিংবা 'সবুজের অভিযান' কবিতার দুঃসাহসী দুর্মদ যৌবনশক্তির প্রশস্তি গভীর সুস্থিত অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। সেখানে নজরুলের ভরাট গলার আওয়াজ যেন ভোলানাথের কোলাকুলি ঝেড়ে আমাদের জাতীয় জীবনের 'বাছা বাছা ভুলগুলি' সামনে এসে তুলে ধরল। সেখানে লড়াই 'মিথ্যা এবং সাঁচায়'।

প্রশ্ন এই, তবে কি সমাজ চৈতন্যেই কাব্যশিল্পের ভিত্তি ? কবিতার পক্ষে সমাজ অনুঘটকের মতো, সে হল উদ্দীপনার উপলক্ষ্য, কবির অন্তরস্থ মানুষটিকে আন্দোলিত করে, আলোড়িত করে, কিন্তু কবিতা শেষ পর্যন্ত অনুভবেরই শিল্পিত প্রকাশ। সমাজের বাইরে কেউ নয়, সুতরাং একজন বলতে পারেন, সময় তো বদলায়, বড়ো পরিবর্তনের ধাপ পেরোলে আগের ধাপের সঙ্গে সংযোগ ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকে, নিছক সমাজ সচেতন শিল্পবোধে শিল্পের ক্ষেত্রে তখনই রসোভোগে বিঘ্ন ঘটে। নজরুলের কবিতার বিষয়ে এসব অভিযোগ আগেও উঠেছে, আজও অনেকে বলেন।

কলাকৈবল্যে আমার আস্থা নেই, তাই কবিতা বিচারে বুদ্ধদেব বসুর মতো

স্ববিরোধী ভাবনা আমায় পেয়ে বসে না। তিনি বাংলা কবিতায় নজরুলের আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করেও বলেছেন, তাঁর 'চীৎকৃত' কবিতাগুলি থাকবে না, মহাকালের কণ্ঠে তিনি যে গানের মালা দুলিয়ে দিয়েছেন, তাই অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর সব গান কি একই মানের? গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমাসে লেখা গানগুলি? 'দে গরুর গা ধুইয়ে, বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর, রুম ঝুম রুম ঝুম, সখি বোলো বঁধূয়ারে, কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে, বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল'- ইত্যাদি তো নানা গানেরই সূচক কলি, এদের ভাবমহিমা কি সদৃশ মানের? এরাও সেই অক্ষয় মালার ফুল। যদি গানের কলি হয়ে, এরা অমরতা পায়, তাহলে 'আমি ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' অবশ্যই স্মরণীয় কাব্যপঙ্ক্তি।

কবির সামাজিক দায়বোধ কথাটি অনেকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; নিহিত শ্রেণী বিরোধের মধ্যে কবি কোন শিবিরে- এ প্রশ্নও কবিতা বিচারে আলোচিত হয়। অন্যদিকে, সমাজের বিপর্যয়, দুঃখ-দারিদ্র্য, কুসংস্কার, মালিন্য, গ্লানির উল্লেখ থাকলেই কবিতার স্বধর্মচ্যুতি ঘটে, এ অভিমতও কবিতার অনেক তাত্ত্বিক পোষণ করে থাকেন।

কবিতার লক্ষ্য কি, তা নিয়েও সমালোচকেরা ভিন্নমত। উক্ত দুটি অভিমতই দুই বিপরীত কোটির। এ বিরোধের কোন মীমাংসা নেই। তবে মম্মট ভট্টের মতো গুণী কাব্যশাস্ত্রীও গোঁজামিল দিয়েছেন। তিনি কাব্যের লক্ষ্য 'পরনির্বিতি' বলেও 'কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে' মেনেছেন। তাহলে দায়বোধ উহ্য রইল না।

নজরুল কাব্য-কবিতার নান্দনিক নিরিখ নির্ধারণের পূর্বে তাঁর আরও কিছু সমাজ চৈতন্যে ধৃত কবিতা পঙ্ক্তি আস্বাদন করা যাক।

১. এই ধরণীর যাহা সম্বল
বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান-
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান।

২. যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু দুর্গ গুঁড়া।

৩. ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু মুসলেমিন।
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন
ধর্মকলহ রাখ দুদিন।
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া
গণ্ডুষ ফের করিবি বাঁচিয়া
আসিবে না ফিরে এই সুদিন।

বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্কলীন।

৪. ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে নাক তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন।

৫. শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরেরে হানো মৃত্যুবাণ।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।

কোন পঙ্ক্তিই গভীর জটিল মানসিকতার নিদর্শন নয়, বরং ভাষাগত অতি-সরলীকরণের ঝোঁকটিই পাঠকের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। মুখের কথাই যেন সমিল বচনে উপস্থিত। উপস্থাপিত/ ১৯২১-২২, ১৯২৬,১৯৩০-৩৩, এইসব সময় পরিধির সমাজ, রাজনৈতিক আন্দোলন, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নানা স্তর, ইংরেজ শাসকবর্গের পীড়ন–দমননীতির প্রতিবাদ, আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা উৎকীর্ণ পঙ্ক্তিগুলোতে পরিস্ফুট। আমাদের দেশপ্রেমে যতটা ভাবালুতা, ততটা সংকল্প দৃঢ়তা নেই। তাই নজরুল–কবিতার সমাজ–ভাবনায় বেশ ঝাঁঝ, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটু সমালোচনা রয়ে গেছে। মেহনতী মানুষের মুক্তি খিলাফত–অসহযোগ ঐক্যে নেই, আছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে। 'ওড়াও ওড়াও লাল নিশান' কবিতার আনন্দানুভূতি আজ অপ্রাপ্তির বেদনায় পর্য্যবসিত, কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে তা অবশ্য অভিনব। 'জীবনোল্লাস' বা 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার তাৎপর্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কাল্ বোশেখীর ঝড়।

কবির অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অনেক রচনাই তৎকালীন পরাধীন দেশের ক্রোধ ক্ষোভের অগ্নিজ্বালায় জর্জ্জরিত। আগুনের রঙ্ লাল, তাকে সবুজ করবে কে?

বিশ শতকের চারের দশকের পরেও চারটি দশক অতিক্রান্ত। অর্থাৎ কবির মানসিক বৈক্লব্য থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আমরা এগিয়ে এসেছি। সেই ক্রোধ ক্ষোভের কারণ এখন নেই; যদিও সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ আজও অক্ষুণ্ন, আছে ধর্মের ভণ্ডামি, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার। কবির কাম্য ছিল যে 'মানুষের ধর্ম', সেখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু এখন বিভক্ত বাংলার দুই

বাহুতেই মৌলবাদের ক্ষত– সব মানব মূল্যের, হিন্দু মুসলমানের যৌথ সাধনার, সুস্থ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। নজরুল ইসলামের আকাঙ্ক্ষার স্বদেশ, শোষণমুক্ত স্বপ্নের স্বদেশ এবং বিশ্ব-আমাদের কালে ও প্রজন্মে বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত। যা ছিল সুখদস্বর্গ তার থেকে আমরা ভ্রষ্ট।

তাই ফিরে ফিরে নজরুলের কবিতা ও গানের কাছে আসতে হয়। প্রায়-প্রবচন হয়ে ওঠা কবির অতি পরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলি পরিবর্তিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশে নতুন তাৎপর্য লাভ করে যেমন, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ, তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত কমল, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই, আমিই কি জানি/ কে জানে কে আছে / আমাতে মহামহিম, আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই, একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান, জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব উত্থান, হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছে মহান, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস, অন্তর ন্যাশনাল সংহতিরে'- ইত্যাদি।

বাঙালী কাব্যপাঠকের স্মৃতির সঞ্চয়ে কাব্যাংশগুলি অমলিন। ভালো কবিতায় সুভাষিত উক্তি থাকে, কিন্তু সুভাষিত মানেই সুকবিতা নয়। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। চারের দশকের উপান্তে সাহিত্য বিচারের নান্দনিক বিতর্কে ঠিক এই ধরনের প্রসঙ্গ উঠেছিল। আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায়, ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ সেই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামের কবিতায় কালোত্তীর্ণ শিল্প মূল্য না পেয়ে অনেকে সাহিত্যের পরম মূল্য ও উপকরণ মূল্যের দ্বিধা-দ্বৈরথে জড়িত হন বলেই উক্ত বিতর্কের সার-সংক্ষেপ এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। পরিচয় পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যায় আইয়ুব সাহেব লেখেন, 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য'। তাঁর বক্তব্য ছিল,

ক. পুরাতন সমাজের পাড় ভাঙছে একদিকে, নতুন সমাজের পলি জমেছে আর একদিকে। এই ভাঙাগড়ার মহা যজ্ঞশালায় ডাক পড়েছে সমস্ত শিল্পীর। সঙ্গীতকার বাঁশি হাতে করে, সাহিত্যিক লেখনী ধরে, চিত্রকর তাঁর তুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তাঁদের গজদন্তের মিনার চূড়া থেকে।

খ. লেনিন 'সাহিত্য ও পার্টি সংগঠন' প্রবন্ধ লেখার তিরিশ বছর পরে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও নেতা জর্জি ডিমিট্রভ ঘোষণা করেন, 'কবিতায় উপন্যাসে নাটকে ও ছোটগল্পের শিল্পরূপে' আমাদের হাতে এমন ধারালো হাতিয়ার তুলে দিন, যাতে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে ব্যবহার করা যায়।'— আশংকার কথা– এইটেকেই শিল্প সাহিত্যের সর্বপ্রধান সার্থকতা বলা হয়েছে।

গ. চরম মূল্য অন্য নিরপেক্ষ, শিল্প সাহিত্যের আনন্দই তার চরম মূল্য – সে সামাজিক ভালো মন্দের (উপকরণ মূল্যের) উর্দ্ধে।

ঘ. ফলিত সাহিত্যের ভূয়সী প্রচারকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাব, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অন্তরতম অনুরাগ আছে, সেটাকে

যেন ব্যাহত হতে না দিই।

উত্তরে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য নিম্নরূপ,

ক. সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সময় বা কেবলমাত্র সাহিত্যের রস সম্ভোগ করিবার সময়, কেহ সমাজতাত্ত্বিক না হইয়া নিছক সাহিত্যিক থাকিতে পারেন। কিন্তু যখনই উপভোগের সীমা পারাইয়া বিচারের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয়, তখনই প্রয়োজন হয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির।–

খ. শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি চিরদিন জনবিপ্লবের সমর্থক। আসল কথা সামাজিক বাস্তবকে তিনি কি পরিমাণে যথাযথ রূপ দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ দিয়া তাহাকে বিকৃত করেন নাই– এই মাপকাঠির ব্যবহারে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার অনেকখানি আত্মনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে–আপরুচিত্বের পরিধি সংকুচিত হইয়া আসে।

গ. মার্কসবাদ তাই ফলিত সাহিত্য ও স্থায়ী সাহিত্য বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও গণসাহিত্যের আত্যন্তিক বিভেদ স্বীকার করে না।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই ঋদানভ-থিসিস অনুযায়ী নজরুলের কবিতা বিশ্লেষণ করেছেন; জনাব মুজফফর আহমদ, আবদুল হালীম তাঁর বন্ধু বলে কমিউনিস্ট পার্টির পত্র-পত্রিকায় ১৯৪০ সাল থেকেই প্রতি বছর ২রা জ্যৈষ্ঠ নজরুল সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে; গণবাণী, লাঙল প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গেও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন লেখকদেরই যোগ ছিল। রবীন্দ্র জন্মদিনের মতো, নজরুল বাক্‌শক্তিরহিত হবার পরে, ঘটা করে কমিউনিস্ট পার্টির যুবফ্রন্ট, সংস্কৃতিফ্রন্ট নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। মুজফফর আহমদ, আবদুল হালীম ছাড়া নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ, হেমন্ত কুমার, নলিনীকান্ত, প্রাণতোষ, পবিত্র প্রমুখ নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলেই কম বেশি 'বাম-ঘেঁষা'। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই প্রথম সরকারীভাবে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল এবং নজরুল জয়ন্তী নামে একটি বই বেরোল। পশ্চিমবঙ্গে যে নজরুল একাডেমি গঠিত হয়, তার মধ্যে কল্পতরু সেনগুপ্ত, বিচারপতি মাসুদ থেকে সম্পাদক মজহারুল ইসলাম পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গ সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির কাছের মানুষ। তার শুভ ফল এই হয়েছিল, ছাত্র যুব সমাজে নজরুল কবিতার চর্চা অব্যাহত ছিল। মুখ্যত অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা ছিল সভা-অনুষ্ঠানে আবৃত্তির প্রিয় বিষয়। সঞ্চয়িতার চেয়ে তখন অগ্নিবীণা বেশি বিক্রি হত। গানের জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠার কথা সর্বজনস্বীকৃত। সেকালের প্রধান গায়কেরা সকলেই নজরুলের গান রেকর্ড করিয়েছিলেন; তবু প্রতিষ্ঠাগতভাবে নজরুলের সমাজ চেতনামূলক গানগুলি গণনাট্য শিল্পীরাই গ্রামেগঞ্জে শহরে শহরতলীতে নিয়মিত প্রচার করতেন। বাম সাহিত্য মহলে রবীন্দ্র–অনীহা এবং নজরুলের–অনুরাগ তখনকার বিশেষ প্রবণতারই পরিচয়বহ। বর্তমান আলোচক 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' বাণীকণ্ঠ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শিশির কুমার ভাদুড়ী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, মোহিত মৈত্র এবং কাজী

সব্যসাচীর কণ্ঠে শুনেছেন।

আর অশুভ ফলের কথাটাও বলা উচিত। সমাজ বাস্তবতার ওপর অত্যন্ত ঝোঁক পড়ায় বামপন্থীরা খণ্ডিত নজরুলকে নিয়েই তৃপ্ত রইলেন। মারফতী গানের, শ্যামাসঙ্গীতের নজরুলকে নিয়ে তাঁরা বিব্রত। হাফিজ-ওমরের অনুবাদক নজরুলও উপেক্ষিত রয়ে গেলেন। কেউ বললেন, ওগুলি গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমাসে লেখা, ওগুলিতে কবির অন্তরের প্রেরণা নেই। এমনকি 'বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল' ধরনের গানকে নজরুল প্রতিভার অধঃপতন বলা হল। কল্পতরু সেনগুপ্ত তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলিকে tour-de-force নিছক সাহিত্যিক খেলা বলতে চেয়েছেন।

কমিউনিস্টদের শিবিরাশ্রয়ী (শিবির-তত্ত্বটাই ঋদানভের) কাব্য ও কবিতা বিচারের যাঁরা বিরোধী, কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য সংস্কৃতির যাঁরা প্রবল প্রতিপক্ষ, তাঁরা নজরুলকে প্রায় এড়িয়ে গেলেন। কখনো বা রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নজরুলকে হেয় করার চেষ্টা দেখা গেল। ফলে পথের দিশা, অগ্রপথিক, দীপান্তরের বন্দিনী, জীবন বন্দনা, প্রলয়োল্লাস, অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি, বুলবুল-চোখের চাতকের গানগুলি তাঁদের নজরে পড়ল না। কেবল কবিরাণী, পউষ এলো গো, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি প্রভৃতি কয়েকটি কোমলভাবের কবিতা ও গান তাঁদের স্বীকৃতি পেল। 'সিন্ধু'-র পর্যায়গুলির কোন তাৎপর্য আবিস্কৃত হল না 'নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে'।

কবি যত গান রচনা করেছেন, সেগুলি তাঁর কল্পনাজগতের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কাছে বিশ শতকের তিনের দশকের দায়বদ্ধ কবি নজরুল ইসলাম অনেকখানি বিস্মৃত, অপরিচিত।

বরং রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি নজরুল সঙ্গীতের ভাব, রূপ ও সুরের বৈচিত্র্য ক্রমশঃ মর্যাদা পাচ্ছে। গীতিকার-সুরকার নজরুল ইসলাম দুই বাংলার তরুণ সমাজের কাছেই এখন প্রিয় এবং অনুশীলনযোগ্য। বুদ্ধদেব বসুর আক্ষেপোক্তি স্মরণ করা যেতে পারে।'

> পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বায়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা খর্ব হলো না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না। প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে।

বুদ্ধদেব বসু নিজে কবি এবং কাব্য অনুশীলনে একান্ত মনোযোগী; তিনি নজরুল ইসলামের মুগ্ধ অনুরাগী হিসেবেই তাঁর কবিতার শিল্পগত ত্রুটির কথা বলেছেন'

১. কবিজীবনে ভাবের ও রূপরীতির কোন বিবর্তন ঘটেনি।

২. প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি। অর্থাৎ আবেগের অব্যবহিত তাড়না মননশীলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। (যে কারণে টি.এস.এলিয়ট

কল্পনার সঙ্গে Fundamental Brainwork-এর সংযুক্তির কথা বলেছেন।)

৩. জীবনদর্শনের গভীরতা ছিল না।

৪. সচেতনতার অভাব। ২ সংখ্যক লক্ষণেরই সম্পূরক।

বুদ্ধদেবের মূল্যায়নে শ্রদ্ধার কোন অভাব নেই, নজরুলের কবিতা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার অকপট অভিব্যক্তিই লক্ষ্য করা যায়। তবু কিছু কথা থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চেয়ে অনেক দুরারোহ শিখর ডিঙিয়ে পৌঁছতে হয় গৌরীশৃঙ্গের শিখরে; সব পর্যটক সফল হতে পারেন না; অথচ নন্দাঘুন্টি পর্যন্ত পৌঁছানোর আনন্দও কম রোমহর্ষক নয়। রবীন্দ্রনাথকে যদি মানদণ্ড ধরা যায়, তাহলে অনেক বিখ্যাত কবি-পর্যটকই কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে নন্দাঘুন্টি পর্যন্ত পর্যটনের সাফল্য অর্জন করেছেন, গৌরীশৃঙ্গের চূড়া দূর থেকে অনুমান করতে পেরেছেন মাত্র। 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরেই উল্লেখযোগ্য কবি-ব্যক্তিত্ব নজরুল ইসলামের',- বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার কোন বিবর্তন আদৌ তিরিশ বছর আগে বর্তমান আলোচকের নজরে এসেছিল, 'সন্ধিক্ষণ' থেকে 'অভ্র-আবীর' পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় অস্থির বহুর্মুখী পদচারণা, বহির্মুখী ব্যস্ততা, যখন দেশে এবং তাঁর সমকালে যে-ঘটনা ঘটছে, সে গান্ধীর কলকাতা আগমন, জগদীশচন্দ্র বসুর নাগরিক সম্বর্ধনা, রবীন্দ্রনাথের ৭৫ বছর পূর্তি, ঠেলাগাড়ি ধর্মঘট, ধাঙড় ধর্মঘট বা সহমরণ নিবর্তন, যাই হোক কবি সত্যেন্দ্রনাথ সেই ঘটনায় বিচলিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একান্তভাবেই সাময়িকতার কবি; এছাড়া বিশেষ ছন্দ নিপুণতার জন্যও তিনি স্মরণীয়- এখানেই তিনি যথেষ্ট বৌদ্ধিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর কবি প্রতিভার কোন মৌলিক প্রেরণাভূমি নেই। তিনি রবি-রশ্মি মণ্ডলেরই অন্তর্গত।

আমাদের বিচারে, সমকালের সমাজবাস্তব কবির ব্যক্তি চৈতন্যে আত্মসাৎ করতে পারাটাই কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। সত্যেন্দ্রনাথের রাজা-কারিগর, মেথর, শূদ্র, জাতির পাঁতি ইত্যাদি কবিতাবলীর সঙ্গে নজরুলের সমাজ-কেন্দ্রিক কবিতাগুলির ভাবসাদৃশ্য খুবই সহজলক্ষ্য। তবু 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া'-র পাশাপাশি 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানব জাতি' তুলনা করলেই বোঝা যায়, একটিতে আছে সংস্কারমুক্ত মনের সামাজিক প্রত্যয়, অন্যটিতে পাই জাতিভেদের সংকীর্ণতার উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্পর্কে ধারণা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-প্রবল ক্ষোভের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন ঠিকরে পড়ছে।

স্বভাবত রোমান্টিক কবিদের মধ্যেই একটা বিদ্রোহভাব থাকে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রচলিত সত্যশিব সুন্দরের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ থাকে। ওয়ার্ডস্বার্থ কোলরিজ শেলী কীটস্ বায়রণ উনিশ শতকের ইংরেজি কবিতার এই পাঁচ রোমান্টিক

কবির মধ্যে বায়রনের সঙ্গেই তাঁর উচ্ছ্বাস-আতিশয্যের, বিদ্রোহ প্রবণতার এবং জনপ্রিয়তার তুলনা চলে; আবার বায়রণ থেকে তাঁর কবিতার পার্থক্যও লক্ষণীয়। বায়রনের স্বদেশে পরাধীনতার অভিজ্ঞতা ছিল না, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মতো স্পর্শকাতর বিষয় ছিল না, তবু বায়রণ কাব্যের কি বিবর্তন-পরিণতি স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর? মধুসূদন দত্ত একটি চিঠিতে বন্ধুকে জানিয়েছেন, বেচারা রঙ্গলাল জানে না, আল্পসের অনেক চূড়া-বায়রণ মুর ওয়ার্ডস্বার্থ-আরও, আরও অনেক অনেক ওপরে মিল্টন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচী স্নাতক-স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধীত হন; তাঁদের কাব্য বিচারের গবেষণা-সন্দর্ভও বেরিয়েছে। উক্ত কবিদেরও মানসিকতার কোন বিবর্তন বা পরিণতি ঘটেনি, সেজন্য তাঁদের কবিতার রসোপভোগে তো বাধা জন্মায়নি। একথা ঠিক, অগ্নিবীণা বিষের বাঁশি ভাঙার গান সর্বহারা সাম্যবাদী-র কবির প্রেম-প্রকৃতি ঈশ্বর-মানুষ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আবার, একেবারে যে বদলায়নি, তা বলা যায় না। 'বাংলাদেশে মহাত্মা' আর চরকাতত্ত্বের সমালোচনা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। প্রথম কাব্য নামগুলি যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মরীচিকা মরুমায়া মরুশিখা এবং উত্তরকালের ত্রিযামা নিশান্তিকার মধ্যে গভীর পার্থক্য, তেমনি নজরুলের প্রথম পর্যায়ের উঁচু পর্দায় বাঁধা কবিতার সঙ্গে তাঁর বুলবুল, চোখের চাতক, জিঞ্জিরের কবিতাগুলির অনেক তফাৎ। ফার্সী কবিতায় ওমর ও হাফিজ দুটি স্মরণীয় নাম। তাঁদের কবিতার জীবনদর্শন তো ধীরে ধীরে পরিণতির শিখর স্পর্শ করেনি। একটা দর্শন অঙ্গীকার করেই তাঁরা কাব্যচর্চ্চা শুরু করেছেন–অনেকটা মধ্যযুগের বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের মতো।

ওমর খৈয়াম সম্পর্কে নজরুল ইসলামের ধারণা কি ছিল দেখা যাক। ওমরকে তাঁর কাব্য পড়ে যারা Epicurean বলে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণত্ব সত্য বলেন না। ওমরের কাব্য সাধারণত ছয়ভাগে বিভক্ত'

১. শিখায়াত্-ই-রোজগার অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ।

২. অজ্জ অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।

৩. বাহরিয়া– বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল–পাখি ইত্যাদির প্রশংসা।

৪. কুফরিয়া –ধর্মশাস্ত্র বিরোধী কবিতাসমূহ। এইগুলি ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতারূপে কবিসমাজে আদৃত। স্বর্গ–নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপ–পূণ্যের মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।

৫. মুনাজাত– খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মতো প্রার্থনা নয়, সুফীর প্রার্থনার মত রহস্যজড়িত।

নজরুল ইসলামের মন্তব্য 'ওমরকে Epicurean কতকটা বলা যায় শুধু তাঁর

'কুফরিয়া' শ্রেণীর কবিতার জন্য। স্বর্গ–নরক ভগবান বলে সত্যই কি কিছু আছে? আমরা মরে কোথায় যাই? কেন এই হানাহানি? এই অভাব, দুঃখ শোক? এমনিতর অগুন্তি প্রশ'– যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি।

> ওমর বলতে চান, এই প্রশ্নের হাত এড়ানোর জন্য কত অবতার পয়গম্বর এলেন। তবু যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই রয়ে গেল। মানুষের দুঃখ এক তিলও কমল না। ওমর তাই বললেন, এসব মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপ পূণ্য মিথ্যা। তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা।

ওমর খৈয়ামের এই সুফীভাব, জীবনকে পরোয়া না করা, নর ঈশ্বরবাদ এবং শাস্ত্রীয় গোঁড়ামিকে ধিক্কার দেওয়া, যেন ইচ্ছা করেই সরাব-সাকী নিয়ে মাতোয়ারা হওয়া – নজরুল ইসলামকে গভীরভাবে টেনেছিল। তাঁর বিশ্বাসের জগতে আলো ফেলেছিল। ওমর অনুবাদসূত্রে এখানেই নজরুলের কবিতার নান্দনিক ভিত্তি আবিষ্কার করা সম্ভব। কৈশোরে লেটোর দলে হাতে-খড়ি, হিন্দু-মুসলিম পুরাণচর্চা, গ্রামের মাটি–ঘেঁষা সাধারণ হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্টতায় তিনি বাংলা সাহিত্যের যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন, সেখানে মানব সাধনার অভেদ রূপটাই চোখে পড়েছিল। তারপর অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ– তাঁর বাণীর প্রসাদ আমাদের 'বিকর্ষ'। হিন্দু-মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, অনৈক্য, রাজনৈতিক সামাজিক শোষণ তাঁকে বিবিধ জিজ্ঞাসায় জর্জরিত করেছিল। তাঁর সুন্দরের ধ্যান বিচলিত হয়েছে বারেবারে। তিনি মানববিজয় বৈজয়ন্তী কেতন ওড়াতে চেয়েছিলেন নবসৃষ্টির মহানন্দে। সুতরাং 'বিদ্রোহী' কবিতায় অজস্র ধ্বংস প্রতীকের ব্যবহার সত্ত্বেও বৈনাশিকতা ঐ কবিতার মূল সুর নয়।

'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতাটি স্মরণ করি,

> পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি ?
> মুক্ত ভারতী ভারতে কই ?
> আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
> সত্য বলিলে বন্দী হই,
> অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
> বলিতে পারি না অত্যাচার,
> যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
> সহিছে বিচার–চেড়ীর মার,
> বাণীর মুক্ত শতদল যথা
> আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
> পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
> বাণী পূজা-উপচার বহি ?
> সিংহের ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
> ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
> কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,

বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ–পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ ?
তবে তাই হোক । ঢাক অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ ।

গোটা কবিতাটিতেই কাব্যদেবীর পূজারীর ভূমিকা পালনে কবি আগ্রহী। বাধা বিদেশী শাসন, স্বদেশী সমাজ। 'রূপের কমল রূপার কাঠির কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান, সেখানে কবিতা লিখলে কণ্ঠরোধ করে আইন, বই বাজেয়াপ্ত হয়, শারীরিক অর্থেই কবিকে কারাবাসী হতে হয়'। তবু এই দেখার দৃষ্টি বিরল; দুঃখিনী সীতা, পরাধীন স্বদেশ এবং নির্যাতিত মানুষের কবিতা একই প্রতীকে ধৃত। প্রতিকূল পরিবেশেও কবি 'নন্দনবন মধুর পিয়াসী'। কবি স্বভাবের পথে আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন না, বারংবার প্রতিহত হয়েই 'বাণীর কমল' বা 'বাণীর সেতার' যুগান্তরের পাঞ্চজন্য হয়ে উঠেছে। এরই সম্পূরক ভাবনা 'দারিদ্র্য' কবিতায়; 'বীণা মোর শাপে তব হল তরবার'।

'বীণা' থেকে যুদ্ধের আহ্বান–'শঙ্খ' এখানে 'তরবারি', কারণ একই– 'বাণী ক্ষুরধার' তাকে কোমল ভাষায় প্রকাশ করা যেত না।

শীর্ণ করপুট ভরি, সুন্দরের দান
যতবার নিতে চাই- হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

কবি এভাবেই সুন্দরের কল্পলোক থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছেন। শান্ত সুন্দর বা বেদনাসুন্দর হয়ে উঠছে রুদ্রসুন্দর। বারংবার কবিস্বভাব আহত হয়েছে সময়ের অভিঘাতে। দারিদ্র্য তারই একটা বাহিরের চেহারা।

কবি দেখেন,

নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দূরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি, ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

এক কথায়,

উছলি, উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ !
আপনার আগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের !

তবু স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের কল্যাণের। ....
কে বাজাবে বাঁশি ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ? ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান, নয়ন নির্যাস। ....

প্রকৃতির সর্বত্র প্রাণের উচ্ছলতা দেখে স্বতঃই তাঁর মনে আনন্দের আগমনী গান জাগে। কিন্তু সে ভাবটি স্থায়ী হতে পারে না। দারিদ্র্য অসহ, পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে, অহরহ। 'সুন্দরের হাসি' হয়ে ওঠে 'নয়ন নির্যাস' 'পুষ্পায়ত' গেলাস ভরা (ধুতুরা) দারিদ্র্যের পোষাকে কাব্যসরস্বতীই তাঁর কপালে দিলেন 'বেদনার টিকা'। 'আমার সুন্দর' রচনাটি নজরুলের কবি-প্রকৃতি, তাঁর কবিতার নান্দনিক পরিচয় বুঝতে সাহায্য করে। তাই রচনাটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল,

> আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান সুর ছন্দ ও ভাব হয়ে। নবযুগে তার শক্তি সুন্দর প্রকাশ এসেছিল। (জেলে উৎসর্গীকৃত 'বসন্ত' পেয়ে) তাঁর দক্ষিণহস্ত দিয়ে আমার সুন্দরের আশীর্বাদ এসেছিল জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে।–
>
> আমার অন্তরতম সুন্দরকে বাংলাদেশ দিয়েছিল ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়ের আকুলতা। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমিরূপে। জাতি ধর্মভেদ আমার কোনও দিনও ছিল না, আজও নেই। আমাকে কোনদিন তাই কোন হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন সুন্দর প্রেমাস্পদ সুন্দরকে দেখলাম। প্রিয়পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গেলেন শোকসুন্দরকে। স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সাময়িক অবসাদ। তারপর অধ্যাত্মসাধনা, শাস্ত্র অনুশীলনের পর্ব। [এই সময়কে কবি বলেছেন স্বর্ণজ্যোতিঃ সুন্দর। এখানেই শেষ নয়।]–
>
> আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম- দৈন্যে দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে তিনি জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললাম, আমি ব্রহ্মা চাই না, আল্লাহ্ চাই না, ভগবান চাই না। – আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী সুন্দর, আনন্দ সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই, শান্তি নেই।...

কবির অন্তরস্থ সুন্দর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে হবে; সর্ব অসাম্যভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম বিলাস, পরম বিহার'।

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতি আলোচকের অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে। নজরুলের ব্যক্তিজীবন,

তাঁর স্বদেশভাবনা এবং সৌন্দর্যচেতনার মধ্যে অন্বয় ছিল না। ফলে রূঢ় ভাষায় ইংরেজ শাসনের অপর ইংরেজের অপশাসন নিয়ে অগ্নিবর্ষী সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছেন, সে-ও তাঁর কবি চেতনার স্ফুরণের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়, জনগণের সংবর্ধনাও তাঁর কাছে গভীর তাৎপর্যবহ। স্বদেশবাসীর ভালোবাসা যেন কাব্যলক্ষ্মীরই দেওয়া পুরস্কার।

নজরুলের কবি প্রকৃতির মধ্যে বিসদৃশ্যের সমাহার হয়েছিল, সমন্বয়েরও সম্ভাবনা ছিল। তার প্রমাণ মেলে এই রচনায়। 'আমার সুন্দর' রচনার গদ্য শৈলী দুর্বল, পুনরুক্তি দুষ্ট, কিন্তু এটিকেই নজরুলের Gospel of beauty বলা যায়। তাঁর নান্দনিক বোধে শুদ্ধ আনন্দের আর্তি ছিল, উপলব্ধিও ছিল, কিন্তু তাঁর সমাজবোধ ও স্বদেশবোধের সঙ্গে নান্দনিক অনুভূতির কোন পার্থক্য ছিল না। আমরা সমাজ বা রাষ্ট্রিক বিষয়ের সঙ্গে কবিতাকে, কবির নান্দনিক বোধকে মেলাতে অভ্যস্ত নই বলে সমগ্র নজরুলকে গ্রহণে দ্বিধা ঘটে। সে কতকটা আমাদের অভ্যাসের দোষ, কতকটা নজরুলের কাব্যের ধারাবাহিক প্রকাশনার অভাব। [বর্তমানে দ্বিতীয় অভাব পূরণ করেছে ঢাকার বাংলা একাডেমি।]

ব্যক্তিগত শোক থেকে বেদনার আবির্ভাব, অধ্যাত্মসাধনা, কিন্তু প্রচলিত অর্থে ধর্মীয়তা নয়, বরং লেটো-আউল-বাউলের সহজ মানবপন্থা, যার সঙ্গে কবি ওমর খৈয়ামের ভাবুকতার মিল খুঁজে পেয়েছেন— এসবই তাঁর কবি প্রকৃতিকে আন্দোলিত করেছে। নজরুলের মৌলিক কবিস্বভাবের জিৎ এইখানে যে, অনেক দীর্ঘপথের পরিক্রমা সেরে তিনি নিজের জায়গাটিতেই আবার এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ (ক) এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই, (খ) শিহরি উঠোনা, শাস্ত্রবিদরে করোনাক, বীর, ভয়, (গ) আমিই কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম, (ঘ) একের অসম্মান, নিখিল মানব জাতির লজ্জা – সকলের অপমান ইত্যাদি। অর্থাৎ একদিকে শোষিত দরিদ্র অপমানিত মেহনতী মানুষ, অন্যদিকে বিদেশী শাসকদের শোষণ-পীড়ন বিশ শতকের সাধারণ ভারতীয়ের কাছে এই তো ছিল বড় সমস্যা। কামাল পাশার আবির্ভাব, প্যান ইসলামের জাগরণ, রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র, স্বদেশে বিদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, দেশবন্ধু এবং বারীন ঘোষের রাজনীতি- সব মিলিয়েই নজরুল ইসলাম। তিরিশ বছরের বাংলা ও বাঙালীর চিন্তাভাবনার ছোট বড় সব বিক্ষোভ, বেদনা, অস্বচ্ছ মুক্তিচিন্তা নজরুলের কবি মানসে বিধৃত। কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরোধকে তিনি পাশ কাটিয়ে যাননি। তাই রবীন্দ্রনাথ পূরবীর 'মাটির ডাক' কবিতায় নিজেকেই যেসব প্রশ্ন করেছেন, কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিলি চাবি, তেমনই সুন্দরের আহ্বানে নজরুল ফিরে এসেছেন বাংলার মাটিতেই- সেই সাম্যসুন্দরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে, সেই লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে।

যে–কবি 'জাহান্নামের আগুনে' বসে 'পুষ্পের হাসি' হাসতে জানেন, যিনি লেখেন,

'রূপের দীপালি-উৎসব আমি দেখেছি তোমার অঙ্গে', 'যা কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন, যা কিছু চুম্বন দিয়ে করেছি সুন্দর', কিংবা 'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে/ হাবুডুবু খায় তারা বুদ্বুদ, জ্যোছনা সোনায় রাঙে'- তাঁর সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যপ্রেরণায় সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

দেখার চোখ, শোনার কান তো সকলেরই আছে; কিন্তু আমরা অভ্যাসবশে দেখি, অভ্যাসবশে শুনি। কবির সংবেদী চোখ ও কান প্রখর প্রবল হলেই তাঁর কবিভাষা নতুন Expression-এর শক্তি অর্জন করে। পাঠকের সঙ্গে বিশেষ কমিউনিকেশন তৈরি হয়।

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি,
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী।

কিংবা, 'অধর নিস্‌পিস/ নধর কিস্‌মিস/রাতুল তুল্‌তুল/ কপোল'- এরকম সত্যেন দত্তীয় চটুলতার পরেও অজস্র সার্থক পঙ্‌ক্তি চোখে পড়ে। যেমন - 'ভালো আমি ছিলাম এবং ভালোই আমি আছি/ হৃদয় পদ্মে মধু পেল মনের মৌমাছি', 'আসমান জোড়া কালো কাফনের আবরণ যেন টুটে/ এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে মৃত শিশুর অধর পুটে', 'ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ', 'বাবলা ফুলে নাকছাবি তার গায় শাড়ি নীল অপ্‌রাজিতার' 'চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ', 'তাল–বনাতে ঝন্‌ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বাজে বজ্রে তুরী' প্রভৃতি।

অত্যন্ত দ্রুত যাঁরা লিখতে বাধ্য হন, ব্যক্তিজীবনে কর্মব্যস্ত, জীবন-জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত, নিজের লেখার দিকে তাঁদের ফিরে তাকাবার অবকাশ হয় না। পরিমার্জনার অভাবে তাঁদের রচনার শিল্পশ্রী খর্ব হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগী পাঠক তাই আক্ষেপের হাত থেকে রেহাই পান না। আবার কোন অবকাশে মার্জনার মর্জি যদি এসে যায়, পুরনো পর্যুসিত পঙ্‌ক্তি অসামান্য উজ্জ্বলতা অর্জন করে। নজরুল যে এ কাজে নির্মোহ সংস্কারক ছিলেন, তারও পরিচয় পাই। 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রথমে লেখা হয়েছিল,

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি হাহা, হাহা, হিহি, হিহি,
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চিঁহি চিঁহি, চিঁহি-চিঁহিহি

অবশ্যই শব্দময়, কিন্তু এদের শব্দানুরণিত বক্তব্য অর্থহীন। সংস্কারের পর এই অংশের চেহারা,

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মতহ্রেষা হেঁকে চলে

অনুকার শব্দগুলি বর্জন করায় অশ্ববেগ কমেনি। আবার নিছক ঘোড়ার ডাক ছিল বস্তুসর্বস্ব, 'হিম্মত-হ্রেষা'- একেবারে অন্যমাত্রায় পৌছে দিয়েছে। আমি 'পরশুরামের কঠোর কুঠার' পঙ্ক্তির পূর্বের ছটি পঙ্ক্তি পরিত্যক্ত হয়েছে; দ্বিতীয় বিবেচনায় কবির কাছেই তাদের অকারণ উপস্থিতি ধরা পড়েছে। 'আমি ধন্য, আমি ধন্য' কবির পরিতৃপ্তি বা পরম প্রাপ্তিরই যেন স্বীকৃতি তার পরে আর 'নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব' এই নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা সাজে না। বর্জনের দ্বারা সংস্কার এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য নজরুল ইসলাম এরকম মার্জনার খুব বেশি দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারেন নি। আমাদের তো মনে হয়, 'অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'... উচ্চারণের লয়ে একটা শমভাব এসে গেছে, সুতরাং আবার আরোহী ভঙ্গিতে 'আমি ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' শিল্পের বিচারে অসমঞ্জস।

মোহিতলাল মজুমদার একালের এক কবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কোন কবির কাব্যে যাহা আছে এবং যাহা নাই তাহার কারণ একই– ইহা না বুঝিয়া লইলে কাব্যবিচার সম্পূর্ণ হয় না। ইতি এবং নেতির উৎস একই কবি ব্যক্তিত্বে; সেখানে প্রতিনিয়ত গ্রহণ বর্জন চলেছে- কবির সামাজিক ও নান্দনিক চেতনার মধ্যে অন্বয় ঘটছে কিনা সেটাই বিচার্য। আশা করা যায়, নজরুল-রচনার সেই অন্বিত জীবনদর্শনের একটি রূপরেখা উপস্থিত করা গেছে।

প্রবন্ধের আরম্ভে হুইটম্যানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর 'লিভ্স অফ গ্রাস', জুড়ে 'আমি', নানা রকমের 'আমি'। শরীর মুখ্য আমি, দেহ ও দৈহিকতায় জীবনের ঐশ্বর্য। রুশ বিপ্লবের কবি মায়াকভস্কিতেও 'আমি' সোচ্চার। একটা বিশেষ সময়ের ক্রোধ ক্ষোভ ঘৃণা, ভালোবাসা ত্যাগ ইত্যাদি নিয়েই মায়াকভস্কির 'আমি'। কবি তখন যুগের organ-voice. কিছু উদ্ধৃতি দিই,

১. হুইটম্যান

One's self I sing, a simple separate person.
yet utter the word Democratic the word En-Masse
Of physiology from top to toe I sing.
Not physiognomy alone, nor brain alone is
I say the form complete is warthly far
the complete equally with the male I sing of life immence in
passion, pulse and power cheerful, for the freest action formed
under the dimene

The modern man I sing.

২. মায়াকভস্কি

Hi, listen!
Comrade heirs and descendents,

To an agitator
Laud speaker in-chief!
Deafeing
Poetic Deluge,
I stride to you
through lyincal volumes,
as they line
with the lining speaks

কবিতায় দুধরনের 'আমি' দেখা গেল। মায়াকভস্কির উচ্চ সুরের সঙ্গেই নজরুলের মিল। দুজনেই 'At the top of voice' কথা বলেছেন। নজরুল ইসলামের 'আমি' অধ্যাত্মভাবের একটু বিভ্রম জাগায়।

ক. আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি আমি এমনি শক্তিমান

খ. প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি
আর চিৎকার করে কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী

গ. আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ,
আমি সহসা আমারে চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

প্রথম দুটি উল্লেখের 'আমি' বিধাতার প্রতিস্পর্ধী মানবসত্তা। তৃতীয় উদাহরণের 'তুরীয়ানন্দ' শব্দের একটি সুস্থির অর্থ আছে – তার সঙ্গে নজরুলের জীবনদর্শনের বা কবি মেজাজের মিল অল্প। 'তুরীয়'- বস্তুজগত অতিশায়ী, সাধনপথে চরম উপলব্ধির আনন্দ যে পেয়েছে। এর মূলে আছে একটি অধ্যাত্মভাবের ব্যঞ্জনা। সেই উন্মাদ-দশার নাম 'দিব্যোন্মাদ'। কবি একেবারেই সিদ্ধ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেননি। ঈশ্বর উপলব্ধির আনন্দের চেয়ে বড়ো এখানে আত্ম-উপলব্ধির আনন্দ। তাই প্রবল আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি উদ্বোধনের আনন্দ কবির বিবক্ষিত। প্রবল উচ্ছ্বাসই 'উন্মাদ' করেছে। এভাবেই শব্দের অভিধা-অর্থ কবির ঈপ্সা অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়। হুইটম্যানে দেহ>নারী >পুরুষ> জীবন> শব্দ। চেতনার গভীর থেকে উঠে আসে শব্দ। সে তৎসম, তদ্ভব, তুর্কী না ফার্সী, না দেশী—এসব কথাই ওঠে না। কবির শব্দের জগৎ থেকে তাঁর চেতনার জগতে পৌঁছনো যায়। কারণ চেতনার উৎস থেকেই তারা জাত। অতি ব্যবহৃত শব্দও অভিনব তাৎপর্য নিয়ে আসে। তবু কাব্যবিচারে যাঁরা ছুৎমার্গ মানেন, তাঁরা মায়াকভস্কি এবং নজরুলের শব্দ চেতনা সম্পর্কে অনুকম্পার মনোভাব পোষণ করেন। Lowering Lexicon শুদ্ধ কাব্যসংসারের অনুপযোগী। মায়াকভস্কি এবং নজরুল অনেক দৃঢ়, অশালীন, কটু শব্দ প্রয়োগ করেছেন। প্রকাশের তাগিদই সেখানে বিবেচ্য। চেতনার গভীর-স্তর গঠন থেকেই শব্দের অবয়ব তৈরি হয়ে যায়– অলংকারের ভাষায় 'অপৃথগযত্ননির্বর্ত্য'। সেখানে গাল্লি বা অশালীনতা আলাদা করে চেনার চেষ্টাই ভুল। বেতমিজ, ভণ্ড, রক্তচোষা, ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্, জুতো-ধোওয়া, লাথি মার্- এসব শব্দ নজরুলের ঈপ্সিত প্রকাশের সঙ্গে অভিন্ন।

Heightened speech-ই কবিতার একমাত্র ভাষা নয়। নজরুলের অবিল্লিত ছন্দগতি সম্পর্কেও কিছু বলা উচিত। ছান্দসিকেরা যেহেতু কবিতার 'সমগ্র' থেকে ছন্দকে আলাদা বিচার করেন, তাই দোষ-ত্রুটির দিকই নজরে পড়ে। এখানেও মায়াকভস্‌কির তথাকথিত ছন্দদোষ প্রসঙ্গে লুনাচারস্কির উক্তি উদ্ধার করা যায় ঃ What are Mayakovoskys rhuthus? Mayakovosky's Rhythm is the rhythm of argument, the rhythm of an oration applied, the rhythm of industrial sound, industrial porduction intres and the rhythm of a march. আ-চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ভাষাকে কেবল কমনীয় সুকুমার সুললিত করা হয়েছে। নজরুল ইসলামের কবিব্যক্তিত্ব ছিল ভিন্ন ধাতের; তাঁর সমাজ চেতনা শিল্পচেতনায় অনন্বয় ঘটেনি। তাই প্রতিকূলতার সব বাধা লঙ্ঘন করেই বাংলা কবিতায় তিনি 'চির-উন্নত শির'।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — সপ্তদশ সংকলন]

নজরুলের উপন্যাসে মানবতাবাদ

শিরীণ আখতার

মহৎ ঔপন্যাসিক মাত্রই মানবতার সূচক। যুগ যুগ ধরে মহান জীবন শিল্পীরা মানবতার জয়গানই গেয়ে চলেছেন। টলস্টয়, ফ্লবেয়ার, তুর্গেনিভ, লরেন্স, গোর্কি, মার্সেল প্রুস্ত, এমিল জোলা, মঁপাসা, বালজাক প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ঔপন্যাসিকরা স্ব স্ব বলয়ে অবস্থান করেও মানবগাথাই রচনা করেছেন। এঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ঔপন্যাসিকদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংকট সৃষ্টি করেছিল, তার বিষময় ফল এবং নৈরাশ্য,অবক্ষয়, বিশ্বাসের সংকট ইত্যাদি বাঙালির জীবন ও সমাজকে গ্রাস করে সমাজ জীবনে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছিল তার রূপটিকে লেখকরা বাস্তব দৃষ্টিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন কথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে । কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং সেই সঙ্গে জীবনদর্শন ও সমাজভাবনাও এ সময় শিক্ষিত বাঙালির মানস-মানচিত্রকে প্রভাবিত করে ।

কার্ল মার্কসের রুশ বিপ্লব এবং ফ্রয়েড-ইয়ুং এর প্রভাবও এদেশের ঔপন্যাসিকদের উপর ছায়াপাত করে। বিশ্বব্যাপী নবযুগবার্তায় সে উচ্চারণ ঔপন্যাসিকদের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল নজরুলও সে ধারারই পথিক। যদিও কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে নজরুলের খ্যাতি সর্বাধিক এবং সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে নজরুল খানিকটা প্রশ্নাত তবুও এক্ষেত্রে তার চেতনা দৃষ্টি এড়াবার মত নয়। তাঁর বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা উপন্যাসত্রয় বিদগ্ধ পাঠকের সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে।

'কারো কারো মতে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নজরুল বিশেষ কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হননি'[১] এবং উপন্যাসে তিনি কোন স্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি করেননি, তথাপি এই উপন্যাসগুলিতে নজরুলের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী মানবতার বাণীই উচ্চারিত হয়েছে। বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'— নজরুলের এই তিনটি উপন্যাস রচিত হয়েছে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের দিগন্ত অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। আচ্ছন্ন সামন্তযুগীয় চেতনার সঙ্গে আধুনিক গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্যশিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বঙ্কিম উপন্যাসে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ আরেক ধাপ এগিয়ে জাতীয়

চেতনার সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের সংমিশ্রণ ঘটান। গ্রাম-বাংলার সমাজ জীবনে বৈপরীত্য ও সংঘাত এবং বাঙালি মানসের চিরায়ত মায়া-মমতার অমোঘ আবেদন নিয়ে শরৎ আসেন বাংলা উপন্যাসের দরদী শিল্পী হিসেবে।

তিরিশের দশকের অন্তিম পর্যায়ে পাশ্চাত্যের প্রকৃতিবাদ, ফ্রয়েডিয় চেতনা এবং মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতা বাঙলা কথাশিল্পীদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই আলোড়নের প্রতিচ্ছবি পরবর্তীকালে আমরা কল্লোলযুগের ঔপন্যাসিকদের শিল্পে লক্ষ্য করি। এইসব জটিলতা থেকে কিছুটা দূরান্তে অবস্থান করেও নজরুল বাংলার মাটি ও মানুষের মানবতাবোধকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। "আঙ্গিকগত স্খলনে এবং সৃষ্টির স্বল্পতায় ঔপন্যাসিক নজরুল অত্যুজ্জ্বল না হলেও ঐতিহাসিক কালানুসারে তাঁর সৃষ্টি শ্রবণীয় এবং ব্যত্যয়ধর্মী"[২]। কল্লোল যুগের অনেক শক্তিমান লেখকই তখন আন্তর্জাতিক সাহিত্যে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু নজরুল কল্লোল পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক হলেও দেশজ একটি অগ্নিমুহূর্তকে এবং সর্বতোভাবে গোটা দেশকে অনুধাবন করেন এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসে মানবতার বাণীকেই উচ্চারিত করেছিলেন।

'বাঁধনহারা' নজরুলের প্রথম উপন্যাস। ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রীঃ) বৈশাখ মাস থেকে 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস 'বাঁধানহারা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ (১৯২৭ খ্রীঃ) শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল। উপন্যাসটি প্রখ্যাত সুরকার নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসর্গীত। ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের রিচার্ডসনের পামেলা উপন্যাসের মত 'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবীদার। শিল্পগত ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রোপন্যাস হিসেবে 'বাঁধনহারা'র স্থান চির নির্দিষ্ট।

মোট আঠারটি পত্রের সমন্বয়ে এই উপন্যাসের কলেবর গড়ে উঠেছে। এ পত্রগুলির লেখক-লেখিকা হচ্ছে— নূরুল হুদা, রবিয়ল, রাবেয়া, সোফিয়া, মাহ্‌বুবা, মনুয়র, রকিয়া ও আয়েশা। করাচী সেনানিবাস, সালার, বাঁকুড়া, শাহপুর, বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা, শোভান বোগদাদ প্রভৃতি স্থান থেকে চিঠিগুলি লিখিত হয়েছে। চিঠির উত্তর-প্রতি উত্তরের মাধ্যমেই উপন্যাসের ঘটনা বিস্তৃত হয়েছে। এই পত্রোপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা। সে বাঁধনহারা। মিস্ সাহসিকা বোস এই উপন্যাসের অন্যতম স্ত্রী চরিত্র। সে নূরুল হুদার বাঁধনহারা জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছে। উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদার চরিত্রচিত্রনে আঙ্গিকগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নজরুল কবি-মানসের প্রতিনিধি এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য ও মানবতাবোধ উপন্যাসটিকে স্বাতন্ত্রে ভাস্বর করে তুলেছে। নূরুল হুদা, ব্রাহ্ম মেয়ে সাহসিকা বোস, বন্ধু রবিয়লের মা রকিয়া এবং অভিমানী মাহ্‌বুবা—এরা প্রত্যেকেই মানবতাবাদের ব্যক্তিরূপ। মিস সাহসিকা বোস নূরুল হুদাকে প্রকৃত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই সে বলেছে,

সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলি গতি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে। এরা সদাই কান খাড়া করে আছে, কোথায় কোন গহনপারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে। যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দধারা, এরা তখন শোনে বিদায়-বাঁশীর করুণ গুঞ্জরণ। এরা ঘরে বারে বারে কাঁদন নিয়ে আসছে, বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর করে নেবে। এরা বিশ্বমাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক-চারণ-কবি যে এরা। এদের যাকে আমরা ব্যথা বলে ভাবি, হয়তো তা ভুল। এ ক্ষ্যাপার কোনটা যে আনন্দ কোনটা যে ব্যথা তাই চেনা দায়। এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে কিন্তু হায় তবু ভালবেসে আর তৃপ্ত হচ্ছে না। এদের ভালবাসার ক্ষুধা বেড়েই চলেছে। তাই এরা অতি সহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় কিন্তু স্নেহকে আজো বিশ্বাস করতে পারলো না এরা তার কারণ ঐ বন্ধন ভয়।[৩]

নূরুল হুদা রবিয়লের বন্ধু। রবিয়লের মা রকিয়া, স্ত্রী রাবেয়ার বোন সোফিয়ার সঙ্গে নূরুল হুদার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পিতৃমাতৃহীন নূরুল হুদা রবিয়লদের পরিবারে একান্ত প্রিয়জন হিসেবে সকলের স্নেহ প্রীতি মায়া মমতা লাভ করে। রবিয়লের মা রকিয়া নূরুল হুদাকে আপন সন্তানসম স্নেহ করে। রবিয়লের নিকটাত্মীয় আয়েশা ও তার কন্যা মাহ্‌বুবা তাদের সঙ্গে বসবাস করে। নূরুল হুদার সঙ্গে মাহ্‌বুবার বিশেষ হৃদয়গত পরিচয় প্রত্যক্ষ করে রবিয়লরা চেষ্টা করে উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে। যখন দু'জনের বিবাহের সবকিছু ঠিকঠাক তখনই হঠাৎ একদিন নূরুল হুদা কাউকে কিছু না বলে যুদ্ধে চলে যায়। স্নেহে-প্রেমের বাঁধনে সে নিজেকে আবদ্ধ করলো না। এতে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হল মাহ্‌বুবা ও তার মা আয়েশা। অপমানিত, মর্মাহত আয়েশা তার কন্যা মাহ্‌বুবাকে নিয়ে আপন পিত্রালয়ে চলে যায়। এতে রবিয়লের পরিবারও মর্মাহত হয়। মামাবাড়ির দুঃসহ পরিবেশ মাহ্‌বুবার কাছে অসহনীয় বোধ হয়। সে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত মুক্তির নেশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। করাচী সেনানিবাস ও বোগদাদ থেকে নূরুল হুদা রবিয়লদের চিঠি লিখে। কোন এক অনন্ত মুক্তি পিপাসায় নূরুল হুদা ক্ষণিকের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে দূরন্ত সৈনিক জীবন বেছে নেয়। সে জানত তার আচরণে সকলেই সীমাহীন দুঃখ পেয়েছে। তবু কোন এক অসীমের আকর্ষণে তার মুক্তি পাগল মনটাকে কোন গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করতে অসমর্থ। রবিয়ল, রাবেয়া, রকিয়া, মনুয়র (নূরুলের কলেজ পড়া কবিবন্ধু) প্রাণান্ত চেষ্টা করে নূরুল হুদার ছিন্ন জীবনকে স্নেহ-প্রীতি ও প্রেমের বাঁধনে গ্রন্থিত করতে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে আত্মাভিমানী আয়েশা তার কন্যা মাহ্‌বুবাকে বীরভূমের জনৈক বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে বিবাহ দেয়। অভিমানক্ষুব্ধা মাহ্‌বুবা স্বল্প সময়ের মধ্যেই বৈধব্য বরণ করে নানা তীর্থ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ে। মনুয়রের

সঙ্গে সোফিয়ার বিয়ে হয়। নূরুলের এক চিঠিতে জানা যায় সোফিয়াও ভীষণভাবে অসুস্থ। হয়ত সে আর বাঁচবে না। আর মাহ্‌বুবা পবিত্রস্থানসমূহ পর্যটন করে বোগদাদে আসতে চায়। নূরুল হুদা বারণ করে না। কেননা তার মহৎজীবন পাছে বিবাহের জন্য নষ্ট হয়ে যায়—এই ভেবে মাহ্‌বুবা নিজেই তাকে মরণের মুখে পাঠিয়েছিল। উপন্যাসের শেষ চিঠিতে নূরুল হুদা লিখেছে,

> আমার বাঁধন-হারা জীবননাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এরপর কি আছে, তা আমার জীবনের পাগ্‌লা নটরাজই জানেন। আশীর্বাদ করো তোমরা সকলে, আবার যখন আসবো রঙ্গমঞ্চে— তখন যেন আমার চোখের জলে আমার সকল গ্লানি, সকল দ্বন্দ্ব-দ্বিধা কেটে যায়— আমি যেন পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে তোমাদের সকলের চোখে চোখে তাকাতে পারি।[৪]

নূরুল হুদা দুঃখের দেবতাকেই বন্দনা করতে ভালবাসত। সুখ তার জীবনে মিথ্যা মরীচিকা। দুঃখকে পাওয়ার জন্যই সে ঘরছাড়া। বাঁধনহারা। বন্ধু মনুয়রকে একটি চিঠিতে সে লিখেছে 'যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন বে-নিমক, বিস্বাদ। এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে, আর আজো সে ছুটছে আমার পিছু পিছু উল্কার মত উচ্ছলতা নিয়ে। দুঃখ আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়বো না।'[৫]

সে আরো লিখেছে, 'মৃগ তৃষ্ণিকার মত সুখ শুধু দূর-তৃষিত মানবাত্মার ভ্রান্তি জন্মায়, কিন্তু সুখ কোথাও নেই, সুখ বলে কোন চীজের অস্তিত্বও নেই। ওটা শুধু মানুষের কল্পনা, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি দেবার জন্য কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধরে দেবার মত সুমলে রাখা। আত্মা একটু সজাগ হলেই এ প্রবঞ্চনা সহজেই ধরতে পাবে।'[৬]

পরাধীনতার শৃঙ্খলিত মানবাত্মার ক্রন্দন নূরুল হুদা ও সাহসিকার চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নূরুল হুদা প্রাণোচ্ছল যুবক। প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি তার। স্নেহপ্রবণ ও স্নেহবুভুক্ষু সে। বাইরে সে আনন্দমুখর কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে অশ্রুর সাগর। সংকীর্ণ স্নেহের গণ্ডীতে সে নিজেকে বন্দী করতে চায়নি। তার হৃদয়ে মহামানবের মহাআহ্বানকে সে অনুভব করেছে। তাই সকল মমতার বন্ধন ছিন্ন করে অসীমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, তীব্র কষ্ট ও যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে সুন্দরকে লাভ করতে চেয়েছে। এ তার মহান মানব ধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ।

সাহসিকা ব্রাহ্ম মেয়ে। বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা ও কুসংস্কারমুক্ত তীব্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা সে। এ চরিত্র সম্পর্কে আবু হোসেন বলেন,

> বলাবাহুল্য এ উপন্যাসের উজ্জ্বলতম নারী চরিত্র সাহসিকা। তিনি গত যুগের বিশিষ্ট নারী সমাজের মুক্তিদাত্রীদেরই প্রতিভূ। তার কথাবার্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর, নারীমুক্তি আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ — একটি যথার্থ সাহসী নারীর চরিত্র ঝলমল করে উঠেছে। নজরুলের 'নারী' কবিতায় আমরা যে বীর্যবতী এবং স্নেহময়ী নারীর চেহারা দেখতে পাই তারই স্পষ্ট প্রতিকৃতি এই

> সাহসিকা। এবং বললে অন্যায় হবে না যে, নজরুলের দক্ষতা এ নারী চরিত্র সৃষ্টিতে সামান্য নয়।[৭]

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটির প্রকাশ ১৩৩৭ সাল (১৯৩০ খ্রীঃ)। এ সময় নজরুল কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি এবং সাহিত্যিক ছাড়াও এ সময় নানান সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে নজরুল সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের সময়কাল ভারতবর্ষের খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কাল। সমালোচক যথার্থই বলেছেন এই উপন্যাসের জন্য,

> নজরুল সৎ ঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গতভাবে কতকটা দাবি করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থক শিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।[৮]

এই উপন্যাসে মানবতাবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রধান চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের নায়ক আনসার একজন দেশপ্রেমিক সমাজকর্মী ও বিপ্লবী। তার এ তিনটি সত্ত্বার মূলে রয়েছে গভীর মানবতাবোধ। তাই সে বিশ্বমানবতার ক্রন্দন তার হৃদয়ে অনুভব করে। পরাধীনতার শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের মুক্তির বার্তা তার অন্তরে বারংবার আঘাত করে ফেরে। তাই সে ঘরছাড়া, বিত্তবান ঘরের সন্তান হয়েও সে সবকিছু ছেড়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আনসার পূর্বে কংগ্রেসপন্থী ছিল, কিন্তু জেল থেকে ফিরে এসে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ বদলে গেছে। সে অনুভব করেছে অসহযোগ আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হবে না। প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রামের। সে আরো অনুভব করে শ্রমিকশক্তির উদ্বোধন না হলে দেশকে স্বাধীন করা দুঃসাধ্য। তাই কৃষ্ণনগরে তার আগমন একটি শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলার জন্য। তার কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে কুলি মজুর, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, মেথর প্রভৃতির ভেতরে।

আনসার দেশসেবার মধ্যেই একদিন অনুভব করে সে সত্যিই দুঃখী। তার মনে হয়,

> মানুষের শুধু পরাধীনতার দুঃখই নাই, অন্য দুঃখও আছে— যা অতি গভীর, অতলস্পর্শী। নিখিল মানবের দুঃখই কেবল মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু নিজের বেদনা সে যেন মানুষকে ধেয়ানী সুস্থ করে তোলে। বড় মধুর, বড় প্রিয়, সে দুঃখ।[৯]

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনার সময় নজরুল কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কে অবস্থান করছিলেন। শ্রমজীবী ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান ও মুসলিমদের বাস এই এলাকা। এই উপন্যাস রচনার উৎস একটি বাস্তব পরিবেশ। দরিদ্র শ্রমজীবী মুসলিম খ্রীস্টানদের জীবনগাথাই এ উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। 'মৃত্যুক্ষুধা' রচনাকালে বাঙলা সাহিত্য অঙ্গন তিরিশের 'কল্লোল' মুখর। তিরিশের নব্যলেখকরা তখন সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেল। তাঁরা

আন্তর্জাতিক সাহিত্য নিয়ে নীরিক্ষারত। কিন্তু দেশীয় সাহিত্যে গণজীবন নিয়ে নজরুল প্রথম পদক্ষেপ নিলেন তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসেই প্রথম স্থান পায় দেশীয় শ্রমজীবী মানুষ। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, দেশজ বাস্তব পরিবেশ, সাম্য ও বিপ্লবী চেতনার শিল্পময় প্রকাশ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ইত্যাদি উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য।

'মৃত্যুক্ষুধা'-পরবর্তী এ ধারার উপন্যাসমূহের উজ্জ্বল পথিকৃৎ। লক্ষ্যণীয় যে তারাশঙ্কর, মানিক এঁদের গণমুখী উপন্যাস কর্মগুলো সবই ১৯৩৩-এর পর বিরচিত।[১০]

বিত্তশালী মুসলিম পরিবারের সর্বত্যাগী যুবক আনসারের মাধ্যমে নজরুল তাঁর মানবতাবাদ ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিস্ফুট করেছেন। কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে আনসার তার খালাত বোন লতিফা উরফে বুঁচির বাসায় উঠলে সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঔপন্যাসিক নজরুল আনসারের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামাকাপড়— কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপে'র মত টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস! তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ত্রিশূল। হাতে তরবারী ধরনের অষ্টাবক্রী দীর্ঘ ষষ্ঠি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকোর মত এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা, তেমনি নাক- চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে তৈরী— গ্রীক-ভাস্কর্যের এ্যাপোলো মূর্তির মত— নিখুঁত সুন্দর। কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা করে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্মর-মূর্তির মত কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্বাঙ্গে ইচ্ছাকৃত অবহেলার ছাপ।[১১]

তার এই স্বেচ্ছাবৈরাগ্যের কারণ সম্পর্কে সে তার বোন লতিফাকে বলেছে,

> দুনিয়ার সব মানুষই একই ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই! আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথী আমি! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।[১২]

নজরুল স্বতস্ফূর্তভাবে এ চরিত্রটিতে নিপীড়িত বিশ্বমানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনিকে মূর্ত করেছেন। নিখিল মানবাত্মার বাণী আনসার চরিত্রকে ঘরছাড়া করেছে। দরিদ্র, দুঃখী ও নিরন্নদের কাছে এনে দিয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্রথমদিকে কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের চাঁদ-বাজারস্থিত নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মুসলমান আর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দেশীয় ধর্মান্তরিত ক্রীশ্চানদের দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থার একটি জীবনঘনিষ্ঠ

চিত্র দেখা যায়। গজালের মা, হিড়িম্বা, পুঁটের মা, খাতুনের মা প্রমুখের তীব্র কলহ ও মিলনের কাহিনী চিত্তাকর্ষক। কলতলায় যারা একে অপরের রক্তপিপাসু হতে চায় তাদের একজনের প্রসববেদনায় অপরজন বিবাদ ভুলে পরক্ষণেই ছুটে যায়— এও নজরুলের অবহেলিত নীচুতলার জীবন চিত্রায়নের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

গজালের মায়ের ছোট ছেলে প্যাঁকালের সঙ্গে মধু ঘরামীর মেয়ে কুর্শির প্রণয় প্রসঙ্গ এবং পরে সমাজের অত্যাচারে রোমান ক্যথলিক ধর্মগ্রহণ করার পর উভয়ের বিবাহ ও মিলন কাহিনী এ উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত হওয়ায় মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিবিহীনতার কারণে উপন্যাসে রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটেছে।

মেজবৌ 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের একটি সজীব ও প্রাণবন্ত চরিত্র। দুঃখের কষ্টি পাথরে যেন যাচাই করা নিখাদ সোনা সে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রাণদরদী মেয়েটি একটি দুর্দশাগ্রস্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের বিধবা বৌ, যে বাড়িতে তিনটি কর্মক্ষম যুবক পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে এবং যে বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি সে বাড়িরই ছোটছেলে প্যাঁকালে। বৈধব্য ও দারিদ্র্যের যুগপত যন্ত্রণাসত্ত্বেও সে ধৈর্যভরে নিজের ও পরিবারের সন্তানদের স্নেহ ভালবাসায় মানুষ করতে চায়। সমাজের নির্মমতা ও অনীহাকে সে সহজে উপেক্ষা করতে পারে। কামার্ত বৃদ্ধ বোনাই-র হাত থেকেও নিজস্ব বুদ্ধি বলে রেহাই পায়। ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণাকে সে চাপা দিয়ে রাখে অনাবিল হাসিতে। মেজবৌ'র সৌন্দর্য সকলকেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু সে কাউকে ধরা দেয় না। সমাজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে দারিদ্র্যের দুঃসহনীয় যন্ত্রণায় মেজবৌ শেষ পর্যন্ত স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীস্টান মিশনে সে মানুষের মর্যাদা পায়। লেখাপড়া ও সেলাই-কাজ শেখার সুযোগ পায়। মিসবাবা ও পাদরীদের অফুরন্ত স্নেহ, নিয়মিত খাবার সবই পায়। কিন্তু মেজবৌর কাছে কোন বিশেষ ধর্মীয় অবদান মুখ্য হয়ে ওঠে না।.ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তার মুক্তস্বাধীন চিত্ত চাঁদসড়কে নির্মম দুঃখদৈন্য ও অসহায় মৃত্যুভরা জীবন ও সমাজপতিদের ক্রূরতায় ক্লিষ্ট, ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ক্রমশঃ জীবনের প্রতি বিশ্বাস তার অন্তর্হিত হচ্ছিল। আর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। মেজবৌ নিজের সম্পর্কে আনসারকে বলেছে 'আমি ত হঠাৎ খ্রীস্টান হইনি। আপনারা একটু একটু করে আমাকে খ্রীস্টান বানিয়েছেন।'১৩

মিশনের বিশেষ নির্দেশে মেজবৌ কৃষ্ণনগর থেকে বরিশাল মিশনে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণনগরে তাকে ছেড়ে যেতে হয় স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে। অপত্যস্নেহ বঞ্চিত মেজবৌ বরিশাল মিশনে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে। সর্বশেষে আপন সন্তান হারাবার দুঃখ তাকে পেতে হয়। আনসারের সংস্পর্শে মুক্তজীবনের আস্বাদন, তার খোকাকে হারিয়ে মুসলমান ধর্মে প্রত্যাবর্তন, দেশের ক্ষুধাতুর শিশুদের মধ্যে নিজের ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার অনুভূতি, সবচেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠশালা খোলার আগ্রহ

পাঠককে একটি সজীব ও দীপ্ত চরিত্রের সন্ধান দেয়। সেবায়, স্নেহে, সৌন্দর্যে, ধৈর্যে, বুদ্ধি ও কর্ম প্রেরণায় মেজবৌ একটি অনন্য চরিত্র। যদিও মূল উপন্যাসের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে মেজবৌ চরিত্রটি যথাযথভাবে সম্বন্ধযুক্ত নয়। তথাপি নানা ঘটনাস্রোতের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে মেজবৌ চরিত্রের ক্রমবিকাশ আছে। বস্তুতঃ নজরুলের মানবমুখী নারীচরিত্র সৃষ্টির অন্যতম সার্থক প্রয়াস মেজবৌ।

বিপ্লবী ও সমাজকর্মী আনসার সংসার ও গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে রাজনীতির কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কৃষ্ণনগরে নাজির সাহেবের বাসায় কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণকালে ক্ষণমুহূর্তের জন্যও স্নেহপ্রীতি সেবায় সিক্ত হয়ে উঠেছে। মনের অর্গল খুলে রুবির কথা বলেছে লতিফাকে। তার বৈধব্য জীবন, তার অভিমানক্ষুব্ধ জীবনাচরণ ইত্যাদিও জানিয়েছে। প্রকারান্তরে রুবির প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালবাসার কথাও স্বীকার করেছে। কিন্তু চাঁদ-সড়কে থাকাকালীন অবস্থায়ই কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রচারের অভিযোগে সে গ্রেপ্তার হয়। এর অল্পদিন পরেই রুবির বাবা নদীয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। লতিফার কাছে রুবি জানতে পারে কৃষ্ণনগরে আনসারের কর্মমুখর দিনের কথা। এও জানতে পারে যে আনসার তাকে প্রকৃতই ভালবাসে। তাই রুবি যখন খবর পায় রেঙ্গুন জেলে থাকাকালীন সময়ে আনসারের যক্ষ্মা হয়েছে এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ওয়ালটেয়ার যাচ্ছে, তখন সে আনসারকে বাঁচাবার জন্য ওয়ালটেয়ার যাত্রা করে। কিন্তু রুবি আনসারকে বাঁচাতে পারে না অক্লান্ত সেবা এবং নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেও। আনসার মারা যায়, রুবি নিজেও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বুঁচিকে লেখা রুবির শেষ চিঠি দিয়েই গ্রন্থটি সমাপ্ত। সে স্পষ্ট করে লিখেছে,

> আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু বীজাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন বাকী আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চির মিলন— নতুন জীবনের নতুন তারায়— নতুন দেশে-নতুন প্রেমে।[১৪]

তবে আনসার চরিত্রের স্বাভাবিক দীপ্তি শেষ পর্যন্ত অম্লান থাকেনি। রুবি সমাজ সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে আনসারের কাছে গিয়ে সেবার মাধ্যমে তার জীবন ও প্রেমের চরম সার্থকতা খুঁজে পেলেও আনসারের অপচয়িত জীবন পাঠককে নতুন কিছু সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আনসারের মত প্রাণোজ্জ্বল, মানবদরদী ও বিপ্লবী চরিত্রের এই পরিণতি যেন পাঠকের কাম্য নয়।

তবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনা করেছিলেন নজরুল এ কথার সত্যতা মেলে। 'কী জঘন্য নোংরা পরিবেশের মধ্যেই না সমাজের একটি বৃহত্তম শক্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীন' স্থূল, অপরিতৃপ্ত, অসুখী জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে। উপরতলার অধিবাসীরা তাদের দেখেও দেখে না। মাথা ঘামাবার সময় পায় না।[১৫] কিন্তু বিশেষ সময়ে তারা করিৎকর্মা। আর তা হলো ধর্মের ব্যাপারে।

এখানে পান থেকে চুণ খসলে তাদের ইহকাল-পরকাল যেন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস ধর্মান্ধ কূপমণ্ডুক ও স্বার্থপর সমাজের বিরুদ্ধে উদার মুক্তপ্রাণ মানবতাবাদী নজরুলের জোরালো প্রতিবাদ। মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা মানব কল্যাণেই নিয়োজিত হবে এটাই ছিল নজরুলের আজীবন ব্রত।

'কুহেলিকা' নজরুলের তৃতীয় এবং সর্বশেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে গোপন বিপ্লবী কার্যক্রম সমগ্র দেশের তরুণ সমাজকে উজ্জীবিত করেছিল, তেমনি একটি গোপন সংগঠনকে কেন্দ্র করে 'কুহেলিকা' উপন্যাস গড়ে উঠেছে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেও নজরুলের মানবতাবাদী চেতনাধারা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এগ্রন্থের নায়ক জাহাঙ্গীর, বিপ্লবী নেতা প্রমত্ত, অধিনায়ক বজ্রপাণি, জয়তী এবং তার মেয়ে চম্পার মধ্যে অগ্নিযুগের বিপ্লবী মন্ত্রের বাণী প্রতিধ্বনিত। আপন সুখের ঠিকানা ছেড়ে এসব চরিত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশের কাজে। আবেদন-নিবেদন ও প্রবীণ রাজনীতিবিদদের অগ্নিমন্ত্রের ভাষণ যখন ইংরেজ শাসকচক্রের দুরূহ ব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল ঠিক এ সময় দেশে তরুণ মুক্তিকামী সমাজ গোপন সশস্ত্র সংগঠন তৈরীর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। অতর্কিত আক্রমণ, হামলা, হত্যা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শাসক মহলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত ক্ষুব্ধ শাসকমহল আর তরুণ বিপ্লবীদের মাঝে সৃষ্টি হয় আপোষহীন সংগ্রামের পালা। কখনও কোন প্রশাসক তরুণ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হচ্ছে, কখনও পুলিশের বড়কর্তার উপর আক্রমণ চলছে। কখনও বা শাসকগোষ্ঠী হঠাৎ করে আবিষ্কার করে বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্রাগার। তারপর তাদের দমননীতি শুরু হয়। বিপ্লবীদের উপর তখন নির্মম নির্যাতন চলে। জেল জুলুম ফাঁসী ও দ্বীপান্তর হয় তাদের।

নজরুলের জীবনকাহিনী থেকে জানা যায় প্রথমে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। পরে এ আন্দোলনের ব্যর্থতায় সন্ত্রাসবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তার নায়ক আনসারও তাই, 'কুহেলিকা'র জাহাঙ্গীরও এই অগ্নিমন্ত্রেই দীক্ষিত। যখন জাহাঙ্গীর সবেমাত্র জননী ও জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শিখেছে তখনই সে হঠাৎ জানতে পারে তার মা ফিরদৌস বেগম সাহেবা কলকাতার একজন ডাকসাইটে বাইজী তার পিতা ফররোখ সাহেব চিরকুমার। সুতরাং সে পিতামাতার কামজ সন্তান। আত্মগ্লানি ও ঘৃণায় যখন জাহাঙ্গীরের অন্তরাত্মা কাতর আর্তনাদ করছে তখন সে ছুটে যায় বিপ্লবী প্রমত্তর কাছে। সবকিছু খুলে বলার পর আর্তকণ্ঠে বলে যে তার ঘৃণার জীবন, তাই দেশমাতৃকার সেবার মহান ব্রত তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু স্কুলশিক্ষক তরুণ বিপ্লবী প্রমত্ত তাকে আশ্বাস দেয়। জারজ সন্তান হলেও দেশসেবার পবিত্র দায়িত্ব সে গ্রহণ করতে পারবে। কেননা কোন অসহায় মানুষই তার জন্মের জন্য দায়ী নয়। জাহাঙ্গীর এমনিতেই প্রকৃতিগতভাবেই এলোমেলো

উদাসীন। তদুপরি মাতৃইতিহাস জানার পর সংসারের প্রতি সে আরো বীতশ্রদ্ধ হয়। নিজেকে পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী ভাবতেও অস্বস্তিবোধ করে। মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল জাহাঙ্গীরকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে। কিন্তু বেদনার্ত জাহাঙ্গীর দেশোদ্ধারের বিপ্লবী মন্ত্রেই দীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হারুন জাহাঙ্গীরের কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওরা একত্রে মেসে থেকেই পড়াশোনা করে। হারুন পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার ছেলে। হারুনের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। হারুনের মা এক পুত্র সন্তানের বিয়োগে উন্মাদগ্রস্থা। তহমিনা উরফে ভূনী হারুনের বোন। একদিন বেড়ানো উপলক্ষে জাহাঙ্গীর হারুনের বাড়ি যায়। কুমিল্লার ঐশ্বর্যশালী জমিদার পরিবারের সন্তান নানা উপঢৌকন ও প্রচুর খাবার সঙ্গে নিয়ে যায় বন্ধুর বাড়িতে। জাহাঙ্গীরের স্বতস্ফূর্ত আচরণ, সদয় ব্যবহার এবং উপঢৌকনে হারুনের পিতামাতা, ভাইবোন সকলে আকৃষ্ট। এ সময় হারুনের উন্মাদিনী মা ভূনীকে জাহাঙ্গীরের হাতে তুলে দেন। জাহাঙ্গীর জটিল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। ভূণী-জাহাঙ্গীরের প্রথম দর্শনে কিঞ্চিত অনুরাগের সঞ্চার হয়। কেননা বিপ্লবীদের একান্ত এবং একমাত্র কাজ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশোদ্ধার করা। ভূণী মনে করে দুর্ঘটনার মাধ্যমে যখন তার মা জাহাঙ্গীরের হাতে তাকে সমর্পণ করেছে তখন জাহাঙ্গীরই তার ভাবী স্বামী। কিন্তু জাহাঙ্গীর ভূণীকে রেখে কলকাতায় চলে আসে। প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভূণী গভীর বেদনাবোধ করে। হারুনকে সে জানিয়ে যায় সে একজন বিপ্লবী। শিউড়ি স্টেশনের ওয়েটিংরুমে দেখা হয়ে যায় প্রমত্তর সঙ্গে। সে তাকে বিপ্লবীদের নেতা বজ্রপাণির নির্দেশে নিয়ে যায় বিপ্লবীদের শক্তিস্বরূপা মাতৃমূর্তী জয়তীর কাছে। জয়তীর একমাত্র কন্যা চম্পার সঙ্গে এখানেই দেখা হয় তার। এরপর সে কলকাতায় ফিরে এলে তাদের জমিদারীর দেওয়ানজী তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যায়। তার মা অভিমানী পুত্রের কোন খবর না পেয়ে কলকাতায় চলে এসেছে। ছেলের কাছে বক্রেশ্বরের ঘটনা শুনে ও ছেলেকে লেখা ভূণীর একটি পত্র দেখতে পেয়ে তিনি বক্রেশ্বরে হারুনের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মৌলভী ছদ্মবেশে প্রমত্তর দেখা হয়। মায়ের অনুরোধে প্রমত্তকে শিউড়ি পর্যন্ত একই সেলুনে যেতে হয়।

হারুনের বাড়িতে জাহাঙ্গীরের মায়ের উপস্থিতিতে সাড়া পড়ে যায়। সিদ্ধান্ত হয় হারুনের বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সকলে একত্রে কলকাতায় যাবে। হারুনের বাবা-মার চিকিৎসা অন্তে ভূণী ও জাহাঙ্গীরের বিয়ে হবে। এ সময় ক্ষণিকের দুর্বলতায় জাহাঙ্গীর ভূনীর চরম সর্বনাশ করে ফেলে। এতে জাহাঙ্গীরও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরের মা সবাইকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জাহাঙ্গীর খবর পায় পুলিশ প্রমত্ত, জয়তী ও বজ্রপাণিকে বন্দি করেছে। এবং তার উপর কর্তব্য পড়েছে জয়তীর মেয়ে চম্পা এবং তৎসহ কিছু অস্ত্রশস্ত্র গোপনে সঙ্গে

নিয়ে কলকাতায় যেতে হবে। প্রথমে চম্পা মুসলিম নারীর ছদ্মবেশে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে এক সেলুনেই চলল। পরে পুলিশের গতিবিধি বুঝতে পেরে জাহাঙ্গীর ও চম্পা বর্ধমান নেমে ট্রেন ধরে রাণীগঞ্জে এসে সেখান থেকে ট্যাক্সী করে কলকাতা রওয়ানা দেয়। পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ওরা। চম্পা গোপনে পালিয়ে যায়। বিচারে বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর ও দলের অনেকের দ্বীপান্তর হয়। জাহাঙ্গীরের মায়ের ভগ্নহৃদয় শোকাশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মায়ের সঙ্গে জেলখানায় শেষ সাক্ষাতের মুহূর্তে জাহাঙ্গীর মাকে প্রশ্ন করে,

> একটু ভাবিয়া বলিল, 'চম্পা এসেছিল তোমার কাছে ?' মাতা বলিলেন,'এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।' জাহাঙ্গীর বলিল, 'ভুল করেছ মা, ও ঐশ্বর্যের মালিক যদি আমিই হই, তাহ'লে ঐ ঐশ্বর্যের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিও! আমার মা'র মত শত শত মা আজ নিরন্ন, তাঁদের মুখে, তাঁদের সন্তানদের মুখে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাতিত ভাই-বোনদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিও না। হাঁ, ভূণীকে আমার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে।[১৬]

'কুহেলিকা' উপন্যাসের কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যায়, এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবের প্রকাশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রেম সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র প্রবলতর রূপে ধরা পড়েছে। ভূণী-জাহাঙ্গীর-চম্পার ভালবাসা এবং তদ্ভুত সংশয়, জটিলতা, জাহাঙ্গীরের এলোমেলো চরিত্র, পারিবারিক কারণে জাহাঙ্গীরের বেদনাবোধ এবং মেসে হারুন, কুম্ভীর মিঞা প্রমুখ বন্ধুদের সান্নিধ্য, ভূনীকে সর্বনাশ করেও চম্পার কাছে অকপটে সব খুলে বলা ইত্যাদিই যেন মূখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু একথা সত্য যে এর কাহিনীর মূলে রয়েছে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবের কাঠামো। আবার 'কুহেলিকা' 'উপন্যাসে নজরুলের বিপ্লবী চেতনার মৌলিকত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে প্রখর হয়ে উঠেছে। এ সময় বাংলাদেশে যে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়েছিল 'কুহেলিকা' উপন্যাসে তা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, উপন্যাসে কতিপয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে। জাহাঙ্গীর, বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জয়তী সকলের চরিত্রে পরাধীন নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতি বেদনাবোধ পরিলক্ষিত। এঁরা সকলেই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী। বজ্রপাণি মূলগুরু হলেও প্রমত্তই জাহাঙ্গীরের দীক্ষাগুরু। এ সময় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যা যাবতীয় আন্দোলনের গতিকে পদে পদে রুদ্ধ করে দিতে তৎপর। কিন্তু প্রমত্ত সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে। সে বলে,

> যে বিপ্লবাধিপ বলেন 'আগে মুসলমান তাড়াতে হ'বে— তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতি ক্ষমতা যদি থাক্‌ত তাহলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যেদিন ভারত একজাতি হবে, সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটুলি বাঁধতে হ'বে। এ কথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা-শ্যামাও জানে। 'হিন্দু', 'মুসলমান' এই

> দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই ত ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা-কবচ। আমার মনে হয় কি, জানিস? ইচ্ছা করলে আমরা অনায়াসে এ দেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্ততঃ একটা স্থূল রকমের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না ক'রে তুললে, 'কালচার'-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশে-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া।[১৭]

মানুষের মনুষ্যত্বের বিনাশ প্রমত্তকে মর্মাহত করেছে। সে বিশ্বাস করে মনুষ্যত্ব হারানোর ফলেই ধ্বংস হয়ে যায় জাতির বিবেক। পরাধীনতার গ্লানি তখন তাদের ক্রমাগত অস্থিমজ্জায় মিশে যায়। জাতি তখন আরো হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে প্রমত্ত বলেছে,

> আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হূণ মেরেছে। আরবী ঘোড়া মেরেছে চাট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরাণী মেরেছে ছুরি, তুরানী হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসী ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকী ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু — যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি— তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজী।[১৮]

প্রমত্তর এই উক্তিতে মানুষের পরাধীনতার গ্লানির বার্তাই প্রতিধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) এবং শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসে পরাধীন ভারতবর্ষের লুপ্ত-প্রায় মনুষ্যত্বের বেদনাকেই বাণীরূপ দিয়েছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, পরাধীন জাতির বড় অভিশাপ হচ্ছে— মানুষের মনুষ্যত্বের ধ্বংস, আত্মশক্তি ও মানবতার বিনাশ সাধন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এ ব্যাপারে সমধর্মী চেতনার ধারক। 'চার অধ্যায়ে' বিপ্লবীরা মনুষ্যত্ব বিলুপ্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও মানবিকতার পুনরুদ্ধার সম্ভব — এটা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। তিনি উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী। তিনি সহিংস বিপ্লবের চাইতে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র সহিংস বিপ্লবের প্রতি কিছু পরিমাণে সহানুভূতিশীল হলেও তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে বিপ্লবের চাইতেও প্রাধান্য পেয়েছে নর-নারীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি। 'কিন্তু নজরুল ইসলামের বিপ্লব-চেতনা নির্দ্বন্দ্ব এবং ভাবাবেগ শূন্য। তিনি বিপ্লবের অন্তঃসারশূন্যতা কোথাও দেখাননি। আবার বিপ্লবের মাঝে নর-নারীর হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম আলোচনাতেও উচ্চকণ্ঠ নন। জাহাঙ্গীর-ভূণি-চম্পার প্রেম সম্পর্কের অবতারণা ও ইঙ্গিত উপন্যাসে থাকলেও পরিসমাপ্তিতে সেটা পাঠক-হৃদয়ে তেমন দীর্ঘ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অথচ পাঠক বিপ্লবের আপাতব্যর্থতায় এবং বজ্রপাণি, প্রমত্ত ও বিশেষ করে জাহাঙ্গীরের দ্বীপান্তরে গভীর বিচলিত বোধ করে এবং জাহাঙ্গীরের ব্যর্থ জীবনের

প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে।'[১৯]

'চার অধ্যায়ের' অন্তু 'পথের দাবীর' সব্যসাচী এবং 'কুহেলিকার' জাহাঙ্গীর সমধর্মী চেতনার ধারক। এরা একই বিপ্লবী চেতনার অধিকারী, মানবতাবাদী। তবে অন্তু ও সব্যসাচীর তুলনায় জাহাঙ্গীর অধিকতর বাস্তববাদী চরিত্র। জাহাঙ্গীর শুধু বাউণ্ডুলে দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী কর্মীই নয় সে প্রগাঢ় দেশভক্তও। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে বক্রেশ্বরের নিসর্গ দেখে জাহাঙ্গীরের অভিভূত উক্তিতে তাই প্রমাণিত। উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের কাছে সহিংস বিপ্লবের চেয়ে মানবজীবন ও বিশুদ্ধ প্রেমই অধিকতর সত্য। শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে বিপ্লবের স্বরূপ উদ্ঘাটনেই অধিকতর বাস্তববাদী। পারিবারিক জীবনের স্নেহ-পরিমণ্ডল ও নর-নারীর চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি তার বিপ্লবী চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। 'কাজী নজরুল ইসলামই শুধুমাত্র মানুষকে ভালবেসে, মানুষের পরাধীনতায় তীব্র বেদনাবোধ করে, আবেগহীন জোরালো দৃষ্টিভঙ্গিতে অসাম্প্রদায়িক মননে, নিরাবেগ আলেখ্য নির্মাণে বিপ্লব চেতনাকে উপন্যাসে অভিব্যক্ত করেছেন।'[২০]

সর্বধরনের গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানুষকে ভালবাসেন নজরুল। তাই শৃঙ্খলিত পরাধীন মানুষের গ্লানি তাঁকে তীব্রভাবে আঘাত করে। তাঁর বিপ্লব চেতনার উৎসমূলেও এই মানবদরদী মনোভাব। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের মত নিরেট বাস্তব-পরিবেশ, নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসের পটভূমিও অসাম্প্রদায়িক নির্যাতিত নিখিল মানব সম্প্রদায়। সর্বগ্লানিযুক্ত মানুষ সম্পর্কে যেমন গোর্কির আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে — নজরুলের উপন্যাসের মূল বক্তব্যও যেন তাই। বিপ্লবীরা আপাততঃ ব্যর্থ হলেও একদিন এদেরই আহবানে জাতি দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে অগ্রগামী পদক্ষেপ নেবে নজরুলের স্থির বিশ্বাসও তাই ছিল। সমালোচক নজরুলের উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, 'নজরুলের সবগুলো উপন্যাস যে শিল্পসম্মত হয়েছে হয়ত তা বলা যায় না, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের সজীবতা, তাঁর মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনকে জানার তৃষ্ণা বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে ঔজ্জ্বল্যে প্রকটিত করেছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে নজরুল ইসলামের যে কৃতিত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা ও জগৎ জীবনের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি।' মুহম্মদ আবদুল হাই নজরুলের উপন্যাসে বিপ্লবী ও মানবতাবাদের স্বীকৃতি স্বরূপ বলেছেন, 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ওরফে উল্‌ঝলুল আর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসারকে তাই জীবনের সকল দেনা-পাওনার বাঁধন দু'হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এক প্রলয় নেশায় মেতে উঠতে দেখি। মায়ের স্নেহ, আত্মীয়-আত্মীয়ার আদর যত্ন, প্রেয়সীর মায়ার ডোর ছিন্ন করে দেশের স্বাধীনতার দুরূহ ব্রতে জীবনকে বারংবার এরা বিপ্লব-বহ্নির কবলে সমর্পণ করেছে. তবু পরাজয় স্বীকার করেনি। [২১]

সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমেও নজরুল তাঁর উদার মানবতাবাদকেই ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসে তাঁর মানবদরদী মনোভাব অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বাঁধনহারা' নূরুল হুদা জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও নিশ্চিত আরামের জীবন ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে গিয়েছে, আনসারও বিত্তবৈভব পিতা-মাতা আরাম আয়েশ ছেড়ে বিপ্লবীর জীবন বেছে নিয়েছে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। তেমনি 'কুহেলিকা' উপন্যাসে জাহাঙ্গীর ইচ্ছাকৃতভাবে জমিদারী, মা, প্রেয়সী সকলকে ত্যাগ করে সংগ্রামী জীবনকেই জীবনের মূল লক্ষ্য করেছে। এরা সকলেই সর্বদাই সকল সাম্প্রদায়িকতা, হীনমন্যতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

এঁরা প্রত্যেকেই স্বাধীন, মুক্ত ও সজীব মানবাত্মার বিজয়ের জন্য নিজ জীবনকে আত্মাহুতি দিতে উদগ্র বাসনা ব্যক্ত করেছে। তাই কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসে আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা কিছুটা লক্ষ্যণীয় হলেও নির্যাতিত নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতি ও মানবতাবাদ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. নজরুল চরিতমানস ঃ ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৭ পৃ. ২৯৩।
২. নজরুল গদ্য সমীক্ষা ঃ মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৭৮, নজরুল উপন্যাস সমীক্ষা ঃ শাহআলম চৌধুরী. পৃ. ১৩।
৩. নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্র: ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩/ ২৫ মে ১৯৬৬, পৃ. ৭৯২।
৪. ঐ. পৃ. ৮০৬।
৫. ঐ. পৃ. ৭৬৮।
৬. ঐ. পৃ. ৭৬৯।
৭. নজরুল একাডেমী পত্রিকা ঃ ১ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, শরৎ ১৩৭৬, পৃঃ ৩৪।
৮. নজরুল চরিত মানস ঃ ড. সুশীলকুমার গুপ্ত, ঐ. পৃঃ ৩০১।
৯. ঐ. নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড, প্র. প্র. ৯ ফাল্গুন ১৩৭৬/২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫, বাংলা একাডেমী, পৃঃ ৫৯৭।
১০. নজরুল গদ্য সমীক্ষা ঃ ঐ পৃ. ১৯।
১১. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ঐ. পৃঃ ৫৮৮।
১২. ঐ. পৃঃ ৫৯২ঐ।
১৩. ঐ, পৃঃ ৬০৩।
১৪. ঐ, পৃঃ ৬৩৬।
১৫. নজরুল সাহিত্য বিচার ঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ পৃঃ ১১৬।
১৬. নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড ঐ. পৃঃ ৭১৮।
১৭. ঐ. পৃঃ ৬৫০।
১৮. ঐ. পৃঃ ৬৪৯।
১৯. নজরুল গদ্য সমীক্ষা ঃ ঐ. পৃঃ ৩১।
২০. ঐ. পৃঃ ৩২।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ঊনবিংশ সংকলন]

নজরুলের শিক্ষা-চিন্তা

হাকিম আরিফ

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলাকাব্যে প্রথম ভিন্ন কাব্যপ্রবাহ নির্মাণকারী বিদ্রোহীর অন্যতম কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবিতায় স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ এবং স্বকীয়-সাংস্কৃতিক আবহ বিনির্মাণে যেমন সফল ও বিশ্বস্ত তেমনি বাংলা তথা ভারতীয় জাতীয় জীবন ও সমাজের মর্মমূলের অন্তর্নিহিত সংস্কার, অজ্ঞতা, অপূর্ণতা, মিথ্যাচারকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি হয়েছেন প্রাতিস্বিক ও পরিণত। নজরুল ইসলামের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে উপরিউক্ত চিন্তা ও ভাবনাসমূহ হয়েছে প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত। নজরুল ইসলাম পেশাগত জীবনে শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন অর্থেই জড়িত ছিলেন না এবং দারিদ্র্য ও কঠিন বাস্তবতার চাবুকাঘাতে চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণও তাঁর পক্ষে কোন কালেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত চাকরি-সূত্রতা বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বেগম রোকেয়ার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাজনিত কারণ— নজরুল ইসলাম কোন অর্থেই শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন না। কিন্তু তারপরও তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় এবং স্বভাবজ পাণ্ডিত্যে 'যুববাণী' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের 'সত্য-শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা', ও 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামের তিনটি প্রবন্ধে এবং কিছু অভিভাষণ ও চিঠিপত্রে সর্বভারতের জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার সমস্যা ইত্যাকার ভাবনাকে প্রতিচিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষা মানুষের জীবনে ইতিবাচক উপলব্ধি ও সামগ্রিকতা বিনির্মাণকারী এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। কারণ শিক্ষা অর্জন দ্বারা ব্যক্তি যেমন তার সার্বিক আচরণের কাঙ্খিত, বাঞ্ছিত ও সমাজানুগ পরিবর্তন সাধন করে তেমনি ব্যক্তির চেতনাকে করে শাণিত, বুদ্ধিকে করে জাগ্রত ও তার জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে করে সর্বতোমুখী। সর্বোপরি শিক্ষা অর্জন ও গ্রহণের মাধ্যমেই ব্যক্তি নান্দনিক, নৈয়ায়িক, নাগরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধিতে জাত হওয়ার পাশাপাশি পরিপূর্ণতার পথে অভিগমন করে। আর,

> শিক্ষার লক্ষ্যই তো পরিপূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করা। পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়াই জীবনবোধ।[১]

শিক্ষার এই যে মহান লক্ষ্য, মানুষের মধ্যে জীবনবোধ বিনির্মাণ এবং মানবিকতার পূর্ণ বিকাশ তা ভারতবর্ষে শাশ্বতকাল ধরে বিদ্যমান টোল শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাকার লোকশিক্ষায় বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ বেনিয়া কোম্পানীর এদেশের

শাসন ক্ষমতা দখলের পর তারা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার নামে যে মানবিক ও বাণিজ্যিক শিক্ষাবৃত্তি চালু করে তাতে করে ভারতের লোকশিক্ষার বিলোপ ঘটতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকশিক্ষা' (১৮৭৮/ বাং ১২৮৫ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধের আক্ষেপ স্মরণীয়,

> ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না। ... তাহার স্থূল কারণ— শিক্ষিত অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভারতের শাশ্বত লোকশিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপজনিত কারণে সমবেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ১৯৩৩ সালে রচিত তাঁর 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে,

পূর্বকালে এদেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল, ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে।

মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সর্বভারতের স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটতে থাকে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮১৩ সালের শিক্ষা সনদ, ১৮২৩ সালের শিক্ষা সাধারণ কমিটি, ১৮৪২ সালের শিক্ষা কাউন্সিল ও ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে। ১৮২৩ সালে কমিটি অব পাবলিক ইস্ট্রাকশন নামে যে শিক্ষা পরিকল্পনা কমিটি হয় তা বাস্তবায়নে লর্ড ম্যাকিউলে 'নিম্নগামী পরিস্রবণ' নামে একটি জনবিচ্ছিন্ন নীতি প্রবর্তিত করে। এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ১৮১৩ সালের শিক্ষা সনদ সমগ্র ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে দেশের আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি সার্বিক বিবেচনায় খুবই অপ্রতুল হওয়ায় তা সবার জন্য ব্যয় না করে মুষ্টিমেয় মানুষের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। এই নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে খুব বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়, ব্রিটিশের গুণগ্রাহী, স্তুতিকার ও তল্পিবাহক একদল প্রশাসক গড়ে ওঠে, দেশীয় বিদ্যালয়সমূহ ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সাহায্য বঞ্চিত হওয়ায় অধিকাংশই বন্ধ হয়ে যায়, ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এবং শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা হওয়ার কারণে ব্রিটিশ শাসক লর্ড কার্জনের মতানুসারেও দেশীয় ভাষাসমূহের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয় এবং তাদের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে জনবিচ্ছিন্ন, সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন ও বিজাতীয় ভাবধারার ইংরেজি শিক্ষা ভারতবর্ষে যেমন চেপে বসে, তেমনি তথাকথিত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত প্রশাসকরা দেশপ্রেমিক ও স্বজাতি-স্বভাষী-নিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে হয়ে ওঠে স্থানু, পুঙ্গব, মেরুদণ্ডহীন, চাটুকার ও দেশপ্রেম বিবর্জিত। তারা দেশ ও জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে ব্রিটিশ বেনিয়া প্রভুর তোষামোদ ও চাটুকারিতায় মেতে থাকে,

সর্বোপরি তখন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এরকম,

> ইংরেজ তার ব্যবসায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কেতাবী শিক্ষার দিকে জোর দিয়েছিল কেরানিকুল তৈরির উদ্দেশ্যে, সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলার দিকে নজর দেয় নি। ... ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার ধারায় ছিল শুধু তোতা পাখির মতো বুলি কপচানো। নকলবাজি করে মগজভারি করে যেন-তেন প্রকারেণ একটা হোয়াইট কলারের চাকরির জন্য 'পাসপোর্ট' সংগ্রহ করাই সেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্যত্ব অর্জন বা ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ সাধনের মহান আদর্শের কথা নেহায়েৎ ছিল কথার কথা। জীবনের গভীর তাৎপর্য জানবার জন্য সে শিক্ষাধারায় কোন ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল না।[২]

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন গঠন করলেও ভারতবর্ষে সেই প্রাণহীন, আত্মমর্যাদা-মনুষ্যত্ব-সংস্কৃতি-জাতীয়তার বিকাশরহিত শিক্ষা ব্যবস্থা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কাজী নজরুল ইসলামের জীবন-চেতনার বিকাশ ঘটেছে ব্রিটিশ ভারতের উপরিউক্ত জনবিচ্ছিন্ন, জাতীয়তা ও দেশীয় সাংস্কৃতিক চেতনাবিহীন শিক্ষা-আবহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু নজরুলের মধ্যে যেহেতু প্রেম ও বিদ্রোহ সুমতি সাযুজ্যে বিকশিত হয়েছিল তাই আপন সমাজ ও চারপাশের মানুষদের তিনি ভালবেসেছেন, তাদের মাঙ্গলিক চিন্তায় উদগ্রিব ও উদ্বিগ্ন হয়েছেন কিন্তু শাসকদের শোষণ ও অনৈতিকতায় হয়েছেন প্রতিবাদী ও মুখর। ব্রিটিশ বণিক শাসন ও তাদের শিক্ষার চরিত্রহীনতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন এভাবে,

> ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার অতীত মহিমার খবর রাখিনে।[৩]

শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য। কিন্তু সে জন্যে জীবিকাই কি শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য? শুধু জীবিকা চিন্তার মত স্থূল ও সংকীর্ণ ভাবনা নিয়েই আমাদের প্রজন্ম শিক্ষা সমাপন করবে? এক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের শিক্ষা ভাবনা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ জন ডিউই বা পেস্তালৎসীর অনুরূপ। তাঁদের মত তিনিও ভেবেছেন শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ ও জ্ঞানার্জন। শুধু চাকরিই যে জাতির শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য তার মুক্তি নেই। তিনি বলেছেন,

> আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরী অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টের' মত আমরা ঐ চাকুরীর দিকে তীর্থের কাকের মত হা করিয়া চাহিয়া আছি।[৪]

অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যেমন একটি জাতির উন্নতির প্রধান নিয়ামক তেমনি ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনাও তার বলিষ্ঠ উপাদান। সাংস্কৃতিক নিজস্বতা ব্যতীত কোন জাতিই শুধু অর্থ-বিত্তের জৌলুসে সভ্যতার ইতিহাসে স্থায়িত্বের আসন লাভ করতে পারেনি।

সমৃদ্ধ অর্থনীতি যেমন জাতির বাহ্যিক চাকচিক্য ও জৌলুসকে বাড়িয়ে তোলে তেমনি নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চার দ্বারা সে জাতির মনোজীবনে প্রকৃত প্রাণরস ও জীবনীশক্তি জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি তার মেদযুক্ত চাকচিক্য ও জৌলুসে লাবণ্যের সুবাতাস প্রবাহিত হয়। আর একটি জাতির পরিপূর্ণ বিকাশই হচ্ছে তার সংস্কৃতি এবং ভাষা, সংস্কার, সাহিত্য, লোকজ উপাদান বীরগাথা ইত্যাদিই হচ্ছে তার সাংস্কৃতিক উপাদান। উপরিউক্ত সাংস্কৃতিক উপাদানের নৈকট্য বা একত্বই জাতির মধ্যে জাতীয়তার ভাবধারা জাগিয়ে তোলে এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের জাতীয়তা বিকাশের সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদানকে সুকৌশলে বিনাশের চক্রান্তে মেতে ওঠে। বিজাতীয় ও বিভাষী ইংরেজি রীতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদের বিপুল বিকাশের কারণে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রতিফলন দেখা দিতে শুরু করে তখন নজরুল ইসলাম তাকে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করেন,

> তাই বিজাতীয় বিভিন্ন শৃঙ্খল কাটিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা আজ এত আনন্দধ্বনি করিতেছি। যাহাতে এই জাগরণ-যুগের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাহিরে না হইয়া অন্তরে হয়, সেই জন্যেই আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।[৫]

সর্বোপরি নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশভিত্তিক এই জাতীয়তাবাদী শিক্ষা শুধু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে নয় বরং উচ্চ শিক্ষাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনুসৃত হবে, তারই প্রত্যয়-দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন নজরুল ইসলাম তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধসমূহে। তবে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্বদান করবে এবং যাদের নেতৃত্বে জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে সেই নেতৃত্ব এবং তাদের ত্যাগের প্রতি সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি। আবার দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় সমাজে ইংরেজ প্রবর্তিত জীবন-বিকাশ ও জীবনবাদী শিক্ষার পরিবর্তে কেরাণী-প্রতিষ্ঠা এবং অনুকরণ ও 'হনুকরণ'[৬] প্রিয় মানুষ তৈরির বিদ্যালয় প্রচলিত থাকার কারণে যেহেতু এ সমাজে সৃষ্টিশীল ও সৃজনবাদী এবং নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত ও আন্তরিক মানুষের সংখ্যা অপ্রতুল ছিল। তাই নজরুল ইসলাম আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন,

> এখন যে-পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ঠিক ঐ রকম বিলাতী শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া 'স্বদেশী' মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মত।[৭]

অর্থাৎ জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতি নির্ভর নব-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রকৃত জাতীয়তা, সাংস্কৃতিক চেতনা, দেশীয় পরিমণ্ডল, বাঙালিত্ব

ইত্যাদির বিকাশ সাধিত হয়নি আমাদের সীমাহীন বিদেশনীতি এবং অনুকরণযুক্ত পদলেহনের কারণে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের প্রকৃত যোগ্যতা কি হবে সে প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার মহান ও বিশ্বস্ত কারিগর। কারণ তিনি সর্বদাই সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার অন্তর প্রেরণায় তার সমস্ত মহৎ গুণ, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সমন্বয়ে আদর্শ মানুষ ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলেন। আর সমাজের নেতৃত্বদানে সক্ষম আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার জন্য একজন শিক্ষককেও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ও পেশাগত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দায়িত্ববান হতে হয়। 'একজন শিক্ষকের দায়িত্ব হবে— যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা পদ্ধতির যে ক্রমোন্নতি সাধিত হচ্ছে তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন।'[৮] নজরুল ইসলামের মতে শিক্ষককে হতে হবে ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, স্বজাতি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরিপক্ক। তবে এই পরিপক্কতা বয়সের পরিপক্কতা নয়, মূলত জ্ঞানের পরিপক্কতা ও ঋদ্ধতা। তিনি বলেছেন,

> এই জাতীয় বিদ্যালয়ে কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক নিয়োগ লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না; 'শাক দিয়া মাছ ঢাকা যায় না'। কাঁচা অধ্যাপক মানে বয়সে কাঁচা নয়।— বিদ্যায় কাঁচা।[৯]

কাজী নজরুল ইসলাম সমকালীন শিক্ষা-সংকট, শিক্ষার স্বরূপ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের মতো প্রাজ্ঞ ও পরিণত দৃষ্টি দিয়ে তৎকালীন শিক্ষার কারিকিউলাম বা পাঠক্রম, পাঠক্রমের স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তেমনি শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা অতি স্বচ্ছ এবং আধুনিকতা ও প্রাগ্রসরতার সংকেতবাহী। তিনি বলেছেন'

> আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনীশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে-শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। প্রাণ-শক্তি আর কর্ম-শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।[১০]

বিট্রিশ বেনিয়া শক্তির ক্রমাগত শাসন- শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক অনাচার, অসঙ্গতি, অশুভ সাম্প্রদায়িকতা, প্রলেতারিয়েত বা উন্মুল মানুষের অধিকার আদায় প্রভৃতির জন্যে কাব্য-সাহিত্যে নজরুল ইসলাম যেমন হয়েছেন বিদ্রোহী, আহ্বান করেছেন যৌবনকে, তারুণ্যকে, তারুণ্যের অপরিসীম জীবনীশক্তিকে তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে, বিদ্যালয় সমূহের ছাত্ররূপে তিনি কামনা করেছেন সেই মানুষকে যে 'মেদা-মারা'[১১] নয় বরং 'ডাংপিটে'[১২]— যে অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী, উদ্দাম, দুরন্ত, দামাল। জড়কে, অন্যায়কে, মিথ্যাচারকে ভেঙ্গে নতুনের প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণে যে

ছাত্র তেজবান সে-ছাত্রই নজরুল ইসলামের কাম্য এবং যুগের চাহিদাও ছিল তখন তাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন ডিউই, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জোহেন হেনরিক পেস্তালৎসী প্রমুখের মতো শিক্ষা দার্শনিক ছিলেন না নজরুল ইসলাম বা তিনি নির্মাণ করেননি শিক্ষার কোন নতুন তত্ত্ব অথবা তিনি জাতির শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতনভাবে প্রদান করেননি কোন দিক নির্দেশনা। মূলত শিক্ষা সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তৎকালীন শিক্ষা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি, বিপর্যয় পর্যবেক্ষণোত্তর সেগুলোর সমাধানে সুপারিশ প্রদান করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনবোধের গভীরতার কারণে, ব্যক্তি প্রতিভার দ্যুতিতে এবং সামূহিক মঙ্গলকামনার অন্তরতাগিদে কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তায় সদর্থক জীবন বিনির্মাণের ক্ষেত্রে এক ধরনের টোটালিটি বা পরিপূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়—যা পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষা-চিন্তার অভীষ্ট লক্ষ্যও বটে। আর এখানেই কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা-চিন্তার সার্থকতা নিহিত।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. হবিসাধন গোস্বামী, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪. পৃ. ২৫।

২. ঐ. পৃ. ৬, ১৯৮৪।

৩. নজরুল রচনা সম্ভার, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, অভিভাষণ. পৃ. ১১৪, ১৯৬১।

৪. ঐ-অভিভাষণ পৃ. ১০৫, ১৯৬১।

৫. নজরুল রচনা সম্ভার/৩, সম্পাদনা ঃ আব্দুল আজীজ আল-আমান. হরফ প্রকাশনী. কলকাতা, সত্য-শিক্ষা, পৃ. ৩১২, ১৯৮১।

৬. ঐ-জাতীয় শিক্ষা, পৃ. ৩১৩, ১৯৮১।

৭. ঐ-জাতীয় শিক্ষা, পৃ. ৩১৩,১৯৮১

৮. ডঃ মোহাম্মদ আজহার আলী, মিসেস হোসনে আরা বেগম, সফল শিক্ষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, পৃ. ২, ১৯৮২।

৯. নজরুল রচনা সম্ভার/৩, সম্পাদনা ঃ আব্দুল আজীজ আল-আমান, হবফ প্রকাশনী, কলকাতা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩১৪, ১৯৮১।

১০. ঐ -জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩১৫, ১৯৮১।

১১. ঐ -জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩১৫, ১৯৮১।

১২. ঐ -জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩১৫, ১৯৮১।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — সংকলন]

নজরুলের ছোটগল্প ঃ আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাস

চঞ্চল কুমার বোস

বাংলা ছোটগল্পের বৈচিত্র্যময় ভুবনে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর উপস্থিতি অনুজ্জ্বল বটে কিন্তু শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যে তিনি সমুজ্জ্বল। জীবনের তীব্রতম আবেগে তাঁর গল্প বিশিষ্ট, মানবীয় উত্তাপের কথকতায় তাঁর গল্প আত্মচিহ্নিত। নজরুলের গল্পে সমাজ-অনুষঙ্গ কিংবা জীবনের বহুচারী রূপ অনুপস্থিত যদিও তাঁর গল্প জীবন-বিবিক্ত নয়। মানবীয় প্রেম তথা নরনারীর মনোময় হৃদয়বৃত্তির বর্ণাঢ্য উদ্ভাসে নজরুলের ছোটগল্পগুচ্ছ উজ্জ্বল।

নজরুলের প্রতিভা মূলত রোমান্টিক গীতিকবির। কলোনিয়াল ভারতের অবরুদ্ধ বাস্তবতায় জাতির সামূহিক আবেগ ও জিজ্ঞাসা তাঁর কাব্যে পেয়েছে মুক্তি। পরাধীন যুগের অগ্নিতপ্ত সময়গর্ভে লালিত নজরুল। বেনিয়া ইংরেজের দুঃশাসন এবং বৈরী সময়ের শৃঙ্খল ভেঙে নজরুল জাতীয় অস্তিত্বের মুক্তি প্রত্যাশী হয়েছিলেন। আবাল্য জীবনায় নজরুল কাব্যের আবেগময় পরিমণ্ডলে তাই ছিলেন স্বচ্ছন্দ, সপ্রতিভ ও সৃষ্টিশীল। তাঁর গল্পসমূহেও এই আবেগ ও উচ্ছ্বাস কাব্যময় রূপ লাভ করেছে। তাই হয়তো বলা যায়, নজরুলের গল্পগুচ্ছ তাঁর গীতিময় কবিতারই দ্বিতীয় সত্তা বা 'অলটার ইগো' (Alter Ego).

'ব্যথার দান' (১৩২৮), 'রিক্তের বেদন' (১৩৩১) এবং 'শিউলিমালা' (১৩৩৮) গ্রন্থের আঠারটি গল্পে নজরুলের ছোটগাল্পিক শিল্পদৃষ্টির আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে। গল্পগুলোতে নজরুলের ঐকান্তিক আবেগের যেমন প্রকাশ আছে, তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনানুভবে গল্পসমূহ ঋদ্ধ। নজরুলের গল্পে বিষয়-বৈচিত্র নেই; প্রেমই তাঁর গল্পের প্রায় একমাত্র উপজীব্য কিন্তু প্রেমের বিচিত্র রূপায়ণে তাঁর গল্পগুচ্ছ আবেগ-সঞ্চারী।

নজরুলের 'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদন'-এর গল্পসমূহে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। নরনারীর তীব্র আবেগময় প্রেম ও ভালোবাসা গল্পগুলিতে শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। এই আবেগোচ্ছ্বাস আরও অবিরল হয়ে উঠেছে গল্পগুলির ফর্ম নির্মাণের অন্তর্ময় পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ 'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদন'–এর চৌদ্দটি গল্পের মধ্যে বারোটি গল্পই বিধৃত হয়েছে উত্তম পুরুষে। নায়ক-নায়িকার স্বগতোক্তি তথা উত্তম পুরুষে কাহিনী বিন্যস্ত হওয়ায় স্বভাবতই তা' হয়ে উঠেছে আবেগসঞ্চারী, মনোময় এবং কল্পনাপ্রবণ। নজরুলের গল্পে মননশীলতা

দুষ্প্রাপ্য; লেখকের উত্তুঙ্গ ভাবময় কবিসত্তা ছোটগল্পের আদলে বিন্যস্ত হয়েছে। 'ব্যথার দান' সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি অনুসরণযোগ্য,

> ...গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক গল্পেই করুণরস নিবিড়ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। নিরাশ প্রেমের মর্মন্তুদ গভীর বেদনা এই পুস্তকের প্রত্যেক পাতায় ফুটিয়াছে। গল্পগুলিতে আখ্যানবস্তুর কারিগরি না থাকিলেও ভাববৈচিত্র্যে ও কাব্যসম্পদে উহা মনোরম হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্র ব্যাখান ও মানব মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লেখকের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও উহাদের অন্তরের যোগ আছে।[১]

গল্পের কাহিনী নির্মাণে ও ঘটনাবিন্যাসে নজরুলের গল্পে কিছু শিল্পরীতির পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নজরুল প্রায়শ তাঁর গল্পকে অনুচ্ছেদতুল্য কয়েকটি অংশে বিভাজিত করেন এবং প্রতিটি বিভাজ্য অংশের শিরোনামা হিসেবে চরিত্রের নাম ব্যবহার করেন। উপরন্তু চরিত্রের পাশাপাশি যেস্থানে ঘটনা সংঘটিত হয় সেই স্থানের নামটিকেও তিনি গল্পের অনুচ্ছেদের শীর্ষ নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের এই শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে 'ব্যথার দান' গ্রন্থের 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'ঘুমের ঘোরে', প্রভৃতি গল্পে এবং 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের 'রিক্তের বেদন', 'মেহের-নেগার' প্রভৃতি গল্পে।

'ব্যথার দান' গল্পের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে দারা, বেদৌরা এবং সয়ফুলমুল্‌কের আবেগময় স্বগতকথনে। আখ্যায়িকার আদলে পরিবেশিত হয়েছে উপর্যুক্ত তিনটি চরিত্রের মনোকথন, কাহিনীর মধ্যে আভাষিত হয়েছে গল্পরস।

'হেনা' গল্পে উত্তম পুরুষের মনোময় উচ্চারণে হেনা ও সোহ্‌রাবের প্রণয়কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এ-গল্পের আখ্যায়িকা রস পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে। আলোচ্য পটভূমি সৃজনে নজরুলের বিশিষ্টতা প্রস্ফুট।

যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন পটভূমিতে হেনা ও সোহ্‌রাবের গভীর হৃদয়ানুভব নজরুলের অপরিমেয় জীবন প্রীতির শিল্পসাক্ষ্য। লেখকের অসংযত ভাবোচ্ছ্বাস এ-গল্পের গতি ও সাবলীলতাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

নজরুলের গল্পসমূহ তাঁর উচ্ছ্বাসময় কবিচৈতন্যেরই অনুবিশ্ব। নজরুলের এই গীতিময় কবিপ্রাণের উৎসার ঘটেছে 'বাদল-বরিষণে'। গল্পের আঙ্গিক বিন্যস্ত হলেও 'বাদল-বরিষণে' চরিত্রগতভাবে কথিকা। নামকরণও কাব্যিক। কৃষ্ণকায় কাজরিয়ার নিজের রূপ নিয়ে দ্বিধা, নায়কের হৃদয়বর্তী হবার ক্ষেত্রে তার মনোময় সঙ্কট এবং পরিণামে 'চাওয়ার অনেক বেশী পাওয়ার গর্বেই' কাজরিয়ার মৃত্যু হয়। গল্পের আবেগ-বাহুল্য এর আঙ্গিকগত ত্রুটিকে প্রকট করে তুলেছে। কাজরিয়ার মৃত্যু কার্য কারণহীন। পুরো গল্পটিই ভাবালুতা-আচ্ছন্ন, আবেগময়।

'ঘুমের ঘোরে' গল্পে আজহার ও পরীর স্মৃতিময় অনুষঙ্গ বিধৃত হয়েছে ঘটনাক্রমে। প্রেম ও কর্তব্যের বিপ্রতীপ দ্বন্দ্বে জীবনের ট্রাজিক বিনষ্টি উন্মোচিত হয়েছে গল্পে। কিন্তু কাহিনী বিন্যাসে নজরুলের কল্পনাতরল আবেগ গল্পের পরিণতিকে শিল্পমাধুর্যহীন প্রতিবন্ধী ক'রে তুলেছে। গল্পের অন্তিক পর্যায়ে পরীকে সান্ত্বনাদানরত তার স্বামীর ভাবোচ্ছ্বাস গল্পের আঙ্গিকগত ত্রুটির নির্দেশক। বস্তুত নজরুলের 'বাদল-বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি'-প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে তাঁর বেদনাজীর্ণ স্মৃতিময় কবিচৈতন্যই মূখ্য হয়ে উঠেছে। নজরুলের কবিসুলভ বিরহীসত্তা ও প্রেমময় স্মৃতিপুঞ্জই গল্পসমূহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবেগের উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে তাঁর গল্পের চরিত্রসমূহ স্পন্দিত। সমাজ ও শাস্ত্রের বন্ধন স্বীকার ক'রেও তারা জীবনময়। 'ঘুমের ঘোরে' গল্পে বিবাহিতা পরী কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছে না পূর্বতন প্রণয়ী আজহারকে। অথচ একজনের স্ত্রী হয়ে পর পুরুষকে মনে স্থান দান নৈতিক অসততার নামান্তর। একদিকে হৃদয়ের প্রবল দাবি অন্যদিকে সমাজভীতি—এই দ্বৈত অনুভবের টানাপোড়েনে পরীচরিত্র মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষত।

> এই তাঁর চিন্তাটা যে আজ হতে জোর করে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, সেইটাই আমায় সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে। বাইরের শাসন আর ভিতরের শাসন এই দুটোয় মস্ত টানাটানি পড়ে গিয়েছে এখন। সমাজ, ধর্ম আমার মনকে মুখ ভাঙিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলছে—সে চিন্তাটা তোমার ভয়ানক অন্যায়, অমার্জনীয় পাপ।
>
> ('ঘুমের ঘোরে', ব্যথার দান)

নরনারীর সুক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের বৈচিত্র্যময় রূপাঙ্কনে 'ঘুমের ঘোরে' গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

'রিক্তের বেদন' গল্পে অচরিতার্থ মানবীয় প্রেমের এক বেদনাময় ইতিবৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে। কর্মের আহ্বানে বহির্গত যুবক-হৃদয় পরিণামে হয়েছে রক্তাক্ত। হাসিন ও শহিদার মেরুদূর ভালবাসা শেষ পর্যন্ত অপ্রাপনীয় থেকে যায়। শহিদার প্রেমকে উপেক্ষা ক'রে যুবক হাসিন যুদ্ধে যায়। সেখানে এক বেদুইন রমণী গুলের প্রতি একসময় আকৃষ্ট হয় সে। কিন্তু গুলের প্রকৃত চরিত্র ও আচরণ যখন উন্মোচিত হয় তখন হাসিনই কর্তব্যের অমোঘ টানে গুলকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমিকায় মুমূর্ষ গুলের সঙ্গে হাসিনের অন্তিক মিলন মানবীয় বেদনায় আর্দ্র। অতিকথন প্রবণতা ও বাগ্‌বাহুল্য গল্পের আঙ্গিক সৌকর্যকে ক্ষুণ্ন করলেও 'রিক্তের বেদন' গল্পরসে উত্তীর্ণ।

'মেহের-নেগার' গল্পের আঙ্গিকবিন্যাসে নজরুলের শিল্প দুর্বলতা স্পষ্ট। গল্পের নায়ক য়ুসোফ ভবঘুরে যুবক, নায়িকা গুলশনের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে তার স্বপ্নপ্রিয়া মেহের-নেগারকে। কিন্তু দুজনের মিলনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে গুলশনের অশুচি জন্ম-পরিচয়। সে বাঈজীর মেয়ে। এই সমাজ-বিকৃত আত্মপরিচয়ের গ্লানিবহনে অক্ষম

গুলশন শেষপর্যন্ত আত্মহনন করে। নজরুলের আবেগপ্রাবল্য গল্পের ঘটনাক্রমকে ছাপিয়ে এর আঙ্গিক সংহতিকে বিপর্যস্ত করেছে। উত্তমপুরুষে বর্ণিত এ-গল্পের সমাপ্তি অতিনাটকীয়।

'সাঁঝের তারা' গল্পে ছোটগল্পের আদল গড়ে ওঠেনি। নায়কের আবেগময় স্বগতকথনই কথিকার ঢঙে পরিবেশিত হয়েছে। চরিত্রসৃজনের কোনো অবকাশও এতে নেই। উত্তম-পুরুষে বর্ণিত 'সাঁঝের তারা' গল্প না হয়ে ভাবময় কথিকা হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয়– 'সাঁঝের তার'র মধ্যে কথিকার ঢঙটি প্রবল এবং এর উপর রবীন্দ্রনাথের লিপিক'র রচনাশৈলীর প্রভাব একান্তভাবে অনুভবগম্য।'[২] 'রাক্ষুসী' গল্পের বিন্যাসরীতি পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে। অসঙ্গত সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দি নামক এক নিপীড়িত নারীর জীবন-যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত এ - গল্পে বিধৃত হয়েছে। নজরুলের অধিকাংশ গল্পের মৌল প্রতিপাদ্য প্রেম হলেও আলোচ্য গল্পে সমাজ চৈতন্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিন্দির স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হলে বিন্দি যে দুর্বার মানবিক সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হয় তারই শিল্পকথা 'রাক্ষুসী'।

'স্বামীহারা' গল্পে আজিজ ও বেগমের আবেগময় দাম্পত্যজীবন এবং কলেরায় আজিজের মৃত্যুর পরও বেগমের একনিষ্ঠ স্বামীপ্রেম কাব্যময় ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। উত্তম পুরুষে উক্ত এ-গল্পে কারুণ্য ও পরিজন হারানোর বেদনা গভীর লালিত্যে বর্ণিত হয়েছে।

'দুরন্ত পথিক' নামক গল্পটি মূলত কথিকা। ছোটগল্পের প্রচলিত রীতিতে এ-রচনাকে চিহ্নিত করা যায় না। কথিকার গতিশীল বিন্যাসে মানবাত্মার শাশ্বত অভিযাত্রার ইতিবৃত্ত কাব্যময় ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

নজরুলের ছোটগাল্পিক শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর একাধিক গল্পের সাংগীতিক উপস্থাপনা। একাধিক গান আছে তাঁর প্রায় গল্পেই। চরিত্রগুলো প্রায়শ তাদের মনোভঙ্গি, তাদের আবেগ-উল্লাস, বেদনা ও যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছে গানে। বস্তুত চরিত্রের অন্তর্মময় আবেগ সংহত হয়েছে সঙ্গীতে। বিপুল বেদনার ভার যেন স্ফটিকখন্ডের ন্যায় জমাট বেঁধেছে গানে, সংগীতে, সুরে। গানের এই যথেচ্ছ ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে গল্পের শিল্পগুণ ব্যাহত করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গল্পের ঘটনাবহুল দ্বন্দ্বময় মুহূর্তে গান বা সংগীতের ব্যবহার গল্পের বাস্তবতাকে প্রবলভাবে লঘু করে দিয়েছে। আর চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশও হয়েছে ক্ষুণ্ন।

নজরুলের 'শিউলিমালা' গ্রন্থের চারটি গল্পের মধ্যে অন্যতম প্রধান গল্প 'পদ্ম-গোখরো'। নজরুলের ছোটগল্পসমূহের মধ্যে এর অবস্থান প্রথম সারিতে। গল্পের সূচনাতেই নজরুল ছোটগল্পের আদর্শ ও চারিত্র্য অনুসারে কাহিনীর কেন্দ্রীয় সঙ্কটকে আভাষিত করেছেন,

> রসুলপুরের মীর সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জীনের বা যক্ষের ধন পাইয়াছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদীনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

অতিপ্রাকৃত অনুষঙ্গে গল্পের বীজ উপ্ত ও পল্লবিত হলেও এক মানবীয় সঙ্কটের আত্মবিদারী হাহাকার গল্পটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পের ফর্মে নজরুল বিস্ময়করভাবে একটি উপন্যাসের আয়তনকে বিন্যাস করেছেন।

বিষাক্ত সর্পযুগল গল্পের ঘটনা ও কাহিনীকে অভাবিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এ-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রাসঙ্গিক,

> দুটি জীব গল্পের ঘটনা এবং চরিত্রগুলি যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে 'আদরিণী' এবং 'মহেশ' ছাড়া আর কোনো গল্পে আছে বলে মনে পড়ে না।[৩]

জোহরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে অতৃপ্ত মাতৃত্বের শাশ্বত হাহাকার ও প্রত্যাশা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের আখ্যায়িকা রস পরিবেশনে নজরুলের ছোটগল্পের শিল্পশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। গ্রামীণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃত এক ইতিবৃত্তকে আশ্রয় ক'রে নজরুল যেভাবে গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন তা' পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে এক অজানা আশঙ্কায়, শিহরণে ও উৎকণ্ঠায়। পদ্ম গোখরোযুগলের প্রতি মৃতবৎসা এক গ্রাম্যনারীর অন্ধ স্নেহকে কেন্দ্র ক'রে যেভাবে নজরুল কাহিনী গেঁথে তুলেছেন তা' কখনো পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে না। তবে শৈল্পিক সূক্ষ্মতায় বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়—এগল্পও আঙ্গিকগত ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। বিশেষত সর্পযুগলের আচরণ-প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব সম্পূর্ণত লেখকের অভিপ্রায়-অনুগ। জোহ্‌রার প্রতি প্রবলভাবে অনুগত হলেও সর্পযুগল অন্যদের প্রতি বিরূপ ও আক্রমণাত্মক। নিদ্রিত জোহ্‌রার বুকে সর্পযুগলের আশ্রয় নেয়ার ঘটনাটিও অবাস্তব। সর্পযুগলকে কেন্দ্র ক'রে জোহ্‌রার মধ্যে যে-মনোবিকার দেখা দেয়, বিশেষ ক'রে তার শুধু সাপের স্বপ্ন দেখা, স্বামীকে নাগলোকের অধীশ্বর এবং নিজেকে নাগমাতাবলে কল্পনা করা অহেতুক শিল্প প্রতীতির নির্দেশক। উপরি উক্ত শৈল্পিক ত্রুটি সত্ত্বেও নজরুল আলোচ্য গল্পের পরিণতিকে অসাধারণ নাটকীয়তায় মুখর ক'রে তুলেছেন। 'ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ একজোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।' এই মিতবাক্যের ইঙ্গিতময়তার মধ্যে গল্পের অন্তিম নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে। 'পদ্ম-গোখ্‌রো' নজরুলের গল্পসমগ্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। মানবিক আবেগের অকৃত্রিম উদ্ভাসে গল্পটি হৃদয়-সংবেদী।

'অগ্নি-গিরি' গল্পের আঙ্গিক বিন্যাস ও ঘটনা সংস্থাপনে নজরুল শিল্প সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের আত্মজৈবনিক স্মৃতি ছায়া ফেলেছে এ-গল্পে।

বীররামপুরের সুশীল যুবক সবুর আকন্দ পাড়ার রুস্তমের দলের দ্বারা নিগৃহীত হতো প্রতিনিয়ত। অবশেষে একদিন তারই আশ্রয়দাতার কন্যা এবং সবুরেরই ছাত্রী নূরজাহানের তিরস্কারে চিরকালের নিভৃতচারী সবুর হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। প্রতিপক্ষকে সে কেবল পরাভূতই করেনি, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুরও কারণ হয়ে ওঠে সবুর। নূরজাহানের দুর্জয় প্রেমাবেগে উদ্বোধিত সবুরের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শিল্পনিপুণ।

'শিউলিমালা' গল্পে নজরুলের পরিণত শিল্পচৈতন্যের প্রকাশ ঘটেছে। কোলকাতার সুখ্যাত তরুণ-ব্যারিস্টার আজহারের সঙ্গে শিউলি নামের একটি মেয়ের বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনীই গল্পের প্রতিপাদ্য। আজহারের আত্মকথনে উন্মোচিত হয়েছে গল্পের অবয়ব। আঙ্গিক ও আদলে গল্পটি পরিশীলিত হলেও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। নায়ক-নায়িকার মিলনে কোনো দুস্তর প্রতিবন্ধকতা ছিল বলে গল্পে কোনো ইঙ্গিত নেই, অথচ তারপরও দুজন বিপরীত বৃত্তবাসী, তাদের মিলন হ'ল না। নায়ক আজহারের চিরকৌমার্যব্রত পালনের নেপথ্যে কোনো যৌক্তিক বা শৈল্পিক কারণ বিশ্লেষিত হয়নি। লেখকের ভাবোচ্ছ্বাসই নায়ক আজহারকে এরকম কার্যকারণহীন পরিণতির দিকে অগ্রসর করেছে, এক বেদনাজীর্ণ হৃদয়ের স্নিগ্ধতা সমস্ত গল্পটিকে আচ্ছন্ন করে আছে।

'জিনের বাদশা' গল্পে নজরুলের চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্য এবং আঙ্গিকবিন্যাস কুশলতা লক্ষণীয়। তবে ঘটনা সৃজনে কল্পনাতারল্য অস্পষ্ট থাকেনি। বিশেষত চান্‌ভানুর বিয়ে ভেঙে দেবার প্রচেষ্টায় আল্লা-রাখার চাতুরির আশ্রয় নেয়া; জিনের বাদশা কর্তৃক চান্‌ভানুর পিতাকে পত্রপ্রেরণ এবং প্রকাশ্যে আল্লা-রাখার বুক থেকে চান্‌ভানুর রক্তশোষণ অনেকটাই অবাস্তব ও তরল কল্পনার সৃষ্টি। আঙ্গিকগত ত্রুটি সত্ত্বেও চান্‌ভানু চরিত্রটি নজরুলের এক সফল সৃষ্টি।

নজরুল-গল্পের অধিকাংশ নায়ক চরিত্রে লেখকের আত্মজৈবনিক উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। অধিকাংশ নায়ক চরিত্রে দেখা যায় এক ধরনের বাউণ্ডেলেপনা, দুরন্তভাব। কর্তব্যের আহ্বানে প্রবল প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে তারা। নজরুলের একাধিক গল্পের নায়ক যেমন 'হেনা', 'ঘুমের ঘোরে', 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি গল্পে কর্তব্যনিষ্ঠ নায়ক প্রেমকে উপেক্ষা করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। উপর্যুক্ত গল্পসমূহে নজরুলের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা-অনুষঙ্গ বিজড়িত রয়েছে।

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ট্রেনযোগে কোলকাতা থেকে লাহোর হয়ে নওশেরা যাত্রার চিত্র 'রিক্তের বেদন'-এ পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত গল্পের নায়ক চরিত্রে যে-বীর্যবত্তা, অকুতোভয় ও নির্ভীক যুদ্ধ প্রেরণা—তার নেপথ্যে যেন সৈনিক-নজরুলের প্রতিভাসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নজরুল-গল্পের ভাষাশৈলী একান্তভাবে নজরুলীয়। ভাষা ব্যবহারে তিনি আবেগ প্রধান। আবেগ প্রবণ গদ্যলেখক হিসেবে নজরুল পরিচিত। নজরুলের ভাষার প্রধান

শক্তি ও দুর্বলতাই তাঁর আবেগোচ্ছ্বাস। ঘটনা বর্ণনায় প্রায় ক্ষেত্রেই কাব্যময় হয়ে উঠেছে, তুলনা হয়ে উঠেছে কাব্যরসাশ্রিত। গীতিকবির ভাবতন্ময়তা নিয়ে নজরুল অবিরাম গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন। তাঁর গদ্যে বুদ্ধি ও মননশীলতার চেয়ে আবেগের প্রাধান্যই বেশী। আবেগোচ্ছ্বাসের বাষ্পে তাঁর গল্পে কাহিনীর রূপ ঠিকমতো দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। নজরুলের গল্পে এই আবেগ-প্রাবল্যের আকরশক্তি নিহিত রয়েছে তাঁর শিল্প প্রতিভার সমগ্রতায়। গীতি প্রধান নজরুল ভাবময় চৈতন্য থেকে কাহিনী নির্মাণ করেছেন, ফলে মননশীলতার চেয়ে বিপুল আবেগের বিস্তার তাঁর গল্পকে কাব্যময় ক'রে তুলেছে।

'ব্যথার দান' এবং 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থদ্বয়ের গল্পগুলি নজরুলের সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকের রচনা। অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য প্রেম। সদ্য যুবক নজরুলের কাছে প্রেম তাই হয়ে ওঠে অনিবার আবেগের উৎস। আবেগচালিত নজরুল-অনুধ্যানে প্রেম স্বপ্নপ্রতিম, স্মৃতিময়। 'ব্যথার দান' গল্পে এই স্মৃতিময় অন্তরঙ্গ অনুভব নিটোল কাব্যময় ভাষায় চিত্রিত হয়েছে,

> তারপরে মনে পড়ে বেদৌরা, আমাদের সেই কিশোর মর্মতলে একটু একটু ক'রে ভালবাসার গভীর দাগ, গাঢ় অরুণিমা। মুখোমুখী বসে থেকেও হৃদয়ের সেই আকুল কান্না, মনে পড়ে কি সে-সব বেদৌরা? তখন আপনি মনে হত এই পাওয়ার ব্যথাটাই হচ্ছে সব চেয়ে অরুন্তুদ। তা না হলে সাঁজের মৌন আকাশ তলে দুজনে যখন গোলেস্তানের আঙুর-বাগিচায় গিয়ে হাসতে হাসতে বসতাম তখন কেন আমাদের মুখের হাসি এক নিমেষে শুকিয়ে গিয়ে দুইটি প্রাণ গভীর পবিত্র নীরবতায় ভরে উঠতো? তখনও কেন অবুঝ বেদনায় আমাদের বুক মুহুর্মুহু কেঁপে উঠত? আঁখির পাতায় পাতায় অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে আসতো?

নজরুলের গল্পের ভাষা আবেগময় হলেও তা' জীবন-বিবিক্ত নয় বরং জীবনময় বস্তুকে দৃষ্টি গ্রাহ্য ক'রে তোলার প্রয়াসে এবং ঘটনানুগ পরিবেশ সৃজনে নজরুলের ভাষা আবেগময় হয়েও বস্তুনির্ভর,

> আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রস আর লাবণ্যে ঢল্‌ঢল্ করছে পরীস্তানের নিটোল স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদীদের মত। নাশপাতিগুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙুল গালের মত। রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের অভিমানে-স্ফুরিত টুক্‌টুকে অরুণ অধরের মত। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেতে বুল্‌বুলদের নওরোজের মেলা বসেছে। আড়ালে আগডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল বধূর গলাসাধার ধুম পড়ে গিয়েছে, কি ক'রে তারা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল রাখবে।

('ব্যথার দান', ব্যথার দান)

নজরুলের গল্পে ভাষা কেবল আবেগময় নয়, একই সঙ্গে তা' ধ্বনিময় ব্যঞ্জনা-নির্ভর। চরিত্রের আবেগ ও অনুভূতি-অনুসারে ভাষায় একপ্রকার সংগীতময়তা, তান

ও দ্যোতনা সৃষ্টি করা হয়েছে। 'বাদল-বরিষণে' গল্পে ভাষার কাব্যময় উপস্থাপনায় সৃষ্টি হয়েছে বর্ষার মেঘমেদুর সজল পরিবেশ,

> বৃষ্টির ঝম্‌ঝমানি শুনতে শুনতে সহসা আমার মনে হ'ল, আমার বেদনা এই বর্ষার সুরে বাঁধা।

> সামনে আমার গভীর বন। সেই বনে ময়ূরে পেখম ধরেছে, মাথার ওপর বলাকা উড়ে যাচ্ছে, ফোটা কদম ফুলে কার শিহরণ কাঁটা দিয়ে উঠছে, আর কিসের ঘন-মাতাল-করা সুরভিতে নেশা হয়ে সারা বনের গা টলছে।

বর্ষার এই মেঘগম্ভীর পরিবেশে গল্পের নায়িকা কাজরিয়া যে ভাষায় কথা বলে তা' যেন পদাবলীর রাধিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুল বর্ষার পটভূমিকায় কাজরিয়ার অন্তর্মময় প্রেমাবেগ চিত্রণে প্রয়োগ করেছেন পদাবলীর ন্যায় ধ্বনিময় সংলাপ,

> পরদেশীয়া রে, তুহার দেশ কাঁহা?' অথবা 'নহি রে সজনিয়া নহি। য়ে পরদেশী জোয়ান।

নজরুলের গল্পে ভাষাবিন্যাসে আঞ্চলিক ও স্থানিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের 'রাক্ষুসী' গল্পে বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের মুখেও আরোপিত হয়েছে এ-ভাষা। দারিদ্রপীড়িত বিন্দির জীবনযন্ত্রণার অকৃত্রিম রূপ উন্মোচনে নজরুল আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগেই শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অশিক্ষিত বাগ্‌দী বিন্দির সপরিমার্জিত আঞ্চলিক সংলাপেই তার যথার্থ প্রাত্যহিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়,

> তু ত জানিস মাখন দি, ঝুটমুট আমাদের গাঁয়ের লোকের আর আমাদের বাগ্‌দীগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের হাতে অনেক টাকা আছে। আবার সে কত পুত্‌খাগীর বেটিরা লোকের ঘরে ঘরে রটিয়ে এসেছিল, আমরা নাকি যক্ষির টাকা পেয়েছি। বল ত বুন, এতে হাসি পায় না?

'শিউলিমালা', গ্রন্থের 'জিনের বাদশা গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে ফরিদপুর অঞ্চলের ভাষা। চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারের ফলে গল্পের ঘটনা ও পরিবেশ হয়েছে অকৃত্রিম,

> নারদ আলি বেশী কিছু বললে বউ তার তাড়া দিয়ে বলে ওঠে 'তোমার খ্যাচ খ্যাচাইবার ওইবো না, আমার মাইয়া বিয়া বস্‌ব না—জৈগুন বিবির লাহান উয়ার হানিপ যদ্দিন না আয়ে।

একই গ্রন্থের 'অগ্নি-গিরি' গল্পে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। একদা শৈশবে ময়মনসিংহের ত্রিশাল, কাজীরশিমলা ও দরিরামপুরে কিছুকাল অতিবাহিত করেছিলেন নজরুল। এমনও হতে পারে সেই শৈশব ও কৈশোর স্মৃতি উত্তরকালে তাঁর সাহিত্যরচনায় প্রভাব ফেলেছে। লাঞ্ছিত সবুর আকন্দের দুরবস্থায় ক্ষিপ্ত নূরজাহানের উচ্চারণ,

আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেভার ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন। আমি পোলা অইলে এই দুন্ একচ্টকনা দিতাম রুস্তম্যাহর আর উই ইবলিশা পোলোপানেরে যে, ঐ হ্যানে পইর্‌য়া যাইত উৎকা মাইর্‌য়া। উইঠ্যা আর দানাপানি খাইবার অইত না।

নজরুলের প্রথম পর্যায়ের গল্পে আবেগের যে-তারল্য, ভাবালুতার যে-উচ্ছ্বাস, 'শিউলিমালা' পর্যায়ে তা' অনেকটাই পরিণত, সংহত ও পরিমার্জিত। এ-পর্বে ভাষায় আবেগই কেবল সঙ্কুচিত হয়নি, এক সূক্ষ্ম কৌতুক ও হাস্যরস ভাষাকে দিয়েছে বর্ণাঢ্যতা। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি লক্ষণীয়,

বীররামপুর গ্রামের আলি নসীব মিঞার সকল দিক দিয়েই আলি নসীব। বাড়ি, গাড়ি ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য। ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারী তিনি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁঠাল-কোয়ার মত টক্‌টকে রং। আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র।

'শিউলিমালা' পর্যায়ে নজরুলের গদ্যে এসেছে এক নতুনতর পরিমিতি ও ব্যঞ্জনা। পুঞ্জীভূত আবেগের প্রকাশে নজরুল গভীর দ্যোতনামণ্ডিত শব্দচয়ন করেছেন–এতে চরিত্রের মনোভাব ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। 'শিউলিমালা' গল্প থেকে,

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল। মনে হল আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত ক'রে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

নজরুলীয় গদ্যের অনন্যতা এর অসাধারণ গতি ও প্রবহমানতায়। নজরুল তাঁর অনায়াস নৈপুণ্যে চলিত শব্দ ও তৎসম শব্দের এক ব্যঞ্জনাময় সমীকরণ ঘটিয়েছেন। নজরুল-কাব্যের ধাবমান চাঞ্চল্য তাঁর গদ্যেও সমানভাবে স্বতশ্চল। তাঁর গদ্য স্থানু নয়, নিরন্তর চলিষ্ণু। ওজোধর্মী তৎসম শব্দ চলিত শব্দের মতোই সঞ্চরণশীল। একটি দৃষ্টান্ত,

পরী নববধূর বেশে এসে যখন আমার পা ছুঁয়ে সালাম করলে, তখন বরষার স্রোতস্বিনীর চেয়েও দুর্বার অশ্রুর বন্যা তার চোখ দিয়ে গলে পড়ছে। মুহূর্তের জন্যে দুর্জয় একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে আমার বুকটা যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। প্রাণপণে আমি আমার অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত স্বরকে সহজ সরল করে তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধ-সজল কণ্ঠে বললুম, 'চির আয়ুষ্মতী হও। সুখী হও'।

('ঘুমের ঘোরে' ব্যথার দান)

নজরুলের গল্পে উপমা-অলঙ্কার, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির সাবলীল ব্যবহার তাঁর গদ্যরচনার বিশিষ্টতার দ্যোতক। উপমা-উৎপ্রেক্ষার যাদুকরী স্পর্শে তাঁর গল্পের শরীর হয়েছে চারুময়। নজরুলের গল্প থেকে অলঙ্কারের একগুচ্ছ হিরণ্য দৃষ্টান্ত,

ক) আদরিণী অভিমানী বধূর মত সন্ধ্যা তার মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা আঁধার করে তুলছিল। ('মেহের নেগার' রিক্তের বেদন)

খ) যদি কোন ব্যথাতুর একটি পল্লী হতে আর একটি পল্লীতে যেতে এমনি সাঁঝে একা শূন্য মাঠের সরু রাস্তা ধরে চলতে থাকে, আর তার সামনে এক টুকরো টাটকা কাটা-কলজের মতো এই সন্ধ্যাতারাটি ফুটে ওঠে, তবে সেই বুঝবে কত বুক-ফাটা ব্যথা সে-সময় তার মনে হ'য়ে তাকে নিপীড়িত করতে থাকে। ('অতৃপ্ত কামনা' ব্যথার দান)

গ) ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া- যত ভালবাসা, তত ভয়। ('শিউলিমালা' শিউলিমালা)

ঘ) সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেলল। ('অগ্নি-গিরি' শিউলিমালা)

বাহ্য প্রকৃতিলোক থেকেই নজরুল মূলত উপমা-উৎস গ্রহণ করেছেন। তাঁর উপমানচিত্র প্রথাসিদ্ধ হলেও প্রয়োগের স্বতোস্ফূর্ততায় তা' চিত্তগ্রাহী।

ছোটগল্পের ভাষানির্মাণে নজরুল কদাচিৎ দ্রুততা-আক্রান্ত এবং শব্দ প্রয়োগে কখনো কখনো শিল্প-অমনোযোগী হয়ে উঠেছেন। উচ্চাঙ্গের ভাব ও শব্দ সমন্বয়ে রচিত বাক্যে নজরুল মাঝে মাঝে এমন চটুল অশৈল্পিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন যার ফলে সমস্ত বাক্যের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়েছে। যেমন,

> ..... আমরা সমাজ আর ধর্মের অন্তর্নির্হিত আদত সত্যকে উপেক্ষা ক'রে তাদের বাইরের খোলসটাকে আঁকড়ে ধরে মনে করি, আমাদের মত সত্যবিশ্বাসী আর নেই। আমাদের এ অন্ধবিশ্বাস যে মিথ্যা, তা সব চেয়ে বেশী ক'রে জানি আমরা নিজেরাই। তবু সেটা আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না, উল্টো হাজার 'ফসচঅ'-এর দলিল নজির পেশ করব। ('ঘুমের ঘোরে' ব্যথার দান)

নজরুলের প্রচন্ড আবেগময় রোমান্টিক কালপর্বের সৃষ্টি তাঁর ছোটগল্প। যৌবনের আতশী উত্তাপে নজরুল ছিলেন সকল বন্ধনহীন। তিনি যখন ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হন বাংলা ছোটগল্প তখন গঠন-পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথের অবিনাশী প্রতিভায় রচিত হয়েছে ছোটগল্পের আদর্শ। মুসলিম লেখকদের মধ্যে নজরুলই প্রথম গল্পরচনায় অগ্রসর হন। সুতরাং প্রথম শৈল্পিক প্রয়াস হিসেবে নজরুলের গল্পে রয়েছে আবেগোচ্ছ্বাস, বাগ্‌বাহুল্য, রয়েছে অনভিজ্ঞের স্পর্শ। ছোটগল্প হিসেবে তাই নজরুলের গল্পগুলি শিল্পসংহত হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া সদ্য সৈনিক জীবনের উদ্দাম স্মৃতিময় অনুষঙ্গ গল্প লেখক হিসেবে তাঁর আবেগ-উৎসে যুগিয়েছে প্রেরণা ও প্রবর্তনা। নজরুল চৈতন্যগত দিক থেকে ছিলেন গীতিধর্মী, প্রবল রোমাণ্টিক। নজরুলের গল্পগুলি তাঁর নিবন্ধন ভাবময়তার রূপকল্প। ছোটগল্প লেখক হিসেবে নজরুল বাংলা সাহিত্যে কোন স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করতে পারেননি বটে, কিন্তু স্বল্পসংখ্যক গল্পের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর আত্মপ্রকৃতি ও প্রতিকৃতি।

তথ্য-নির্দেশ ঃ

১. বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা, মাঘ ১৩২৯,ইং ১৯২৩

২. নজরুল-চরিতমানস: ড: সুশীল কুমার গুপ্ত, পৃ; ২৫১, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৭

৩. নজরুল-সমীক্ষণ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত , নজরুলের ছোটগল্প : আতোয়ার রহমান, পৃ: ২৯২ প্রথম প্রকাশ ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯।

সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — বিংশ সংকলন ।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নজরুল-চেতনা

মাসুমা খানম

নজরুলের চিন্তা-চেতনায় নারীর অনুষঙ্গ বরাবরই যুক্ত ছিল। বাঙালি সমাজ-পরিবেশে নারীর পশ্চাৎপদতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নজরুল যেমন নিজে তাঁর জীবনে ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে উঠে নারীত্বের মহিমাকে শ্রদ্ধা করেছেন তেমনই সাহিত্যেও তাঁর নারীরা হয়ে উঠেছে মুক্ত জীবনসন্ধানী। বস্তুতপক্ষে বাঙালির পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির দ্যোতনা তাঁর চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল। এই পরাধীন পুরুষজাতির অথঃ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীরও বন্ধনমুক্তির প্রসঙ্গ তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে তাঁকে যেমন ঘোষণা করতে হয়েছে 'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর। অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'।[১] তেমনই এই যুক্তির সঙ্গে নারীর জাগরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অগ্রগামী হওয়ার আহ্বানেও তাঁর কণ্ঠ উচ্চকিত, 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা'।[২]

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিসরের সবদিক থেকেই নারীসমাজ আজ অবহেলিত। যুগ যুগ ধরে এ অবস্থা বিরাজমান। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্মের সময়ে আরব দেশে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা হ'ত। ইসলামের প্রসার ও প্রচারের মাধ্যমে এহেন কার্যের অবসান ঘটলেও পর্দা, অবরোধ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ব্যবস্থা তিরোহিত হয়নি। নজরুল তাঁর জীবন ও কর্মসাধনার মাধ্যমে অবহেলিত নারীর সামাজিক মর্যাদা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় তাদের অধিকার নিয়ে নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। মুসলিম নারীদের পর্দা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার সংগ্রামের প্রসঙ্গ আমরা অনেকেই জানি। কাজী নজরুল ইসলাম নারীদের ভিন্ন চোখে দেখে শিক্ষা-সভ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে তাদের সামনে সকল অর্গল উঠানোর বিরোধিতা করেছেন। ১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি অবরোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন,

> ইসলামের প্রথম উষার ক্ষণে, সুবহ-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তিরূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিণী হয়েছিলেন—যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে—তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে সকল আনন্দের, সকল

> খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভকাজ, কল্যাণ উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার। তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা—যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম জগতের মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন পথের দুরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্পপেলব।[৩]

ইসলামে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। শাস্ত্রে অধিকারের ফরমান নির্দিষ্ট থাকলেও মোল্লা-পুরুতের দল বাস্তব জীবনে তা কার্যকর হতে দেয় না। মোল্লাতন্ত্রের দ্বারাই নারী অবরোধের অর্গল কিভাবে বিস্তৃত হয় এবং তা কত দূর ভয়াবহ সে সম্পর্কেও নারী দরদী কবি বলেছেন, 'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল।—আমাদের বাঙলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।'[৪] নারীর অবরোধ ও অধিকার হরণের হোতা পুরুষ সমাজ। কিন্তু এই সামাজিক রীতি অশিক্ষিত রমণীদের মধ্যে কখনো কখনো মহাসত্যের জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়েছে। নারীদের কেউ কেউ এটাকেই তাদের জীবনসত্যের নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করে। নজরুলের সঙ্গে তৎকালীন বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক ও রাজনীতিক হবীবুল্লাহ বাহারের সখ্যতা ছিল। তাঁর ছোট বোন শামসুন্নাহার মাহমুদকেও সমধিক স্নেহ করতেন নজরুল। চট্টগ্রামে কবি নাহার-বাহারদের বাড়িতে অবস্থান করলেও কড়া পর্দার কারণে তিনি সেই সময়ের শামসুন্নাহারের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। ১৯২৬ সালের ১১ই আগস্ট শামসুন্নাহার মাহমুদকে লেখা নজরুলের একটি পত্রে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। এই পত্রে কবি কড়া পর্দার ব্যবহারে নারীদেরও যে সদিচ্ছা রয়েছে তাও তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,

> আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির তাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বার হাত লম্বা আট হাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বারে বারে প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা।[৫]

শুধু চিঠিতেই নজরুলের এই অবরোধ ও পর্দা সম্পর্কিত ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকেনি। নানা সভা সমাবেশেও তিনি নারীদের এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। পর্দার জুজুবুড়িতে নারীদের পেয়ে বসবার প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর ভাষ্য, 'এই জুজুবুড়ির

বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে।'[৬] কাজেই যারা শৃঙ্খলিত হয় তাদের মধ্যে যদি শৃঙ্খল অপনোদনের অভিলাষ না থাকে, তাহলে শৃঙ্খলমুক্তি অসম্ভব। পুঁজিবাদী বিশ্বের নিয়ম হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা। পুঁজিতন্ত্র সব সময়ই একে অপরকে ঠকিয়ে শোষণ লিপ্সা বিস্তার করে ব্যক্তিসাফল্য অর্জনের মন্ত্রণা দেয়। এ সমাজে কে বন্ধু কে শত্রু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে কিভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখা যায় সেই কৌশল। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমরা যাদের শৃঙ্খলিত হতে দেখি, শোষণ-বঞ্চনায় সেই পুরুষও একই সঙ্গে বঞ্চিত নারীকে আলাদাভাবে শোষণ করে। কাজেই সামগ্রিকভাবে শোষণবন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করতে চাইলে নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে বলে নজরুল মনে করেছেন।

নারীদের জন্য পর্দা ও অবরোধের কঠোরতা থাকার ফলে অন্যতম মৌলিক চাহিদা শিক্ষাও বিপন্ন হয়। সে যুগের বিদুষী মুসলিম মহিলা ফজিলাতুন্নেসা মুসলিম নারীর অধোগতি ও শোষণ বঞ্চনার কারণ হিসেবে অশিক্ষাকে চিহ্নিত করেছিলেন। পুরুষের অবরোধ আরোপের পথকে সুগম করেছে নারীর অশিক্ষা। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেনঃ 'সমস্ত নারী মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধ করবার যে প্রধান অস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞান, তাই তাদের নাই— আছে কেবল দারুণ একটা আত্মগ্লানি, মর্মভেদী একটা অনুশোচনা, আর সর্ব্বোপরি মুক্তির জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা। পাপীর অনুতাপই যেরূপ তার পাপকে আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ ও খাঁটি করে তোলে, সেইরূপ নারীর এই আত্মগ্লানিই তাকে মনুষ্য পদবাচ্য করে তুলবে। এর জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক শিক্ষা'।[৭] সমকালীন মুসলিম নারী সমাজের বেদনা ও বিড়ম্বনা নজরুল মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। নারীকে অবরুদ্ধ করে তাদের যেভাবে হীনমন্যতার গহ্বরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে সেখানে অশিক্ষার অন্ধকার সহজেই বিস্তার লাভ করবেই। নজরুল নারী শিক্ষার গুরুত্ব যথার্থভাবেই উপলব্ধি করে বলেছেন,

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন-এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথমে বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে।[৮]

সমকালে মুসলিম নারীর শিক্ষা বিস্তারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন বেগম রোকেয়া। গোঁড়া মুসলমান সমাজ মহীয়সী রোকেয়ার সে ভূমিকা ভাল চোখে দেখেনি। এ বিষয়েও আফসোস করে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে নজরুল লিখেছেন,

> অভিভাবক যিনিই হন তোমার, তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি

> বলেই মনে হল। তোমায় যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্য। এও হয়তো সেই কারণেই । মিসেস আর. এস. হোসেনের মত অভিভাবিকা পাওয়া অতি বড় ভাগ্যের কথা। তাঁকেও যখন তাঁরা স্বীকার করে নিতে পারলেন না, তখন তোমার কী হবে পড়ার, তা আমি ভাবতে পারি না।[৯]

এ সমস্ত মন্তব্য থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয় যে, কবি কাজী নজরুল ইসলাম আন্তরিকভাবেই সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে নারীর অবরোধ অপনোদন এবং শিক্ষার আলোকে তাদের বিভূষিত হবার পক্ষে ছিলেন।

নজরুল নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলমুক্তির জন্য কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'সন্ধ্যা প্রদীপ' নামে নারীদের জন্য একটি বিভাগ ছিল। নারী সমাজ তাদের সার্বিক মুক্তির কথা অকপটে এখানে লিখতে পারতেন। এখানে নারীর শিক্ষা, অধিকার, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ এবং যুগ-সভ্যতার এগিয়ে আসবার ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীন মতামত, এমনকি বিতর্কও সন্নিবদ্ধ করেছিলেন নজরুল। 'ধূমকেতু'র দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সন্ধ্যা প্রদীপ' বিভাগে প্রকাশিত জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ভূতের মুখে রাম নাম' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কমলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নারী বাঘিনী' প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। শুধু লেখক নয়– পুরুষের কাতারে দাঁড়িয়ে সমানভাবে কার্য সম্পাদনে নারীরা যে অসমর্থ তা কমলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়েরও লেখায় ফুটে ওঠে। এর প্রতিবাদে মিসেস এম. রহমান, শৈলবালা ঘোষজায়াসহ আরো অনেকে লেখনী সঞ্চালন করেন। 'সন্ধ্যা-প্রদীপে' নারীর মুক্তি ও অধিকারের পক্ষে-বিপক্ষে নারীদেরই লেখার উৎসারণ ঘটে। একজন গবেষক বলেছেন, 'অভিযোগ, অনুযোগ, উত্তর-প্রত্যুত্তর, দাবী এবং বিদ্রোহ নিয়ে আরো অনেক লেখা 'ধূমকেতু' তে পত্রস্থ হয়। সব রচনাই মহিলাদের। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে বিন্দুবাসিনী রায়, চঞ্চলা দেবী, মহামায়া দেবী, চারুশীলা মিত্র এবং আরো অনেকেই এই বাক্‌যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম নারী সমাজের মুখপাত্ররূপে একমাত্র মিসেস এম. রহমানের পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ....ধূমকেতুর সকল লেখিকার মধ্যে তারই কণ্ঠ প্রতিবাদে, দাবীতে বিদ্রোহী, তিক্ততায় সর্বাধিক উদ্দীপ্ত ও জ্বালাময়ী।[১০] ধূমকেতুর এই নারীবিভাগে নজরুল নারীদের মতামত প্রকাশে এমনই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, শালীনতার মধ্যে তাঁরা যে কোন মতামত প্রকাশ করতে পারত। মিসেস এম. রহমান একটি প্রবন্ধে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন,

> আজ যুগের পুঞ্জীভূত অপমান শুধু বাঘিনী নয়, ঘৃণিনীও করেছে আমাদিগকে। রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অপমানকারীদের হৃদয়ের রক্ত পান করে শরম বেদনার উপশম করবো, দলিতা ফণিনীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদগার করে, দংশনে দংশনে তাদিগকে জর্জরিত করে তীব্র অপমানের জ্বালা ভুলবো।[১১]

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবস্থানকে সুদৃঢ়

করতে চেয়েছিলেন। অবরোধ ও আবরণের বোঝা তুচ্ছ করে তারা সংস্কৃতির স্পর্শে উজ্জীবিত হোক এটাই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। ধূমকেতুর 'সন্ধ্যা প্রদীপে' নারীদের মতামত ছাড়াও মুক্তিসন্ধানী কবিতাও পত্রস্থ করেছেন। এখানে প্রকাশিত মুক্তি সন্ধানী নারীর 'বোনের দাবী' নজরুলের অকৃত্রিম প্রেরণারই নামান্তর,

মনের জাগ
মুক্তি মাগ
চায় কে দান?
প্রাপ্য চাই।
প্রাণ খুলেই
দিল মেলেই
গাইতে গান
চাইরে চাই
এই আলোয়
এই হাওয়ায়
ধুইয়া লই
পরাণ মন।
স্বাধীনতাই
চাই গো চাই
স্বাধীনতাই
শ্রেষ্ঠ ধন।[১২]

বেগম সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া'র সমালোচনা করতে গিয়েও নজরুল স্বীকার করেছেন তার নিজের প্রেরণা জ্ঞাপনের কথা। কবির ভাষ্য, 'কল্যাণীয়া কবি সুফিয়া এন্ হোসেন তখন হেরেমের বন্দিনী বালিকা। তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু সৈয়দ নেহাল হোসেন সাহেব আমায় কয়েকটি কবিতা দেখতে দিলেন। আমার বিশ্বাস হলো না যে সে কবিতা কোন মুসলিম বালিকার লেখা। আমারই উৎসাহ ও অনুরোধে বোরকা নেকাবের অন্ধস্তূপ থেকে সেই কবিতার মুকুলগুলি সলজ্জ শঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করল।[১৩] কাজেই আমরা বলতে পারি কাজী নজরুল ইসলাম সমকালীন জীবন ও সমাজের পরিবৃত্তে নারীদের যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই তাদেরকে গৃহকোণে, পরিবার-শৃঙ্খলে পরিবদ্ধ রাখতে চাননি। নারীর স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক অনুধ্যান নজরুল-মানসে বরাবরই সমুন্নত ছিল।

দুই

নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম পর্যায়েই নারীর অধিকার ও সমস্যাবলীর উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। তাঁর কাছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীশোষণের বিচিত্র কৌশল ধরা পড়েছে। নজরুল তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা' উৎসর্গ করেছিলেন 'ভাঙা-বাঙলার

রাঙা যুগের অনাদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে'। তৃতীয় কাব্য 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) উৎসর্গ করেছেন 'বাঙলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা কুল গৌরব... মিসেস এম, রহমানকে'। নজরুল তাঁকে নাগমাতা হিসেবে চিহ্নিত করে 'ধূমকেতু' পর্যায়ে তাঁর অবিসংবাদী ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেছেন,

কোথা সে অন্ধ অতল পাতাল বন্ধ গুহার তলে,
নির্জীত তব ফণা নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে,
পাতাল প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা–ক্রন্দন চুর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ চিক্কুর।
আঁধার পীড়িত রোষ-দোদুল সে তব ফণা ছায়া-দোল
হানিছে গৃহীরে অশুভ শঙ্কা, কাঁপে-ভয়ে সুখ-কোল।
ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধাপ্রণত রথের অশ্বদল।
ধুমকেতু ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু ফণী
উল্লাসে "জয় জয় নাগমাতা" হাঁকিল জয় ধ্বনি।[১৪]

নজরুল জীবনেও মিসেস এম. রহমানের (১৮৮৪-১৯২৬) ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'কবির নাগমাতা মিসেস এম. রহমান কবির প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন। হিন্দু কন্যা বিবাহের বাধা যে কয়েকজন ব্যক্তির আগ্রহে স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, তিনি তাঁদের অন্যতম প্রধানা'।[১৫] এ প্রসঙ্গে কবি আব্দুল কাদিরও বলেছেন, '১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১২ই বৈশাখ মোতাবেক ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল শুক্রবার জুম্মার পরে শ্রদ্ধেয়া প্রমীলার সঙ্গে নজরুল পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ৬ নং হাজী লেনের বাড়ীর একটি কক্ষে। 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িত্রী মিসেস এম. রহমান সাহেবার উদ্যোগেই বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়'।[১৬] নজরুলের সমকালে নারী সমাজের মুক্তির লক্ষ্যে যাঁরা একনিষ্ঠভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে কাজ করেছিলেন মিসেস এম. রহমান, বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ। নজরুল তাদের সঙ্গে শুধু চিন্তা চেতনাতেই একাত্ম ছিলেন না কর্মপ্রেরণায়ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কারণে 'বিষের বাঁশী' প্রকাশের পর তাঁর 'সাম্যবাদী' (ডিসেম্বর ১৯২৫) ও 'সর্বহারা' (অক্টোবর ১৯২৬) প্রকাশিত হলে সেখানে তাঁর নারীজাগরণের পূর্ণচেতনা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। 'সাম্যবাদী' কাব্যের 'নারী' কবিতায় নজরুল যে বিষয়টির প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেটা হচ্ছে, সমানাধিকারের প্রসঙ্গ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কখনো কখনো মৌখিকভাবে নারীপুরুষের সমানাধিকারের ব্যাপারটি স্বীকার করা হলেও কার্যত তা থেকে যায় অপাংক্তেয়। নজরুল 'নারী' কবিতায় ঘোষণা করলেন,

সাম্যের গান গাই,
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।[১৭]

নজরুল দেখেছেন পৃথিবীর সকল কাজেই নারীর অংশীদারিত্ব রয়েছে। সমাজের চাকা পুরুষ একাই ঘোরায় নি, সেখানে সতত প্রয়োজন হয়েছে নারীর প্রেরণা আর দোসরতা। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন জগৎ বিখ্যাত তাজমহলের। সম্রাট সাজাহান যাঁর অন্তরের প্রেমবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সহস্র সহস্র শ্রমের কাঠিন্যে নির্মাণ করলেন শ্বেতমর্মরের স্মৃতিসৌধ, তিনি হচ্ছেন একজন নারী। এমন কি পৃথিবীর যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজয় কেবল বীরের শক্তিমত্তায় সংঘটিত হয়নি, সেখানেও প্রয়োজন হয়েছে নারীর অনুপ্রেরণা,

কোনকালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।[১৮]

অথচ নারীর সে মহিমা স্বীকার করা হয় না। রচিত হয় না তার যথাযোগ্য ইতিহাস,

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল, সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?[১৯]

নারীর কাছ থেকে এত প্রেরণা এত সাহচর্য জগতের জীবনধারার ছন্দ গ্রহণ করেও পুরুষজাতি যুগ যুগ ধরে তাদের নানা কায়দায় নানা কৌশলে কোনঠাঁসা করে রেখেছে। অবরুদ্ধ করেছে তার সত্তাকে হরণ করেছে স্বাধীনতা। তাই খোদার মুক্ত বিশ্বে নজরুলের মনে হয়েছে 'পুরুষ আজ জালিম নারী আজ মজলুম'।[২০] সেই উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে বাঙালি চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থে ঘোষণা করেছিলেন, 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী, যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত'।[২১] কিন্তু এদেশে সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদী সভ্যতার সমস্ত বলয়ে নারীরা বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশে যে পরিমাণ স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপ বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্ব প্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।... এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে।

এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তি, অন্যত্র তত নহে'।[২২] নজরুলও লক্ষ্য করেছেন শোষিত পুরুষজাতি যে সময়ে বুর্জোয়া শোষকের দ্বারা শোষিত হচ্ছে সেই সময়ে তাদের সঙ্গে নারীরাও নানাভাবে মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বুর্জোয়া কর্তৃক দরিদ্র বঞ্চনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। কবি নজরুল নানাবিধ মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত নারীসমাজের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন,

ক. গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি পায়ে দলা কাদা মাখা কুসুম
বক্ষে লইয়া কাঁদিছে মা চক্ষে পিতার নাহি ক'ঘুম।
শিয়রের দীপে তৈল নাই পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
"দেখিতে পাইনা মা তোর মুখ বাবা কোথা বল লাগিছে ভয়"।
মাঠের ফসল, কাজলা মেঘ স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বাপ,
মর মর পুত্রেরে বাঁচায় মার মমতায় উষ্ণ তাপ।[২৩]

খ. প্যাঁট্‌রা-ভরা কাপড় তোমার, এরা মরে শীতে,
সারাটি রাত মায়ে-পোয়ে শুয়ে ছাঁচ-গলিতে।
তোমরা ছেলের চুমো খেয়ে হাস কতই -সুখে
এদের মা'রা কাঁদেই শুধু ধরে এদের বুকে।

তোমাদের সব খোকাখুকির খেলনার অন্ত নাই,
খেলনা ত মা ফেলনা এদের মায়ের মুখে ছাই।[২৪]

অথচ নারীদের অবরোধ ও শোষণের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র নেই। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে যে নিয়মনীতি, অনুশাসন প্রচলিত হয়ে আসছে একজন বঞ্চিত-শোষণপিষ্ট পুরুষ ও তার নারীদের ক্ষেত্রে একই অবরোধ, একই পর্দার শৃঙ্খল তুলে ধরেছে। এ কারণে বাঙালি সমাজে নারী শোষণের দু'ধরনের কৌশল আরোপিত হচ্ছে। এক. বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা কর্তৃক দরিদ্র নিষ্পেষণের যাঁতাকলে পুরুষের সঙ্গে নারীরা নানা অভাব-বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। দুই. বঞ্চিত নারী বঞ্চিত পুরুষ দ্বারাও নিগৃহীত-লাঞ্ছিত হচ্ছে। অর্থাৎ নারীদের লাঞ্ছনা ঘরে ও বাইরে সমান। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় নারীদের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মনীষী কার্ল মার্কস উনিশ শতকে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজে নারীত্বের অবমূল্যায়ন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বুর্জোয়ারা নিজেদের স্ত্রীদের নিছক উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবেই দেখে থাকে'।[২৫] তিনি আরও বলেছেন, 'মামুলি বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, তাদের মজুরদের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যবহারের ক্ষমতা পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুসলে নেওয়াতেও তাদের পরম আনন্দ। বুর্জোয়া বিবাহ আসলে অনেকে মিলে সাধারণের স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা'[২৬] অর্থাৎ পুঁজিবাদ সব কিছুকে যেমন পণ্যে পরিণত করে—সব কিছুর মধ্যেই যেমন অর্থের সদর্থকতা খোঁজে, তেমনই নারীদেরও মানবিক মহিমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করে না। ফলে এ সমাজে নারীত্বের বিপর্যয়

অবধারিত। নজরুল বিপর্যস্ত নারীর অবমাননা সম্পর্কে তাঁর 'রুদ্র মঙ্গল' (১৯২৭) গ্রন্থে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে অবহেলিত নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাবের চিত্র অঙ্কন করেছেন,

> মারামারি চলিতেছে। উহারি মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিণী তাহার সদ্য প্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিণী বলিল, "বাছাইকে আমার একটু দুধ দিতে পারছিনা বাবু। এইমাত্র এসেছে বাছা আমার! আমার বুকে একফোঁটা দুধ নেই।" তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব-জননী কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়া বিদ্রুপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা,! এই তা চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই।"
>
> ভিখারিণী নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটার দিকে। সে কি দৃষ্টি! চোখ দুটো তার যেন তারার মত জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল হতভাগিনী নারীর জিজ্ঞাসা। এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে তাহারই দিকে যে তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, "পেটের ক্ষুধা এত প্রচন্ড বলিয়াই ত দেহ বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয়"।[২৮]

নজরুল তাঁর সাম্যবাদী কাব্যে 'বারাঙ্গনা' কবিতাটিও অনুরূপ একটি ঘটনার বশবর্তী হয়ে রচনা করেছিলেন। শোনা যায় হ্যারিসন রোডের একটি রেস্তোরায় কবি বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিতেন। সেই রেস্তোরার পাশের রাস্তায় অগণিত ভিখিরির মধ্যে বসে একটি যুবতী নারী কোলে ছেলে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে ভিক্ষে করত মুখে কিছু বলত না, হাত পেতে বসে থাকত। তার আচরণ দেখে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই মনে হত। পথ চলতি লোকেরা ভিক্ষার বদলে বহু স্থূল রসিকতা তার প্রতি ছুঁড়ে মারত। শালীনতাহীন আচরণ ও অভদ্র উক্তির জন্য নজরুল মনে মনে ব্যথা পেতেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই তিনি 'বারাঙ্গনা' কবিতা লিখেছিলেন২৮ এবং নারীত্বের অবমাননার জন্য বদ্ধমূল বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। নজরুল যুক্তি দিয়ে বলেছেন,

> শোন মানুষের বাণী,
> জনমের পর মানব জাতির থাকে না ক' কোন গ্লানি।
> পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
> শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ন দেবত্ব দেবতার।
> অহল্যা যদি মুক্তি লভে, মা মেরী হতে পারে দেবী।
> তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমলা সত্য সেবি?[২৯]

নজরুল বারাঙ্গনাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে তাদের নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা

সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। গোঁড়া ধর্মের চেলা যারা বিপর্যস্ত নারীদের অভাব-বঞ্চনার কোন সমাধান করতে পারে না, কেবল তিরস্কার ও বিদ্রূপ ছাড়া, তাদেরকেও কামনাদুষ্ট পুরুষের হীনতার কথা জানিয়ে দিয়ে বলেছেন,

সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত?
শুন ধর্মের চাঁই–
জারজ কামজ সন্তান দেখি কোন যে প্রভেদ নাই।
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়?[৩০]

নারীসমাজের উপরে ক্রমাগত অবরোধ ও স্বাতন্ত্র্য হরণের দুঃশাসনযজ্ঞে তারা নেপথ্যচারী হতে বাধ্য হয়। অনেক সময় নিজেকে দাসীসত্তার বাইরে ভাবতে পারে না। তাদের সতীত্ব, পতিব্রাত্য সবই অলঙ্ঘনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপমহাদেশে নারীদের অবরোধ সম্পর্কে বলেছেন,

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী, যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ, দেবতা স্বরূপ কেন? সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে পত্নীদিগের আদর্শ স্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।[৩১]

কাজি নজরুল ইসলামও স্বীকার করেছেন অবরুদ্ধতার জন্য রমণীরা আত্মমুখী, পশ্চাৎকণ্ঠ আর ভীরু হয়ে থাকে,

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষ পুরীতে নারী
করিল তোমায় বন্দিনী, বল, কোন সে অত্যাচারী?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা।[৩২]

নারীজাগরণের অন্যতম অগ্রদূতী মিসেস এম. রহমানও উপলব্ধি করেছিলেন পুরুষজাতি আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই নারীদের বন্দিনী করে রাখে হেরেমের চার দেয়ালের মাঝে। এখানে লোভী পুরুষের পাশব প্রবৃত্তির অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই যুক্ত থাকে না। নজরুল তাঁর নাগ-মাতা মিসেস এম. রহমানের জবানিতে বলেছেন ,

নারীদের এই বাঁদি করে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে,
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান বাজে।
আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য কালের নারী,
করিছে পুরুষ জেল দারোগার কামনার তাবেদারী।[৩৩]

যাঁরা কোরান, হাদিস, ফেকার বরাত দিয়ে নারীদের সভ্যতার আলোক থেকে দূরে রাখতে চায় তাঁদেরকে মিসেস এম. রহমান ব্যবসায়ী বলেছেন। এই ব্যবসায়ী শাস্ত্রানুসারীরা নিজেদের সুবিধাবাদকে অটুট রাখার জন্যই সুবিধামত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

করে থাকে। নজরুলের ভাষ্য,

বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারো মাস?
হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী
মানেনাক তারা কোরানের বাণী-সমান নর ও নারী।
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে
নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ্‌ যত চোরে।[৩৪]

নজরুল তার কাব্যসাধনার অন্তর্লোকে এ সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার অপনোদন করতে হলে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের বিকল্প নেই। তিনি তাঁর নিজের বিদ্রোহী সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। এক সময় ব্রিটিশ জাতি উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রদান করে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। পুরুষের তাবেদারিতে মুহ্যমান নারীদের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির জন্য তিনি নারীদেরও বিদ্রোহ করতে বলেছেন। বর্তমান যুগ সভ্যতার পুরনো মূল্যবোধে আঁকড়ে থেকে ললাটে দাসীর চিহ্ন পরিধানের মধ্যে কোনই তৃপ্তি নেই। কাজেই সুস্থ জীবনচেতনার পরিবাহী হয়ে নারীসমাজকে সামনে এগিয়ে আসার জন্য কবির বজ্রদীপ্ত একান্ত আহ্বান,

ক. চোখে চোখে আজ চাহিতে পারনা, হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ! [৩৫]

খ. ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় না পাতাল ফুঁড়ি,
আঁধারে তোমার পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি।
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ তলে দলিত যমের সাথে।
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূটবিষ দিতে হবে।[৩৬]

নজরুল নারীজাতিকে অধিকার সচেতন হবার আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। এ ক্ষেত্রে পুরুষজাতিকে যুগ যুগান্তের বদ্ধমূল ধারণা আর নারীশাসনের মনোভাব পরিত্যাগের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। নারীকে দাসীরূপে ব্যবহার হয়তো পুরনো যুগের ফসল। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত পুরুষদের নারীশোষণ ও দাসীত্ব-শৃঙ্খল পরানো মনোভাবের পোষকতা করা, ঠিক নয়। নজরুল এই মনোভাবের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন,

সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী।

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।[৩৭]

শুধু যুগের দাবিই নয়, মানবতাবাদী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যাবে যে, পরপীড়ন অন্যায় ও গর্হিত। পুরুষজাতি যেভাবে নারীদের উপরে অত্যাচার নিপীড়ন চালায় হয়তো কালের ধর্মে তা উল্টে গিয়ে তা নিজেদের ঘাড়েই পড়বে। বিদগ্ধ কবি ভবিষ্যতের এই আশঙ্কা উপলব্ধি করে পুরুষদের চেতনাদীপ্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন,

নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।
শোনো মর্ত্যের জীব।
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লিব।[৩৮]

এ ছাড়াও তাঁর উপলব্ধি এসেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত বিনির্মাণে 'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্যলক্ষ্মী নারী' হিসেবে যারা পুরুষের পাশাপাশি অংশ নিয়েছে তাদের উপেক্ষিত রেখে এককভাবে পুরুষের অবিমিশ্র সাফল্য আসতে পারে না। ফলে তাদের উপেক্ষা এক হিসেবে দেশের ও জাতির অকল্যাণেরই নামান্তর। নজরুল পুরুষজাতিকে নারী সম্পর্কে অবহিত করাতে চেয়েছেন,

যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সেদেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়।
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তি-হীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ।
নারী অমৃতময়ী, নারীকৃপা-করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান।[৩৯]

শুধু মুক্তির দ্যোতনা দিয়ে, পুরুষকে নারীর স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যহরণে হতোদ্যম ও নিরুৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হন নি, নারীজাতির উত্থান ও বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশার বাণীও ঘোষণা করেছেন,

সেদিন সুদূর নয়,
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর জয়।[৪০]

তিন

নজরুল কথাসাহিত্যেও কাব্যের অনুরূপ নারীর স্বাধীনচিত্ততা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। রয়েছে পুরুষ কর্তৃক নারীর অবরোধ ও নানা অনুশাসন শৃঙ্খল উল্লম্ব করে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ থেকে এ জাতিকে বঞ্চিত করবার চিত্র। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিবাদমুখরতাও দুর্লক্ষ্য নয়। নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধন হারা'র (১৯২৭) কয়েকটি পত্রে বাঙালি সমাজে নারীর অধোগতি ও পুরুষ

কর্তৃক নানা অনুশাসন শৃঙ্খলে তাদের আবদ্ধ করবার কথা প্রকটিত। উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদার সঙ্গে তার প্রণয়ী মাহবুবার বিয়ে পাকাপাকি হয়ে যাবার পর সে সঙ্গোপনে উধাও হয়ে যায় এবং যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এরূপ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে মাহবুবার পিতা মারা যায়। সঙ্গতিহীন মা তার মেয়েকে নিয়ে ভাই-এর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখনেই মাহবুবার মামারা চল্লিশোর্দ্ধ বয়সী জমিদারের সঙ্গে বিয়ে দেয় তার। এর কিছুদিনের মধ্যে সে বৈধব্য বরণ করে। জীবনের উষালগ্নে এরকম আঘাত মাহবুবাকে একজন ব্যাকুল ও উৎকর্ণ সমাজসচেতন নারী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। তার চিন্তার মধ্যে ধরা পড়ে নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের নানা অসঙ্গতি। বান্ধবী সোফিয়াকে লেখা পত্র কিংবা সাহসিকাকে লেখা পত্রে মাহবুবা তার দৃষ্টিতে প্রতিভাত অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরেছে। নারীর প্রতি পুরুষের চাপিয়ে দেয়া নিগ্রহ আর পরাধীনতা সম্পর্কে তার ভাষ্য,

> আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি। আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনো— কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড। ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তকনাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসীবৃত্তিই করে আসছি, কারণ হজরত আদমের বাম পাশের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি। বাপরে বাপ। আজ সেই কথা টলবে? এসব কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে পড়ে। কোন্ কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষের পায়ের নিচে বেহেস্ত, আর সেসব কেতাব ও আইন-কানুনের রচয়িতা পুরুষ। দুনিয়ার কোন ধর্মই আমাদের মত নারী জাতিকে এতটা শ্রদ্ধা দেখায়নি, এত উচ্চ আসনও দেয়নি। কিন্তু এদেশের দেখাদেখি আমাদের রীতি নীতিও ভয়ানক সঙ্কীর্ণতা আর গোঁড়ামি ভণ্ডামিতে ভরে উঠেছে।[৪১]

নারীর ব্যক্তিত্ব, তার পছন্দ বা অপছন্দের তোয়াক্কা পুরুষজাতি কখনোই করেনা। তাই চল্লিশোর্দ্ধ বৃদ্ধের সঙ্গে মামারা যখন মাহবুবার বিয়ে ঠিক করেছে সেখানেও তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করতে হয়েছে। বিয়ে করবার অধিকার একমালিকী কারবারের মত পুরুষের একচ্ছত্র বলেই বয়সী জমিদার অল্পবয়সী পাত্রীর পানিগ্রহণে কসুর করেননি। পুরুষের ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি থাকলেই নারী শিকারে বাধা নেই। এ প্রসঙ্গে মাহবুবা বলেছে,

> আমাদের সমাজে স্ত্রী শিকারী অর্থাৎ স্বামীরা শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে শিকার করেন আমাদের। তাঁরা আমাদের দেখতে পান না বটে কিন্তু শুনতে পান। রূপের একটা অভিশাপ আছে, হেরেমের দেয়াল ডিঙাতে তার বিশেষ বেগ পেতে হয় না। প্রভাত আলোর মত, ফুলের গন্ধের মত তার খ্যাতি ঘরে -ঘরে দেশে-দেশে পুরুষের কানে গিয়ে পৌছে। কোথাও ভালো শিকার আছে শুনলেই পুরুষ ছোটেন

> সেখানে। সেই শব্দভেদী বাণের কল্যাণে তাদের হয়ে যায় শাপে বর, কিন্তু এই হতভাগিনীদের বরই হয়ে ওঠে শাপ।[৪২]

নারীদের অবরোধের পেছনে শুধু সমাজের অশিক্ষিত পুরুষেরাই যে দায়ী সেটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত পুরুষের ভূমিকা কম নয়। যারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেও মনটা মধ্যযুগীয় পরিসর থেকে সরাতে পারেননি তাদের দ্বারা নারীনিগ্রহ সংঘটিত হয়। এসব পুরুষ সম্পর্কে বাঁধনহারার মাহবুবা মূল্যায়ন করেছে,

> আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্ছেন, কিন্তু আমি একে উচ্চশিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখছেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। কেননা, এঁরা যত শিক্ষিত হচ্ছেন, ততই যেন আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেকারতের দৃষ্টিতে দেখছেন, আমাদের মেয়ে জাতের উপর দিন দিন তাঁদের রোখ চড়ে যাচ্ছে। তাঁরা মহিষের মত গোঙানি আরম্ভ করে দিলেও কোন কসুর হয় না, কিন্তু দৈবাৎ যদি, আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রচণ্ড হুঙ্কারে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার করেন।[৪৩]

এ কারণে দেখা যায় কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি নজরুল কথাসাহিত্যে দেশপ্রেমের নামে নিজেদের অভিনিবেশ যুক্ত করতে চেয়েছেন, তাঁদের দ্বারাও নারীনিগ্রহের শেষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁধানহারার নূরুল হুদা দেশ-প্রেমের বহ্নিচ্ছটায় নিজেকে আহূতি দেবার জন্য আয়োজন-সম্পন্ন বিয়ে ভণ্ডুল করে পালিয়ে গেল। একাধিক রমণীর সঙ্গে প্রেমের সম্ভাষণ ঘটালো। সেকি উপলব্ধি করেনি আয়োজন-সম্পন্ন বিয়ে ভেঙে গেলে একটি নারীর জীবনে কত রকমের নিগ্রহ নেমে আসতে পারে? নূরুল হুদার দেশোদ্ধারের জন্য অসময়ে মাহবুবাকে পিতৃহীন হতে হয়েছে। মাতাকে নিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রিত হতে হয়েছে। আশ্রিত মেয়ের সদ্‌গতি করার জন্য মামারা বৃদ্ধ জমিদারের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে। নির্বিবাদে সেই বিয়েতে সম্মতি দিয়ে অকালেই মাহবুবাকে বৈধব্যবরণ করতে হয়েছে। তাহলে নূরুল হুদার মহত্ত্ব কোথায়? বৃহৎ পরিসরে যিনি আত্মাহূতি দিতে চান তিনি কেন স্নেহকাতর প্রেমবিলাসী হয়ে নারীজীবনের ক্ষেত্রে দুর্গ্রহরূপে প্রতিভাত হবেন? নূরুল হুদার অপরাধ দেশপ্রেমিকের চোখে গৌণ কিন্তু আরেক নারী মাহবুবার মা আয়েশা এটাকে মোটেও ক্ষুদ্র করে দেখেনি। বরং সে উষ্মা এবং ক্ষোভের বহ্নি উন্মুক্ত করেই রোকিয়াকে লেখা পত্রে বলেছে,

> কিন্তু এও আমি বলে রাখলাম যে, আমি বেঁচে থাকতে যদি আমার এই মেয়ের ফের নূরুর সঙ্গে বিয়ে হতে দিই, তবে আমার জন্ম শাহ্‌জাদ মিয়া দেন নি। মাহবুবার বাবার উঁচুমন, তিনি মরণকালে তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে গিয়েছেন, কিন্তু আমি আজো তোমাদের কাউকে ক্ষমা করতে পারিও নি আর পারবোও না। এ সত্যি কথা আজ মুখ ফুটে বলে দিলাম। নূরুকে আমি বদ্ দোওয়া করবো না, সে যুদ্ধ থেকে সহি সালামতে ফিরে আসুক আমিও প্রার্থনা করছি, কিন্তু তাকে ক্ষমা করতে পারবো না, তাই বলে। যে অপমান, যে আঘাতটা আমাদের সইতে হয়েছে তা অন্য কেউ হলে এতদিনে তার হাজার গুণ বদলা নিয়ে তবে ছাড়তো।[৪৪]

নূরুল হুদা ধর্ষকামী বা Sadistic চরিত্র। 'মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ' এর প্রবক্তা নূরুল হুদা নারীপ্রেমের মাধুরিমা নিঃশেষ করে স্বদেশপ্রেমের দিকে নিমগ্ন হয়েছে। এ সব চরিত্র সেখানেও পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন হতে পারে না। সেও পারেনি বলেই অতীতের মোহ ও স্মৃতিময়তা নিয়ে পত্রালাপে রত হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা'র আনসার সাম্যবাদী। শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠিত করে তাদের সামগ্রিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য তার কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়েছে। ধনী ঘরের সন্তান হয়েও নিজেকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত রাখতে সে বরাবরই সচেষ্ট। কিন্তু যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এই দেশপ্রেমিক তার মৃত্যুপথযাত্রায় শেষ সংযম কি রক্ষা করতে পেরেছে? তার প্রাক্তন প্রেমিকা রুবি তার সেবা করার জন্য ওয়ালটেয়ারে গিয়েছিল। মৃত্যুপথযাত্রী যুবক তার আত্মসংযমের সকল গণ্ডি অতিক্রম করে রুবিকেও সহযাত্রী করেছে। আনসারের শেষ মুহূর্তের অসংযম সম্পর্কে রুবি বুঁচিকে লিখেছে, 'আমি জানতাম এ রোগের বড় শত্রু ঐ প্রবৃত্তি । নইলে, যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এ মৃত্যুক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন?'[৪৫] কুহেলিকা' (১৯৩১)-র জাহাঙ্গীর তার জন্মের ইতিহাস আবিষ্কার করে যখন জানতে পারল যে, সে জমিদারের জারজপুত্র, তখনই জমিদারির প্রতি সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রত নিয়ে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে রত হয়। কিন্তু যে নারীর প্রতি তার অনীহা, যে বাইজীর সঙ্গে তার মাতৃনাম প্রযুক্ত, সেই নারীর জাত থেকে জাহাঙ্গীর সর্বাংশে নিজেকে পরিমুক্ত রাখতে পারে নি। ভূণী তার কামনার জালে নিস্পৃষ্ট হয়েছে। জাহাঙ্গীর তার সন্ত্রাসবাদী সহকর্মী চম্পার সঙ্গে প্রেমের সম্ভাষণে রত হতেও দ্বিধা করেনি। নারীজাতি সম্পর্কে সে চম্পাকে বলেছে , 'ওদের বিশ্বাস করিনা–শ্রদ্ধা করিনা বলেই আমার অত ভয়। যাকে শ্রদ্ধা করি না, তার অসম্মান করতে আমার বাধবে না'।[৪৬] ভূণীর সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রশ্নেও জাহাঙ্গীর চম্পাকে বলেছে, 'বিয়ে করবো কিনা জানিনা চম্পা, কিন্তু তার সর্বনাশের আর কিছু বাকি রাখিনি'।[৪৭] 'ব্যথার দান' (১৯২২) এর নাম গল্পের নায়িকা বেদৌরার সতীত্ব হরণকারী সয়ফুলমুল্ক তার আত্মভাষণে বলেছিল,

'আমি সেই শয়তান, আমি সেই পাপী, যে এক দেবীকে বিপথে চালিয়েছিল।'[৪৮] এই সয়ফুলমুল্কই প্রায়শ্চিত্তের জন্য মুক্তিসেবক সৈন্যদলে যোগদান করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। স্বদেশীকর্মীর যৌনক্লেদ ও লাম্পট্যকে তিনি বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে। সন্দীপ যত বড়ই স্বদেশপ্রেমিক হোক, যতই মুক্ত জীবনচেতনার অধিকারী হোক, একটি নারীকে গ্লানির মধ্যে আপতিত করবার ক্ষেত্রে তার চাতুর্য ও লাম্পট্যকেই সে প্রসারিত করেছিল। নজরুল কথাসাহিত্যেও এই সমস্ত দেশপ্রেমিক শিক্ষিত ব্যক্তি

নারীকে পূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারেনি। শুধু দেশপ্রেমিক সৈনিকদের কথা কেন? নারীকে বিবাহসর্বস্ব জীবনের দিকে ঠেলে দিতেও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা কার্পণ্য করেনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নারীর সমস্ত পছন্দ-অপছন্দের ভার তারাই গ্রহণ করেছে। ফলে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শিক্ষিতা কন্যার অমতে কেবল পিতৃত্বের দাবিতে কন্যা রুবিকে বিয়ে দিয়েছিলেন একজন আই. সি. এস. পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জম-এর সঙ্গে। মৃত্যুক্ষুধার রুবি কোনদিন মোয়াজ্জমকে স্বামী বলে স্বীকার করেনি। বিয়ের পরে রুবির বৈধব্যদশা ঘটলেও তার পিতা তারই অমতে পুনরায় বিয়ের চেষ্টা করেছেন। 'বাঁধন হারা'র মাহবুবাও তার চল্লিশোর্ধ্ব জমিদার স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি। মাহবুবা বলেছে যে তার জমিদার স্বামীর কথা শুনে অনেকেই হয়তো সতীনের মত হিংসা করবে কিন্তু জমিদারির-পঙ্খীরাজে চড়েও তার দ্বিগ্বিজয়ের আকাঙ্খা জাগেনি। স্বামী নব নব অলংকারে বন্দনা করলেও তাতে সে প্রসন্ন হতে পারেনি।

নারীকে বিয়ের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করার নিটোল অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে নজরুলের 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পে। এ গল্পের নায়ক যখন থার্ড ক্লাসের ছাত্র তখন তার বাবা-মা বার-তের বছরের কিশোরী রাবেয়ার সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। কিন্তু নায়ক পরীক্ষা দেয়ার জন্য কলেজে গমন করলে রাবেয়া রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। গল্পের কথক ছাত্রের শোক কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে তার বাবা-মা আবারও 'সখিনা' নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কিন্তু প্রথম স্ত্রীর ভালোবাসায় উৎসলীন নায়কের দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি কোন অনুরাগ জন্মালো না। ফলে ভালোবাসা না পাবার অভিমানে সখিনাও অল্পদিনের মধ্যে পরপারে চলে যায়। গল্পের কথক যথারীতি পরীক্ষায় ফেল করলে বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে। উপমহাদেশের বিবাহব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই পুত্রের পাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব অভিভাবকরাই করে থাকেন। অনেক পরিবারেই ছেলের শিক্ষা-দীক্ষারও তোয়াক্কা করা হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পের নিরুপমা শ্বশুর-শাশুড়ির নিগ্রহের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। পুত্রবধূর মৃত্যুর পর বিশ হাজার টাকা পণে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করে মা পুত্রকে বাড়ি আসবার জন্য পত্র লিখেছে। অথচ এই বাবা-মা তাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকারই করতে চায়নি। স্ত্রীজাতিকে অলক্ষুণে ও অপয়া হিসেবে তিরস্কার করবার রেওয়াজ বাঙালি সমাজ পরিবেশে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত। 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) গ্রন্থের 'স্বামীহারা' গল্পে সমাজের নিগ্রহের শিকার হয়েছে বিধবাবধূ বেগম। বাবা-মায়ের মৃত্যুতে দরিদ্র ঘরের অনাথা বেগমের দায়িত্ব নেয় তারই সইমা। সে নিজের বি. এ. পাস ছেলে আজিজের সঙ্গে বেগমের বিয়ে দেয়। শাশুড়ি ও স্বামীর আদরে বেগমের জীবন সুখেরই হয়েছিল। কিন্তু আজিজের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। অনেকেই সহায়

সম্বলহীনা ছোট বংশের মেয়ে বেগমের ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হল। কোন কোন পড়শি বলত, 'বুনিয়াদী খান্দানে এমন একটা খটকা এও কি কখন সয়? এত বাড়াবাড়ি সইবে না সইবে না'।[৪৯] বেগমের শাশুড়ি ও স্বামী আজিজ এগুলোকে কখনো পাত্তা দিত না। কিন্তু বিয়ের বছর দুই পর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে আজিজ ও তার মা মারা যায়। এবার আত্মীয় স্বজন অনাথা বিধবানিগ্রহের সুযোগ পায়। স্বামীর লাশ কাঁধে করে যখন বাইরে আনা হল তখন তাদের একজন আত্মীয় বেগমের চুল ধরে বলেছে, 'যা শয়তানী, বেরো ঘর থেকে এখনি। তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদী খান্দানের উপর নাক চড়ান, এই সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইলো না কেউ, বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস না। আর ইচ্ছা হয় চল, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি।'[৫০] ১৯২০ এর দশকে প্রকাশিত হয়েছিল জসীম উদ্‌দীনের বিখ্যাত কবিতা 'কবর' ('কল্লোল', আষাঢ়, ১৩৩২)। এ কবিতার বৃদ্ধ চাষি বনেদি ঘর দেখে তার অতি আদরের নাতনিকে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়ে বনেদি ঘরে বধূর মর্যাদা পায়নি। নাতনির শ্বশুরকে বৃদ্ধের কসাই চামার বলে মনে হয়েছে। বৃদ্ধ শ্বশুর বাড়িতে নাতনির নিগ্রহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে'।[৫১] বৃদ্ধের নাতনির চেয়ে বেগমের নিগ্রহ আরও কদর্য, ঘৃণ্য। একটি পারিবারিক পরিসরে যখন বাইরের আত্মীয়স্বজন কিংবা প্রতিবেশীরা এসে নাক গলিয়ে অপমানকর অবস্থার সৃষ্টি করে তখন তা কদর্যতায় হয় তীব্র ও বেগবান।

নজরুলের কথাসাহিত্যে পুরুষতন্ত্রের ক্লেদ ও খবরদারির বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদের চিত্রও ফুটে উঠেছে। আমরা 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নূরুল হুদার খেয়ালি আচরণের বিরুদ্ধে মাহবুবার মা আয়েশা বেগমের ক্ষোভ ও উষ্মার কথা বলেছি। 'মৃত্যুক্ষুধা'র মেজবৌ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে। বিধবা হবার পরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে শাশুড়ির বাড়িতেই অবস্থান করছিল। অথচ আপন বোনের স্বামী ঘাসু মিয়া ওরফে ঘিয়াসুদ্দীন আহমদ তার স্ত্রীর বর্তমানেই শ্যালিকা মেজবৌকে বিয়ের জন্য পীড়াপড়ি করতে থাকে। এ অন্যায় আবদারের পক্ষে ইন্ধন যোগায় মেজ বৌ-র মা। বৌমাকে অন্যত্র ঘর করতে না দেয়ার কারণ থেকেই শাশুড়ি তার ছেলে প্যাঁকালের সঙ্গে মেজবৌ-এর বিয়ের কথা ভাবে। প্যাঁকালে ভাবীকে বিয়ে করতে রাজি না হয়ে হঠাৎ করেই নিরুদ্দিষ্ট হয়। একটি মিথ্যে অপবাদের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে প্যাঁকালে ঘরছাড়া হয়েছে ভেবেই মেজবৌ পুরুষের পৌরুষ ও সমাজের বদ্ধমূলতাকে তিরস্কার করে প্যাঁকালে সম্পর্কে বলেছে,

> এই আবার পুরুষ, বেটা ছেলে। এতবড় মিথ্যার ভয়কে সে উপেক্ষা করতে পারলো না। যে মিথ্যা কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে। সেই ঢিল কুড়িয়ে সে

> তাদের ছুঁড়ে মারতে পারলে না। অন্তত অবহেলার হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরই সামনে দিয়ে পথ চলতে পারল না। শেষে কিনা পালিয়ে গেল। হার মেনে। কাপুরুষ।[৫২]

মেজ বৌ লক্ষ্য করেছে তার সমাজ শুধু গ্লানি, তিরস্কার আর বিদ্রুপের পুরস্কার নিয়ে মানুষকে বিচার করে। দুঃখে-দুর্ভোগে এগিয়ে আসে না। অসুস্থ মেজ-বৌর চিকিৎসার জন্য খ্রিস্টান পাদরি নার্সসহ এগিয়ে আসে। যাবার সময় নার্স একটা টাকা দিয়ে যায় সেজ বৌকে বেদানার রস খাওয়ানোর জন্য। মেজ বৌ নিজেদের দারিদ্র্য ও হৃদয়হীন স্বজাতির অসহযোগিতার কথা মনে করে ধিক্কার দিয়ে বলেছে,

> কপালে এত দুক্ষুও লিখেছিলেন আল্লাহ। মেজ-বৌর যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না। শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাটা মার নিজের জাতের মুখে, গৌয়াত কুটুমের মুখে। সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়।[৫৩]

মেজ-বৌ এর এহেন মন্তব্য অন্তরসঞ্জাত। খ্রিস্টান মিশনারির মিস জোন্স এর সহানুভূতি ও সেবায় মেজবৌ সামান্য পড়ালেখার কাজে এগিয়ে যায় এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের সাহচর্যে যাবার পর একদিন বাচ্চাদেরসহ সে নিজেই খ্রিস্টান হয়ে যায়। মেজ-বৌর খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া স্বজাতীয় বদ্ধমূলতা ও অনাচারের প্রতি আরেকটি বড় ধরনের বিদ্রোহ। তার খ্রিস্টান হয়ে যওয়ার সংবাদে পাড়ার মসজিদের ইমাম প্যাঁকালদের বাড়িতে মৌলুদ ও তৎসঙ্গে বে-ইমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্পর্কে ওয়াজের জলসা বসান। এখানেই সিদ্ধান্ত হয় গোমরা বেদীনকে নসিহত করবার জন্য মওলানা হযরত পীর গজনফর কেবলা ও মওলানা রুহানী সাহেবকে আনতে হবে। এর ব্যয়ভার বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা মেজ-বৌর শাশুড়ি ছাগল বেচে আপাতত পনের টাকা দেবে। নইলে সমাজে সে 'পতিত' থাকবে। মুসলমান সমাজের কড়া অনুশাসন, স্বজাতীয়দের অনমনীয়তা ও অসহযোগিতায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই মেজ-বৌ খ্রিষ্টান হয়েছিল। সাম্যবাদী আনসার মেজ-বৌর ধর্মান্তরিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে, 'আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিষ্টান করেছেন'।[৫৪]

বদ্ধমূল পুরুষের হঠকারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং নিজ হাতে সাদাবি দিয়েছে 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের 'রাক্ষুসী' গল্পের বাগদি মেয়ে বিন্দি। দুটো মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে বিন্দির সংসার। সে হিসেবি মেয়ে এবং পরিশ্রমী। কিন্তু সেই ভালোমানুষ স্বামীটি যেদিন রঘো বাগদির দু'তিনটে 'স্যাঙ্গা করা', 'কড়ুই রাঁড়ী' মেয়েটাকে নিয়ে মজলো তখনই বিন্দির মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে প্রথমে স্বামীকে ঝাঁটাপেটা করেও নিবৃত্ত করতে পারল না। একদিন স্বামী পাঁচুর বাপ বিন্দির পেটরা থেকে সঞ্চিত পয়সা কড়ি নিয়ে গিয়ে হবু শ্বশুরকে প্রদান করে বিয়ের ভেট হিসেবে। সেই সঙ্গে বিয়ের তারিখও নির্ধারিত হয়। বিন্দি দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার মনে হয়,

> একটা দেবতার মত লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক এক পা করে, আর বেশি

> দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোন উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? তা ছাড়া আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও ত একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, ত আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী। ধর আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে তার ত আর কোন পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক, সোয়ামির পাপ তার ইস্ত্রি নেবে না ত কি নেবে এসে শেওড়াগাছের ভূত?[৫৫]

স্বামীকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য বিন্দি তাকে হত্যা করে এবং সাত বছর জেল খেটে আসে। বিন্দি এ কাজের জন্য মোটেই অনুতপ্ত হয়নি। এটাকে সঠিক বলেই সে মনে করে। 'পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার'।৫৬ বিন্দি তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে থেকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে হত্যা করে স্বামীকে। কিন্তু রবীন্দ্র ছোটগল্প 'কঙ্কাল'এর কনকচাঁপা হত্যা করে প্রেমিককে। তার প্রেমের অমর্যাদা করে ডাঃ শশি শেখর কেবল পণের বারো হাজার টাকার লোভে অন্যত্র বিয়ের বন্দোবস্ত করলে কনক তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে এবং নিজেও করে আত্মহত্যা। এভাবে দেখা যায় সমাজ-পরিবেশের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে অবরুদ্ধ নারীরাও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে কখনো কখনো বিদ্রোহ করেছে। কাব্যের মতো নজরুল কথাসাহিত্যেও সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যসন্ধানের অভীপ্সা প্রযুক্ত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাঁর সার্থকতাও যথোচিত।

চার

কাব্য ও কথাসাহিত্য ছাড়া নাটকেও নজরুলের নারীচেতনার পূর্ণস্ফূর্তি ঘটেছে। নাটকেও তিনি নারীসমাজের বহুমুখী সমস্যার সমাবেশ ঘটিয়ে সমাজজীবনে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বপ্নব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। নারীদের জীবনে নিবর্তক সমস্যাগুলো নজরুলের নানা নাটকে স্থান পেয়েছে। 'ঝিলিমিলি' (১৯৩০) গ্রন্থের 'ঝিলিমিলি' একাঙ্ক নাটকটিতে একজন শিক্ষিত গোঁড়া ও বদ্ধমূল চরিত্র মির্জাসাহেব। তিনি গ্রাজুয়েট হলেও স্ত্রী ও কন্যাকে কড়া পর্দার মধ্যে রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। বিয়ের পর স্ত্রীর গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। রোগার্ত কন্যা ফিরোজা মাকে গান গাওয়ার অনুরোধ জানালে হালিমা গান গাইতে থাকে। মির্জাসাহেব দহলিজে বসে সেই গান শুনে স্ত্রীর কাছে অনুযোগ করে বলেছেন, 'দেখ, তুমিই ফিরোজার মাথা খেলে। আর এই বুড়ো বয়সেও তোমার গান গাওয়া অভ্যেস গেল না। কি ভুলই করেছি স্কুলে পড়া মেয়ে বিয়ে করে'।৫৭ হালিমাও স্বামীর এহেন গোঁড়ামিকে বাড়াবাড়ির ফসল হিসেবে বিবেচনা করে বলেছে, 'সত্যি, এ ভুল না হলে দুই জনই বেঁচে যেতাম। আমি একথা ভাবতে পারিনে যে, কোন কোন গ্রাজুয়েট গোঁড়ামিতে কাঠ-মোল্লাকেও

হার মানায়'।৫৮

পুরুষের বহুভোগ্যা মানসিকতা থেকে জন্ম হয়েছে বহুপত্নীকতা। পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজে কখনো ধর্মীয় অনুশাসনের বিধি হিসেবে এগুলো স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। উনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আইন করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সেই সময় বহুবিবাহের অপকার সম্পর্কে বলেছেন, 'এ দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজে বহুবিধ অনিষ্ট হইতেছে'।৫৯ এক স্ত্রীর বর্তমানে বিবাহের রেওয়াজ থাকায় পুরুষরা পরকীয়া প্রেম থেকে শুরু করে নানাবিধ দুষ্কর্মের ক্ষেত্রেও প্রস্তুত করে থাকে। এরূপ অবস্থায় বিবাহের ফলে সংসারে সৃষ্ট হয় সতীনের কলহ। আবার পরকীয়া প্রেমের ফলেও তৈরি হয় পারিবারিক অশান্তি। যেটাই হোক, এ দুটো কাজের জন্য পুরুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয় ভোগবাদী জীবনচারিত্র। ফলে পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় নেমে এলে নারীনিগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কাজী নজরুল ইসলামের 'ঝিলিমিলি' নাট্যগ্রন্থের 'শিল্পী' নাটিকায় স্ত্রীর বর্তমানে পুরুষের অন্য নারীর প্রতি আসক্তি পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্রকর শিরাজকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল লায়লি। কিন্তু শিরাজ রোগার্ত স্ত্রীর প্রতি সেবাধর্মের আদর্শ অনুসরণ না করে চিত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লায়লি মারা গেলে সে দুঃখ পাবে না বলে জানায়। কারণ শিল্পীর তুলিতে শিরাজ লায়লিকে চিরবৈচিত্র্য-চিরনবীনতা দান করবে বলে জানায়। কিন্তু অশিল্পী লায়লি চায় না সে অমরত্ব। তার ভাষ্য,

> ওগো দোহাই তোমার। আমি চাইনে অত গৌরব, অত মহিমা। তুমি আমায় বাঁচিয়ে তোল। আমি বাঁচতে চাই। তোমায় পেতে চাই। মরতেই যদি হয়, এত দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে মরতে চাইনে। আমি মরতে চাই স্বামীর কোলে, পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজনের মাঝে। যেতে চাই বাড়িভরা ক্রন্দনের তৃপ্তি নিয়ে। এমন করে এই মাঠের মাঝে শূন্য ঘরে এক পাষাণের পায়ের তলে পড়ে মরবার আমার সাধ নেই।[৬০]

'উপায় নেই লায়লি উপায় নেই' বলে চিত্রকর শিরাজ তাকে জানিয়ে দেয়। লায়লি স্বামীর অনুরাগিনীকে 'ডাইনী' নামে চিহ্নিত করে বাবার বাড়িতে চলে যায়। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছে স্ত্রীর পূর্ণ পর্যাদা না পায় তাহলে এর মত বেদনার কারণ আর কি হতে পারে? 'আলেয়া' (১৯৩১) নাটকের মীনকেতুর মধ্যে ভোগমত্ত বিলাসী জীবনে নারীর মহিমা স্বীকার করা হয়নি। মীনকেতুর ভাষ্য, 'আমি মনুষ্যত্বের পূজা করিনা, কৃষ্ণা। আমি যৌবনের পূজারী। ফুল আর হৃদয় দলে চলাই আমার ধর্ম'।৬১ এ কারণে রাজার মনোরঞ্জনে আগত মদালসা কৃষ্ণাকে দেখে বিরক্ত হলেও মীনকেতু মন্তব্য করেছে, 'আহা রাগ করো কেন সুন্দরী, মাঝে মাঝে পুণ্য করে পাপেরও মুখ বদলে নিতে হয়, এ সব পুণ্যাত্মারা যখন বাসি হয়ে উঠবেন তখন তোমারই দুয়ারে আবার যাব'।৬২ রাজার ভোগোন্মত্ততা সীমাতীত ছিল বলে কৃষ্ণার মত ব্যক্তিত্বশালিনী সুন্দরী রমণী তার ভেতরে প্রেমের কলি ফোটাতে পারেনি।

পর্দাসমস্যা ও সতীনসমস্যা সমকালীন সমাজে নারীর জীবনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল বলেই নজরুল ছোটদের নাটক 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) তেও এ সব প্রসঙ্গ সন্নিবদ্ধ করেছেন। ছোট বাচ্চারা পুতুল নিয়ে খেলতে গিয়ে বিয়ে দেয়ার সময় এক পুতুলের সঙ্গে দুই পুতুলের বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। কম্‌লি তার ডালিম-কুমারের সঙ্গে টুলি ও বেগমের পুতুলের বিয়ের কথা বললে টুলি বলেছে, 'কি? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে? আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় পুঁটু তোর অন্য বর খুঁজিগে।'৬৩ খেলার আসরে বেগমের আসার বিলম্বের হেতু কমলি জিজ্ঞাসা করলে বেগম বলেছে, 'বাপরে। আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে। আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দার ভিতর বিবি করে রাখতে'।৬৪ এসব থেকেও উপলব্ধি করা যায় নজরুল চেতনায় নারীসমস্যাগুলো ক্ষণিকের জন্য রেখাপাত করেনি। এগুলো যেন সর্বস্তরের মানুষের বোধনকে স্পর্শ করে এই উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের নাটকের প্রাসঙ্গিকতায় পর্দা ও বহুবিবাহের সমস্যা তুলে ধরেছেন।

নজরুলের নাটকে কেবল অসহায় নারীর অসহায়ত্বের কারণ কিংবা তাদের দুর্বলচিত্ততার পরিচয়ই তুলে ধরা হয়নি। এখানে বিজয়িনী নারীর গৌরব ও শক্তিমত্তার চিত্রও উদ্ভাসিত। 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থের 'সেতু-বন্ধ' শীর্ষক নাটিকায় পদ্মাদেবী তার বুকের উপর দিয়ে যন্ত্রপতির স্বর্গজয়ের পথ রচনায় বাধা দেয়। অনেকটা হতোদ্যম হয়ে জলদেবীদের সে বলেছে যে, যন্ত্রপতির উদ্ধত যাত্রাপথ তাকে বিদ্রুপ করছে। তার কাছে অসহ্য এ অপমান। শেষ পর্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলে তিনি দেবীকে সাহায্য করেন এবং যন্ত্রপতি পরাজিত হয়। এতে সে বলে, 'আমার মৃত্যু নাই দেবী। আজ তোমারই জয় হল। দেবতার মত দানবও বলে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। আমি আবার নতুন দেহ নিয়ে আসব। আবার তোমার বুকের উপর দিয়ে আমার স্বর্গজয়ের সেতু নির্মিত হবে।'৬৫ এর জবাবে পদ্মাও বলেছে, 'তুমি বারে বারে আসবে। কিন্তু প্রতিবারেই তোমায় এমনি লাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে'।৬৬ পদ্মাদেবী যন্ত্রপতির লৌহ দানবীয়তার উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য অবশ্যই একটি শক্তিশালী নারীসত্তার উদ্‌বেলন।

সময়, সুযোগ ও পথ পেলে নারীরাও যে তেজোদ্দীপ্ততায় পুরুষের পৌরুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'আলেয়া' নাটকের জয়ন্তী। যশোল্মীরের রাণী জয়ন্তী মীনকেতুর গর্ব খর্ব করে তারই রাজ্য যুদ্ধ করে জয় করবার পর সদম্ভে বলেছে,

> হ্যাঁ, মীনকেতু গর্ব করে ঘোষণা করেছিল, সে নিখিল পুরুষের প্রতীক। যৌবন-সাম্রাজ্যের সম্রাট। ফুল আর হৃদয় দলে চলাই নাকি ওর ধর্ম। ওকে আমি জানাতে চাই যে, যৌবন শুধু পুরুষেরই নাই। ওদের যৌবন আসে ঝড়ের মত, তুফানের মত বেগে, নারীর যৌবন আসে অগ্নিশিখার মত রক্তদীপ্তি নিয়ে। আমি জানাতে

> চাই, পুরুষের পৌরুষ দুর্দান্ত যৌবনকে যুগে যুগে নারীর যৌবনই নিয়ন্ত্রিত করেছে। নারীর হাতের লাঞ্ছনা-তিলকই ওদের নিরাভরণ রূপকে সুন্দর করে অপরূপ করে তুলেছে। মীনকেতু যদি হয় নিখিল পুরুষের প্রতীক, আমিও তাহলে নিখিল নারীর বিদ্রোহ ঘোষণা–তার বিরুদ্ধে, নিখিল পুরুষের বিরুদ্ধে।[৬৭]

'জয়ন্তী' নজরুল সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠ শৌর্যশালিনী নারী চরিত্র। একই সঙ্গে শক্তিমত্তা এবং নিবৃত্তির সাধনা তার চরিত্র মাহাত্ম্যকে উচ্চকিত করেছে।

পরিশেষে বলবো নজরুল সাহিত্যের বিচিত্র পরিসরে নারীদের অধোগতি দেখানোর পাশাপাশি এর কারণও উৎঘাটন করা হয়েছে। উৎঘাটিত কারণ সমূহের মধ্যে পুরুষের অনমনীয়তা ও বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর গুরুত্বহীনতার আরোপকে মুখ্যত চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে কতিপয় নারীর পিছুটান স্বভাব ও দাসত্ব মনোবৃত্তি। নজরুল সাহিত্যের সর্বত্র নারীপুরুষের সুস্থ জীবনচেতনার জন্য একদিকে যেমন নারীজাগরণের স্ফূর্তির কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে এই জাগরণে দোসরতার জন্য পুরুষ জাতিকেও সচেতনতা প্রদান করা হয়েছে। জাগরণের জন্য নারীদের বলিষ্ঠ বীর্যবতী ও সংগ্রামী দ্যোতনায় পুষ্ট করা হয়েছে। অধোগতি ও নিবর্তনের চিত্র অঙ্কন করে তাদের মনোযোগ ও ক্ষিপ্ততা উভয়ই আকর্ষণের প্রয়াস সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। অপরপক্ষে বোঝানো হয়েছে নারীকে বাদ দিয়ে পেছনে রেখে সভ্যতা বা প্রগতির মশাল বহন যথার্থহীন। এ কারণে সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেতনায় নজরুলের সাহিত্য হতে পেরেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও জীবনসন্ধানী।

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম, "নারী", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৪১।

২. ঐ, নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮৮।

৩. ঐ, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৯।

৪. তদেব, পৃ. ৯৬।

৫. তদেব, পৃ. ৩৭৬-৭৭।

৬. তদেব, পৃ. ৯৬।

৭. ফজিলাতুন্নেসা, "মুসলিম নারীর মুক্তি", সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৬, পৃ. ২।

৮. কাজী নজরুল ইসলাম, "তরুণের সাধনা", নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৯৬।

৯. ঐ, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

১০. এস. এম. লুৎফর রহমান, "নারী জাগরণে ধূমকেতু", 'উত্তরাধিকার', মে-আগস্ট, ১৯৭৭, পৃ.৩৩২।

১১. মিসেস এম. রহমান, "আমাদের দাবী", 'ধূমকেতু' (১০ম সংখ্যা), ২রা আশ্বিন, ১৩২৯।
১২. শ্রীমতী শক্তিবালা, "বোনের দাবী", 'ধূমকেতু' (২৬শ সংখ্যা), ১২ই ডিসেম্বর, ১৩২৯।
১৩. কাজী নজরুল ইসলাম , "সাঁঝের মায়া", নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
১৪. ঐ, 'বিষের বাঁশী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, উৎসর্গপত্র দ্রষ্টব্য।
১৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, "নজরুল ইসলাম ও মিসেস এম. রহমান", 'ইত্তেফাক', ২০শে ভাদ্র, ১৩৯২।
১৬. আব্দুল কাদির , 'যুগ-কবি নজরুল', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ.১২-১৩।
১৭ .কাজী নজরুল ইসলাম, "নারী", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।
১৮. তদেব, পৃ.২৪২।
১৯. তদেব।
২০. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৬।
২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী (যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত), ২য় খণ্ড, ৯ম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ.৩৯৯।
২২. তদেব,পৃ. ৪০০।
২৩. কাজী নজরুল ইসলাম, "যেন আপনারে হানি হেলা", 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬।
২৪. ঐ, "গরিবের ব্যথা", নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২১।
২৫. কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার', নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯, পৃ. ১৬৩।
২৬. তদেব।
২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, "মন্দির ও মসজিদ", 'রুদ্রমঙ্গল', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৮৮০।
২৮. আজহার উদ্দীন খান, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', ৫ম সং, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ.২০৪।
২৯. কাজী নজরুল ইসলাম, "বারাঙ্গনা", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪২।
৩০. তদেব।
৩১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাম্য',বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৪০০।
৩২. কাজী নজরুল ইসলাম, "নারী", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪৩।
৩৩. ঐ, "মিসেস এম. রহমান", 'জিঞ্জীর', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩৩।
৩৪. তদেব।
৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম, "নারী", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।
৩৬. তদেব।
৩৭. তদেব, পৃ. ২৪২।
৩৮. তদেব।
৩৯. কাজী নজরুল ইসলাম, "নারী", ' শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০১-২।

৪০. ঐ, 'নারী', 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪৩।
৪১. ঐ, 'বাঁধনহারা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৭৪৭।
৪২. তদেব, পৃ. ৮০২।
৪৩ তদেব, পৃ.৭৪৯।
৪৪. তদেব,পৃ.৭৮৫।
৪৫. কাজী নজরুল ইসলাম 'মৃত্যু-ক্ষুধা', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৫।
৪৬. ঐ, কুহেলিকা, নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৭১৩।
৪৭. তদেব।
৪৮. কাজী নজরুল ইসলাম, 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৬১০।
৪৯. ঐ, 'স্বামীহারা', 'ব্যথার দান', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৭১১।
৫০. তদেব, পৃ.৭১৫।
৫১. জসীমউদ্‌দীন, "কবর", রাখালী, ৯ম সং, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৯১, পৃ.২৪।
৫২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'মৃত্যু-ক্ষুধা', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৫৭৭।
৫৩. তদেব, পৃ. ৫৭৪।
৫৪. তদেব, পৃ.৬০৩।
৫৫. কাজী নজরুল ইসলাম, "রাক্ষুসী", 'রিক্তের বেদন', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ.৭০০।
৫৬. তদেব, পৃ.৭০১।
৫৭. কাজী নজরুল ইসলাম,"ঝিলিমিলি",'ঝিলিমিলি',নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৭৫।
৫৮. তদেব।
৫৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, রিফ্লেকট পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৫৭।
৬০. কাজী নজরুল ইসলাম, "শিল্পী", নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৭।
৬১. ঐ. 'আলেয়া', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৮১৪।
৬২. তদেব, পৃ. ৮১৫।
৬৩. কাজী নজরুল ইসলাম, 'পুতুলের বিয়ে', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৮৪৭।
৬৪. তদেব।
৬৫ .কাজী নজরুল ইসলাম, "সেতু-বন্ধ", 'ঝিলিমিলি', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৯৪।
৬৬. তদেব।
৬৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'আলেয়া', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৮৩৩-৩৪।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — বিংশ সংকলন]

নজরুলের প্রেমের কবিতা ঃ দৃষ্টি ও সৃষ্টি

স্বপ্না রায়

প্রেম এক ধরনের বিমূর্ত অনুভূতি বিশেষ। মানব-মানবীর পারস্পরিক আকর্ষণ সম্ভূত মনের আবেগ যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, দর্শন মিলন ব্যতিরেকে জীবনাচরণ অবান্তর বলে মনে হয়, তখনই তাকে বলা যায় প্রেম। মিলন, বিরহ, বেদনার অন্তর্গূঢ় রক্তক্ষরণ এর অনুসঙ্গ। প্রেমের উৎস রূপ কিংবা গুণে, কিংবা উভয়ে। এই প্রেম শিল্পীর সৃষ্টি প্রয়াসের অন্যতম প্রধান উপকরণ। যুগ যুগ ধরে চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য–এসব শিল্প মাধ্যমের বিকাশ একে ভিত্তি করেই। পরিবর্তিত জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে সাধিত হয়েছে এর নানামাত্রিক বৈচিত্র্য। কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬) তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাসে এ বিষয়টিকে আশ্রয় করেছেন অসংখ্যবার এবং বিচিত্র বিন্যাসে।

নজরুল ইসলামের যুগ একদিকে ভাঙনের, অন্যদিকে এই ভাঙ্গনসূত্রে গড়ে ওঠারও যুগ। দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে যুদ্ধ, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়–সব মিলিয়ে বিরাজমান ছিলো ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ এক সময় ও পরিবেশ। দেশবাসীর জীবনকে তা অস্থির ও বিপন্ন করে তুলেছিলো। আবার পৃথিবী জুড়ে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক নানামাত্রিক আবিষ্কার ও নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার প্রসার বিশ্ববাসীর মতো এদেরও মনোলোককে করে তুলেছিলো নতুন বোধে উদ্দীপিত। এর প্রভাব অনিবার্য হয়ে প্রতিফলিত হয়েছিলো—শিল্প ও সাহিত্যে। ভাঙ্গাগড়ার এমনিতরো এক সন্ধিলগ্নকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে ও অতিবাহিত হয়েছে নজরুলের সৃষ্টির কালসীমা। যদিও এ সীমা ১৯২০ থেকে '৪২, মাত্র বাইশ বছর ব্যাপ্ত। ১৯৪২-এর মাঝামাঝি সময়ে মস্তিষ্কের অবশীর্ণতায় আক্রান্ত হয়ে কবির সৃষ্টি থেমে যায় চিরতরে।

নজরুল কাব্য পর্যালোচনা করলে এর দুটো স্থুলবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। একভাগে তাঁর কবিসত্তা বিদ্রোহের লক্ষণধারী, অন্যভাগে তিনি রোমান্টিক, মিস্টিক। সমকাল সংলগ্নতা সূত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ার কারণে বিদ্রোহ-বিপ্লব তাঁর সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ হয়ে ধরা পড়েছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধান না হলেও অন্যতম প্রধান রোমান্টিক প্রেমের অন্য ধারাটিকে অস্বীকার করা চলে না। একদিকে যৌবনের প্রমত্তশক্তি ও উদ্দামতা, অন্যদিকে রোমান্টিক প্রেমের গুঞ্জনধ্বনি। বিদ্রোহের ঘোষণায় যেমন, প্রেমনির্ভর ব্যক্তি অনুভূতি

প্রকাশেও তেমনি তিনি সবাক ও সোচ্চার । তাঁর দুটো সত্তাকেই অভিন্নতায় গ্রথিত করে বিচার করা যায়। কারণ উভয়টিই তারুণ্যের ধর্ম। এই তারুণ্যের উদ্দামতায় তিনি কখনো বিদ্রোহী ভৃগু কিংবা ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, কখনো প্রেমাবেগতপ্ত ষোড়শীর হৃদি সরসিজ- সবকিছুর যোগফল যুগলগ্ন প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির এক মানুষ। 'বিদ্রোহী' (১৯২১) কবিতায় তাঁর নিজেরই শিল্পভাষ্যে রয়েছে এর প্রমাণ,

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।

দুই বিরোধী বস্তুর সমবায়ে অর্থাৎ মানস গঠনের দিক দিয়ে কোমলে কঠোরে গড়া, দ্বৈতসত্তায় বিন্যস্ত এক মিশ্রমনের মানুষ তিনি। কবির প্রেম আর বিদ্রোহী সত্তা – দুটোই পরস্পর অন্তর্গূঢ়সূত্রে গ্রথিত। কবির পত্রসাক্ষ্যে জানা যায়- হৃদয় নিভৃতের প্রেমাশ্রিত যন্ত্রণার অগ্নিক্ষরণই তার 'অগ্নিবীণা'র কবিতাবলীর উৎসমূল। কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা জুড়ে বিদ্রোহ-বিক্ষোভ, বজ্রকণ্ঠ-প্রতিবাদ, স্বীয় শক্তি প্রমাণের সোচ্চার প্রয়াস,

আমি মানি নাকো আইন,
আমি ভরা তরী করি ভরাডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন,

আবার কোথাও তা প্রেমাবেগ-প্রকম্পিত, উষ্ণ, অধীর,

চিতচুম্বন চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর

নজরুলের কবিতার মেজাজ বিচার করতে গিয়ে তাঁর মানস প্রবণতার এই দ্বৈত লক্ষণকে গৌণ বিচার করা যায় না।

নজরুল সাহসী। ব্যক্তি জীবন ও প্রবণতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতার পর্যায়ে পর্যায়ে এবং নানামাত্রিকতায়। প্রাচীন ভারতীয় ও পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন, ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত-আরবী-ফারসী শব্দ কখনো আলাদাভাবে, কখনো আবার একই কবিতায়, অথচ কাব্যশিল্পে তা বিরোধ বাধায় নি কোথাও। বরং তার অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গমাধুর্য বিষয়ের অনুসারীই হয়েছে। আর ঠিক এমনি করেই একাধারে লিখে গেছেন; আনন্দ, বেদনা, বিদ্রোহ, প্রেম ও ধর্ম ইত্যাকার নানা মেজাজের কবিতা। বলাবাহুল্য এ সবের সর্বত্রই তিনি এক সফলশিল্পী। আসলে সমকালকে আশ্রয় করে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও বিচিত্রধর্মী সৃষ্টি ও তার সাফল্যের জন্যে তিনি কালাতিক্রমী শিল্পী প্রতিভা।

নজরুলের স্বল্পায়তন কাব্যজীবনকে বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত করা যায়। এই সব পর্বেও আবার নানা ধরনের স্তর বিন্যাস রয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক কবির রোমান্টিক প্রেমের কবিতা ও গানের দিকটিকে প্রধান ধারারূপে বিবেচনা করেছেন। আনন্দ, বেদনা, যন্ত্রণামথিত এই সৃষ্টিরাজির মধ্যে যুক্ত হয়েছে তাঁর অপরিমেয় ভাবোচ্ছ্বাস আর স্বপ্নালুকল্পনার শৈল্পিক পরিবেশনা। অবশ্য রোমান্টিক প্রেমের এই ধারাটিকে তাঁর সৃষ্টির অন্যদিকগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কারণ

'নজরুল কাব্যের প্রেমের রোমান্টিকতা তাঁর অন্যান্য ধারার কবিতা এবং গানে যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়েছিল।'[১]

ব্যক্তিজীবন ও শিল্পপ্রবণতায় বৈচিত্র্যপিয়াসী কবি তাঁর স্বধর্ম রক্ষা করেছেন প্রেমের কবিতায়ও। ভাবাবেগ নজরুল মানসের এক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এর প্রকাশ কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতিতে, বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্বে, একে পাঠকমনে মুদ্রিত করে দেবার আকুলতায় সবচেয়ে বড়োকথা বাংলা সাহিত্য-ধারার প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার অস্থির আকাঙ্ক্ষায়।[২] অভিজাত মূল্যবোধের বিপরীত মাত্রা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের কাব্যাঙ্গনে। বিপুল জনজীবন-সংলগ্নতা তাঁর কাব্যের এক বিশেষ ধর্ম। আমাদের সাহিত্যের মূলধারার প্রথাসিদ্ধ প্রবণতার মূলে আঘাত করে সমাজের নিম্নস্তরের নিপীড়িত শোষিত শ্রেণীর মানুষেরই প্রতিনিধিত্বকারী বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন তিনি। অত্যাচারিত, শোষিত, দুর্গত জন মানুষের দুঃখ বেদনার সঙ্গে একাত্মতা নজরুলের কবিতার মর্মসুর। বিদ্রোহীরূপে নজরুলের যে পরিচয় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে যেসব লক্ষণ স্পষ্টতা পায় তা হচ্ছে— অত্যাচারী, শোষক ও বঞ্চনাকারীর বিরুদ্ধে, শক্তিমানের মদমত্ততার বিরুদ্ধে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম ইত্যাদি সব ধরনের দম্ভ ও অহংকারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতাজনিত উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) কবিতায়ও। কিন্তু নিপীড়িতের দুঃখ যন্ত্রণার যারা উৎস, তাদের বিরুদ্ধে দুঃখী মানুষদেরকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি একমাত্র নজরুলই করেছিলেন। নজরুলের কবিতায় যে বিদ্রোহের আবেগ, আবেগের বেগ, তা বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে লক্ষ্য করা যায় অস্থির অশান্ত এক প্রাণশক্তির উদ্দামতা। কোনো নিয়মকানুন, শাসন বারণ না মানার উচ্ছৃঙ্খল-অবারিত উচ্ছ্বাস। এই অবারিত-উচ্ছ্বসিত আবেগ তাঁর প্রেমের কবিতারও মর্মলক্ষণ।

স্বভাব ধর্মে নজরুল মূলত: রোমান্টিক। অনুভূতির প্রাবল্য, সুদূরের প্রতি, অদৃশ্য অধরার প্রতি সুতীব্র ব্যাকুলতা, অতীতচারিতা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা, বিদ্রোহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনা, প্রকৃতিপ্রীতি ইত্যাদি রোমান্টিকতার পরিচয়বাহী লক্ষণগুলো নজরুলের কবিতায় সহজলভ্য। এরই অন্তর্প্রেরণায় তাঁর কণ্ঠে স্ফুরিত হয়েছে কখনো বিদ্রোহ, কখনো বা প্রেমের অনাবিল উচ্চারণ। একদিকে অদম্য ভাবাবেগ, অন্যদিকে রোমান্টিক চেতনা-সব মিলেই তাঁর বিচিত্রমাত্রিক সৃষ্টির উৎস। হৃদয়াবেগের স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর রচিত এসব কবিতা।

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা ও প্রেম চেতনা আপাতত বিসদৃশ মনে হলেও আসলে দু'টি সত্তাই অন্তর্গূঢ়সূত্রে গ্রথিত। ব্যক্তিগত কিংবা বৃহত্তর প্রেমের টানেই তো তিনি বিদ্রোহীর ভূমিকা পালন করেছেন। নার্গিসের সঙ্গে বিচ্ছেদের মর্মদাহসূত্রেই উৎসারিত

হয়েছিলো তাঁর বিপ্লব সন্ত্রাসের অনেকগুলো অগ্নিক্ষরা কবিতা।[৩] সংসারের যাবতীয় অশুভশক্তির বিরুদ্ধ-উচ্চারণের মূলে নিহিত রয়েছে তাঁর মর্মগত প্রেম ও মানবতাবাদের মন্ত্র। কাজেই তাঁর বিদ্রোহ আর প্রেম প্রায়ই পৃথক বিন্যস্ত কোনো বিষয় নয়, বরং তা অভিন্ন এবং পরস্পরের পরিপূরকও বটে। রোমান্টিক কবি প্রতিভার মর্মলক্ষণ এই, একদিকে সৌন্দর্য ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাজনিত হতাশা-পরাজয়-যন্ত্রণা, অপর দিকে একেই বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম, বিদ্রোহ।[৪] উভয় ধারাতেই নজরুলের অনায়াস বিচরণ। তাঁর একমাত্র 'বিদ্রোহী' কবিতায়ই রয়েছে–এর অনেকগুলো প্রমাণ,

আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, বিদ্রোহী সুত বিশ্ববিধাত্রীর।

আবার,

আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা-অনুখন,
আমি চপল-মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্।

বিদ্রোহী মেজাজের পাশেই তাঁর প্রেমাবেগের প্রোজ্জ্বল-প্রকাশ, মর্মসুরের দারুণ ব্যবধান সত্ত্বেও রোমান্টিক আবেগের অন্তর্গূঢ় যোগসূত্রের কারণে উভয়টিই সুন্দরভাবে মিশে গেছে। নজরুলের মর্মবাণী এই সত্তাটিই তাঁর সৃষ্টির শরীরে চিহ্নিত।

তাঁর প্রেমপর্যায়ের কবিতা সংকলনগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'পূবের হাওয়া' (১৯২৫), 'সিন্ধু হিন্দোল' (১৯২৭), 'চক্রবাক'(১৯২৯)। এখানকার কোনো কোনো কবিতায় পূর্বরাগ, মিলন ও বিচ্ছেদের সুর স্পষ্ট। কোথাও প্রিয়াকে ঘিরে সঞ্চারিত হয়েছে কবির আবেগ-বিহ্বল মিলনানুভূতি, প্রেমবিমুগ্ধতা, মধুর ব্যথা ও বিচ্ছেদ– এসবের বিচিত্র অনুভূতির পরিচয়। কোথাও বা বঞ্চনা-প্রতারণায় ক্ষিপ্ত তাঁর প্রেমিক সত্তা – অভিশাপে মুখর। যদিও এ অভিশাপে হিংস্র-আক্রোশ নেই, রয়েছে অভিমানের মর্মমথিত বেদনার প্রস্রবণ,

পড়বে মনে আমার সোহাগ,
কণ্ঠে তোমার কাঁদবে বেহাগ।
পড়বে মনে অনেক ফাঁকি,
অশ্রুহারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছবে
বুঝবে সেদিন বুঝবে। ('অভিশাপ', 'দোলন-চাঁপা')

আবার প্রেমাবেগ সুতীব্র অধীর হয়ে নার্সিসাসসুলভ অভিব্যক্তি লাভ করেছে কোথাও,

তখন মুকুর-পাশে একলা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুম্‌বো আমি চুম্‌বো নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম,
('পরশ পূজা', 'ছায়ানট')

স্বকৃত অপরাধের বেনামে পুরুষের চিরন্তন নিষ্ঠুরতার অনুশোচনাও দুর্লক্ষ্য নয়,

অনন্তকুমারী সতী তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলাচ্ছলে, চিরমৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেববালা
নীরবে সয়েছ সবি- ('পূজারিণী', 'দোলন-চাঁপা')

কবিতাগুলোর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে প্রেমের অতৃপ্ত, অদম্য ও আদি-অন্তহীন পিপাসা, যা কিনা তাঁর অনুভবের সামগ্রিক লক্ষণ,

ভগবান! ভগবান! একি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!
কোথা তৃপ্তি? কোথা তৃপ্তি? কোথা মোর তৃষ্ণাহরা প্রেমসিন্ধু
অনাদি পাথার,
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার!
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি, এত বড় বিশ্বে মোর নাই শান্তি নাই।
('পূজারিণী', 'দোলন-চাঁপা')

নজরুলের প্রেম পর্যায়ের কবিতাগুলোর অধিকাংশই রচিত হয়েছে দৌলতপুরে ও কুমিল্লায় অথবা কুমিল্লা দৌলতপুরের ঘটনাসূত্রে অন্য কোথাও। কবির জীবন ও কাব্যের সঙ্গে কুমিল্লা ও দৌলতপুর মর্মসূত্রে সম্পর্কিত। অবশ্য প্রেমের কবিতায় নজরুলের অনুভূতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে অনুমান কারা যায়— এসব কবিতার উৎসমূল শুধুই কুমিল্লা-দৌলতপুরে সীমাবদ্ধ নয়। কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা কবির অনেকগুলো পত্র পর্যালোচনায় এ প্রমাণ মেলে,

ক. আচ্ছা বন্ধু, এত শক্ত মনের পুরুষ তার কান্না পায় আমার এতটুকু অবহেলায়, আর একজন নারী-হোকনা সে পাষাণ-প্রতিমা— তার কিচ্ছু হয় না? (পৃষ্ঠা-৪০৮)

খ. যে দেবতাকে পূজা করব— তিনি পাষাণ হন, তা সওয়া যায়, কিন্তু তিনি যেখানে আমার পূজার অর্ঘ্য উপদ্রব বলে পায়ে ঠেলেন, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায় বলতে পার? (পৃষ্ঠা-৪১০)

গ. ওকে একটা অনুরোধ করবে বন্ধু আমার হয়ে? বলো–"যাকে ভাসিয়ে দিয়েছ স্রোতে, তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ভাসিওনা। ওকে তরঙ্গের সাথে ভেসে যেতে দাও, পাহাড় কি চোরাবালি কি সমুদ্দুর এক জায়গায় গিয়ে সে ঠেকবেই।" যেই সে স্রোতে ভাসতে যাবে, অমনি দড়ি ধ'রে টান্‌বে— এ হয়ত তাঁর খেলা, আমার কিন্তু এ যে মৃত্যু। (পৃষ্ঠা-৪১৪)

ঘ. একটা কথা, কিছু মনে করোনা। তুমি হঠাৎ আমাদের ভাই-বোন পাতিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ কেন, বলত! যদি ব্যবধানের নদী সৃষ্টিই হয়ে যাবে আমাদের মধ্যে আমি এ পারেই থাকব...তাঁর ইঙ্গিতে যদি ও কথা লিখে থাক, তা'হলে তাঁকে বলো– আমাকে ভয় করার তাঁর কিছু নেই। আমি তাঁর বিনা

অনুমতিতে গিয়ে বিরক্ত করব না বা শান্তির ব্যাঘাত করব না।[৫]

সবগুলো চিঠিরই রচনাকাল জানা যায় ১৯২৮ এবং উল্লিখিত এ 'পাষাণ প্রতিমা' নারী অবশ্যই নার্গিস কিংবা প্রমীলা নন। তাঁর নাম ফজিলাতুন্‌নেসা। সমালোচকের মতে,

প্রেমের কবিতার প্রেরণাদাত্রী নার্গিস-প্রমীলা ব্যতীত ফজিলাতুন্নেসাসহ আরও অনেকের নিকট নজরুল কৃতজ্ঞ। নজরুলের তুলিতে সৃষ্টি হয়েছিল 'রহস্যময়ী, 'কৌতুকময়ী' 'এ মোর অহংকার'-এর মত বর্ণবহুল নিখুঁত হৃদয়গ্রাহী চিত্রাবলীর মতো কবিতাসমূহ।৬

নজরুলের 'চিঠি' ও 'সুন্দরী' কবিতা দুটোয় কিশোর প্রেমের রোমাঞ্চকর এবং বর্ণাভ চিত্রকল্প লক্ষ্য করেছেন সমালোচক। ১৯১০ সালের দিকে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠকালে তাঁর হৃদয় নিভৃতে প্রেমের গুঞ্জরণ শুরু হয়েছিলো বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতার সর্বত্র আরোপিত হয়েছে এক বিষণ্ন তুলির আঁচড়। শৈশবে দুখুমিয়া নামকরণের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিলো তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস। তাঁর ব্যক্তি জীবনের ভাঁজে ভাঁজে লক্ষ্য করা যায় আঘাত-সংঘাত আর ব্যর্থতা বেদনার পুনরাবর্তন। এরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোয়। প্রেমে অতৃপ্তিজনিত মানসিক ক্ষুধার প্রমাণ এগুলোর প্রায় সর্বত্র। দেহাশ্রিত রোমান্টিক মানসিক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধনে তিনি 'নিত্য-অভিসারী' প্রমত্ত; অথচ স্থিতিহীন। প্রেমে একনিষ্ঠতার বিপরীত 'উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা'র প্রমাণ তাঁর নিজেরই শিল্পভাষ্যে,

প্রেমসত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়,

*   *   *   *

প্রেম এক প্রেমিকা সে বহু,
বহুপাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম–
সে শরাব লোহু। ('অনামিকা', 'সিন্ধু-হিন্দোল')

একই কবিতায়, কখনো আবার,

...ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে! তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে।

তাই তাঁর প্রেমের কবিতায় উচ্ছ্বাসময়তা, অনুভূতির প্রাবল্য সত্ত্বেও কোনো বিশেষ ধারা, বিশেষ পরিণতি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পার্থিব প্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যাশিত মিলনে ব্যর্থতা এলে আন্তরগঠনে রোমান্টিক কবি কখনো বা নিমগ্ন হন মৃত্যুচিন্তায় যার মধ্যে নিহিত তাঁর অপার্থিব প্রিয়মিলন বাসনা। এমনি ধরনের মানস লক্ষণ ধরা পড়ে তাঁর 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতায়।

নজরুলের কবিতায় নিঠুরা প্রিয়ার উপমা 'পাষাণ-প্রতিমা', 'দেবতা' এবং 'দেবী', কিন্তু এ উপমা প্রায়ই তাঁর প্রেমের আত্যন্তিক উচ্ছ্বাসের প্রমাণ বহন করে না, বরং তার বিপরীত— ক্ষোভে বিক্ষুব্ধ কিংবা সুতীব্র অভিযোগে বিন্যস্ত,

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন -প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণপূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,

* * * *

নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।

('পূজারিণী', দোলন-চাঁপা')

এখানে 'ইহাদের' বলে সাধারণীকরণ সত্ত্বেও লক্ষ্য আসলে একজনই, কবির নির্দিষ্ট সেই 'নারী', অর্থাৎ ওই সময়ে যার কাছ থেকে তিনি প্রতারিত কিংবা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

কখনো প্রেমের অনুসঙ্গ হয়ে এসেছে প্রকৃতি, প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রিয়ার প্রতিরূপ, আর এর মধ্যে কবির বাণী-অলঙ্কৃত উপমা, রূপক, চিত্রকল্পও দুর্লক্ষ্য নয়। কবির মর্মমথিত শূন্যতা আভাসিত হয়েছে তাতে,

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালোজল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক,
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ তল?

('চৈতী হাওয়া', 'ছায়ানট')

'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কবিতায় গুবাক তরুর প্রতীকে, 'কর্ণফুলী' কবিতায় কর্ণফুলী নদীর প্রতীকে. 'তোমারে পড়িছে মনে' কবিতায় প্রকৃতির বিচিত্র রূপসুষমার ভিড়ে প্রিয়াকে কল্পনা করেছেন, প্রিয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন। প্রেমের কবিতায় অধিকাংশ উপমা রূপকই তাঁর মর্মনিহিত বেদনার অনুষঙ্গ। এইসব কবিতার ভাব এবং বিষয় বিন্যাসে যেমন, প্রকরণগত কৌশল প্রয়োগেও তেমনি তাঁর এই প্রবণতারই প্রমাণ মেলে। এখানে প্রিয়ার চেয়ে প্রিয়াকে ঘিরে কবির যে অনুভূতি তাই বর্ণ ও চিত্রময় হয়ে ধরা পড়েছে।একদিকে বৈচিত্র্যধর্মী প্রেমানুভূতির নিবিড়তা, অন্যদিকে শিল্পপ্রকরণ— সব মিলে তাঁর অনন্য-প্রতিভার স্বাক্ষর প্রেমের কবিতাগুলো। এই কবিতাগুলো যেসব কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, যেমন– 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'সিন্ধুহিন্দোল'— এইসব কাব্যে কবির রোমান্টিক আবেগ অনেকটা অসংযত বিন্যাসে উচ্চারিত হয়েছে। আবার 'চক্রবাক' কাব্যে এসে এই আবেগ লাভ করেছে সংহতরূপ।

'চক্রবাক' কাব্যে প্রেমিকার কাছে 'দোলন-চাঁপা'র প্রবল উচ্ছ্বাস, 'ছায়ানট'-এর

আত্মমগ্নতার উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা কিংবা 'সিন্ধু হিন্দোল'-এর মান অভিমান আর চিত্তবিক্ষোভ নেই, বরং আছে প্রজ্ঞালালিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ এক বিশ্বাস্য প্রেমবোধ, যার মূলকথা মানবাত্মার শাশ্বত-বিরহ। বস্তুত, নজরুল ইসলামের প্রেম চেতনার চিত্রময়, সংহত এবং শিল্পিত প্রকাশ হিসাবে 'চক্রবাক' এক বিশিষ্ট নির্মাণ।[৭]

নজরুল ইসলামের কবিতায় প্রেমের স্বরূপ কখনো রূপে, কখনো রূপাশ্রিতকামে। সুদূর অতীত থেকে একাল পর্যন্ত মানুষের শিল্পে সাহিত্যে এ প্রেমের সাক্ষ্য রয়েছে অসংখ্য, আর তা এসেছে নানা মাত্রিক ধরনে— দাম্পত্য প্রেম, পরকীয়া প্রেম, অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর প্রেম। একদিকে সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা, অন্যদিকে এই প্রেমকে আদর্শ ও মহিমান্বিত করার প্রয়াস— সবমিলে দেবদেবীর প্রতীকে নানারকম অধ্যাত্মতত্ত্বকে আশ্রয় করেছে সামাজিক মানুষ। আর তা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন ও অন্তর্গূঢ় প্রেমের আকৃতিকেই তুলে ধরেছেন তাঁরা। দেহজ মিলনও এসেছে এই অধ্যাত্মছদ্মাবরণে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে কাব্য সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম সূচিত হতে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত প্রায়ই এই প্রেম হয় অনুপস্থিত অথবা শুধুমাত্র পত্নীপ্রেম প্রান্তিক গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা বাদ দিলে বলা যায়, তাঁর কবিতায় প্রেম থাকলেও তা দেহাতীত মহিমায় বিন্যস্ত। প্রেমে রক্ত-মাংসে সজীব দেহকে উপস্থিত করার যথার্থ দুঃসাহস দেখালেন প্রথমে গোবিন্দ্র চন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), পরে নজরুল সমসাময়িকদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) নামও করা যায়। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) প্রথমদিকে শারীর প্রেমের কথা বললেও শেষ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে দ্বিধা কাটাতে সমর্থ হননি।

নজরুলের যুগ নানাভাবেই বিদ্রোহের যুগ। সামাজিক বিদ্রোহের পতাকা তুলে এগিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রোত্তর 'অতি-আধুনিক' সাহিত্য স্রষ্টাগণ। 'কল্লোল' (১৯২৩) এবং তার পরবর্তী সমধর্মী 'কালিকলম' (১৯২৭), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'ধূপছায়া', (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকাকে আশ্রয় করে সূচিত হয়েছিলো তাঁদের যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত ভাববাদী প্রেমের বিরুদ্ধে এবং সনাতন মূল্যবোধের বিপরীত এক নতুন সমাজ সত্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ছিলো তাঁদের প্রয়াসে। 'গোটা মানুষের মানে' খুঁজতে গিয়ে তাঁরা তার 'রক্ত, মাংস, হাড়, মেদমজ্জা',... কোনো কিছুকেই বাদ দেননি। তারা বলেছেন,

> এই দেহ তোর দেবতা শুধু,
> দিন দুয়েকের স্বর্গ রে।
>   অর্ঘ্য দে।
> মর দেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে,
>   অর্ঘ্য দে! (প্রেমেন্দ্রমিত্র, 'ইহবাদি', প্রথমা)

নজরুল এঁদের থেকে দূরে ছিলেন না। অবশ্য এই 'অতি আধুনিক' সাহিত্য স্রষ্টাদের মতো যন্ত্র-সভ্যতা-পীড়িত নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ও বিকার-স্পর্শিত নয় তাঁর সৃষ্টি। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতাকে অস্বীকার করা

যায় না। আর এই অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়— প্রেমের কবিতায় তাঁর দেহবাদিতায়। প্রেমের ক্ষেত্রে ভূমি থেকে ভূমা কিংবা দেহ থেকে দেহাতীত ইত্যাদি সূক্ষ্ম গভীর, দার্শনিক তত্ত্বের ধার ধারেননি নজরুল, বরং মৃত্তিকাসংলগ্ন নারী এবং তার শরীরী আবেদনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মানস গঠন বিন্যাসে তিনি দেহবাদী শিল্পী চেতনা আশ্রয়ী রক্ত মাংসময়ী মানবী প্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন ও পাঠক হৃদয়ে সরাসরি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন চিরকালীন আবেদনের মাধ্যমে। যৌবনবতী নারীর দেহগত রূপ তাঁর সৃষ্টি প্রেরণাকে উজ্জীবিত করেছে। কবিতায় এই দেহ চেতনার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। তাঁর প্রেমতত্ত্ব সরাসরি দেহনির্ভর, কামজ আকর্ষণই তাতে মুখ্য। বিমুখ প্রিয়াকে সংখ্যাধিকবার 'পাষাণ-প্রতিমা' উপমায় বিভূষিত করলেও তার স্বরূপ আসলে রক্ত-মাংসের মানবী নারীর। তাকে ঘিরে কবির ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী দেহ-নির্ভর মিলন-অনুভূতি রূপলাভ করেছে কোনো কোনো কবিতায়,

তখন এমন যেমন কেমন কেমন কোন্ তিয়াসে কোঙারি?
ঐ শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারি।

*　*　*　*

ঐ বেদন বুকে যে সুখ চোঁয়ায়, ভাগ দিয়ো তার কোঙারি।
আমার কুমার হিয়া মুক্তি মাগে অধর-ছোঁয়ায় তোমারি।

('প্রণয় নিবেদন', পূবের হাওয়া')

প্রায় প্রতিটি প্রেমের কবিতায় অধর বিলাসী কবির বিশেষত্বের সংখ্যাধিক প্রমাণ বর্তমান। কদাচিৎ দেহের বাঁধন মুক্ত হলেও সে মুক্তি স্থায়ী হয়নি, পরক্ষণেই তা আবার বিপুল আবেগে ধরা পড়েছে দেহের বাঁধনে। এ ছাড়াও উল্লেখ করা যায় তাঁর 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থের 'মাধবী প্রলাপ' কবিতাটির কথা। যা কিনা দেহবাদী প্রেমের কবিতারূপে একাধারে বিখ্যাত ও বিতর্কিত,

আজ　লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে　অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার　নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পীত যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি

মুখে কামকন্টক ব্রণ মহুয়াকুঁড়ি। ('মাধবী প্রলাপ' 'সিন্ধু হিন্দোল')

'অতি-আধুনিক' সাহিত্য স্রষ্টাগণ দেহবাদ ও অশ্লীলতার দায়ে তাদের সমকালে অভিযুক্ত ও আক্রান্ত হয়েছিলেন, বলাবাহুল্য নজরুলও তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তার কারণ ওই, তাঁর 'কামকন্টক ব্রণ-দুষ্টতা' আশ্রয়ী দেহবাদ। 'কল্লোল' ও তার সমধর্মী পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত যেসব রচনা সেই সময়ে বাংলা সাহিত্য-জগতে ঝড় তুলেছিলো , তার সূচনা বোধ হয় নজরুলের এই কবিতা দিয়ে। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের

প্রবর্তনায় সৃষ্ট এবং 'প্রবাসীর' (১৩০৮) অনুগ্রহপুষ্ট পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪-৪৩) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক তরুণ-সাহিত্য স্রষ্টাদের বিরুদ্ধ-ভূমিকা পালনে এর জুড়ি মেলা ভার। পত্রিকাটির সূচনালগ্ন থেকেই এর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন নজরুল। এর 'গাড়োয়ানী রসিকতা' ও 'মেছোহাটা থেকে টুকে আনা গালি'র কথা জানা যায় স্বয়ং নজরুলের উক্তিতে,

এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি একালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ।[৮]

'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের (১৯০০-৬২) 'আত্মস্মৃতি' (১৯৫৪) তেও এর সমর্থন মেলে,

'কালি-কলম' শুরু হইতেই 'কল্লোল' অপেক্ষা মার্জিত ও ভদ্ররুচির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু প্রথম সংখ্যাতেই হাবিলদারী 'কামকণ্টক ব্রণ' দুষ্টতার জন্য আমাদের আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল। রাধিকা যেমন সারা বৃন্দাবন কৃষ্ণময় দেখিতেন, হাবিলদার কবি তেমনি সারা বনভূমি 'সুরত কেলি' ময় দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া 'প্রলাপ' বকিয়াছিলেন,

করে বসন্ত বনভূমি সুরতকেলি
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতি বেলি।
আসে ঋতুরাজ ওড়ে পাতা জয় ধ্বজা।
হ'ল অশোক শিমূলে বন পুষ্পরজা।[৯]

'শনিবারের চিঠি'র ১৩৩৪-এর ভাদ্র সংখ্যায় নজরুলের 'অনামিকা' কবিতাটিকে নিয়েও বিদ্রুপ করা হয়,

কবির প্রেয়সীই অনামিকা। অর্থাৎ নামহীনা, তাহার কারণ তাঁহার প্রেম-তৃষ্ণা কোন নামনির্দিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের যাহা কিছু মৈথুনযোগ্য তাহাকেই পাত্র ধরিয়া তিনি তাঁহার কাম পরিবেশন করিতেছেন।

তবে নজরুলের সকল প্রেমের কবিতায় সজনীকান্ত দাস-কথিত 'কাম পরিবেশন' নেই। অনেক কবিতায়ই প্রিয়ার প্রতি প্রাণের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে আত্মনিবেদন এবং তার চরণতলে নিজেকে সমর্পণের ইচ্ছায়,

ক. এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ তলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে।
('সমর্পণ' 'দোলন-চাঁপা')

খ. এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙ্গুল চুমে।
চরণ আঘাত করলে রেগে,

* * * *

এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরাণ প্রিয়!
('ব্যথাগরব' 'দোলন-চাঁপা')

কিন্তু প্রিয়ার পদস্পর্শিত কবির এ দীন-সমর্পণকে পছন্দ করেননি সমালোচক ড:

আহমদ শরীফ। বলেছেন, পূজার নামে এই চরণ সেবাই ছিলো 'আত্মসম্মান বোধশূন্য' কবির প্রিয়া তোষণের পদ্ধতি।[১০] নিজের যোগ্যতায় আস্থাবান নন বলেই নাকি তিনি প্রণয়কামী পদলেহী। তবে একথাও তো সত্য যে, প্রেমের সঙ্গে আত্মসমর্পণের সম্পর্ক চিরকালীন।

কখনো রূপাসক্তি, রোমান্টিক বিরহবিলাস; অপ্রাপ্তিজনিত বেদনাও এসেছে কখনো কখনো তাঁর কবিতায়। অতৃপ্ত মিলনাকাঙ্ক্ষার গভীরে তত্ত্বানুসন্ধান নয়, বরং বিদ্রোহ যেমন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আশ্রয়ী, প্রেমের কাব্য শুধুই লক্ষ্যহীন বিলাস। হৃদয় নিঙড়ে রক্ত ঝরিয়েছেন কোথাও, ক্ষোভ অভিমানও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু কখনোই তা দার্শনিক উপলব্ধিজাত নয়। প্রিয়ার প্রতি আকুতি-মিনতি কিংবা প্রত্যাখ্যাত তিক্ততার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবে তাঁর সৃষ্টির ভান্ডার পূর্ণ। মর্ত্যের মানবী প্রিয়া তাঁকে লুব্ধ করেছে, ক্ষুব্ধও করেছে। মর্মগভীরে আপাদ-মস্তক রোমান্টিক হয়েও এই রোমান্টিক আবেগকে শৃঙ্খলিত করেছেন বাস্তবতার অনুশাসনে। প্রেমের কবিতায় যুক্তি, বুদ্ধি, তত্ত্ব ও বোধের চেয়ে তাৎক্ষণিক আবেগমথিত মানস অবস্থাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো কথা।

ভাব, ভাষা, বিষয়ের সঙ্গে নজরুলের উপর্যুক্ত কবিতাগুলোর প্রকরণ পরিচর্যার বিশেষত্বও লক্ষণীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোমান্টিক মানস প্রবণ কবি তাঁর প্রিয়ার বর্ণনায় প্রায়ই আশ্রয় করেছেন প্রকৃতির বিচিত্র সব উপকরণ-অনুষঙ্গ। ফলে একদিকে তাঁর প্রেমবোধ, অন্যদিকে প্রকৃতি চেতনার পরিচয় আভাসিত হয়েছে। অলঙ্কার সৃজনেও তাঁর একই রোমান্টিক স্বভাব লক্ষণ প্রতিফলিত। বিভিন্ন প্রেমের কবিতায় 'রোমান্টিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বেদনা যন্ত্রণা আর পরাভবের চিত্র নির্মাণ করেছেন নজরুল'।[১১] চিত্রকল্প প্রধানত বিষয়ের মর্মগত দিকের চেয়ে আঙ্গিকগত দিকটিকেই পরিস্ফুট করে তোলে। অনেক সময় একে সহায়তা করে উপমা, রূপক, প্রতীক–সব মিলে চিত্রকল্প। চিত্রকল্পের মানে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সরাসরি চিত্রায়ণ নয়, বরং একে বলা যায় কল্পনাকে অধিকতর উজ্জীবিত করার মাধ্যম। 'বর্ণনার দেয়াল ঘেরা উদ্যান নয়, ব্যঞ্জনার ব্যাপক বাগান আমরা দেখতে চাই একটি কবিতার আভাতমসার চক্রে। ১২ নজরুল কাব্যের সার্থকতার প্রধান কারণ তাঁর চিত্রকল্প সৃজন-দক্ষতার মধ্যে নিহিত। এ যেমন বিদ্রোহী মেজাজের কবিতায়, তেমনি প্রেমের কবিতায়। বলাবাহুল্য, উভয়ক্ষেত্রেই কবিতার বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের সার্থক অনুষঙ্গরূপেই বিবেচিত হয়েছে এবং লালিত্য ও মাধুর্য্যে এর তুলনা মেলা ভার। তাঁর কিছু কিছু প্রেমের কবিতা থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যায়,

ক. উপমা,

১। অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে কহে– "চিনি চিনি"

('পূজারিণী' 'দোলন-চাঁপা')

২. বিজলী-শিখার প্রদীপ জ্বেলে ভাদর রাতের বাদল-মেঘ
দিগ্বিদিকে খুঁজছে তোমায় ডাকছে কেঁদে বজ্র-বেগ
দিগ্বিদিকে খুঁজছে মেঘ।
('আশান্বিতা', 'দোলন-চাঁপ')

৩. শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালোজল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
('চৈতী হাওয়া' 'ছায়ানট')

৪. মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে,
('শেষের গান' 'ছায়ানট')

খ. উৎপ্রেক্ষা,

১। ধুলি-অন্ধ ঘূর্ণিসম
দিবাযামী
ঘরে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়—
('পূজারিণী' 'দোলন-চাঁপা')

২। সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাক্‌বে নত চোখে
('বেদনা -অভিমান', 'ছায়ানট')

৩। দুইটি হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন।
('মরমী'-'ছায়ানট')

৪। অগ্নিগিরি এসে যেন মরুভূর কাছে হায় জল-ধারা চাবে
('বেলাশেষে' 'দোলন-চাঁপা')

গ. অনুপ্রাস,

১। সর্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে নাকো চিত্ত-কূলে
('ব্যথাগরব' 'দোলন-চাঁপা')

২। দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজ্‌কে দহে
('অবেলার ডাক' 'দোলন-চাঁপা')

৩। আগল ভেঙে আসবে পাগল, চুম্‌বে সজল নয়ন-পাত
('আশান্বিতা' 'দোলন-চাঁপা')

৪। সিঁথির বীথির খসে পড়া কপোল-ছাওয়া চপল-অলক
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক
('মানসবধু' 'ছায়ানট')

ঘ. অন্ত্যমিল

১। অলস বৈশাখে/ কলস কই কাঁখে
('দুপুর-অভিসার', 'ছায়ানট')

২। মরম-কথা/ শরম-নতা
('পাঁপড়ি-খোলা' 'ছায়ানট')

৩। নাসায় তিলফুল/ হাসায় বিলকুল
('প্রিয়ার রূপ' 'ছায়ানট')

৪। নদীজল/ অবিরল

('পূজারিণী' 'দোলন-চাঁপা')

আন্তরধর্মে রোমান্টিক কবি নজরুল ভাব ও বিষয়গত দিকে যেমন, অলঙ্কারাদির শিল্পিত সৃজনেও তেমনি এক উজ্জ্বল স্রষ্টা।

তথ্যনির্দেশ

১. বশীর আল হেলাল, 'নজরুল-কাব্যের দুই ধারা' নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংকলন, পৌষ ১৩৯৮, পৃষ্ঠা-১১।

২. নারায়ণ চৌধুরী 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কাব্যশৈলী' 'নবপর্যায়ে সাহিত্য ভাবনা', কলিকাতা: পপুলার লাইব্রেরী-১৯৮১ পৃ: ৪২;

৩. নার্গিসের সঙ্গে বিচ্ছেদেব পরপরই কামাল পাশা, বিদ্রোহী, ভাঙার গান, প্রলয়োল্লাস–এই মহৎ সৃষ্টিগুলো উৎসারিত হয়েছিলো কবির লেখনী থেকে।

৪. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' বাঙলা একাডেমী; ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ:৮২

৫. আনিসুজ্জমান ও অন্যান্য সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃ: ৪০৮, ৪১০, ৪১৪, ৪২২।

৬. কাজী মোজাম্মেল হোসেন, ' প্রেমের কবিতায় নজরুলের বর্ণ বৈচিত্র্যঃ চিত্র শিল্পের দৃষ্টিতে', নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, ভাদ্র-১৩৯৯, পৃ: ৯৬।

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' বাংলা একাডেমী; ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ: ৪৬ ৪৭

৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ: ২০৮।

৯. সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি' প্রথম খণ্ড, কলিকাতা: ডি, এম লাইব্রেরী, ১৩৬১, পৃ:২৩০।

১০. আহমদ শরীফ, 'একালে নজরুল' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৩।

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'নজরুল চিত্রকল্প', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল ইসলাম', করাচী বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা বিভাগ, ১৯৬৯ পৃ: ২৭৯।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — বিংশ সংকলন]

নজরুল ও তুলনামূলক সাহিত্য

শামসুদ্দিন চৌধুরী

সাধারণের সিদ্ধ প্রত্যয় এমত যে নজরুল শিক্ষাদীক্ষায় উন ছিলেন। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন এমনকি স্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধ ছিলেন না। আমরা এই প্রচল প্রত্যয়ের পরিপন্থী মত পোষণ করি। এ পর্যায়ে নজরুল ইসলাম 'তুলনামূলক সাহিত্য' ধারণার সাথে কতটা পরিচিত ছিলেন তা পর্যবেক্ষণ করব।

নজরুল ও তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় বিবেচ্য হতে পারে তিনি কি বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের সাথেও পরিচিত ছিলেন? সমকালীন সাহিত্য জগতের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কতটা ওয়াকেবহাল ছিলেন? নজরুলের মানসে বিশ্বনাগরিকতার উপাদান সমূহ কোন কোন সূত্রে পুষ্ট হয়েছিল। আর 'তুলনামূলক সাহিত্য অভিধা'র সঙ্গে নজরুল পরিচিত ছিলেন কিনা?

নজরুল সম্পর্কে চালু নানাবিধ উৎকেন্দ্রিক ধারণার অন্যতম তার শিক্ষাদীক্ষার উনতা সম্পর্কিত অভিযোগ। যা পুষ্ট হয়েছে কিছুটা নজরুলের নিজের বাউন্ডেলে জীবনযাপন ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাবের জন্য। সাজানো পরিকল্পিত জীবন তাঁর ছিলনা, ছন্নছাড়ার ন্যায় বেড়ে উঠেছেন। ঘর ছেড়েছেন শৈশবেই, নানা বিপর্যয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছতে বার তিনেক ছেদ পড়ে। অথচ গ্রামের পাঠশালা, মাথরুন হাই স্কুল, দরিরামপুর হাইস্কুল ও সিয়ারসোল হাই স্কুলে সেরা ছাত্ররূপেই পরিচিত ছিলেন এমন কি ডবল প্রমোশন লাভের মত যোগ্যতাও ছিল তাঁর। বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে ইতি ঘটালেন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার। এরই ফাঁকে পাঠশালার ওস্তাদগিরি, লেটোর দলে কবিয়ালের চাকুরি, রুটির দোকানে কাজ, রেলওয়ে গার্ডের বাবুর্চিরূপেও বহাল হয়েছেন। উনিশ বছর বয়সে যোগ দিলেন ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে। নৌশেরার ট্রেনিং শেষে করাচী ক্যাম্পে ছিলেন তিন বছর। করাচী সেনানিবাসে থাকতেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ –'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'। এরপর প্রায় দুই যুগ সাহিত্যচর্চা করেছেন অসুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়কালে ২২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩টি কাব্যানুবাদ, ৩টি উপন্যাস ও দুই সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন। সাহিত্যচর্চা ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদনা, চলচ্চিত্রে অভিনয়, সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ করেছেন। তাঁর সমকালের যে কোন আন্দোলন উপপ্লবে তিনি যুক্ত থেকেছেন। 'বর্তমানের কবি' হওয়াই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল।

মনন আচরণে নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। বাংলার 'হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাতে চেয়েছেন' তিনি। হিন্দু-মুসলিম সাধারণের সংবর্ধনার উত্তরে এলবার্ট হলে এ প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেছেন। 'তাঁর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যচেতনার শিকড় ছিল গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্য স্বীকরণের ভিতরে এবং স্বভাবগত অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের মধ্যে'।[১] প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর চিঠির উত্তরেও আপত্তি জানান 'মুসলিম সাহিত্য' প্রসঙ্গে–'ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিমভাবাপন্ন সাহিত্য। যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তা সকল জাতিরই হবে'।[২] এই চিঠির অন্যত্র রয়েছে 'আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী'। তাঁর হাতেই যুগপৎ ইসলামী গজল ও শ্যামা সঙ্গীত রচিত হতে দেখি।

সমকাল মনস্কতা নজরুল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলেও নজরুলকে বলা হয় কালের সৃষ্টি। পরিপার্শ্ব ও সমকালের সাথে একাত্মতার জন্যই ফৌজে যোগ দিয়েছেন, রাজপথে নেমেছেন, জেলে গিয়েছেন, অনশন করেছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, গণ মানসে বিপ্লবের আগুন জ্বেলেছেন। তবে নজরুল নিজে যদিও কালের দাবী পূরনের কথা বলেছেন অথচ প্রায়শই নজরুল কালজ হয়েও কালোত্তর হয়ে গেছেন। নিজস্ব মননমুদ্রায় আবেগের অকৃত্রিমতায় চিরন্তন হয়ে উঠেছেন। যেমন 'ভাঙার গান' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জেলে থাকার সময়ে লেখা হলেও চিরকালের শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র হাতিয়াররূপে উত্তীর্ণ হয়েছে। আবদুল মান্নান সৈয়দের সাথে আমরাও অভিন্ন মত পোষণ করি যে 'সমকালে ও সাময়িকতায় যুক্ত থেকেও নজরুলের একটি চোখ সর্বসময় দেশোত্তর ও কালোত্তর'। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের দেয়া প্রতিভাষণ থেকে স্মরণ করতে পারি—'আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের'।[৪]

নজরুলের ছন্নছাড়া জীবনে সেনা-পর্বটি গুরুত্ববহ। স্বল্পমেয়াদী এ সময়টুকুতে নজরুলের অর্জন কম নয়। স্কুল শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ তাড়নের লক্ষ্যে সৈন্যদলে যোগ দেন। পরাধীন দেশের এই যুবকের মানসে আলোড়ন তুলল রুশ দেশে লাল ফৌজের প্রতিষ্ঠালাভের ঘটনা। ১৯১৭ সনের অক্টোবর বিপ্লবে মেনশেভিকদের হাত থেকে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখল, রুশ বিপ্লবধ্বংসী অভিযানে মিত্রশক্তির অংশ হিসেবে ভারতীয় সৈন্যদের অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি, বিদ্রোহ সবই নজরুলের গোচরে ছিল। তাঁর ফৌজী এক বন্ধুর স্মৃতিচারণে জানি[৫] ব্রিটিশদের কড়াকড়ি সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংবাদ, পত্র-পত্রিকা নজরুল জোগাড় করতে সমর্থ হতেন এবং সমমনাদের নিয়ে আলোচনা করতেন। অনুরূপ ঘটনা মেলে 'ব্যথার দান' গল্পে যেখানে নায়ক লাল ফৌজে যোগ দেয়। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও জানাচ্ছেন 'রুশ বিপ্লবের পত্রিকা' নজরুল নানা কৌশলে হাত সাফাই করে আমদানী করতেন। তার এই কৌতুহল নিবৃত্তির অন্য পথও ছিল। সৈনিক জীবনের ন্যায় এক

ঠাঁই হয়ে নজরুল বেশী দিন থাকেন নি তাই এর যথার্থ প্রয়োগ করতেও দেরী করেন নি–'কাজী নজরুল করাচীতে গিয়ে প্যারেডের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কোয়ার্টার মাস্টার হয়ে লেখাপড়ায় ডুবে গেলেন। তখনকার দিনে যতরকম মাসিকপত্র 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী' 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সবুজপত্র' ইত্যাদি সবই তিনি রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সব সময়েই সঙ্গে থাকত।'[৬] সবচেয়ে বেশী চর্চা করেছেন ফারসী সাহিত্য। শৈশবে পিতৃব্য বজলে করিম বাহারের হাতে যে ফারসী চর্চার হাতে খড়ি পল্টনে এসে তাতে পারদর্শী হন। নজরুলেরই নিজের বয়ান[৭] 'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে সে দিন থেকেই তার কাছে ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তারই কাছে ক্রমে ফার্সী কবিদের সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।' পরে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে আসেন তখন অন্যান্য বইপত্রের মধ্যে ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ ছিল। ফারসী কাব্য নজরুলের সাহিত্যেও যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। তাঁর সাময়িকপত্রে প্রকাশ বিচারে তৃতীয় কবিতাটি–আশায় (প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৬) হাফিজের একটি গজলের অংশবিশেষের তরজমা। আর 'বোধন' শীর্ষক ৫ম কবিতাটিও হাফিজের 'যূসোফে গুম গুশতা বাজ্ আয়েদ ব-কিনান গম্ মখোর' নামক গজলের ভাবানুবাদরূপে মোসলেম ভারত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৮] কার্তিক ১৩২৭ বঙ্গনূরে প্রকাশিত 'বাঁশীর ব্যথা' নামক কবিতাটিও রুমীর ভাবানুবাদ। দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে মোট ৯টি গজলের ভাবানুবাদ করে প্রকাশ করেছেন মোসলেম ভারত, প্রবাসী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ও কল্লোলে।[৯] রিক্তের বেদনের 'সালেক' গল্পটি ছাড়াও রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের ৭৩টি রুবাই অনুবাদ করেন ওমর খৈয়ামের দুই শতাধিক রুবাই অনুবাদ করেন রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম নামে। উভয় অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকাদ্বয় কবির ফারসী সাহিত্যে পারদর্শিতার স্বাক্ষরবহ।

আরবী ছন্দের কবিতা (প্রবাসী ১৯২২) শীর্ষক প্রবন্ধটি গভীর আরবী ছন্দজ্ঞানের পরিচয় বহ। ১৮টি আরবী ছন্দের আলোচনা উদাহরণসমৃদ্ধ হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। কোরআন শরীফের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের ইচ্ছা ছিল তার। ১৯৩৩ সালে প্রকাশ করেন 'কাব্যে আমপারা' যা তৎকালীন মোল্লাদের বিচারেও উৎরে গিয়েছিল।

তবে কেবল আরবী-ফারসী সাহিত্যই নয় ইংরেজী সাহিত্যের চর্চাও তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। 'করাচী সেনানিবাসে থাকতেই তিনি শুধু রুমী হাফিজের গজল নয়, 'গণতন্ত্রের কবি' হুইটম্যানের Leaves of Grass (১৮৫৫) For you O Democracy (১৮৬০) Pioneers! O Pioneers! প্রভৃতি গদ্য কবিতার সাথে পরিচয় লাভ

করেছিলেন।[১০] হুইটম্যানের সাথে নজরুলের পরিচয়ের সাক্ষ্য অপ্রতুল নয়। হুইটম্যানের উল্লেখ নজরুলের চিঠিপত্রে, লেখায় ছড়িয়ে আছে। 'অগ্রপথিক' কবিতাটি হুইটম্যানের Pioneers! O Pioneers! কবিতা অনুসরণে রচিত হয়েছিল। 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধেও one's own self এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। চিঠিপত্রে[১১] হুইটম্যানকে উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যের ঋষি বলে এবং song of myself এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। মোহিতলাল মজুমদারও প্রয়াসী হয়েছিলেন নজরুলকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে পরিচিত করাতে –'পড়ো শেলী, কীট্স, পড়ো—বায়রন ব্রাউনিং'। গণবাণী ২২শে বৈশাখে নজরুলের প্রকাশিত 'জাগরতূর্য' কবিতাটির পাদটীকা ছিল–'শেলীর ভাব অবলম্বনে।' রুশ সাহিত্যের আঙ্গিনাও নজরুলের অপরিচিত ছিল না। যতীন্দ্র মোহন বাগচীর বাড়ীতে গানের আসর শেষে সাহিত্য-আলোচনার সংবাদ জানি 'কথা হচ্ছিল রুশ সাহিত্য নিয়ে, সব সুমহান পূর্বসূরিদের সাহিত্য—পুশকিন, টলস্টয়, গোগল, ডস্টয়ভস্কি।'[১২]

যে সমকালমনস্কতা নজরুল সাহিত্যের সিলমোহর তার দাবীতেই নজরুল সমকালের অন্যান্য সাহিত্যের সুলুক-সন্ধান রেখেছেন। আর বিশ্বসাহিত্য চর্চাই তাঁর মানসে বৈশ্বিকতার উপাদান যুগিয়েছিল। এই ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হয়েছিল ইকবালের প্রভাব। নজরুল ইকবালের ন্যায়ই প্যান-ইসলামিজম-এ বিশ্বাস করতেন–'কামাল পাশা', 'আনোয়ার' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতা তার নিদর্শন। এছাড়া আবদুল কাদিরের সাক্ষ্যে জানতে পারি[১৩] নজরুল কথা প্রসঙ্গে ইকবালের শেকোয়া ও আসরারে খুদী অনুবাদের সংকল্প জানান। নজরুল মনে করতেন 'বাঙলার মুসলমানরা ইকবালের শেকোয়া ও আসরারে-ই-খুদী হতে প্রচুর প্রেরণা পেতে পারেন।' তাছাড়া তিনি 'বাঙালী মুসলমানের ঐহিক ও আত্মিক জীবনের দুর্গতি' নাশের জন্য ইকবালের অনুসরণে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন।

নজরুল মানসে বিশ্বনাগরিকতার উপাদান যুগিয়েছে কল্লোলের আড্ডা। কল্লোলে নজরুল যুক্ত হলেন জেলে বসেই। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কথা দেন কল্লোলের জন্য কবিতা লিখবেন। নজরুল ছিলেন কল্লোলের প্রাণ পুরষ—অচিন্ত্যকুমারের জবানীতে শুনি 'নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মভোলা বন্ধুত্বের পরিচয় পেলাম তারপরে স্বাদ পাব তার দারিদ্র্য জয়ী যুক্ত প্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম। সবই সেই কল্লোলযুগের লক্ষণ'।[১৪] নজরুলের 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ হওয়ার অভিঘাত কল্লোলের লেখকদেরকেও স্পর্শ করে।[১৫]

আবার কল্লোল বিশ্বসাহিত্য অনুবাদ ভাবানুবাদের মাধ্যমে হামসুন, গোর্কি, বোয়ার বিয়ার্নসনকে নিয়ে এল বাংলায়। কল্লোলে রমা রলাঁ,জাসিন্তো বেনাভাঁতে, যোহান বোয়ার, ক্নুট হামসুন প্রমুখের আশীর্বাদপত্র ছাপা হত। এদের সঙ্গে নজরুলেরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি সেই সাক্ষ্য বহন করে। কল্লোলের

কসমোপলিটান আবহাওয়া বুঝতে 'বেদে' উপন্যাসের নায়কের ভাবনা শোনা যাক—'বাঙলার কোণে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের উপর পা ছড়িয়ে বসে—ডস্টয়ভস্কি কাঁধের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবার টুকু গোর্কির সঙ্গে একত্রে খাই, হামসুন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্পকরে যায়-জ্বরো কপালে বোয়ার তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয় নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ফ্রসেঁ কতদিন আমার এই ঘরে এসে জিরিয়ে গেছে'। বেদে'র নায়িকা মৈত্রেয়ী নায়ককে বলে-দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লাসের যেমন লেসবীয়া, মিকাল এঞ্জেলোর যেমন ভিক্টোরীয়া কালোনো'—তেমনি আমি তোমারই।' কল্লোলের সাহিত্যাদর্শ শোনা যাক কথাকার অচিন্ত্যকুমারের উক্তিতে[১৬]—'যেহেতু আমরা সাহিত্যিক সেহেতু আমরা সমগ্র বিশ্বজনের আত্মজন, এমনি একটা গর্ব ছিল মনে মনে। আমাদের জন্য দেশের ব্যবধান নেই, ভাষার অন্তরায় নেই। আমাদের গতিবিধি পরিধিহীন। পৃথিবীর সমস্ত কবি ও লেখকের সঙ্গে আমরা সমবেত হয়েছি একই মন্দিরে, সম্মিলিত হয়েছি একই উপাসনায়। আসনের তারতম্য আছে, আছে ভাষণের গুণভেদ—কিন্তু সন্দেহ কি সত্যের দেবালয়ে, সুন্দরের বন্দনায় একত্র হয়েছি সকলে এক সামমন্ত্রে। সমস্ত পৃথিবী আমাদের স্বদেশ, সমস্ত মানুষ আমাদের ভাই—সেই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতিতে।" এ বক্তব্যের সাথে নজরুলের মতদ্বৈধতা নেই। 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করা চলে[১৭] 'সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের। ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কোন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে, ইহা তাহারই অন্তরের অন্তরতম কথা। এই রূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়।' একই প্রবন্ধের অন্যত্র কবির মন্তব্য[১৮] 'সাহিত্যে যে একটা নতুন ধারা চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক নতুন লেখক এখনও অন্ধ।' এই নতুন ধারাটি চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে। সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা- রোমান্টিক ও রিয়ালিস্ট। রিয়ালিস্ট সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রুশ সাহিত্যের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যও আলোচনা করেছেন। স্বপ্নচারী রোমান্টিকদের তালিকায় ফেলেছেন শেলী, কীটস, নোগুচি, ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথকে। বাস্তববাদীদের তালিকাভুক্ত করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি, যোহান বোয়ার, জর্জ বার্নার্ডশ, জসিন্তো বেনাভাঁতে, ওয়াদিশল রেমন্ট, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা প্রমুখকে। সমস্ত প্রবন্ধে অধিকতর পরিসর পেয়েছে—ম্যাক্সিম গোর্কি প্রসঙ্গ— তাঁর আবির্ভাব, অক্টোবর বিপ্লব। স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে তুলনা করেছেন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের সঙ্গে। যোহানের 'গ্রেট হাঙ্গার' এর 'সোয়ান' এর সাথে তুলনা করেছেন ভারতীয় উপনিষদের আনন্দকে। যোহানের অন্য এক উপন্যাস। 'The

prisoner who snag' নায়কের সাথে উপনিষদের সচ্চিদানন্দের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভারতবর্ষে তুলনামূলক সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ' শুরুর মাধ্যমে।[১৯] ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদেই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে গ্যেটের ধরনে তুলনামূলক সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য নামকরণ করেন—'আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজীতে আপনারা তাহাকে comparative literature নাম দিয়াছেন। বাঙলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।'[২০] গ্যেটেও ৩১ জানুয়ারি ১৮২৭-এ চিঠিতে লেখেন একারমানকে 'জাতীয় সাহিত্যের দিন অবসিত হলো', এবার আমাদের যাত্রা বিশ্বসাহিত্যের দিকে। এই 'নামকরণটি গ্যেটের।---জগতে যে বহুকাল ধরে বহুপ্রকার সাহিত্য রচিত হয়েছে এই আবিষ্কারটি গ্যেটের সময় নতুন ছিলো না; নতুন ছিলো তার বিশ্ববীক্ষা, সেই বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি।--- সাহিত্য বিশ্বমানবের এক আবহমান মিলনস্থল। ---মানুষ যে এক এই সত্যটিকে তিনিই শুধু মুখোমুখি দেখেছেন নানা দেশের সাহিত্যে যিনি অভিজ্ঞ।[২১]

সাহিত্যের অধ্যয়ন দুভাবে হতে পারে জাতীয় সাহিত্য হিসেবে ও বিশ্বসাহিত্য হিসেবে। জাতীয় সাহিত্য হিসেবে অধ্যয়নের অসম্পূর্ণতার কথা অনুধাবন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-'পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবে দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব।[২২] রেনে ওয়েলেকও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন-[২৩] 'yet literature is one , as art and humanity are one and in this conception lies the future of historical literary studies'. নজরুলের বিশ্ববীক্ষা সমন্বিত প্রাসঙ্গিক বক্তব্যও উদ্ধৃত করা চলে[২৪]— 'সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের। ইহা এক জনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোওয়া দিবেন।...যাহা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দুদিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়।' নজরুল সম্ভবত গ্যেটে পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে নজরুলের পাঠপরিধি, নজরুলমানসে বৈশ্বিকতার উপাদান (l'agents de cosmopolitanisme) ও বিশ্ববীক্ষার বিচারে নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী বিবেচনা করা যায়। তিনিও

রবীন্দ্রনাথের মত 'বিশ্বসাহিত্য' অভিধায় তুলনামূলক সাহিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন।

তথ্য নির্দেশ

১. হায়াৎ মামুদ–'প্রতিভার খেলা নজরুল', পৃ. ৬৯–৭০, (১৯৮৮)

২. আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫ (১৯৭৭)

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ– 'নজরুল ইসলাম কালজ কালোত্তর' পৃ. ৩৪ (১৯৮৭)

৪. আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬ (১৯৭৭)

৫. শম্ভু রায়ের চিঠি: প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' থেকে উদ্ধৃত পৃ. ২৯০–২৯১

৬. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়–'কাজী নজরুল' পৃ. ৩৪ (১৯৭৭)

৭. নজরুল ইসলাম-'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র ভূমিকা, পৃ. ১, (১৯৭৭)

৮. আবদুল কাদির-'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ', পৃ. ২১৪ (১৯৭০)

৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ–'নজরুল–কবি ও কবিতা', পৃ. ১০০

১০. আবদুল কাদির–'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ', পৃ.৪৪৫, (১৯৯০)

১১. আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার', ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪, (১৯৭৭)

১২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত— 'কল্লোল যুগ' পৃ. ২৮

১৩. আবদুল কাদির–'নজরুল প্রতিভার স্বরূপ', পৃ. ৯৭ (১৯৯০)

১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' পৃ. ৩৩ (১৩৬৬)

১৫. প্রাগুক্ত পৃ. ৫০

১৬. প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৫

১৭. আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৯ (১৯৬৬)

১৮. প্রাগুক্ত পৃ. ৬২৮

১৯. Budhadeva Bose 'Contribution to Comparitive Literature Germany and India' p, 85 (1973)

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–'সাহিত্য', পৃ. ৭৪ (১৩৭৬)

২১. বুদ্ধদেব বসু–'স্বদেশ ও সংস্কৃতি।' পৃ. ৯১ (১৩৬৭)

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–'সাহিত্য', পৃ. ৭৪ (১৩৭৬)

২৩. Rene Wellck and Austin Warren–'Theory of Literature' p, 42 (1977)

২৪. আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৯ (১৯৬৬)

[সূত্র : নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্দশ সংকলন]

নজরুল প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম মিলন ভাবনা

হাকিম আরিফ

ব্রিটিশ ভারতের শ্রেণী-খণ্ডিত, ধর্ম-বিচ্ছিন্ন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমাচ্ছন্ন বহুধা বিভক্ত সমাজে জন্মগ্রহণ করেও কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িকতম লেখক। বহু পথ ও মতে লতায়িত হয়ে ওঠাজনিত কারণে সমাজের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা প্রত্যক্ষ করে নজরুল ইসলাম রক্তাক্ত ও ক্ষতাক্ত হয়েছেন এবং এই উপলব্ধিতে স্নাত হয়েছেন যে ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি ও মানবতার বিকাশের জন্য প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ এবং হিন্দু ও মুসলমানের সত্যিকার মিলন। তারই আদর্শে উজ্জীবিত তিনি স্বাভাবিক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের গান গেয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং তাদের ঐক্যের ব্যগ্রতায় হয়েছেন সর্বদা তৎপর ও উচ্চকিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের মতো অসাম্প্রদায়িক লেখক বিরল।[১]

ভারতবর্ষের প্রধান দুই জাতি হিন্দু ও মুসলমানের এই মিলনের ভাবনা যেমন, নজরুলের কবিতা, গান ইত্যাদিতে লক্ষণীয়, তেমনি তার রচিত প্রবন্ধসমূহেও এই ধারণাটি আরও বেশি প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট ও জোরালো। যদিও তাঁর প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশেরই বিষয় হচ্ছে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ এবং প্রধানত সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে রচিত কিন্তু তারপরেও সাম্প্রদায়িকতা তথা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মত ভারতবর্ষের তৎকালীন অথচ সমাজের মর্মমূলে প্রোথিত গভীরতর সমস্যাদি নিয়ে প্রবন্ধে লেখনি ধারণ করার কারণে এগুলির উপযোগিতা চিরকালীনতায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এবং এই চিরকালীনতার জন্যই প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যগুণের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত যে সমস্ত প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তার মিলন বিষয়কে উপজীব্য করেছেন এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'যুগবাণী' গ্রন্থের 'নবযুগ', 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ', 'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য', 'ছুঁৎমার্গ' ও 'রুদ্র-মঙ্গল' গ্রন্থের 'আমার পথ', 'মন্দির ও মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান' প্রভৃতি।

অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা বা মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণে নজরুলের উৎসুক্য কিন্তু কোন আরোপিত বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার নয়, বরং এটি তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে, চেতনার গভীরে প্রত্ন-প্রতিমার মতো ধারণা করা একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং এটি তাঁর হয়ে ওঠা ব্যাপার। কারণ ভারতের সর্বংসহা মাটি, সমাজ ও সংস্কৃতির

একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, যুগে যুগে ভারত হাজারো মত, পথ ও চিন্তার মানুষকে আপন করে নিয়েছে আন্তরিকতায় ও একান্ততায়। একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশ কর্তৃক সচেতনভাবে সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ব্যতীত ভারত মূলত সর্বদাই জাতি নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী ভূ-খণ্ড ছিল। শাশ্বত ভারতের এই যে পরমত সহিষ্ণু মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য তা নজরুল ইসলাম চেতনায় ধারণ করেছিলেন অবচেতনেই। তাছাড়া শৈশব থেকেই নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ করেছেন,ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি পৃথক বহমান ধর্ম ও জনগোষ্ঠী থাকলেও এরা একই জল ও বায়ুতে পরিপুষ্টি লাভকারী, একই সাংস্কৃতিক আবহে স্থিত, মাঠে, ঘাটে, হাটে পরস্পরের সহযাত্রী ও সমব্যথী; জরা, মৃত্যু-ব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমানভাবে শিকার এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি উভয় জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল।[৩] ফলে নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের সার্বিক মুক্তি কামনায়, পৃথিবীতে ভারতীয়দের শির হিমালয়সদৃশ সুউচ্চ করার অনন্ত বাসনায় ও মানবধর্মের পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা অটুট ছিল। অধ্যাপক আহমদ শরীফের ('একালে নজরুল', ১৯৯০; ১৮) ভাষায়,

> সাহিত্যক্ষেত্রে তাই তাঁর এ অসাম্প্রদায়িক মৈত্রীকামী চেতনা সক্রিয় ছিল গোড়া থেকেই। নজরুল ইসলাম সারা জীবন প্রায় সতর্কভাবেই চেতনায় চিন্তায় কথায় কাজে ও আচরণে এ অসাম্প্রদায়িকতা বজায় রেখেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও তা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন এভাবে,

> আমি হিন্দু-মুসলমানদের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দুদের দেবীর নাম নিই।[৪]

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে হস্তগত করার পর থেকে ভারতে তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার অসৎ বাসনায় হিন্দু ও মুসলিম যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে না পারে সে জন্যে ভেদবুদ্ধির সহায়তায় বিভেদনীতি চালু করে এবং হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বিভক্তির সুযোগে নির্বিঘ্নে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু ততদিনে ভারতবাসী ইংরেজি শিক্ষা করে ইংরেজি গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নপূর্বক ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাম্য, গণতন্ত্র, রেনেসাঁর বোধে আকৃষ্ট হয়, নিজেদের দেশপ্রেমকে শাণিত করে এবং নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। ইতোমধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বিভেদ ও সংঘর্ষের কারণে ভারতে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কংগ্রেসের পাশাপাশি মুসলমানদের রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ (১৯০৬) আত্মপ্রকাশ করে। তবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের স্বার্থে ১৯১৬ খ্রিস্টিয় সনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকা

ফেরত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলমানরা আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে শুরু করে খেলাফত আন্দোলন।[৬] এভাবে আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও[৭] গান্ধীর আহ্বানে 'কংগ্রেস-খেলাফত' গোষ্ঠীর যৌথ আন্দোলন 'অসহযোগ-খেলাফত' সংগ্রাম জোরদার হয়। কিন্তু পরস্পরের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবে আন্দোলন অসফল হয় এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্রমাবনতির কারণে ১৯২৬ খ্রিষ্টিয় সনের ২ এপ্রিল হিন্দুদের রাজরাজেশ্বরী দেবীর মিছিলকে কেন্দ্র করে কলিকাতায় ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।[৮] আসলে রাজনৈতিক দলসমূহকে কেন্দ্র করে যে ক্ষণস্থায়ী হিন্দু-মুসলমানের মিলন সূচিত হয়েছিল, তা ছিল মূলত কতিপয় রাজনীতিকের ফায়দা হাসিলের কৌশল মাত্র। এতে কোন আন্তরিকতা ছিল না, ছিল না পরস্পরের কল্যাণ কামনার মহৎ লক্ষ্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে এদের নেতৃত্বের প্রতি নজরুলের বিশ্বাস ছিল না। তাঁর ভাষায়,

> হিংসা দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা। অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, "ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়।[৯]

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান শত শত বৎসর ধরে পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করছে। একই অন্নে গ্রাসাচ্ছাদন করে, একই হাওয়া ও বায়ুতে প্রাণ শীতল করে, একই সময় ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নিজেদেরকে সাঙ্গীকৃত করে। একই বোধ ও উপলব্ধিতে স্নাত হয়ে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দিনাতিপাত করলেও উভয়ের অন্তরের গহীন কোণে যেন এক প্রচ্ছন্ন বাধা আছে, যে বাধা বা অন্তরায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মর্মমূল থেকে জাত নজরুল ইসলাম গভীর প্রজ্ঞায় ও অন্তর্দৃষ্টিতে এ সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে 'ছোঁয়া-ছুঁয়ি'কে সনাক্ত করেছেন।

> আমাদের গভীর বিশ্বাস যে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না, তাহা কোন ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি।[১০]

আসলে এই ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বা ছুঁৎমার্গ হচ্ছে ভারতীয় হিন্দু সমাজের এক ঘৃণিত ও কদর্য উপাচার। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণরা তাদের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নের জন্যে এবং বর্ণপ্রথাকেই জিইয়ে রাখার পক্ষে এর প্রচলন ঘটিয়েছিল। শোষণ, প্রবঞ্চনা এবং অসম্মানসূচক এই ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার অব্যাহত থাকার ফলে হিন্দু সমাজ দিন দিন যেমন নির্বীর্য ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তেমনই এর কারণেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কখনই ঐক্যের পতাকাতলে সারিবদ্ধ হতে পারেনি। আবার

এই ছুঁৎমার্গের কারণেই হিন্দুরা মুসলমানকে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি বলে দূরে রেখেছে এবং লেখকের মতে এভাবেই ভারতবর্ষে মনুষ্যত্বের বিপুল অবমাননা হয়েছে।

ধর্মের আবরণ থেকে ছুঁৎমার্গের মতো জঘন্য উপচারকে উৎপাটন করার পর ধর্মের যে সুন্দর ও কল্যাণময় রূপ বেরিয়ে আসে, তা মানবতার মুক্তি অগ্রগতি সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। মুসলমান ধর্মপ্রাণ পরিবার অর্থাৎ দরবেশ পীরের মাজারের ও মসজিদের খাদেম বংশে[১১] জন্মগ্রহণকারী কাজী নজরুল ইসলাম উপরিউক্ত চেতনা ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে ধর্মকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সকল ধর্মকেই সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ভেবেছেন,

> ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এইখানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম শুধু কোন নির্দিষ্ট এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের।[১২]

কিন্তু ধর্মের উপর যখন শাস্ত্রীয় আচার তথা বাহ্যিক আবরণ চেপে বসে তখনই ধর্মের শক্তি কমে যায়, ধর্মের প্রাণ বা স্পিরিট নষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্মে ধর্মে বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। মূলত শাস্ত্রীয় আচার বা আচরণ হচ্ছে বাইরের মেকীরূপ আর ধর্ম হচ্ছে খাঁটি; আচার যদি হয় বাকল তবে ধর্ম হচ্ছে তার শাঁস বা আঁটি। তাই আচার বর্জনীয় এবং ধর্ম হচ্ছে পূজ্য। প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায়, ধর্ম যুগে যুগে ঐ সমাজের আচার, সংস্কার গ্রহণ করে মেকিত্বের আড়ালে তলিয়ে যাওয়ার ফলে ধর্ম আচার সর্বস্বতায় পরিণত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায়ের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় আচার তথা বাহ্যিক আবরণকেও দায়ী করেছেন। এই বাহ্যিক আচার সমাজের মিলনের ক্ষেত্রে, অগ্রগতির ক্ষেত্রে, পরস্পর সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতিকর। কারণ তখন মানুষ ধর্মের মূল সত্য বা প্রাণকে আড়াল করে মেকিত্ব নিয়ে, আচার সর্বস্বতাকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ে মেতে ওঠে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের এই বাহ্যিক আবরণ বা শাস্ত্রীয় আচার হচ্ছে, 'দাড়িত্ব' আর 'টিকিত্ব'। এই 'টিকিত্ব' এবং 'দাড়িত্ব'-এর কারণেই হিন্দু-মুসলমান আজ মানুষ নাম ধারণ করেও পরস্পর আলাদা, বিমুখ, জঙ্গী এবং মারমুখী। লেখক বলেছেন,

> ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে,........ হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্বও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। ...টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।[১৩]

ধর্মের শাস্ত্রীয় আচরণ বা বাহ্যিক আবরণের পাশাপাশি ভারতের হিন্দু ও মুসলমান

ধর্মের তথাকথিত ধার্মিক বা ধর্মধ্বজাধারীদেরকেও নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় ভেবেছেন। কারণ এরা প্রকৃত ধার্মিক নয়, ধর্ম পালনের ভাণ করে মাত্র। এরা ধর্মকে পুঁজি করে, শাস্ত্রীয় আচারের অনুগত হয়ে ধর্মের বিনষ্টি সাধন করে, নিজেদের পকেট ভারী করে আখের গোছায়, মানবতার ধ্বংস সাধন করে। মানবতার প্রকৃত শত্রু এই তথাকথিত ধার্মিকদের কাছে মানুষের প্রাণের চেয়ে বিত্তের দাম অনেক বেশি। এরা ধর্মের চেয়ে ধর্মালয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়, ধর্মের সত্যকে বাদ দিয়ে উপাচারকে আকর্ষণীয় মনে করে। এরা 'ধর্ম-মাতাল' এবং শাস্ত্রকে না পেয়ে 'শাস্ত্রের এলকোহল' পান করে হয়েছে মোহাচ্ছন্ন এবং মতিভ্রষ্ট। এই তথাকথিত ধার্মিকদের ধ্বংসসাধন জরুরী, অন্যথায় মানবতার মুক্তি সাধন ত্বরান্বিত হবে না। এবং হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মে বিদ্যমান ভণ্ড ধার্মিকদের কুচক্রে হিন্দু-মুসলিমের মিলনও বিলম্বিত হবে। কারণ,

> এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। ...ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে। ইহারা ইট-পূজা করে। ইহারা পাথর-পূজারী।[১৪]

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের সার্বিক মিলনে বিশ্বাসী ও স্থিতধী কাজী নজরুল ইসলাম মিলনের পথে উভয় ধর্মের উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় আচার ও উপচারকে সুচিহ্নিত করে এদের প্রতিকারে তৎপর হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলনে প্রতিবন্ধক উপরিউক্ত অন্তরায়গুলি যদি হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাস ও চৈতন্য থেকে দূর করা যায়, তবেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ কণ্টকমুক্ত হবে। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও বিকাশের সময়টি ছিল ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী ব্রিটিশের করতলগত ভারতে তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব ছিল। পরস্পরের সন্দেহ, সংশয় ও সংঘর্ষের কারণে একদিকে যেমন ভারতের স্বরাজ বা স্বাধীনতার স্বপ্ন ক্রমশ দূরবর্তী হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিক নির্দেশনার অভাবে রাজনৈতিক হানাহানি ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই প্রতিকূল ও অনিশ্চিত অবস্থায় ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল দিশারী কাজী নজরুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অমরবাণী, এবং তাদেরকে আহ্বান করে বলেছেন,

> এই পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই, আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই। নহিলে এ ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই![১৫]

কাজী নজরুল ইসলামের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে শুধু তাঁর রচিত কবিতা, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি অর্থাৎ সাহিত্য চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়,

বরং ব্যক্তিগত জীবন-যাপনেও তিনি তাঁর এই বিশ্বাসের বাস্তবায়ন ঘটাতে চেয়েছেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে তিনি তাতে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন।[১৬] তাছাড়া তাঁরই সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'র (১৯২২) উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিঁয়ে বলেছেন,

> ধূমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।[১৭]

ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের মহৎ আকাঙ্ক্ষাটি নজরুল ইসলাম তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি। যদিও তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ভারতবর্ষে ঘটেনি, কিন্তু জীবিতাবস্থায় নজরুল যখনই কোথাও শুনেছেন বা দেখেছেন যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ক্ষণিকের জন্য হলেও এক জায়গায় মিলিত হয়েছে, ভালবাসার আন্তরিকতায় পরস্পরকে আপন করে নিয়েছে, তখনই তিনি আবেগে আপ্লুত হয়েছেন এই ভেবে যে এ ক্ষণিক মিলনই ভবিষ্যতের স্থায়ী মিলনের নির্দেশক। তিনি বিশ্বাস করতেন এভাবেই একদিন ভারতের সকল হিন্দু-মুসলমান স্থায়ী মিলনের মাধ্যমে শান্তির ও সমৃদ্ধির ভারতবর্ষ সৃষ্টি করবে এবং মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আকাঙ্ক্ষাটির মধ্য দিয়ে মানবধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন,

> ১. হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া-মানব, তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, "আমার ধর্ম মানুষ।[১৮]
>
> ২. এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি"।[১৯]

প্রকৃত পক্ষে নজরুল ইসলাম এক বিশ্বমাত্রিক শিল্পীসত্তা। সমৃদ্ধ বিশ্ব সাহিত্য ও শিল্প ঐতিহ্যে ঘটেছে তাঁর স্পর্ধিত প্রবেশাধিকার—যার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। সর্বোপরি নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এমনি এক প্রাতিস্বিক কথা-কোবিদ যিনি শিল্পের প্রয়োজনে, সৃষ্টির তাড়নায় পরিভ্রমণ করেছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মিথ-ভাণ্ডারে। তিনি শুধুই হিন্দু-মুসলিম মিলনেই সৃষ্টির আনন্দ পান না। তাই তাঁর প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিম মিলন ভাবনা প্রকারান্তরে পরিণত হয়েছে বিশ্ব-মানবতার বিকাশের অমোঘ মন্ত্রে—এখানেই তাঁর শিল্পী সত্তার সার্থকতা ও স্বাতন্ত্র্য নিহিত।

তথ্যপঞ্জি

১ বফিকুল ইসলাম (১৯৯১) ঃ কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৭, পৃ. ৫২১

২. ড. সুশীল কুমার গুপ্ত (১৩৬৭) ঃ নজরুল-চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ-১৩৯৫, পৃ.৩২১

৩. আহমদ শরীফ (১৩৯৬) ঃ একালে নজরুল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৮

৪. 'ইব্রাহিম খাঁকে নজরুল লিখিত চিঠি, সওগাত, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত, কলিকাতা পৌষ, ১৩৩৪, পৃ.৫৮০

৫. আহমদ শরীফ (১৩৯৬) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ.১২

৬. মোবাশ্বের আলী (১৩৯৬) ঃ নজরুল প্রতিভা, মুক্তধারা, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২, পৃ.২১৬

৭. আহমদ শরীফ (১৩৯৬) প্রগুক্ত, পৃ.১২

৮. মোবাশ্বের আলী (১৩৭৬) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫

৯ নজরুল -রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯০,পৃ.৬৩৯

১০. নজরুল-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩৬

১১. আহমদ শরীফ (১৩৯৬) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-২৪

১২. নজরুল-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত পৃ-৬৩৬

১৩. নজরুল-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) প্রাগুক্ত, পৃ-৭১২

১৪. নজরুল-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত,৭১০

১৫. নজরুল -রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) প্রাগুক্ত পৃঃ৬৩০

১৬. রফিকুল ইসলাম (১৯৯১) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৫২১

১৭. নজরুল -রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯৬

১৮. নজরুল -রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩৮

১৯. নজরুল -রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) ঃ প্রাগুক্ত, পৃ-৬১৯

সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — বিংশ সংকলন]

কবি নজরুলের পরস্পর-বিরোধী সত্তা

আহমেদ আশরাফ

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, গীতিকার ও সুরকার হিসাবে আপামর সংস্কৃতিসেবী জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এ পর্যন্ত তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনাগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বহুজন পর্যালোচনা করে এসেছেন নানাভাবে। বর্তমান নিবন্ধের শিরোনামে উল্লেখিত বিষয়বস্তু যথার্থই আলোচনার দাবী রাখে বলে মনে হয়। তাঁর প্রতিভার মধ্যে নানা পরস্পর-বিরোধী সত্তার উপস্থিতির অন্বেষণ বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

'পথের শেষ কোথা' গ্রন্থে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব দৃঢ়তার সঙ্গে বিধৃত করেছেন যে, "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বহু অসঙ্গতি তাঁর মন এবং ব্যক্তিত্বকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে কম সাহায্য করেনি। পরস্পর-বিরোধিতা 'কারো' মতে, অপার্থিবতার লক্ষণ।... যেভাবে বিচার্য হোক, সুধীনের মধ্যে অপার্থিব কিছু ছিল না। তাঁর পরস্পর-বিরোধিতাসমূহ তাঁকে প্রতীয়মান করেছে একজন যথার্থ প্রকৃত মানুষ পরিচয়ে, যিনি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চিন্তাধারা এবং মানসিক ভাব নিয়ে পরিপূর্ণ জীবন্ত ছিলেন।"

প্রখ্যাত ইংরাজ লেখক সমারসেট মম তাঁর 'সামিং আপ' গ্রন্থে লিখেছেন, ক্ষুদে মানুষেরাই হলো অস্বাভাবিক, যারা পরস্পর-বিরোধিতার সমাগমে ভরপুর থাকে আর যথার্থ প্রতিভাবানেরাই হলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, পরস্পর-বিরোধী সত্তার অস্তিত্ব তাঁদের মধ্যে তেমন একটা দেখা যায় না। এই ধরনের সাধারণীকরণ বা ঢালাও মন্তব্যকে আজকাল সুনিশ্চিত সত্য হিসাবে ধরে নিতে অবশ্যই আধুনিক বস্তু-নিষ্ঠ চিন্তাবিদেরা আপত্তি তুলবেন। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে প্রচারিত একটা আপ্তবাক্য থেকেও জানা যায় যে, তিনি একসময় বলেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বড় দোষই হলো অসঙ্গতি, আবার তাঁর সবচেয়ে বড় গুণও হলো ঐ অসঙ্গতিই।

যেহেতু বিশ্ব-প্রকৃতিই নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যে ভরপুর, সেই হেতু এর সন্তানেরাও তাঁরা–সমারসেট মমের কথামত যত বড় মহিমান্বিত পুরুষই হোন না কেন, পরস্পর-বিরোধিতার উর্ধ্বে কেউই সম্পূর্ণ বিরাজ করেত পারেন না।

কবি নজরুল ইসলাম 'ভাঙার গান' গেয়েছেন তাঁর যৌবনের অজস্র রচনাবলীতে। বিদেশী শাসনের অনিবার্য পরিণামে দেশের মধ্যে নানা অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হতে দেখে তাঁর সদাজাগ্রত বিদ্রোহী সত্তা একান্ত আবেগে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বার বার। তাছাড়া তিনি বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরকে চুরমার করতে অসীম দুঃসাহসে, দু'হাতে হাতুড়ী, শাবল চালাতে উজ্জীবিত করেছেন তরুণদের। গোরস্থানের যত শব-কঙ্কাল চ'ষে ছুঁড়ে ফেলে সেখানে ফুলের মেলা বসাতে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের। পুরাতন জঞ্জাল, সংস্কারের জগদ্দল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল এসব অকুতোভয়ে মোহ-মুদ্গরের গদা দিয়ে ভাঙবার একান্ত ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যে ও কিছু গানে। এছাড়া তিনিই বলেছেন,

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর,
প্রলয় সে তো সৃজন-বেদন,
আসছে যে মা ভয়ঙ্করী,
অসুন্দরে করতে ছেদন।

প্রকৃতির মধ্যেই পুরাতনকে ধ্বংস করে দিয়ে আবার নতুন করে সৃষ্টি করবার এই পরস্পর-বিরোধী প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন কবি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে। তাই তিনি সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে সহজেই আবার মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছেন নানা ভাঙ্গার গানের আবেগ আপ্লুত বজ্র-হুঙ্কার তুলেও।

আধুনিক বাংলা কাব্যের নম্র পেলব আবহাওয়ায় যিনি প্রথম আনেন ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের জোর-কদম-অশ্বের হ্রেষধ্বনি, সমরজয়ী অমর তরবারীর ঝনঝনানি, তিনিই পরবর্তীকালে 'বিজয়িনী' কবিতায় আঁকেন নারীর পদমূলে আত্মসমর্পণের এক অনবদ্য ছবি,

ওগো জীবন-দেবী।
আমায় দেখে কখন তুমি ফেলবে চোখের জল,
আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!
আজ বিদ্রোহীর এই রক্তরথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।

কমরেড মুজফফর আহমদ লিখিত 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায় ১৯২২ সালের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে লিখিত নজরুলের এই 'বিজয়িনী' কবিতাই তাঁর পরবর্তী জীবন-সঙ্গিনী প্রমীলা সেনগুপ্তাব সঙ্গে তাঁর প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা।

তরুণ বয়সের বিদ্রোহী যোদ্ধা কবি নারীর প্রেম ও তজ্জনিত আকুল বিরহের অসংখ্য গান রচনা করে বাংলার সংগীত জগতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন নানা অপূর্ব

সুধারসে। তাঁর সৃষ্টি-শক্তির এই বিচিত্রধর্মী পদচারণা অনেককে বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে, আর আমরা দেখেছি তাঁর মধ্যে রণ-দেবতা মঙ্গল এর পাশাপাশি সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী ভেনাস (শুক্র)-এর এক অভূতপূর্ব সম্মিলন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র মাঝেই অবশ্য বহু স্থানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নিজের মধ্যে এক পরস্পর-বিরোধী সত্তার অবস্থানের—'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।'

'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় স্বয়ং নজরুল লিখেছিলেন, 'নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!'

এখন এই কবির বিখ্যাত কবিতা 'নারী' থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি তাঁর নরের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তুলতে,

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনোকালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী-নারী।

কাজী নজরুলের খ্যাতির মধ্যগগনে লেখা তাঁর অন্যতম দীর্ঘ কবিতা 'পূজারিণী।' এ'টি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দোলন-চাঁপা' থেকে পরে 'সঞ্চিতা'তে সংকলিত হয়। এখানে অভিমান-বিক্ষুব্ধ আর এক নজরুলকে দেখি, যাতে মনে হতে পারে তিনি বুঝি ঘোর নারী-বিদ্বেষী! কবিতাটির শেষাংশের দিকে লিখিত হয়েছে,

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন।...
যে-পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!

অনেকেই বোধহয় জানেন, কাজী নজরুলের বাপ-মা প্রদত্ত বাল্য ডাক-নাম ছিল

দুখু মিয়া। কিন্তু ভাগ্যের এমনই লীলা-খেলা, কৈশোরকাল থেকেই দেখা গেল তিনি দুখু মিয়া না হয়ে হাসি-খেলা খোশ-মেজাজে মাতোয়ারা হয়ে গড়ে উঠলেন, একজন ভিন্নধর্মী মানুষ হিসাবে। শেষ পর্যন্ত যৌবনকালে তিনি হয়ে গেলেন অল্পতেই সন্তুষ্ট, হাসি-খুশীতে উচ্ছল একজন 'খুশী মিয়া'। তাঁর শৈশবের ডাক-নাম এবং পরিণতকালে এর বিপরীত গুণের অধিকারী বলে পরিচিতি লাভ যদিও খুব তুচ্ছ ব্যাপার, তবু কিছুটা কৌতুক জাগায় না কি? বিশেষ করে নজরুলকে নিয়ে গোলাম মোস্তফার লেখা ঐ মজার ছড়াটার কথা ভাবলে ঃ কাজী নজরুল ইসলাম/বাসায় একদিন গিছলাম/ভায়া লাফ দেয় তিন হাত/হেসে গান গায় দিন-রাত/প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয়/ ধরায় কেউ তাঁর পর নয়।

বিরাট এই রহস্যময় বিশ্বে মানুষ সে যতই দুর্দম এবং সবল হোক, ভাগ্যের হাতে অতি অসহায়। কাজেই কবি নজরুল ইসলামের করুণ পরিণতির কথা বাদ দিলেও আযৌবন হাসি-খুশীতে উচ্ছল প্রচণ্ড হাস্যরসিক এই মানুষটি, যিনি রচনা করেছেন 'চন্দ্র-বিন্দু'র মত হাসির কাব্যগ্রন্থ; তিনি যে মৌলিক অর্থে কতটুকু সুখী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেই আমরা এর কিছুটা আভাস পেতে পারি।...

এই সম্পর্কে সুফী জুলফিকার হায়দার তাঁর 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে বলেছেন,

> জীবনে গোঁজামিল দিয়ে চলার ফলে নজরুলের মতো একটা বিরাট সংবেদনশীল হৃদয়ে কি যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

> তাঁর মতে, নজরুল তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে ঢাকবার জন্যই ছাদ ফাটা হাসি আর গান নিয়ে বেশী মেতে থাকতেন। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের মানুষ, শুধু তাঁর বাইরের এই ছদ্ম আবরণটুকুই দেখে এসেছে—ব্যক্তি নজরুলের ভিতরের চিন্তাদগ্ধ মনের সাক্ষাৎ তারা তেমন করে পায়নি।

> যৌবন পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিক বাদ দিয়ে অর্থোপার্জনের তাগিদে গান রচনায় প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিলেন। সেসময় আমরা দেখি তাঁর গানের ছন্দে, এবং আবহ নির্মাণে বিদ্রোহী সত্তার পরিবর্তে এক অপূর্ব প্রেমিক ও সংবেদনশীল মনের আবির্ভাব। এছাড়া প্রথম জীবনের ঈশ্বর এবং ধর্মদ্রোহী' এই কবি পরবর্তীতে একদিকে লিখেছেন হিন্দু মানসের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য আত্মসমর্পণ ও ভক্তিতে নিবেদিত অজস্র শ্যামা-সংগীত; অপরদিকে তেমনি হৃদয় উজাড় করে দিয়ে রচনা করেছেন বিপুলসংখ্যক ইসলামী সংগীত—হামদ, নাত, গজল ইত্যাদি।[৩] তাঁর ইসলামী গান রচনার ফলে তৎকালীন গোঁড়া মুসলিম সমাজ যারা তাঁকে একসময় সরবে 'কাফের' ফতোয়া দিতে পেরেছিল তাদের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য বলে পরবর্তীকালে বিবেচিত হয়েছিলেন। মুসলিম বাংলার সাময়িক প্রতিভূ একজন কর্মিষ্ঠ পুরুষ হিসাবে কিছুটা স্বীকৃতিও তাই তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন।

এদেশের অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে জাগাবার জন্য তিনি অবিরল ধারায় রচনা করেছিলেন গানের পর গান। তরুণ বয়সের উচ্ছল আবেগধারায় দুকূলপ্লাবী যে বিদ্রোহী মানস তাঁর ভগবান বুকে পদচিহ্ন পর্যন্ত এঁকে দিতে বলীয়ান হয়েছিল একসময়, সেই মানসও শেষে ইসলামের নয়নমণি নবী করিমের চরণ তলে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল; আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম করুণাপ্রার্থী হয়েছিল পরবর্তীকালে অসংখ্য গানে এবং কবিতায়।

সুফী জুলফিকার হায়দার তাঁর 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে নজরুলের চরিত্রের পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার এক করুণ চিত্র এঁকেছেন। এককালীন বলিষ্ঠ তরতাজা কবি নজরুলের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা এতে স্বভাবতই পরিস্ফুটিত হয়েছে বলে মনে করি। তিনি গ্রন্থের প্রথম দিকে (১০ পৃষ্ঠায়) বলছেন,

> বিদ্রোহীর কবি কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ বিদ্রোহী ছিলেন না এবং তা ছিলেন না বলেই তিনি তাঁর জীবনে হিন্দু কিংবা মুসলমান কোন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে চলেননি। বাড়ীতে তিনি 'ভগবান' এবং 'জল' বলতেন, আবার মুসলমানদের সামনে 'আল্লাহ্' এবং 'পানি' বলতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ী একেবারে নির্ভেজাল হিন্দু আগেও ছিলেন এবং বরাবর আমি তাই দেখেছি। এই যে গোঁজামিল—কবির মানসিক জীবনে এর চেয়েও বড় দুর্বলতা আর কিছু হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করিনা।[২]
>
> যে সমাজে তাঁর জন্ম সেই আপনার মুসলিম সমাজ তাঁকে 'কাফের' ফতোয়া দিতে দ্বিধা করেনি। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে—যে কবি বিদ্রোহী কবি হিসাবে সারা দেশের প্রশংসা কুড়ালো, কারাবরণ করলো—সেই মহাবিদ্রোহী নজরুল একান্ত পোষমানা নিরীহজনের মতো তাঁর ছোট্ট পারিবারিক জীবনে যেন অসহায় অবস্থায় কোন রকমে একটা গোঁজামিল দিয়ে পড়ে রইলো। ঘরে ও সমাজ জীবনে যাঁর কোথায়ও দাঁড়াবার ঠাঁই মিলেনা তারপক্ষে বোধহয় নিরব নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া উপায়ও থাকেনা।

বইটির আরেক জায়গায় সুফী জুলফিকার হায়দার লিখেছেন,

> আমার মনে হয় নজরুলের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটি তাঁর জীবনের একটি বড় অভিশাপ।...
>
> আমাদের মধ্যে এমনও কয়েকজন বিদগ্ধ সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত রাজনীতিবিদ রয়েছেন, যাঁরা হিন্দু মেয়ে-বিবাহ করেছেন। কিন্তু তাঁদের বেলায় এহেন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে কিনা জানিনা। একি ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস। 'আঁধার রাতে বাধার পথে রক্তে করি পিছল'-এহেন ক্ষুরধার বাণী যে কবির, তাঁর জীবনে গোঁজামিল কি করে সম্ভব হলো?

নজরুল কলকাতায় এসে কাব্য ও সাহিত্য-জগতে সাড়া জাগানোর সময় থেকেই কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এই মুজফফর আহমদের সংস্পর্শে থেকে তিনি কম্যুনিষ্ট ভাবাদর্শে

উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি 'সাম্যবাদী' জাতীয় কিছু বলিষ্ঠ বক্তব্যমূলক কবিতা রচনা করে ফেলেন।[৩]

> কমরেড মুজফফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' বইতে বলেছেন, "নজরুল ইসলাম মার্ক্সবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সাম্যবাদের দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। একই সঙ্গে এই দর্শনে বিশ্বাসী ও আধ্যাত্মবাদী কেউ হতে পারেন না। অথচ নজরুল ইসলাম পরে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন না জেনেও আমি বলব নজরুল যখন আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গিয়েছিল তখন সে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ ছিল না। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোন কোন সূত্র সে মানতো ঠিকই, কিন্তু এই দর্শনটি কখনও যে সে আয়ত্ব করেনি একথাও ঠিক।[৪]

আসলে নজরুলের মন-মানসিকতা এমনিই ধাঁচের ছিল যে প্রথম যৌবনে শোষিত বঞ্চিত ব্যথাহত সব মানুষের পক্ষে থাকলেও এবং তাদের নিয়ে অনুপম বহু কবিতা লিখলেও শেষ পর্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ সাম্যবাদী তিনি হতে পারেননি। বরং পরবর্তীকালে গাড়ী রেখে এবং বিরাট বাড়ীতে থেকে, কিছু সময়ের জন্য ব্যয়বহুল জীবনযাপনও করে তিনি ঐ মতবাদধারীদের চিন্তাধারা থেকে বহু দূরে সরে আসেন।[৫]

প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভা, কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে চায়নি তাঁর বৃহৎ কল্পনাশক্তির উদ্বেল বিস্তার। তাই যখনই যে বিষয় কালোপযোগী প্রেরণা সঞ্চারিত করতে পেরেছে তাঁর মধ্যে, সেই বিষয় নিয়েই অন্তরস্থিত স্বতোৎসারিত প্রতিভার গুণে, তিনি অজস্র ধারায় বিতরণ করেছেন নিজের মানসিক বৈভব। আমরা ঋণী তাঁর এই আন্তরিক মানসিক বিস্তারের কাছে।

কমরেড মুজফফর আহমদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থের শেষদিকে নজরুল-বন্ধুদের ত্রুটি তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন,

> কেউ বলছেন নজরুল একজন জাত বোহেমিয়ান ছিল। কেউ বলছেন স্ত্রী-পুত্রের জন্যে তার মমতা ও দায়িত্ববোধ ছিল না। তাঁদের ফেলে এক সপ্তাহের জন্যে কোথাও গিয়ে সে একমাস থেকে আসত।... এইসব কথা যিনি বলবেন, তাঁর উচিত গভীরভাবে নিজের স্মৃতিকে আলোড়ন করা যাতে সঠিক তথ্য তিনি সরবরাহ করতে পারেন।... যেমন ধরুন কথার কথা বলছি। নজরুল এক সপ্তাহের জন্যে গিয়ে কখনো খবর না দিয়ে একমাস বাইরে থেকে গেল। তাহলে দেখতে হবে বারে বারে সে এই রকম করেছে কিনা। যদিমাত্র একবারই সে এইরকমটা করে থাকে তবে তাকে কি নজরুলের স্বভাব বলে ধরে নেওয়া যায়? আর, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতার কথা। বসন্ত রোগের মত ছোঁয়াচে, রোগাক্রান্ত পুত্রের শিয়রে বসে যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিল এবং পুত্রের মৃত্যুর পরে শোকে যে পাগলের মতো হয়ে গেল, আমরা কি বলতে পারি যে পুত্রের প্রতি তার মমতা ছিল না? আর, ১৯৩৯ সালে স্ত্রী যখন কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত তখন তার ব্যাকুলতা যিনিই দেখেছেন তিনিই আশ্চর্য হয়েছেন। স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে সে সর্বস্বান্ত হয়েছে।...

> এরপরেও কেউ কি বলতে পারেন যে স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তার মমতা ছিল না। জীবনে অবিবেচনার কাজ নজরুল অনেক করেছে। দায়িত্বহীনতার পরিচয়ও সে কখনও দেয়নি এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনারের ও হেড কম্পোজারের চাকরির কাজ সে ঠিকই করেছে। ... কোনো কবিকে কোন্ অবস্থায় বোহেমিয়ান বলা যায় তা আমি বুঝি না। কিন্তু নজরুলের যে-সব কাজ ও আসক্তির কথা আমি বলেছি তাতে কি তাকে বোহেমিয়ান বলা যায়?

একদিকে তাঁর যেমন ছিল ব্যক্তিবাদী আপোষহীন বিদ্রোহী এক সত্ত্বা, অপরদিকে তেমনি ছিল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতাবোধের ঐকান্তিক এক আগ্রহ। যার জন্য তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে পর্যন্ত অংশ নিয়ে একবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সংসদ সদস্য হবার মানসে। যাইহোক তাঁর জনপ্রিয়তার পথে অন্তরের এই দ্বৈত-সত্তা তেমন বাধা হয়ে কখনও দাঁড়াতে পারেনি বলেই আমাদের প্রতীতি হয়।

নজরুল ও জীবনানন্দ

সৈয়দা আইরিন জামান

নজরুল ও জীবনানন্দ, দুই কবি, দুই স্রষ্টা। জন্মগ্রহণ করেছেন একই কালবেলায়, ১৮৯৯ সালে দুই শতাব্দীর যৌগিকলগ্নে। উভয় কবিই আবির্ভূত হয়েছেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমাজ ব্যবস্থার মাঝে, মহাকালের এক রাক্ষুসী বেলায়। ১৮৫৭ সাল থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের আওতায় পড়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবর্তনের হাওয়া ভারতবর্ষেও তরঙ্গায়িত হয়। এ সময় উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী দ্বারা ভারতবর্ষ আরও বেশী শোষিত হতে থাকে। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষের পুরোনো মূল্যবোধগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে রুশ বিপ্লব নিপীড়িত উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির প্রতীক রূপে দেখা দেয়। সেখানে সমাজতন্ত্রের জয় সূচিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নতুনের কেতন উড়িয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে একজন কবি আবির্ভূত হলেন,

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
['প্রলয়োল্লাস', অগ্নিবীণা]

নতুনের কেতন উড়লো, জয়ধ্বনিও শোনা গেল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালজয়ী, ব্যতিক্রমী এক কবি-সত্তা আবির্ভূত হলেন। নাম তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম। 'নজরুলের ভিতর তারুণ্য চমৎকার, জীবনের আনন্দ তিনি সহজভাবে অনুভব করতে পারেন।'[১]

নজরুল যেমন নতুনের কেতন উড়িয়েছিলেন, জীবনানন্দও তেমনি তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই পুরাতনকে স্বীকার করতে চাননি। অজানা এক বাণী তিনি শোনাতে চেয়েছেন,

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—

আমি বহে আনি; একদিন শুনেছে যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা-কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেহ!
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার,—শেষ মুহূর্তের
আমি এক;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো—
নতুন এ–আর সব হারানো—পুরোনো।

[কয়েকটি লাইন, ধুসর পাণ্ডুলিপি]

এখানে জীবনানন্দ সচেতনভাবেই তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছেন।

একই বছর জন্মেও 'দু'জন হ'য়ে রইলেন দু'যুগের কবি, দুই আলাদা ও পরস্পর সময় স্রোতের কবি স্তম্ভ, প্রাক ও উত্তর কাব্যেতিহাসে।'[২]

নজরুল ও জীবনানন্দ উভয় কবিরই জন্ম রবীন্দ্রোত্তর যুগে। নজরুলের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আবহ ও ভাষাভঙ্গির প্রচ্ছায়া তেমন নেই। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশি কবিদের থেকে আলাদা এক কাব্যিক স্রষ্টা। তাঁর কবিতায় মোহিতলাল মজুমদারের দূরান্বয়ী সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুই কবি একই সময়বাসী হলেও জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিকের কবিতায় নজরুলের ছাপ সুস্পষ্ট। নজরুলের সাহিত্য-উত্থান জীবনানন্দ দাশের চেয়ে কিছু আগে। ১৯২২ সালে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ২৩ বছর বয়সে তাঁর লেখা 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ করার মুহূর্তে নজরুল ইসলাম আলীপুর জেলে ছিলেন। সে সময় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

> জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত বসন্ত গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি নিজে যখন গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো। আমার হয়েই ওকে তুমি বইখানা দিও।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালক প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। ঝরা পালক কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথকে একটি বই উপহার পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্তি স্বীকার করে চিঠি পাঠালেন। জানালেন

জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাটুকু,

> তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। —কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।
> বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উল্টো।

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য জীবনানন্দকে মোটেই বিচলিত করেনি। যত সময় অতিবাহিত হয়েছে, ততই তিনি ভাষা নিয়ে জবরদস্তি আরো বেশী করেছেন। তিনি তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও খুব বেশী শংকিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এই সুস্থিরতা তিনি অর্জন করেছিলেন তার পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিক বিশ্বাস থেকে।

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশ সেই সময়ের একজন কবি ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

> আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
> কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

কুসুমকুমারী দাশ জানেননি তাঁর ছেলে বড় হয়েছে এবং কথায় বড় না হয়ে কাজেই বড় হয়েছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নজরুলের কবিতার সাথে জীবনানন্দের প্রথম দিকের কবিতার সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন—'নজরুলের প্রভাবরশ্মি দ্রুত বিকীর্ণ হয়ে যায় বাংলা কাব্যমন্ডলে, আর যাঁরা তাঁর সেই অভিনব, বিস্তীর্ণ ও মোহন খপ্পনে পড়েছিলেন জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম।' জীবনানন্দ যে নজরুলের প্রভাবে পড়েছিলেন দু'জনের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলেই এ উক্তির সত্যতা মিলবে। নারীর প্রতি মমতা নজরুল-এ যেমন ছিল, তেমনি দেখতে পাই জীবনানন্দে। নজরুল বারাঙ্গনা নারীকে তাঁর কবিতায় মায়ের আসনে বসিয়েছেন; জীবনানন্দ পতিতা নারীকে দিয়েছেন হারিয়ে যাওয়া সম্মান। নজরুল 'বারাঙ্গনা' কবিতায় বারাঙ্গনার উদ্দেশে বলেছেন,

> কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
> হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়েছে সীতা-সম সতী মায়ে;
> নাই হ'লে সতী তবু তো তোমরা মাতা ভগিনীরই জাতি,
> তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত তারা আমাদেরই জ্ঞাতি;
> [বারাঙ্গনা, সাম্যবাদী]

জীবনানন্দ বলেছেন পতিতার উদ্দেশে,

> ছোয়াতে তাহার ম্লান হ'য়ে যায় শশী তারকার শিখা,
> আলোকের পারে নেমে আসে তার আঁধারের যবনিকা।
> সে যে মনন্তর—মৃত্যুর দূত—অপঘাত-মহামারী,—

মানুষ তবু সে,—তার চেয়ে বড়, —সে যে নারী সে যে নারী!

[পতিতা, ঝরা পালক]

নজরুলের রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার জগৎ জীবনানন্দ দাশকে আলোড়িত করেছিল। উভয় কবিই শিকল ছিড়ে মুক্ত বাতাসে ডানা মেলতে চেয়েছেন।

নজরুল প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এভাবে,

'বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখী
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্তি ধ্বনি হাঁকি'—
উড়িবারে চাই যত জ্যোতিদীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।

জীবনানন্দও নজরুলের প্রত্যয়ের সাথে একইভাবে সুর মিলিয়েছেন,

'শকুনের মত শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে দূরে, আরো চলিলাম উড়ে
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা,—অনন্তের শুক্ল অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে!

'ঝরা পালক'-এ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যধ্যান থাকলেও তার থেকে প্রাধান্য পেয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের সমকালীন ইতিহাস চেতনা ও দেশজ শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ, নজরুলের বাঁধভাঙা ভোগবাদ ও তারুণ্যের জয় ঘোষণা, মোহিতলালের দেহচেতনা ও আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগে ইন্দ্রিয়ঘন (Sersuour) জগতের সৃষ্টি, কল্লোলের বিদ্রোহ ও প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যের রীতি।[৩] ঝরা পালক এবং ধূসর পাণ্ডুলিপিতে পূর্বজ কবিদের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হলেও জীবনানন্দ ক্রমে ক্রমে এত বেশী পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন যে, একসময় জীবনানন্দ তাঁরও চেনা জগতের বাইরে চলে গেছেন বলে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন।

১৯২৭ সালে জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হওয়ার আগে-পরে নজরুল ইসলামের বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবং নজরুল স্বমহিমায় বাংলা সাহিত্যে কবির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মাত্র ত্রিশ (৩০) বছর বয়সে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে কলকাতায় এলবার্ট হলে সাড়ম্বরে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অন্যদিকে জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' অবিক্রীত থেকে যায় এবং তাঁকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—নজরুলের অগ্রগতি হয়েছিল দ্রুততালে, আর জীবনানন্দের মন্থর বেগে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মাইকেল ও মিল্টন স্বকালে উপেক্ষিত হন, আবার জন ডান মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে পুনরুজ্জীবিত হন। কাজেই খুব দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করাটাই বড় কথা নয়, সময়ের

বহমানতায় টিকে থাকাটাই আসলে বড় কথা।

ব্যক্তি মাত্রই তার সামাজিকরণের ফসল। একথা একজন সাধারণ মানুষের জন্য প্রযোজ্য, অনিবার্য একজন কবির ক্ষেত্রেও। সামাজিকরণ বিষয়টি আসলে কি? মাসেন, কঙ্গার ও কাগান (musen, conger & kagan, 1974) তাঁদের 'Child Development and Personality' গ্রন্থে সামাজিকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'সামাজিকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিবার ও কৃষ্টির উপযোগী আচরণের ধারা, বিশ্বাস, আদর্শমান ও প্রেষণাবলী অর্জন করে।' এই সামাজিকরণের ফলেই একটি শিশু বুঝতে শেখে তার পরিবার, প্রতিবেশী, তার সমাজ, তার কাছে কি প্রত্যাশা করে। সামাজিকরণের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, তবে শিশুকালেই সামাজিকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়। এছাড়া 'সহজাত প্রবৃত্তি'ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এবারে দৃষ্টি ফেরানো যাক নজরুল ও জীবনানন্দ—এই দুই কবির সামাজিকরণ প্রসঙ্গে। নজরুল ইসলামের জীবন-চর্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি এক ঐতিহ্যবাহী, সম্ভ্রান্ত ও সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার জন্মের সময় পরিবারের ন্যূনতম আর্থিক স্বচ্ছলতাটুকুও ছিল না। নজরুলের নয় বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। চরম আর্থিক সংকটের কারণে ১০ বছর বয়সে গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতা, ১১ বছর বয়সে আসানসোলে রুটির দোকানে তাকে কাজ করতে হয়। এরপর তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে ছেলেবেলায় যেসব শিশু অবহেলা, অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে একটা বেপরোয়া মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। নজরুল সারাজীবনই বেপরোয়া মনোভাব দ্বারা শাসিত হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে এই প্রভাব উৎকীর্ণ। বলা যেতে পারে এই বৈপরীত্য কন্টস্টকিত বেপরোয়া মনোভাবেরই এক তুঙ্গীয় ভাষ্য তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা।

জীবনানন্দের জীবনচর্যা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়— জীবনানন্দ খুব সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ না করলেও তাঁর পরিবারে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল। ছিল নৈঃশব্দ আর সুস্থিরতা। তাকে জীবিকার প্রয়োজনে শিশুকালে পথে নামতে হয়নি। তিনি স্বাভাবিকভাবে তার পরিমাণগত শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। জীবনানন্দ ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ছিলেন। তিনি তাঁর পিতৃ ও মাতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞানের, হৃদয়ের ও মননের সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখেছিলেন। এই উপলব্ধিগত শিক্ষা তাকে একজন পরিশীলিত কবি হতে সহায়তা করেছিল।

নজরুল ও জীবনানন্দ উভয়ই একই সময়বাসী হলেও নজরুলের সাহিত্য কর্মে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁর 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ এই সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবের ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে সারা পৃথিবীতে। এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠার জন্য পশ্চিমা শক্তিবর্গ তাদের দুর্বল

উপনিবেশের উপর অধিকতর শোষণ চালাতে থাকে। মানবিক মুক্তি সেখানে কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঔপনিবেশিক শক্তির এই অমানবিক অর্থ সম্পদ লিপ্সার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার কাব্যিক নির্মাণে। এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের উদাহরণ তুলে আনা যেতে পারে। কামাল পাশাকে আহ্বান করে তিনি তুর্কী জাতির পুনরুত্থান কামনা করেছেন,

ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
[কামাল পাশা, অগ্নিবীণা]

এটি প্রকারান্তরে কেবল তুরস্কের নয়, পরাজিত পৃথিবীর নব উত্থানের সূচক। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব নজরুলের বোধিবিন্দুকে স্পর্শ করবার আগেই তিনি নির্বাক হয়ে যান। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব জীবনানন্দের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল ততটুকুই; যতটুকু করেছিল এলিয়ট, এজরা-পাউন্ড আর ইয়েটস্-এর উপর। তবে প্রত্যক্ষ প্রভাব বড় কথা নয়। কেবল জীবনানন্দ নয়, তিরিশি কবিদের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতীকী প্রভাব পড়েছিল। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অনিশ্চয়তা অবিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতা প্রত্যক্ষ করে তাঁরা শিউরে উঠেছিলেন। এ কারণে ইয়েটস্-এর মনে হয়েছিল 'মানবজাতি প্রাণহীন কোনো উৎকল্পনার ফসল'। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ভাষায়—'এলিয়ট বিলাপ করেছেন যুদ্ধজনিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের, যেখানে নৈতিকতা তিরোহিত'। জীবনানন্দ দাশ আনবিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাবকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তিনি খণ্ড খণ্ড মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। যখন মানুষের মাঝ থেকে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে,

হয়তো গুলির শব্দ আবার:
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
[আমি যদি হতাম, বনলতা সেন]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব জীবনানন্দকে তেমনভাবে আলোড়িত না করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহ তার কবিতায় অনিবার্যভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। 'সাতটি তারার তিমির' 'বেলা অবেলা-কালবেলা' কাব্যগ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছাপ লক্ষ্যযোগ্য। এই দুই কাব্যগ্রন্থে তিনি একজন ইতিহাসচারী রাজনীতি সচেতন কবি।

তাঁর 'তিমির হননের গান' কবিতায় তিনি অন্ধকার তিরোহিত করার প্রত্যয়ে

সোচ্চার,

তিমির হননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমির বিলাসী?
আমরা তো তিমির বিনাশী
হ'তে চাই
আমরা তো তিমির বিনাশী।

[তিমির হননের গান, সাতটি তারার তিমির]

এই কবিতাটিকে আমরা শ্লোগানমুখী কবিতাও বলতে পারি। নজরুল অখণ্ড ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন। তাঁর কবিতায় তাই অখণ্ড ভারতবর্ষের চিত্রই ফুটে উঠেছে। জন্মভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,
স্বর্গাদপি গরিয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা।

প্রাক-ভারত বিভক্তির সময়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কল্পনা করাও নজরুলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে,

আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি'

এই বৈপরীত্যপূর্ণ অভিপ্রায়টি হয়তো তার স্বদেশভূমিকে নিয়ে লেখা। নজরুলের চোখে স্বদেশ মানে এই বাংলাদেশ, তবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ যে স্বদেশকে উপস্থাপন করে তার নাম অখণ্ড ভারতবর্ষ। স্বদেশী মানে এই বাংলাদেশের নাগরিক তবে তারা কোন বিশেষ ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের আশ্রয়ে লালিত নয়; তার একক নাম বাঙালী। তাই তিনি তাঁর গদ্য রচনায় বলেছিলেন, 'বাঙলা বাঙালির হোক! বাঙলার জয় হোক' 'বাঙালির জয় হোক'। স্বাধীনতা আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে 'জয় বাংলা' নামক বাংলা শ্লোগানটি তার এই শব্দবন্ধ থেকে উচ্চারিত বলে মনে হয়।

জীবনানন্দের বাংলা–'রূপসী বাংলা'; শাশ্বত বাংলার স্বপ্নরূপ। জীবনানন্দ ত্রিকালদর্শী কবি। তিনি মনে মনে তার প্রিয় ভূমিকে অখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে আলাদা করে নিয়ে রূপসী বাংলা নাম দিয়েছেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এই বাংলায় থাকবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন,

তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব;

[তোমরা যেখানে সাধ, রূপসী বাংলা]

রূপসী বাংলার সৌন্দর্যের বিমুগ্ধ রূপকার তিনি। পৃথিবীর রূপ খুঁজতে জীবনানন্দ মোটেই আগ্রহী নন। বাংলার প্রতি অগাধ ভালবাসার সূত্র ধরে তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন,

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর

এখানে কবি খণ্ডের ভেতর অখণ্ডের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এরপর কবি এখানে তাঁর স্বদেশভূমির অস্তিত্ব দেখতে চেয়েছেন পৃথিবীর মানচিত্রে। অনাগত স্বদেশ ভূমির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন,

'তুমি কেন দূরে—বহু দূরে—ঢের দূরে- আরো দূরে—
নক্ষত্রের অস্পষ্ট আকাশ
তুমি কেন কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে এসে বলনাকো একটিও কথা
[তুমি কেন দূরে, রূপসী বাংলা]

'সত্য মিথ্যায় জগৎ, কিন্তু কাব্য শুধু সত্যের অভিব্যক্তি' উক্তিটি আবুল কালাম শামসুদ্দিন'এর। প্রকৃত কবি কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। নজরুল-জীবনানন্দ উভয়ই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। নজরুল বাঙালীর উত্থান চেয়েছিলেন। তিনি আলাদা করে মুসলমানের উত্থানের কথা ভাবেননি। তিনি বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান—কাউকে বিচ্ছিন্ন ভাবেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেছেন, 'মানবতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যভাবনার এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি কামনা'।[৪] মানুষই নজরুলের কাছে বড় সত্য। তিনি মানুষে মানুষে সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। নজরুল সাম্যের গান গেয়েছেন এভাবে,

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? —পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? বলে' যাও, বল আরো।
বন্ধু যা খুশী হও,
[সাম্যবাদী, সাম্যবাদী]

অন্যদিকে জীবনানন্দও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে লেখা তাঁর '১৯৪৬-৪৭'কবিতা থেকে উদ্ধৃতিই এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করবে। জীবনানন্দের লেখা থেকে,

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ ক'রে গেলো,
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'এয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি? আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে

চোখ তুলে শুধাবে সে— রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
বলে যাবে 'গগন, বিপিন, শশী পাথুরে ঘাটার;
[১৯৪৬-৪৭, অন্যান্য কবিতা]

নজরুল ও জীবনানন্দ উভয়ই অভিনব চিত্রকল্পের রূপকার। নজরুলের চিত্রকল্প মিথ্যানির্ভর আপাত সারল্যে পরিপূর্ণ। জীবনানন্দের চিত্রকল্প উপমা, উৎপ্রেক্ষা, লোকজপুরাণ, প্রতীকের সমন্বয়, যার মধ্যে রয়েছে আপাত সারল্যের মধ্যে বৈপরীত্যপূর্ণ কূটাভাস। দু'জন কবির কবিতার চিত্রকল্পের মধ্যেই জড়িয়ে আছে রং, রূপ, রেখার লাবণ্য। চিত্রকল্প সম্পর্কে সি. ডি. লিউইস তাঁর 'পোয়েটিক ইমেজ' গ্রন্থে বলেন— 'a picture made out of words.' 'দারিদ্র' কবিতায় দেখা যায় নজরুল প্রাকৃতিক উপাদানে অভিনব চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন,

বেদনা হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালীর মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকাশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দল বৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া -সম।
[দারিদ্র, সিন্ধু-হিন্দোল]

জীবনানন্দের চিত্রকল্প তাঁর কাব্য আঙ্গিক ও রচনা শৈলীকে অভিনবত্ব দান করেছে। কবি যখন বলেন,

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;
[বনলতা সেন, বনলতা সেন]

সেই মুহূর্তে সুনিপূণ এক শিল্পকর্ম পাঠকের মনোলোকে উদ্ভাসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন—'চিত্ররূপময়'। আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের চিত্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন' 'শুধু চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ যে গভীরতর অর্থের শহর গ'ড়ে তোলেন, রবীন্দ্রনাথের চলা সেখানে ঝাপসা হয়ে আসে।' তিনি নজরুলের কবিতায় চিত্রকল্পের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে 'নজরুল এক অলংকার মুখর কবি, নজরুল এক চিত্রকল্পের সম্রাট।'

নজরুল মূলত বর্ণনা প্রধান উপমাবাহী, চিত্রকল্পসমৃদ্ধ ও ঋজু উচ্চারণে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রধানত বাস্তবাশ্রয়ী। তবে বিমূর্ততাকেও একেবারে অগ্রাহ্য করেননি। কবিতায় তিনি গদ্যের একার্থক স্পষ্টতা চেয়েছেন। রাজনীতি ও সমাজনীতি নির্ভর রচনায় তাই প্রতীকের ব্যবহার তেমন দৃশ্যগোচর নয়। নজরুল প্রচলিত প্রতীক ব্যবহার করলেও নিজস্ব নতুন প্রতীক খুব বেশী ব্যবহার করেননি। এক্ষেত্রে জীবনানন্দ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কবি। তাঁর বর্ণনাভঙ্গী জটিল, প্রায়শ বিমূর্ত ও নেপথ্য চিত্রকল্পনির্ভর, যাকে স্যুররিয়ালিস্ট বলা হয়ে থাকে। তবে বেশ কিছু নিজস্ব প্রতীক নির্মাণে তিনি

সফল। জীবনানন্দের নিজস্ব প্রতীক হিসেবে 'বনলতা সেন' 'হায়চিল' 'প্যাঁচা', 'মিরোজীন নদী', 'হেমন্ত' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। নজরুল গ্রীক, ভারতীয় এবং মুসলিম মিথ ব্যবহার করেছেন বহুলভাবে। জীবনানন্দ 'বনলতা সেন' 'সুচেতনা' 'সবিতা'– ইত্যাদি ব্যক্তিগত মিথ নির্মাণ করেছেন।

নজরুল মূলত স্বরবৃত্ত (প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা), মাত্রাবৃত্ত (বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা) ও অক্ষরবৃত্তে (দারিদ্র, সিন্ধুহিন্দোল) সমান পারদর্শী। তবে তাঁর অভিভাষণসমূহে এমন সব অনুপ্রাণিত চিত্রকল্প সমৃদ্ধ স্তবক পাওয়া যায় যাকে স্পন্দিত গদ্যের কবিতা বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ স্তবক প্রবহমান গদ্যে লিখিত হয়েও কবিতার মর্যাদায় অভিষিক্ত। জীবনানন্দের প্রধান বাহন অক্ষরবৃত্ত (বনলতা সেন, বনলতা সেন) ও স্পন্দিত গদ্য (আমাকে তুমি, বনলতা সেন)। পরাবাস্তব উপমা ও চিত্রকল্পসমৃদ্ধ স্পন্দিত গদ্যের কবিতাসমূহ বাংলা কবিতায় ছন্দমুক্তির পথ সুপ্রশস্ত করেছে।

কবি মাত্রেই বিশেষ শ্রেণীর শব্দ বা বিষয়ের প্রতি ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। এই ঝোঁক বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, সহজাত প্রবৃত্তির আবহ-ই এই ঝোঁক সৃষ্টি করে থাকে। নজরুলের অধিকাংশ কবিতায় বিশেষ্য শব্দ ব্যবহারের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হয়। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতিটি পংক্তি এই উক্তির অর্থ বহন করে,

আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়,
আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রানী সূত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
[বিদ্রোহী, অগ্নি-বীণা]

এখানে, হোম-শিখা, সাগ্নিক, জমদগ্নি, যজ্ঞ, পুরোহিত, অগ্নি, সৃষ্টি, ধ্বংস, শ্মশান এই সবই বিশেষ্য। জীবনানন্দের ঝোঁক ছিল বিশেষণ শব্দের প্রতি। তাঁর কবিতায় বিশেষ্যের চেয়ে বিশেষণের আধিক্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। আর এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ্য শব্দের আগে। এই ব্যবহারের ফলে বিশেষ্য শব্দের দ্যুতি অনেক ক্ষেত্রেই হাজার গুণ বেড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে জেমস জয়েস-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি একাধিক বিশেষণের বিস্ময় আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন : .'She was just a young thin pale soft shy slim slip of a thing then'. জীবনানন্দের কবিতায় বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণের চকিত ব্যবহার এবং একই সাথে একের পর এক বিশেষণের সমাবেশ তাঁর কবিতাকে এক অদ্ভূত ব্যঞ্জনায় সমাসিক্ত করেছে।

বিশেষণের চকিত ব্যবহারের ফলে তার কবিতার বিশেষ্য শব্দের অনুধাবন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যখন তিনি বলেন,

সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে
[হাওয়ার রাত, বনলতা সেন]

এই (উপরের) পংক্তিতে 'বিস্তীর্ণ' বিশেষণটি হাওয়া নামক বায়বীয় পদার্থের তীব্রতাকে প্রকাশ করে, পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারে এই হাওয়া আর কিছু নয়, সমুদ্রের হাওয়া।

বিশেষণের চকিত ব্যবহারের পাশাপাশি তাঁর কবিতায় গুচ্ছ বিশেষণ লক্ষযোগ্য। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতা তিনি লিখেছেন,

সোনালি—সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে–

এখানে চিল দু'বার সোনালি চিল নামে অভিহিত। এই চিল সাধারণের সীমা অতিক্রম করে অসাধারণ দীপ্তিতে ভাস্বর। আবার যখন তিনি বলেন,

গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন

(উপর্যুক্ত) এই পংক্তিতে গভীর বিশেষণ ইচ্ছা, চেষ্টার গভীরতা প্রকাশ করে, নীলাভতম বিশেষণটি ইচ্ছা, চেষ্টার অচরিতার্থ আশংকা আর অনিশ্চয়তা। নীল এখানে কষ্টের প্রতীক। জীবনানন্দ বিশেষণ প্রয়োগের মধ্য দিয়েও পরস্পর বিরোধী ঘটনার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নজরুল তাঁর কবিতায় খুব বেশী বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ না করলেও বিশেষ্য শব্দ কবিতায় এত বেশী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে যে, সেখানে বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ না করার দৈন্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে নজরুল এমন কিছু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা তার আগে আর কেউ ব্যবহার করেননি। যেমন—দামাল ছেলে।

নজরুল নারী স্বাধীনতার প্রধান প্রবক্তাই শুধু নন, তিনি নারীর গার্হস্থ্য কর্তব্য ও নান্দনিক সৌন্দর্যের ওপর একজন কাব্যিক ভাষ্যকার। সনাতন পুরুষ-শাসিত সমাজে গৃহের অভ্যন্তরে নারীর যে বন্দিনী রূপ তাকে তিনি মহিমান্বিত করেছেন মাতার আসনে বসিয়ে। যে বারাঙ্গনার প্রতি সভ্যসমাজ চিরকাল ঘৃণাবর্ষণ করেছে তাকেই তিনি বসিয়েছেন সীতাসম মায়ের আসনে। ব্যাভিচারের প্রশ্নে তিনি নারী ও পুরুষকে দায়ী করেছেন সমানভাবে; তাই তার সুচিন্তিত রায় হচ্ছে যে,

অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।

নারী ও পুরুষকে তিনি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার সম্পূরক সত্তা হিসাবে দেখেছেন। মহৎ কল্যাণকর সমস্ত কিছুতে নারী পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে বলে তিনি মনে

করেন,

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেকতার নর।

[নারী, সাম্যবাদী]

অন্যদিকে জীবনানন্দের কাব্যচেতনায়ও নারী এক স্বতচ্ছল প্রবাহ। নজরুলের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, জীবনানন্দের নারী প্রথাগত অর্থে কদাচ প্রতিবাদী। তিনি নারীর ভেতর, যেমন 'বনলতা সেন'–নান্দনিক ও পৌরাণিক সৌন্দর্যকে সমকালীন সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। আবার 'সুচেতনা' এই প্রতীকে তিনি নারীকে সভ্যতার মাঙ্গলিক প্রতীক হিসেবে দেখেছেন।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;

জীবনানন্দের নারী প্রলুব্ধ করে কিন্তু কাউকে রুদ্র করে না। অন্তর ঐশ্বর্যে এই নারী না জায়া, না জননী, না ভগ্নী, না সেবিকা। অনন্তকাল মঙ্গল প্রদীপ হাতে এই নারী যেন প্রতিনিয়ত আরাধ্য এক নান্দনিক প্রতিকৃতি।

কবি নজরুল তৎসম, তৎভব, আরবী, ফাসী, উর্দু, দেশী অর্থাৎ তাবৎ জনগোষ্ঠীর লিখিত ও মৌখিক ভাষায় এবং সাংস্কৃতিক আবহকে তার কবিতায় ধারণ করেছেন। তিনি তাঁর পারিবারিক পরিবেশ থেকেই পাঁচটি ভাষা শিখেছিলেন– আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী এবং বাংলা। এই শিক্ষণের প্রভাব তাঁর অনেক কবিতাতেই বিদ্যমান। তিনি একাধিক জনগোষ্ঠীর ভাষার সমন্বয়ে এমন অনেক কবিতা নির্মাণ করেছেন যা রীতিমত বিস্মিত করে। এ প্রসঙ্গে 'মোহর্‌রম' কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়,

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া-দামেশকে–

[মোহর্‌রম, রুদ্র-মঙ্গল]

একাধিক ভাষার সমন্বয়ে রচিত কবিতাকে ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় পিজিন বলা যেতে পারে। পিজিন ভাষা সমুদ্র উপকূলে বন্দর এলাকায় গড়ে ওঠে, যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির মানুষ এক সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করে। নজরুলের কবিতার মধ্যে একাধিক ভাষার সমাবেশ ঘটেছে। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে একে পিজিন (pidgin) বলা যায়। আবার এই কাব্যিক পিজিন (Poetic Pidgin)কে পাঠক সংস্কৃতিগতভাবে মেনেও নিয়েছে। এই মেনে নেয়াকে ক্রেয়লাইজেশন (Creolization) বলা যেতে

পারে। উল্লেখ্য যে, পিজিন কোন জাতির মাতৃভাষা নয়, এটি কেবল বন্দর এলাকায় লেনেদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পিজিন যখন বংশ পরম্পরায় কোন জাতির মাতৃভাষায় পরিণত হয় তখন তাকে ক্রেয়ল বলা হয়।

জীবনানন্দ তার কবিতায় তৎভব, দেশী ও তিরিশি নন্দনতত্ত্ব বাহিত সুশীল শব্দের ব্যবহার বেশী করেছেন। তিনি এমন সব দেশী শব্দ তার কবিতায় প্রয়োগ করেছেন; যা তার পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন-দু'জন কবিতায় শালিখকে নিয়ে তিনি লিখেছেন,

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলেঃ

[দু'জন, বনলতা সেন]

এখানে 'ঠ্যাং' শব্দটি কবিতার ক্ষেত্রে গতানুগতিক নয়। এরকম তিনি কবিতায় 'ফেঁড়ে' 'নটকান' ' শেমিজ', 'থুতনি' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বুদ্ধদেব বসু'র উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার ক'রেই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর Diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না।...... তার নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এজন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।'

নজরুলের কবিতার আবহকে জাতির উচ্চমার্গের সোচ্চার কণ্ঠস্বর বলা যায়। যা কেবল একজন নির্ভীক কবির পক্ষে বীরদর্পে বলে যাওয়া সম্ভব। তিনি স্বাভাবিক কবি নন। সৃষ্টিশীল বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তার উত্তরণ ঘটেনি। তিনি বাংলা সাহিত্যের মূল চরিত্রকে ভিন্ন অবয়ব প্রদান করেছেন। নজরুল রবীন্দ্রোত্তর হয়েও রবীন্দ্রবলয় থেকে ভিন্ন এবং তিরিশি কবিদের শিল্প প্রকরণ হতে অনেকটাই আলাদা এক কবিমানস। তিনি বাংলা কবিতায় সৃষ্টি করেছেন একটি সূর্যকরোজ্জল অভিনব উজ্জ্বল আকাশ। তিনি কথা বলেছেন রহস্যশূন্য, সরাসরি। ঠিক আমরা যেমনটি বলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি।

জীবনানন্দের কবিতার আবহের মধ্যে রয়েছে গল্প বলে যাবার মতো একটা অলস-উতরোল ভঙ্গি, রয়েছে লৌকিকতার আমেজ, নিসর্গপ্রীতি, ভায়োলিনের করুণ সুর। বুঝি না—বুঝি না— একটা অবোধ্য যন্ত্রণা। পড়ার পর পাঠকের মনে হয় এই যন্ত্রণা সেও লালন করছে। কোথাওবা কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময়তা; সময় যত গড়িয়ে গেছে তিনি ততই রহস্যময় মায়াবী পর্দা দিয়ে নিজেকে আড়াল করেছেন।

কবিমাত্রই প্রেমিক, তাই নজরুল ও জীবনানন্দ তার ব্যতিক্রম নন। তবে পার্থক্য আছে উভয়ের দৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিতে। উভয়ের মধ্যে মিল এই যে, দু'জনের কেউই মনোবিলাসী পেত্রার্কান প্রেমিক নন। নজরুল নারীকে চেয়েছেন বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন রূপে। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনে তিনি একাধিক রমণীর সংস্পর্শেও এসেছেন।

স্ত্রী প্রমিলা ছাড়াও নার্গিস ও ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে তাঁর আবেগবাহিত সম্পর্ক সকলেরই জানা। তিনি লিখেছেন– 'প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু' (অনামিকা)। তিনি নারীর ভেতর রহস্যমধুর এক শরীরী সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন এবং চিরদিন প্রেমিকার কাছে হার মানতেও রাজী হয়েছেন।

তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
[বিজয়িনী, ছায়ানট]

অন্য অর্থে বলা যায়, নারী-প্রেম নজরুলের কবিসত্তায় এক সর্বগ্রাসী শক্তি বা তাকে বাংলা ভাষার একজন সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কবিতে পরিণত করেছে। তিনি নারীকে রূপবদ্ধ করেছেন প্রথাগত বর্ণনামূলক স্বতঃস্ফূর্ততায়। অন্যদিকে জীবনানন্দের নারী একই সাথে শরীরী প্রতীক হয়েও এক প্রতীকায়িত সত্তা। একদিকে ঘাই হরিণীর ডাক, অন্য দিকে বনলতার হেলেনীয় সৌন্দর্য তাঁর নারীকে করেছে মিশ্র-প্রতিমা। বোদলেয়ারের নির্বেদ ও বিষণ্নতা তাঁর প্রেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা বৈষ্ণবীয় বিরহের চেয়ে আলাদা। নারীর ভেতর জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছেন মৃত্যু চেতনাকেও। কখনও কখনও, যেমন 'শ্যামলী'-এই নারী প্রতীকে তিনি ইতিহাসচারিতার ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করেছেন।

নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় সুন্দরের বিভিন্ন রূপ ও দর্শন রয়েছে। এই সুন্দর কখনো বিনাশকারী, কখনো সৃষ্টিকারী, কখনো প্রেমময়ী, কখনো প্রেমময়, কখনো শোকময়, কখনো চঞ্চল, কখনো স্থির, কিন্তু তার সংজ্ঞা বিবর্তনধর্মী। চলমানতাই সৃষ্টি, চলমানতাই স্রষ্টা, চলমানতাই মানুষ। এই তত্ত্ব নজরুলের সমগ্র রচনায় পরোক্ষ দর্শন হিসাবে উপস্থাপিত। 'আমার সুন্দর' শীর্ষক নজরুলের অবিস্মরণীয় স্বীকারোক্তিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেছেন–'তাঁর কোনো অচঞ্চল প্রতিকৃতি নেই। জন্মসূত্রে মুসলমান, বাঙালি ও ভারতবর্ষীয় এই কবি নিজেকে জ্ঞানমানব রূপে, অভেদসুন্দর রূপে কল্পনা করেন। অতঃপর তিনি সর্বমানবের মুক্তির প্রতীকরূপে নিজেকে স্রষ্টার মাঝে নির্বিকার স্রষ্টার আদলেই প্রতিস্থাপন করেন। মানুষই ধর্মাধর্ম, মানুষই জ্ঞান, মানুষই স্রষ্টা, মানুষই সৃষ্টি, মানুষই আচার-অনাচার, মানুষই উদ্ধার—মানুষের শক্তিমত্তার এমন দৃষ্টান্তরহিত স্বীকৃতি তো স্বয়ং নজরুল।' নজরুলের দর্শনের মধ্যে বিবর্তনাশ্রয়ী জীবসত্তাই প্রধান। জীবনানন্দ মূলত ইতিহাসচারী এবং মানবসত্তার আপাত-নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাসী বলে মনে হয়। তাঁর অন্ধকার নামক সুবিখ্যাত কবিতায় তিনি যে স্থবিরতা ও নিদ্রামগ্নতার কথা বলেছেন তাকে মহামতি বুদ্ধদেব বর্ণিত নির্বাণের সাথে তুলনা করা যায়। ফলে নজরুল ও জীবনানন্দের দর্শন মৌলিকভাবে বৈপরীত্য-কণ্টকিত।

নজরুল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তার 'চিরশিশু' কবিতায় এই বিষয়টি

বিশেষভাবে প্রকাশিত। তিনি বারবার নতুন নামে নতুন মানুষ হয়ে এই মর্ত্যলোকে আসার কথা বলেছেন,

নাম হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন নামের আজ পরলি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ॥
আবার মনের মতন করে
কোন্ নামে বল ডাক্‌ব তোরে।
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারে বারে নাম হারায়ে।
[চিরশিশু, ছায়ানট]

এই জন্মান্তরবাদ জীবনানন্দের কবিতার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় তিনি বিভিন্ন প্রতীকে ফিরে আসতে চেয়েছেন বাংলার রূপসী বুকে,

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে,
কুয়াশার বুকে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়,
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে-ভেসে; আবার আসিব আমি
বাংলার নদী মাঠ খেত ভালবেসে।
[আবার আসিব ফিরে, রূপসী বাংলা]

নজরুল প্রথম জীবনে স্বভাবে চঞ্চল, প্রচন্ড বহির্মুখী (Extrovert); পরবর্তী জীবনে বিশেষত: বুলবুলের মৃত্যুর পর অন্তর্মুখী। জীবনানন্দ প্রথম জীবনে অর্ন্তমুখী (Introvert), চাপা স্বভাবের। পরবর্তী সময়ে 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা-কালবেলা' কাব্যগ্রন্থে তিনি ইতিহাসচারী, বহুলাংশে বহির্মুখী মানুষ।

নজরুল বাঙালীর চিরচেনা জগৎকে, অভ্যস্ত স্বভাবকে অস্বীকার করে তার কবিতায় গতিময়তার ছন্দ-হিন্দোল প্রবাহিত করেছেন। বাঙালীর অচঞ্চলতাকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে গতিহীনতা। তিনি অলস জাতির কর্মময়, আনন্দমুখর জীবন প্রত্যাশা করেছেন। এ কারণেই তিনি রচনা করেছেন 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাসের' মতো কবিতা; রচনা করেছেন কৃষক, ছাত্র, ধীবর আর শ্রমিকদের জন্য জাগরণী গান। নজরুল বাঙালীর জীবনে রাঙাপ্রভাতের স্বপ্ন দেখেছিলেন,

উষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।'

[চল্ চল্ চল্, সন্ধ্যা]

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় তমগুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক ধরনের কর্মবিমুখতা, রহস্যবিধুর অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা তার কবিতাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি স্বপ্নের ধ্বনিদের মুখোমুখি হয়ে শুনেছেন,

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায়ঃ স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো;' শৈলেশ্বর ঘোষের ভাষায়—'বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ সেই কবি যিনি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছিলেন,

জেগে ওঠা কষ্টকর. জেগে থাকা আরো কষ্টকর।

জীবনানন্দ চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন,

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?

[অন্ধকার, বনলতা সেন]

যে কোন কবিকে প্রথমেই তার তাৎপর্যপূর্ণ (Significant) শিল্পকর্ম দিয়ে সনাক্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', সুফিয়া কামালের 'সাঁঝের মায়া', নজরুলের 'বিদ্রোহী', জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এ জাতীয় রচনা। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। কবিতাটি নজরুলের জন্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বয়ে এনেছিল। এই কবিতাটিকে তাঁর 'জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' বলে চিহ্নিত করা যায়। বিদ্রোহী কবিতা প্রসঙ্গে কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন–'বিদ্রোহী পড়লাম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে—মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করেছিল, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।' এই কবিতা সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার অভিযোগ করেছিলেন, কবিতাটি তাঁর 'আমি' নামক গদ্য রচনার ভাবাদর্শে লিখিত। 'বিদ্রোহী' গ্রীক ও ভারতীয় মিথের সমন্বয়ে প্রধানত উত্তম পুরুষে লিখিত। এই কবিতার শতকরা ১৮ ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে 'আমি'। এই আমিত্বের ভেতর তিনি সর্ব আমিত্বের সমাহার দেখেছেন। 'বনলতা সেন' কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'কবিতাটি পাওয়ার পর বুদ্ধদেব আর প্রেমেন্দ্রের মুগ্ধতা আর কাটে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম জানিয়েছিলেন 'অ্যালান পো' রচিত 'To Helen কবিতার সাথে 'বনলতা সেন' কবিতার সাদৃশ্যের কথা। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিকে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) মিথ। এই ব্যক্তিগত মিথ কিংবদন্তীর সীমা ছাড়িয়ে সকলের অর্থাৎ সার্বজনীন মিথে পরিণত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' এবং 'বনলতা সেন' দুটি কবিতাকেই বলা যেতে পারে প্রেমের কবিতা। বনলতা সেনের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর মনোলীলার মুখোমুখি বসে নিশ্চুপ প্রশান্তির আকাঙ্খা করেছেন। তাঁর অন্ধকার মূলত অনন্ত শান্তিদায়ী একটি পরিবেশ। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাতে

চূড়ান্ত মানবিক বিদ্রোহের পর শান্ত হবার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে; যদি পৃথিবীতে নিপীড়নমুক্ত প্রশান্ত পরিবেশ বিরাজ করে। দু'টি কবিতা-ই ইতিহাস-আশ্রয়ী মিথ-নির্ভর।

নজরুল-জীবনানন্দ উভয় কবিই ট্রাজিক পরিণতির শিকার এবং উভয়েরই অন্তঃক্ষরণ হয়েছিল। নজরুলের পুত্র বুলবুল মারা যাবার পর তিনি রচনা করেন— 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি'। এই রচনার বিষাদময়তার সাথে জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সাযুজ্য বর্তমান। নজরুলের ট্রাজিক অনুভূতির তুঙ্গীয় নিদর্শন তাঁর সঙ্গীত। সঙ্গীতের সুর-মুর্চ্ছনার মধ্যে রয়েছে বুকের ভেতর থেকে ভেসে আসা নির্মোহ বেদনার প্রতিধ্বনি। হেমন্তের সর্বশূন্যতা, সর্বরিক্ততা জীবনানন্দের কবিতাকে সর্বদাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার লেখা শেষ কবিতাতেও তিনি হতাশার বাণী উচ্চারণ করেছেন,

কেন চ'লে যেতে চাও মিছে;
কোথাও পাবে না কিছু,
[হে হৃদয়, বেলা অবেলা-কালবেলা]

নজরুল ও জীবনানন্দ দুজনই অবিমিশ্র বাঙালী। বাংলা কবিতা ও সংস্কৃতির এই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান বৈশ্বিক আধুনিকতাকে আত্তীকরণ করেছেন নিজস্ব প্রকরণ ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে। বিষয় ও প্রকরণে নজরুল যে দু'জন পাশ্চাত্য কবির কাছে ঋণী, তারা হলেন– হুইটম্যান ও শেলী। নন্দনতত্ত্বের ধারণায় তিনি কীট্‌সের সৌন্দর্যতত্ত্বের কাছাকাছি। জীবনানন্দ প্রধানত ইয়েটস্ দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়া তাঁর প্রকৃতির বর্ণনামূলক কবিতায় কীটসের সৌন্দর্য এবং পরাবাস্তব উপমায় অ্যাপোলোনিয়রের প্রভাব পরিলক্ষিত। ফলে দু'জনেই স্বদেশের মাটিতে শিকড় চারিয়ে ডালপালা বিস্তার করেছেন সীমাহীন আকাশে, যার অন্য নাম আন্তর্জাতিকতা।

একই সময়ের কবি হয়েও জীবনানন্দ নজরুলের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবে পরিণত জীবনানন্দ নজরুলের চেয়ে সর্বৈব পৃথক এক কবিসত্তা। সৃষ্টির কল্পনার দিক দিয়ে দুই কবিই মৌলিক ও অভিনবত্ব প্রয়াসী। নজরুলের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং জীবনানন্দের পরাবাস্তব প্রবহমানতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও দূরান্বয়ী মিল লক্ষ্যযোগ্য। একই সময়বাসী এই দুই কবি এ কারণে সম্পূর্ণ আলাদা জগতের নির্মাতা হয়েও আধুনিক বাংলা কবিতার দুই সম্পূরক সত্তা।

পাদটীকা

১) ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল (সম্পাদিত), ১৯৯১ নজরুল ইসলামঃ নানা প্রসঙ্গ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২) সৈয়দ, আবদুল মান্নান, ১৯৮৯, নির্বাচিত প্রবন্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা।
৩) ত্রিপাঠী দীপ্তি, ১৯৭৪, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪) মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, ১৯৯৬, নজরুলচেতনা, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা
৫) নজরুলের কবিতা সম্পর্কে পিজিন ও ক্রিয়ল বিষয়ক মন্তব্যটি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার লেখা প্রবন্ধ- 'Nazrul's Personlore এর অনুসরণে লেখা। প্রবন্ধটির উৎস-'Nazrul: An Evaluation, Edited by Mohammad Nurul Huda, June 1997, Nazrul Institute. Dhaka.

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) কাদির, আবদুল (সম্পাদিত), ১৯৭৭, নজরুল রচনাবলী (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২) সৈয়দ, আবদুল মান্নান, ১৯৭৭, নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা। নজরুল একাডেমী, ঢাকা।
৩) আহ্সান, সৈয়দ আলী। ১৯৫৪, নজরুল ইসলাম।
৪) মামুদ, হায়াৎ ১৯৮৩, নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৫) হক, শেখ আজিবুল ১৯৮৭ নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য
৬) ইসলাম, রফিকুল, ১৯৬৯, নজরুল নির্দেশিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৭) ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, ১৯৮৩, সমকালে নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
(৮) সৈয়দ, আবদুল মান্নান, ১৯৭৩, শুদ্ধতম কবি, নলেজ হোম, ঢাকা
৯) সৈয়দ, আবদুল মান্নান, ১৯৮০, দশ দিগন্তের দ্রষ্টা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১০) সৈয়দ, আবদুল মান্নান (সম্পাদিত), ১৯৮৪, জীবনানন্দ চারিত্র, ঢাকা
১১) হুদা, মুহম্মদ নূরুল, ১৯৮১, শর্তহীন শর্তে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১২) Selly, Clinton Booth, 1990. A POET APART (A literary Biography of the Bengali poet Jibanananda Das (1899-1954). DELWARA, New York: University of Delawara Press.

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — বিংশ সংকলন]

সঙ্গীতানুষঙ্গ

নজরুল-গীতি পরিবেশনা প্রসঙ্গে

বেদারউদ্দিন আহমদ

আমরা যারা নজরুল-গীতির পরিবেশক অর্থাৎ শিল্পী, আমাদের নজরুল-গীতির গায়কী সম্পর্কে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা প্রয়োজন। যেমন—প্রথমে নজরুল-গীতির মূল সুরে ও নাজরুলিক উচ্চারণ সহকারে গান পরিবেশন করা। নাজরুলিক উচ্চারণ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে, নজরুল তাঁর গানে বাংলা ভাষার সঙ্গে অনেক আরবী, ফারসী, উর্দু ও হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দগুলির সঠিক উচ্চারণ— যেমন 'রোজ হাসরে' এর রোজের উচ্চারণ যদি জ জেড্ এর উচ্চারণ না করে যদি শিল্পী j এর উচ্চারণ করেন তবে শুনতে খুবই খারাপ লাগবে। ঐ রূপ 'শরাব' 'সাকী' 'বেহেস্ত' ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে শ এর উচ্চারণ sh ও স এর উচ্চারণ শুধু s এর উচ্চারণ হবে। নাজরুলিক উচ্চারণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য (্)'হসন্ত' এর ব্যবহার যেমন—ফুল, এই ফুল্ শব্দটি যদি লম্বা সুরের হয় তবে ফু এর উপর সুর না টেনে ফুল ল্ এর উপর সুর টানতে হবে। রবীন্দ্র-সংগীতের বেলায় উচ্চারণ হবে স্বাভাবিক, অর্থাৎ ফুল শব্দে যদি সুরের চার মাত্রা টানতে হয়, তখন উক্ত ফুল টেনে নিম্নরূপ হবে।

া -া -া -া
ফু ০ ০ ল্

কিন্তু নজরুল-গীতির বেলায় নিম্নরূপ উচ্চারণ হবে,

-া -া -া -া
ফুল্ ০ ০ ০

কিন্তু কোন নজরুল-গীতির স্বরলিপি গ্রন্থে উক্তরূপ লিখিত হয়নি। স্বরলিপিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপির পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। নজরুল-গীতির কিছু শিল্পীকে (্) হসন্ত এর উচ্চারণ করতে শোনা যায় ও ভালো লাগে। ইদানীং কিছু নজরুল-গীতির শিল্পীকে নজরুলের মূল সুর পরিবর্তন করে গানের কোন কোন পংক্তিতে নিজস্ব সুর ও অলংকার ব্যবহার করতে শোনা যায়। একজনকে দেখে অন্যজন আবার একই গানের একই পংক্তিতে আলাদা সুর ও অলংকার দিয়ে পরিবেশন করেন। যার ফলে নজরুল-গীতির সুরের প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে। এর পরে আছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দেশ ও প্রতিবেশী দেশ হতে স্বরলিপি পুস্তকের (নজরুল-গীতির) প্রকাশনা, উক্ত পুস্তকগুলিতে একই গানের দুই প্রকার সুরের স্বরলিপি

পরিলক্ষিত হচ্ছে। উক্ত স্বরলিপি-গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ গানেই গ্রামোফোন রেকর্ডকৃত সুরের সংগে গরমিল হতে দেখা যাচ্ছে (প্রয়োজনে পরবর্তী কোনো আলোচনায় গানের ও স্বরলিপিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে)। এতে নজরুল-গীতির শিল্পীদের মধ্যে পরিবেশনার ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষক, শিল্পী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যেরূপ নিষ্ঠার সাথে গানে স্বরলিপি ও গায়নরীতি মেনে চলতে দেখা যায়, নজরুল-গীতির শিল্পীদের তা তেমন মেনে চলতে দেখা যায় না। এই প্রবণতা নজরুল-গীতির ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে বলে আশংকা হয়। তাই আমার নিবেদন নজরুল-গীতির শিল্পীদের কাছে। তাঁরা যেন নজরুলের গানের বিকৃতি রোধ করে মূল সুরে পরিবেশন করে নজরুল-গীতিকে ফ্রি স্টাইলের হাত হতে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন।

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ রাত্রিতে বাংলাদেশ টেলিভিশন যে নজরুল-গীতিগুলি প্রচার করে, তার মধ্যে অতি পরিচিত একটি গজলের সুর পরিবর্তন ও বেশ কিছু তান ও সারগাম করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, বাংলাদেশের একজন প্রবীন, খ্যাতনামা নজরুল-সংগীতশিল্পী ও শিক্ষকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, নজরুলের গজল গানে তান সারগাম করার নিয়ম নেই এবং এর আগে কোন গজল গানে তান সারগাম সহ পুরাতন শিল্পীদের দ্বারা গ্রামোফোন রেকর্ড হয়েছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নেই! নজরুল-গীতির অনেক সংকলন আমাদের দেশ ও প্রতিবেশী দেশ হতে বের হয়েছে। যেমন বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সংকলিত এবং পরে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), জনাব আবদুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত ও কলিকাতা হতে প্রকাশিত 'নজরুল গীতি অখণ্ড' ১ম ও ২য় সংস্করণ। নজরুল গীতির 'অখণ্ড' নামকরণের কি যুক্তি আছে বুঝতে পারছি না, কেন না, কবির সব গান উক্ত দুইটি সংস্করণেও স্থান পায়নি। কাজেই 'অখণ্ড' নাম কিভাবে হতে পারে? তবুও জনাব আবদুল আজীজ আল আমান সাহেবের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই, একটি পুস্তকের মাধ্যমে অতগুলি নজরুল-গীতি উপহার দেওয়ার জন্য : নজরুল-গীতির শিল্পীদের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন উক্ত বইপত্রের সাহায্যে অন্তত গানের সঠিক বাণী পরিবেশন করেন। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রেডিও বাংলাদেশের রেকর্ডকৃত অনেক নজরুল-গীতির বাণীই সঠিক নয়, তাতে নানা ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। কিন্তু উক্ত গানগুলি মাঝে মাঝেই বেতার থেকে প্রচার করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা উক্ত ভুল বাণীই অনুসরণ করে। এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত নজরুল-গীতির শিল্পী একটি জনপ্রিয় নজরুল-গীতির 'শূন্য এ-বুকে পাখী মোর আয়' গানটির সঞ্চারিতে 'আকাশে মেলিয়া শত শত কর' গেয়েছেন। নজরুল-গীতির কোন পুস্তকে অবশ্যই উক্ত কথাই ছাপা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, 'গগনে মেলিয়া শত শত কর' এই পংক্তিই রেকর্ড হয়েছে (শিল্পী শ্রী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী মেগাফোন রেকর্ড কোং)। যে বিখ্যাত শিল্পীর কথা উপরে বলা হলো তাঁর ভুল ধরে

দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা জানি, অনেক সময় অনেক গানের বাণী আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়, তখন আমাদের বই-পুস্তক থেকে বাণী সংগ্রহ করতে হয়। অবশ্য কোন কোন শিল্পী বেতারের ষ্টুডিও রেকর্ডে 'গগনে মেলিয়া শত শত কর' গেয়েছেন। কবি অনেক গানের বাণীর কোন কোন শব্দ পরিবর্তন করে গ্রামোফোন রেকর্ড করিয়েছেন, সুরের সাথে সঙ্গতি রাখার উদ্দেশ্যে। হয়ত মূল পাণ্ডুলিপিতে উক্ত পরিবর্তন করতে ভুলে গেছেন এবং হয়ত আগে অথবা পরে পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী বইয়ে ছাপা হয়েছে। কিন্তু তবুও গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীকেই সঠিক বলে মানতে হবে। পাকিস্তান আমলে অনেক ইসলামী গানের কথা পরিবর্তন করে আমাদের গাইতে হ'ত। 'এ কোন্ মধুর শরাব দিলে আল আরবী সাকী' এই বিখ্যাত গীতটির একটি পংক্তির মূল বাণী 'নর-নারী বাদশা ফকীর।/ তোমার রূপে হয়ে অধীর'। কিন্তু তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাদের গাইতে হতো 'তোমার নামে হয়ে অধীর' বহু গানের বাণী এইভাবে পাকিস্তান আমলে পরিবর্তন করা হত। নজরুল-গীতি শিল্পীদের কবির গানের কথা ও কাব্যমূল্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা অবলম্বন করতে আহ্বান জানাই। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, গজল, এমনকি নজরুলের খেয়াল ও ঠুংরি অঙ্গের গানের বাণীরও যথেষ্ট মূল্য আছে। অতএব, আমাদের সুরের সাথে সাথে গানের কথা অর্থাৎ কাব্যের প্রতিও মনোনিবেশ করা উচিত। নজরুল-গীতিকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত পুরোপুরি না হলেও একটা সীমার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত, অন্যথায় যথেচ্ছাচারের ফলে ভবিষ্যতে নজরুলের নাম ছাড়া তাঁর সুরের ও গায়কীর চিহ্ন পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, সব ভাষারই একটা আলাদা বাচনভঙ্গি আছে। সেরূপ সংগীতের ক্ষেত্রেও এই ভঙ্গি অর্থাৎ গায়কীরও আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বাউল, কীর্তন, উচ্চাঙ্গ, রবীন্দ্র-সংগীত ইত্যাদি শুনলেই বুঝতে পারি কোন্টা ভাটিয়ালী, আর কোন্টা উচ্চাঙ্গ-সংগীত। সেইরূপ নজরুল-গীতি শুনলেও যেন আমরা বুঝতে পারি যে এটা নজরুল-গীতি যদিও নজরুল-গীতি বৈচিত্র্যময়, তথাপি নজরুল-গীতির অলংকারের প্রাচুর্য, গায়কীর বলিষ্ঠতা ও বাণীর গাঁথুনী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ ও অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এটা নজরুল-গীতি— যদি শিল্পী মূল সুর ও ঢং এ গান পরিবেশন করেন।

এবারে আমি নজরুলের রাগাশ্রয়ী গান সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোচনা করবো। মরহুম ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন — 'নজরুল সমস্ত বিষয়ে অস্থিরচিত্ত ছিল। কিন্তু একমাত্র রাগ-রাগিনীর শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনে ছিল খুবই ধীর-স্থির শান্ত ও অনুগত'। নজরুল নিজস্ব ও বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর রাগ-ভিত্তিক গানগুলির সুরসৃষ্টিতে। দরবারী কানাড়ায়ে— "আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ," কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে', 'বাজে মৃদঙ্গ বীণা বাজে মূরলী', মিয়াকী মল্লারে— 'স্নিগ্ধ শাম বেণী বর্ণা', 'আজি এ শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে',— ছায়ানটে— 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়', বেহাগে 'নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে', নট বেহাগে— 'রুম

ঝুম ঝুম ঝুম নূপুর বোলে', জয়-জয়ন্তীতে— 'মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি', ললিত রাগে— 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে' ইত্যাদি আরো প্রচুর রাগভিত্তিক রচনা ও সুরযোজনা করেছেন। উক্ত গানগুলির কয়েকটি যদিও হিন্দী খেয়ালের অনুসরণে রচিত ও সুরারোপিত, তথাপিও বাঙ্গালী শ্রোতাদের জন্য এ গানগুলি সুখশ্রাব্য। কেননা হিন্দি খেয়ালের বাণী গৌণ, কিন্তু নজরুল উক্ত খেয়াল অঙ্গের গানে যে বাণী রচনা করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। এখানে আরো উল্লেখ করার বিষয় যে, হিন্দী খেয়ালের বাণীতে ঠিক রাগের যে রূপ তার প্রকাশ দেখা যায় না সব সময়। কিন্তু নজরুল রাগাশ্রয়ী গানগুলিতে রাগের বৈশিষ্ট্য ও কাল অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাব্যে বর্ণনা করেছেন। যেমন 'জয় জয়ন্তী' বর্ষা ঋতুর রাগ। তাই নজরুল লিখেছেন 'মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি', গানটিতে বর্ষাকালের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলতানী রাগটি গীত এবং বাদিত হয় বিকেল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত। নজরুল 'মূলতানী' শব্দটি গানের বাণীতে অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। গানটির প্রথম পংক্তি 'কার বাঁশরী বাজে মূলতানী সুরে নদী কিনারে কে জানে/' কোন রাগের সাহায্য ব্যতীত শুধু মুলতানী রাগের উপরে সুন্দরভাবে সুর নির্মাণ করেছেন ও বাণীর মধ্যে বিকেল ও সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়েছেন। অন্তরা 'একে চৈতালী সাঁঝ অলস / তাহে ঢল ঢল কাঁচা বয়স / রহে চাহিয়া ভাসে কলস/ হৃদি বাঁশরিয়া পানে।' আরেকটি গান 'রুম ঝুম ঝুম নূপুর বোলে' গানটিও একটি হিন্দী খেয়াল গানের অনুসরণে রচিত হলেও উক্ত গানটির কাব্যমূল্য অনস্বীকার্য। গানটি নটবেহাগ রাগে রচিত। এক পংক্তিতে তিনি লিখেছেন 'নাচে নট বিহগ শিখি তরুতলে'। রাগের নাম নট বেহাগ, তিনি লিখেছেন 'নাচে নট বিহগ শিখি' একটি শব্দ দ্বারা দু'টি অর্থ প্রকাশ করেছেন। নট বিহগ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ময়ূর পাখী। কিন্তু সংগীত-রসিকদের বুঝতে মোটেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, গীতিকার আসলে রাগের নামটি অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে নটবেহাগকে নট বিহগ রূপে তুলে ধরেছেন ও সুরের মাধ্যমে উক্ত কথাগুলিতে রাগের রূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, যেমন—

পা গা -া মা। গা পা মা গা। সা ন্া সা -া। ন্া ধ্া পা -া স্বরগুলির মাধ্যমে নটবেহাগ রাগের স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। হিন্দী খেয়াল গানকে অনুসরণ ছাড়াও রাগ-আশ্রয়ী বহু মৌলিক রচনা ও সুর-যোজনার অনেক গান আছে। রাগ 'মিয়াকী মল্লার'এ রচিত 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা এসো মালবিকা / অর্জ্জুন মঞ্জরী কর্ণে গলে নীপ মালিকা'। 'মিয়াকী মল্লার'কে বর্ষাকালের রাগ মানা হয়। কিন্তু বহু হিন্দী গানের বাণীতে বর্ষাকে আহ্বান জানানো হয়েছে মল্লার সুরে। ইতিহাসের একটি কিংবদন্তী- 'সম্রাট আকবরের নবরত্ন-সভার অন্যতম এক রত্ন ছিলেন সুর সম্রাট তানসেন। তৎকালীন ভারত-উপমহাদেশে তানসেনের সমকক্ষ আর কোন সুরশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু ঐ রত্ন পদবী অধিকার করার বাসনা অনেকের ছিল। কিন্তু তারা প্রতিযোগিতায় তানসেনের সঙ্গে টিকতে না পেরে ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেছিল। একটি রাগ আছে 'দীপক'। রাগটি খুবই উদ্দীপক। দীপক রাগটি লোকালয়ে গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আত্মশুদ্ধির জন্য ও স্রষ্টার অনুগ্রহ লাভের আশায় তিনি এই রাগটি

নির্জনে রেওয়াজ করতেন। উক্ত রহস্য তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বীরা জানতো। তারা প্রচার করতে থাকে যে তানসেন এমন একটি রাগ জানেন যার নাম রাগ 'দীপক'—অতি মধুর রাগ। কিন্তু 'দীপক' রাগ তানসেন কাউকেও শোনায় না। এই কথাগুলি সম্রাট আকবরের কন্যার কর্ণগোচর হয় এবং তিনি অসুস্থ অবস্থায় উক্ত রাগ শ্রবণ করার জন্য বাদশার কাছে আবদার করেন, যেন তানসেন তাকে 'দীপক' রাগ শোনান। বাদশা তখন তানসেনকে উক্ত রাগটি তাঁর কন্যাকে গেয়ে শোনাতে বলেন। কিন্তু তানসেন অত্যন্ত বিনীতভাবে বাদশাকে জানান যে 'দীপক' রাগ ছাড়া যে-কোনো রাগ গাইতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বাদশা তাঁর ক্ষমতার দর্পে 'দীপক' রাগই শোনাতে হবে বলে হুকুম দেন। তানসেন তখন বলেন, 'শিল্পী কারো হুকুমের মর্যাদা দিতে পারে না, আপনি আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পারেন'। সম্রাট আকবর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি অনুভব করলেন যে তানসেনকে ইচ্ছা করলে মেরে ফেলা যাবে কিন্তু তাঁকে দিয়ে 'দীপক' রাগ গাওয়ানো যাবে না। তখন তিনি অন্য পথ ধরলেন। শিল্পীর দুর্বল স্থানে তিনি আঘাত দিয়ে বললেন— 'বন্ধু তানসেন, আমার কন্যা মৃত্যুশয্যায়, সে হয়ত আর বাঁচবে না। তুমি আমার প্রাণাধিক কন্যার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবে না বন্ধু'? তখন তানসেন উচ্ছসিত হয়ে বললেন 'আমি অবশ্যই আপনার কন্যার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবো। তবে মহামান্য সম্রাট, 'দীপক' রাগ গাওয়ার আগে আমার কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে।' বাদশাহ্ তাঁর শর্তগুলি জানতে চাইলেন। তানসেন বললেন, 'আমি যেদিন 'দীপক' রাগ গাইবো তার এক সপ্তাহ আগে সারা দেশে প্রচার করতে হবে যে, অত তারিখে অতটার সময় সুর সম্রাট তানসেন 'দীপক' রাগ পরিবেশন করবেন।' তানসেনের কথামত কাজ করা হলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে তানসেন রাজদরবারে দীপক রাগ পরিবেশন শুরু করলেন এবং অস্থিরচিত্তে চারদিকে কি যেন খুঁজে ফিরছিলেন। কিন্তু তাঁর আকাংখিত ব্যক্তিকে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে গান শেষ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তানসেনের আশা ছিল যে 'দীপক' রাগ গাওয়ার খবর যথাসময়ে 'তানী' (তানসেনের শিষ্যা ও প্রণয়িনী) শুনতে পাবে এবং 'দীপক' রাগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তানী 'মিয়াকী মল্লার' গেয়ে তার দেহমনে স্নিগ্ধতা আনয়ন করবে। কিন্তু কোথায় তানী! তানসেন যে 'দীপক' গাইবে সে কথা তানী যখন শুনতে পায় তখন তানসেন মৃত্যুর কোলে চির নিদ্রায় নিদ্রিত'। এই কাহিনী বলার উদ্দেশ্য, 'মিয়াকী মল্লারের' রূপ রস ও কার্যকারিতার ব্যাখ্যা করা। নজরুল গ্রীষ্মের এক দুপুরে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে ধ্রুপদী ভঙ্গিমায় 'মিয়াকী মল্লারে' রচনা করেন— 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা এসো মালবিকা/ অর্জ্জুন মঞ্জরী কর্ণে গলে নীপ মালিকা'। মিয়াকী মল্লার পূর্বাঙ্গ- প্রবলঅর্থাৎ উদারা সপ্তকের ন্া ধ্া ন্া সা. এবং না সা রা সা ন্া ধ্া ন্ সা স্বরগুলোর সফল প্রয়োগে রাগের রূপ প্রকাশ পায়। নজরুল উক্ত স্বরগুলি এমন সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন যার তুলনা হয় না।

ন্সা -রমা -রা [ব]সাঃ । -ণ্ঃ ণ্া [ণ]ধ্া ধ্া। ন্াঃ -সঃ সা -া

স্নি০ ০গ্ ধ শ্যা ০ ম বে ণী ব র ণা ০

স্বরগুলোর মাধ্যমে শুরুতেই আমরা মল্লারের আমেজ পেয়ে থাকি অন্তরার মা ণ্য না ধা না র্সা স্বরগুলি 'ক্ষীণা তন্বী জলভার নমিতা' কথাগুলির সাথে সুন্দরভাবে মল্লার রাগের রূপ প্রকাশ করেছে। নজরুলের এইরূপ গানের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। নজরুল সুরকার ও গীতিকার হিসাবে একটি অবদান রেখেছেন, আর তা হলো, তাঁর একাধিক রাগমিশ্রণে একটি গান সৃষ্টি। 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান আসিবে আজি বন্ধু মোর' গানটির প্রথম অংশ (অন্তরা পর্যন্ত) বেহাগ রাগে প্রতিষ্ঠিত। 'চন্দ্র চুড় মেঘের গায়/ মরাল মিথুন উড়িয়া যায় / নেশা ধরে চোখে আলো ছায়ায় / বহিছে পবন গন্ধচোর'। সঞ্চারী হতে আভোগ পর্যন্ত অত্যন্ত নিখুঁত সুরস্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন বেহাগের সাথে পরয বসন্ত রাগকে মিশিয়ে, 'চন্দ্র চুড় মেঘের গায় / মরাল মিথুন উড়িয়া যায়' এখান থেকে বসন্ত রাগ অর্থাৎ কড়িমধ্যম থেকে শুরু করে গান্ধার ছুঁয়ে কোমল রেখাবে উঠে তারার ঋষবে স্থিতি করার ফলে কথার সাথে সুরের সামঞ্জস্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। চন্দ্র শব্দ শুনলেই আমাদের আকাশের দিকে মন যায় — অর্থাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি যায়। উপরের রূপ প্রকাশের জন্যই মুদারার গন্ধার থেকে তারার ঋষবে স্থিতি। অত্যন্ত কুশলী সুরকার না হলে এবং রাগ-রাগিনীর উপর যথেষ্ট দখল না থাকলে এবং কাব্যের অন্তরনিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে না পারলে স্বরের এমন প্রয়োগ সম্ভব নয়। বসন্ত শেষ করে পুনরায় বেহাগে প্রত্যাবর্তনের সময় আরেকবার সুরকারের কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে। গানের শেষ কয়টি কথা 'বহিছে পবন গন্ধচোর' -এর স্বর সা ম্য -া । -া -া -া এখানে 'সা' থেকে 'মা'তে মীড় করে পা ছুঁয়ে গন্ধারে এসে বেহাগে ফিরে আসার মাধ্যমে। নজরুল আরেকটি অপূর্ব গান সৃষ্টি করেছেন দুটি রাগের সমন্বয়ে। রাগ দু'টির নাম 'ধানেশ্রী' ও 'ভৈরবী'। ভৈরবী রাগটি খুবই পরিচিত, কিন্তু ধানেশ্রী রাগটি সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়া সকলের কাছে পরিচিত নয় বলে ধানেশ্রী রাগের আরোহী অবরোহী বাদী সমবাদী স্বর দেওয়া হল। আরোহী — সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা অবরোহী সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রে সা, বাদী স্বর পঞ্চম সমবাদী ষয়ম। ধানেশ্রী বিকেল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গীত এবং বাদিত হয়। ভৈরবী সকালের রাগ। নজরুল প্রথমে সুরের চিন্তা করে পরে কাব্য রচনা করতেন। এই উক্তির সত্যতা 'সন্ধ্যা মালতী যবে ফুলবনে ঝুরে / কে আসি বাজালে বাঁশি ভৈরবী সুরে' এই গানটির মাধ্যমে প্রকাশিত। প্রথম ছত্রের বাণীতে সন্ধ্যা শব্দটির প্রকাশ করেছেন ধানেশ্রী রাগে এবং 'কে আসি বাজালে বাঁশি ভৈরবী সুরে' কথাগুলি প্রকাশ করেছেন ভৈরবী রাগের স্বরগুলির মাধ্যমে। ভৈরবী শব্দটি দপ মজ্ঞঋ স্বরগুলির মাধ্যমে ভৈরবী রাগকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। পুরো গানটি রচনা করা হয়েছে রাগ দুটিকে প্রকাশ করার জন্য — যেখানে সাঁঝের বর্ণনা আছে — সেখানে ধানেশ্রী, আর যেখানে প্রভাতের বর্ণনা আছে সেখানে ভৈরবী রাগের মাধ্যমে কাব্য প্রকাশ অতুলনীয় হয়েছে।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — দ্বিতীয় সংকলন]

নজরুল-সঙ্গীত প্রসঙ্গে

নারায়ণ চৌধুরী

[ভারতের পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক ও সঙ্গীতজ্ঞ এবং 'সঙ্গীত-পরিক্রমা', 'নজরুলের গান' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক শ্রী নারায়ণ চৌধুরী সম্প্রতি তাঁর বাংলাদেশ সফরকালে নজরুল ইন্সটিটিউট পরিদর্শনে আসেন। নজরুল-সাহিত্য ও সঙ্গীত-সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানেও শ্রী নারায়ণ চৌধুরী 'ডক্টর শহীদুল্লাহ্ স্মারক বক্তৃতামালা' সিরিজে নজরুলের সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। নজরুল ইন্সটিটিউটের তরফ থেকে তাঁর এই দীর্ঘ বক্তৃতা ক্যাসেটে ধারণ করা হয়। ক্যাসেটে ধারণকৃত এই বক্তৃতার অনুলিপি এখানে পেশ করা হলো। যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুণ ক্যাসেটে ধারণকালে কোনো কোনো বক্তব্য, শব্দ ও বাক্যবন্ধ কিছুটা অস্পষ্টরূপে গৃহীত হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে আবার একেবারেই বাণীবদ্ধ হয়নি। সে কারণে অনুলিপিতেও কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকতে পারে। তবে, শ্রী চৌধুরীর বক্তব্য এখানে যথাসম্ভব হুবহু তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ, সুচিন্তিত ও সুলিখিত আলোচনা পেলে তা পত্রস্থ হবে। - স. ন. ই. প.]

আমার যে বক্তব্য কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে—নজরুলের গান সম্পর্কে তাঁর যে সাহিত্যের দিকটা, কাব্যের দিকটা, বিদ্রোহের দিকটা—সেটা অন্য দিক, কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতের যে দিক—সেদিক সম্বন্ধে আমার বিনীত বক্তব্য, গৃহীত কিন্তু শুদ্ধীয়, যে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার যে দিকটির এখনও যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি, এখনও প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি, এবং যখন প্রকৃত মূল্যায়ন হবে তখন দেখা যাবে যে, আমাদের দেশের একজন সেরা বা সেরা না হলেও অন্যতম সেরা সুরকার এবং সুর-স্রষ্টা। * * * *

সুরের একটা নিজস্ব মানদণ্ড আছে, কারণ আমরা সঙ্গীত নিয়ে বিচার করছি, সঙ্গীতের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা সঙ্গীতের আলোচনা করছি, সঙ্গীতের মূল্যায়ন করছি। সঙ্গীতের মূল্যায়ন অত্যন্ত কঠিন, সে-ক্ষেত্রে নজরুলের যে অনন্য অবদান রয়েছে তার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। এই দীর্ঘকাল পশ্চিম বাংলায়—আমাদের জানিত অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি, নজরুল ইসলাম সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে অবহেলিত ছিল, অনাদৃত ছিল। সেটা কি কারণে ঘটেছিল সেই বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য করতে হয়, সে সমস্ত অপ্রিয় প্রসঙ্গের মধ্যে আমি যেতে চাই না। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, দেখা গিয়েছে যে, দীর্ঘকাল কাজী নজরুল ইসলাম সুরকার, গীতিকার হিসাবে আমাদের পশ্চিম বাংলায়, আমি এখানকার কথা বলতে পারবোনা, আমাদের পশ্চিম বাংলায় অনাদৃত, অবহেলিত হয়েছিলেন; তাঁর

যে প্রাপ্য তা তিনি পাননি, যথার্থ যে স্বীকৃতি তাঁর পাওয়ার কথা ছিল সেই স্বীকৃতি তিনি পাননি। ইদানীংকালে দেখা যাচ্ছে যে একটা আলোড়ন ঘটে গিয়েছে—নজরুল ইসলামের গানের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে গেছে এবং যারা এসব সংস্কৃতি জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা বাধ্য হয়েছেন— এই জনগণের যে ক্রমবর্ধমান দাবী— যা প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে— তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। আগে রেডিওতে নজরুলের গান হতো না, হলেও নজরুল-গীতি বলে তার কোন উল্লেখ থাকতো না। আজকে জনরুচির — জনদাবীর চাপে পড়ে এরা বাধ্য হয়েছেন নজরুলকে তাঁর স্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিতে। এবং অন্যান্য মহলও—অভিজাতমহল—সাংস্কৃতিক যে সমস্ত কৌলিন্যবাদী মহল—রবীন্দ্রসঙ্গীতে অত্যন্ত রবরবা—সে-মহল নজরুলকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিল। তাদের মধ্যে একটা স্বভাব-কার্পণ্য ছিল—নজরুল সম্পর্কে— তাঁর কাব্য সম্পর্কেও, এমনকি সঙ্গীত সম্পর্কেও। কিন্তু যেহেতু নজরুল কাব্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন সুরের প্রবর্তক, বাংলা কবিতায় তিনি সাম্যবাদের প্রথম উদগাতা— সাম্যবাদী আদর্শ বা চিন্তা-চেতনার উদগাতা, আর এই কালটি যেহেতু সাম্যবাদের কাল—সমাজতন্ত্রের কাল—সমাজতন্ত্র হচ্ছে এ-যুগের সব চাইতে প্রবহমান আদর্শ এবং শ্রদ্ধেয় আদর্শ—এই কারণে নজরুলকে এড়িয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। নজরুল সাম্যবাদের উদগাতা, অথচ আজকে আমরা সাম্যবাদকে—এটা আজকে একটা current point—এটা একটা চালু মুদ্রা, এটা সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করুন আর নাই করুণ, অন্তরে হয়তো অন্য ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু বাইরে-বাইরে জনপ্রিয়তা রক্ষা করেন, সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান প্রত্যেকে—সে দক্ষিণপন্থীই হউন আর উত্তর-পন্থীই হউন সব দল; বামপন্থী হউন, মধ্য পন্থীই হউন- সব দল। আর সে ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম সাম্যবাদের উদগাতা বাংলা কাব্যে, তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁকে পাশ কাটিয়ে, তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার কি কোনো উপায় আছে? উপায় নেই।

কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কিছু ভিন্ন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্ন এই জন্য যে একান্ত 'বিদ্রোহী'তে তো সুরটা abstract ☆ ☆ ☆ ইউরোপে বিটোফেন থেকে শুরু করে অনেকে ছিলেন—তাঁরা সবাই ছিলেন। তাঁরা সবাই সে-যুগের যে প্রবহমান আদর্শ—প্রগতিশীল আদর্শ তার ধারক-বাহক। আমাদের দেশের অবস্থা একটু ভিন্ন। যাঁরা সঙ্গীত চর্চা করেন তাঁদের সঙ্গে এই যে নতুন কালের যে চিন্তা-চেতনা—অগ্রসর ধ্যান-ধারণা—তার বিশেষ কোন যোগ নেই। তারা এখনও মধ্যযুগের আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে আছে। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে, তিনি একজন গীতিকার হিসাবে বিচার্য নন, আমরা এখানে গীতিকার,—তাঁর গীতিকবিতার বিচার করতে আসিনি, তাঁর সুরের বিচার করতে এসেছি। কেননা, আমার প্রথম আরম্ভ-বিন্দুই হচ্ছে গান। যেহেতু সুর নিয়ে গানের কারবার, সেজন্যে

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরই হচ্ছে মূল বিচার্য, কথা নয়। কথা অবান্তর, কথার স্থান গৌণ। আপনারা অনেকেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত আছেন, আপনারা জানেন যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে—রাগ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কথাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বাণীর তেমন গুরুত্ব নেই—এবং কোন কোন খেয়াল গান আছে—যাতে বাণী মাত্র একটি কি দুটি কথায় সীমিত। কোন কোন খেয়াল গানে বাণী অস্থায়ীতেই সীমিত—টপ্পা গানে অস্থায়ী থেকে অন্তরা—তার বেশী তারা যায় না। কেননা, তারা জানে, তারা ধরেই নিয়েছেন যে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুর পরিবেশন করাটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য, সেখানে কথার জন্য রয়েছে কবিতা, কাব্য। কাব্যের ক্ষেত্রে কাব্যের জগতে যখন আমরা প্রবেশ করবো, তখন আমরা কথার মূল্য বিচার করবো, কথার সৌন্দর্যে আপ্লুত হবো, কথার সৌন্দর্যে বিমোহিত হবো। কিন্তু সুরের জগতে যখন প্রবেশ করবো, তখন কথা এক পাশে সরিয়ে রাখতে হবে, তখন সুরকেই মূল বিচার্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই তথ্যটি ছিল হার্বাট পেন্সারের, এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম-জীবনে এই তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। তিনি যে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন কলকাতায়, তাঁর কৈশোরকালে, তাতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাতে তিনি এই হার্বার্ট পেন্সারের যে মত—এই মতকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সে আদর্শ থেকে সরে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের যে আদর্শ, সেটাতে সুরই হচ্ছে মুখ্য, সুরই হচ্ছে শ্রেয়, সুরই হচ্ছে প্রধান বিচার্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে—বাংলা গানের ক্ষেত্রে এই আদর্শ সবচাইতে সার্থকভাবে যদি কেউ অনুসরণ করে থাকেন তবে তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কথার বিচার নয়, কাব্যের বিচার নয়, তিনি কাব্যেও গীতি লিখেছেন, তিনি গজলে প্রেম-সঙ্গীত রচনা করেছেন, বিরহ-সঙ্গীত রচনা করেছেন, তিনি ভক্তি-গীতি লিখেছেন, তিনি বিদেশী সুর-অঙ্গের গান লিখেছেন। তিনি জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত রচনা করেছেন। এই সমস্ত বিচার অপ্রাসঙ্গিক বিচার, আসল বিচার হচ্ছে সুর, এবং ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে আর এক মূল কথা হচ্ছে যে সুরের স্বাধীনতা, সুর বিকাশের স্বাধীনতা, কথা হচ্ছে সেখানে একটি অবলম্বন মাত্র। যেমন লতা লতায়িত হওয়ার জন্য বেড়ার দরকার মালঞ্চের দরকার হয়। লতা লতিয়ে উঠার জন্য একটা কিছু অবলম্বন চাই, তেমনি সুরকে বিকশিত হয়ে বিকাশ লাভের জন্য তার একটা অবলম্বন দরকার—সে অবলম্বনের নাম হচ্ছে—সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক বাণী—কথা, তার বাইরে কথার আর কোন দাম নেই।

আপনারা বলতে পারেন যে আমি নিজে একজন সাহিত্যসেবী হয়ে, কাব্যানুরাগী হয়ে, এসব কথা বলছি—আমার মুখে এসব কথা খানিকটা আশ্চর্য হওয়ার মত কথা যে আমি কাব্যের মূল্য দিচ্ছি না, আমি সুরকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে সেটা

গোড়াতেই আপনাদেরকে বলে নিয়েছি যে যখন আমরা সুরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে— আমরা গানের আলোচনা করবো—সঙ্গীতের আলোচনা করবো, তখন সুরকেই আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। বাণীকে সেখানে-ঠিক অবান্তর বলা যায় না। বাণীর আর একটা দিক জানেন? বেশীর ভাগ লোক গান শুনে যে মোহিত হন—তারা বাণীর সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে মাথা নাড়েন না, তারা সুরকে— সুরের সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য, সুরের যে অভিনবত্ব, সুরের যে নানা রকম কারুকার্য সেগুলি তাদের প্রাণে নিয়ে যায়—শ্রবণে নিয়ে যায়, তারা জেনে হোক না জেনে হোক, জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারেই হোক, তারা কাব্যপ্রেমে মুগ্ধ হয় তারিফ করে না—গানের তারিফ করে। বেশির ভাগ সঙ্গীতানুরাগী হচ্ছে ঐ পর্যায়ের— এটা আমি কটাক্ষ করে বলছিনা, এটা হচ্ছে প্রকৃত সত্য। ভারতীয় সঙ্গীতে যেটা মূল লক্ষ্য, একটা কথা বলছি যে, কথা সেখানে মুখ্য নয়, কথার স্থান সেখানে গৌণ, আর দ্বিতীয়— যেটা সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ, হয়ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ —সেটা হচ্ছে সুরের স্বাধীনতা—সুরকে বিকাশ করবার স্বাধীনতা থাকা চাই শিল্পীর—গানের মধ্যে সুরকে যদৃচ্ছা খেলাবার স্বাধীনতা। যে-গানে এই স্বাধীনতা খণ্ডিত সে গান গান নামের পদবাচ্য নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের স্ট্যান্ডার্ড, ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শ অনুযায়ী— সেই গানই হচ্ছে গান, সেই সঙ্গীতই হচ্ছে সঙ্গীত—যে সঙ্গীতে শিল্পী বা Executor তাঁর নিজস্ব খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সুরকে, অবশ্য একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে সেই সুরটি নিবদ্ধ থাকে—রাগরাগিনীর যে বিশেষ Limitation বা বাধা-বিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতা আছে—তার বাইরে যাওয়ার কথা বলছিনা। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা—সেই মৌলিক সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে শিল্পীর সে অবাধ অধিকারে সেই সুরকে খেলাবে; 'খেয়াল' নামটাই হচ্ছে তা-ই। 'খেয়াল' কথাটার মৌলিক অর্থই হচ্ছে তাই— যে শিল্পী তাঁর খেয়াল-খুশী অনুসারে সুরকে বিকশিত করে তুলবেন। টপ্পা, ঠুংরী, কাজরী, গজল, কাওয়ালী— এই সমস্ত গানের মূল কথা হচ্ছে এই যে, শিল্পী তাঁর নিজ খেয়াল-খুশী অনুসারেই তাঁর প্রাণের চাহিদা অনুযায়ী, প্রাণের পরিকল্পনা বা কল্পনা অনুযায়ী, নিজের অভিপ্রায় মত, অভিরুচি অনুযায়ী, সুরকে খেলাবেন অবশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে— সেই গণ্ডীর বাইরে গেলে সেটা আদর্শ ভ্রষ্ট হতে হয়—সে-স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ঐটুকু সীমাবদ্ধতা মেনে নেওঁয়ার পর অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে 'ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে'।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গীত রচনায় এই— ভারত বর্ষীয় সঙ্গীতের এই যে মৌলিক আদর্শ, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। আর তাঁর গানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন-যে, তাঁর গানে এই সুর বিকাশের স্বাধীনতা ইংরেজীতে বললে বলতে হয় Freedom of improvisation-এই improvisation করবার যে ক্ষমতা— এটা নজরুলের গানে একেবারে ভরপুর হয়ে আছে; এটা হচ্ছে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় সঙ্গীতে—সেখানে Composer ই হচ্ছে প্রধান। সেখানে

Executor হচ্ছেন কাব্যগানের অধ্যাপক। Executor অর্থাৎ শিল্পী—তা গানের শিল্পীই হউন, যে-কোন ধরনের শিল্পী বা অর্কেস্ট্রার যারা বাদক—তাদের প্রত্যেকেরই হাত-পা বাঁধা। সেখানে Composer যে সুরটা বেঁধে দেবেন বা যে ছকটি গেঁথে দেবেন তার বাইরে একচুল এদিক ওদিক করার উপায় নেই; একচুল এদিক-ওদিক হলেই তাদের যে নির্দিষ্ট—যে সঙ্গীতের বিধি তার থেকে তারা ধপ করে পড়েন। সেখানে Composer ই সর্বেসর্বা এবং শিল্পীর ভূমিকা নিতান্তই গৌন ভূমিকা। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতে শিল্পীর ভূমিকাই প্রধান। যাঁরা Composer বা রচয়িতা—যারা গীত রচয়িতা বা সুর-রচয়িতা তারা অ-প্রধান। কত কত শিল্পী, কত কত সুর-রচয়িতা সুর রচনা করে গিয়েছেন, গান রচনা করে গিয়েছেন, তার কথা কে জানে তাঁদের নাম আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু যাঁরা প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন বা যন্ত্রী ছিলেন তাঁদের নাম আমরা এখনো ভুলতে পারিনি, যদিও তাঁদের গান আমরা শুনিনি, তাঁদের যন্ত্র-সঙ্গীত আমরা শুনিনি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তাদের নাম স্বীকৃত হয়ে আছে। আমাদের ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন তানসেন, বৈজু বাওরা, গোপাল নায়ক, মানসিংহ অমর, আরও অনেকে—স্বামী হরিদাস—তানসেনের যে গুরু। তার পরবর্তীকালে—মুসলিম আমলে সাদ্দারঙ্—যে ওস্তাদ ঘরানা স্মরণ করা হয়—ক্রমে যাঁরা এসেছেন তাঁদের নাম আমরা জানি। কিন্তু কেন? তাঁরা কি সুর-রচয়িতা হিসাবে—তাঁদের নাম, তা নয়, তাঁরা প্রকাশক। এই দ্বিতীয় কীর্তি হিসাবেই তাঁদের এই কীর্তি। এই যে—ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের এই যে মূল আদর্শ—এই আদর্শ কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতে অত্যন্ত সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কেননা, তিনি গোড়াতেই এই সুর-বিকাশের যে স্বাধীনতা freedom of interpretation, freedom of improvisation এটাকে তিনি মেনে নিয়েছেন এবং সেভাবেই তাঁর সব গান তিনি রচনা করেছেন—সেখানে যদিও তিনি Composer হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত আছেন, তা' হলেও শিল্পীদের জন্য সে স্বাধীনতা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন এবং শিল্পীরা ইচ্ছা করলে তাঁর গান নিয়ে নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী, নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী—নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী, রাগের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে, ইচ্ছামত খেলাতে পারেন। সেটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অনুপস্থিত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরকারই হচ্ছেন মুখ্য, গীতিকারই হচ্ছেন মুখ্য, শিল্পী সেখানে গৌণ, সেখানে শিল্পীর হাত-পা বাঁধা। আমাকে যদি বলতে দেন তাহলে বলি, সেটা হচ্ছে একেবারে আজ্ঞাবহ, শিল্পীর সেখানে অত্যন্ত আজ্ঞাবহের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। সেজন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জগতে খুব বড় ধরণের শিল্পী কেউ নেই। তার কারণ হচ্ছে—তাঁদের মধ্যে যে প্রতিভার তারতম্য— শক্তির যে পার্থক্য সেটা নির্মিত হয় তাঁদের কণ্ঠ-সংগীতের গুণাগুণের ধারা। কে ভাল কণ্ঠের অধিকারী, কে সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী, কে সুরেলা-কণ্ঠের অধিকারী—সেখানে কণিকা বন্দোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত

মুখোপাধ্যায়—যাঁরা প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীতকার— তাঁদের গুণাগুণ নির্ণয়ের মূল নিরিখ হচ্ছে তাঁদের কণ্ঠ-সম্পদ। এর বাইরে যদি বলেন যে, স্বাধীনতার মানদণ্ডে তাঁরা কোথায় দাঁড়ান? তা' হলে আমার উত্তর খুব নেতিবাচক। হয়তো বলা হবে যে, রবীন্দ্রনাথ চাইতেন না তাঁর গানের উপরে—তিনি বলেই দিয়েছিলেন—যখন পঙ্কজ কুমার মল্লিক তাঁর কিছু কিছু কবিতায় সুর-সংযোজন করে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন—তিনি প্রথমটায় তা অনুমোদন করেন নি। তা তিনি করতেই পারেন না, কেননা, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সংগীতের আদর্শ ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন যে, আমার গানের উপর স্বেচ্ছাচারের স্টীম-রোলার চালানো হউক, এটা আমি চাই না। তিনি অনুমোদন করেন নি। পঙ্কজ কুমার মল্লিকের এই যে প্রয়াস—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরারোপ করবার এই যে চেষ্টা, কিন্তু যখন নাকি 'দিনের শেষের ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়ায়/দুলাল মোর প্রাণ'–এই গানটির উপরে নিজস্ব সুরারোপ করে পঙ্কজ কুমার মল্লিক রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলেন—সেই গানের সুর অতি চমৎকার। আপনারা শুনেছেন—সবাই শুনেছেন আশা করি,—তখন রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়ে, বিমোহিত হয়ে তাঁকে সেই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং তাতে পরে পঙ্কজ কুমার মল্লিক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর-যোজনা করেছেন, এবং সেই গান খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে আমাদের সমাজে। নজরুল কিন্তু গোড়া থেকেই শিল্পীদের স্বাধীনতা দিয়ে বসে আছেন। তাঁর গজল দিয়েই তার সূত্রপাত পরে তিনি একে একে কাব্যগীতি লিখেছেন, জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত লিখেছেন, তারপর বিদেশী সুর-ভঙ্গীর গান লিখেছেন, রাগ প্রধান গান লিখেছেন। বহু রাগ-রাগিনী ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছেন, ভক্তি-গীতি রচনা করেছেন, কীর্তন রচনা করেছেন, শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করেছেন, বাউল-অঙ্গের গান রচনা করেছেন, ইসলামী গান রচনা করেছেন—তারপর লোক-গীতির অনুসরণে তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। বাউল গান তেমন নয়—বাউল গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের অনেক বেশী। নজরুলের বাউল গানের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু ভাটিয়ালী অনেক বেশী—সব চাইতে বেশী হচ্ছে ঝুমুর। ঐ ঝুমুর গান—যেটা হচ্ছে—মুসলিম বাংলা এবং বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে—যেখানে আদিবাসী আছে—ঐ যে সাঁওতালরা বাস করে,— মুণ্ডারা বাস করে, কোল-ভিল-রা বাস করে,—এদের যে সুর—সে সুরকে অবলম্বন করে কাজী নজরুল ইসলাম একাধিক গান—ঝুমুর গান রচনা করেছেন। এসব গান তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু সর্বপ্রথম গজল থেকে তিনি শুরু করেছেন, তার পরে অন্যান্য যত গান লিখেছেন—সব গানের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতা আছে এবং নজরুল-সঙ্গীতের বিচারে—মূল্যায়নের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সুর, গায়কের স্বাধীনতা—শিল্পীর স্বাধীনতা—এটাকে একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে—নজরুল-সঙ্গীতে। এই শিল্পীর স্বাধীনতা—যেটা ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত, এবং আমি একথা বলে

একটু অপ্রিয় হয়েছি—বিশেষ করে রাবীন্দ্রিক-মহলে— যেহেতু আমি বলেছি রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের স্বাধীনতা নেই, রবীন্দ্রনাথের গানে তিনিই সর্বেসর্বা, তিনি সমস্তকিছু আত্মসাৎ করে নিয়েছেন, সমস্ত গুরুত্ব, সমস্ত মনোযোগ তাঁর উপরেই আপতিত। কিন্তু শিল্পীদের জন্য ছিটেফোঁটা মনোযোগ বা গুরুত্ব তিনি রাখেননি। এই যে একটা দিক, সঙ্গীতের, এটা এখনও আমাদের সমাজে পৌঁছতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, এজন্য আমাকে বহু নিন্দা-মন্দ শুনতে হয়েছে, সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে-এখনও। কিন্তু আমি আমার গোঁ ছাড়িনি—বাঙালের গোঁ। আমি ত আসলে এই দেশেরই মানুষ—সেই গোঁ নিয়েই আমি শেষ-জীবন পর্যন্ত চলবো। আমি বলছি, আমার মত গৃহীত হউক বা না হউক, হয়ত আমার জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবোনা, কিন্তু আমি বলে যাবো জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত যে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সুরের স্বাধীনতাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। সেখানে কাব্যের মূল্য গৌণ, কাব্যের মূল্য বিচার করবার জন্য তার স্বক্ষেত্র আছে—কবিতার ক্ষেত্র। যখন আমরা কাব্যের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—কাব্যের বিচারের ক্ষেত্রে মিলিত হবো—তখন কাব্যের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু যখন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আলোচনা করবো, তখন কাব্য এক পাশে থাকবে—তখন সুরই হবে মুখ্য। এই যে নজরুল-সঙ্গীতের এই দুটি দিক প্রথম থেকেই আমার মনোহরণ করেছে। এবং আপনারা জানেন যে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের একটা পর্ব—কুমিল্লা শহরে—একটা সময়েতে অতিবাহিত হয়েছে, এবং তিনি যে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সে গৃহ আমার বাড়ি থেকে খুব কাছে—সেই গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করতেন। আমি বাল্যকালে—তখনও আমি ভাল করে বুঝতামনা, এর গুরুত্ব খুব ভাল করে অনুভব করতে পারিনি,—কিন্তু আমার একেবারে নিকট-প্রতিবেশী তিনি ছিলেন। আমরা শুনেছি তাঁর অনেক স্বদেশী গান, তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতেন। কুমিল্লার স্কুলে—বিভিন্ন সভা-সমিতি হত, জাতীয় নেতারা আসতেন, এবং নজরুল সেখানে অনেক জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। 'ধুমকেতু'র পর্ব তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর কারাগার থেকে তিনি বের হয়ে এসেছেন। রাজরোষের দ্বারা তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন—এ কথা আপনারা সকলেই জানেন। তারপর তিনি ছুটি ভোগের জন্য, বিশ্রাম ভোগের জন্য কুমিল্লায় গিয়েছিলেন, সে সময়েতে কুমিল্লায় যাঁরা সঙ্গীতানুরাগী মানুষ—তাঁরা তাঁকে নিয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তিনি ত সব জগতেই বিচরণ করেন। মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম, কাব্যের ক্ষেত্রেও কাজী নজরুল ইসলাম—তিনি ত একটি Legendary figure তৎকালে। তখন তাঁর বয়স আর কত? ২৩-২৪ খুব বড়জোর। সেই পর্বের কথা বলছি, সেই পর্বে তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ —সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, কিন্তু তিনি যে এত বড় মাপের মানুষ সেটা তখনো বুঝতে পারিনি। সেই কাজী নজরুল

ইসলাম—ঐ যে প্রথম যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন—করাচীর সৈনিক ব্যারাক যখন ভেঙে দেওয়া হলো—৪৯নং বাঙালী পল্টনে প্রথমে সাধারণ সৈনিক হিসাবেই তিনি প্রবেশ করেছিলেন, তারপর তিনি হাবিলদার পর্যন্ত উঠেছিলেন। তারপর যুদ্ধ থেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪৯নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো। তখন তিনি ঐ পল্টনে থাকতেই 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় এবং 'সওগাত' পত্রিকায় কবিতা পাঠাতেন—গল্প পাঠাতেন, উপন্যাস পাঠাতেন এবং সেগুলো তখনই অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ছাপা হতো এবং তাঁর কিছু কিছু কবিতা তখনই আমাদের সাংস্কৃতিক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল।+ কাজেই নজরুল ইসলাম যখন কলকাতায় এলেন ভাগ্যান্বেষণ, নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে, নতুন করে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে, তখন তিনি একেবারে অপরিচিত নন এবং তাঁর কলকাতার সাথী হিসাবে কাদের পেলেন?—তিনি পেলেন কমরেড মুজফফর আহমদ, কমরেড আবদুল হালিম, এবং আরো আরো যারা সাম্যতন্ত্রের ভাবুক, ভাবের পথের পথিক, সাম্যতন্ত্রে দীক্ষিত—এই রকম সব— গতানুগতিক পথকে যাঁরা সযত্নে বর্জন করে নতুন পথের অভিসারী—সে রকম কিছু মানুষের সঙ্গ তিনি পেলেন। এটা একটা Co-incidenceও হতে পারে। এটা যেমন একটা যোগাযোগ—যে যোগাযোগ কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকে বহুতরভাবে সমৃদ্ধ করেছ। কাব্যের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধ করেছে। কেন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে, সে-কথায় আমি আসছি। ঐ যে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্গীত জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২০ সালে। আর ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে-একদিন তিনি রেডিওতে programme করছিলেন-ঐ 'হারামণি' পর্যায়ের গানের তিনি programme করেছিলেন-যে পর্যায়ের গানে তিনি লুপ্ত-অর্ধলুপ্ত, অপ্রচলিত বাংলা গানের রাগ-রাগিনীকে ভেঙে বাংলা গান তৈরি করছিলেন এবং শিল্পীদের দিয়ে গাওয়াচ্ছিলেন, সে রকম একটি programme অনুষ্ঠানে তিনি যখন পরিবেশন করছিলেন programme তখন হঠাৎ তিনি বাকহারা হয়ে পড়েন, হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর শত চেষ্টা করেও তাঁর এই বাক্যস্ফূর্তি হয়নি, তাঁর এই বাকশক্তিকে ফিরানো যায়নি। এবং শুধু বাকহারা নয়, ধীরে ধীরে তাঁর এই চেতনাও হারিয়ে গিয়েছে—সমাহিত হয়ে গিয়েছে। এবং এই বাকহীন সম্বিৎহীন অবস্থায় ৩৫/৩৬ বছরকাল তিনি জীবিত ছিলেন, সেই বাঁচা - বাঁচা নয়-এটাকে বাঁচা বলেনা, এটা না বেঁচে থাকারই শামিল। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বাঙময়—এই হিসাবে যে, তাঁর ভাবনাধারা সমগ্র বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সবচেয়ে যে বড় মূল্যবান কাজ তিনি করেছেন সেটা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির যে আদর্শ— সেই আদর্শ—সেই আদর্শ তিনি বাকহীন অবস্থাতেও অত্যন্ত চরমভাবে সমগ্র বাংলাদেশে তাঁর রচনার মাধ্যমে ছড়িয়েছেন। এবং মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ জয়লাভ করল, তার মূলে একটা প্রধান কারণ হচ্ছে

ঐ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আদর্শ—যে সম্প্রীতির আদর্শ রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রচার করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে পূর্বসূরী করে কাজী নজরুল ইসলাম সেই ধারা অনুসরণ করেছেন। হিন্দু-মুসলমান—'আমরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম, হিন্দু মুসলমান/মুসলিম তার নয়ন-মনি হিন্দু তাহার প্রাণ'— এই যে গান—এই সম্মেলক গান—এই যে কোরাস গান—যেটা তিনি পরবর্তীকালে রচনা করেছিলেন—কিন্তু এই সুর আগাগোড়া বর্তমান নজরুলের গানের মধ্যে, কবিতার মধ্যে। তিনি—আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে, কিন্তু তার আগেও যখন—আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি—আপনারা জানেন। আসানসোল থেকে মাইল বার দূরে চুরুলিয়া নামে একটি গ্রাম—বলা যেতে পারে বর্ধিষ্ণু গ্রাম—সেখানে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই সমান এবং দুই পক্ষই প্রবল—সেই রকমই এক গ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম হয়েছিল— সম্ভ্রান্ত পরিবারে—কিন্তু তৎকালে—যে সময় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন—সেই সময় কাজী নজরুল ইসলামের পরিবার অত্যন্ত দারিদ্র্য দশায় পড়েছিল। নিতান্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁর বাল্য-কৈশোর পর্বে। বাল্য-কৈশোর তাঁর চরম দুঃখ-যন্ত্রণা, এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে বিজড়িত যত রকমের অভিজ্ঞতা, মান অভিমান, লাঞ্ছনা, বেদনা, ক্লেদ অবদমন—সব কিছুকে তিনি পরখ করেছেন নিজের জীবন দিয়ে। আমার সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে একাধিকবার, চুরুলিয়া গ্রামে যেখানে তাঁর জন্ম হয়েছে —তা দেখে আসার আমার সুযোগ হয়েছে: কেননা, তাঁর ভাইপো-রা যারা জীবিত, তাদের সাথে আমার আন্তরিক যোগ আছে, সাংস্কৃতিক সূত্রেও যোগ আছে। আমাকে সেই সূত্রে একাধিকবার—ঐ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে ১১ই জ্যৈষ্ঠ কিংবা তার কিছু আগে থেকে ৭দিন ব্যাপী সেখানে অনুষ্ঠান হয় এবং প্রমীলা মঞ্চে, এবং প্রমীলা সমাধি—প্রমীলা ইসলামের যে সমাধি—সেখানে যাওয়া-আসা আছে। সেটাও একটা তীর্থস্থানে পরিণত রীতিমত।

আমরা কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম জীবনের যে তথ্য পাই তাতে দেখা যায় যে দারিদ্র্যের জ্বালায় মাঝপথে তাঁর শিক্ষার অবসান ঘটে, অর্ধপথে তাঁর শিক্ষার শেষ ঘটে গিয়েছিল। বেশী দূর এগুতে পারেননি, যদিও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ক্লাস সিক্স-সেভেন পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন—ঐখানে চুরুলিয়ার স্কুলে। কিন্তু লেখাপড়া শেখবার জন্য যতদিন স্কুলে ছিলেন ততদিন খরচ চালাবার জন্য —শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি লেটোর গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। এই লেটোর গান তিনি অনেক লিখেছেন এবং তা দিয়ে তাঁর যে উপার্জন হতো সেটা দিয়ে তাঁর স্কুলের পড়াশুনার খরচ চালাতেন। লেটো হচ্ছে এক ধরনের কবি-গান। অকুস্থলেই গান রচনা করতে হয়, অকুস্থলেই সুর-যোজনা করতে হয় এবং গেয়ে শোনাতে হয়। এই হচ্ছে প্রথম জীবনে নজরুল ইসলামের জীবনের ছক। তারপরে তো আপনারা জনেন। আজ সঙ্গীতের

আলোচনার জন্য আমি এখানে আহুত হয়েছি। কিন্তু তাঁকে বোঝাবার জন্য এগুলির আলোচনার দরকার আছে। তাঁর ১২ বৎসর বয়সে—শোনা যায়, তিনি তাঁর মা'র সঙ্গে অভিমান করে চলে যান গ্রাম ছেড়ে। প্রথমে তিনি যান আসানসোল শহরে—সেখানে একটি রুটির দোকানে বয়ের কাজ করেন—ফাই-ফরমাস খাটার কাজ। বালক-শ্রমিক—আমাদের সমাজে একটা প্রধান সমস্যা। কিন্তু ছেলেটি প্রতিভাবান। সেখানে তাঁর প্রতিভার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তারপরে এক দারোগা তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে তাঁর ময়মনসিংহের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন।* ✮ ✮ ✮ কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের যে চরিত্র—তাঁর যে স্বভাব, সে হচ্ছে চির অশান্ত— 'আমি সেইদিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবেনা'—সেই অশান্তচিত্ত এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে পারে না। তিনি চলে এলেন, এসে ভর্তি হলেন শিয়ারসোল রাজ-স্কুলে — সেখানে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—কথা সাহিত্যিক—(পরবর্তীকালে শৈলজানন্দ খুব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন), তাঁর সাথে নজরুলের খুব সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল নজরুল তখন লিখতেন গল্প, আর শৈলজানন্দ লিখতেন কবিতা। পরবর্তীকালে ভূমিকার সম্পূর্ণ উলটপালট হয়ে গিয়েছিল। শৈলজানন্দ কথাসাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম কবি, সুরকার, গীতিকার হিসাবে। তারপরে যুদ্ধের ডাক এলো। —যুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি নাম লেখালেন। তার মূলেও রয়েছে সেই অশান্ততা। আর বাঙালীরা ভীরু-কাপুরুষ-এরূপ একটা অপবাদ আছে। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কারণেই এই অপবাদ চাপিয়ে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। সেই অপবাদকে ঢাকবার জন্য—মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নজরুল ইসলাম ও তাঁর সমভাবাপন্ন কিছু মানুষ—ছাত্র যুবক—যুদ্ধের ক্ষেত্রে নাম লেখালেন। তারপর ফিরে এসে যখন এদের সঙ্গে সান্নিধ্য করছিলেন—কমরেড মুজফফর আহমদ, কমরেড আবদুল হালিম—সে সময় তিনি প্রথম সঙ্গীত-জীবন শুরু করেন। গজল গান, সেই গজল পারসিক গজল। আপনারা জানেন যে, গজল হচ্ছে প্রেম-সঙ্গীত, তার অস্থায়ী—মুখপাত যেটা—সেটা ছন্দেবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তীবার যখন অন্তরা আসে—যাকে 'শের' বলে; 'শেয়র' বা 'শের' অংশে-ঠিক উচ্চারণ আমি বলতে পারবনা, এখানে যারা এ-বিষয়ে ভাষা-অভিজ্ঞ—তারা বলতে পারবেন, 'শের' অংশে এসে তাল ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন সেটা অনেকটা আবৃত্তির ভঙ্গীতে আবৃত্ত করা হয়। আবার যখন মুখপাতে ফিরে আসে, তখন আবার তাদের—লয়ের পর্ব শুরু হয় এবং সেটা একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আপনারা তো গজল গান সবাই শুনেছেন — পারসিক গজলকে অনুসরণ করে নজরুল একাধিক গজল রচনা করেছেন প্রথম জীবনে-'ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনাখানি রহিল আঁকা', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিসনে

আজি দোল', 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে', 'কেন আন এ ফুল-ডোর বিদায় বেলায়'—এই সমস্ত গান—'পথ চলিতে যদি কভু দেখা হয় পরাণ প্রিয়া', 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর–নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ'—এই সমস্ত গজল গান দিয়ে তিনি তাঁর জীবনের সূত্রপাত করলেন—সঙ্গীত-জীবনের সূত্রপাত করলেন এবং তারি পরিবেশনায়—পরিবেশ অনুকূল হলে অনেক কিছু হয়, সে-সময় দীলিপকুমার রায়—তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র—তিনি বিলাত থেকে সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করেছেন, তিনি নজরুলের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সাথে গভীর সৌহার্দ্য হয়। দীলিপকুমার একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, নজরুলও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন তবে তাঁর কণ্ঠ এত সুমিষ্ট ছিলনা, দীলিপ কুমার তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে এই গানগুলিকে—গজল গানগুলিকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেন। এবং সেই সময়ে এই গজল গানের এত জনপ্রিয়তা হয়েছিল যে, সাধারণ শ্রমজীবী—যে বিড়ি শ্রমিক, বলা যেতে পারে সাধারণ কারখানার শ্রমিক মজুর—একেবারে সাধারণ মানুষ—বালিগঞ্জের ড্রয়িং রুমে, আভিজাত্যগর্বী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও, সকল স্তরে সমান আদরে গৃহীত হয়েছিল। এটা তথ্য, ঘটনা। সমাজে, নজরুল ইসলামের গজল গানের জনপ্রিয়তার মূলে—অনেকেই বলবেন যে, কথার সৌন্দর্য। কিন্তু ঠিক তা নয়, এটা সুরের মাতোয়ারা। প্রত্যেকটি গান আপনারা যদি বিশ্লেষণ করেন ঐ সুরের মানদণ্ডে, তবে দেখবেন, যেমন 'কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলায়'—এই গানটি হচ্ছে ভীমপলশ্রী রাগিণীর ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং এটি গেয়েছেন— রেকর্ডে শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী। কিংবা 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ—অথবা 'কে নাচে নটবর ঝম ঝম ঝম ঝম'– এই যে গান, বাণীর দিক থেকেও কোনো তুলনা নাই, কিন্তু আমি বলছি—আমার যে আরম্ভ-বিন্দু—যে বাণীর আলোচনা করবো না, আজকে সুরের আলোচনা, এটি ভৈরবী সুরে—রাগ ভৈরবী সুরের কাঠামোয় বিধৃত একটি গান, এটিও গেয়েছেন শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী। শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবী, শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া-এই তিনজন মুখ্য শিল্পী—এদের মধ্যে কেউ এখন আর বেঁচে নেই। সবাই বিগত হয়েছেন—সব শেষে গিয়েছেন শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী—প্রথমে গিয়েছেন আঙ্গুরবালা —না, প্রথমে গিয়েছেন কমলা ঝরিয়া, তারপর আঙ্গুরবালা,তারপর ইন্দুবালা। তিনি নজরুল -পুরস্কার পেয়েছিলেন, চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর কাছ থেকে। অসামান্য সঙ্গীত-শিল্পী এঁরা। এখন কথা হলো এঁরা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন কেন? এঁদের সঙ্গীতের মূল কথা কি? আধুনিক গাইয়েরা তাঁদের ধারে-কাছেও কেউ যেতে পারেন না, কারণ তাঁদের অনুশীলন ছিল রাগ-সঙ্গীতে, তাঁরা মূলতঃ রাগ-সঙ্গীতকে অবলম্বন করে তাঁদের সংগীত জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন। সেই জন্য তাঁদের পক্ষে নজরুলের সুরের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়েছে। নজরুল যা' চেয়েছেন--তাঁর সেই অভিপ্রায় এঁরা তাঁদের গান গাওয়ার মধ্য

দিয়ে সার্থক করেছেন। যেহেতু তাঁদের রাগ-সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল, রাগ-সঙ্গীতের চর্চা ছিল এবং নজরুলের সেই অভিপ্রায়কে তাঁরা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁরা পেরেছেন, তার কারণ হলো, তাঁদের রাগ-সঙ্গীতের চর্চা ছিল। এবং আমার নিবেদন হচ্ছে, ভারতবর্ষীয় গানে রাগ-সঙ্গীতের চর্চা ছাড়া কোন গান গান নয়। এগুলো হচ্ছে প্রান্তীয় সঙ্গীত। কিন্তু মূলে যদি রাগ-সঙ্গীতের ভিত্তিভূমি দুর্বল হয় তা'হলে গান বেশিদিন টিকে না। সামান্য সুড়সুড়ি দেয় কিছুকালের জন্য, কিছু সময়ের জন্য, সামান্য সময়ের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু তারপরে হারিয়ে যায়। সুতরাং মূলেই হচ্ছে রাগ-সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীত, আমরা আমাদের স্বজাতিক অভিমানে হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতকে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি না কেন, আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের এটিই হচ্ছে মৌলিক বুনিয়াদ। এই রাগ, রাগ-সঙ্গীত, রাগ-রাগিনী—এই রাগের ভিত্তির উপরে প্রত্যেকটি গজল গান–খুব চটুল সুরের হাল্কা গান, কিন্তু তা'হলেও এগুলো যেহেতু রাগ-বিধৃত গান, রাগের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে এর কাঠামো—এর যে ইমারতটা দাঁড়িয়ে আছে বুনিয়াদের উপরে—রাগের বুনিয়াদের উপরে— সেজন্য এই গানের সুরের আবর্তন অপ্রতিরোধ্য। এই গজল-গান এককালে সম্পূর্ণ আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করেছিল বাংলাদেশে—আমরা জানি ঐ আমাদের বাল্যকালে—কৈশোরের অভিজ্ঞতা, ছাত্র বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, গজল গান সেই কালে কি রকম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালে এসে এই গজল থেকে তিনিও (নজরুল) অনেকটা সরে এসেছিলেন। নজরুল জীবনের একটা বড় দিক, নজরুল কখনও কোন একটা সিদ্ধি অর্জন করলে পরে সেখানে থেমে থাকেননি, সেটা অর্জিত হয়ে গেলে, সেটা সিদ্ধ হয়ে গেলে—তার প্রতি দৃকপাত করেননি, পিছনে ফেলে রেখে, জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় তাকে ত্যাগ করে, নতুনের অভিসারী হয়েছেন। তার প্রতি আর কোন মায়া-মমতা নেই এবং ঐ ২২ বছরের যে সময়-কাল—আমি বললাম ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল, তার পরিধিটা কত? এই ২২ বছরের মধ্যে তিনি যে গান লিখেছেন তা—কেউ বলে তিন হাজার, কেউ বলে সোয়া তিন হাজার, কেউ বলে সাড়ে তিন হাজার গান লিখেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার—ভারতবর্ষে তো সর্বোচ্চ রেকর্ড—এই হিসাবে তো কোন সন্দেহ নেই। এটাকে বিশ্ব রেকর্ডও বলা যেতে পারে। যাঁরা সঙ্গীতামোদী—যাঁরা বিশ্বের সঙ্গীত-জগতের খবরাখবর রাখেন, তাদের জানা মতে এটা হচ্ছে—বিশ্বের সর্বোচ্চ রেকর্ড। মাত্র ২২ বছরের সময়-সীমার ভিতরে তিনি তিন হাজার—সোয়া তিন হাজার—সাড়ে তিনি হাজার গান রচনা করেছেন—সংখ্যাটা কিন্তু অগণিত। এটা নিয়ে এখনো জল্পনা-কল্পনা চলছে—কেন না, কোন সুনিশ্চিত—কোনো প্রামাণিক সংখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি, সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যায়নি। তার কারণ হলো —নজরুলই অংশতঃ তার জন্য দায়ী, কারণ নজরুলের মধ্যে কোন গার্হস্থ্যপনা ছিল

না — নজরুলের নিজের সৃষ্টির প্রতি এতটুকুও মমতা ছিল না। পশু-মাতারা যেমন সন্তান জন্ম দিয়ে তার দিকে ফিরে তাকায় না, কাজী নজরুল ইসলামও যে-মুহূর্তে গানটি রচিত হয়ে গেল, আর কিছু-কিছু অনুরাগী-অনুগামী ভক্তকে যারা তাঁর চারপাশ ঘিরে ছিল, তাদের তিনি সেই গানটি শিখিয়ে দিলেন, তখন তিনি সেটা ভুলেই গেলেন—এইভাবে কত গান যে হারিয়ে গেছে; কত গান যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে তার লেখাজোখা নেই, তার সীমা-সংখ্যা নেই। এজন্যই নজরুলকে নিয়ে এই সমস্যা যে কত গান তিনি লিখেছেন, সে কথাও কেউ জোর করে বলতে পারে না, আমরাও ত অনুমান করে বলি যে তিন হাজার গান লিখেছেন। 'হরফ প্রকাশনী' তাঁরা যে গানের সংকলন করেছেন, 'নজরুল সমগ্র'* তাতে ১৯০০ গান–তাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা বলেছেন যে, আরও গান অনেকের কাছে ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে, আমরা সেটি সংগ্রহ করতে পারিনি, সেটা তারা Part করতে চান না। যে-কোন কারণেই হোক, কি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই হোক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, তারা সেই সমস্ত গান—তার স্বত্ব ছেড়ে দেন নি। তারা ঐ গানের উপরে They are sitting tight- তাদেরকেও ঐ গান থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তারা প্রাণ গেলেও নজরুলের গানের স্বত্ব ছাড়বে না। সেই জন্য পশ্চিম বঙ্গের সরকারের তরফ থেকে একটা আন্দোলনের চেষ্টাও হয়েছিল। সে-কমিটিতে আমিও ছিলাম। কিন্তু আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই সমস্ত প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানকে রাজী করাতে পারিনি। তারা সেই স্বত্ব দিতে রাজি নয়। ফলে নজরুল কত সংখ্যক গান লিখেছেন, ঐ 'হরফ প্রকাশনী'র যে আব্দুল আজীজ আল-আমান, তিনি বলেছেন যে আমি চেষ্টা করে প্রায় দু'হাজারের মত গান সংগ্রহ করেছি, এর বেশি গান আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। আমরা শুনেছি, এখানে সংগৃহীত হয়েছে, এটা খুব বড় গৌরবের কথা, তৃপ্তির কথা। আমরা এটা—তার যে এই গৌরব ও কৃতিত্ব—সেটা অবশ্য এই বাংলাদেশের—যারা নজরুল-সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করছেন, তাদের প্রাপ্য। কিন্তু পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি হচ্ছে এই। তারপর আরও আরও অনেকেই চেষ্টা করেছেন নজরুলের গানের তথ্য সংগ্রহ করার। বুদ্ধদেব বসু যখন জীবিত ছিলেন, তিনি একটা চেষ্টা করেছিলেন, তিনি ছয়-সাত শ'র বেশি গান সংগ্রহ করতে পারেননি। তারপর আরও আরও কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন। 'নজরুল-গীতি অন্বেষা' নামে সম্প্রতি একটি বই বেরিয়েছে—আমারই বন্ধু কল্পতরু সেনগুপ্ত—তিনি এই গানের–বইটি সম্পাদনা করেছেন—তিনিও প্রায় দু'হাজার—সোয়া দুই হাজার গান একত্রিত করতে পেরেছেন—তার বেশি পারেননি–অর্থাৎ নজরুলের গান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেসব অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, এবং উদ্যোগী গবেষক যারা—তারা সেসব অনুসন্ধান করবেন, যদি পারেন তা'হলে উদ্ধার করবেন, আর তা না হলে হয়তো তাদের ভাগ্যে চিরতরে বিস্মরণই লেখা আছে। এই হচ্ছে নজরুল-সঙ্গীতের সংরক্ষণের

দিকের কথা।

একথা কেন উঠল যে, নজরুল নিজের গান সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। নিজের গানের মূল্য কতটা তিনি বুঝেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে, আমার কবিতা যদি হারিয়েও যায় কিন্তু আমার গানের জন্য আমি বেঁচে থাকবো—শেষ পর্যন্ত আমার গানের জন্যই আমি—চিরস্থায়ী—আমি মানুষের মনে একটা স্থায়ী আসন লাভ করবো—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল—তা না হলে এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতোনা। আর একটি প্রবাদ আছে—জনপ্রসিদ্ধি বা লোকশ্রুতি—কিংবদন্তী যে নজরুল অশিক্ষিত পটুত্বের ফলে এ-সমস্ত গান লিখেছেন— অশিক্ষিত পটুত্বের দ্বারা চালিত হয়ে—একথা সর্বৈব ভ্রান্ত, মিথ্যা। কেননা, নজরুল খুব প্রণালীবদ্ধভাবে—রাগ-সঙ্গীতের চর্চা করেছেন। একাধিক ওস্তাদের কাছে তিনি রাগ-চর্চা করেছেন—সেই প্রথম-জীবনে মঞ্জু সাহেব, পিয়ারা সাহেব—এঁরা সব গজল-গাইয়ে ছিলেন। সেই মঞ্জু সাহেব, পিয়ারা সাহেব এঁদের কাছে তিনি গজল, ঠুংরী, টপ্পা, কাজরী, পলি—এই যে হাল্কা Light classical Music এর যে গান-এই গানগুলির ট্রেনিং অনুশীলন বা চর্চা তিনি করেছেন ওঁদের কাছে। তারপর জমীরউদ্দীন খাঁ বলে তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ ঠুংরী গায়ক ছিলেন-আমরাই তাঁর গান শুনেছি, এই জমীরউদ্দীন খাঁর কাছে দীর্ঘকাল তিনি প্রণালীবদ্ধভাবে ঠুংরী গান শিক্ষা করেছিলেন। এবং জীবনের প্রান্তভাগে-একটা সময়ে তিনি নিজে সেতারের চর্চা করেছেন। তারপর যখন তিনি শ্রীরামপুরে-চুঁচুড়াতে থাকতেন-ঐ জেলবাসের পরে দীর্ঘকাল তিনি চুঁচুড়ায় ছিলেন—যাঁর জন্যে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়—আমাদের বন্ধু—আমাদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তিনি নজরুলের নিতান্ত অনুরাগী, সুহৃদ সহচর বলা যেতে পারে, তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য হয়েছিল—আপনারা জানেন। এই চুঁচুড়ায় থাকাকালে তিনি নিজে বাঁশী বাজাতেন—সেতার বাজাতেন। তারপর জমীরউদ্দীন খাঁর কাছে তো ঠুংরী গান অনেকদিন শিখেছেন—জীবনের শেষ-পর্বে এসে তিনি মুর্শিদাবাদে ওস্তাদ কাদের বক্স বলে একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ—তিনি খুব বড় গাইয়ে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সঞ্চয়ে বহু অমূল্য—সেই রাগ-রাগিণী—যে-সব রাগ-রাগিণী আজকাল প্রচলিত নয়—সেইসব রাগ-রাগিণী তাঁর ঝুলিতে ছিল, তাঁর সঞ্চয়ের ঝুলিতে এইগুলি ছিল। তিনি প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যেতেন এবং সেখানে থেকে ঐ ওস্তাদ কাদের বক্সের কাছে সে-সমস্ত অপ্রচলিত, লুপ্ত, অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণীর তালিম নিয়ে আসতেন। এবং নজরুল 'গীতি-অন্বেষা' বইয়ের ভূমিকাতে—আপনারা দেখবেন—গোড়ার দিকে নজরুলের নিজের হাতে লেখা—কোন রাগের কি বৈশিষ্ট্য—নিজের হাতে লিখেছেন—কোন রাগের কি রস—সেটা লিখেছেন, এবং সেই যে রচনা,—অপ্রকাশিত রচনা, প্রথম প্রকাশিত হয়েছে এই বইতে। আমি জানিনা এখানে এঁরা—'নজরুল ইন্সটিটিউট' এর সঙ্গে

যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁরা এই রচনাটির সন্ধান পেয়েছেন কিনা। এই রচনাটিতে তিনি লিখেছেন যে গান সব সময়েতে রাগ-ভিত্তিক এবং রাগের অনুশীলন ছাড়া প্রকৃত সঙ্গীত হয় না। প্রকৃত সঙ্গীত—জনমনহারী সঙ্গীত হতে গেলেই সেই গানকে রাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই কথা কাজী নজরুল ইসলামের নিজের কথা—এ আমার কথা নয়। আমি সেটা আরোপ করি। সেই কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা বা রটনা বা কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি-যে তিনি ঐ আকাশে-বাতাসে সুর ভাসতো—আর যেহেতু প্রতিভাবান মানুষ সেই জন্যেই—প্রতিভা দিয়ে সবকিছু হয় না, প্রতিভার সঙ্গে অনুশীলন চাই, সাধনা চাই—সব কিছুতেই-খানিকটা দূর চলা যায় প্রতিভার জোরে—কিন্তু প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলন-সাধনা-প্রণালীবদ্ধ যে চর্চা বা অনুশীলন—না হলে খুব বেশী দূর এগুনো যায় না। নজরুল যে আজকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছেন-এত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছেন—তার মূলেও আছে তাঁর এই অনুশীলন—সাধনা। একথাটা তেমনভাবে সমাজে প্রচারিত হয়নি। তা সেই নজরুল গজল থেকে এলেন কাব্যগীতিতে। কত গান লিখেছেন—কাব্য গীতির তো কোন তুলনা নেই— নিজে দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন—সে গান আপনারা বোধ হয় অনেকেই শুনেছেন-'দিতে এলে ফুল হে প্রিয় আজি এ-সমাধিতে মোর'-এ গানটি হচ্ছে—এটি হালকা রাগিণীতে নয় যদিও এটি প্রায় গজলের সমধর্মী রচনা—কাব্যগীতি—কিন্তু গজলের সমধর্মী, এটি হচ্ছে যোগিয়া রাগিণী—ভোরের যে রাগিণী যোগিয়া—সেই যোগিয়াতে বিধৃত একটি রাগ—'দিতে এলে ফুল হে প্রিয় আজি এ সমাধিতে মোর'—এরই অপর পিঠে আছে 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়/গলিয়া সুরের তুষার গীতি নির্ঝর বয়ে যায়/ উদাসী-বিবাগী মন /যাচে আজি বাহুর বাঁধন/কত জনমের কাঁদন ও পায়ে লুটাতে চায়/পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়।'— এ গান একটি অনবদ্য গান—অসামান্য গান—সুরের দিক থেকে বলছি,—কথাটা তো শুনলেন খানিকটা—কথাও অনবদ্য, কিন্তু আমি কথার অনবদ্যতার দিকে একেবারেই যাচ্ছিনা—আমি বলছি সুরের দিক থেকে এটি হচ্ছে লাউরী শ্রেণীর গান। ওই বিহার, উত্তর প্রদেশ—এই সমস্ত অঞ্চলে ঐ দেহাতী সুরের—একটি সুরের নাম হচ্ছে লাউরী। এই লাউরী সুরে তিনি এই গানটি বেঁধেছেন—অনেকটা ভীমপলশ্রী বা পিলু বাঁরোয়া—এর সঙ্গে বিহারী—পাহাড়ী—এসব সুরের সঙ্গে এই রাগিণীটি—এই সুরটির মিল আছে। এই সুরে পরে আরও অনেক গান লিখেছেন আর তারপরে—তিনি তো এই দুইটি গান নিজে রেকর্ডে গেয়েছেন। হয়তো আপনারা সংগ্রহ করে থাকবেন—যাঁরা নজরুল-গবেষক, এই গান দুটি—তাঁর নিজের কণ্ঠে গাওয়া , আর সেই সময়েতে ঐ আঙ্গুরবালা,

ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া—কমলা ঝরিয়া সেই সময়েতে—'প্রিয়া যেন প্রেম ভোলো না? এই মিনতি করি পদে তুমি প্রিয় তুমি যেন প্রেম ভোলোনা' তোমাকে এই মিনতি করছি। এটাও ঐ লৌকিক সুর—লৌকিক সুরে কাব্যগীতি–সঙ্গে যে আরেকটি গান প্রথমেই শোনালাম আপনাদের–'মোর ঘুম ঘোরে'—এটাকে কাব্যগীতিও বলা যায়, গজল গানও বলা যায়। এই ধরনের গান তিনি কত যে লিখেছেন তার সীমা সংখ্যা নেই। কিংবা 'প্রিয় যেন প্রেম ভোলো না এই মিনতি করি পদে'—তার পরের পিঠে আছে—কমলা ঝরিয়ার—একটু বিস্মরণ হয়েছে—দেখে নিচ্ছি। —'প্রিয় যেন প্রেম ভোলো না এ মিনতি করি পায়'–এটা কানাড়া-মিশ্র, হ্যাঁ, এখানে নেই—আচ্ছা 'কেমনে আঁখি বারি রাখি চাপিয়া'— এটা একটা বিখ্যাত গান—এটাও রাগের উপর ভিত্তি করেই রচিত—এটা রাগেশ্রী রাগ—বাগেশ্রী নয়, রাগেশ্রী। বাগেশ্রীতে কোমল গান্ধার লাগে, কিন্তু রাগেশ্রীতে কোমল গান্ধার এবং শুদ্ধ গান্ধার—দুটিই লাগে। এই রাগেশ্রী রাগ—একটি অসামান্য সুন্দর ছোট্ট রাগ—ছোট্ট রাগ—কিন্তু জনমনহারিণী। এই রাগটিতে তিনি অনেক গান লিখেছেন, শুধু এই গানটিই নয়। আরও অনেক গান লিখেছেন। 'প্রিয় যেন প্রেম ভোলোনা', 'কেমনে রাখি আঁখি বারি চাপিয়া'—রাগেশ্রী। 'আমার না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা'—দেশী টোরী। দেশী টোরী রাগ—এটা খুব উচ্চাঙ্গের রাগ। এটা সকালের একটি রাগ—টোরী থেকে বেরিয়েছে—অনেকটা জৌনপুরী ও আশাবরীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য। রসের সাদৃশ্যটা হচ্ছে জৌনপুরী ও আশাবরীর সঙ্গে। কিন্তু টোরী শ্রেণীর রাগ। এতে অনেক গান আছে—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় গান গেয়েছেন—আরও অনেকে বাংলা গান গেয়েছেন। দেশী টোরীতে তিনি এই গান রচনা করেছেন।

'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান/আসিবে আজি বন্ধু মোর'—বেহাগ। বেহাগ রাগ প্রচলিত—খুব ব্যাপকভাবেই প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গানেই বেহাগ সুর ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগগুলির মধ্যে বেহাগ একটি। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগগুলির মধ্যে আরেকটি হচ্ছে মল্লার, আরেকটি হচ্ছে শাহানা—বিভাস এবং কাজী নজরুল ইসলামও এই রাগগুলিকে খুব সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে। 'অবিরত বাদল বরষে কি ঝর ঝর'—মিয়া কি মল্লার—বর্ষার গান মিয়া কি মল্লার! মল্লার, এবং মিয়া কি মল্লার, মেঘ মল্লার ইত্যাদি হচ্ছে বর্ষার গান এই সমস্ত রাগকে তিনি ব্যবহার করেছেন এই বর্ষার গানে—অন্যান্য ভাবের গানে—কাব্যগীতিতে তিনি এসব রাগ ব্যবহার করেছেন। তারপর এই কাব্যগীতির অধ্যায় —এই যে আমি বললাম—জীবনের প্রথম ঐ যে ২০ বছর কি ২২ বছর কাল—পরিধি—আমি বল্লাম—

তাতে সব সময়েতেই এই কাব্যগীতি তিনি রচনা করেছেন—এটা একটা অব্যাহত ধারা।*

+ এই বক্তব্যে তথ্যগত দিক থেকে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে। করাচী থেকে পাঠানো নজরুলের গল্প প্রথম মুদ্রিত হয় 'সওগাত' পত্রিকায় ('বাউণ্ডেলের আত্ম কাহিনী') ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এবং কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকায়' ('মুক্তি') ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। 'মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় নজরুলের রচনা প্রকাশিত হয় বহুকাল পরে।–স, ন, ই, প,

* ময়মনসিংহের কাজীব সিমলা গ্রামের কাজী রফিজউল্লাহ্ দারোগা। রফিজউল্লাহ্ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মরহুম কাজী তালেবুর রহমানের (নজরুল তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন) এক স্মৃতিচারণমূলক রচনা থেকে জানা যায় যে, আসানসোলে রুটির দোকানে কাজ করার আগেই নজরুল সেখানকার এক স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এবং তাঁর সহপাঠী ছিলেন রফিজউল্লাহ দাবোগার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আবুল হোসেন, আব সেই সূত্রে দারোগাব পরিবারের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

* আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থটির নাম ঃ 'নজরুল-গীতি–অখণ্ড' –স.ন. ই. প.

নজরুল-সঙ্গীত প্রসঙ্গে

লায়লা আর্জুমান্দ বানু

আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে ৬/৭ যুগ আগে বালক নজরুল ইসলামের পদধূলি পড়েছিল। ত্রিশালের মাটি প্রতি বছর তাঁর প্রতি নতমুখে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনন্য সাধারণ সৃজনী-প্রতিভার অবদানে বাংলা সাহিত্য, সংগীত এবং সমাজ ও সংস্কৃতি নানাভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। যুগ-স্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম গীতিকার ও সুরকার হিসাবেও তাঁর অতুলনীয় সৃজনীক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি শুধু কয়েক হাজার গানের স্রষ্টাই নন, তাঁর হাতেই সৃজিত হয়েছে কয়েকটি নতুন রাগ। বিষয়-বৈচিত্র্য, সুরের নানা ধরনের সূক্ষ্ম কারুকাজ ও মহনীয়তায় এবং অসাধারণ কল্পনা-প্রতিভা ও সৃজন-শীলতার স্পর্শে নজরুল-সঙ্গীত অনুপম ও আকর্ষণীয়।

নজরুলের কবিতা ও গান আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনে যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব এবং আবেগের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা অতুলনীয় অসাধারণ ঘটনা। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের বাংলা সাহিত্যে এবং সংগীতে যে অবদান তিনি রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়। আজকে কবির জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে আমরা ত্রিশালে সম্মিলিত হয়েছি।

বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ কবি, গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলামের গানের বাণী ও সুরের বৈচিত্র্যে এবং স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জল হয়ে আছে। সঙ্গীত এই মহান কবি ও সুরকারের প্রতিভার স্পর্শে শুধু বৈচিত্র্যময় এবং আকর্ষণীয়ই হয়নি, ব্যাপক জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে নজরুল-সংগীত গীত এবং সমাদৃত হয়ে আসছে। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, আংগিক ও রূপরীতির বৈচিত্র্যময়তায় এবং সুরের নানারূপ কারুকাজে নজরুল-সঙ্গীত আজও অতুলনীয় ও আকর্ষণীয়।

নজরুল-সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন থেকে যে সমস্যাটি বড় হয়ে উঠছে, তা হলো কবির গানের বাণী ও সুরের বিকৃতি-সংক্রান্ত। নজরুলের সুস্থ অবস্থায় তাঁর নিজের দেওয়া সুরে এবং অন্য সুরকারদের দেওয়া এবং কবির অনুমোদিত সুরে যেসব গান রেকর্ড হয়েছিল, খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পীদের গীত যেসব গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, গত কয়েক দশকে সে সব গানের বাণী ও সুর বিকৃত হয়েছে, এবং

এখনও হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকেই অভিযোগ রয়েছে। আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে গৃহীত এবং প্রখ্যাত শিল্পীদের গীত গানের বাণী ও সুর অনুসরণ না করার ফলেই নজরুল-সঙ্গীতের নানারূপ বিকৃতি ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন।

নজরুল-সঙ্গীতের বাণী ও সুরের বিকৃতি রোধ করতে হলে, কবি ও সুরকার নজরুলের দেওয়া এবং তাঁর দ্বারা অনুমোদিত ও আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধৃত বাণী এবং সুর অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। একালের ও ভবিষ্যতের শিল্পীরা যদি বাণী ও সুরের দিক থেকে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড অনুসরণ করেন, এবং সে-অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সঙ্গীত-পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করেন, তবেই নজরুল-সঙ্গীতে বাণী ও সুরের বিকৃতিরোধের পথ প্রশস্ত হবে।

গানের বাণী ও সুর সংগ্রহের জন্য পশ্চিম বংগ ও বাংলাদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আমরা আমাদের দেশে নজরুল -সংগীতের বাণী ও সুর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এ সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশে আমরা নজরুল-সংগীত স্বরলিপি প্রমাণীকরন পরিষদ কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের এ কাজকে সম্পূর্ণ সফল করার জন্য পশ্চিম বংগের স্বরলিপি-প্রণেতা ও সাহিত্যিকদের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা জয়ন্তী উৎসবকে সফল করে তোলার জন্য, নজরুলের সাহিত্য-সংগীতকে অমর করে তোলার চেষ্টা করব। যে গান একদিন, যে আবৃত্তি একদিন পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে কবি আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন এ আশা রেখে সকলকে সম্মান জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি।[১]

১ সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এবং ত্রিশালের দরিরামপুরের জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নজরুল-জয়ন্তী অনুষ্ঠান 'নজরুল-সঙ্গীতের বাণী ও সুর-বৈচিত্র্য' শীর্ষক আলোচনা-অধিবেশনে প্রদত্ত সভানেত্রীর ভাষণের অনুলিখন:–স. ন-ই-প.

নজরুলের সঙ্গীত-প্রতিভা

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

আমি যখন একসঙ্গে বি. এল এবং এম. এ পড়ার এবং পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সে সময়ে পরিচিত এবং ঘনিষ্ট কিছু সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতপ্রেমিক আমাকে জানালেন যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাকে খুব খুঁজছেন। এঁদের মধ্যে মাননীয় হেম সোম মহাশয়ও ছিলেন। কিন্তু কেন? সে কথাটি সঠিক অনুধাবন করতে পারিনি। আমি সামান্য ছাত্র বৈ তো নয়। তবে হ্যাঁ গান–বাজনায় আমার কিছু সুনাম আছে।

কিছু দিন পরে, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে রাত্রি ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত পদাবলী কীর্তন গাওয়ার পরেই অতি ব্যস্ত হয়ে লাল দীঘিতে শ্যাম বাজারের ট্রাম ধরবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে বেতারের পুরাতন পিওন গতি আমাকে এসে বল্লে 'আপনার একটি জরুরী ফোন এসেছে।' আমি জানালাম এখন ছুটে গিয়ে শেষ ট্রামটি ধরতে হবে, অতএব ফোনে কথা বলতে পারবো না। গতি বল্লে, আপনাকে যেতেই হবে, লাইনে কাজী সাহেব অপেক্ষা করছেন। এর পরে যেতেই হল এবং অনুনয় বিনয় করে ওঁকে বলতেই হল, এই শেষ ট্রামটি ধরতে না পারলে নির্জন লাল দীঘিতে আমি বাড়ি ফেরার কোন যানবাহন যোগাড় করতে পারব না।

উনি রাজি হয়ে গেলেন এবং ক'দিন পরেই দুপুরে খাওয়ার জন্যে বসেছি, এমন সময়ে একটি চাকর এসে জানালো–কাকাবাবু! একজন আপনাকে ডাকছেন। আমি জানতে চাইলাম কে তিনি? সে বল্লে, ওকে আগে কখনও দেখিনি। বড় বড় ঝাকড়া চুল, বড় চোখ, ছবিতে কেষ্ট ঠাকুর যে রকম দেখতে ঠিক সেই রকম।

আমি কোন রকমে দু'চার মুঠো গরম গরম ভাত মুখে দিয়ে কাজী সাহেবের কাছে গেলাম। উনি আমাকে বল্লেন, ভাই! আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমার কিছু গান আছে, যেগুলি একমাত্র আপনি সঠিক রূপদান করতে পারেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক ক'রে নিয়েছি। তিনি আমার প্রিয় কাজীদা এবং আমি ভাই ধীরেন। কিন্তু তিনি আমাকে তুমি আর বল্লেন না কোন দিন। সেদিন তিনি আমার আপত্তি শুনলেন না। বল্লেন, আমি একদিন এসে দাদাদের সঙ্গে দেখা করে এবং প্রয়োজন হলে আপনার মা'র কাছে থেকেও সম্মতি আদায় করে নেব। তাঁর মতে, একদিন রিহার্সাল রুমে Music hands দের সঙ্গে গান করে ঠিক ঠাক করে নিলে দমদমে আপনার পক্ষে ভালভাবেই রেকর্ডিং করা নিশ্চয় সম্ভব হবে। এতে পরীক্ষার প্রস্তুতিও আপনি করতে পারবেন, জমে যাওয়া Preliminary Inter-

mediate এবং law final পরীক্ষায় আপনার মত Intelligent Student এর কৃতকার্য হওয়া মোটেই চিন্তার বিষয় নয়। আপনি এক একবারে দু'টি বিষয়ে পরীক্ষা দেবেন, তিনটি law এবং এম. এ. উভয় মিলিয়ে দু'বছরেই শেষ হয়ে যাবে। Gramophone Record করার জন্যে আপনি পরীক্ষায় অসফল হতেই পারেন না।

বাড়িতে বসে সেদিন ওর সঙ্গে অনেক কথা কইবার সুযোগ পেয়ে নিতান্তই আনন্দিত হয়েছিলাম। এরপর তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। প্রথমে তিনি আমার রেকর্ড H.M.V.কোম্পানীতে করাবার ইচ্ছা পোষণ ও ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সূত্রে মাননীয় হেম সোম মহাশয় আমার কাছে দু'চারদিন এসেছিলেন। প্রথমে আমার পদাবলী কীর্তনের রেকর্ড অবিলম্বে করা হল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কাজীদার সঙ্গে H.M.V.কোম্পানীর Exclusive এবং বিশেষ সুবিধা ভোগী ট্রেনারের Contract টি বলবৎ না থাকায় তিনি Megaphone Co তে গিয়ে সঙ্গীতকার হিসাবে কাজ করতে লাগলেন। কাজীদার বিশেষ অনুরোধে হেম সোম মহাশয় আমাকে H.M.V. ছেড়ে এক বছরের জন্যে Megaphone Co.তে রেকর্ড করার Permission করিয়ে দিলেন।

প্রতিদিন দুপুরে কাজীদার গাড়ি এসে আমাকে Megaphone Co. তে নিয়ে যেতো। ওখানে কাজীদা ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে গানের সুর দিতেন। গান শেখাতেন, রিহার্সাল করাতেন, নানা নির্দেশ সকলকে দিতেন।

তিনতলার ঘরে কাজীদা ফরাসের উপর গানের মহড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। প্রসঙ্গতঃ সেখানে যাঁরা উপস্থিত থাকতেন তাঁরা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। তিনি তাঁর যতগুলি গান সুরসমৃদ্ধ করে রাখতেন, সবগুলি পর পর শুনিয়ে দিতেন। আমরা অভিভূত হয়ে শুনতাম, নিজের কাজের তাড়া থাকা সত্ত্বেও। সুন্দর সুরের সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত এবং দরদী কণ্ঠে গাওয়া গান না শুনে কাজের অছিলায় চলে যাওয়া তখন আমাদের কাছে সাধ্যাতীত।

যাঁরা উপস্থিত তাঁদের মধ্যে রেকর্ড করার জন্যে মনোনীত এবং নির্দেশিত গায়ক-গায়িকা ছাড়াও যাঁরা কণ্ঠের দৈন্য আছে এবং সঠিকভাবে গান শিখেও গাইতে পারবেন না, এমন অনেকেই থাকতেন। কিন্তু কাজীদা এতই ভালবাসাপ্রবণ ব্যক্তি যে তাঁদেরও কাছে চলে এসে গান শিখে নিতে বলতেন। কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন আমার গান ভালবাসেন বলেই তো ওঁরা দুপুর রৌদ্রে এখানে এসেছেন দু' একখানি গান সুরকারের মুখে শুনে শিখে নেবেন। ওঁদের আমি কিছুতেই নিরাশ করতে পারি না।

মেগাফোনে বসেই কাজীদার গানের সম্বন্ধে আমার কিছুটা ধারণা হয়েছিল।

কাজীদা অনেক সময়ে কোন একটি চিত্তাকর্ষক সুর মাথায় এলে এবং প্রয়োজন হলে কোথাও মৃদু গুণগুণিয়ে একটি গান লিখে ফেলতেন। তাঁর ব্রিফকেসে সাদা কাগজ থাকত। ওর ব্যাগটির উপর সেই কাগজ রেখে একটি পা মুড়ে, হাঁটুর উপর ব্যাগটি রেখে খস্ খস্ করে, মোটামুটি দ্রুতভাবে লেখার সমাপ্তি ঘটাতেন। নিতান্ত প্রয়োজনে দু'একটি কথা কেটে তার পরিবর্তে অন্য শব্দ বা লেখা সংযোজিত করতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কথা কেটে কোনও ছবি এঁকে রাখতেন না।[১] এ ছাড়া কাজীদা তাঁর সংগ্রহ থেকে হিন্দি বা উর্দু ভাষায় রচিত কোনও traditional রাগ সঙ্গীতকে অবলম্বন করেও তাঁর বহু মূল্যবান রাগাশ্রয়ী গান লিখেছেন। কিন্তু তিনি কখনও পুরোপুরি অনুকরণ করতেন না। অনুসরণ করে তোলা তাঁর গানটি original composition কে সৌন্দর্য ও সুষমায় অতিক্রম করে এক অনবদ্য গানের সৃষ্টি হত।

উচ্চাঙ্গ গান ছাড়াও আমি দেখেছি যে প্যায়ারু কাওয়াল, কালু কাওয়াল, মস্তান গামা প্রভৃতি শিল্পীদের গান শুনে এবং ধ্যান দিয়ে তিনি কিছু মনোহারী লঘু সঙ্গীত (আধুনিক গজল, দাদ্‌রা প্রভৃতি ঢঙ্গের গান) রচনা করেছেন যা কালজয়ী হয়ে বেঁচে থাকবার দাবী নিশ্চয় করতে পারে।

দেখেছি যে, কোনও সুর তাঁর অন্তর স্পর্শ করলে তিনি কিছু সাধারণ কথা বসিয়ে সেই সুরটি আত্মসাৎ করতেন এবং পরে সুললিত ভাষায় গীত রচনা করে সেই সুরটি জনসমক্ষে উপস্থাপন করতেন। কাজীদার সঙ্গে মেশামেশির ফলে এটুকুই সার বুঝেছি যে, মধুর সুর রঞ্জিত রাগ রূপ এবং মাধুর্যের সঙ্গে গীত সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খিত বস্তু। এর বাইরে যা কিছু, সেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

একদিন কাজীদার সঙ্গে তাঁর গান কিভাবে গাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ছিল, তাতে উনি বলেন 'উচ্চাঙ্গের গানে হিন্দি খেয়ালেব অনুকরণে সরগম পরিবেশন করা ওঁর কাছে ভাল বলে বিবেচিত হয় না।' উনি বরং আপত্তিই করলেন। বোল্‌তান্ সম্বন্ধে ওঁর আপত্তি না জানালেও উনি বল্লেন, গানের মধ্যে এমন অংশ যদি রচিত হয় যেটি শুনলে সেই অংশটি একটি ভাল বোল্‌তান্ হিসাবে গণ্য হতে পারে, তা হলে ভাল হয়। 'ভোরে ঝিলের জলে' এ গানটিতে সঞ্চারী অংশটি পুরো বোল্‌তান্।

'আমি পুরব দেশের পুরনারী' গানটি শুরুতেই বোল্‌তান্। গানকে কথার বিস্তার দিয়ে সাজাতে উনি বড় ভালবাসতেন। তাই 'কথার তান্' বা বোল্‌তান্ গানেরই অংশ বিশেষ হলে উনি সন্তুষ্ট হতেন।

গানের কোন কোন স্বরকে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ব্যবহারের উনি পক্ষপাতী ছিলেন। সেটা হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে 'পুকার' বলা হয়ঃ ভোরের 'কান্না' পাওয়ায়', ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে'; 'দেবতা চাহেনা মোরে, মালার ডোরে' ইত্যাদি।

এখানে নজরুলের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য, 'সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই। তবে এটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন। এ বিশ্বাস আমার আছে।'

সত্যদ্রষ্টা কবির বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ সত্যদর্শনের সমর্থন করছে সঙ্গীতের এ আলোচনা ও অনুশীলন।

রাগ রাগিনীর সম্বন্ধে কবি প্রায়ই বলতেন,

> সকল রাগ-রাগিনীর বন্দেজ বাংলায় সৃষ্টি করবো, বাঙ্গালীকে আর কোথাও হাত পাততে হবে না। আপনারা যারা classical জানা শিল্পী আমার পাশে থাকুন।

ছায়ার মত পাশে থেকেছি, সৃষ্টিও করেছেন প্রচুর । গেয়েছিও প্রচুর। কিন্তু হায়! সম্পূর্ণ সাধ তাঁর পূরণ হওয়ার পূর্বে বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে অকালে জরায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৩৫ বছর নীরব মূক হয়ে থেকেছেন বাংলার Singing bird. নজরুল।

আজ আমার স্মৃতি পথে ভেসে ওঠে 'বেনুকা' ও 'দোলন চাঁপা' নবরাগ পর্যায়ের রাগ দু'টি সৃষ্টির পরে তাঁর সঙ্গীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যের কথা। তিনি বলেছিলেন,

> 'বেনুকা' ও 'দোলনচাঁপা' দু'টি রাগিনীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশী অনুভব করি তা হচ্ছে Symmetry বা uniformity-এর অভাব। কোন রাগ বা রাগিনীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিনীর মিশ্রণ ঘটাতে হ'লে শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ-রাগিনীর এবং অপ্রচলিত রাগ-রাগিনী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিনী যদি তার গ্রহ, ন্যাস এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে—সেই রাস্তায় চলে তা'হলে তাতে কখনো সুরের সামঞ্জস্যের অভাববোধ হবে না। Classical বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হ'তে পারে, মানুষের মনকে 'মহতো-মহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক গানের একঘেঁয়ে চপলতায় সম্ভব হ'তে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন হিন্দি ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হ'তে পারেনা—আমার এই গান দু'টির স্বর সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্ত্তব' তাঁদের সে ধারণা বদলে দেবে, গানের আঙ্গিক বা musical technique বজায় রেখেও এই শ্রেণীর গান কত মধুর হ'তে পারে, আশা করি আমার এই গান দু'টিই তা প্রমাণ করবে।'

সঙ্গীত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস তাঁকে এমন মন্তব্য করতে সক্ষম করেছিল। দার্শনিকেরা ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন উপলব্ধির আলোকে, সব দার্শনিক কবি না হ'লেও সব কবি দার্শনিক, তাই কবিরাও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। কবিদের যে সৃষ্টিকর্ম

tradition এর উপর প্রতিষ্ঠিত তা যে নশ্বর না হ'য়ে চির ভাস্বর হবে তা তাঁর জানা ছিল। কবি মাইকেল tradition ছেড়ে ভুল করেছিলেন, পরে শুধরে নিয়ে 'মহাকবি' হলেন। শেষে তিনি বলেছিলেন 'মাতৃভাষায় যে পাণ্ডিত্য দেখাইতে সক্ষম তাহাকেই পণ্ডিত বলিব'। নজরুল তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত সাধনাকে ভারতীয় tradition এর উপর স্থাপন করে বড় হয়েছেন। তাঁর অসংখ্য গান ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান ধারা, মার্গ সঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত। Tradition এর উপর দাঁড়িয়ে individual talent দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন বলেই তিনি উপরোক্ত কথাগুলি বলতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ওস্তাদ হ'তে তো একযুগ একাদিক্রমে সাধনা চাই। কাদের বক্স, মঞ্জু সাহেব ও ঠুমরী সম্রাট জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে নজরুল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা করলেও দীর্ঘ দিন তো করেন নি। তবু তাঁর শত শত রাগ-রাগিনীর জ্ঞান হয়েছিল স্ব-প্রতিভা বলে। সাধারণের পক্ষে যা আয়ত্তে আনতে দীর্ঘ সময় লাগে প্রতিভাশীলদের তা অল্প সময়ে অধিগত হয়। অধীত বিদ্যার প্রভাবে তিনি সুরের জাদু সৃষ্টি করতে পারতেন। Grammar এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মাইকেল যেমন অসাধারণ কাব্যামৃত সৃষ্টি করেছেন, grammar কবিকে follow করেছে, সেইরূপে উদ্দাম গতিতে নজরুল সঙ্গীত রচনা করেছেন, সুর তাঁকে follow করেছে। নজরুল বুঝেছিলেন, ধ্রুপদে আছে রাগের কঠিন অনুশাসন আর ঠুমরী ও খেয়ালে আছে সুরের স্বাধীনতা ও সম্মোহন বিদ্যা। নজরুল খেয়াল ঠুমরীর কাঠামোয় বেশী সঙ্গীত রচনা করেছেন।

রাগ-রাগিনীতে পুষ্ট না হ'লে বাংলা গানের ধারা,
পাবে না আসন বিশ্ব সভায় মরু পথে হবে হারা।
তাই
রাগ-রসে ভরা গীত সুধা-ঢালি বহায়ে খুশীর বান,
বাংলা গানের ভাণ্ডার ভরি, ভরেছে সবার প্রাণ।

হিন্দী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ছায়া অবলম্বনে তাঁর রচিত গানগুলি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

১. গুঞ্জ মালা গলে–মালগুঞ্জ–রটত রাধা মনমোহন
একি তন্দ্রা বিজড়িত–মালকোষ-মুখ মোর মোর

২. কুহু কুহু কোয়েলিয়া খামাজ–ন মানুঙ্গী ন মানুঙ্গী

তাঁর রাগ-রাগিনীর ভিত্তিতে কাব্যগীতিগুলিও রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ উক্তির অনুসারী ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরীর ব'লে সে মানতে নারাজ—বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, যে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।' নজরুলের বেশ কিছু গানের কাঠামো শাস্ত্রীয় রাগের প্রাধান্য পেয়েছে আর কথা অংশ কাব্য-সুষমা মণ্ডিত। এ সকল গানে বাণীর সঙ্গে সুর খেলাবার সুযোগ আছে। তাঁর একটি প্রাতঃকালীন

রাগে রচিত গান 'সাজিয়াছ যোগী' সাধারণ দৃষ্টিতে তরুণ বয়সী বিবাগীর কাছে দয়িতার যোগী বেশ ছাড়ার আবেদন। বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যোগীয়া রাগ বোঝানোর জন্য কবির এ ভাষার সৃষ্টি। নবোদিত গেরুয়া রঙ্গের সূর্য্য পুরুষের প্রতীক আর পৃথিবী নিখিল বিশ্বের বিরহিনী প্রিয়ার প্রতীক। রূপকল্প দ্বারা যোগীয়া রাগের রূপ ও সময় বোঝাতে চেয়েছেন কবি।

আহির-ভৈরব রাগে নিবন্ধ কবির গানখানি যেন ঐ রাগের নবতর ব্যাখ্যা বিশেষ। ভৈরব সাধারণত রুদ্রের প্রতীক। আহির-আহিরিণী গোয়ালা-গোয়ালিনীদের বোঝায়। যারা প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দিয়ে বংশীধারীর সাথে লীলারসে মগ্ন থেকেছে, তাদের ভজনার হোরী গান বেশীর ভাগ কাফীরাগে গীত হয়েছে। আহির ভৈরব রাগে পূর্বাঙ্গ ভৈরব এবং উত্তরাঙ্গ কাফী রাগের প্রয়োগে সমৃদ্ধ। দুইয়ের রসগত পার্থক্য মোচন করে মিলিত হওয়ার আবেদন আহিরিণী অর্থাৎ শ্রীরাধা জানিয়েছেন তিনি বিষাণ ফেলে নীপমালা পরে বাঁশরী-ধারী হতে বলেছেন শিবকে।

অরুণ কান্তি কে গো

বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ দ্বারা কবি অসংখ্য রাগ সৃষ্টি করেছেন।

[পিলু-খাম্বাজ — আজি মনে মনে লাগে হোরী
বেহাগ বসন্ত — ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান
ধানশ্রী ভৈরবী — সন্ধ্যা মালতী যবে]

বিকাল ও রাত্রির রাগ মিশ্রণে তাঁর সফলতা যত না আশ্চর্য করে, তার চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্য করে সকালের রাগের সঙ্গে বিকালের রাগের ওতপ্রোত মিশ্রণে, কোথাও সাবলীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়না। তা ছাড়া কথার মধ্যেও সকাল এবং বিকালের রূপ পাওয়া যায়। যখন সকালের রাগের স্বর প্রয়োগ, তখন কথার মধ্যে সকালের উল্লেখ এবং বিকালের রাগের স্বর প্রয়োগকালে বিকালের উল্লেখ সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে।

সন্ধ্যা মালতী যবে-

মিশ্রণ ছাড়া এক একটি রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে বিশেষ ভাবার্থপূর্ণ রাগাঙ্গক গানগুলি বাংলা রাগ-সঙ্গীতের জগতে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

[তিলং — অঞ্জলী লহ মোর
বেহাগ — নিশি নিঝুম
হাম্বীর — আজো কাঁদে
মিয়ামাল্লার — স্নিগ্ধ শ্যাম]

কখনো মধ্যাহ্নের রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল মেলে প্রলয়ের বেগে ধাবমান সুন্দরের আবাহন দ্বারা শুদ্ধসারং রাগের রূপ ফুটিয়েছেন কবি। কখনো মধ্য রাত্রির

রাগ বেহাগের রূপ দেখিয়েছেন নিদ্-না আসা বিরহিনীর আর্ত আবেদনের দ্বারা, বিহগীর বিহগ কোলে ঘুমানোর সাথে বিরহিনীর ঘুম না আসার তুলনা করেছেন antithesis দ্বারা।

ধূলি পিঙ্গল

অপ্রচলিত রাগগুলিকে কবি বলেছিলেন, হারামনি। হারামনিগুলি উদ্ধার করে আত্ম-প্রতিভার রসে জারিত করে অভিনব রূপ দিয়েছেন কবি। এক এক রাগের রূপের সঙ্গে কথার পরিপাটি মিলন আমাদের মনকে কোন এক অমরার দিকে নিয়ে যায় পলকের মধ্যে। গানের চিত্রকল্প এত নিপুণ যেন তা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সুরের মায়াজাল, কথার জাদু নিসর্গের রূপ পরিগ্রহ আমাদের চেতনাকে অবশ-অসাড় করে ফেলে।

এতক্ষণ কবির tradition-ভিত্তিক রাগ সঙ্গীতের কথা তৎসহ রাগ মিশ্রিত সঙ্গীতের আলোচনা করেছি, এখন আসছি তাঁর সৃষ্টি 'নব-রাগ' পর্যায়ের গানের কথায়। নবরাগ সম্বন্ধে কবি নিজেই বক্তব্য রেখেছেন যা প্রথমে আমি আলোচনা করেছি। বেনুকা শুনলে তা বোঝা যাবে।

কবি বলতেন এসব রাগের রূপ তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন। কবি যখন রাগ সঙ্গীত রচনা ও নবরাগ সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁর ধ্যানমগ্ন রূপ বুঝিয়ে দিত যে তিনি নূতনের স্বপ্ন দেখছেন। প্রচলিত-অপ্রচলিত সকল রাগের উপর বিশেষ জ্ঞান না থাকলে নূতন রাগ সৃষ্টি করা যায় না। তাতে অন্য রাগের রূপ আসতে পারে। কবির সৃষ্ট রাগ মীনাক্ষী, অরুণ ভৈরবী প্রভৃতি রাগ সম্পূর্ণ নিজস্বতার দাবী রাখে।

মীনাক্ষী বা অরুণ ভৈরবী

কবি যখন সৃজনশীলতার চরম শীর্ষে, যখন পাকা ফসল ভারে ভারে ঘরে তোলার সময় এলো, তখন বাঙ্গালীকে রাগাশ্রিত সঙ্গীত সুধা পানে বঞ্চিত করে চির মৌনব্রত নিলেন। পরবর্তী প্রায় ৩৫ বৎসরে কবি আমাদের মাঝে ভগীরথের মত সুর ধুনীর পূর্ণ প্রবাহ বহাতে পারতেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য যদি তাঁকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা থাকত তবে বলতাম,

বাগিচার ফুল, বাগিচায় ঝরে,
বুলবুলি ঝুরে বনে,
আজো কাঁদিতেছে কোয়েলিয়া আর
চকোরীরা অভিমানে।
পাণ্ডুর আজ আকাশের চাঁদ
তারকায় নাই জ্যোতি,
তোমার লাগিয়া প্রকৃতি কাঁদিছে'
শোন কবি কান পাতি।

মদির গন্ধী হাসনু হানা
কুমুদীর তাজা কলি,
খুস্‌বু গোলাপ বনলতা সারি
আর কাঁদিতেছে অলি।
ফুলের জলসায় নীরব থেকোনা
কাঁদায়ো না প্রকৃতিরে,
সুরের বীণায় সুর তোল কবি,
পৃথিবীতে এসো ফিরে।

'বাগ্যেয়কার' নজরুল সুরের জগতে বহু বিচিত্র ঢংএর প্রবর্তন করেন। তাঁর মাথায় সবসময় নব সৃষ্টির এবং অভিনবত্বের চিন্তা ঘুরে বেড়াত। তা ছাড়া বিশেষ ভাবে রাগ সঙ্গীতে জ্ঞান থাকায় তা কবিকে সৃষ্টির পথে সর্বদা আহ্বান জানাত। তাঁর রচিত কোন গানে সর্‌গম্‌ না চললেও বিস্তার—যা দীর্ঘায়িত নয় তা চলত। কিন্তু রাগ-রাগিণীর গানে বিস্তার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই তাঁর সেই নান্দনিক চিন্তাধারা প্রকাশের বিশেষ রূপ খুঁজছিল। হাফিজ, গালিব, জামী প্রভৃতি গীতিকবিদের প্রভাব এসে পড়ল তার গানের মধ্যে, এবং তিনি বাংলায় প্রথম গজল গানের প্রবর্তন করেন। এ তাঁর একটি বড় কীর্তি। গজল পারস্য দেশের এক লঘু প্রেমসঙ্গীত। এর স্থায়ী অংশটি সুর ও ছন্দে গাওয়া হয়। বাকী অংশগুলি ছন্দহীন আবৃত্তির ঢঙে গাওয়ার রীতি। এ আবৃত্তি অংশগুলিকে বলা হয় 'শ্যের' বা শায়রী। উদুর্তে এ ধরনের গান অসংখ্য, কিন্তু বাংলায় প্রথম সার্থক গজল প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব নজরুলের। এক সময় বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল নজরুলের গজল। এখন আবার তার পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই। গজল প্রবর্তন করায় তাঁর রাগভিত্তিক গানে রাগ বিস্তার সার্থক হ'ল শ্যের বা শায়রী অংশে। মনে তাঁর যে সুপ্ত কামনা ছিল রাগ বিস্তৃতির —তার সমাধান হ'ল। কিছু কিছু গজল আবার শ্যের বিহীনও আছে। জামী রচিত ও সুরারোপিত গানের কাঠামো কবিকে বিমোহিত করে। তিনি ঐ গানের ছায়া অবলম্বনে 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর' গানটি রচনা করেন এবং তাঁকে এ গান অমর করে রেখেছে বাংলা গানের জগতে। কবি ভৈরবী রাগিনীতে এর বন্দেজ তৈরী করেন। এ রূপে ভৈরবীতে নিবদ্ধ আর এক গজল 'একি সুরে তুমি গান শোনালে।' এ গানে যে শায়রী আছে তার তুলনা বাংলা গানে বিরল। সুরের চমক বলতে যা বোঝায় আর ভৈরবী রাগ বলতে যা বোঝায় তা মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া এ গানগুলিতে চিত্রকল্প ও নাটকীয়তার মূর্ত দৃশ্য ভেসে ওঠে নয়ন সম্মুখে।

(১) মোর ঘুম ঘোরে বা একি সুরে তুমি— পারস্যের এ প্রেমসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে আমাদের উত্তর প্রদেশের বর্ষাকালীন প্রেমসঙ্গীত মিশিয়ে কবি এক অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেন যার তুলনা অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া সম্ভব নয়। গানটি কাজরী তালের। চমক সৃষ্টির জন্য কবি এটি নিবদ্ধ করেন লাউনী তালে। ফলে শায়রী গাওনের

অব্যবহিত পরে যখন আবার তালে এসে গানটি পড়ে তখনি বাদক প্রায় নিজেকে সামলাতে পারে না। ভাল বাদক তখন অপূর্ব বাদনশৈলী দেখিয়ে সঙ্গত করেন।

(২) কাজরী গাহিয়া এসো গোপ ললনা— আশাবরী রাগে একখানি গজল গান। কবির সৃষ্টিবিলাসকে উর্ধে তুলে দেয় মুহূর্তে যখন গানের সুর কানে প্রবেশ করে। ঐ গানের শায়রী রাগরূপ ফুটিয়েছে অপূর্ব ভঙ্গিতে। কেমন করে মানুষ মানুষকে ভুলে যায়, যা চির সত্য উদ্ধৃত হ'য়েছে এ গানে। কবির রাগ হৃদয়ধর্ম ও তৎসম্বন্ধে চেতনা যে কত প্রবল তা বোঝা যায় এর গায়কীতে।

(৩) আমি যেদিন রইব না গো—বিভাস রাগের। রাগ তথা কাব্যগীতিটি কেমন করে বিশুদ্ধ গজল গানে শ্যের অংশ রাগরূপ প্রকাশ অপূর্ব। ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায় ঘুমাবার বাসনা অপূর্বতম কল্পনা বিলাস ও জৈব-তাগিদ উভয়েই বর্তমান এ গানে।

(৪) পলাশ ফুলের গেলাস ভরে— একটি গানে স্মৃতিচারণ ও বিরহ যেন পাশাপাশি থেকে গানখানি শ্যের অংশে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। যার দু'চার লাইন গাইলেই বোঝা যাবে।

বাংলার সংগীত জগতে পঞ্চকবি তাঁদের সংগীতের অমৃতধারা ও লহরী বইয়ে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও সর্বকনিষ্ঠ নজরুল। তাঁদের এ সংগীত ধারাকে পঞ্চামৃত ধারা বলা হয়, এ সকল অমৃত ধারার মধ্যে সকল প্রকার সংগীত বিদ্যমান। রজনীকান্ত বেশী ভক্তিগীতিতে যত্ন রেখেছেন। অতুল প্রসাদ বিরহ প্রেম সংগীতে যত্নবান। বাকীরা সব রকমের সঙ্গীতে যত্নবান। কাব্য–সঙ্গীত বা প্রেমসঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল কৃতিত্বের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীত ও ভগবৎপ্রেমসংগীত প্রায় একাত্ম হয়েছে। তাঁর শুধু প্রেমসংগীত ও অতিমাত্রায় অতি ইন্দ্রিয়লোকে ভ্রমণশীল। দ্বিজেন্দ্রলালে কিছুটা মানব-লোকের সাড়া মেলে। রবীন্দ্রনাথের অতি মানবীয় প্রেম এক transcendental পৃথিবীতে ভ্রমণ করেছে। অনেকক্ষেত্রে Platonic প্রেমের রূপ পাওয়া যায়। নজরুলের গানে মানব-মানবীর প্রেমের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত। রক্তমাংসের শরীরের বাস্তব ও জাগতিক আকুতি বিদ্যমান। তার সাথে কবির রূপকল্প ও সুরের চমক মিলে অতি আবেদনশীল ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। তাঁর গানে উপমা ও কল্পনা সুরের সাথে মণিকাঞ্চন যোগের সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্য ও প্রেমের গান কিন্তু রাগাশ্রয়ী। তাই বলে কথার অবমাননা করেনি তাঁর রাগ রূপ। যা আমরা শাস্ত্রীয় সংগীতে পাই। সেখানে রাগ সকল কিছুর উপরে। কথাকে সে দোসর মানতে রাজী নয়, কথা অবহেলিত। কাজীদার গানে কথা আবার কোথাও কোথাও রাগের প্রকাশক। যেমন পটমঞ্জরী রাগের কথা, 'আমি পথমঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে'। 'নিসর্গের' কোলে মানব-মানবীর প্রেম-কথা বিকাশ লাভ করে। কখনো প্রকৃতি বর্ণনার সাথে তা জড়িয়ে

থাকে, কখনো প্রকৃতির ফুল-পাতা-পাখী-প্রজাপতির মাধ্যমে মানুষের কথা প্রকাশিত হয়। একখানি গান প্রেম ও তার আকুতি প্রকাশে কেমন সুর-কথা ও সময়োপযোগী রাগে ভরপুর হয়ে সুধা বর্ষণ করে তা দেখা যাবে গান খানি শুন্‌লে। গান খানিতে প্রবাসী প্রিয়তমের বিরহে বিরহিনী প্রিয়তমার কাতরতা প্রকট। গভীর রজনীতে বিহগ-বিহগীর সুখী জীবন আর বিরহিনীর কাতরতা পাশাপাশি অনুধাবনযোগ্য। গভীর রজনীর রাগ 'বেহাগ' এই আর্তি প্রকাশের জন্য 'নিশি নিঝুম' কথার সাহায্য নিয়েছে। কবির অনুভূতি রাগ ও কথা প্রয়োগের তুলনা পাওয়া যায় না।

(১) নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে— মানবীর প্রেমের নাটকীয় প্রকাশে তাঁর বহু গান সমৃদ্ধ। এ জগতের গান শুন্‌লে মনের চোখে এমন বাস্তব ছবি আঁকা হয়, যাতে মনে হয় সামনে ঘটনা ঘটেছে। তখন গান শেষে নাটকীয় মোহজালে মন ভরে থাকায় সম্বিৎ ফিরে আসতে দেরী লাগে।

(২) মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর— কবির বহু গানে প্রেম কত নিবিড় হ'তে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেমন করে প্রিয়াকে সাজানো যাবে, কেমন করে দিন কাটানো যাবে, কেমন করে প্রকৃতির বুকে নিজেদের জীবন যোগ করা যাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ একটি বিশেষ গান 'বিভাস' রাগে নিবদ্ধ আছে। আশা করি শুনলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

(৩) পলাশ ফুলের গেলাস ভরে— প্রিয়ের কাছে স্বপ্ন মধুর রাতকে সার্থক করে তুলতে আকুলি-বিকুলি নজরুলের গানে বিশেষ স্থান করে আছে। শ্রী রাধার গভীর প্রেমাবেগ যেমন তাকে ঘর-বাহির করতো তেমনি প্রিয়তমের আগমন আশায় প্রিয়তমার ঘর-বাহির করার চিত্র দেখি কবির গানে। উপমা উৎকর্ষের শীর্ষে আরূঢ় প্রিয়ার পথ চাওয়া কৃষ্ণা তিথির চাঁদের পথ চাওয়ার মত আবার প্রিয়ের আগমন বার্তা আকাশে বাতাসে যে কানাকানির মত শব্দিত হয়।

(৪) প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই— নীলাম্বরী (নীলাম্বরী শাড়ি পরে কে যায়......) গানে কবির কবিত্বশক্তি তথা কল্পনার মায়াময় রূপ ফুটে উঠেছে। নায়িকার রূপ বর্ণনায় নিসর্গের প্রচ্ছদপট এসে আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এতে মেঘদূত, শকুন্তলার চিত্র ফুটে ওঠে মনের আকাশে, অঙ্গের ছন্দে পলাশ মাধবী ও অশোক ফোটার কথা অশোক বনে সীতার পরশে অশোক ফোটার চিত্র মনে করিয়ে দেয়। যাঁরা মহাকবি হ'ন তাঁরাও tradition এর উপরে ভর করেন। কত গভীর জ্ঞান মহাকাব্যে থাকলে এরূপ লিরিক রচনা করা যায়, তাই ভাবিয়ে তোলে। কাজী নজরুলের এই যুগান্তকারী গানখানি শুনলে তা আরো intensive হবে।

(৫) নীলাম্বরী শাড়ী পরি— কবি যে কেবল মানব প্রেমের কাহিনী আর স্বরূপ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়, তিনি প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করেছেন

কোথাও তাকে Personify করেছেন। তাঁর 'বসন্ত মুখর আজি', 'এল এ বনান্তে পাগল বসন্ত', 'অঝোর ধারার বর্ষা ঝরে' প্রভৃতি অসংখ্য গান একথার সাক্ষ্য বহন করে। এমনি আর এক গান 'শিউলি ফুলের মালা দোলে।

রবীন্দ্রনাথ দেহাতী লোকদের মনের খবর না পেয়ে নীচুতলার লোকদের সাথে মিশতে না পেরে হা হুতাশ করে বলেছিলেন 'যে আছে মাটির কাছাকাছি সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।' সে কবি নজরুল, নিম্নস্তরের মানুষের মনের খবর তিনি রাখতেন ভালভাবেই। তাঁর একখানি ঝুমুর গান শুনলে বোঝা যাবে ঐ সকল মানুষের মনে কত গভীর প্রেম মুক্ত গোমুখী ধারার মত উৎসারিত হয়েছে।

এই রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে,
বাজে বাঁশের বাঁশী।

গানের সুর যাঁরা করেন তাঁরা সবাই গীতিকার বা কবি নাও হতে পারেন। বেশীর ভাগ সুরকার অন্যের কথা নিয়ে নানান সুরে ফেলার চেষ্টা করেন, কথার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে সময়ানুযায়ী রাগ রূপ আরোপ করে সুর করার চেষ্টা সবাই করেন না। যাঁরা বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ এবং রাগরাগিনীর উপর দখল রাখেন এবং রাগের বিস্তার করতে সক্ষম তাঁরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ভাল সুর সৃষ্টিতে সক্ষম। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের খেয়াল গানের বিস্তারগুলি এক এক করে সরিয়ে নিলে এক একটি বিশেষ হাল্কা রাগভিত্তিক গানের সৃষ্টি হতে পারে। মূল রাগকে কেন্দ্র করে গুচ্ছ গুচ্ছ গান একত্রীভূত হয়ে থাকে প্রকৃত খেয়াল বা ঠুংরী গানে, সেরূপ গায়ক ও কথার স্রষ্টা যদি একই ব্যক্তি হন তবে তো সুরের ঝর্ণা ধারা বয়ে যায় গানে। সে ক্ষমতাই সবার থাকে না। সে ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরায় যে প্রতিভাবান সুরকার তা সন্দেহাতীত। তা ছাড়া যাঁরা আবার সঙ্গে সঙ্গে সুর ও কথার সৃষ্টি করেন তাঁরা হলেন সুর ও সঙ্গীতের জগতে super musician. এরূপ বাংলার সুরের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুরকার ও গীতিকার ও গায়ক কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর মনের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ কথা ও সুর যেন সাজানো থাকত। হঠাৎ যেন গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় উৎসারিত হ'ত। কিছু উদাহরণ দিলে সে সম্বন্ধে আরো ভালো বোঝা যাবে।

একদিন হঠাৎ বিকাল তিনটার সময় কাজীদা গেয়ে উঠলেন একটা সুর, তাঁর সে সুরের ভাঁজ দেখে বোঝা গেল তিনি দরবারী কানাড়া রাগের সুর ভাঁজছেন। আমরা বললাম কাজীদা কথা কেমন হবে? তিনি বললেন, কথা তো হবে, এই ধরো কথা এরূপ–বলে,

(১) 'ওর নিশীথ সমাধি ভাঙ্গিও না' গানটি সঙ্গে সঙ্গে গাইতে লাগলেন। আমরা সব তাজ্জব বনে গেলাম। কথা নাই গান হল, সঙ্গে সঙ্গে কথাও হ'ল। এরূপ আর একটি গানের সৃষ্টি হ'ল 'নিশি রাতে রিম ঝিম ঝিম বাদল নূপুর।' গানগুলি গেয়েছি গেয়ে থাকি। মনে হবে যেন কত trial and error method এর পিছনে ছিল সুন্দর

করার জন্য, কিন্তু না স্বতঃস্ফূর্ত এ সঙ্গীত ধারা কাজীর-কণ্ঠ হতে নিঃসৃত।

(২) তাঁর গানের মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ থাকত। আমরা যারা তান বোলতান দিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত গেয়ে থাকি তারা তান বোলতান প্রয়োগ করে গান করতে চাইতাম। কাজীদা বলতেন 'বোলতান ইচ্ছামত করবেন কেন। আমি গানের কথায় বোলতান দিয়ে দিচ্ছি, তাই করুন। ছোট রাগ ভিত্তিক তান করতে দিতে আপত্তি নাই। তবে আমার গানে সর্‌গম্‌ করতে আমি দিতে নারাজ। এতে আমার গান নষ্ট হবে।' 'পূরব দেশের পুরনারী' এবং 'ভোরে ঝিলের জলে' গানে তিনি বোল তান গানের তুকের মধ্যে বসিয়েছেন, দ্বিতীয় গানের সঞ্চারীটাই বোলতান। গানটি শুনলেই তাঁর প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। এমন সুমধুর কথা অনুসারী বোলতান সৃষ্টি করতে আমি খুব কম দেখেছি।

(৩) কাজীদা প্রতিভাবান শিল্পীদের দিয়ে অনেক সময় তাঁর গানের কাঠামো গাওয়াতেন ও গায়কী যোগ করতে বলতেন। যদি তা মনোমত হ'ত তবে তা রেখে দিতেন, আবার কখনো addition-alteration করতেন নিজের সুরের কাঠামোর, কখনো কখনো একই গানের দু'রকম সুরও হয়েছে। তার কারণ দু'টি, একটি সুর কাজীদার অন্যটির structure গায়ক হয়তো recording এর আগে deviate করেছে, তাই থেকে গেছে। 'মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা' এরূপ এক একটি গান, originally দেশীতোড়ী কিন্তু পরে 'ভৈরবী' আবার 'কাজরী গাহিয়া এসো' গানটি কবির সুরে গেয়েছেন, ইন্দুবালা দেবী এবং সোহ্‌রাব হোসেন সাহেব। আবার এ গানে আমি যে সুর করেছিলাম কাজীদা তা allow করেছিলেন। তাই এর দু'রকম সুর। 'গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমায়' গানের সুরে কাজীদা 'রবিকোষ' রাগ আরোপ করেছেন। আমি কিন্তু তা গেয়েছি 'মধুবন্তী' রাগে। কাজীদার তারিফও পেয়েছি এ গানে।

(৪) কাজীদা গানের কথা অনুযায়ী গানের গায়কী করে দিতেন। কোন গায়কী হয়তো যে স্বর ছিল তার সামান্য পরিবর্তনে যদি আরো সুন্দর হয় এবং তা যদি কোন ভাল শিল্পী করেন কাজীদার তাতে আপত্তি থাকতো না।

আবার গানের কথার সাথে সমতা রেখে গায়কী তৈরি করা উনি বিশেষ পছন্দ করতেন। যে emotion বা আবেগ যে কথায় সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন এবং সেখানে যে অলংকার প্রয়োগ করা দরকার তা করতেন এবং জ্ঞানীগুণী শিল্পীদের তা করতে বলতেন। এরূপ এক যুগান্তকারী গান কাজীদার এই সূত্রগুলি মেনে গেয়েছিলাম। 'ফুলেরও জল্‌সায় নীরব কেন কবি' গানের 'ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায়' অংশে তিনি বললেন কান্না মূর্ত হ'য়ে উঠুক। তাই করলাম। এক সময় এক Function এ এটি গাইছি, সারেঙ্গী বাদক ছিলেন লাহোরের আলিবক্স। তিনি All India Radio-এর staff artist ছিলেন। 'ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায়' অংশ শুনে সারেঙ্গী রেখে দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললেন। সেদিন ভেবেছিলাম গান গাওয়া ও গায়কী

করা আমার সার্থক হয়েছে। আজ আমাদের কান্না পাচ্ছে—সে কবি, সে সুরকার, সে গীতিকার, সে বাংলার singing bird নেই বলে। কবির লেখা সে গান কবির মহাপ্রয়াণে গাওয়ার যোগ্য। তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবসে তাঁর উদ্দেশে এ গান গাইছি

'ফুলেরও জলসায় নীরব কেন কবি'

১. শ্রী ধীরেন্দ্র মিত্রের এ বক্তব্য সর্বাংশে সঠিক নয়। নজরুলের অনেক গানের মূল পাণ্ডুলিপিতে অজস্র কাটাকুটি আছে। –সম্পাদক, ন. ই. প.

নজরুল-মৃত্যুবার্ষিকী ১৩৯৯ উপলক্ষে নজরুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান মালার অংশ হিসাবে ২৮শে আগষ্ট ৯২ তারিখ বিকেল ৫টায় শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র নজরুল গবেষকদের সমাবেশে উক্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গীতও পরিবেশন করেন। -স.ন. ই. প

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — পঞ্চদশ সংকলন]

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও নজরুল

শেখ লুৎফর রহমান

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের দুই দিকপাল কবি, গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে-সব ব্রহ্মসঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন— সেইগুলির সুরের কাঠামো হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ আঙ্গিকভিত্তিক। পরবর্তী জীবনে কিছু দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটক-বিষ্ণুপুরী ঘরানা খেয়াল, কিছু বিদেশী ও দেশজ ছাড়া আপন সঙ্গীত সৃষ্টিতে বেশির ভাগ যে ধ্রুপদী ধারা অনুসরণ করেছেন, তার প্রকৃষ্ট কারণ আছে। কিন্তু সে ব্যাখ্যা এখানে নয়। নজরুল ইসলাম আপন সঙ্গীত সৃষ্টিতে উত্তর ভারতীয় খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, গজল ইত্যাদির ধারা অনুসরণ করেছেন। নজরুলের বহু বিচিত্র ঢং এবং বর্ণের সঙ্গীতে এমনকি তাঁর কোনো কোনো কাব্য-সঙ্গীতের প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই সহজে বোঝা যাবে, খেয়াল-ঠুমরির প্রতি কতখানি মন-প্রাণ ভরা অনুরাগ ছিল তাঁর। খেয়াল গানে সুরের স্থিতি, সুরময় আত্মায় সুরের খেয়াল সুর বিহারে মন্দ্র সপ্তক ছাপিয়ে তার অতি-তার সপ্তক ছুঁয়ে শ্রোতাকূলকে এক অলৌকিক জগতে পৌঁছে দেয়। এর গায়ন পদ্ধতি ধ্রুপদের মতো সর্বাঙ্গ শাস্ত্র আচারে শক্ত বাঁধন যুক্ত। এমনকি, একজন ধ্রুপদিয়া একটি গানই যদি এক ঘন্টা ধরে পরিবেশন করতে চান— ঐ এক ঘন্টাকাল স্বরলিপির কাঠামোয় ধরে-রাখা স্থায়ী-অন্তরা-আভোগ-সঞ্চারী-পরিবেশনা ছাড়া এতটুকু এদিক-ওদিক বিচ্যুতির শামিল বলে গণ্য। তবে খেয়ালে রাগ পরিচিতির আরোহী-অবরোহী বাদী-সমবাদী-পকড়-চলনের শাস্ত্রানুশাসনটুকু অবশ্যই মেনে চলতে হয়। যদি প্রাণাবেগে শিল্পী কখনও বিবাদী স্বর লাগিয়ে সেরে নিতে পারেন তখনও ভ্রষ্ট রাগ পরিবেশনার প্রশংসাই পাবেন। তিনি বলবেন, কেমন চমৎকার করে লাগিয়েছে সুরটা। ঠুমরির বেলায় রাগবিচারী শাস্ত্র-আচারের তেমন কোনো বালাই নেই। গায়ন পদ্ধতি স্বতন্ত্র। খেয়ালের মতো কোনো একটি স্বরে দীর্ঘস্থায়ী সুরোপস্থিতি তান-সারগাম-বাট-বাঁটোয়ারা ঠুমরির স্বভাববিরুদ্ধ। একটি চলমান মানুষের বিশেষ ভঙ্গিমার চলনের প্রতি কটাক্ষ করে কদাচিৎ আমরা বলে থাকি : 'দেখ এ যেন ঠুমরি চালে চলেছে।' ঠুমরির চাল এমনই উচ্ছল প্রাণবন্যার। ভাঙা-ভাঙা ঠুনকো ঠুনকো শিল্পীকণ্ঠ নিঃসৃত প্রতিটি তীক্ষ্ণ কাজের 'সুরের মুচড়া' মরমীয়া বিদগ্ধ মনে আনে দু'কূলপ্লাবী প্রশস্তির জোয়ার। ঠুমরির আচরণ এমনই সুরকেলির। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা গজল, কাওয়ালী, দাদরা-মূল সূত্র ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি। খেয়াল ঠুমরির সুর বিস্তারে সুরকে অবাধ

খেলানোর স্বাধীনতা নজরুলকে আচ্ছন্ন করেছে। এই আচ্ছন্নতা ঠুমরি গায়ন সুর-ভঙ্গির দিকেই যেন বেশি। এক কথায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যাকে রাগ সঙ্গীত বলা হয়, তার বিশুদ্ধ সুরাদর্শই নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে। নানাভাবে তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত রচনায় সুর প্রকরণের ভেতর তার প্রভাব বিস্তার করেছে। কয়েকটি রাগ-রাগিণীর ব্যঞ্জনাময় কাব্য-সঙ্গীতের নমুনা তুলে ধরছি,

> 'আবার কি এল রে বাদল'-জয়জয়ন্তী মিশ্র; 'নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়'- তোড়ী; 'নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল'- বাগেশ্রী; 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান'- বেহাগ-বসন্ত; 'সন্ধ্যা নেমেছে - আমার বিজন ঘরে তব গৃহে জ্বলে বাতি'- ইমন মিশ্র; 'ভোরের হাওয়া ধীরে বহ ধীরে' – ভৈরবী; 'বিদ্যায়সন্ধ্যা আসিল ঐ' – ভীমপলাশী।

এতে কিছু কিছু লৌকিক সুরের ক্ষণিক পরশ থাকলেও মূলত এসব সঙ্গীত রাগ-রাগিণীর প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

কাজী সাহেবের গজল, গজল–ঠুমরি, দাদরা, এই তিন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে আর এক গোষ্ঠীর গানে—সুরসৃষ্টির সময়ে রাগ-সঙ্গীতের প্রবল প্রভাব যা বিস্তৃতি লাভ করেছে, তার কয়েকটি নমুনা,

> 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল'- ভৈরবী; 'নিশি ভোর হোল জাগিয়া'- ভৈরবী; কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি'- মাণ্ড মিশ্র; 'করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব'- সিন্ধু; 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিনী'- পাহাড়ী মিশ্র; 'আজকে না হয় একটি কথা কইলে আবার মোর সনে-খাম্বাজ মিশ্র; 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি'- বেহাগ-তিলক কামোদ -খাম্বাজ; 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়'- খাম্বাজ-জয়জয়ন্তী; 'মুসাফির মোছ রে আঁখি জল'- বারোয়া মিশ্র।

গজল পারস্য দেশের এক ধরনের কাব্য-সঙ্গীত। এর ভাবাদর্শ প্রেম রসেসিক্ত। বাংলা ভাষায় পারস্য দেশীয় গজলী ঢংয়ের সাথে বাঙালিয়ানার সমন্বয় ঘটিয়ে নজরুলই প্রথম বাঙালি সমাজকে এই সঙ্গীতের অপূর্ব রস-মাধুর্য উপহার দিলেন। এই কৃতিত্বের তিনিই হলেন একক দাবীদার। নজরুল ইসলামের আগে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত গীতিকার ও সুরকারদের মধ্যে দু-একজন বাংলা কথায় গজল প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাঙালি সমাজ সেগুলি গ্রহণ করতে পারেনি। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের একটি ধারা হলো গজল, এই গানগুলির কোনোটি গজল, কোনোটি গজল-ঠুমরি এবং কোনোটিতে রয়েছে গজল, ঠুমরি, দাদরার সমন্বয়। কখনও বিশুদ্ধ একটি রাগের সাথে অন্য একটি রাগের নাম উল্লেখ ক'রে তাকে মিশ্র বলা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখ্য রাগটির সাথে অন্য একটি রাগের সামান্য ছায়া এসে গেছে। ছায়া রাগটি পরিস্ফুট নয় বলেই মিশ্র বলা হয়েছে। যেমন ঃ ভৈরবী, মান্ড মিশ্র, সিন্ধু, পাহাড়ী মিশ্র, খাম্বাজ মিশ্র, বারোয়া মিশ্র, খাম্বাজ-জয়জয়ন্তী। এখানে দু'টি রাগকে

একত্র করে সুর সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও আবার তিনটি রাগ একত্র করে সুর সৃষ্টি করা হয়েছে- যেমন বেহাগ, তিলক, কামদ, খাম্বাজ। এখানে মনে রাখা দরকার, সঙ্গীতে পুরোপুরি ব্যবহারিক জ্ঞান, শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং সঙ্গীত প্রকরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে নিখুঁত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া একাধিক রাগের অঙ্গাঙ্গি সমন্বয় ঘটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের বিশুদ্ধ সুরাদর্শে ভরপুর মাতোয়ারা নজরুলের সঙ্গীত সত্তা, খেয়াল ঠুমরি প্রীতির উৎস হলেও— আপন অজান্তেই বুঝি তাঁর 'ঠুমরি চালে মজেছে মন বেশি।' কাজী সাহেবের সৃষ্টির কত বিচিত্র ধারার মাঝে যে এই ঠুমরি চাল ছড়িয়ে রয়েছে সে শুধু বিদগ্ধ শ্রোতা ছাড়া কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কাব্য-সঙ্গীত, গজল, গজল-ঠুমরি, গজল-ঠুমরি-দাদরার মিলিত ঢং ভজন, হোরি, ফাগুয়া, কাজরী, কাওয়ালী, ধুন প্রভৃতি সঙ্গীত শ্রুতি-নির্ভর শিল্প। তার স্বাদ একমাত্র কানে শুনেই গ্রহণ করতে হয়। সমসাময়িক গীতিকার, সুরকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা কথায় কিছু কিছু হিন্দুস্থানী খেয়াল, অতুলপ্রসাদ বাংলা কথায় কিছু কিছু ঠুমরি সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি বিদগ্ধ শ্রোতাকুলই গ্রহণ করেছেন-সাধারণ মানুষ তেমন করে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু নজরুল ইসলামের সৃষ্ট বাংলা কথা খেয়ালের ঠুমরিগুলি সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছেন, এবং আগামী দিনেও গ্রহণ করবেন।

নজরুলের কয়েকটি ঠুমরি, টপ্পা, কাওয়ালীর নমুনা এখানে তুলে ধরছি,

> 'এ মোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে'- তিলং (ঠুমরি) আদ্ধা; 'পেয়ে কেন নাহি পাই'- খাম্বাজ (ঠুমরি) যৎ; 'স্বপনে এস নিরজনে'- পিলু (ঠুমরি) দাদরা; 'বনে চলে বনমালি'- কাফি (ঠুমরি); 'ফিরে গেছে সই এসে নন্দ কুমার'- পিলু (ঠুমরি) দাদরা; 'যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম'-সিন্ধু-ভৈরবী (টপ্পা) যৎ; 'আজি এ কুসুম হার'- কাফি (টপ্পা) যৎ; 'আসিছেন হাবিবে খোদা আরশ পাকে তাই'- কাওয়ালী ঢং'; 'সৈয়দে মক্কী মদনী'-কাওয়ালী, 'শহিদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারি',- কাওয়ালী।

কাওয়ালী গানের সুর সাধারণতঃ রাগাশ্রয়ী হয়। একাধিক মিশ্র রাগের কোনোটার প্রতি তেমন স্পষ্ট ধারণা করা যায় না বলেই সুরের বেলায় কোনো রাগের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিন হাজারেরও বেশি নজরুলের গানের সংখ্যা শুধু শুধুই হয়নি। পৃথিবীর কোনো গীতিকার, সুরকারই এত বিপুল সংখ্যক গান রচনা করতে পারেননি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সংখ্যা আড়াই হাজার। নজরুল-সঙ্গীতের আওতায় যে কত ধারার বা গোষ্ঠীর গান পাওয়া যায় তা জানেন শুধু মরমীরাই। নতুন নতুন গোষ্ঠী উদ্ভাবন করে তিনি নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করেছেন। এ রকম একেকটি গোষ্ঠীর গানই বোধ হয় হবে কয়েক শত। এই নিবন্ধে এর প্রামাণ্য কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, গজল, দাদরা, সাদরা-সব কিছুতেই সুপণ্ডিত, বিশেষ ক'রে যাকে ঠুমরির জনক বলা হ'তো। নজরুলের গানের বই 'বুলবুল' অথবা 'বনগীতি' ঠিক কোনটি, আমার মনে পড়ছে না-সেই ঠুমরি সম্রাট ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খাঁর নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে কবি লিখেছেন, 'আমার গানের ওস্তাদের দস্ত মোবারকে'। তাই

বোধ করি নজরুলের ঠুমরি-প্রীতি এত বেশি। ঠুমরি গানের ভাঙ্গা-ঠুনকো সুরের মিশ্রণে কথাও হালকা ধ্রুপদ খেয়ালের তুলনায়, গায়ন পদ্ধতি ভেবে কথার সৃষ্টি হয়।

ভজন, হোরি, কাজরী, 'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল'- লাচ্ছা-শাখ, 'এস আনন্দ সুন্দর ঘন শ্যাম',- খাম্বাজ মিশ্র, 'বনে যায় আনন্দ দুলাল'- কাফি, 'শ্যাম সুন্দর গিরিধারি'-মধুমাধবী সারং- গান ক'টি ভজন। হোরী-'আজি নন্দ দুলালের সাথে ওই খেলে ব্রজ নারী হোরী'- মিশ্র খাম্বাজ, 'আজি মনে মনে লাগে হোরী'- পিলু খাম্বাজ, 'আজি নন্দ দুলাল মুখ চন্দ্র হেরি'- খাম্বাবতি, 'কাজরী গাহিয়া এস গোপ ললনা'- কাফি, গান ক'টি কাজরী। রাগ প্রধান, 'কার বাঁশরী বাজে মুলতানী সুরে'- মুলতান, 'আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া'- হাম্বির, 'অরুণ কান্তি কে গো যোগীভিখারী'- আহীর – ভৈরব, 'সাজিয়াছো যোগী বল কার লাগি'- যোগিয়া, 'আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ-দরবারী মিশ্র, 'নীলাম্বরী শাড়ী পরি নীল যমুনায়'- নীলাম্বরী, 'হংস মিথুন ওগো যাও কয়ে যাও'- বড় হংস সারং, 'এস চির জনমের সাথী'- নাগ সরাবলি, 'বসন্ত মুখর আজি রে'- বসন্ত মুখারী, 'চাঁদনী রাতে মল্লিকা লতা' – চাঁদনী কেদার, 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা'- কর্ণাটি সামন্ত। উল্লিখিত গানগুলির সুর ও বাণীর সাথে আমরা বহুদিন থেকে পরিচিত। প্রথম প্রচলিত রাগের গান ছেড়ে – পরেরগুলি সুরের দিকটায় একটু লক্ষ্য করলে পাওয়া যায়, কয়েকটি অপ্রচলিত রাগের নাম। প্রচলিত রাগের সাথে অপ্রচলিত রাগগুলি শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একটু কঠিন বলে বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। এটা রাগ-সঙ্গীতে নজরুলের পর্যাপ্ত বুৎপত্তিরই পরিচায়ক। প্রসঙ্গ-কথায় উল্লেখ করা যেতে পারে, এক সময় কাজী নজরুল কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী উদ্ধারকল্পে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ) এর সাথে 'হারামনি' নামক নিয়মিত অনুষ্ঠানমালা প্রচার করতেন। খেয়াল, ধ্রুপদ ও ধ্রুপদ অঙ্গে গান কয়েকটি পুরানো আদি রাগ-সঙ্গীতের ভাবানুবাদ ও বাংলা সঠিক বাণী চয়নের খেয়াল- 'মোর মন্দির আবলো না আয়ে'- 'মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি'- জয়জয়ন্তী, 'ঝ্যন ঝ্যন ঝ্যন ঝ্যন পায়েল বোলে'- 'রুম ঝুম রুম ঝুম নূপুর বোলে' নট- বেহাগ, 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে'-ললিত। নজরুলের সৃষ্ট খেয়াল প্রচুর-তার কয়টি-'বরষা ঐ এলো বরষা'— মেঘ মল্লার 'রুম ঝুম বাদল আজি বরষে'-নট-মলহারা' 'পাপিয়া পিউ পিউ বোলে'- বাহার, 'গগনে সঘন চমকিছে দামিনী'- মেঘ, 'এলো ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত'- পরজ-বসন্ত, প্রামাণ্য দুটো ধ্রুপদি ঢংয়ের গান ঃ 'উদার অম্বর দরবারে'- দরবারি টৌড়ি'- (তিল- ওয়াড়া), 'হে প্রবল প্রতাপ দর্প' হরি- মোহন কোষ (চৌতাল) গান দু'টো ধ্রুপদ। 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু' মালকোষ (ঝাঁপতাল), 'প্রভাত বীণা তব বাজে' – ভৈঁরো (তেওড়া) এই দুটো ধ্রুপদি ঢংয়ের।

নজরুল-সঙ্গীতের আওতায় কিছু ধ্রুপদ অঙ্গের গানও পাওয় যায়। তবে সংখ্যাটা নেহাত কম। তাই বোধ হয় 'নজরুল ইসলামের গান' প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, 'নজরুল ধ্রুপদ বিমুখ; তবে খেয়াল ঠুমরিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে আসক্ত।'

কাজী নজরুলের বিশুদ্ধ সুরাদর্শ-প্রীতি, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি চিন্তা রাগ-সঙ্গীত ভাবনার কিছু কিছু নমুনা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ধ্রুপদিয়া ধারা আর নজরুলের সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে খেয়াল ঠুমরি ধারা। খেয়াল ঠুমরি প্রবর্তনে কিছু ঐতিহাসিক সূত্র ক্ষুদ্রাকারে এখানে উপস্থাপন করা হলো। এই ধারাগুলিকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে আমাদের উপমহাদেশীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ধারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুদ্ধ সঙ্গীতে মতবিরোধ চিরন্তন। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত ব'লে আমার ধারণা। ধ্রুপদ সম্পর্কে একটি মত হল ঃ ধ্রুপদ কখন সৃষ্টি হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও বলা যেতে পারে বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদের প্রবর্তক মিয়া তানসেন। ভিন্ন মত পোষণকারীরা পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা মানসিংহকে বর্তমান প্রচলিত ধ্রুপদ গীত-রীতির প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করেছেন। খেয়াল সঙ্গীতের উৎস সম্পর্কেও নানা মত রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক সত্য হলো, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আমীর খসরু খেয়াল গীতি প্রবর্তন করেছেন। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঠুমরি গীত-রীতির প্রচলন হয়। এবং এর প্রবর্তক হিসাবে লক্ষ্মৌ-এর সাদেক আলী খানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ধারণাগুলি এক পর্যায়ে বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং রসভঙ্গি হারিয়ে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলই সেই হারিয়ে যাওয়া রসভঙ্গি আপন আপন সৃষ্টিতে প্রয়োগ করে কেবলমাত্র রাগ-রাগিণীর অন্তর্নিহিত ভাব ও রসই উদ্ধার করেননি, বাংলা গানের ক্ষেত্রেও এনেছেন নতুন প্রাণের স্পন্দন।

ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক এই দু'টি দিক রয়েছে সঙ্গীতের। আমরা ব্যবহারিক দিকটাই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। নজরুলের সমগ্র সৃষ্টিকালের অর্ধেকেরও বেশি সময় কেটেছে সঙ্গীতচিন্তা ও সঙ্গীত সৃষ্টিতে। এই সঙ্গীতকলার সমৃদ্ধি সাধনে যাঁদের কাছে তিনি তালিম নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সতীশ কাঞ্জীলাল, মঞ্জু সাহেব, ওস্তাদ কাদের বখ্‌শ, ওস্তাদ মাস্তান গামা, সুরেশ চক্রবর্তী, ঠুমরি–সম্রাট জমির উদ্দীন খাঁ, বীণকার ধ্রুপদিয়া ওস্তাদ দবির খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে তিনি ফারসী সংস্কৃতসহ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'সঙ্গীত রত্নাকর', 'রাগ বিরোধ'. কলানিধি; 'সঙ্গীত পারিজাত', 'মারফুন নাগমাৎ' ইত্যাদি।

সঙ্গীতের ব্যবহারিক দিক ছাড়াও এর তাত্ত্বিক চিন্তায় নজরুল ইসলাম মাঝে মাঝে এতটা গভীরভাবে ডুবে যেতেন যে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, প্রায়ই তিনি সঙ্গীত চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে এক থেকে দু'দিন পর্যন্ত আহার-নিদ্রা ভুলে চোখ বন্ধ করে

ধ্যানমগ্ন তাপসের মতো স্থির হয়ে বসে থাকতেন। ব্যবহারিক ও শাস্ত্র জ্ঞানে রাগ সঙ্গীতের প্রকরণ পদ্ধতি জ্ঞানে সমৃদ্ধ নজরুল সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে একাধিক রাগ-রাগিণী সৃষ্টি এবং অপ্রচলিত রাগ প্রচলন ছাড়াও, বাংলা ভাষায় প্রথম যে কয়টি রাগের 'লক্ষণ-গীত' রচনা করেন, তার দু' একটি নমুনা এখানে তুলে ধরছি,

আশাবরী ঃ ত্রিতাল

হে নট ভৈরবী আশাবরী/ ওঠগো করুণ গান বিস্মরি ॥
চেয়ে আছ জলভরা নয়নে,/ তীব্র নিদাঘ তাপ কোমল করি ॥
পঞ্চমে কোয়েলিয়া ক'য়ে যায়/ প্রথম প্রহর দিবা বয়ে যায়
গুরু গঞ্জনা দিতে আসে ঐ/ মুখ ভার করে তব ননদিনী তোড়ী ॥

ব্যাখ্যা

'ওঠগো করুণ গান বিস্মরি'- করুণ রসের রাগ; 'তীব্র নিদাঘ তাপ কোমল করি'- তীব্র নি, ধা ও গা কোমল; 'পঞ্চমে কোয়েলিয়া ক'য়ে যায়'- ন্যাস স্বর পঞ্চম 'প্রথম প্রহর দিবা'- রাগ গায়নের সময় দিবা প্রথম প্রহর।

শুদ্ধকল্যাণ ঃ একতাল

নিত্য শুদ্ধকল্যাণ রূপে আছ তুমি মোর সাথে
সান্দ্র নিবিড় সন্ধ্যায় যেই পথ ভুলি ধর হাতে ॥
প্রদোষে স্বরগ পাশে তোমার করুণা ভাসে,
স্নিগ্ধ শান্ত চাঁদ হয়ে প্রভু/ আঁধারে পথ দেখাতে ॥

মান ত্যাজিয়া সে যায় প্রভু / তোমার চরণ তলে।
পূর্ণরূপে নেমে এসো / তার হৃদয় পদ্ম তলে ॥
অবতার হও ভূ-পালিতে প্রভু./ প্রেম যমুনার পারে রহ কভু ।
দগ্ধ পরাণে বিরাজ হে স্বামী/ দুঃখ জ্বালা জুড়াতে ॥

ব্যাখ্যা

'সান্দ্র নিবিড় সন্ধ্যায়'- রাগ গায়নের সময় সন্ধ্যাকাল (রাত্রি-১ম প্রহর) ঃ প্রদোষে স্বরগ পাশে– সা, রে, গা এবং পা ধা (আরোহ সা, রে, গা, পা, ধা, র্সা); 'স্নিগ্ধ শান্ত' – প্রকৃতি শান্ত, 'মান ত্যাজিয়া সে যায়'- আরোহে মা এবং নি বর্জিত; 'পূর্ণরূপে নেমে এসো' অবরোহে সম্পূর্ণ; 'অবতার হও ভূ-পালিতে'- ভূপালি রাগের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে; 'প্রেম যমুনার পারে' পা এবং রে সঙ্গীত প্রেমময়; 'দগ্ধ পরাণে বিরাজ'- গা এবং ধা বাদী-সমবাদী। লক্ষণ-গীতের মাধ্যমে বিশেষ রাগটির লক্ষণ ব্যক্ত করা হয় অর্থাৎ সেই রাগের স্বর, বাদী, সমবাদী গাইবার সময় ইত্যাদি নিয়ে যে রচনা, তাকেই 'লক্ষণ-গীত' বলা হয়। সহজে রাগ পরিচয়ের জন্য হিন্দী ভাষায় এই শ্রেণীর সঙ্গীতের অভাব নেই। বাংলা ভাষায় প্রথম প্রচেষ্টা নজরুলের। ছয়টি রাগের উপর তিনি মাত্র ছয়টি 'লক্ষণ-গীত' রচনা করেছেন। আশাবরী, শুদ্ধ-কল্যাণ, প্রদীপ-কি, রাগেশ্বরী,

বিভাস ও শঙ্করা।

কবি সৃষ্ট কুড়িটি রাগ-রাগিণীর নাম ঃ দেবযানী, সন্ধ্যামালতী, মীণাক্ষী, অরুণ-রঞ্জণী, নির্ঝরিণী, রূপমঞ্জরী, শঙ্করী, শিবানী-ভৈরবী, রুদ্র-ভৈরব, যোগিনী, আশা -ভৈরবী, উদাসী-ভৈরবী, রক্তহংস সারং, ময়ুর-সিংহাসন, বিষ্ণু-ভৈরবী, অরুণ-ভৈরব, শিব-সরস্বতী, বেণুকা, দোলন চাঁপা ও বনকুন্তলা।

কবি–সৃষ্ট একটি রাগ ও একটি রাগিণীর পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

শঙ্করী

বাদী-গান্ধার, সমবাদী-নিষাদ
আরোহ ঃ সা গা, পা না ধা র্সা
অবরোহ ঃ র্সা না পা, গা পা ণা ধা পা, গা সা

রুদ্র–ভৈরবী

বাদী–ধৈতব, সমবাদী-ঋষভ
আরোহ ঃ সা ঋা মা দা, ণা র্সা,
অবরোহ ঃ র্সা ণা দা মা ঋা সা।

সঙ্গীতেও স্বচ্ছন্দভাবে নানা ছন্দের প্রয়োগ করেছেন নজরুল। নীচে একটি গানসহ ছন্দ উল্লেখ ক'রে উদাহরণ দেওয়া হলো। একে নতুন তালের প্রবর্তন বললেও অত্যুক্তি হবে না, কেননা এখানে ছন্দই তাল এবং তালই ছন্দ।

প্রিয়াছন্দ ঃ ৭ মাত্রা

বিভাগ ঃ ২ । ৩ । ২ ;

১ ২ । ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ । ১ ২ । ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ ।

ম হু । য়া ০ ব । নে ০ । ব ন । পা ০ পি । য়া ০

মণিমালা ঃ ২০ মাত্রা

বিভাগ ঃ ২ । ৪ । ২ । ২ । ২ । ৪ । ২ । ২ ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ২০ মাত্রার অপ্রচলিত তালের মধ্যে আছে 'অর্জুন', 'অভিনন্দন'। এর ভাগ ভিন্নতর।

রাগ-রাগিণী সৃষ্টি, নতুন তালের প্রবর্তন, লক্ষণ–গীত রচনা- এসব হলো নজরুলের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভাবনার ফসল। কবি বেশ কয়েকটি ছন্দ তথা তাল প্রবর্তন করেছেন। কয়েকটির নাম তিনি দেননি। মাত্র যে– ছয়টির মাত্রা–বিভাগসহ নাম উল্লেখ করেছেন, বিভাগ ছাড়া সেই ছয়টির নাম দেওয়া হলো, ১। প্রিয়াছন্দ-৭ মাত্রা; ২। মণিমালা– ২০ মাত্রা; ৩। স্বাগতা– ১৬ মাত্রা; ৪। মন্দাকিনী-১৬ মাত্রা; ৫। মঞ্জুভাষিণী-১৮ মাত্রা; ৬। নবনন্দন–২০ মাত্রা এবং পঞ্চ বিভাগ।

নজরুল ইসলামের সঙ্গীত বিষয়ক মূল্যবান পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি অপ্রকাশিত লেখা কলিকাতা থেকে কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি অন্বেষায়' প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির সাথে সম্পাদক নিম্নরূপ একটি নোট যুক্ত করেছেন,

> 'সুর ও শ্রুতি' কাজী নজরুল ইসলামের এই রচনাটি অপ্রকাশিত। একটি বাঁধাই খাতায় কাজী নজরুল ইসলামের নিজের হাতের লেখায় এটি পাওয়া গেছে। খাতায় তিনি এত দ্রুত লিখেছেন যে, কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধারের অসুবিধা হয়েছে। রাগ-রাগিণী ও শ্রুতির চার্টগুলি তাঁর নিজের তৈরী। এই চার্টগুলি দেখে অনুমান করা যায়, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচারে তিনি কিরূপ আগ্রহী ছিলেন এবং কিরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। এই খাতায় আরো কয়েকটি রাগের প্রকৃতি পরিচয় বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত সঙ্গীত সম্পর্কে নিজের চিন্তা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল এবং এই রচনা সেই ইচ্ছার প্রকাশ। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের তুলনামূলক অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ ও ধারণা এই রচনা থেকে অনুমান করা যায়।
>
> [নজরুল একাডেমী পত্রিকা, হেমন্ত ১৩৯৩ থেকে সংকলিত]

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — সপ্তদশ সংকলন]

শতবর্ষের বাংলা গানে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য

করুণাময় গোস্বামী

আধুনিক যুগের বাংলা গানের যে পঞ্চপ্রধান রচয়িতা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম, এঁদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই বাংলা চতুর্দশ শতকের সন্তান। সে বিবেচনায় ১৪০০ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষে শতাব্দীর পটভূমিতে নজরুলের সংগীত কীর্তির দিকে ফিরে তাকানো খুবই আকর্ষণীয়। শতাব্দীর অন্তিম ফিরে তাকাবার জন্য সময় হিসেবেও খুব উপযুক্ত। সক্রিয় জীবন থেকে নজরুল অন্তর্হিত হয়েছিলেন ৫০ বছর হল। এর মধ্যে নানা রাজনৈতিক সামাজিক ভাঙাগড়া চলেছে, নজরুলের গান নিয়ে নানা নান্দনিক প্রতর্ক হয়েছে ও হচ্ছে। তবে এসবের ভেতর দিয়ে রচয়িতা হিসেবে নজরুলের শক্তির মূল ক্ষেত্রগুলোকেও আমরা সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছি। শতাব্দীর অন্তিমে এসে নজরুলের সংগীত রচনার সুস্থ মূল্যায়নের জন্য আমরা শৈল্পিক নিস্পৃহতাযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে পারি, যা আমাদের সিদ্ধান্তকে দেবে নান্দনিক শ্রেয়োবোধযুক্ত উচ্ছলতা। ১৪০০ সাল নজরুলের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য একটি চমৎকার সময়, এখানে এসে আমরা নজরুলের কাছেও আছি, আবার ৫ দশকের দূরত্বেও আছি, স্মরণ-বিস্মরণের একটি আশ্চর্য কালচক্রও এর মধ্যে অর্ধশতক ধরে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে। সুতরাং খানিক সহজ এখন ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে নজরুলের কর্মপ্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা যেগুলো মানের পরীক্ষার উত্তীর্ণ।

কৈশোরক সংগীতরচনার কথা বাদ দিলে, আমরা নজরুলকে পাই কলকাতায় ১৯২০ সালের মার্চের শেষের দিক থেকে দেশাত্মবোধক সংগীতরচয়িতা হিসেবে। সংগীত রচনায় প্রথম দিককার প্রয়াসগুলোই এমন প্রতিশ্রুতিবাহী হয়ে ওঠে যে, গোটা বাঙালি স্বাধীনতাকামী সমাজ এই তরুণ কবিকে অভিনন্দন জানান তাঁর অগ্নিগর্ভ রচনার জন্য, যা ছিল সেকালে সকলের কাম্য, কিন্তু তেমন গান পাওয়া যাচ্ছিল না। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায়, ততদিনে যথেষ্ট কাজ হয়েছে, বিখ্যাত সব রচয়িতারা আবির্ভূত হয়েছেন সেই ধারায়, কিন্তু বিদ্রোহের এমন প্রমূর্ত বাণী তাঁরা কেউ রচনা করেননি। রচনা করা সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্যমন্ডলী ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িকে কেন্দ্র করে উচ্ছসিত এই ধারায় বিদ্রোহের বিষয়টি এমন তাজা, এমন বিস্ফোরক অবস্থায় ছিলনা। সেখানে একদিকে ছিল বেদনার গান, রোদনের

গান, আর এক দিকে ছিল আশ্বাসের গান, জাগাবার গান, ভাষায় ছিল লালিত্য মিশ্রিত হাহাকার বা পেলব উদ্দীপনা, সুরে মাধুর্য ছিল, আকুলতা ছিল, ভক্তি প্রকাশের নম্রতা ছিল। রুখে দাঁড়াবার প্রচণ্ডতা ছিলনা। জেলখানা শুদ্ধ উপড়ে ফেলার কথা গানে বলা যায় তেমন ভাবতে পারার কোনমাত্র সম্ভাব্যতা আগেকার রচয়িতাদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক ছিলনা। বাংলা স্বদেশী গীত-সাহিত্যের যে ধারাবাহিকতা এবং সেই ধারবাহিকতায় আবির্ভূত নজরুল-পূর্ব রচয়িতাদের যে আর্থ–সামাজিক অবস্থান, তাঁদের যে রাজনৈতিক সংগ্রামবোধ, তাতে এমন ঘটতে পারতো না,

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল পূজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।
....
লাথি মার ভাঙরে তালা
যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা
আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।

এমন বিস্ফোরক গান পূর্ববর্তী ধারায় রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। নজরুলদ্বারা সম্ভব হয়েছিল। একাধিক কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল। যেমন তিনি ছিলেন এই ধারাবাহিক স্বদেশী গীতসাধনার পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা, তাঁর প্রাণে ছিল সেই অগ্নিযুগের আগুন, তাঁর কোনো কায়েমি স্বার্থ ছিলনা। ফলে সহজেই তিনি ইংরেজকে চ্যালেঞ্জ করতে পারলেন, কালের রক্তাপ্লুত খড়গে দুলিয়ে দিতে পারলেন তাঁর রক্তজবার মালা। প্রারম্ভেই তিনি স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিলেন। প্রকৃতপক্ষে সে কালটাই ছিল পূর্ববর্তী কালের চেয়ে স্বতন্ত্র। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন এবং আন্দোলন বিরোধী দমন সেই কালকে পার্থক্যে চিহ্নিত করেছিল।

সেই স্বাতন্ত্র্যযুক্ত কালের প্রতিভু ছিলেন কবি ও সংগীতরচয়িতা নজরুল। বর্তমানের সোপানে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরলে আমরা সুস্পষ্টভাবে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি দেখতে পাই, তদ্দ্বারা নজরুলকে আলাদা করে দেখা যায়। তা বলে নজরুলের এই সাংগীতিক অভ্যুদয় হঠাৎ মিলিয়ে যাবার জন্য দ্রুত উপরে ওঠা ধরনের কোন ঘটনা নয়। নজরুল তার মধ্যে স্থিতিলাভ করেছিলেন। ভাষায়, ছন্দে, সুরে এবং সর্বোপরি এদের মর্মগ্রাহী গ্রন্থনায় তিনি এমন একটি গীতরূপ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা বীর রসাভাসের চিরস্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হতে জানে। এই গান প্রতিরোধের

আকাঙ্ক্ষাকে প্রেরণা দিতে জানে, মানুষকে অসমসাহসী করে তোলে। ১৯৭১ সালের সংগ্রামেও এই গান তার আবেদনের সমগ্রতায় ঝলসে উঠেছে।

এই পর্যায়ে নজরুল অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে। চল্লিশের দশকের সূচনায় সাম্যবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবাহে এই চেতনার গানের নাম হয় গণসঙ্গীত। নজরুল বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন মুসলিম জাগরণমূলক গানে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গানেও নজরুলের মর্মবেদনাই বেজে উঠেছিল সুতীব্র সংগীতে। দীর্ঘ কালের নির্মোহ দূরত্ব থেকে এই ব্যাপারগুলোকে আমরা সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারি। গেল একশ বছরে বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীতের ধারায় যথেষ্ট কাজ হয়েছে। বিখ্যাত সব বাণী রচিত হয়েছে, প্রাণ মাতানো সব সুর রচনা করা হয়েছে। এই সংগীত-আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত রয়েছেন নজরুল, যাকে খুব সহজেই নজরুল বলে সনাক্ত করা যায়। দশকের পর দশক যাঁর গান গভীর উৎসাহের সঙ্গে গাওয়া হয়, অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা যে গানের অব্যাহত থাকে। অন্য সব গানের কথা বাদ দিয়ে একটি মাত্র গান 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু'র কথা যদি উল্লেখ করি, যে গানটির অসামান্য প্রশংসা করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু', দিলীপকুমার রায় এঁরা এই গানটির ভেতর দিয়েই আমরা বাক্‌শিল্পী ও সুরশিল্পী নজরুলের গভীর পরিচয় পাই। এই ধরনের রচনায়ই তাঁর শক্তির সন্ধান মেলে এবং যে-কথা সহজে বলা যায়, এমন চিত্তজয়ী ও কালজয়ী গানও নজরুলের ভান্ডারে অনেক, আক্ষরিক অর্থেই অনেক।

যৌবন ধর্মের এক দিকে বিদ্রোহ, আর এক দিকে ভালবাসা। সে কথারই প্রতিধ্বনি ছিল 'বিদ্রোহী'তে 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।' কবির এই উক্তিই সত্য হয়ে উঠল অত্যন্ত গভীরভাবে, যখন তূর্যবাদন বন্ধ না করেই তিনি গজল রচনা শুরু করলেন এবং একেবারে শুরুতেই সারাদেশকে মাতিয়ে তুললেন এর ব্যতিক্রমী সাংগীতিকতা দ্বারা। এ যে তিনি পারলেন তারও প্রধান কারণ ছিল যে, তাঁর ফার্সি গজলের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি করাচি ব্যারাকে থাকতে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ ব্যাপারটি খুবই চিত্তাকর্ষক, যে দুইজন প্রথিতযশা বাঙালি কবি গজল রচনায় মনোনিবেশ করেন তাঁদের উভয়েরই বঙ্গবহির্বর্তী অভিজ্ঞতা ছিল। অতুলপ্রসাদ সেন গজলের সূত্রপাত করেছিলেন বাংলায়। সেটা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, তিনি লখনৌ থাকতেন বলে। নজরুল যে তাঁর উদগত যৌবনে এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের একটি চমৎকার ক্ষণে করাচি ছিলেন সেটা তার জন্য খুবই প্রেরণাদায়ক হয়েছিল। ফার্সি গজলের পুরো দোলাটা তিনি বহন করে এনেছিলেন সেখান থেকে। সেটাকে তিনি কয়েক বছর লালন করেন, উর্দু গজলের লঘুরাগসংগীতের পটভূমিতে নানাভাবে তাকে তিনি কাজে লাগিয়ে দেখেন। তার পর, অর্থাৎ একটা উল্লেখযোগ্য সংগীতিক প্রস্তুতির পর মনোযোগ দেন তিনি গজল

রচনায়। বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের ইতিহাসে সূচিত হলো গজল যুগ। ১৯২৬ সনের শেষের দিক থেকে ধরলে আজো পর্যন্ত নজরুল এই ক্ষেত্রটিতে একক মহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন। তার এই স্থানটিকে আর কেউ বিচলিত করতে পারেননি। কেন যে পারেননি সেটা ভাববার বিষয়। নজরুলের সমকক্ষ হওয়া, বা তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা না ঘটলে আশ্চর্য হবার থাকেনা, কিন্তু এই ফলদায়ক ধারাটিকে অন্য কেউ তেমনভাবে অগ্রসর করে নিতেই এগিয়ে এলেননা, এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। এর নানা ধরনের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করার চেষ্টা আমি করেছি। সর্বপ্রধান যে যুক্তি আমার, তাতে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, নজরুল-পরবর্তী বাঙলা গানের যুগ গজল রচনার উপযুক্ত কাল নয়। গজল কবির কীর্তি। কিন্তু নজরুলের সমকালেই নাগরিক বাংলা গানের ধারা থেকে প্রধান কবিরা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেন এবং ক্রমে এই বিচ্ছিন্নতা পাকাপাকি হয়ে যায়। আসেন গীতরচয়িতা গীতিকবি। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের এই যুগসন্ধিক্ষণে নজরুল গজল রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নজরুলই বাংলা কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রতিনিধিত্বশীল কবি। কবিদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরিণামেই এই ধারাটির বিস্তার ঘটেনি। এখন আমার মনে হয় প্রধান কারণ এ-ও নয়। প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বাংলা গানের প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে কাজ করার জন্য এমন একটা বাংলাবহির্বর্তী প্রেরণার প্রয়োজন যা সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে। যে প্রেরণা নজরুলের ছিল, অতুলপ্রসাদের ছিল। নজরুলের পরেও প্রতিভাবান বাঙালি গীতিকবি বা সুরকার আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা গজলের পথে যাননি। কিন্তু নজরুল যে ধারাটি সূচনা করেছিলেন সেটি শিল্পের বিচারে অত্যন্ত সফল ছিল। এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক ও একচ্ছত্র হয়ে থাকা ঐতিহাসিকভাবে নজরুলের জন্য গৌরবের, কিন্তু বাঙালির সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিষয়টি উদ্বেগের।

শতাব্দীর অন্তিমে এসে নজরুলের রাগসাংগীতিক অর্জনের দিকে ফিরে তাকালে ব্যাপারটা সমসাময়িকদের কাছে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে, এখনো তেমনি মনে হয়। বাংলা কাব্যসংগীতের ধারায় রাবীন্দ্রিকরীতি প্রতিষ্ঠার ফলে এই গান সুরসমুচ্ছল জনপ্রিয় সাংগীতিকতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে মনে হচ্ছিল। বাংলা শীলিত সংগীত একটি সীমাবদ্ধ শ্রেণীর প্রাণের আয়াসের বিষয়ে পরিণত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু নজরুল এই প্রবণতাটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরিয়ে দিলেন জনপ্রিয় সাঙ্গীতিকতার দিকে এবং এটিই হয়ে উঠল বাংলা কাব্যসঙ্গীতের প্রধান ধারা। বেতার, রেকর্ডপ্রতিষ্ঠান ও সবাক চিত্রকে কেন্দ্র করে সুর সৌকুমার্যময় বাংলা গানের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সে-যুগে তার প্রধান প্রেরণা এসেছিল কাজী নজরুল ইসলামের রাগসঙ্গীতানুগ সুরসমুচ্ছল সঙ্গীতরীতি থেকে। এ নিয়ে নজরুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর নবরাগরচনা, লুপ্তপ্রায় রাগসমূহের পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি সেই নিরীক্ষামূলক প্রবণতারই পরিণাম। তবে এই নিরীক্ষামূলক প্রয়াস থেকে যে সঙ্গীতধারাটির উদ্ভাস ঘটে সে

হচ্ছে রাগপ্রধান বাংলা গান। রাগসঙ্গীতের বহুমুখী বিকাশের ক্ষেত্রে রাগপ্রধান বাংলা গানের সংযোজনকে বাঙালির বিশেষ অবদান হিসেবে গণ্য করা হয়, আর নজরুল ছিলেন সেই ধারার জনকতুল্য। রাগ সঙ্গীত অবলম্বনে নজরুলের নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকেই এই ধারার সূত্রপাত। এই সঙ্গীতরূপটি বিশুদ্ধসঙ্গীত ও কাব্যসঙ্গীতের মধ্যবর্তী একটি ব্যাপার। এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতকে কাব্যানুবর্তী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আরও আগে নিধু বাবু যখন হিন্দুস্তানী টপ্পার ধারা থেকে খানিক সরে এসে বাংলা টপ্পারীতির প্রবর্তন করেন, তখন তিনিও কিন্তু এমনি একটি সাঙ্গীতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানী টপ্পার বিশুদ্ধসঙ্গীতের রীতিকে বাংলা বাণীর রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। ফলে হিন্দুস্তানী টপ্পার বাহবা প্রাপ্ত সুরের লাফ ঝাঁপ আর বাংলা গানে এসে দাঁড়ায়নি। বাণী বন্ধের মর্মবস্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মর্মবেদনাকে দানাদার দোলায়িত বিস্তারের সাহায্যে তীব্র করে তোলাই হয়েছে সেই সাঙ্গীতিকতার আদর্শ। রাগপ্রধান গানেও সেকাজই করা হয়েছে। তান-গমক-গিটকিরি সারগামের উপস্থাপন বাহুল্যে এখানে রাশ টানা হয়েছে, বাণীর ব্যঞ্জনাকে তীব্র করে তোলার ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিধু বাবুর রচনায় যেমন নবভাবে হিন্দুস্তানী টপ্পাকে পাওয়া গিয়েছিল, নজরুলের রাগপ্রধানেও নবভাবে পাওয়া গেল খেয়াল সঙ্গীতরূপকে, কেননা মূলত খেয়ালের ভিত্তিতেই রাগপ্রধান গান রচিত হয়েছিল। ক্রমে অবশ্য এর সীমা বিস্তৃত হয়। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতরীতির এই বঙ্গীয়করণে নজরুলের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছ।

বাংলা ভক্তিসংগীতের ধারায়ও নজরুলের অবস্থান স্বাতন্ত্র্যময়। তিনি আধুনিক ইসলামী সংগীতের প্রবর্তক। আধুনিক জীবন, কাব্য ও সঙ্গীতমনস্ক মুসলমান সমাজের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী কোন ভক্তিসংগীত এর আগে বাংলায় ছিলনা। কাজী নজরুল ইসলাম এই ধারাটির সূচনা করেন এবং এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরূপটিও অদ্যাবধি তাঁর রচনাতে প্রতিফলিত। অপর দিকে হিন্দুধর্মসংগীতের রচয়িতা রূপেও তিনি বাংলা গানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। হিন্দুধর্মসংগীত পর্যায় নজরুল রচনায় এমন বিস্ময়করভাবে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় যে তাতে স্তম্ভিত না হওয়ার উপায় থাকে না। অপর কোন বাঙালি ভক্তিসংগীত রচয়িতার কর্মে হিন্দুধর্ম সম্পৃক্ত বিষয়াদির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ ঘটেনি। তাছাড়া অপর একটি বিষয়েও এখানে ঐতিহাসিক কারণটি উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম সঙ্গীতের চাপে তখন আবহমান হিন্দু ধর্মসঙ্গীতের ম্রিয়মান অবস্থা। ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম নির্বিশেষে বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতারা তখন এই নব সঙ্গীতরূপে অর্থাৎ ব্রাহ্ম সঙ্গীতরূপে নিবিষ্ট। ঠিক এই সময়ে নজরুল প্রবলভাবে তুলে ধরলেন আবহমান হিন্দুধর্মসঙ্গীতের শাখাগুলোকে। অসাধারণ সব শ্যামা ও শ্যামসঙ্গীত রচনা করলেন তিনি। বাংলা কাব্যসঙ্গীতের এই আবহমান ধারাগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পঞ্চাশ বছর, শতাব্দী বা তারও বেশি

কালদূরত্ব থেকে বাংলা গানের ইতিহাসের যে কোন পাঠক এই ঘটনাবলীর ওপর দৃষ্টিপাত করলে বিস্ময়বোধ করবেন এ ভেবে যে, একক চেষ্টায় কত অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

আধুনিক বাংলা গান নামে খ্যাত সঙ্গীতরীতির প্রবর্তনে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অতীব উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই গীতিধারা প্রতিষ্ঠায় প্রধান প্রেরণা তাঁর রচনা থেকেই এসেছিল। জনরুচির পরিপ্রেক্ষিতে জনবোধ্য, জননন্দন সঙ্গীত রচনাই ছিল আধুনিক গীতধারার প্রধান প্রবণতা। নজরুল-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনচিত্তমনস্কতা। জনহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে অতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত করতে জানতেন বলেই নজরুলের গান এমন বিপুলভাবে শ্রোতৃচিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। এই অর্থে আধুনিকতাই নজরুল ইসলামের সঙ্গীতপ্রতিভার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে বেতার, গ্রামোফোন রেকর্ড, সবাক চিত্র প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জননন্দন সঙ্গীত রচনার এই ধারা যখন গড়ে উঠতে থাকল, তখন অতি অনায়াসে তিনি তার নেতৃত্ব দিতে পারলেন। বাংলা প্রেমের গানের একটি অসাধারণ পর্ব নজরুলের 'আধুনিক গান' শ্রেণীর রচনাকে কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।

নজরুল বাংলা প্রীতিগীতিকে যৌবনস্পৃষ্ট মানুষের হৃৎস্পন্দনে আকুল করে তুলেছিলেন। এ গান যথার্থই সাধারণ মানুষের হৃদয়সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। নজরুল ইসলামের অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের বিপুলায়তন প্রেমসংগীতের প্রতি সাধারণ শ্রোতৃহৃদয় আন্তরিকভাবে সাড়া দিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতে নরনারীর ভালবাসা এতটা দর্শনায়িত হয়ে পড়েছে, বা এতটা আকাশচারী হয়ে পড়েছে যে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে তাতে সাড়া দেওয়া কঠিন। কোথাও কোথাও অনুভবের প্রকাশ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রেমের গানে ও পূজার গানে পার্থক্য করা কঠিন। কিন্তু নজরুলের প্রেমের গান যথার্থই মানুষের যৌবন বেদনার গান। উচ্ছ্বাসে, অনুরাগে, বিফলতায় যে গান গৃহবাসী মানুষের অনুভব ও স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। এর সুর দ্রুতগতিতে শ্রোতৃচিত্তকে চঞ্চল করে তোলে, তালছন্দে হৃদয় দোলে। সার্বজনীন হৃদয়সঙ্গীত হওয়ার সকল উপাদানই এই সঙ্গীতে বর্তমান। এই জন্যেই বিশেষ করে সবাক বাণীচিত্র ও রেকর্ড কোম্পানি সমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলা আধুনিক গান বা আধুনিক প্রেমের গানের সুবর্ণপ্রস্থ ধারাটির প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃত্ব নজরুলের কাছ থেকে আসা সহজ হয়েছিল।

আধুনিক লোকসঙ্গীতানুগ সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও নজরুল যে বিশিষ্ট অবদান রেখেছিলেন সে কথা সহজে কারো মনে আসার কথা নয়। কেননা তিনি বাংলাসঙ্গীতকে অতি বিপুলভাবে অবলম্বন করেছিলেন। নজরুল বলতেই গজল, নজরুল বলতেই ঠুংরি বা খেয়াল, বা রাগসঙ্গীত ভাঙা সব আশ্চর্য সুরকণা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, ত্রিশের দশকে এসে চলচ্চিত্র, রেকর্ড কোম্পানি ও বেতার সংস্থাকে কেন্দ্র করে

বাংলা লোকসংগীতের আধুনিক প্রয়োগের যে একটি ধারা গড়ে উঠতে শুরু করে, তা নজরুলের অবদানে সমৃদ্ধ হয়। তিনি বাংলা লোকসংগীতকে নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করার ভাবনায় বেশ কিছু দৃষ্টান্তস্থানীয় কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের লোকসঙ্গীতানুগ রচনায় বাউল প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু নজরুল ইসলাম ঝুমুর, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, ঝাপান প্রভৃতি নানা ধরনের সঙ্গীতরূপ অবলম্বনে গান রচনা করে এই ধারাটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিলেন। বৈচিত্র্যবোধ যে তাঁর প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, লোকসঙ্গীতানুগ গানের রচনায়ও প্রমাণিত হয়। ঝুমুরের আড় দোলাটির প্রতি তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল। থাকা স্বাভাবিক, কেননা—পঞ্চ প্রধান বাঙালি সঙ্গীত রচয়িতার মধ্যে তিনিই ঝুমুর এলাকার অধিবাসী। লোকসঙ্গীতানুগ বাংলা গানে আধুনিক গীতোচিত ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ব্যাপারেও নজরুলকে আমরা পথিকৃতের ভূমিকায়ই দেখতে পাই।

এখন ভাবা যেতে পারে, সঙ্গীতরচয়িতারূপে নজরুলের স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রগুলো কি এবং ১৪০০ সালে এসে সেগুলোকে কিভাবে দেখা যাচ্ছে। গানের প্রধান যে-দুই উপাদান বাণী ও সুর, উভয় ক্ষেত্রেই নজরুল-স্বতন্ত্র চিহ্নিত। প্রথম এবং প্রধান ব্যাপারটিই হচ্ছে, এ যে নজরুলের বাণী ও সুর তা শোনা মাত্রই বোঝা যায়। এটা একটা খুবই বড় ব্যাপার। ত্রিশের দশকে বাঙালি সঙ্গীতরচয়িতার একটা মিছিল দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যে নজরুল আছেন আপন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়ে, পড়ামাত্রই বোঝা যাচ্ছে, শোনামাত্রই বোঝা যাচ্ছে, এবং আজো পর্যন্ত, তা যেমন ছিল তেমনি আছে, বলতে হয় না এই যে নজরুল এইখানে, তিনি উপস্থিত। খুব বড় প্রতিভা ছাড়া এমন হয় না, কোথাও কোনকালেই হয়নি। বড় প্রতিভারই থাকে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব যা বাকরীতিতে গ্রথিত হয়ে যায়। বড় সুরকারের থাকে একধরনের ব্যক্তিত্ব যা সুর রচনার রীতিতে চিহ্নিত হয়ে থাকে। নজরুলে তা হয়েছে। তিনি তাঁর সুর রচনার বেলায় খেয়াল, ঠুংরি ও গজলের চালগুলো এমনভাবে সাক্ষাতে বা ভেঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যা তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। আবেগ প্রকাশের যে-সাক্ষাৎ প্রবল ভঙ্গিটি এর সঙ্গে গ্রথিত করেছেন তা তাঁকে অন্যদের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। জীবনঘনিষ্ট ভাষা, যার কেন্দ্রে রয়েছে জীবনঘনিষ্ট অনুভব, তা নজরুলের প্রকাশরীতিকে সর্বতোগ্রাহ্য করে তুলেছে। এই কথাগুলো ১৩৩০ সালে সত্য ছিল, ১৩৩১ সালে ১৩৩৫ সালে সত্য ছিল ১৪০০ সালে এসেও তেমনি সত্য রয়েছে। মধ্যবর্তীকালে শত সহস্র বাংলা গান রচিত হয়েছে, সেগুলো বিস্মৃতির ফলে লুপ্ত হয়ে গেছে। নজরুলের গান যে লুপ্ত হয়নি, তাঁর গান প্রবলতরভাবে আমাদের সামনে আসছে, সেখানেই তাঁর শক্তি। এ কাউকে আনতে হয়নি, আপনি এসেছে; আমরা আমাদের তাড়নায় তাঁকে অবলম্বন করেছি। এখনো নজরুলের সঙ্গীতকর্মের সৌন্দর্যের সামগ্রিক ভাণ্ডারটি উদঘাটিত হয়নি। আমরা সঠিক জানিইনা এখনো যে নজরুলের

সমগ্র ব্যাপারটি কেমন। আমাদের হচ্ছে বেলাভূমিতে মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। সমুদ্র রয়েছে সামনে। ১৪০০ সালে কবির জন্মদিনের উদ্দীপনা আমাদের সামনে তাঁর সঙ্গীতসমুদ্রের সামগ্রিক রূপটি অবারিত করুক।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — ষোড়শ সংকলন]

নজরুল-সঙ্গীত ঃ কিছু বিভ্রান্তি

আবদুস সাত্তার

১০ এপ্রিল, ১৯৬৯ সাল। ঢাকার ফকিরাপুলস্থ আমার বাসভবন 'শিল্পী-কুটির'এ পুরানো দিনের গানের আসর বসেছে,

প্রিয়তম এসো ফিরে
রহিবে কি দূরে দূরে
ভুলি মোরে চিরতরে
ভাসাইয়া আঁখি নীরে।

গ্রামোফোন রেকর্ড বেজে চলেছে, আর তন্ময় হয়ে শুনছেন কমল দাশগুপ্ত। গ্রামোফোন লয়-এর মিটার (কাঁটা) ৭৮-এর পরিবর্তে ৭৭ করা ছিল পুরানো গানটিকে উপভোগ্য করার উদ্দেশ্যে। টুইম কোম্পানীর এফ. টি ৩৪৩৮ নম্বর রেকর্ডটি প্রতি মিনিটে ৭৮ বার ঘূর্নন গতিসম্পন্ন। হলুদ লেবেলযুক্ত ১০ ইঞ্চি 'ডবল সাইডেড' রেকর্ডে ইংরেজীতে লেখা 'মডার্ণ' এবং গায়কের নাম ঃ 'মাষ্টার কমল'। কৌতুহলের ব্যাপার, গানটি রেকর্ডকৃত হবার ৩৫ বছর পরে কণ্ঠশিল্পী কমল দাশগুপ্ত তাঁর নিজের কণ্ঠের গান নিজেই উপভোগ করছেন এক অপূর্ব ভাবাবেশে। বলাবাহুল্য, তাঁর নিজের গাওয়া এই গানটি তাঁর স্মৃতি থেকে কবে যে মুছে গেছে তা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। তাই তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, 'স্মৃতি মানুষকে প্রতারিতও করে'

রেকর্ডে গানটির রচয়িতার নাম নেই। চলতি শতকের পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি গবেষকদের কাছে আবিষ্কৃত হলো গানটির গীতিকার-সুরস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। 'মডার্ণ' নামকরণে টুইন কোম্পানীর এই দ্বিতীয় রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। 'মডার্ণ' বলতে 'আধুনিক গান' অথবা 'কাব্যগীতি', এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। পূর্ববর্তী রেকর্ডেও রয়েছে কাজী সাহেবের গান,

কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ!

গানটি রেকর্ড করেন প্রখ্যাত সুরকার ও গায়ক কমল দাশগুপ্তের ভগ্নী শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্তা। এ রেকর্ডে (এফ. টি. ৩৯৩৭) গানের কোন শ্রেণী বিভাগ (মডার্ণ বা কাব্যগীতি...) উল্লেখ নেই। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত নজরুলের 'গানের মালা'

পুস্তকে গানটির রাগ 'বেহাগ মিশ্র' এবং তাল 'দাদরা' হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত 'নজরুল গীতি অখণ্ড' গ্রন্থে (আবদুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত) উল্লেখিত গানটি 'কাব্যগীতি' পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হিজ মাষ্টারস ভয়েস কোম্পানীর এন ৭২২৮ নম্বর রেকর্ডে একই বছর (১৯৩৪) কুমারী পারুল সেন রেকর্ড করেন নজরুলের দু'টি মডার্ণ গান,

(১) আসে রজনী সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে।

(২) এল এলরে বৈশাখী ঝড় এল এলরে।

স্মরণ করা যেতে পারে, বাংলা গানের ভুবনে 'মডার্ণ' তথা 'আধুনিক গান' নামকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সঙ্গীত-বিভাগ সংযোজন করেন সঙ্গীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম।

এমনি এক সময়ে কমল দাশগুপ্ত তাঁর বন্ধু নবীন গীতিকার প্রণব রায়কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন কাজী সাহেবের সঙ্গে। উদারমনা কাজী নজরুল ইসলাম প্রণব রায়কে 'আধুনিক গান' রচনায় উৎসাহিত করলেন। প্রণব রায় লিখতে শুরু করলেন বাংলা গান (আধুনিক)। তাঁর একটি গান,

সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে
এসেছি ভুলে।

এই আধুনিক গানটি রেকর্ড করেন (এন. ৭২৯৭) নবীন গায়িকা যুঁথিকা রায় (রেনু), সুরারোপ করেন কমল দাশগুপ্ত। উল্লেখ্য, গানটি সে সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উল্লেখনীয় যে, পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্নেহ ও সহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ কবির নিজের বেশ কিছুসংখ্যক গানের রেকর্ডের এক পৃষ্ঠে প্রণব রায়ের গানও রেকর্ড করেন। এ-ধরনের একই রেকর্ডে (হিজ মাষ্টারস ভয়েস) কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রণব রায়ের গান-এর একটি তালিকা এখানে মুদ্রিত হলো,

কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রণব রায়ের গান একই রেকর্ডে
(হিজ মাষ্টারস ভয়েস)

রেকর্ড নম্বর	নজরুলের গান	প্রণব রায়ের গান
এন. ৭৩৬৫	আঁধার রাতে তিমির দোলে	সখি আজো সেই চাঁদ আনে রূপালি স্বপন
এন. ১৭৩৯৮	আমার মালায় লাগুক তোমার	প্রিয় আমি যবে রব না কাছে
এন. ২৭০০৫	বনের তাপস কুমারী আমি গো	চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয় (ঢাকা বেতার ও টিভি থেকে প্রচারিত)

এন. ২৭০২৫	এখনও ওঠেনি চাঁদ	কেন এ হৃদয় নিজেরে লুকাতে চায়
এন. ২৭১১২	না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা	মন নিয়ে প্রিয় যেয়ো না চলে
এন. ২৭১৯২	মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে	এখনো সময় আছে
এন. ২৭৩৩১	স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর	ধীরে ধীরে বউ কথা কও ডাকে বনেরে
এন. ২৭৪৭১	তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর	কতদিন দেখিনি তোমায় (রাজশাহী বেতার থেকে প্রচারিত হয়)/১৯৭০
এন. ২৭৫২৪	গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়	কণ্ঠে আমার নিশি দিন (ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত/১৯৬৯)

বস্তুতঃ ১৯৩৫ সাল থেকেই বাংলা 'আধুনিক' গানের বিশেষ প্রচলন শুরু হয় এবং তা ব্যাপক পরিচিতিও লাভ করে। এই সময়ে আধুনিক গানের জগতে আবির্ভাব ঘটে অনেক খ্যাতনামা গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠশিল্পীর। সঙ্গীতে গুণীজনের অভিমত, বর্তমান শতকের চল্লিশ দশকেই বাংলা গানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর পেছনে কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর স্নেহভাজন ও সান্নিধ্য-ধন্য গীতিকারদের অবদান অবিস্মরণীয়।

আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের নতুন সৃষ্টির ধারা শেষ হয়ে গেছে, তারও আগে শেষ হয়েছে রবীন্দ্রধারা, অতুল প্রসাদের গান, দ্বিজেন্দ্র-গীতি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে, বেতার-রেকর্ড কলকাতাকেন্দ্রিক এবং ঢাকা বেতার-কেন্দ্রিক আধুনিক গান সৃষ্টি হয়ে চললো পুরাতনের কিছু ঐতিহ্য নিয়েই। আর এই ধারা বহন করে যারা গীতিকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন— প্রণব রায় তাদের অন্যতম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সালের দিকেই প্রণব রায়ের গানের স্বরলিপি পুস্তক 'পরিচিতা' প্রকাশিত হয়। এর অন্তর্গত গানগুলির সুরকার কমল দাশগুপ্ত। নজরুল সান্নিধ্য-ধন্য প্রণব রায়ের রচনায় এবং কমল দাশগুপ্তের সুর-সংযোজনায় কাজী নজরুলের গানের ও সুরের যথেষ্ট ছাপ প্রতিফলিত হয়। ফলে প্রণব রায়ের রচিত কিছু গান বাণী ও সুরের নিরিখে নজরুলের গান বলে গণ্য হয়। সাম্প্রতিককালে এসব গান প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তকে।

প্রণব রায়ের রচিত গান নজরুল-সঙ্গীত হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, এরূপ কিছু গানের একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো,

প্রণব রায়ের গান–যা নজরুল-সঙ্গীত হিসেবে প্রকাশিত

	প্রণব রায়ের গানের প্রথম পংক্তি	যে পুস্তকে প্রকাশিত	প্রমাণ সূত্র/মন্তব্য
১।	তোমার আকাশে এসে– ছিনু হায় আমি কলঙ্কী চাঁদ	(ক) নজরুল-গীতি-১ম খণ্ড (নজরুল একাডেমী, ঢাকা) (খ) নজরুল-সুর সংকলন (স্বরলিপি ঃ এ, এইচ, সাইদুর রহমান)	হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডে নম্বর এন. ২৭৪৫৯
		(গ) নজরুল-গীতি অখণ্ড (আব্দুল আজিজ আল্ আমান) (ঘ) গীতি-সংকলন ১ম খণ্ড (রফিকুল ইসলাম/ বাংলা একাডেমী)	নজরুল-সঙ্গীত হিসেবে প্রচারিত হয়, রাজশাহীবেতার ২২/৯/৭০
		(ঙ) নজরুল রচনা-সম্ভার ৫ম ও ৬ষ্ট খণ্ড (হরফঃ কলিকাতা) (চ) নজরুল-গীতি ৩য় খণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান)	ঢাকা বেতার ১২/৬/৮৫
২।	পাখী জাগে ফুল জাগে আজি রাতে	নজরুল-গীতি ৪র্থ খণ্ড (নজরুল একাডেমী, ঢাকা)	'পরিচিতা' (প্রণব রায় রচিত গানের স্বরলিপি-পুস্তক)
৩।	আমি যদি কভু দূরে চলে যাই	(ক) নজরুল-গীতি ৪র্থ খণ্ড (নজরুল-একাডেমী ঢাকা (খ) নজরুল-গীতি ৪র্থ খণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান) (গ) নজরুল-গীতি অখণ্ড (ঐ) (ঘ) নজরুল রচনা–সম্ভার ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঐ/ হরফ, কলিকাতা) (ঙ) গীতি-সংকলন–১ম খণ্ড (বাংলা একাডেমী)	ঢাকা-বেতারের অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তি ঃ তারিখ ১৭/১০/১৯৬৯ প্রণব রায় রচিত গানটি নজরুল সংগীত হিসাবে প্রচার বন্ধ করা হয়। পূর্বের প্রচারিত তারিখ ২২/৫/১৯৬৯

৪। ওরে ও বিদেশী বন্ধু (রেকর্ডে গীতিকারের নাম উল্লেখ নেই)	'গীতি-আলেখ্য' স্বরলিপি পুস্তক (কাজী অনিরুদ্ধ)	আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি অখণ্ড গ্রন্থে' গানটি প্রণব রায় রচিত বলে উল্লেখিত
৫। শ্যামল সুন্দর প্রিয়তম হেরি একী অপরূপ রূপ রাশি	(ক) নজরুল রচনা-সম্ভার ১ম খণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান) (খ) নজরুল-গীতি অখণ্ড (সম্পাদনা–ঐ) হরফ প্রকাশনী (গ) নজরুল-গীতি ৬ষ্ঠ খণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান)	এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নম্বর ৭৪৯২-এ গীতিকার প্রণব রায়
৬। সিন্ধুর কল্লোল ছন্দে ত্রিশ কোটি সন্তান বন্দে	নজরুল-গীতি ১ম খণ্ড (নজরুল-একাডেমী, ঢাকা)	নজরুল-গীতি অখণ্ড গ্রন্থে গানটির গীতিকার প্রণব রায় বলে উল্লেখিত
৭। ফিরিয়া ডেকোনো মহুয়া বনের পাখী	নজরুল-গীতি, ৫ম খণ্ড (ঐ)	–ঐ–

প্রণব রায়ের আরো কিছু গান রয়েছে, যেগুলি এদেশের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র এবং টেলিভিশন থেকে প্রচারিত হয়ে থাকে। 'নজরুল-গীতি' হিসেবে বেতার-টেলিভিশনে প্রচারিত প্রণব রায়ের রচিত গান-এর একটি ছোট্ট তালিকা এখানে প্রদান করা হলো,

নজরুল গীতি হিসাবে বেতার-টেলিভিশনে প্রচারিত প্রণব রায়ের গান ঃ

প্রণব রায়ের গান	বেতার-টিভি থেকে প্রচারিত
১। মন দিয়ে প্রিয় যেয়ো না চলে (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নং এন, ২৭১১২ দ্রঃ)	ঢাকা বেতারে প্রচারিত ১২/৫/১৯৬৭
২। কত দিন দেখিনি তোমায় ('পরিচিতা' স্বরলিপি পুস্তক দ্রঃ)	রাজশাহী বেতার ঃ ১৫/৯/১৯৭০
৩। কবে প্রিয় এসেছিলে চাঁদ হয়ে ('দৈনিক ইত্তেফাক'	ঐ ৬/১০/১৯৭০

৮/২/১৩৭৬ দ্রঃ)	
৪। এসেছিল মধুযামিনী দুটি জীবনে (ঢাকা বেতারের আভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তি (১৭/১০/১৯৬৯) দ্রঃ)	ঢাকা বেতারঃ ১৫/১০/১৯৭০ ঢাকা টেলিভিশন ঃ ৭/৯/১৯৭২ (হিন্দোল অনুষ্ঠান)
৫। জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নং এন, ২৭২৩৫ দ্রঃ)	সঙ্গীত শিক্ষার আসর রাজশাহী, ১৯৭৫
৬। তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন (এন, ২৭৪৬৮) 'পরিচিতা'	খুলনা বেতারঃ ২৮/১১/১৯৮৫

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রণব রায় ছাড়াও আরও অনেক খ্যাতিমান গীতিকার, এবং কমল দাশগুপ্ত ছাড়াও আরো বহু প্রবীণ সুরকার কলকাতার সাত-আটটি রেকর্ড কোম্পানীর মাধ্যমে বাংলা গানে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এছাড়া, সুরকারদের মধ্যেও অনেকে রয়েছেন যাঁরা কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গানেও সুরারোপ করেছেন। এই প্রেক্ষিতেই, কাজী নজরুল ইসলামের রচিত অনেক গান যেমন অন্যের রচিত বলে চালু হয়ে গেছে, তেমনি অন্যের রচিত অনেক গানও আবার কাজী নজরুল ইসলামের নামে চালু হয়েছে। এখানে গানের কিছু তালিকা পেশ করা হলো,

নজরুল-সঙ্গীত হিসেবে প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিকারের গানঃ

গানের প্রথম কলি	গীতিকার	যে গ্রন্থে প্রকাশিত
১। খুঁজে দেখা পাইলে যাহার পরাণ তবু আছে বলে (প্রকাশিত গানের বাণীতে ৬টি শব্দের গরমিল পরিলক্ষিত হয়)	'নজরুলের রচনা নয়' বলে উল্লেখিতঃ নজরুল গীতি অখণ্ড (আবদুল আজীজ আল্ আমান)	১। নজরুল-গীতি-১ম খণ্ড (নজরুলএকাডেমী, ঢাকা)। টুইন কোম্পানীর এফ. টি. ৩৭৪ নম্বর রেকর্ডে গীতিকারের নাম উল্লেখ নেই। গানটি কাজী নজরুলের নয়, তার কারণগুলি গবেষণায় মেলেঃ ১। টুইন কোম্পানীতে কাজী সাহেবের প্রথম রেকর্ড ৮৪৭ ২। রেকর্ডকৃত গানের গায়ক হরিপদ রায় কাজী নজরুলের কোন গান রেকর্ড করেছেন ব'লে জানা যায় না।

২। মেঘে আর বিজুরীতে মিশায়ে কে রচিল তনুখানি তোর	ঐ	২। নজরুল-গীতি-২য় খণ্ড (নজরুল একাডেমী, ঢাকা) ১৯৬৭ সালে কলকাতা বেতার থেকে গানটি নজরুল গীতি হিসেবে প্রচারিত হয়।
৩। শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে	ঐ	৩। নজরুল-গীতি ২য় খণ্ড (নজরুল একাডেমী, ঢাকা) ৪। নজরুল রচনাবলী-৪র্থ খণ্ড (বাঙলা একাডেমী) ৫। নজরুল সুরসুধা-২ স্বরলিপি পুস্তক ঃ সুরাইয়া খলিল) গানটি টুইন কোম্পানীর এফ, টি ৬৭৩ নম্বর রেকর্ডে গীত। এসময় এই কোম্পানীতে কাজী নজরুলের কোন গান রেকর্ড হয়নি।
৪। আজ আগমনীর আবাহনে কী সুর উঠেছে বেজে	হীরেন বসু (নজরুল-গীতি অখণ্ড দ্রঃ)	৬। নজরুল-সুর সুধা-২য় খণ্ড (সুরাইয়া খলিল) ৭। নজরুল -গীতির-৩য় খণ্ড (নজরুল একাডেমী, ঢাকা)
৫। আবেশ আমার যায় উড়ে কোন ফাল্গুনী ফুলবনে	সুবোধ পুরকায়স্থ (নজরুল-গীতি অখণ্ড)	৮। নজরুল-গীতি-৩য় খণ্ড নজরুল একাডেমী, ঢাকা)
৬। ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই। (হিন্দুস্থান রেকর্ড নং এইচ১১ কণ্ঠঃ শচীনদেব বর্মন	হেমেন্দ্র কুমার রায় 'ঝিনুক' পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৭৭	৯। নজরুল-গীতি—৩য় খণ্ড ঐ দ্রঃ 'আমার জীবনে আমি' শীর্ষক প্রবন্ধ, শচীন দেব বর্মন।

বিভিন্ন গীতিকারের গানঃ

গানের প্রথম কলি	গীতিকার	যে পুস্তকে প্রকাশিত
৭। তোর নাম গানেরই দীপক রাগে ধুপের মতন জ্বালো	সুশীল ঘোষ (এইচ, এম, ভি.	১০। নজরুলগীতি—৪র্থখণ্ড (নজরুল একাডেমী, ঢাকা)

মোরে।	রেকর্ড নম্বর ২৭৪৪৪ দ্রঃ)	১১। নজরুল-গীতি—৩য় খণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান) ১২। নজরুল-গীতি অখণ্ড (হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা) ১৩। নজরুল-রচনাবলী –৪র্থ খণ্ড (বাঙলা একাডেমী)
৮। তোমার সাথে হলো আমার গানের পরিচয়	নিহার বিন্দু সেন (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নম্বর ১৭৩২০ দ্রঃ)	১৪। নজরুল রচনা-সম্ভার –১ম খণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান) (হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা) বিগত ২৩/১২/–১৯৮৫ ঢাকা বেতারে প্রচারিত
৯। বকুল গন্ধে উতল হ'ল দখিন হাওয়া	ধীরেন মুখোপাধ্যায় (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নম্বর ৭৩৫০ দ্রঃ)	১৫। নজরুল রচনা-সম্ভার ৭ম খণ্ড, এবং ১৬। নজরুল-গীতি অখণ্ড (আব্দুল আজীজ আল্ আমান)
১০। মাধবী রাতে মম মন বিতানে মল্লিকা মঞ্জরী-গুঞ্জরে হায়	অনিল ভট্টাচার্য (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড ৯৯১৯ দ্রঃ)	১৭। নজরুল সুর-সুধা –২য় খণ্ড (স্বরলিপিকার ঃ সুরাইয়া খলিল)

বিভিন্ন গীতিকারের গান
নজরুল-গীতি হিসেবে প্রচারিত

গানের প্রথম কলি	গীতিকার	প্রচার মাধ্যম
১। আজ ভোরে মোর ঘুম ভাঙালে	ধীরেন মুখোপাধ্যায় (১৯৩০ সালের শারদীয় পূজায় নূতন প্রকাশিত গ্রামোফোন রেকর্ডের তালিকা দ্রঃ)	আকাশবাণী,কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত ঃ ১৩/৪/১৯৬৯ ঢাকা থেকেও প্রচারিত ১৯৬৯ 'নজরুল-নির্দেশিকা' (বাঙলা একাডেমীর প্রকাশনা) গ্রন্থে নজরুল-গীতি হিসেবে উল্লেখিত
২। আজ যদি গো নীরব রহি	হৃদয় রঞ্জন রায়	ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত ঃ ১০/১০/১৯৬৮ আকাশবানী, কলকাতার ২৮/১১/৬৮ 'সংবাদ

		১। প্রচার। ঘোষিত হয়। সাহেবের রচনা হৃদয় রঞ্জন রায়। গান উল্লেখ ক'রে বিরূপ মন্তব্য হয়
৩। ও তুই যারে আঘাত হান্‌লিরে মনে	জসীমউদ্দীন ('আব্বাস উদ্দীনের গান' পুস্তক দ্রঃ)	রাজশাহী বেতারে প্রচারিত হয় ঃ ৮ই মার্চ, ১৯৬৬
৪। তুমি যে গিয়াছ, বকুল বিছানো পথে	অজয় ভট্টাচার্য ('সুরের লিখন' স্বরলিপি পুস্তক দ্রঃ)	রাজশাহী বেতার থেকে প্রচারিত ঃ ১২ই সেপ্টেম্বর ও ১৩ই অক্টোবর, ১৯৭০
৫। ওরে ও কাজলা দিঘীর জল	মোহিনী চৌধুরী (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নম্বর এন, ২৭৫৬৫ দ্রঃ)	তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আই-য়ুব খানের সম্মানার্থে নজরুল একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে (হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল–২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮) গীত হয়
৬। নতুন ফাগুন যবে আজি ধরা চঞ্চল	বিনয় মুখোপাধ্যায় (হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর অক্টোবর, ১৯৩৬ সালের রেকর্ড তালিকা দ্রঃ)	রাজশাহী বেতারে প্রচারিত ১৩/১১/১৯৬৬
৭। নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা	জসীমউদ্দীন (জসীমউদ্দীন- এর 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' পুস্তক দ্রঃ)	রাজশাহী বেতারে ৮ই মার্চ, ১৯৬৬
৮। যদি জাগে পরাণ কভু	ধীরেন মুখোপাধ্যায় (১৯৩০ সালের এইচ, এম, ভি, রেকর্ড তালিকা দ্রঃ	ঢাকা বেতার থেকে হিন্দোল-এ প্রচারিত (একাধিকবার) ১৯৬৮–৬৯। নজরুল নির্দেশিকা (রফিকুল ইসলাম) গ্রন্থে নজরুল-গীতি হিসেবে গণ্য
৯। যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে	অজয় কুমার ভট্টাচার্য (হিন্দুস্থান কোম্পানীর রেকর্ড তালিকা এইচ, ১৩৭ নম্বর রেকর্ড)	রাজশাহী বেতার ১৩/৪/১৯৬৬
১০। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু	গোলাম মোস্তফা	রাজশাহী বেতার

মোহাম্মদ রসুল	('হাম্‌দ্‌ ও না'ত' প্রকাশক ঃ পূর্ব-পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা)	৮/৩/১৯৬৬
১১। আমার এ ভালবাসা জানি গো তোমার	সুবোধ পুরকায়স্থ (এইচ, এম, ভি, রেকর্ড নং এন, ২৭৩২৩ দ্রঃ)	ঢাকা বেতারের 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর'। গানটি পরেও ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত হয় ৩১/৫/১৯৮৪

উপরোক্ত কিছু তথ্যাদি পেশ করতে গিয়েই গোড়ায় উল্লেখিত মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। কমল দাশগুপ্ত কর্তৃক গীত ও রেকর্ডকৃত কাজী নজরুল ইসলামের 'মডার্ণ' গানটি তাঁর কোন গীতি-গ্রন্থ বা স্বরলিপি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। গানটি, কোন বেতার,টেলিভিশন বা ক্যাসেটেও শোনা যায় না। রেকর্ড থেকে গানটি উদ্ধার করে এখানে পেশ করছি ঃ

মডার্ণ

প্রিয়তম এসো ফিরে–
রহিবে কি দূরে দূরে
ভুলি মোরে চিরতরে–
ভাসাইয়া আঁখি নীরে।
আছি বসে পথ চেয়ে–
আঁধার এলো যে ছেয়ে–
মনের বনের ছায়ে
এস মিলন মধুর সুরে।
নয়নের মণিহারা
নিভে গেছে সুখ-তারা–
ভেসে আসে কালো মেঘ
আমার গগন ঘিরে।

শিল্পী ঃ মাস্টার কমল

এফ, টি. ৩৪৩৮

উপরোক্ত 'মডার্ণ' গানটিতে পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সুরের আভাস রয়েছে। মীর-প্রধান, দাদরা তালে নিবদ্ধ–সুরের মধ্যে 'সামঞ্জস্য' বা 'সমতা'র অভাব নেই।

'Our sweetest songs are those that tell of
saddest thought'.

কথাগুলির সমর্থন মেলে কাজী নজরুলের এ গানটির ভাব-ভাষা-সুর-লয় ইত্যাদিতে।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্থ সংকলন]

নজরুল-গীতি নয়, সঙ্গীত

শেখ দরবার আলম

সঙ্গীতজ্ঞ কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের একটি সুবিখ্যাত গানের পংক্তিঃ 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে'। লক্ষণীয় যে, কবি একমেবাদ্বিতীয়ম সেই করুণাময় স্রষ্টার দরবারে শ্রদ্ধাঞ্জলিও নিবেদন করেছেন গীতিতে নয়, সঙ্গীতে। অবশ্য নজরুল-রচনাবলীতে গীত ও সঙ্গীত উভয় শব্দই আছে, যেমনটা রবীন্দ্রনাথে-ও আছে। তবু এই উপমহাদেশে অধিকাংশ বেতার কেন্দ্রে এখন প্রচার করা হ'চ্ছে 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত', কিন্তু 'নজরুল-গীতি'। এর যে একটা আপত্তিকর দিক আছে এবং কেনো, সেটাই প্রথমে উল্লেখ করা দরকার।

'নজরুল-সৃষ্টি সংরক্ষণ সংস্থা'র কাজে শহর মফঃস্বল নির্বিশেষে নানা জায়গায় জনসাধারণের সঙ্গে কবির বিষয়ে আলাপ হ'য়েছে। নানান জায়গায় অনেকেই আমাকে প্রশ্ন ক'রেছেনঃ 'গীতি' এবং 'সঙ্গীতে'র মধ্যে পার্থক্য কী? সঙ্গীত শব্দটা কি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক? 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' বলা হ'চ্ছে, কিন্তু 'নজরুল-গীতি' কেন? ইত্যাকার নানান প্রশ্ন।

কোনো সঙ্গীতজ্ঞই কেবল এ সব সওয়ালের সঠিক জবাব দিতে পারেন। আমি এর জবাবে প্রথমে বড় জোর নিজের পছন্দ-অপছন্দ ব্যক্ত করতে পারি; দুই, অভিধান খুঁজে দেখতে পারি; তিন, এ বিষয়ে কোনো সঙ্গীত শাস্ত্রবিদের লেখার হদিশ পেলে তা প'ড়ে দেখতে পারি; চার, সঙ্গীতজ্ঞ কারো কারো কাছে জানার চেষ্টা ক'রতে পারি; পাঁচ, পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে এ বিষয়ে কোনো নজির, উপাদান বা ইতিহাস মেলে কিনা তা যথাসম্ভব খুঁজে দেখতে পারি।

এবার এর জবাবে আসছি ঃ

দুই, 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এ গীতি শব্দের অর্থ দেখছি ঃ 'গান, সঙ্গীত', উভয়ই। অর্থাৎ গীতি এবং সঙ্গীত, এই উভয় শব্দের কোনোটিই অন্যটির চেয়ে উঁচু বা নীচু মানের পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্র-গীতি এবং নজরুল-সঙ্গীত ব'ললে তাতে কারো রচনাকে আভিধানিক অর্থে ছোট কিংবা বড় করা হয় না।

তিন, সঙ্গীত-শাস্ত্রে নজরুলের যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিলো সে প্রমাণ নজরুল রচনাবলীতেই মিলবে। সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্পর্কে-ও তিনি যে রচনা রেখে গেছেন তা যে-

কোনো কবি-গীতিকারের জন্য শ্লাঘার বিষয়। সঙ্গীতকার নজরুল ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী গানে পারদর্শী ছিলেন। নানান রাগ-রাগিনীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিলো। ঠুংরীর বাদশাহ্‌ ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর সুযোগ্য সাগরেদ নজরুল কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীনের ভাষায় 'নবাব, বাদশাহ্‌, রাজা, উজীর, জমিদার শ্রেণীর দ্বারা পুষ্ট এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে' জনসাধারণের মাঝে দিতে লাগলেন অভূতপূর্ব উপায়ে মুঠো মুঠো রাশি রাশি ছড়িয়ে।' যেমন ধ্রুপদ অঙ্গে টোরী রাগিনীতে ঃ 'আমি ছন্দ-ভুলো চির সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো'। মালকোষ রাগে ঃ 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।' দরবারী পূরবী, বাগেশ্রী, ইমন কল্যাণ, জৌনপুরী, ভৈরবী প্রভৃতি বিশুদ্ধ রাগিনীতে অজস্র খেয়াল গানও রচনা ক'রেছেন কবি।

আব্বাস উদ্দীন লিখেছেন যে, 'সঙ্গীতের কথা ও সুর-সৃষ্টিতে 'রাগমিশ্রণ আর রাগ ভাঙার ব্যাপারে' নজরুল 'অসাধারণত্ব ও অভিনবত্বে'র পরিচয় দিয়েছেন। যেমন জয়জয়ন্তী -খাম্বাজ ঃ 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়/তবু যেতে হবে হায়।' বেহাগ, তিলক কামোদ, খাম্বাজ ঃ 'কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি', নট মল্লার-ছায়ানট ঃ 'হাজার তারার হার হ'য়ে গো/দুলি আকাশ বীণার গলে॥'

একটি গানকে একটি বিশুদ্ধ রাগের কাঠামোতে বেঁধে অন্য রাগের সুরকেও স্থান দিয়েছেন, যেমন তিলক কামোদ-দেশ দিয়ে ঃ 'এক ডালি ফুল ওরে সাজাব কেমন ক'রে'।

চার, পশ্চিম বঙ্গের 'নজরুল সৃষ্টি-সংরক্ষণ সংস্থার' উদ্যোগে ১৯৮০ সনের ২৪ মে রবিবার কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রেক্ষাগৃহে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রমেন্দ্র কুমার পোদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'নজরুল জয়ন্তী'তে নজরুল শিষ্যা পরলোকগতা বিজন বালা ঘোষ দস্তিদার তাঁর দীর্ঘ ভাষণের নানান স্থানে স্বকণ্ঠে গেয়ে সুধীমণ্ডলীকে অবহিত করেছিলেন যে, সঙ্গীত-শাস্ত্রে নজরুলের দখল কেবল ব্যাপক ও সর্বতোমুখীই নয়, অসাধারণ। একই কথা সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা দেবী এবং আঙ্গুরবালা দেবীর কাছেও শুনেছি। এদের কাছে প্রিয় সঙ্গীত 'নজরুল সঙ্গীত'। যেমন, কবি হ্‌লেন এদের কাছে সব চেয়ে প্রিয় মানুষ।

পাঁচ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও অন্যান্য কাগজের পুরানো ফাইল থেকে আর্কাইভাল ওয়ার্ক ক'রতে গিয়ে দেখছি, সেখানে গোড়ার দিকে বছরের পর বছর কবি নজরুল ইসলামের গানকে নজরুলগীতি নয়, 'নজরুল-সঙ্গীত'ই লেখা হ'য়েছে। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধ'রছি ঃ

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ ঃ ২৫মে ১৯৪৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং যুগ্ম সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আহ্বানে কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি হল-এ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজীবুর রহমান খাঁ প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিতব্য কবির ৪৬তম জন্ম-দিবসের ঘোষণায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বলা হয় ঃ'সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের দ্রষ্টব্য অংশ।' পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিবেদনঃ 'বক্তৃতাগুলির মধ্যে সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।'

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ ঃ ২৫মে ১৯৪৫ তারিখ শুক্রবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে' 'রেকর্ড সমালোচনায় বলা হয় 'আমরা মে মাসে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে প্রকাশিত যে সঙ্গীতগুলি পাইয়াছি নিম্নে তাহার সমালোচনা দিলাম।'

N 27519–এই রেকর্ডে সুকণ্ঠী গায়িকা বীণা চৌধুরী যথাক্রমে কাজী নজরুল ও পরলোকগত কবি অজয় ভট্টাচার্যের দুইটি গানেই ভাষার লালিত্যকে সুর-মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া এমন দরদ দিয়া গাহিয়াছেন যে, তাহা মর্মস্থলে গিয়া পৌছায়।'

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ ঃ ২৬মে ১৯৫০ তারিখ শুক্রবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলামে এ দিন বিকেল সাড়ে চারটায় পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বশিরহাট টাউন হলে ৫২ তম নজরুল জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠান ঘোষণায় বলা হ'য়েছে ঃ 'স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা নজরুলের কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করিবেন।'

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ ঃ ২৭শে ১৯৫১ তারিখ রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চতুর্থ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে কলেজ স্কোয়ারস্থ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল-এ ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে কবির ৫৩তম জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিবেদন ঃ 'সুর-তান-লয়ে কবির সুপ্রসিদ্ধ যৌবন-সঙ্গীত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' সমবেত কণ্ঠে গীত হইলে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে সভার সূচনা হয়।' ... অনুষ্ঠানের শেষের দিকে শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক কবির অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হয়।'

এ দিনই আবদুর রশীদ খাঁর সভাপতিত্বে ২৯ ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ 'নবযুগ' কার্যালয়ে 'নজরুল দিবস' পালন উপলক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা হ'য়েছে ঃ 'নজরুল সঙ্গীত, কবিতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, নৃত্য ও হাস্যকৌতুকে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়।'

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ২৫ মে ১৯৫৩ তারিখ সোমবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রিয়রঞ্জন সেন এম, এল, এ-র সভাপতিত্বে কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল-এ অনুষ্ঠিতব্য কবির ৫৫ তম জন্মোৎসব সম্পর্কে ঘোষণা ঃ 'বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ কবির রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।'

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ঃ ৯ জুন ১৯৫৩ তারিখ মঙ্গলবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম কলামে কাঁচড়াপাড়া হাইও মার্স ইন্সটিটিউটে লেখিকা অন্নপূর্ণা গোস্বামীর সভাপতিত্বে কবির ৫৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের খবর ঃ 'নজরুল সঙ্গীতে

অংশগ্রহণ করেন শ্রী অরুণ দীপ্তি গোস্বামী ও মোহিত ভট্টাচার্য।'

বর্ধমান সম্মিলনীর উদ্যোগে বসন্তকুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে বঙ্গবাসী কলেজ হল-এ কবির ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের খবর ৮ আষাঢ় ১৩৬০ ঃ ২২ জুন ১৯৫৩ তারিখ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ঃ 'জনাব জাহেদ আলী সাহেব নজরুল সঙ্গীতে ও কাব্যে যৌবন শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রী সুধাংশু লাল সরকার, শ্রী সতীশ রঞ্জন সাহা, শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ দাস, শ্রী মনোজ সেন, অরুণ রায়, শ্রমতী জয়শ্রী সরকার নজরুল সঙ্গীতের দ্বারা সভাস্থ জনগণের তৃপ্তি বিধান করেন।'

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ ঃ ২৫ মে ১৯৫৪ তারিখ মঙ্গলবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তৃতীয় পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলামে এদিন বিকেল ৬টায় নজরুল জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল-এ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে কবির ৫৬ তম জন্মোৎসব সম্পর্কে ঘোষণা ঃ 'বিভিন্ন শিল্পীবৃন্দ কবির রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।'

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ঃ ২৭ মে ১৯৫৫ তারিখ শুক্রবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলামে 'কাজী নজরুল জন্মোৎসব কমিটি'র উদ্যোগে ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল-এ কবির ৫৭-তম জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্পর্কে খবর ঃ 'সভায় কবির রচনা আবৃত্তি ও নজরুল সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করে।' এই সভায় পঠিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণী ঃ 'আমাদের দেশের পুরানো ধারায় সেই কবিরাই মহাজন যাঁদের কাব্য গীতধর্মী, সঙ্গীত মহিমায় মহিমান্বিত। সেই ধারাকে যাঁরা বহন ক'রে নিয়ে চ'লেছেন— নজরুল ইসলাম তাঁদেরই শেষ জন। ঠিক এইধারায় কোনো উল্লেখযোগ্য অভ্যুদয় আজও নজরুল ইসলামের পর হয়নি। নজরুল ইসলামের সেই পরিচয় আমাদের কাছে বিস্ময়কর পরিচয়। 'সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতকার নজরুল— মহাজন নজরুল ইসলাম। আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কবির উপর।'

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ ঃ ২৯ মে ১৯৫৫ তারিখ রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ২৬মে যাদবপুর চিত্তরঞ্জন কলোনী চিত্তরঞ্জন সঙ্ঘের উদ্যোগে ও কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ৫৭তম নজরুল জন্মোৎসব সম্পর্কিত খবর ঃ 'সঙ্গীত' আবৃত্তি ও নজরুল সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ ঃ ২৫ মে ১৯৫৬ তারিখ শুক্রবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় শোভাবাজার রাজবাড়ীতে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে এদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে চারদিনব্যাপী কবির ৫৭তম জন্ম দিবসের অনুষ্ঠান ঘোষণা ঃ 'কর্মসূচী-স্বস্তি বচন— ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী; সভাপতি— শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত; স্বাধীনতার উপাসক নজরুল—

শ্রী সরোজ রায় চৌধুরী। ইত্যাদি ব্যতীত আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যগীতি আলেখ্য।'

পরদিন ২৬ মে ১৯৫৬ঃ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ তারিখ শনিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠা পঞ্চম কলামে 'নজরুল সাহিত্য সম্মেলন' শিরোনামে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ঘোষণা ঃ 'অদ্য শনিবার ২৬শে মে সন্ধ্যা ৬৷৷০ টায় শোভাবাজার রাজবাটীতে ২য় দিবসের অনুষ্ঠানসূচী ঃ– বাংলা কাব্যসাহিত্যে নজরুলের দান ঃ কাজী আবদুল ওদুদ, নজরুলের সঙ্গীত-প্রতিভাঃ শ্রী সুনীল কুমার বসু, নজরুল সঙ্গীত ঃ নজরুলের রচনা থেকে পাঠ ঃ নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন ঃ শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়....।

আরো নানান অনুষ্ঠান সম্পর্কে এ পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'সহ বিভিন্ন কাগজে কেবল 'নজরুল সঙ্গীত'ই লেখা হয়েছে। কিন্তু এদিনই অর্থাৎ ২৬মে ১৯৫৬ ঃ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ তারিখ শনিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেই ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে এক প্রতিবেদনে জনৈক চিন্তাশীল স্টাফ রিপোর্টার প্রথম নজরুল সঙ্গীতের স্থলে 'নজরুল-গীতি' কথাটা চালু ক'রে দেন ঠিক এইভাবে ঃ

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লাম/

জন্ম দিবস উদ্‌যাপন/

(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

শুক্রবার কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের ৫৮তম জন্ম দিবস মহাসমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। জন্মদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় কবির কাব্য প্রতিভা, সঙ্গীত সৃষ্টির নিপুণতা ইত্যাদি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা ও বিভিন্ন শ্রেণীর 'নজরুল-গীতি' পরিবেশিত হয়।...'নজরুল-গীতি' অবলম্বনে 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' একটি মনোজ্ঞ নৃত্য-গীতালেখ্য পরিবেশন করেন।'

স্মর্তব্য, এই 'বাসন্তী বিদ্যাবীথি' নজরুলের অবদান পুষ্ট। ভুলটা কি তাঁরাই করেছিলেন প্রথম?

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের বাসায় নির্বাক, নিশ্চুপ কবি তখন আপনার মনে আপনি গন্ধ বিধুর ধূপের মতো পুড়ছেন।

কিন্তু এর দু'দিন পর ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ ঃ ২৮ মে ১৯৫৬ তারিখ সোমবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় শোভাবাজার রাজবাড়ীর এক অনুষ্ঠান বিজ্ঞপ্তিতে নজরুল সঙ্গীতের কথাই আছে। সুচিত্রা মিত্রও যে সেদিন নজরুল সঙ্গীতই গেয়েছেন সে প্রমাণটুকু-ও মেলে ঃ

'অদ্য ২৮ শে মে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শোভাবাজার রাজবাটীতে নজরুল-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সমাপ্তি দিবস অনুষ্ঠানে শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত জীবন

সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। কবির রচনা থেকে পাঠ করিবেন কবি তনয় কাজী সব্যসাচী ইসলাম। নজরুলের সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে শ্রী অপরেশ লাহিড়ী, শ্রী দ্বিজেন চৌধুরী, শ্রী শ্যামল, শ্রী সুকুমার মিত্র, শ্রী করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুচিত্রা মিত্র, শ্রী বাঁশরী লাহিড়ী, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করিবেন। সেতারে ওস্তাদ আলি আহম্মদ খাঁ ও তবলা সঙ্গতে মাঃ পানু অংশ গ্রহণ করিবেন।'

লক্ষণীয় সুচিত্রা মিত্র, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া প্রমুখ সঙ্গীত সম্রাজ্ঞীরা নজরুল-সঙ্গীতই গেয়েছেন।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ ঃ ২৫মে ১৯৫৭ তারিখ শনিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তৃতীয় পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে কলকাতায় ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটে সাহিত্য-তীর্থের উদ্যোগে কবির ৫৯-তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপনের বিজ্ঞপ্তি ঃ 'সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিবেন শ্রী অমিত বন্দোপাধ্যায়, রীণা গোস্বামী, বাণী মুখোপাধ্যায়, সাগর বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাত্রি ৮টায় নজরুল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হইবে।'

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ ঃ ২৫ মে ১৯৫৮ তারিখ রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দশম পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলামে এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় হাওড়ার ২২ নীলমনি মল্লিক লেনে যুব-সভার উদ্যোগে কবির ৬০তম জন্ম দিবস উদযাপনের বিজ্ঞপ্তি ঃ 'নজরুল-সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় এবং শ্রী সোমেশ ঘোষ।'

কবি-শিষ্য সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় নজরুল-সঙ্গীতই গেয়েছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই একই কলামে এর পর আছে ঃ

শরৎ বসু একডেমী

'অদ্য রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নেতাজী ভবনে "নজরুল সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে শ্রী রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত সহযোগে আলোচনা করিবেন।'

লক্ষণীয়, আলোচনা হয়েছে তখন নজরুল-গীতি নয়, নজরুল-সঙ্গীতের বিষয়েই। এভাবে এ যাবৎ গোড়া থেকে সঠিকভাবে নজরুল-সঙ্গীত কথাটাই উচ্চারিত হ'য়ে এসেছে।

পরদিন ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ ঃ ২৬মে ১৯৫৮ তারিখ সোমবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পঞ্চম পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলামে 'বিদ্রোহী কবি নজরুল /৬০তম জন্ম দিবস পালন/ কলকাতা ও সহরতলীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শিরোনামে 'ষ্টাফ রিপোর্টার' পরিবেশিত খবরে নজরুল-সঙ্গীত ও নজরুল-গীতি, দু'টো শব্দই ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। খবরের শেষ অংশে নজরুল-গীতি কথাটা ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত জবরদস্তি ক'রে

আরোপ করা হ'য়েছে।

'এই উপলক্ষে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও সাহিত্যালোচনার মধ্য দিয়া নজরুল প্রতিভার বিভিন্ন পরিচয় তুলিয়া ধরা হয়।

কাজী আবদুল ওদুদ দুঃখ করিয়া বলেন যে, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নজরুল প্রতিভার স্ফুরণ হইলেও তাহা আজ আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি । নজরুলের সঙ্গীত সংরক্ষণ, সংগ্রহ, চর্চা ও প্রচার আজ আশু প্রয়োজন বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।......

রামকৃষ্ণ শিল্পী সঙ্ঘ কর্তৃক নজরুল-গীতি গীত হয়।' নজরুল-সঙ্গীত হয় লিখলেই তা মানানসই হ'তো। কিন্তু ষ্টাফ রিপোর্টার নজরুল-সঙ্গীতের বদলে 'গীত' লিখতেই সচেষ্ট ব'লে ধারণা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নজরুলের প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় দৃষ্টিভঙ্গির তখনো কোন সামগ্রিক তারতম্য ঘটে নি। কাজী আবদুল ওদুদ যে নজরুল-সঙ্গীত কথাটা ব্যবহার করেছেন, সে উল্লেখ আছে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ ঃ ২৫ মে ১৯৬৫ তারিখ মঙ্গলবার কবির ৬৭তম জন্মদিনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলামে এদিন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীর অংশ বিশেষ ঃ 'সঙ্গীত পরিচালনা ঃ কাজী অনিরুদ্ধ ॥ অংশ গ্রহণে ঃ কাজী সব্যসাচী, পূরবী দত্ত, কল্যানী কাজী, প্রগতি বর্মণ, উৎপলা মুখোপাধ্যায়। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত ঃ নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। পরিচালনা ঃ কাজী অনিরুদ্ধ ও রজত নন্দী। মেলা প্রাঙ্গনে একক সঙ্গীত ঃ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ।'

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, 'নজরুল-সঙ্গীত' কথাটা দেশ বিভাগের আগে থেকে শুরু ক'রে ১৯৬৫ পর্যন্ত বহাল ছিলো। তবে 'নজরুল-সঙ্গীত' কথাটার পাশা-পাশি 'নজরুল-গীতি' কথাটার আমদানী ও মিশেল শুরু হয়।

১৯৭৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে প্রদত্ত মানপত্রে তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী 'সঙ্গীত' শব্দটাই ব্যবহার করেছেন এইভাবে ঃ 'সঙ্গীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয়, বিচিত্রধর্মী ও স্বতন্ত্র। ......আপনি বাঙলাদেশের, বিচিত্রমুখী সঙ্গীতের অনতিক্রমনীয় নিরীক্ষাধর্মী সার্থক সুরকার'। আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় ৩১ আগষ্ট ১৯৮৫ তারিখে আমার নিবন্ধে আমি 'নজরুল-সংগীত' কথাটাই ব্যবহার করা উচিত বিবেচনা করেছি। কেউ প্রশ্ন তুললে অঢেল উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে, 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'ও প্রথম দিকে বহু বছর 'নজরুল-সঙ্গীত' কথাটাই ব্যবহার করেছেন।

হালে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিমিটেডের 'দেশ' পত্রিকায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে সপ্তম পৃষ্ঠায় মুর্শিদাবাদের নিমতিতার সুখেন্দু নন্দী 'নজরুল

সঙ্গীত' কথাটা ব্যবহার করেছেন। এইভাবে ঃ 'নচেত নজরুল-সঙ্গীতের প্রতি শ্রী ভট্টাচার্য্যের অজ্ঞতার বোঝা।' আর ২৮ সেপ্টেম্বর '১৯৮৫-র ' দেশ'-এ শিল্প সংস্কৃতি' বিভাগে 'রেকর্ড' আলোচনায় দেখছি 'রবীন্দ্র গীতি' শব্দটা ব্যবহৃত হ'য়েছে এভাবেঃ 'বেশির ভাগ রবীন্দ্র-গীতির সুরে উচ্চাবচতা কম, টপ্পার দানা অনুপস্থিত, সুরের প্রধান আশ্রয় মধ্য সপ্তকে।'

সুধীর চক্রবর্তী তাঁর এ রেকর্ড সমালোচনায়ঃ রেকর্ডে রবীন্দ্র-গীতি গায়নের ক্রুটি সহজ সরল ধারা এবং রবীন্দ্র গীতি প্রতিভার' কথা-টা-ও লিখেছেন।

এদিকে 'নজরুল পরিচিতি'র' চতুর্থ মুদ্রণে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮-তে দেখছি, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ 'শিশু সাহিত্যে নজরুল' শিরোনামে তাঁর নিবন্ধের শুরুটা 'নজরুল সঙ্গীতের চর্চা', এই কথা দিয়েই করেছেন। এই পুস্তকে আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর 'নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ক নিবন্ধ'টি যে-কথাগুলো দিয়ে শেষ করেছেন সেদিকে এক ভিন্ন প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল-রুমে তাঁর গানের বড় বড় খাতাগুলো পড়ে থাকতো। সেই খাতা থেকে কোনো নতুন কবি গান লিখে নিয়ে কাজীদার লাইন শুদ্ধ প্রায় হুবহু নকল ক'রে নিজের লেখা ব'লে গ্রামোফোনে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাজীদাকে বললাম সে কথা। তিনি হেসে ব'ললেন, 'দূর পাগল, মহাসমুদ্র থেকে ক'ঘটি পানি নিলে কি সাগর শুকিয়ে যাবে? আর নবাগতদের দল এক-আধটু না নিলে হালে পানিই বা পাবে কী ক'রে?

প্রায় বিশ বছর কাজীদার সাহচর্য্যে ছিলাম; এর মধ্যে একদিন-ও তাঁর মুখে পরনিন্দা শুনি নি।'

এই মহান কবির বিষয়ে আমাদের তরফে-ও উদার হওয়ার দাবী অযৌক্তিক বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। 'নজরুল-সঙ্গীত' কথাটাই যখন গোড়াতে সাতচল্লিশের আগেই বহু বছর যাবৎ চ'লেছে, তখন সেটাই সর্বত্র বহাল করতে আপত্তির কী আছে?

১. ভারতের পশ্চিম বঙ্গের একটি সংস্থা।

২. কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল পরিচিতি' দ্রষ্টব্য। –স, ন, ই, প,

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — চতুর্থ সংকলন]

নজরুল-সঙ্গীতের গায়কী : স্বাধীনতার সীমা

রওশন আরা মুস্তাফিজ

অধুনা নজরুল-সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায়শই শুনি, নজরুল-সঙ্গীতের শিল্পীরা নজরুলের গান আরও অধিকতর সুন্দর করার প্রচেষ্টায় যার যেমন খুশী কারুকার্য প্রয়োগ করছেন, ইচ্ছেমত সুর এদিক ওদিক করে গাইছেন এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে নিজস্ব সুর প্রয়োগ করে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রবণতা অবশ্যই বন্ধ করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে, যারা নজরুল-সঙ্গীত গাইছেন তাঁদের বক্তব্য, গানের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম শিল্পীকে তার নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে গেছেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে স্বনামধন্য গায়ক-গায়িকারা অসংখ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরা কবির উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সেকালের দু'জন নামকরা গায়িকা ইন্দুবালা ও আঙ্গুরবালার সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ইন্দুবালার সাক্ষাৎকারটি যখন গ্রহণ করা হয় তখন তার বয়স আটাত্তর। কাজী নজরুল ইসলামের কথা বলতে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ-মুখ, বলেছেন - 'কে ? কাজী দা!' চমকে উঠলেন- 'অমন মানুষ কি আর দেখতে পাব ? আশীর্বাদ করুন বাবা, যেন কাজীদার সঙ্গে ওপারে দেখা হয়'। তারপর তাঁর গান প্রসঙ্গে বললেন,

> গান করতেন ক'মিনিট। হেসেই খুন, ঠাট্টা মশকরা আর গল্প। হার্মোনিয়াম বাজাতেন না তো চটকাতেন। তবে একেক সময় দেখতাম অন্য জগতে চলে গেছেন। একদিনের কথা বলি। খুব সকালে গাড়ী চেপে গিয়েছি রিহার্সেল রুমে। দশরথ চাকর বললো কাজী সাহেব এসে গেছেন। সকাল দশটা। ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলাম কাজীদা এক লাইন করে গাইছেন আর হারমোনিয়ামে ভ্যাঁপর ভ্যাঁপর। ঘরে ঢুকে একধারে চুপ করে বসলাম। দাদা তখন সুরের ভিয়েন চড়িয়েছেন। গাইছেন, বাজাচ্ছেন, ডুবে যাচ্ছেন সুরে। গান রচনা ও সুর দেওয়া শেষ হলো। এতক্ষণ বাদে আমার দিকে চোখ পড়লো। রহস্য ভরা গলায় বললেন, আজো শুনতে পাই— ইন্দু নিবি ? এই গানটা নিবি ? 'অঞ্জলি লহ মোর' বলে একটা মোচড় দিয়ে 'সঙ্গীতে' এসে পড়া।

ইন্দুবালা বলেছিলেন, 'দাদা এ গান তো তুমি আমারই জন্য রচনা করেছ'। রাগ তিলং-এর উপর রচিত এই গানটি ইন্দুবালা রেকর্ড করেছিলেন আলাপ বিস্তারের পর দাপটের সঙ্গে সপাট তান দিয়ে এবং লয়ের খেলা করে। রেকর্ডের সীমিত সময়ের

মধ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব গায়কীর মাধ্যমে এই গানের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন কষ্টলব্ধ শ্রমে। স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম ইন্দুবালার নিজস্ব ঢং-এ পরিবেশিত সেই গান শুনে আনন্দিত হয়ে তা অনুমোদন করেছিলেন। ইন্দুবালার মত সে যুগের আরও কিছু সংখ্যক শিল্পী যারা রেয়াজী কণ্ঠে নিজস্ব গায়কী ঢং-এ সঙ্গীত পরিবেশন করে কাজী নজরুল ইসলামের মৌখিক অনুমোদন সাপেক্ষে গান রেকর্ড করে প্রশংসিত হয়েছিলেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অনেকেই পরবর্তীকালে যথাযথ অনুশীলন ছাড়াই তাদের খেয়াল খুশি মত গাইবার চেষ্টা করেছেন। ইন্দুবালা এই গান যে আঙ্গিক বা স্টাইলে পরিবেশন করতেন, তাঁর তখনকার গান গাইবার যে ভঙ্গী, যে গায়কী তা আজ আর নেই। ইন্দুবালার গান তাঁর রেকর্ড শুনে কেউ হুবহু তাঁর মত গাইতে পারবেন এটা আশা করাও ঠিক নয়। কারণ, এই গান যিনি পরিবেশন করবেন, তাঁর রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে প্ররিচ্ছন্ন ধারণা থাকতে হবে, সেই সঙ্গে তুখোড় রেয়াজী কণ্ঠ হতে হবে। তা ছাড়া এ গান রেকর্ড থেকে হুবহু কণ্ঠে তুলে গাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার কোন কোন শিল্পীকে বলতে শুনি- 'নজরুল-সঙ্গীতের সুর, গায়কী প্রভৃতি নিয়ে বেশী আলোচনা সমালোচনা করলে ভবিষ্যতে এ গানের প্রতি অনেকেরই আগ্রহ কমে যাবে'। কারণ, বর্তমানে নজরুল-সঙ্গীত চর্চা বেড়েছে, দেশের আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে নজরুল-সঙ্গীত শিক্ষালয়। সেসব শিক্ষালয়ে নিয়মিত নজরুল সঙ্গীত শেখানো হচ্ছে, ছাত্র ছাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে শিখছে। মোদ্দাকথা আজ নজরুল-সঙ্গীতের চর্চা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

নজরুল সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাক নজরুল সঙ্গীতপ্রেমী-মাত্রই তা চান। কিন্তু সেইসঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের চর্চা যেন সঠিক পথ ধরে হয়, যাঁরা পথ প্রদর্শক তাঁদের নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ক লব্ধজ্ঞান যেন সুস্পষ্ট হয়, স্বচ্ছ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যাঁরা প্রশিক্ষক তাঁরা যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে নিজেদের ফাঁকি দিয়ে থাকেন বা তেমন মনোযোগের সঙ্গে এই সঙ্গীত চর্চা না করেন এবং পরবর্তীকালে এই বিদ্যা সম্পূর্ণ রপ্ত না করে অর্ধসমাপ্ত বিদ্যা নিয়ে প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ অনিবার্য। অথচ এ দুর্ভোগের জন্য শিক্ষার্থীরা দায়ী নয়। দায়ী সেই শিক্ষক যাঁর নিজেরই রয়েছে অপূর্ণতা। হয়তো অর্থনৈতিক কারণে তিনি অর্ধসমাপ্ত বিদ্যা নিয়েই শিক্ষকতা শুরু করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যদি বিবেকবান হন তাহলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাঁর নিজেকে শুধরে নেয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা অল্পবিদ্যা নিয়ে একবার প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তারা কিছুতেই নিজেকে সংশোধন করতে চাননা। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবজান্তা ভাব নিয়ে যে গান তার জানা নেই, শিষ্যের আবদারে সে গানও হয় ভুল সুরে অথবা সম্পূর্ণ গানটিই নিজস্ব ভঙ্গীতে সুরারোপ করে শিখিয়ে থাকেন। নিজের বিবেকের সঙ্গে প্রতারণা করে এ জাতীয় শিক্ষকরা শিষ্যদের কতবড়

ক্ষতি করেন তা তাঁরা বিন্দুমাত্র ভাবেন না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা। শিশু বয়সে কোমল মন নিয়ে যা শেখা হয়, তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যত। গোড়ায় গলদ থাকলে তা সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন। যারা নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গীত সাধক কেবলমাত্র তারাই ভবিষ্যতে বহু কষ্টে নিজেকে শুধরে নিতে পারেন। ভুল শিক্ষার কারণে বহু প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশু বয়সে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একজন শিশু অত্যন্ত ভাল সঙ্গীত পরিবেশনা করেও যখন শুধুমাত্র ভুল শিক্ষার কারণে পুরস্কার পায় না, তখন সে দোষ কার ? আমি এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি বেশ কয়েকবার। বাংলাদেশ শিশু একাডেমীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত এবং নজরুল-সঙ্গীতের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছি বেশ কয়েক বছর। এক্ষেত্রে আমি দেখেছি, শিশু একাডেমী জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে বাছাইকৃত যে কজন প্রতিযোগী আসে তারা প্রত্যেকেই তাদের সাধ্যমত সুন্দর গায়। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কখনও বন্দিশের হেরফের হলেও সুর, তাল, মাত্রা, লয় সামগ্রিক পরিবেশনা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। নজরুল-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খেয়াল, টপ্পা বা ঠুমরী আঙ্গিকের গান হলে নির্দিষ্ট রাগের রূপ অক্ষুণ্ন রেখে গায়কী কিঞ্চিৎ এদিক সেদিক হলে প্রতিযোগীকে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু কাব্যগীতির ক্ষেত্রে ? হয়তো স্থায়ী অন্তরার সুর ঠিক রয়েছে, কিন্তু সঞ্চারীর সুর আদি সুরের সঙ্গে ঠিক মিলছে না। অথচ প্রতিযোগী মনপ্রাণ দিয়ে গাইছে। তার গায়কী, সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গী সুন্দর। কিন্তু শুদ্ধতাই এক্ষেত্রে বিচারের মাপকাঠি। শুধুমাত্র শিক্ষকের ভুল শিক্ষাদানের কারণে বহু সুকণ্ঠী পরিশ্রমী শিশুশিল্পী প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্য, যারা নিজের খেয়াল খুশিতে ভুল গান শেখান তারা নিজের অজ্ঞতা অস্বীকার করে বিজ্ঞের মত বলেন– 'নজরুলের গান এক আধটু এদিক সেদিক হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।' নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সুরের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, শিল্পীকে মনের মাধুরী মিশিয়ে গাইতে উৎসাহী করেছেন প্রভৃতি নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে নিজের অযোগ্যতা ঢাকার জন্য সচেষ্ট হন।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন বাংলা গানের জগতে প্রবেশ করেন তখন এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত ভাস্বর। তাঁর পাশাপাশি রয়েছে আরো তিনজন কাব্যগুণ সমৃদ্ধ কবি ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন এবং রজনীকান্ত সেন। সমসাময়িক ধারায় এঁদের সঙ্গীত একই স্রোতে বয়ে চলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গানের যে ধ্রুপদী আঙ্গিক অর্থাৎ অনড় রীতিনীতি, এর ভেতর দিয়েই বাংলা গান ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। ধ্রুপদ রীতি অনুসারে বাংলা গান স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারটি কলির মধ্যেই প্রধানত আবদ্ধ ছিল। বাংলা গান নিয়ে এই রীতির বাইরে কিছু চিন্তা-ভাবনা অতুলপ্রসাদ সেনের ছিল।

তিনি লক্ষ্ণৌর মাহফিলি ঢং-এর কিছু ঠুমরী এবং গজল গানের অনুসরণে বাংলা ঠুমরী ও গজল লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত সেই গান মাহফিলি ঢং-এর লেবাস ছেড়ে বাইরের জগতের মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করতে পারেনি। এদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের গান এবং হাসির গান, সেই সঙ্গে রজনীকান্ত ভক্তিগীতির প্রাচীরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেলেন। অকস্মাৎ খরস্রোতা নদীর মত দুকূল ছাপানো জোয়ারের বান নিয়ে আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা গানের এতদিনের প্রচলিত রীতিনীতি একপ্রান্তে সরিয়ে তিনি ধরলেন সম্পূর্ণ অন্যপথ। সে পথ ধ্রুপদের মত নির্দিষ্ট বেড়াজালে তত আবদ্ধ নয়, সেপথে রয়েছে ইচ্ছেমত বিচরণের স্বাধীনতা। ধ্রুপদের পথ ছেড়ে কবি নজরুল বেছে নিলেন খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা ও গজলের পথ। এই ভিন্ন পথে গমনই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্তের যুগে আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে।

নজরুল-সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলোচনাকালে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন- নজরুল-সঙ্গীতের কথা, সুর, গায়কী প্রভৃতি নিয়ে এত কথা কেন ? এই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এখন যে সচেতনতা তা আগে ছিল কি ? অবশ্যই ছিল। যারা নজরুল-সঙ্গীত একনিষ্ঠভাবে চর্চা করতেন তারা নজরুল-সঙ্গীতের শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়ার পর তাঁর রচনাসম্ভারের সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র প্রশস্ত হলো। সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা এবং সঙ্গীত চর্চা বৃদ্ধি পেল। সঙ্গীত চর্চার পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হলো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আজ নজরুল সঙ্গীতের আওয়াজ শোনা যায়। নজরুল-সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবসে বিভিন্ন অঞ্চলের নজরুলপ্রেমী সাংস্কৃতিকগোষ্ঠী, সঙ্গীত বিদ্যালয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে সভা সমিতি সেমিনার এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। আয়োজনের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কোন কমতি নেই। সভা সমিতিতে বছরের পর বছর একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে— নজরুল আমাদের জাতীয় কবি, তাঁর যাবতীয় রচনাবলীর মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁর সঙ্গীত সঠিক কথায়, শুদ্ধ সুরে গাইতে হবে, তাঁকে আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিতে হলে তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত সুরক্ষা করতে হবে। কবি নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়ার পর থেকে নজরুল বিষয়ক প্রতিটি সভা সমিতি সেমিনারে ভাঙ্গা রেকর্ডের মত ধ্বনিত হচ্ছে একই কথার পুনরাবৃত্তি। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর হয়ে গেল আজও নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ক সমস্যার তেমন কোন সমাধান হলো না। অবশ্য সঙ্গীতের এ সমস্যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দিনের পর দিন ভুল সুর শোনা গেছে রেডিওতে, টেলিভিশনে এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক অতিউৎসাহী নজরুল সঙ্গীতপ্রেমী শিল্পীদের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে। আজকের এই অবস্থার জন্য মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দায়ী। তাঁরা তাঁদের জনপ্রিয়তার সুযোগ

পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন যথেচ্ছ সুরে নজরুল-সঙ্গীত পরিবেশন করে। তাঁর জনপ্রিয় গজল গানগুলোর গায়কী ঢং-এ রঙ চড়িয়ে এমন অবস্থা করেছেন যে, ভালভাবে মনযোগ দিয়ে না শুনলে বোঝার উপায় নেই কোন সঙ্গীত গীত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পী আঙুরবালা বলেছেন – এ গান ভাষায় বোঝানো কঠিন। গেয়ে বোঝাতে হয়। মানবেন্দ্রকে নজরুল-গিতর ট্রেনিং দিয়ে প্রথম রেকর্ড করাই। রেকর্ড করলো আমার ঢঙে, কাজীদার শেখানো ঢঙে। ফাংশনে যখন গায় - তখন তা নজরুল গীতির চেয়ে মানবেন্দ্রগীতি হয়ে যায়। পরক্ষণেই বলেছেন- হ্যাঁ, এটা বলছি না পা টিপে টিপে স্বরলিপি পড়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার তো করতেই হবে। তবে মিষ্টি হওয়া চাই গান। সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। কবির স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন নিজের কথা,

> একদিন ট্রেনিং দিচ্ছেন কাজীদা। ট্রেনিং-এর জন্য গান রচনা করলেন, সুর দিলেন। গানটা দু'চার লাইন গাইতে গাইতে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বললেন, কাঠামোটা ঠিক করে দিলাম। তুমি এবার আঙুরের রস দিয়ে গানটাকে আরও মিষ্টি করে নাও আঙুর।

কবির গান শেখানো পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, বলেছেন,

> উনি কোনদিন আমাদের ওপর মাস্টারি করেননি। ওঁর গানে কোন বিশেষ কাজ নিজস্ব ঢং-এ করে ফেলেছি হয়তো। উনি মনোমত হলে মাথা নেড়ে তারিফ করেছেন। বলেছেন এরকমই তো চাই।

সেকালে কাজী নজরুলের গানে যাদের স্বাধীনভাবে গাইবার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন তৈরী রেয়াজী কণ্ঠের অধিকারী খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী। ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া দাপটের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করতেন। সে যুগের বিচারে তারা কখনোই সঙ্গীতের নান্দনিক সৌন্দর্যসীমা লঙ্ঘন করেননি। কাজী নজরুলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা এবং সপ্রেম উৎসাহ অনুপ্রেরণায় সেকালের মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা যথাসাধ্য আন্তরিকতা ও ভালবাসায় তার গানের গুলবাগ রঙিন প্রেমের গজলে ভরপুর করে তুলেছিলেন। কবি তাঁর গানে এদেরকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার তারা করেছেন। গানের মূল কাঠামো ঠিক রেখে প্রয়োজনবোধে নিজস্ব গায়কী প্রয়োগ করেছেন। গায়কী গুণে গানের সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীকালে এই স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারে নজরুল-সঙ্গীতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি দূরে থাক, নজরুল-সঙ্গীতের মূল সুরেরই বিকৃতি ঘটেছে। তাঁর উদারতাই এক্ষেত্রে ক্ষতি করেছে। অনেকে মত পোষণ করেন— কবি যদি তাঁর জীবদ্দশায় রেকর্ডকৃত শিল্পীদের গান তোলার ব্যাপারে কিছুটা রীতিনীতিবদ্ধ হতেন তাহলে আজ তার গানের সুর নিয়ে এত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি

হতো না।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর গান একটু এদিক থেকে ওদিক করে গাইবার কোন উপায় নেই। অবশ্য সে উপায় তিনি রেখে যাননি। তাঁর সঙ্গীতে তিনি ধ্রুপদ রীতির অনুসরণ করেছেন। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ অঙ্গের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ অবলম্বনে বহু ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনা করেছেন। ভক্তিগীতি রচনার ক্ষেত্রে তিনি অনড় রীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনেও সেই রীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর নিজের গান প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য 'আমার গানে তো আমি সেরকম কোন ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠবো।' নিজস্ব সুরের প্রতি মমত্ববোধ অথবা আত্মবিশ্বাসের কারণেই হয়তো তিনি এ উচ্চারণ করেছিলেন। এ কারণে সে যুগের রাগ সঙ্গীত চর্চাকারী গায়ক গায়িকারা নজরুলের গান গাইতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে এদিক সেদিক করে গাইলে রীতিমত অপদস্ত হতে হতো। এ প্রসঙ্গে ইন্দুবালা সরল স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাঁর জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন আসরি ঢং-এ। ঘটনাটি শুনলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িককালে তাঁর ভক্তবৃন্দের নিকট থেকে যে আনুগত্য আশা করেছিলেন তাতে সফল হয়েছিলেন। সে ঘটনা প্রসঙ্গে ইন্দুবালার বক্তব্য,

> রবি ঠাকুরের গান ভয়ে গাইনি। একবার হয়েছিলো কি শুনুন। মুজরোয় গাইছি। দাদ্‌রা, গজল, অনেক শোনালাম। একজন বললেন রবি ঠাকুরের গান জানেন ইন্দুবালা? কোনদিন গানে হারিনি। বললাম জানি বৈকি। ওই আমার মরণ। জেদ করে ধরলাম বেহাগে— দাঁড়াও আমার আঁখির আগে— মনের সুখে এক ঘন্টা বেহাগের কাজ টাজ, গা থেকে সা- এ লম্বা মীড় টেনে হুমকী তান করে যখন সুরে এসে দাঁড়ালাম তখন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন- ও ইন্দুবালা, আর তো আঁখির আগে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। রবি বাবুকে এভাবে খুন করো না। শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গেল। চোখে জল এসেছিল। ঐ শেষ। জীবনে আর ও পথ মাড়াইনি শত অনুরোধেও।

তাঁর বক্তব্য-রবীন্দ্র-সঙ্গীত খুব কঠিন জিনিস। লয়ের কাজ দেখানো জানা চাই। হাত পা চামড়া দিয়ে বেঁধে যেন কাঠ হয়ে গান করা। উনিশ বিশ চলবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক শ্রোতাবৃন্দের আনুগত্য অর্জন করে ভাবীকালের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার গান রবীন্দ্র ভারতীর সৌজন্যে শুদ্ধ স্বরলিপির আকারে অবিচল অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কবিগুরুর জীবদ্দশায় যা ছিল পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাই রয়ে গেছে। যুগ পাল্টাছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুচি পাল্টেছে, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনার অভিরুচি বদলায়নি। আজও

তাঁর গান আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনি। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন গান শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের উপাদান নয় বরং মেধা ও মননের যুক্ত শৈলীতে, রুচি ও শ্রমের পরিপূর্ণ বিকাশে গড়ে ওঠা অনিন্দ্য সুন্দর এক শিল্প। এই মহৎ শিল্পবোধ স্রষ্টাকে পৌঁছে দেয় তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সীমাবদ্ধ কাব্য জীবনে অবিশ্বাস্য গতিতে রচনা করেছেন অজস্র গান। সুরারোপ করেছেন অসংখ্য গানে। কোন কোন সময় অর্থনৈতিক চাপে ফরমায়েসি গান রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সেসব গানও লোকনন্দিত হয়ে প্রমাণ করেছে দ্রুতহস্তে রচিত গানেও আবেগ এবং যত্নের ব্যত্যয় ঘটেনি। সুরক্ষার অভাবে তার বহু রচনাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এখনও তাঁর যেসব গান অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য বহু ধরনের উদ্‌যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যত উদ্‌যোগই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাঁর সুরের রাজ্যে নৈরাজ্য অব্যাহত থাকলে এ উদযোগ কখনোই সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হবে না। নজরুল-সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় সমস্যা শিল্পীর গায়কীর স্বাধীনতা। কিন্তু এটা দেখা দরকার তিনি সে যুগে কোন ধরনের শিল্পীদের ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা অনুমোদন করেছিলেন। ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলাঝরিয়া, সুপ্রভা সরকার, কমল দাশগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, গিরিন চক্রবর্তী প্রমুখ গুণী শিল্পীবৃন্দ রাগ সঙ্গীতে যথাযথ তালিম নিয়েছিলেন। এঁরা জানতেন গানের কাঠামোর ওপর কিভাবে রঙ চড়িয়ে তা সুন্দর করে তোলা যায়। ইন্দুবালা বলেছেন- কাজীদার গানে স্বাধীনতা থাকে। মন খুলে গাও সরকারী দেখাও। আঙ্গুরবালার নিকট জিজ্ঞাস্য ছিল- নজরুল গীতি কাঠামোর ক্ষতি না করে, কতক্ষণ খেলিয়ে গাওয়া যায়? উত্তরে বলেছেন- 'তা মিনিট পনেরো তো যায়ই। ঠুমরীর মত খেলতে জানা চাই। মন খুলে সরকারী দেখানো বা ঠুমরীর মত খেলতে জানা শিল্পীরাই কাজী নজরুলের গানে স্বাধীনতার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই স্বাধীনতার যথেচ্ছাচার হয়েছে নজরুলের প্রতিটি গানের ক্ষেত্রে— খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে কাব্যগীতি, লোকগীতি, ভক্তিগীতি কোন গানই বাকী থাকেনি। যারা স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার করেছেন এবং এখনও করছেন তাঁদের অধিকাংশই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা সঠিকরূপে করেননি। এঁরা নজরুলের উচ্চাঙ্গের গানে স্থায়ী, অন্তরা গাইবার পর আলাপ, বিস্তার, তান, সরগম প্রতিটি ক্ষেত্রেই হোঁচট খেতে শুরু করেন। ফলে স্বভাবতই শুরু হয় পুনরাবৃত্তি। এ পুনরাবৃত্তির জন্য দায়ী তাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। তাই অক্ষমতার প্রাচীরের ঘেরাটোপে একই সুর, একই তান ঘুরেফিরে আবর্তিত হতে থাকে। যথাযথ তালিমবিহীন এই সকল স্বঘোষিত ওস্তাদদের গান শুনতে শুনতে নজরুল-সঙ্গীত শ্রোতাবর্গ এখন তিক্ত বিরক্ত। এঁরাই বলেন— নজরুলের গানের বৈচিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি উদারচিত্তে শিল্পীর স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁর গান প্রাণ ভরে গাওয়া যায়। সুতরাং যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক

প্রাণ ভরে গাইবার প্রতিযোগিতায় কেউ আর পিছিয়ে নেই। এঁদের বক্তব্য নজরুল তাঁর গানে স্বাধীনতা না দিলে আজ তাঁর গানের আবেদন কতটুকু অবশিষ্ট থাকতো সন্দেহ। এ ধরনের সন্দেহবাতিকগ্রস্তরাই তাঁর গানের সবচেয়ে বড় শত্রু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানে পান থেকে চুন খসার অনুমতি দেননি। শিল্পীর গাইতে ভাল লাগুক না লাগুক, এক তিল বদল করা যাবে না, শুদ্ধ স্বরের জায়গায় শিল্পীর শত ইচ্ছে থাকলেও কোমল স্বর ব্যবহার করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর সঙ্গীত নির্দিষ্ট রূপে সীমাবদ্ধ করে ভাবীকালের শিল্পীকে স্বাধীনতার সুযোগ দেননি সত্য। কিন্তু সে কারণে তাঁর গানের রস কি বিন্দুমাত্র কমেছে? আজও আমরা আগ্রহ সহকারে, নিবিষ্টচিত্তে তাঁর গান শুনে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুণ সমৃদ্ধ বাণী সুরের ছোঁয়ায় রূপে রসে নতুন ব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যগীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কথার নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সুর রচনা করেছেন, স্বরলিপি করেছেন, শিল্পীর কণ্ঠে হুবহু সেই সুর তুলে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে তাঁর বহু কাব্যগীতি রঙের উপর রঙ চড়ানোর ফলে বিভিন্নজনের কণ্ঠ ঘুরে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে আসল রূপই হারিয়ে ফেলেছে। নজরুল-সঙ্গীতে এই আসল সুর হারানো গানের সংখ্যা অনেক। এ পরিবর্তন হয়েছে ধীর গতিতে। সুতরাং ভুল-ত্রুটি যে খুব সহজে সংশোধন হবে তা নয়। সংশোধন করতে সময়ের প্রয়োজন। তবু যথা সম্ভব শীঘ্র যেন এ পরিবর্তন আসে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যারা নজরুল-সঙ্গীত চর্চা করেন তারা যেন আসল নকল সুর চেনার ক্ষেত্রে সতর্ক হন। সঠিক সুরের সন্ধান করতে তাদের যেন কোন বেগ পেতে না হয় সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অবশ্য নজরুল-সঙ্গীতের সঠিক চর্চা অর্থাৎ কথা, সুর, তাল, লয়, গায়কী প্রভৃতি নিয়ে বহুদিন যাবৎ চিন্তাভাবনা হচ্ছে। নজরুলের গানে স্বাধীনতার সাথে যথেচ্ছাচারিতা হচ্ছে, আনাড়ী নজরুলের প্রশিক্ষকদের কারণে শিক্ষার্থীরা ভুল শিক্ষা পাচ্ছে, এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ বহুদিনের। শিক্ষার্থীরা যেন ভুল শুধরে নিতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বরলিপিকার স্বরলিপি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তড়িঘড়ি করে প্রকাশিত স্বরলিপি পুস্তকেও আদি গ্রামাফোন রেকর্ডের সঙ্গে না মিলিয়ে স্মৃতিনির্ভর স্বরলিপি প্রণয়ন করাতে ভুল সুরের গান সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমার মতে বর্তমানে নজরুল-সঙ্গীতের প্রধান সমস্যা মূলতঃ ভুল সুর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নজরুল প্রদত্ত শিল্পীস্বাধীনতার মর্ম না বুঝে তার অপব্যাখ্যা করে এই সঙ্গীতের যথেচ্ছাচার। ইতিমধ্যে নজরুল ইন্সটিটিউট হতে আদি গ্রামাফোন রেকর্ডে বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া গান দেশের প্রখ্যাত শিল্পীদের দিয়ে নতুন করে রেকর্ড করিয়ে

স্বল্প সংখ্যক ক্যাসেট এবং গ্রামোফোন রেকর্ড বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমার ধারণা, যথাযথ প্রচারের অভাবে এইসব ক্যাসেট এবং রেকর্ডের খবর অনেকেই জানেন না। নজরুলের আদি রেকর্ডের সুরের ক্যাসেট বা গ্রামোফোন রেকর্ড বাজারজাত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে পত্র পত্রিকায় দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত বিজ্ঞাপন ঘন ঘন দেয়া প্রয়োজন। নজরে পড়ার মত প্রচার না হলে নজরুল ভক্ত এবং শিক্ষার্থীরা এ সম্বন্ধে কিছু জানতেই পারবেন না। বেতার এবং টেলিভিশনে এ প্রসঙ্গে নিয়মিত অনুষ্ঠান, আলোচনা প্রভৃতির আয়োজন করা যেতে পারে।

এছাড়া ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরুল প্রশিক্ষকরা নজরুল-সঙ্গীত শেখান তাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তারা যাতে নিজেকে শুধরে নিতে পারেন এ বিষয়ে নজরুল ইন্সটিটিউট দেশব্যাপী প্রশিক্ষকদের যথার্থ প্রশিক্ষকরূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাঁতে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস এ ধরনের বৃহৎ পরিকল্পনা শুদ্ধ নজরুল-সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

নজরুল-সঙ্গীতে সুরের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোন ধরনের গানে নান্দনিক সৌন্দর্য বজায় রেখে শিল্পীর স্বাধীনতা রয়েছে এবং কোন ধরনের গানে স্বাধীনতা নেই এ বিষয়ে অহরহ তর্ক বিতর্ক হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে নজরুল ইন্সটিটিউট গুণী শিল্পী এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে শিল্পীস্বাধীনতার ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে বিভিন্ন আঙ্গিকের গানের তালিকা তৈরী করতে পারেন। এতে যে ধরনের গানে শিল্পীস্বাধীনতার কোন সুযোগ নেই, অথচ অন্যায়ভাবে সে সুযোগ নিয়ে সুর বিকৃত করা হচ্ছে তা অচিরেই বন্ধ হবে।

নজরুল-সঙ্গীতের মৌলিক সুর ও বিশুদ্ধ বাণী অর্থাৎ শুদ্ধরূপ বজায় রাখতে হলে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কবি তার জীবদ্দশায় তাঁর তত্ত্বাবধানে যে সব গান রেকর্ড করিয়েছিলেন এবং যাঁরা তাঁর অনুমোদন নিয়ে তাঁর গান রেকর্ড করিয়েছিলেন সে সব গান এখনও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। স্বাধীনতার নামে এইসব গান বিকৃত করলে আমরা তাঁর গানের সৌরভ থেকে বঞ্চিত হব।

মরমী গানে লালন ও নজরুল

মহম্মদ মীজানুর রহমান

জীবন-রহস্য অলৌকিক। এই রহস্যেই অধ্যাত্মবোধ উজ্জীবিত। জীবনকে নিয়েই ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক চিন্তা-ভাবনা। এই বৃত্তালোকেই সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় মানুষ করছে ভাল-মন্দ পাপ-পূণ্যের বিচার। সুন্দরের আবাহন এবং অসুন্দরের প্রতি ঘৃণা মানুষের প্রবৃত্তিজাত। এ কারণেই অতি আদিম যুগ থেকেই মানুষ আত্ম দর্শনের প্রতি আকর্ষিত।

খৃষ্ট-পূর্ব গ্রীক সাহিত্যে এই আত্ম-দর্শনের কথা বলা হয়েছে। নিজেকে জানো Know Thyself. প্রাচীন ভারতীয় দর্শন-পুরাণেও অহংবোধের কথা বলা হয়েছে। ইসলামে রুহানিয়াত প্রকৃত অর্থে আত্মদর্শনের অভূতপূর্ব উপস্থাপনা। মানবিক অভিজ্ঞায় আত্ম-দর্শন অভিকর্ষিত। ভূ-কেন্দ্রাতিগ জীবন-আচরণ তাই একই কারণে আবিশ্ব।

বাংলা সাহিত্যে এই আত্মদর্শনের মরমিয়া রূপ অনুধাবন করে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন দুইজন জনপ্রিয় কবি ও গীতিকার যথাক্রমে ফকির লালন শাহ (১৭৭৪–১৮৯০) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)।

এই মরমিয়া বা সুফীতত্ত্বের ধারণা অবশ্যই সুপ্রাচীন। এবং এর মূল উৎস হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে লালন এবং নজরুলের মরমিয়া গানের যৎকিঞ্চিত আলোচনা করে আমরা শুধু এদের গানের পটভূমি আবিষ্কার করতেই সমর্থ হব না বরং এঁরা কে কোথায় অবস্থান করছেন তাও আমাদের কাছে সহজবোধ্য হতে পারে।

মরমী(mystic) শব্দের সঙ্গে একটা 'জীবনবোধ' সর্বদাই ঘনিষ্ট। ব্যক্তিক শব্দ 'আমি' কবির জন্য যথার্থ ক্রিয়াশীল। নানা সংশ্লেষণে এই রূপটি, ছন্দের অন্তরঙ্গ ধ্বনির মাধ্যমে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ে স্পর্শিত। লালনের একটি গানে এই স্পর্শকাতর ভাবটি লক্ষ্য করা যায়।

আমি দেখলাম এ সংসার ভোজবাজী প্রকার,
দেখিতে দেখিতে কেবা কোথা যায়।

মিছে এ ঘরবাড়ি, মিছে টাকাকড়ি,
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়, ॥

কীর্তিকর্মার কীর্তি কে বুঝতে পারে,
কেবা এই জীবকে নেয় কোথা ধরে,
এ কথা আর সুধাব কারে,
নিগূঢ় তত্ত্ব অর্থ কে বলবে আমায়॥

যে করে এই লীলা, তারে চিনলাম না,
"আমি" "আমি" করি ভবে, আমি কোনজনা....
[লালন গীতি]

আর নজরুল গাইলেন–

পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম
হে চির-সুদূর প্রিয়তম ॥

তুমি আকাশের চাঁদ
আমি পাতিয়া সরসী ফাঁদ
জনম জনম কাঁদি কুমুদীর সম।
হে চির সুদূর প্রিয়তম ॥

নিখিলের রূপে রূপে
দেখা দাও চুপে, চুপে;
এলে না মুরতি ধরি' ওগো নিরুপম।
[নজরুল গীতি]

নজরুলের দ্রোহাত্মক চেতনায় আত্মদর্শন হচ্ছে—'আমি আছি', আমি পুরুষোত্তম, আমি চিরদুর্জয়' এবং

তুই আত্মাকে চিন, বল্ "আমি আছি", সত্য, আমার জয়॥"
[অভয় মন্ত্র]

লোক-কবি লালনের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক পুরাণ এবং দর্শন, ভারতীয় দর্শন, পারস্যের মরমিয়াবাদ এবং ইসলামী মতাদর্শের অন্তর্গত অহংবোধ এবং শরিয়ত সংকট, অন্যদিকে বেদের ভেদ উৎরিয়ে আপন অভিজ্ঞতার উপস্থাপনায় আমরা কতটুকু আশ্বস্ত হতে পারি।

'আমি' কি?' তাই জানলে সাধন সিদ্ধ হয় 'আমি' কথার অর্থ ভারি, 'আমি' সে আমার নয়।

অনন্ত শহর বাজারে,
"আমি" "আমি" শব্দ করে,
আমার "আমি" চিনতে নারে,
বেদ পড়ি পাগলের প্রায়॥

মনসুর হল্লাজ ফকির সে তো,
বলেছিল, "আমি" সত্য,
সই প'ল সাঁইর আইন মত
শরায় কি তা মর্ম পায় ॥
কর্ম–বে এজনি বা এজনে আল্লাহ,
সাঁইর হুকুম 'আমি' হিল্লাহ,
(কিন্তু) লালন তেমনি কেঠো মোল্লাহ
ভেদ্ না জেনে গোল বাধায় ॥
[লালন গীতি]

এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে মরমী মনসুর হল্লাজের প্রভাব লালনের দ্রোহাত্মক সাম্য গর্ভে প্রায়োগিক সূত্রে প্রবুদ্ধ। আর. এ. নিকলসন তাঁর মিষ্টিসিজম নিবন্ধে জর্মন একহার্তের (Eckhart) একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, 'পূর্ণতা' শব্দটি খোদা ছাড়া আর কারুর জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ খোদা স্বয়ংসম্পূর্ণ আর অন্য সব জীবই অপূর্ণ (The word sum can be spoken by no creature but by God only; for it becomes the creature to testify of itself Non-sum) এই অপূর্ণতার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, সাড়ে তিন শতাব্দীকাল আগে বাগদাদের আবু নসর-আল-সররাজ এর কথার-ই-ছিল এটা পুনরুক্তি মাত্র এবং এটা ছিল তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া "আমি" কেউই বলতে পারে না; কারণ 'প্রকৃত ব্যক্তিত্ব' স্বয়ং আল্লাহতায়ালার। এটাই নৈর্ব্যক্তিক প্রবুদ্ধতা। এডওয়ার্ড কার্পেন্টার ছিলেন একই সংবোধে সংবেশিত। এই একটি অনুভূতির ভেতর ঘটেছে সব চিন্তাধারার সংশ্লেষণ। আর কার্পেন্টার মিশরীয় মরমী কামেল কবি ইবনু-ই-ফরিদের (১২৩৫খৃঃ) তা-ই-ইয়া'র (নং ৫৮০) উদ্ধৃতি টেনে সেই ঐকান্তিক সংবোধের উপমা হাজির করেছেন ঠিক এমনিভাবে,

যখন আমার চোখ সংলাপরত
তখন আমার কথারা চেয়ে চেয়ে দ্যাখে,
যখন কথা বলে আমার কর্ণ,
আমার হাতেরা তখন তা শুনে থাকে।
এবং দৃশ্যত সবকিছু দেখার জন্যে
যখন আমার কান হয়ে যায় চোখ
তখন গান শোনার জন্যে আমার চোখ
হয়ে যায় কান।

এ যেন সব কথার মিলন ঘটেছে এক কথায়। কিন্তু এরও একটা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপ অনুধাবনযোগ্য। পশ্চিমা দার্শনিকেরা ইসলামের এই মরমিয়া মনস্তত্ত্বের অনুধ্যানে (Mystical Psychology and Speculation) আবিষ্ট ছিল যখন মুসলিম দর্শনে ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের অপরিমেয় আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল স্পেন থেকে। ইসলামের

এই হিরন্ময় দ্যুতি থেকে ক্রিশ্চান ইউরোপ যে কতটুকু গ্রহণ করেছিল তার কোন পরিমাপ নেই। তবু এর অভূতপূর্ব প্রভাবের চুম্বকীয় আকর্ষণ ছিল বলেই সেই মধ্যযুগীয় ক্রিশ্চান ও ইসলাম ধর্মের মরমিয়াবাদের সমভূমে আবিষ্ট হতে পেরেছিলেন টমাস এ্যাকুইনো, একহার্ত এবং দান্তের মতোন মনীষীরা। এর সঙ্গে মরমিয়াবাদের মৌলিক ইতিহাস মরমী সাহিত্যের উপরি পাওনা। হিজরী সনের দ্বিতীয় শতকের উপান্তে (খ.৭১৯-৮১৬) মেসোপটেমিয়ায় মুসলিম মরমিয়াবাদের ভাষায় 'সুফী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। 'সুফ্' শব্দের অর্থে 'সুফী' র উৎপত্তি, এই অহেতুক তর্কে না গিয়ে আমরা সুফীতত্ত্ব বা মরমিয়াবাদের উৎপত্তিস্থল ইরাক এবং ইসলামী আদর্শাবলীই যে এর উৎস এটাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। গবেষক আর. এ. নিকলসনও বলেছেন, সুফীদর্শন মূলত ইসলামের কামেল সুফীগণ তাঁদের ঐকান্তিক সাধনার মাধ্যমে অর্জন করেছেন পয়গম্বর হজরত মহম্মদের (সাঃ) কাছ থেকে।

> [Let us take first the view that the basis of Sufism is essentially Islamic. The claim by the sufis to have inherited their doctrine from the prophet deserves respect.]

এখানে বাঙলা সাহিত্যে ফকির লালনশাহ এবং নজরুল ইসলামের মরমিয়া ও ইসলামী লোক-গান এবং গজল সমৃদ্ধ হয়েছে বিশেষতঃ পয়গম্বর-প্রীতি এবং আল্লাহর সঙ্গে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ (দঃ) এর সম্পর্ক ঘনিষ্ট করে তার মানবিক রূপ, দেহাবয়ব এবং পার্থিব ও পারলৌকিক যে সমস্ত চেতনার উন্মেষ ঘটানো হয়েছে তা অতীতের ইসলাম-মানস-চৈতন্যে উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ কামেল পুরুষ-মনীষীদের বাণী সমন্বিত বলেই প্রতীয়মান হয়।

আগের দিনে, খোদা প্রদত্ত প্রচন্ড শাস্তি পাওয়ার শঙ্কায় সংসার বিরাগী কামেল মুসলিম তপস্বীগণ কঠোর সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠাসহ অনবরত আল্লাহর রাহে আত্মনিবেদনমূলক স্তুতিতে (জিকির) মগ্ন হতেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে গৃহত্যাগ করে অনাড়ম্বর জীবন চর্চায় মরমী মুসাফির হওয়াটাই শ্রেয় হিসেবে গ্রহণ করতেন। তাঁদের ধারণায় আল্লাহর কোন শরীক নেই। পরমপ্রিয় আল্লাহর কাছে নতজানু হওয়া ছাড়া নরকাগ্নি থেকে মুক্তিলাভ এবং বেহেস্ত পাওয়ার বিকল্প কোন পন্থা নেই। আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস (তোয়াক্কেল) এবং সকল অবতার বিগ্রহের উপরে আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হওয়া, আল্লাহর ইচ্ছার (বিদা) কাছে আত্মসমর্পণই মরমিয়াদের ভাষণ। আর এই তত্ত্বেই, মরমিয়াদের ধর্মীয় রীতি ও আদর্শ ব্যক্ত। বসরার তাপসী রাবেয়া (৮০১খৃ.) ছিলেন এই মতাদর্শের পুরোধা। তিনি ছিলেন পিতৃমাতৃহীন ক্রীতদাসী। আল্লাহর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রেমের অভিব্যক্তি তিনি প্রকাশ করে গেছেন এই কবিতায়,

> তোমাকে যে ভালবাসি তার আছে দুটো রূপ,
> স্বার্থসঞ্জাত প্রথমটি এবং দ্বিতীয়টি পরার্থ।
> আমার সমগ্র চেতনায় জুড়ে আছে তোমার ভালবাসা।

এখানে আমি স্বার্থকামী নট। সুনির্মল
সে আমার প্রেম-সে শুধু তোমারই ভাষা।
তোমার উদয়ে তুমি উদ্ভাসিত আমার চোখের তারায়।
তাই তুমি অনুক্ষণ স্তুতিময় আমার হৃদয়ে।

মরমিয়া সুফী প্রাণে আল্লাহ্ স্বয়ং ব্যক্ত করে থাকেন—উক্ত প্রাণ আমার বান্দাহ আমার প্রতি আকর্ষিত হয়ে আশাতিরিক্ত আমার কর্মে মগ্ন থাকে বলেই আমি তাকে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন তার চক্ষু আমারই চক্ষু হয়ে দ্যাখে, তার জিহবা আমার ভাষা হয়ে কথা বলে এবং তার হাতও আমারই হাত হয়ে যায়।

. এই মানুষে সেই মানুষ আছে।

[লালনগীতি]

আর নজরুল গেয়ে ওঠেন,

আল্লাহ্ পরম প্রিয়তম মোর, আল্লাহ্ ত দূরে নয়
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়।

মরমিয়া সুফী তার হৃদয়ে আল্লাহকে দেখতে পান নজরুল দিব্যজ্ঞানে যেন দেখতে পান সেই পরমার্থকে।

আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি।

সুফী তাঁর মরমিয়া জ্ঞানে (Gnosis) অনবরত আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে যেন একাত্ম হয়ে পড়েন আল্লাহর সঙ্গে। এই জিকিরের প্রথম বিশ্লেষণাত্মক ধারণা দেন বসরার হারিস-আল মুহাসিভি (৮৫৭ খৃ.)। রাইয়া লি-হুকুক আল্লাহ্ বা ধর্মীয় বীক্ষণ পদ্ধতি (method of religious observance) পুস্তিকায় এটি বিশ্লেষিত আকারে দেওয়া হয়েছে। আহওয়াল বা মরমিয়া ধারণায় অর্জিত গুণাবলীর (মুকামাত) পথ (তরীকা) দেওয়া হয়েছে নানাভাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সন্তাপ বা সংলাপ। অতঃপর পর্যায়ক্রমে সে ত্যাগ, দারিদ্র,-ধৈর্য, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এ সবই পরবর্তী কর্ম প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি বিশেষ। বিষয় একই। আল্লাহর রাহে আত্মনিবেদনে ঐকান্তিকতা নজরুলের গানে এটা যথার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে-[খোদার প্রেমে শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।]

মরমিয়া চৈতন্যে তরীকা বা পদ্ধতিগত বিস্তর ব্যবহারিক প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সূত্রের ঐক্যে একই গন্তব্যের দিকে ধাবমান প্রত্যেকেই। এঁরা সত্যের গভীরতার প্রতীকীসমূহের প্রতি আস্থা রেখে ধর্মীয় বিধিবিধান সম্মত ধারাবলীর বর্ণন ও পালনের মাধ্যমে হৃদপিন্ডের (the works of heart) পরিচর্যা করে থাকেন। এর বিধিগত শাস্ত্রীয় তত্ত্বাবলী দিয়েছেন মহাতাত্ত্বিক ইমাম গাজ্জালী (১১১১খৃঃ) এবং জননন্দিত

নীতিজ্ঞ সাদী (১২৯১খৃঃ) দিয়েছেন এর বিষদ ব্যাখ্যা,

বড় জ্বালা তোমার আমার মধ্যিখানে
এই 'আমি'টি।
তোমার আমার মধ্য থেকে উঠিয়ে নাও
এই 'আমি' টি।
'আমি'-ই তুমি, তোমার মাঝে 'আমি'।
আমার ভিতর তোমার ভালবাসা
তোমার ভিতর 'আমি'
সবখানেতে তুমি আছ, তুমি শুধু তুমি॥

হৃদয় ভরে শুধু তোমায়–শুধু তোমায় ভালবাসি।
তোমার আমার সত্তা একই—
(আমরা) একই দেহের অধিবাসী।
দেখলে আমায়, তুমি দেখবে তোমায়,
দেখবে ঠিকই তোমার মাঝে আছি আমরা দু'জনায়॥

জালালউদ্দীন রুমীও ঠিক এই একই কথার প্রতিধ্বনি তুলেছেন,

দু'জনে থাকি এক প্রাসাদে, তুমি এবং আমি।
এক দেহেরই দ্বৈত রূপ, দ্বৈত আকার, তুমি এবং আমি

লালন বলেন,

সে নড়ে কি 'আমি' নড়ি,
আমার 'আমি' হাতড়ে ফিরি...

নজরুলের কণ্ঠে,

সুরুজ থাকে কোন সুদূরে,
সূর্যমুখী তারেই চায়।
তেমনি 'আমি' চাহি খোদায়
চাহি না হিসাব করে॥

দারুণ প্রত্যয়ে মনসুর হল্লাজ নিজেকে খোদা বলে ঘোষণা করেছিলেন। হল্লাজের 'আনাল হক' এর মধ্যে সক্রিয় ছিল মরমিয়া প্রজ্ঞা। গভীর রহস্যের অন্তহীন উৎসে তিনি আত্মহারা হয়েই নিজের মধ্যে পরমের আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

মুহীউদ্দিন ইবনু-ই-আরাবী (১১৬৫–১২৪০) সম্পন্ন মানুষের (perfect man)সন্ধানে কাব্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যের মরমিয়া সুরে তিনি কল্পনা করেছেন, খোদা মানুষকে হাত-পা বেঁধে যেন ফেলে দিয়েছেন অথৈ সমুদ্রে , আর বলেছেন, গা বাঁচিয়ে চল, গা বাঁচিয়ে চল, গা যেন ভিজে না যায়। হল্লাজের লোকান্তরের পরের শতকে 'কিতাব-উল-লুমা'-তে আবু নসর আল-সররাজ এবং আবু তালেব আল মাকিক 'কুতুব-উল-কুলুব'-এ সুফী মতবাদের ওপর গবেষণা চালিয়েছেন।

ইসলামের তৌহিদবাদ থেকে সরে এসে সর্বেশ্বরবাদ (pantheism and antinomianism) প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসে চিড় ধরালো গ্রীক দার্শনিক-তত্ত্বীয় ধারণার অবাধ ও উদার দ্বন্দ্ববাদের অবতারণায়। কিন্তু পারস্যের মরমী কবি আবু সাঈদ (খৃ. ৯৬৭–১০৪৯) যথার্থই ঐসব বৈরাগ্যে বিশ্বাসী পান্ডিত্য অগ্রাহ্য করে বলেছেন, যিনি সাধারণ্যে চলাফেরা করেন, সাধারণের মধ্যে আহার করেন, নিদ্রা যান, বাজারে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বেসাতিতে অংশগ্রহণ করেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর-সংসারে ব্যস্ত থেকে সামাজিক সম্পর্ক অটুট রাখেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে যান না আল্লাহকে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সাধক দরবেশ। দয়া, মমতা, দান খয়রাত মানুষের আত্মভূষণ, আত্মনিবেদন বা আত্মত্যাগের মাধুর্য আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার সামিল। হল্লাজের মতোন আত্মলীন হয়ে যাওয়ার মধ্যে তিনি মুক্তি খোঁজেন নি। তিনি পেয়েছেন আত্মবন্ধনের মধ্যে মুক্তি, যেখানে বিরোধে রয়েছে সংঘাত (Conflict), আল্লাহর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মানবিক সংঘাত যে অসার সে বিষয়ে সাঈদ সচেতন ছিলেন। পরবর্তীতে কাসুরীর পত্র (লিখিত ১০৪৫ খৃঃ) সুন্নাহ-বিরোধী আচরণ, কাম-ক্রোধ পশুত্বের অবোধ প্রশ্রয়, আইন, দৈবজ্ঞান, হৃদয়বেদ্য স্বর্গীয় প্রেম এবং আত্মবর্জনের মতোন সদ্‌গুণাবলী যখন অন্তর্হিত হচ্ছিল এমনই এক দুঃসময়ে আবু হামিদ গাজ্জালীর আবির্ভাব (খৃঃ ১০৫৮–১১১১)। গাজ্জালীর সুফী হওয়ার বিষয়টি ছিল বিস্ময়কর। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সন্দেহপরায়ণ। পরিণত বয়সে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন তাঁকে পরমের প্রতি আগ্রহান্বিত করে মরমিয়া ধ্যানে জ্ঞানতাপস করে তোলে। যখন তিনি পরম সত্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তখন তাঁর মধ্য থেকে সন্দেহের ঘোর আপনা আপনিই নিক্রান্ত হয়ে যায়। বই পড়ে মরমিয়া রহস্য অনুধাবন সম্ভব নয় জেনেই তিনি দরবেশ হওয়ার তাগিদ অনুভব করেন এবং মরমিয়া হন যে, সকল সত্যের উৎস হচ্ছেন স্বয়ং হজরত মহম্মদ (দঃ)। মিশকাতুর আনওয়ারে তিনি বলেন, 'আল্লাহ সূর্য যেমন— যার কাছ থেকে আমরা পাই জীবন এবং জীবনের আলো এবং অন্য সব কিছুই আমরা প্রাপ্ত হই তাঁর অপার মহিমা থেকে। এই যে অনুভূতি যা স্বভাবতঃই আমাদের মনকে উতলা করে তোলে কোন অজানা রহস্যের পানে। যথার্থই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি কত অজ্ঞ।' ইমাম গাজ্জালীর (রাঃ) মধ্যে সর্বেশ্বরবাদের ভাব থাকলেও তাঁর মর্মমূলে ছিল ইসলাম অনুসৃত তৌহিদী মরমিয়া। লালন বলেন,

> কারে শুধাব রে, মর্মকথা, কে বলবে আমায়। আকার কি নিরাকার সেই দয়াময়॥ যখন সাঁই (God) নিরাকারে ভেসেছিলেন ডিম্বভরে কি রূপ ছিল তার মাঝারে, শেষে কি রূপ হয়॥ সেতারা রূপ ছিল যখন, গহনারূপে পাক পাঞ্জাতন, আকারে কি নিরাকার তখন, বল পরিচয়॥ জগতপতি সোবহানে, 'বরকতকে মা বললে কেনে, তার কি পতি নয় সেজনে?'

এই যে অপার জীবন রহস্য, এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জিজ্ঞাসার কোন অন্ত নেই। হিজরী সনের তৃতীয় শতকে মরমিয়া ধর্মের গোড়া পত্তন হয় এবং এই নব উদ্ভাবিত

সমাজ তার কাজ শুরু করে দেয়। মিশরে ধু-ই-নূন ইসলামে মারিফা'র প্রবর্তন করেন। সেটা ছিল আনন্দ-ধ্যানে জ্ঞানার্জন যা প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানার্জন (ইলম) থেকে ছিল ভিন্ন। আল্লাহ্ সম্পর্কে তিনি কি জানেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি খোদাকে জানি খোদার অন্তর্গত হয়ে। তাঁর উত্তর ছিল অনেকটা ডায়োনিসিয়াসের মতোন।

ডায়োনিসিয়াস বলতেন, 'যা তুমি ভাবো বা কল্পনা কর তারই প্রতিপক্ষে রয়েছেন খোদা অর্থাৎ খোদা সম্পর্কে যত ভাববে ততই তুমি খোদার ভেতর তলিয়ে যাবে।'

রহস্যের এই চরম অজ্ঞেয়বাদে আমাদের সাধারণ কর্ণ বিভ্রান্তির বঙ্কিম পথ গ্রহণ না করুক এটাই কাম্য। তবুও প্রতীকীর অতি ব্যবহার, প্রযুক্তি ও প্রজ্ঞার প্রসারণ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদে অন্তর্নিহিত থাকবেই। জ্ঞানীজনের কাছে এটা বুঝে নেওয়ার বিষয়, অজ্ঞের বা অবুঝের কাছে এটা হবে সংঘাতের। অতএব, দর্শনতত্ত্ব জ্ঞানীদের মাধ্যমে সাধারণের কাছে আসুক সহজবোধ্য হয়ে।

রুমী এখানে স্মরণযোগ্য,

জ্ঞানের পথ দুর্গম, দুরতিক্রম্য—
আল্লাহ ছাড়া প্রেমিকদের কোন পথ নেই।

লালন বলেন,

সাঁই দরবেশ যারা
আপনার ফানা কোরে অধরে মেশে তারা ॥

[হারামণি-২৫]

পারস্যের বিস্তামের আবু ইয়াজিদ যাঁকে আমরা বাংলাদেশে বলে থাকি বায়াজিদ বোস্তামী, তিনি ভারতীয় তৌহিদীর (monism) প্রতি আকর্ষিত হয়ে ফানা মতবাদ অর্থাৎ আত্মবিলীন বা আত্মলীন হওয়ার কথা বলেন এবং তারপরেই এরই সমার্থক বাকা অর্থাৎ আল্লাহর ভিতর সমাহিত (United life in God) হওয়ার কথা যুক্ত করেন। এক পর্যায়ে বায়াজিদ খোদার ধ্যানে তাঁর অদম অন্তর্লীন হওয়ার কারণে পারস্যের সুফীদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে কিংবদন্তী হয়ে রয়েছেন। তাঁর সহিয়াত বা সুবহানী অর্থাৎ আমি খোদার সিংহাসনে আসীন এবং আমি গৌরবান্বিত এই মর্মে তিনি যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তা আজও কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে।

লালন তাই বলছেন,

আপনাতে আপনি ফানা
হলে তারে যাবে জানা
স্বরূপ রূপ দেখ সংক্ষেপে॥

[হারামণি-৪, পৃষ্ঠা ৯]

অদ্বৈতবাদী ইবনু-ই-আরাবী ওয়াহাদাত-উল-ওয়াজুদ এ অদ্বৈত সত্তার বর্তমানতা

সম্পর্কে বলেন, যা দুনিয়ায় ঘটে থাকে তা আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্বেই নির্ধারিত। আল্লাহর জ্ঞান থেকে যা কিছু দুনিয়ায় আসে, তা আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়। [ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন]

No creation ex-nililo অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতায় কিছুই সংঘটিত হয় না। তাহলে সেই অস্তিত্বের ভিতরের বিষয়টিইত হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। আর বাইরের রূপটি হচ্ছে বিশ্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর আবিশ্ব সৃষ্টি বর্তমান। কারণ ব্যতীত যেমন কোন ঘটমান বিষয় নেই, তেমনি মানুষ তার আপন ভুবনে (microcosm) আবর্তিত, যেখানে আল্লাহর সকল গুণাগুন অন্তর্নিহিত এবং মানুষের অন্তর্গত সত্তায় সেই অস্তিত্ব সর্বত্র সর্বদায়ই অনুভূত হচ্ছে।

(man is the microcosm in which all the divine attributes, are united and in Man alone does God become fully conscious of Himself)

লালন সম্ভবতঃ ইবনু-ই-আরাবীর অনুসরণেই গেয়েছেন।

'এই মানুষে সেই মানুষ আছে।' সেই মানুষ সত্য-মানুষ পারফেক্ট ম্যান।

'ওরে মন সত্য বল, সুপথে চল।'

ইবনু-ই-আরাবীই প্রথম উচ্চারণ করেছেন, সকল ধর্মেই 'তিনি' আছেন এবং তাঁর ভাষ্যে,

আমার স্বরূপে আছে সর্বরূপ;
সাধুর নামাবলি, মূর্তিসর্বস্ব মন্দির,
মায়া হরিণের চারণভূমি, কাবার ভক্ত প্রাণ,
তোরাহ'র পত্রাবলী, আল-কোরান,
প্রেম-ই আমার বিশ্বাস, যেখানে যাক না তাঁর
উষ্ট্রের কাফেলা, তৌহিদী আমি, তৌহিদ আমার আত্মার ॥

লালন বলেছেন, 'প্রেম অমূল্য নিধি'

স্বরূপে রূপ আছে গিলটি করা॥
শতদল সহস্রদলে/রূপ-স্বরূপে ভাটা খেলে
ক্ষণেকে রূপ রয় নিরালে,
ক্ষণেকে হয় নিরাকার ॥...
..স্বরূপের ঘরে অটল রূপ নিহারে...

এর আরো ব্যাখ্যা লালন সহজ কথায় দিয়েছেন,

আপনার জন্মলতা
খোঁজ তো তার মূলটি কোথা,
লালন কয় পাবি সেথা

সাঁইর পরিচয় ॥...

'মহাসমর' কবিতায় নজরুল ইসলাম বলেছেন,

তৌহিদ আর বহুত্ববাদে বেধেছে আজিকে
মহাসমর,
লা-শরীক' এক হবে জয়ী...কহিছে,
'আল্লাহু আকবর'
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে
অন্ধকারে এ ভেদজ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ' মন্ত্রে টুটিবে,
সকলে হইবে এক সমান।

ইসলামের মরমীয়া জ্ঞানে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস অর্পণ করলে সাম্যবাদের যে সম্যক সূচনা হয় তাতে যেমন স্রষ্টার প্রতি প্রত্যয়ী হওয়া যায় তেমনি এ দুনিয়া থেকে অপসারিত হয় মানুষের তৈরী কৃত্রিম দুঃখের কারণসমূহ। মরমীয়ার সকল জটিলতা মুক্ত করেছেন নজরুল। তিনি আরো আধুনিকতম সহজ ভাষায় আল্লাহর প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করেছেন,

সকল রঙের খেলার উর্ধ্বে পরম জ্যোতি আল্লাহরে।
দেখেনি যেজন, বুঝিবে না এই আল্লাহর খেলা সংসারে
তিনি আদি কবি, সৃষ্টি জুড়িয়া কবিতা লেখেন দিবস রাত'..
তেমনি পরম আদি কবি তিনি-নিরাসক্ত ও আলহ আহাদ,
'মনসুখ' করি দেন অসুরের, আনেন জগতে সাম্যবাদ
সুন্দর হয় সৃষ্টি তখন 'পরমা-শ্রী'তে পূর্ণ হয়,
কে বুঝিবে সেই আহাদের খেলা, যে চির পরম অমৃতময়।

নজরুল এই সঙ্গে আবার আক্ষেপও করেছেন এবং তাঁর দুঃখবোধ ও দ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই ভাবে,

এই তৌহিদ-একত্ববাদ বারে বারে ভুলে,
এই মানব,
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতালতলের
ঘোর দানব।

প্রকৃতির সামগ্রিকতায় একটা ভারসাম্য বিরাজমান। সকল ঘটমান বর্তমানতায় বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক। আবর্তন ও বিবর্তন প্রকৃতির গতিময়তায় চিরন্তন। লক্ষ্যযোগ্য যে, এরই মধ্যে এতটা সুষম শৃঙ্খলা প্রকৃতিকে আবহমান একটা দ্বন্দ্বাত্মক ধারায় ব্যপ্ত রেখেছে। এর মধ্যে একটা আত্মিক জীবনাধারা এমন এক পুঞ্জিভূত রহস্যের আবর্তে আমাদের স্থুল দৃষ্টির বাইরে অবস্থান করছে যার ভাবনাবলি পুরাণেও

লক্ষণীয়। ভগবৎ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে'

প্রকৃতিকে জানো এবং এর সত্তাকে (spirit) উপলব্ধি কর–এর কোন আদি নেই, এর গুণাবলী লক্ষ্য কর, এর সকল রূপান্তর বা বিবর্তন প্রকৃতির নিয়মেই হয়, প্রকৃতির ছাঁচে এ সক্রিয়। কিন্তু আপনার সত্তায় আত্মচৈতন্যে আনন্দ–বেদনায় উপলব্ধি আমরা অনুভব করে থাকি।

আত্মা জড়িয়ে থাকে জড় বস্তুতে,
জড় নড়ে ওঠে, স্বয়ং সক্রিয় হয়...

এই জটিলতার ভেতর থেকে আমরা আমাদের মনকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে পারি, বিমুক্ত হতে পারি, ম্লানিমা-গ্লানিমা থেকে, সত্য মানুষ (Perfect man) যে আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, এই অভিধায় দীক্ষিত হয়ে আমরা মানবিক কল্যাণে সার্বক্ষণিক ব্রতী হতে পারি, তার যেমন একটা সুবিমল বাহ্যিক রূপ আছে, তেমনি আছে সুনির্মল আত্মিক রূপ।

নজরুল সেই দীক্ষায় আমাদের দীক্ষিত করতে চেয়েছেন'

(১) ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো
ভবনটা সে সত্য নয়।
ঘরটাই তোর সত্য নয়।
(২) বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য
নিত্যকালের তার আলোকে।

লোক সমাজের শাসক রাজা,
রাজার শাসক মালিক সেই
বিরাট যাঁহার সৃষ্টি এই,
তাঁর শাসনকে অগ্রে মান,
তাঁর বড় আর শাস্ত্র নেই,
তার বড় আর সত্য নেই
সেই খোদা খোদ সহায় তোর,
ভয় কি? নিখিল মন্দ ক'ক্‌।
বিধির বিধান মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল,
আছেন সত্য মাথার 'পর,
বে-পরওয়া তুই সত্য বল্‌।
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্‌।
সত্যতে নেই ধানাই পানাই...।

মরমী গানে ফকির লালন শাহ আমাদের অগ্রযাত্রায় অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয়

এবং নজরুল সেই সত্যের মরমী হৃদয়ের পথিকৃত। গানের সংখ্যা দিয়ে গানের কোন বিচার হয় না, বিচার হয় গানের মরমী সত্যকে মানুষের অবিরাম সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় চালিকা-শক্তি রূপে ব্যবহারের উপর। বাঙলা সাহিত্যে সেই একটি সত্যকে লালন পূর্ব-সুরী এবং নজরুল উত্তরসুরী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে আমাদের হৃদয়ে একটা চিরকালের জন্যে আসন করে নিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা যেন সেই সত্যকে উপলব্ধি করি যে, মরমিয়া রহস্যের অনির্বচনীয় ফল্গুধারায় ইসলাম ধর্মের সর্বজনীনতা কোন দেশ বা জাতির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়; মানবিক কল্যাণের তাগিদে যে ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্যে পরমাত্মিক এবং ব্যবহারিক জীবনে সেই ইসলামই সমানে স্বতঃসিদ্ধ।

তথ্য নির্দেশ

১. দ্য লিগেসি অব ইসলাম—স্যার টমাস আরনল্ড ও আলফ্রেড গিলাউম সম্পাদিত।
২. দ্যা ফেইথ এন্ড প্র্যাকটিস অব আল গাজ্জালী—এম, ওয়াট।
৩. দ্য মিস্টিকাল ফিলোসফি অব মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী—এই, আফিফি।
৪. হারামণি—মুহম্মদ মনুসুর উদ্দীন, সপ্তম খন্ড, বাংলা একাডেমী।
৫. ইন্ডিয়ান ফিলোসফি ইন মডার্ণ টাইমস্—ভি, ব্রডও
৬. মিস্টিসিজম—ই, আন্ডারহিল।
৭. দ্য মিস্টিকস্ অব ইসলাম—আর, এ, নিকলসন।
৮. নজরুল রচনাবলী —আব্দুল কাদির সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী।
৯. দ্য ডক্‌ট্রিন অব সুফীস—এ, জে, আরবেরী।
১০. কুষ্টিয়ার বাউল সাধক—আবুল আহসান চৌধুরী।
১১. লালন শাহ—ঐ
১২. লালন শাহ ও লালন গীতিকা—মুহম্মদ আবু তালিব, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী।
১৩. এ্যাস্পেক্টস অব নজরুল সংগস্—ডঃ করুণাময় গোস্বামী
১৪. ম্যাটেরিয়ালিজম এণ্ড এম্পিরিকো ক্রিটিসিজম—ভ. ই., লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, প্রগ্রেস পাবলিশার্স মস্কো।
১৫. বিশ্ব মরমী চিন্তাধারায় রুমী—মোহম্মদ গোলাম রসুল।
১৬. নজরুল সমীক্ষা—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
১৭. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম — সৈয়দ আমীর আলী।
১৮. রেনেসাস অব ইসলাম—এম, এ্যাডমস, মার্গোলিখ ও খোদাবকস্ অনূদিত।
১৯. রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম, —ড.মোহাম্মদ ইকবাল।
২০. দ্য কমপ্লিট ওয়ার্ডস—বিবেকানন্দ, তৃতীয় খন্ড।
২১. মিশকাট আল আল আনোয়ার গাজ্জালী— ট, এ, এইচ গার্ডনার।

২২. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী—বাংলা একাডেমী, প্রথম খণ্ড, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত।

২৩. বাউল কবি লালন শাহ—অধ্যাপক, এ, করিম।

২৪. জাগরণ—কাজী নজরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন, ঢাকা বাংলাদেশ।

২৫. লালন সঙ্গীত চয়ন—ডঃ খোন্দকার রিয়াজুল হক।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা — পঞ্চদশ সংকলন]

নজরুল-সঙ্গীতে
লোক-ঐতিহ্য ও লোক-সুর

আশরাফুল আলম

গান ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে নিতান্তই আধুনিক কালে। বাংলা গানের ধারায় চর্যাপদ থেকে বৈষ্ণব পদাবলী পর্যন্ত কবিতা ও গানের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। গীতি কবিগণ তাঁদের গান রচনায় বিষয়বস্তু ও সুরকে সুন্দররূপে প্রকাশ করতে লোকজ ঐতিহ্যের কাছে হাত পেতেছেন। একসময় বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলার বাইরেও ভাব-রসের বন্যা বইয়ে দেয়। তার অন্যতম কারণ পদ রচয়িতাগণ তাঁদের রচনাকে করেছিলেন লোক-ঐতিহ্য-মণ্ডিত। লোক কাহিনী, চলমান মানব জীবনাচরণ, সম্প্রদায়গত দর্শন ছিল তাদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নজরুলের গান কবিতাও বটে। একথা অবশ্য অন্যান্য গীতিকারের গানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সমস্ত গানই কবিতা, যদিও সমস্ত কবিতাই গান নয়। নজরুলের গানে লোক-ঐতিহ্যের ব্যবহার আধুনিক বাংলা গানকে করেছে বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তেইশ বছর সাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চার মধ্যে কবি শেষের নয়-দশ বছর সঙ্গীত-চর্চার মধ্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এত অল্প সময়ে রচনা করেছেন আড়াই হাজারের অধিক সংখ্যক গান।

নজরুলের গান বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আধুনিক গান ছাড়াও দেশাত্মবোধক, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, ঝাপান, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি গান রচনা করেছেন। তবে তাঁর প্রায় সমস্ত গানই লোক-ঐতিহ্য মহিমায় উদ্ভাসিত।

পদ্মার ঢেউরে—
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা যারে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে॥
মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই (নাইরে)
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে সুগন্ধ নাইরে—
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে রে॥
ও পদ্মারে—
ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো,
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি
ঝিল্‌মিল্ করে কৃষ্ণ-কালো।

সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস, তারে, দিস্ এই পদ্ম তার পায়—
বলিস্ কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

(আদি রেকর্ড-ভিত্তিক নজরুল সঙ্গীতের নির্বাচিত সংকলন, নজরুল ইনস্টিটিউট, পৃ. ৪০।)

নজরুলের এ ভাটিয়ালী সুরের গানে স্থায়ীতে নদীর ঢেউয়ের উপমা, সঞ্চারীতে বঁধুয়ার রূপ কৃষ্ণের সাথে তুলনা করেছেন। কৃষ্ণরূপসম প্রেমানল জ্বালিয়ে প্রেমের মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়—যেন একালের প্রেমমুগ্ধ নর-নারীরই জীবন কথা।

বাংলা লোকগীতির এক বিশিষ্ট ধারা ভাওয়াইয়া। এ গান রংপুর দিনাজপুর, কুচবিহার অঞ্চলের গান। কাজী নজরুল ভাওয়াইয়া সুরেও গান রচনা করেছেন,

নদীর নাম সই অঞ্জনা
. নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি ॥

(গ্রাম্য সঙ্গীত, বন-গীতি : নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪, বাংলা একাডেমী)

নজরুল এ ভাওয়াইয়া সুরের গানের ভেতর দিয়ে নর-নারীর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন নদীর পটভূমিতে। নদী ও নদীর জল বাঙালি জীবনের সাথে গভীরভাবে মিশে আছে। যা·শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর যমুনা নদীর সাথে তুলনীয়।

রাঙামাটির পথে লো মাদল বাজে,
বাজে বাঁশের বাঁশী,
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো।
মন লাগে না কাজে লো,
রইতে নারি ঘরে ওলো
প্রাণ হল উদাসী লো ॥

মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে লো
দোল লাগে শাল-পিয়াল বনে, নোটন খোঁপার ফুলে লো,
মহুয়া বনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো।

চোখে ভালো লাগে যাকে, তাকে দেখব, পথের বাঁকে।
তার চাঁচর কেশে বেঁধে দেব ঝুমকো জবার ফুল
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানের দুল্।
তার নাচের তালে ইশারাতে বল্‌ব, ভালোবাসি লো॥

(আদি রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন, নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৪৮২)

নজরুলের ঝুমুর গানে ব্যবহৃত 'মাদল' এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। যা পাহাড়ী সাঁওতালীদের আনন্দোৎসবে ব্যবহৃত অপরিহার্য যন্ত্রবিশেষ। প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া মিশ্রিত বিষয়বস্তুই ঝুমুরের বৈশিষ্ট্য। নজরুলের এইরূপ গানেই আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়।

নজরুল তাঁর অনেক গানে বাউলের সুর গ্রহণ করেছেন, এমন কি বাউলের ধ্যান-ধারণাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। বাউল গানের মূল কথা মানবতাবাদ, এর সাধনা দেহতত্ত্ববাদ, যা অনেক সময় প্রচলিত সমাজ-ধর্ম বিরুদ্ধ হয়। নজরুলের বাউল গানের মধ্য দিয়ে বাউল ভাবনার পরিচয় পাই,

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ ॥
সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তারে প্রণাম করি, বক্ষে ধরি,
কভু তা'রে বিলাই স্নেহ ॥

ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
তা (রা) মোর সাথে মিলন বিরহ ॥
সেআমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি'
চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে এক তারাতে,
কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ ॥

(চন্দ্রবিন্দু, নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১)

বাউলদের দ্বারা রচিত ও গীত গানের নাম বাউল গান। বাউল এক প্রকার লৌকিক অধ্যাত্ম সাধনা। মনের মানুষ পরম আরাধ্য ও পরম প্রিয়, এই দেহেই তার অবস্থান। তাকে চেনার প্রচেষ্টাই বাউল সাধনা। যেমন লালনের এই গানটি,

মিলন হবে কতদিনে
আমার মনের মানুষের সনে।

বাউলেরা অনেক ভাষা রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করে। যা ঐ তন্ত্রের সাধক ছাড়া সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়,

ত্রিবেণীর ত্রিধারে
মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে।

উদাহরণকৃত নজরুলের এ বাউল গানের শেষ লাইন,

কেউ বোঝে বোঝে না কেহ

এ গানে বাউলের গুপ্ত সাধন তত্ত্বকেই বুঝিয়েছেন। বাউলদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবিমনই যেন 'ক্ষ্যাপা বাউল'।

রাধা কৃষ্ণ লীলাকে একটি গীতিনাট্য কল্পনা করলে জন্ম, বাল্য, গোষ্ঠ, দান, নৌকা, অভিসার, মিলন, বংশী, বসন্ত ও হোলী, ঝুলন, রাস, শাপ, বিরহ, ভাবসম্মিলন, নিবেদন, প্রার্থনা ইত্যাদি উপ-বিভাগ মেলে। (ড. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা)। নজরুল সচেতনভাবে হয়তোবা প্রত্যেকটি উপবিভাগের জন্যে গান-কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু তাঁর রচনাবলীতে বিভিন্ন উপ-বিভাগ সম্পর্কিত কবিতার সন্ধান মেলে।'[১]

বাল্যলীলা ঃ

নন্দ-দুলাল নাচে, নাচেরে —হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে
ব্রজের গোপাল নাচে, নাচেরে—হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে ॥
হাতের নাড়ু মুখে ফেলে
আড়-চোখে চায় হেলে-দুলে
যেথায় গোপীর ক্ষীর-ননী দই-এর হাড়ি আছে ॥

শূন্য দু'হাত শূন্যে তুলে দেয় সে করতালি,
বলে 'তাই, তাই, তাই'
নন্দ পিতায় কয় ইশারায় নাই ননী নাই।
নন্দ ধরতে গেলে যায় পিছিয়ে,
মুচকি হেসে যায় এগিয়ে
যশোমতীর কাছেরে ॥
কহে শিউরে উঠে শিমুল ফুল- নাচরে গোপাল নাচ,
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে ডুমুর গাছ রে-
নাচ রে গোপাল নাচ।
শিমুল গাছের গায়ে সুখে কাঁটা দিয়ে ওঠে
ফুল ফোটে মোর আকাশে॥
নাচ ভুলে সে থমকে দাঁড়ায়
মার চোখে জল দেখতে সে পায় রে;
ননী মাখা দু'হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে
লুকায় বুকের কাছে ॥

(আদি রেকর্ড-ভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের বাণী সংকলন, নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৬২১।)

এ গানে কৃষ্ণের বালককালের কয়েকটি দিক বিশেষ করে ননীচোরা প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে।

পূর্বানুরাগ

শ্যাম নাম ও তার বাঁশি কানের ভেতর দিয়ে রাধার মরমে পশেছিল, রাধার মনে জন্মেছিল কৃষ্ণের জন্যে অনুরাগ। নজরুলের গানে কৃষ্ণ নাম ও বাঁশি প্রসঙ্গ এসেছে,

সখি, সে হরি কেমন বল্।
নাম শুনে যার এত প্রেম জাগে
চোখে আনে এত জল ॥
সে কি আসে এই পৃথিবীতে
গাহি রাধা নাম বাঁশরিতে ?
যার অনুরাগে বিরহ-যমুনা হয়ে ওঠে চঞ্চল ॥
তারে কি নামে ডাকিলে আসে,
'কোন রূপ কোন গুণ পাইলে সে
রাধাসম ভালবাসে ?
সখি শুনেছি সে নাকি কালো,
জ্বালে কেমনে সে এত আলো,
মায়া ভুলাইতে মায়াবী সে না কি
করে গো মায়ার ছল ॥

(নজরুল রচনাবলী-৩, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৪৪)

নজরুলের এরূপ অনেক গানই বৈষ্ণব উপাদানে সমৃদ্ধ। নজরুলের ইসলামী গানেও বৈষ্ণব উপাদান দেখা যায়। নবরাগ মালিকার একটি গানে জুলেখার আর্তি, রাধার আর্তি থেকে অভিন্ন। জুলেখা নিজেকে অবরোধবাসিনী কুলের কুলবালা মনে করে বলেছে,

বাজিয়ে শাহাদতের বাঁশি,
কেন ডাক নিত্য আসি
হাজার বছর আগে তোমায় দিয়েছি মালা।

নজরুলের ইসলামী গানও বাঙালি সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কেননা এ সমস্ত গানেও তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন।

'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' এই বিখ্যাত গানটিতে হজরত আমিনার কোলে মোহম্মদের আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের মহিমা বর্ণনা করলেও সমগ্র গানটিতে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিরা যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে কল্পনা করেছেন, যেভাবে সেই আবির্ভাবের মহিমা কীর্তন করেছেন, নজরুল ইসলাম উপরোক্ত গানটিতে হযরত মোহম্মদের মহিমা সেই একইভাবে কীর্তন করেছেন। এছাড়াও নজরুলের কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীতে হিন্দুদের জীবনাচরণ ও ধর্মীয় পরিচয় বিধৃত। তবে নজরুলের প্রায় সমস্ত গানই যার মধ্যে বাঙালি ঐতিহ্য—হিন্দু

ধর্ম, ইসলাম, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং অনেক কিছুরই অবাধ সমন্বয়।

মানবতাবাদী নজরুল একজন সার্থক গণসঙ্গীত রচয়িতা। 'গণসঙ্গীত' সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয়বাচক সঙ্গীত।

নজরুল গানে হিন্দু মিথ, গাজন উৎসবকে উপমা হিসেবে নিয়েছেন যা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে নজরুলের এরূপ অসংখ্য দেশাত্মবোধক গানে নজরুল প্রচলিত দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন, সুচিন্তিতভাবেই গানকে আরও অধিকতর তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্যে

ক. জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত,

খ. মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো মন্ত্র দিয়ে নয়।

নজরুলের আধুনিক গান, এলো শ্যামল কিশোর অথবা নীলাম্বরী শাড়ী পরে এই গানের মধ্যে নজরুল রাধা ও কৃষ্ণের উপমা দিয়ে এ যুগের নর-নারীর প্রেম কথাই শুনিয়েছেন।

টি. এস. এলিয়ট লিখেছিলেন. Tradition is the pastness of the past and of the presence. ঐতিহ্য সচেতন নজরুল লোক সাহিত্যে লোকসুর শুধু অতীতে সীমাবদ্ধ না রেখে বর্তমানের সঙ্গে মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পৃথিবীতে সঙ্গীতের নানা প্রকারভেদ সত্ত্বেও সঙ্গীতের মূলধারা কিন্তু রয়ে গেছে দু'টি শাখায় বিভক্ত। প্রথমটি আধ্যাত্মিক ও উচ্চমানের ভাব সাধনার জন্যে, শেষেরটি সাধারণতঃ লৌকিক জগতের মানবিক অনুভূতিকে বিকশিত করার জন্য। তাই প্রথমটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও শেষেরটি লৌকিক সঙ্গীত। যে কোন জাতির সংস্কৃতিতে লৌকিক সঙ্গীতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে অনেকে লঘুসঙ্গীতও বলেন।

হিন্দুস্থানী গেয় রাগ সঙ্গীত বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আদর্শে গঠিত। সেখানে সুরের সাহায্যে গানের বাণীকে পরিস্ফুট করে তোলার পরিবর্তে কথাকে অবলম্বন করে সুরের ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই সঙ্গীত পরিবেশনার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভাষা নিরপেক্ষ সঙ্গীতাদর্শ বাংলা গানের নয়, পদবাহিত ভাব ব্যঞ্জনাকে সুরের সাহায্যে তীব্র করে তোলাই বাংলা গানের উপজীব্য। বাংলা গানের উৎপত্তি সাহিত্যের ভূমিতে সুরের আকাশে প্রকাশের জন্য। এখানে কার্যত সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটে। রসের স্বাভাবিক টানে সুর ও বাণী এখানে পরস্পর মিলিত হয়। চর্যাগীতি থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা গানের যে মুখ্যপ্রবাহ তার সাঙ্গীতিক অবয়ব নির্মিত হয়েছে প্রধানত হিন্দুস্তানী রাগ সঙ্গীতের সাহচর্যে। রাগ ও রাগ সঙ্গীতিক রূপবন্ধ এই সঙ্গীত প্রবাহের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ। হিন্দুস্থানী গেয় সঙ্গীতের বিশুদ্ধ সঙ্গীতে সম ভাষা নিরপেক্ষ সাঙ্গীতিক কখনো বাংলা গানে উপজীব্য হয়নি। বাংলা অতি সংক্ষেপে গণসঙ্গীতকে

শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের গানরূপেও অভিহিত করা হয়।[২] নজরুলের গণ সঙ্গীত শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের চেতনায় উজ্জীবিত। প্রকাশ করেছেন স্বদেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরিখে,

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল্ কর্‌রে লোপাট
রক্ত- জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।
গাজনের বাজ্‌না বাজা।
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত-স্বাধীন সত্য কে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি?
সর্বনাশী-
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা
জোর্‌সে ধ'রে হেঁচ্‌কা টানে!
মার্ হাঁক হায়দরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে।

নাচে ঐ কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার, ভাঙরে তালা।
যত সব বন্দী-শালায়-
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি।

(আদি রেকর্ড-ভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন, নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৫৬১-৬২।)

গান কবির রচনা। সুরের সাহায্যে কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত করে তোলাই এই গানের বড় একটা আদর্শ। একজন প্রধান বাঙালি সঙ্গীত রচয়িতা মূল্যায়ন হবে বাংলা গানের আবহমান বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে।[৪]

সঙ্গীতের প্রতি নজরুলের এই অনুরাগ আবাল্য। একদিকে সঙ্গীত রচনা করেছেন অন্যদিকে করেছেন সুর সংগ্রহ। ওস্তাদের নিকট থেকে তিনি যত না রাগ শিক্ষা করেছেন, তার চেয়ে বেশি আহরণ করেছেন তার পাশের সুর গুঞ্জন থেকে।

এ গুঞ্জরণ ভেসে এসেছে কোন কলাবিদের কাছ থেকে নয়, নিতান্ত অজানা কোন পথচারীর নিকট থেকে। হয়তো ভিখারীর কণ্ঠ থেকে, মাঝি মাল্লা বা রাখালের কাছ থেকে, চট্টগ্রাম এবং সন্দ্বীপ বেড়াতে গিয়ে কবি রচনা করেছিলেন অসংখ্য ভাটিয়ালী এবং সাম্পানের গান। বলাই বাহুল্য এসব সুর সৃষ্টিতে মাঝিমাল্লাদের অবদান অনস্বীকার্য।[৫]

নজরুল বেশ কিছু আধুনিক গানে প্রচলিত পদাবলীর সুরকে কাজে লাগিয়েছেন। এসব গানে আগাগোড়া কীর্তনের সুর ব্যবহার হয়নি। কোন গানের অন্তরা আবার সঞ্চারী অংশে কীর্তনের সুর ব্যবহার করেছেন। কোন কোন গানের একটি পংক্তিতেই হঠাৎ করে কীর্তনের সুর বেজে ওঠে।

'বসন্ত এল এল রে' গানের নীচের অংশে,

বেণুকার বনে বাঁশি বাজে,
বনমালী এল বন-মাঝে,
নাচে তরু-লতিকা
যে গোপ-গোপিকা
রাঙা হয়ে রঙের বানে॥

অথবা,

'বাঁশি তার কোথায় বাজে' শীর্ষক একটি গানে 'মোর অন্তর গো বাজে মোর মথুরা' অংশে পদাবলীর সুর ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা 'তুমি হাত খানি যবে রাখ মোর হাতের পরে' এ গানের 'যেন রাধা নাই আর বৃন্দাবনে গো সব গেছে মরে' অংশে কীর্তনের সুর ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুলের এরূপ অনেক আধুনিক গানে ভাটিয়ালী কীর্তন ইত্যাদির সুর মিশ্রণ করেছেন গানের কোন কোন অংশে। ফলে গানগুলো হয়ে উঠেছে অধিকতর ব্যঞ্জনাময়।

নজরুলের লোকজ সুরের গানগুলোকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ওগুলো সাঙ্গীকৃত। অথবা কীর্তন-ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া ইত্যাদি শ্রেণীর গানগুলোর কথা ও সুরকে সম্পূর্ণভাবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রূপায়িত করেননি। কথা ও সুরকে সাজিয়েছেন নিজের মত করে।

কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি- কথা, দোহা, আখর, তুক ও ছুট। গানের কোন অংশের অর্থ যখন কীর্তনীয়ারা বিশ্লেষণ করেন তখন তাকে কথা বলা হয়।[৬] কিন্তু নজরুল পূর্বসুরীদের এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কীর্তন গান রচনা করেননি,

এস নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া
কৃষ্ণ কানাইয়া হরি।
মাখি গোখুর ধূলি রেণু, গোঠে চরাইয়া ধেনু
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরী॥
গোপী-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গে
প্রাণ মাতাইয়া প্রেম-তরঙ্গে
বামে হেলায়ে ময়ূর-পাখা দুলায়ে তমাল-শাখা
নীপ বনে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে।
এসো লয়ে সেই শ্যাম-শোভা ব্রজ-বঁধু মনোলোভা
সেই পীত বসন পরি'॥
এসো গগনে ফেলি' নীল ছায়া,
আনো পিপাসিত মেঘ-মায়া
এসো মাধব মাধবী-তলে,
এসো বনমালী বন-মালা গলে
এসো ভক্তিতে প্রেমে আঁখি জলে।
এসো তিলক-লাঞ্ছিত সুর-নর-বাঞ্ছিত
বামে লয়ে রাই কিশোরী॥

(আদি রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন নজরুল ইন্সটিটিউট, পৃ. ৩২২-২৩।)

প্রচলিত কীর্তনের সাথে নজরুলের এ গানের তুলনায় নজরুলের স্বকীয়তা সহজেই ধরা পড়ে। কীর্তনের তাল দশ কোষি, তেওড়া, লোফা, মধ্যমান, রূপক, একতাল। নজরুলের কীর্তনের বেশিরভাগ তালই কাহারবা।

নজরুলের ভাওয়াইয়া গানের ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। এ গানে কিছু শব্দ বিশেষভাবে প্রচলিত যেমন মৈশাল বন্ধু, গাড়িয়াল ভাই ইত্যাদি। এই সুর স্থানে স্থানে উত্তর বঙ্গে দীর্ঘটানযুক্ত, তবে এই টান নিরবচ্ছিন্ন নয়, স্থানে স্থানে সুর ভেঙে আসে আর তার সঙ্গে একটু স্বরের আঘাত লাগতে শোনা যায়।[৮] নজরুল ভাওয়াইয়া গানগুলোতে শব্দের ক্ষেত্রে মৈশাল, গাড়িয়াল বাদ দিয়েছেন, এ গানে সুরারোপ ভাওয়াইয়ার সাথে সম্পর্ক থাকলেও গানগুলো স্থায়ী অন্তরা অর্থাৎ আধুনিক লঘু সাঙ্গীতিক পদ্ধতিতে রচিত, অথচ সুর শুনে বোঝা যায় এ গানে ভাওয়াইয়া। এইভাবে নজরুল ভাটিয়ালী, বাউল, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি রচনা করেছেন।

গানের সফলতা পরিবেশন গুণের উপর বেশিরভাগ নির্ভরশীল। শিল্পীর কণ্ঠ নিসৃত সুর, তাল ও সুরযন্ত্রের সঠিক ব্যবহার গুণেই গান হয় অধিকতর শ্রুতিমধুর।

নজরুলের লোকজ সুরের গানের ক্ষেত্রে এ কথাটি অধিকতর তাৎপর্যময়। বিভিন্ন শ্রেণীর গানে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আবহমানকাল থেকেই বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন— ভাওয়াইয়া গানে দোতারা, বাউলগানে একতারা, খমক, প্রেমজুড়ি, মুর্শিদি গানে সারিন্দা ব্যবহার হয়ে আসছে। মোটকথা গানের মেজাজ অনুযায়ী যথাযথ বাদ্য ও সুর যন্ত্রের অপরিহার্যতা। নজরুলের লোকজ সুরের গানের ক্ষেত্রে শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালকের দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন আছে। যেটার আজকাল খুবই অভাব।

গানের বাক্য ও গেয় এ উভয় অংশকেই যিনি পরিস্ফুট করেন তাকে আমাদের পূর্বসূরী সঙ্গীতবেত্তারা বলতেন 'বাগ গেয়কার।' যিনি দক্ষতার সঙ্গে কথা ও সুর উভয়ই রচনা করতে পারেন বা গীতি পরিবেশনায় কথা ও সুরের সম্মিলিত আবেদনকে রূপ দিতে পারেন তিনি বাগ গেয়কার।

বাগ গেয়কার উত্তম, মধ্যম, অধম— এই তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। উত্তম বাগ গেয়কার যিনি-ক্রিয়াত্মক ও শাস্ত্রাত্মক সঙ্গীতের এই উভয়দিকের ওপর বিপুল অধিকারসম্পন্ন। উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে নজরুল ছিলেন একজন মহাবাগ গেয়কার।

নজরুলের যে কোন আঙ্গিকের গানই শুনে আমরা অতি সহজেই ধারণা করতে পারি যে এটা নজরুলের গান, মোটকথা বৈচিত্র্যময় সঙ্গীত সৃষ্টি করে কাজী নজরুল বাংলা সঙ্গীতাঙ্গনে একটা নিজস্ব ঘরানা সৃষ্টি করেছেন। তাকে আমরা বলতে পারি নজরুল ঘরানা। আধুনিক বাংলা গানের অঙ্গনে এ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলেরই আছে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের সাহিত্য, রাজীব হুমায়ুন।
২. সঙ্গীত কোষ, করুণাময় গোস্বামী।
৩. নজরুল-সঙ্গীত রচনায় সুর ও বাণী, করুণাময় গোস্বামী, নজরুল পত্রিকা ৭ম সংকলন, ১৩৯৯।
৪. নজরুল-গীতি— অখণ্ড, আব্দুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত।
৫. সঙ্গীত কোষ, করুণাময় গোস্বামী।
৬. আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের বাণী, ৫ম খণ্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট।

[সূত্র ঃ নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা]